শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দশটি উপন্যাস

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

"রা স্বা"

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রীসুব্রত বাগচী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রকাশকের নিবেদন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত দশটি উপন্যাস—দিন যায়, বাসস্টপে কেউ নেই, আশ্চর্য ভ্রমণ, লাল নীল মানুষ, নীলু হাজরার হত্যারহস্য, ঘরজামাই, জীবনপাত্র, বাঘু মাম্নার বরাত, অসুখের পরে এবং ঋণ নিয়ে প্রকাশিত হল বর্তমান সংগ্রহটি।

আশা করি, আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য দশটি উপন্যাসের মতোই এটিও পাঠক সমাজে আদৃত হবে।

সূচিপত্র

দিন যায় ১১
বাসস্টপে কেউ নেই ৯১
আশ্চর্য ভ্রমণ ১৪১
লাল নীল মানুষ ২১৩
নীলু হাজরার হত্যারহস্য ২৭৭
ঘরজামাই ৩৫৭
জীবনপাত্র ৩৮৫
বাঘু মান্নার বরাত ৪৩৫
অসুখের পরে ৪৬১
ঋণ ৫২৭

গ্রন্থ-পরিচয় ৫৯৩

দিন যায়
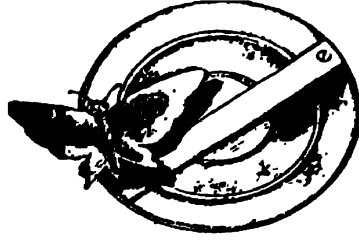
সীতাকে বহুকাল বাদে দেখল মনোরম।

দেখল, কিন্তু দেখা-হওয়া একে বলে না। দুপুরে উপর্ঝরণ বৃষ্টি গেছে। তারপর মেঘভাঙা রোদ উঠেছে। সমস্ত কলকাতা জলের আয়না হয়ে বেলা চারটের রোদকে ফেরত দিচ্ছে। ভবানীপুরের ট্রাম বন্ধ, চৌরঙ্গির মুখে জ্যাম। সবকিছু থেমে আছে, রোদ ঝলসাচ্ছে, ভ্যাপসা গরম। মনোরমের পেটে ঠাণ্ডা বিয়ার এখন দুর্গন্ধ ঘাম হয়ে ফুটে বেরোচ্ছে। লক্ষ্ণৌয়ের কাজ করা মোটা পাঞ্জাবি আর বিনির টেরিকটন স্ট্রাইপ বেলবটম প্যান্টের ভিতর মনোরম নিজের শরীরে কয়েকটা জলধারা টের পাচ্ছে। গরম, পচা, লালচে ঘাম তার। সীতা রাগ করত।

বিয়ারটা খাওয়াল বিশ্বাস। নতুন কারবার খুলেছে বিশ্বাস। ভারী নিরাপদে কারবার, ক্যাপিট্যাল প্রায় 'নিল'। কলকাতার বড় কোম্পানিগুলোর ক্যাশমেমো ব্লকসুদ্ধু ছাপিয়েছে, সিরিয়াল নম্বর-টম্বর সহ। ব্যবসাদার বা কন্ট্রাক্টররা আয়কর ফাঁকি দিতে বিস্তর পারচেজ দেখায়। সেইসব ভুয়ো পারচেজের জন্য এইসব ভুয়ো রসিদ। মাল যদি না কিনে থাক তবে 'কন্ট্যাক্ট বিশ্বাস। হি উইল ফিক্স এভরিথিং ফর ইউ।' যত টাকার পারচেজই হোক রসিদ পাবে, এন্ট্রি দেখাতে পারবে। সব বড় বড় কোম্পানির পারচেজ ভাউচার। বিশ্বাস এক পারসেন্ট কি দু পারসেন্ট নেবে। তাতেই অঢেল, যদি ক্লায়েন্ট আসে ঠিকমতো।

কিন্তু কারবারটার অসুবিধে এই যে, বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না। হাশ পাবলিসিটি। লোকে জানবে কী করে যে কলকাতার কোন গাড্ডায় বিশ্বাস বরাভয় উঁচিয়ে বসে আছে উদ্বিগ্ন আয়করদাতাদের জন্য? যে সব চেনা লোক কলকাতার বাজারে চালু আছে, তাদেরই বলে রাখছে সে। কমিশন দেবে।

—দিস ইজ দি জিস্ট ব্যানার্জি! বিশ্বাস বলল—এবার ইন্টারেস্টেড মক্কেলদের টিপ্‌সটা দেবেন।

মনোরম কলকাতার ঘুঘু। শুনে-টুনে মৃদু একটু হাসল, বলল—বিশ্বাস, এর চেয়ে চিট ফান্ডের ব্যবসা করুন। এটা পুরনো হয়ে গেছে। কলকাতায় অন্তত ত্রিশটা রসিদ কোম্পানিকে আমি চিনি।

বহুকাল আগে একটা ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়েছিল মনোরম। শরীরে কাটাছেঁড়াগুলো মিলিয়ে গেছে, ভাঙা হাড় জুড়ে গেছে। কেবল জিভটাই এখনও ঠিক হয়নি। দাঁত বসে গিয়ে জিভটা অর্ধেক নেমে গিয়েছিল। জোড়া লেগেছে বটে, কিন্তু কথা বলার সময়ে থরথর করে কাঁপে। কথাগুলো একটু এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। কিন্তু তাতে আত্মবিশ্বাস এতটুকু কমেনি মনোরমের।

বিশাল থলথলে চেহারার বিশ্বাস উত্তেজনায় চেয়ারে নড়ে বসল। মোকাম্বোর মজবুত চেয়ার তাতে একটু নড়বড় করে। প্রকাণ্ড গরম শ্বাস ফেলে বিশ্বাস ঝুঁকে মুগুরের মতো দুখানা হাতের কনুই দিয়ে ভর রাখল টেবিলের ওপর। বলল—ব্যানার্জি, আমার তিন মাসের ব্যবসাতে কত লাভ হয়েছে জানেন?

—কত?

বিশ্বাস শুধু মুখটা গম্ভীরতর করে অবহেলায় বলে—হুঁ।

মনোরম বলল—কিন্তু কম্পিটিশন তো বাড়ছে এ কারবারেও!

—ট্যাক্স পেয়ার কি কমে যাচ্ছে? জোচ্চুরি কমেছে? যতদিন এদেশে প্রাইভেট সেক্টরে ব্যবসা থাকবে, ততদিন আমারও ব্যবসা থাকবে। এর মধ্যেই আমার ক্লায়েন্ট তিনশো ছাড়িয়ে গেছে, দু-আড়াই লাখ টাকার রসিদ ইসু হয়েছে। অ্যান্ড উইদাউট মাচ পাবলিসিটি। আপনার স্বভাব হচ্ছে সব ব্যাপারের নৈরাশ্যের দিকটা দেখা। ভেরি ব্যাড।

বিশ্বাস ঠিক বলেনি। মনোরমের এটা স্বভাব নয়। নৈরাশ্যের দিকটা সে কখনও দেখে না।

বিশ্বাস বিয়ার খায় সরাসরি বোতল থেকে। বোতলের শেষ কয়েকটা ফোঁটা গলায় ঢেলে আবার নতুন বোতলের অর্ডার দিল। তারপর তেমনি মনোরমের মুখে ঝোড়ো লু-বাতাসের মতো শ্বাস ফেলে বলল—দেন?

মনোরম কিছুক্ষণ এক ঢোঁক বিয়ার মুখে নিয়ে তিতকুটে স্বাদটায় জখম জিভটা ডুবিয়ে রাখল। মুখের

ভিতরে ঠিক যেন একটা জিওল মাছ নড়ছে। গিলে ফেলল বিয়ারটা। আস্তে করে বলল—কত কমিশন?

—আমার কমিশন থেকে টুয়েন্টি-ফাইভ পারসেন্ট দেব।

—আর একটু উঠুন।

—কত?

—ফিফটি।

বিশ্বাস ভ্রূ তুলল না, বিস্ময় বা বিরক্তি দেখাল না। একটু হাসল কেবল। বিশ্বাস পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। তবু ওর দাঁতগুলো এখনও ঝকঝকে। নতুন বোতলটা তুলে নীরবে অর্ধেক শেষ করল। তারপর নিরাসক্ত গলায় বলল—ফিফটি। অ্যাঁ?

—ফিফটি।

—ব্যানার্জি, আমি যেমন প্রফিট করি তেমন রিস্কটা আমারই। ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে গভর্নমেন্ট কী রকম হুজ্জত করে আজকাল জানেন না? যদি ধরা পড়ি তো মোটা হাতে খাওয়াতে হবে নয়তো শ্বশুরাল ঘুরিয়ে আনবে। আমার প্রফিটের পারসেন্টেজ সবাই চায়, রিস্কের পারসেন্টেজ কেউ নেয় না। এটাই মুশকিল।

বিশ্বাস তেমন ঝোড়ো শ্বাস ছাড়ে। ওর নাকের বড় বড় লোমের গুছি বের হয়ে আসে। গালের দাড়ি অসম্ভব কড়া, তাই রোজ কামালেও গালে দাড়ির গোড়া সব গোটার মতো ফুটে আছে। ঘন ভ্রূ। আকাশি রঙের বুশ শার্টের বুকের কাছ দিয়ে কালো রোমশ শরীর দেখা যায়। গলায় সোনার চেন-এ সাঁইবাবার ছবিওলা ছোট্ট লকেট।

মনোরম মুখে বিয়ার নিয়ে নড়ন্ত জিভটাকে ডুবিয়ে রাখে বিয়ারে। মুখের ভিতরে একটা চুকচুক শব্দ হতে থাকে। শালার জিভটা নড়ছে অবিকল ছোট্ট মাছের মতন।

রসিদের কারবারটা মনোরমের কাছে ছেলেমানুষির মতো লাগে। সে আস্তে করে বলল—আজকাল ফলস রসিদ টিকছে না। স্পটে গিয়ে এনকোয়ারি হয়, কোম্পানি নিজেদের সিরিয়াল নম্বর দেখে বলে দেয় যে, রিয়্যাল পারচেজ হয়নি। তখন মক্কেলরা ঝোলে।

বিশ্বাস উত্তেজিত হয়ে বলে—ঝুলবে কেন? আজকাল কেউ ঝোলে না। ধরা পড়লে খাওয়াবে কিছু।

মনোরম শ্বাস ছেড়ে বলে—খাওয়াবে আর খাওয়াবে। কত খাওয়াবে মশাই? এত খাওয়ালে নিজে খাবে কী? তার ওপর ফলস রসিদ ধরা পড়লে ক্রিমিনাল কেস হয়ে যায়।

বিশ্বাস ঝুঁকে বলল—আপনি আমার ইয়ে বোঝেন। আমি আরও তিনটে কোম্পানি চালাই ব্যানার্জি। সেগুলো অনেক বেশি রিস্কি। বলে উত্তেজিত বিশ্বাস ধবধবে সাদা রুমালে ঘেমো কপালটা মুছল। তারপর হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে বলল—আপনার ওই একটা বড় বদ স্বভাব। পেসিমিস্টিক অ্যাটিচুড। ভেরি ব্যাড।

মনোরম নিরুৎসাহের হাসি হাসে।

বিশ্বাস বলল—একটা কথা মনে রাখবেন। না সুন্দরী বউ যার, হয় না যার শালা, তার ঘরে অলক্ষ্মী অচলা।

—মানে?

—মানে হচ্ছে 'না' কথাটা যার সুন্দরী বউয়ের মতো প্রিয়, 'হয় না' কথাটাকে যে নিজের শালার মতো খাতির-যত্ন করে, সে কখনও সাকসেসফুল হতে পারে না।

মনোরম বালকের মতো হাসে। এমন সে অনেকদিন হাসেনি।

বিশ্বাস স্মিতমুখে বলে—এক মহাপুরুষের কথা। আমি অবশ্য বাজে ব্যাপারে প্রয়োগ করলাম।

—ঠিক আছে। মনোরম বলল—আমি দেখব।

—টুয়েন্টি ফাইভ?

—টুয়েন্টি ফাইভ।

বিশ্বাস আত্মতৃপ্তিতে হাসল। বলল—এটা আমার সাইড বিজনেস। না টিকলেও ক্ষতি নেই।

বৃষ্টি এখানে বসে কিচ্ছু বোঝা যায় না। তারপর একটু চিন্তিতভাবে বলে—খুব বৃষ্টি?

—থেমেছিল। আবার বোধহয় শুরু হয়েছে।

অন্যমনস্কভাবে সমীর বলে—খেলাটা না ওয়াশড আউট হয়ে যায়।

—কার খেলা?

—ছোটবাঙাল আর বড়বাঙাল। উয়াড়ি ভারসাস ইস্টবেঙ্গল। সমীর তার সরু কিন্তু সুবিন্যস্ত দাঁত আর কোমল ঠোঁট দিয়ে আকর্ষক হাসিটা হাসে, তারপর ফোনটা তুলে নিতে নিতে বলে—দাঁড়াও, জেনে নিই।

ফোন করল। বোধহয় ক্লাবে। সমীর অনেক ক্লাবের মেম্বার। আই এফ-এ, সি-এ-বি, ওয়াই-এম-সি-এ এবং আরও কয়েকটার। বোধহয় রোটারিয়ানও। বহুকাল ধরে মেম্বার। এতদিনে দু-চারটে ক্লাবের কর্মকর্তাও হয়েছে বোধহয়।

ফোনটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বলল—না, খেলা হচ্ছে। বৃষ্টিটা বোধহয় থেমে গেল। লিগের যা অবস্থা আজকের খেলাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট।

থুতনিই বোধহয় মানুষের মুখের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। অনেকক্ষণ সমীরকে লক্ষ করে এই সত্যটা উপলব্ধি করে মনোরম। থুতনির চমৎকার খাঁজটি সমীরের বংশগত, ওই খাঁজটিই ওর মুখটাকে এত উঁচুদরের মানুষের মুখেব মতো করেছে। অনেক মানুষের মুখই সুন্দর কিন্তু সেই সৌন্দর্যে সব সময়ে ব্যক্তিত্ব থাকে না। সমীবকে দেখলেই যে সম্ভ্রান্ত এবং উঁচুদরের লোক বলে মনে হয় তা কি ওর চমৎকার খাঁজওলা ওই থুতনিটার জন্যই? মনোরম ভাবে। সমীর ঘড়ি দেখছে। বোধহয় প্রায় চারটে বাজে। ওর ওঠা দরকার। কিন্তু সে কথাটা ভদ্রতাবশত মনোরমকে বলতে পারছে না।

মনোরম সংকোচটা ঝেড়ে ফেলে বলে—সীতার কোনও খবর জানেন?

আবার মদরঙের চশমার ভিতরে চোখটা সামান্য বিস্ফারিত হল। বিস্ময়ে। একটু অস্বস্তির সঙ্গে সমীর বলে—সীতা! ভালই আছে। একদিন কি দু'দিন নার্সিং হোম-এ গিয়েছিল ওর দিদিকে দেখতে।

—সে খবর নয়, অন্য কোনও খবর?

—আর কী? ওদের বাড়িতে বহুদিন যাই না, ঠিক কিছু বলতে পারব না। কীসের খবর চাও?

মনোরম টেবিলের ওপর কাচেব ভিতরে চাপা একটা ছবি দেখল। রঙিন ফটোগ্রাফ বলে মনে হয়েছিল প্রথমে। তা নয়, হাতে আঁকা রঙিন প্রিন্ট। বনভূমিতে বেলাশেষের সিঁদুরে আলো, কয়েকটা গোরুর গাড়ি ঝুঁকে আছে, মাঝখানে আদিবাসী কয়েকজন নারী ও পুরুষ রান্নাবান্না করছে। পথের ওপর গেরস্থালি। ছবিটার মধ্যে একটা গল্প আছে।

সে মুখ তুলে বলল—একটু আগে আমি সীতাকে দেখলাম।

সমীর অস্বস্তিতে চেয়ারের একদিক থেকে আর একদিকে শরীরে ভর দিল। বলল—ও! কোথায়?

—এসপ্লানেডে। বোধহয় মার্কেটিংয়ে এসেছিল। ফিরে যাচ্ছিল তখন।

চুলে তেমনি আঙুল চালায় সমীর। চোখ সরিয়ে নেয় মনোরমের চোখ থেকে, তারপর একটু হাল্কা গলায় বলে—কথাটথা বললে নাকি?

—না। আমি কথা বললেও ও পাত্তা দিত না।

মনোরম ক্ষীণ একটু হাসে। সমীর চিন্তিতমুখে পার্টিশনটার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বড় একটা শ্বাস ফেলে বলে—আর কিছু বলবে? হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে—এখনও একটু সময় আছে।

—ক'টা বাজে?

—চারটে প্রায়।

—আমার কিছু বলার ছিল।

—খুব কি জরুরি কথা?

—খুব। অন্তত আমার কাছে।

—খুব জরুরি হলে না হয় আজকের প্রোগ্রামটা...

—না না। আমি...আমার খুব অল্প কথা।

সমীর একটু ঝুঁকে মুখখানা তুলে চেয়ে রইল।

মনোরম বলার আগে আর একবার বনভূমির ছবিটা দেখে নিল। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কয়েকটা গোরুর গাড়ি। গাছের ছায়ায় গোধূলি, আদিবাসী নারী ও পুরুষ উনুন জ্বেলেছে।

—আমি আজ সীতাকে দেখলাম।

—বলেছ তো।

—বলেছি। তবু বলতে ইচ্ছে করছে।

—কী?

—সীতা এরপর কী করবে কিছু জানেন?

—ফ্রাঙ্কলি জানি না।

সমীর দুঃখিতভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে। মুখে সত্যিকারের সমবেদনা। রক্তাভ সুন্দর আঙুল দিয়ে থুতনির খাঁজটা মুছে নিল অকারণ। একটা পোখরাজ একটু ঝলসে যায়। মনোরম বুঝতে পারে, সমীরের কিছু বলার নেই।

কিন্তু তবু মনোরমের ইচ্ছে হয়, আরও একটুক্ষণ এই সফল সুপুরুষ ও উঁচু ধরনের লোকটির সঙ্গে কাটায়। আর একটু দেখতে ইচ্ছে করে, কী আছে লোকটার। সীতার কথা একটু শুনতে ইচ্ছে করছিল তার।

সে একটা মিছে কথা বলল। চেয়ারটা ঠেলে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে—আমিও মাঠের দিকে যাচ্ছিলাম।

—যাবে? বলে একটু বিস্মিতভাবে তাকিয়েই সেই ভদ্র আন্তরিক হাসিটি হেসে বলে—ইউ আর ওয়েলকাম। আমার সঙ্গে চলো।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে মনোরম বলে—যাব?

—যাবে না কেন?

মনোরম একটু বোকা-হাসি হেসে বলে—আমি কিন্তু একটু মদ্যপান করেছি। অবশ্য তেমন কিছু না, একটু বিয়ার...

তেমন ভদ্র হাসি হেসে সমীর উঠতে উঠতে বলে—গন্ধ পাচ্ছিলাম। তাতে কী? আমিও তো মাঝে মাঝে খাই। ইটস অল ইন দ্য গেম।

টেবিল থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়ার আগে শেষবারের মতো মনোরম ছবিটা দেখছিল। রাঙা আলোর বনভূমিতে গো-গাড়ি থামিয়ে গেরস্থালি পেতেছে কয়েকজন আদিবাসী পুরুষ ও রমণী। কী চমৎকার বিষয়, যেন ঠিক একটা গল্প বলা আছে ছবির ভিতরে। ছবিটা দেখতে দেখতেই সমীরের শেষ বাক্যটির চমৎকার ইংরিজি ক'টা শব্দ শুনে সে চমকে গেল। এখনও ভাল ইংরিজি-বলা লোককে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়। আদিবাসীদের ছবি থেকে সে চোখ সরিয়ে কলকাতায় চলে এল এক পলকে। কিছুক্ষণের জন্য যেন বা সে ওই ছবির বনভূমিতে চলে গিয়েছিল।

—আমার কার্ড নেই, লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে হবে।

—টিকিট? লোকটা পরতে পরতে আবার সেই ভদ্র হাসি, কোমল লাবণ্য, ক্ষমা, সব বিকিরণ করে সমীর বলে—আরে কার্ড-ফার্ড লাগবে না। আমি...বলে আবার সেই ভদ্রতাসূচক স্তব্ধতা, থেমে বলল—গভর্নিং বডির মেম্বার।

আন্দাজ করেছিল। তাই হাসল মনোরম, মনে মনে বলল—জানতাম। ঘাড় দুটো উঁচু করে ঘ্রাণ করল। বলল—না। আমি সবুজ গ্যালারিতেই যাব।

—চলো তো।

নিঃশব্দ গাড়ি। ছুটল, শব্দ হল না। কথা না বলে গাড়িটার জোরালো ইঞ্জিনের টান ও গতিটুকু উপভোগ করে মনোরম। কনভার্টিবল বুইক। একটু পুরনো। তবু ভাল। যে কোনও ভাল জিনিস—এমনকী একটা গাড়ির চলাও—নিবিড়ভাবে উপভোগ করার আছে। মনোরম করে। মামার গাড়িটা ভাল নয়, সেই গাড়িতে সে আজকাল প্রায়ই বীরুর পিছু নেয়।

ইডেন গার্ডেনের উল্টো দিকে গাড়িটা দাঁড় করায় সমীর। বৃষ্টিটা থেমেছে। পিঁপড়ের মতো ময়দান ভেদ করে লোক চলেছে। দূরে উড়ছে একটা লাল সোনালি পতাকা। মাঠে সমীর গাড়ির কাচ বন্ধ করে
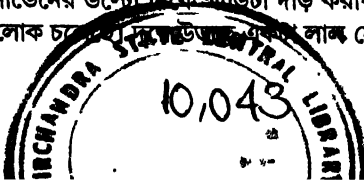
দরজা লক করে বলল—এখানেই থাক। দূরে থাকাই সেফ।

হাঁটতে হাঁটতে মনোরম বলে—আপনি রোজ খেলা দেখেন?

—আরে না, না। মাঝে-মধ্যে। তবে গভর্নিং বডিতে যাওয়ার পর প্রায়ই আসতে হচ্ছে। ওটা এটিকেট।

—কখনও টিকিটের গ্যালারি থেকে খেলা দেখেননি?

একটু অস্বস্তি বোধ করে সমীর, দ্বিধাভরে বলে—সেই ছেলেবেলায়, দু-একবার, ঠিক মনে নেই।

—কেন যান না?

—এমনিই! যেতে তো হয় না, তা ছাড়া ওদিকের ওরা একটু হস্টাইল।

সাধারণ দর্শকের গ্যালারি থেকে যখন মানুষ জামা প্যান্ট খুলে বাতাসে ওড়ায়, চেঁচিয়ে বাপ-মা তুলে গাল দেয় খেলোয়াড়কে, যখন ঘাড়ে লাফিয়ে ওঠে, মস্তিষ্কশূন্য খ্যা-খ্যা হাসে, কনুয়ের বা হাঁটুর গুঁতো দেয়, তখন তার মাঝখানে এই অতি সুকুমার ও ভদ্র মানুষটিকে কেমন দেখাবে? যখন ইট ছুড়ে মারবে, রেফারি, লাইনসম্যান আর ক্লাবের কর্মকর্তাদের পিতৃপুরুষ উদ্ধার করবে তখন কেমন হবে ওই মুখখানার ভাব!

—ওরা হস্টাইল কেন, তা কিন্তু একবার আপনার নিজের দেখে আসা উচিত। গভর্নিং বডির মেম্বারদের দর্শক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা ভাল।

সমীর দ্বিধাভরে বলে—মন্দ বলোনি। কিন্তু এ বয়সে একটা মোটামুটি ভদ্র জীবন যাপন করে, ওই ইট-ছোড়া আর খারাপ কথা ভাল লাগে না। হার্শনেসটা ঠিক সহ্য হয় না আমার।

মাঠের কাছাকাছি এসে মনোরম হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সমীরের কোমল, পরিষ্কার এবং রক্তাভ একখানা হাত ধরল—আসুন।

সমীর অবাক হয়ে বলে—কোথায়?

—সবুজ গ্যালারিতে।

—আরে পাগল, টিম মাঠে নামবে, মেম্বাররা খোঁজাখুঁজি করবে।

মনোরম মিনতি করে—আসুন না। একদিন আমার সঙ্গে দেখুন। ওদের বলবেন শরীর খারাপ ছিল।

সমীর হাত টানাটানি করল না, বিরক্তি দেখাল না। কেবল সহৃদয়ভাবে হেসে বলল—আরে, আজ তুমি আমার গেস্ট। এসো এসো—

লড়াইটা মর্যাদার ছিল। সবুজ গ্যালারিতে লম্বা লাইনে সমীরকে দাঁড় করাবে, গ্যালারিতে খিস্তির সমুদ্রে দাঁড় করিয়ে পাশাপাশি খেলা দেখবে—এতটা আশা করেনি মনোরম। বড়লোকেরা যে কী জিনিস দিয়ে তৈরি! টপ করে হারিয়ে দেয়। মনোরম ওই মহার্ঘ গলার স্বরের প্রভুত্বের কাছে হেরে গেল। খুবই বোকা-বোকা লাগছিল নিজেকে।

সমীর তার কাঁধটা বন্ধুর মতো ধরে বলল—চলো।

মনোরম চলল। সসম্ভ্রমে গেট-এর পাহারাদাররা রাস্তা ছেড়ে দেয়। মনোরম কে সে প্রশ্নই ওঠে না।

ভিতরে দু-চারজন কর্তাব্যক্তি গোছের লোক সমীরকে ঘিরে ধরে। সমীর যে বড় 'ডোনার' এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, নইলে মনোরমের সন্দেহ ও কোনওকালে ফুটবলে লাথিই দেয়নি।

কথা বলতে বলতেই সমীর ব্যস্তভাবে চলে গেল টেন্ট-এর দিকে, মনোরম যে সঙ্গে আছে, খেয়ালই করল না। একা দাঁড়িয়ে থেকে মনোরম তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে। একা সে দাঁড়িয়ে, চারদিকে ব্যস্ত-সমস্ত লোকজন চলে যাচ্ছে। এখন কেউ তাকে সে কে জিজ্ঞেস করলে তার তেমন কিছু বলার নেই। চলাচলের রাস্তাটা ছেড়ে সে গ্যালারির তলদেশে আবছায়ায় এসে দাঁড়ায়। টেন্ট-এর খোলা জানালা দিয়ে ভিতরের অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। সমীর যে কোথায় গেল! বড্ড একা লাগে মনোরমের। আর সেই নিঃসঙ্গতায় কেবল টুক টুক করে মুখের ভিতরে নড়ে তার অসহায় জখমি জিভখানা।

ঝলসানো রঙের জার্সিপরা খেলোয়াড়রা সারিবদ্ধভাবে টেন্ট থেকে বেরিয়ে আসছে। কী চমৎকার তাদের সতেজ উরু, নোয়ানো কিন্তু গর্বিত মাথা, চারদিককে অবহেলা করে তারা পলকে গ্যালারির ভিতরকার রাস্তা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় মাঠের দিকে। সামনে পেছনে পাশে কয়েকজন ভাল চেহারার

লোকজন তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল। মনোরম ঈর্ষার চোখে এই তাজা বয়সি খেলোয়াড়দের চলে-যাওয়া দেখছিল। সে যদি খেলোয়াড় হত!

আলো থেকে চোখ সরিয়ে গ্যালারির তলার আবছায়ার দিকে তাকিয়ে মনোরম নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল। পায়ে বুট, হোস আর রঙিন জার্সি। নোয়ানো মাথা, আত্মবিশ্বাসী সতেজ উরুদ্বয়ে মাংসল শক্তির পিচ্ছিলতা। হেঁটে যাচ্ছে মনোরম খেলার মাঠের দিকে.। সেখানে হাড়ভাঙা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গ্যালারিতে সীতা বসে আছে, উদগ্রীব তার শুষ্ক উজ্জ্বল মুখখানা। মাঠে বাইশজনের একজন হয়ে মনোরম প্রচণ্ড শক্তিতে ফেটে পড়ে। কী খেলাই খেলছে মনোরম, কী খেলাই যে খেলছে! বাইশজনের মধ্যে ঠিক একজনকেই দেখছে সীতা। মনোরমকে।

হঠাৎ মাঠে চিৎকার ফেটে পড়ে। টিম মাঠে নামছে। কল্পনাটা ভেঙে যায়।

মাঠ থেকে চিৎকার আসছে। বলে বুটে লাগাবার শব্দ। দৌড় পায়ের আওয়াজ। একজন চেঁচিয়ে উঠল—হেগো...হলদে চিনি দিয়ে খা। একা বিষণ্ণ এবং চুপচাপ দাঁড়িয়ে শোনে মনোরম। আজ বিকেলে সে সীতাকে দেখেছিল। ভুলতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত স্মৃতি ছাড়া মানুষের কিছুই থাকে না বুঝি! গ্যালারিতে ঝুঁকে মানুষ খেলা দেখছে, মাঠে রগ-ছেঁড়া লড়াই কত উত্তেজক, বলে পা লাগার শব্দ কী মাদকতাময় কত মানুষের কাছে! একাকী মনোরম দাঁড়িয়ে আছে গ্যালারির ছায়ায়, বিষণ্ণ, স্মৃতিতাড়িত, উদাসীন। এখনও, মানুষ পৃথিবীতে খেলা করে। ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা। চারদিকে বৃষ্টিবিন্দুর মুক্তো আর মেঘভাঙা রোদের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর মাটিতেই হেঁটে গেছে সীতা। কোথা থেকে এসেছিল, কোথায় চলে গেল কে জানে! প্রায় এক বছরে সীতা কত দূরের হয়ে গেছে! সীতাকে চেনার চিহ্নগুলি কি শেষ পর্যন্ত মনোরমের থাকবে। ভুলে যাবে না তো। স্মৃতি ছাড়া তার আর কিছুই নেই। প্রবল বৃষ্টিতে যেমন গাছপালার ধুলোময়লা ধুয়ে যায় তেমনই কি সীতা মনোরমের সব স্মৃতি ধুয়ে-মুছে ফেলেছে? কিছু কি নেই?

মুখের ভিতরে জিভটা নড়ছে টুক টুক করে। চামচের মতো নড়ন্ত জিভটাই যেন তার স্মৃতিকে খুলিয়ে তোলে। সীতা তীব্র আশ্লেষের সময়ে কতবার তার সুন্দর দাঁতে মুখের ভিতরে মনোরমের জিভটাকে নরম করে চেপে ধরে রেখেছে। শ্বাসবায়ুর স্বরে বলেছে 'নোড়ো না জিভ, চুপ করো।' সীতার সুগন্ধী সুস্বাদু মুখের ভিতরে জিভটা নিথর হয়ে থাকত। এমন প্রবলভাবে সেই অনুভূতিটা আক্রমণ করে মনোরমকে যে তার চোখ বুজে আসে, মুখটা আস্তে একটু ফাঁক হয়, জিভটা লোভে-প্রত্যাশায় বেরিয়ে আসে। মুখে স্বেদবিন্দু ফুটে ওঠে মনোরমের, গায়ে কাঁটা দেয়, শ্বাস গাঢ় হয়ে আসে। সমস্ত শরীরটা এক অদৃশ্য সীতার ঝুঁকে-পড়া, কাছে আসা, আলিঙ্গন-আশ্লেষে বদ্ধ অস্তিত্বের স্বাদ নিতে থাকে। ইডিও-মোটর অ্যাকশন।

ঠিক এই অবস্থায় তাকে দেখল সমীর। টেন্ট-এর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবার মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে সে অবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কাছে এসে বলল—তোমার শরীর কি খারাপ মনোরম?

—না, না। লজ্জা পেয়ে মনোরম বলে।

সমীরের অবাক ভাবটা কাটেনি, বলল—চোখ বুজে, জিভ বের করে এমন ভাবে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে যে আমি চমকে উঠেছিলাম।

কী করবে মনোরম! মনে পড়ে, বড্ড যে মনে পড়ে! কিছু একটা প্রবলভাবে মনে পড়লেই তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। এই ইংরিজি শব্দটা সীতাই শিখিয়েছিল তাকে। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছে সীতা, অখণ্ড মনোযোগে, খুব ধীর হাতে, চোখ ছোট, ঠোঁট দুটো পাখির ঠোঁটের মতো ছুঁচোলো। দেখতে দেখতে মনোরমেরও চোখ ছোট হয়ে যেত, ঠোঁট ছুঁচোলো হয়ে আসত, দুটো হাত আপনা থেকেই শূন্যে উঠে ছুঁচে সুতো পরানোর ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকত, হঠাৎ চোখ তুলে দৃশ্যটা দেখেই হেসে ফেলে সীতা একদিন বলেছিল—তোমার ইডিও-মোটর অ্যাকশন আছে। না বুঝে মনোরম বলেছিল—মানে? সীতা উত্তর দিয়েছিল—ওটা সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার। কখনও কখনও সেই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে মনোরমের। কোনও কারণ থাকে না, হঠাৎ মনে পড়ে। সেই ভয়ঙ্কর শব্দ, অন্ধকার রাত, হঠাৎ ঘুম-ভাঙা আধো-চেতনায় টের পেত, চারদিকে ট্রেনের কামরা ভাঙার শব্দ, কে যেন তাকে বাতাসে ছুড়ে দিচ্ছে। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল মনোরম। মনে

পড়লেই তার হাত মুঠো পাকায়, শরীর কুঁকড়ে আসে, চোখ বুজে সে কাল্পনিক আঘাতে বিকট মুখভঙ্গি করতে থাকে। এ দৃশ্য দেখেও সীতা ওই ইংরিজি শব্দটা বলেছিল। ইডিও-মোটর অ্যাকশন। বলত—তোমার যখন ছেলে হবে, আর ছেলেকে যখন আমি ঝিনুকে দুধ খাওয়াব তখন তা দেখে ঠিক তুমিও হাঁ করবে, ঢোক গিলবে, দেখো। ইডিও-মোটর অ্যাকশন থাকলে ওরকম হয়।

দুর্ঘটনাটা এড়ানো গেছে। তাদের ছেলেপুলে হয়নি। সীতা তাই বিবাহ-বিচ্ছেদের পর অবিকল বিয়ের আগের মতো কুমারী হয়ে গেছে। কিন্তু তা কি হয়? হতে পারে? স্মৃতি থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত স্মৃতিই থাকে। কুমারী সীতার বুকভরা বিবাহের স্মৃতি, মনোরম জানে।

—এসো, বলে সমীর হাঁটতে থাকে। এবং মনোরম কেন সমীরের সঙ্গে এতক্ষণ লেগে আছে তা না-বুঝেই পিছু নেয়। গ্যালারির ফাঁক দিয়ে মাঠে রঙিন জার্সির ছোটাছুটি দেখা যায়। একটু এগোতেই মস্ত আকাশের নীচে সতেজ সবুজ মাঠ, গ্যালারিতে আনন্দিত ভিড়, সাদা উড়ন্ত বলখানা—সব মিলিয়ে সুন্দর দৃশ্যটা দেখে মনোরম। দেখে, কিন্তু তাকে কিছুই স্পর্শ করে না। বরং একটা খোলা বাতাস এসে ঝাপটা দিতেই তার গা শিরশির করে, একটু শীত করে। সে এই খেলার কিছুই মানে বুঝতে পারে না। তবু সমীরের পিছু পিছু সে যায়। লোহার ঘেরা-বেড়ার গেট দিয়ে মাঠের সাইড লাইনের ধারে গিয়ে বসে। একটা প্রবল চিৎকার উঠতে উঠতে হঠাৎ ফেটে পড়ে উল্লাসে। গোল। দুহাতে কান ঢেকে মনোরম চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ। এত কোলাহল তার সীতার হেঁটে-যাওয়ার ছবিটা ছিঁড়ে দেয় বুঝি।

সমীর গাঢ় একটা শ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাল। মুখে হাসি। একটু ঝুঁকে বলল—বি পাল খেলছে না, আমাদের রেগুলার স্ট্রাইকার। খুব চিন্তা ছিল।

না-বুঝে মনোরম হাসল, যেন বা গোলটা হওয়ায় সেও নিশ্চিন্ত। খানিকটা অসহায়ভাবেই সে মাঠের দিকে চেয়ে খেলাটা বুঝবার চেষ্টা করে। সারা মাঠ জুড়ে রঙিন জার্সির ছোটাছুটি। মাঠে চোরা জল লাথি খেয়ে হঠাৎ ছিটকে ওঠে ফোয়ারার মতো। পিছলে পড়ে বহু দূর মাটিতে ঘষটে যায় চতুর খেলোয়াড়েরা। কী সুন্দর ভঙ্গিতে হরিণের মতো লাফিয়ে ওঠে শূন্যে গোলমুখে কয়েকজন হালকা শরীরের মানুষ। বলটা বাতাসে কেমন ধনুকের মতো বাঁক নেয়। দেখতে দেখতে তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। পা শূন্যে ওঠে, মাথাটা হঠাৎ নড়ে, দুহাত মুঠো পাকায়।

দুটো গোলের পর সমীর হাসল—গেম ইজ ইন দি পকেট। তুমি কী বলবে বলেছিলে মনোরম।

মনোরম একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে—মানস লাহিড়িকে আপনি চেনেন?

সমীর একটু থমকায়। তারপর চিন্তা করে বলে—কোন মানস বলো তো!

—জিমন্যাস্ট ছিল। রিং থেকে পড়ে গিয়ে যার কলারবোন ভেঙেছিল এখন রেলের অফিসার, দু-চারটে ক্লাবের কোচ। চেনেন না?

সমীর মাথা নাড়ল, বলল—হ্যাঁ, চিনি।

—আমি খবর রাখি, সীতা ওকে বিয়ে করবে।

সমীর নীরবে কিছুক্ষণ খেলাটা দেখে যেতে থাকল। ভ্রূ কোঁচকাল। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল—মনোরম, ফ্র্যাঙ্কলি আমি কিছুই জানি না। কিন্তু যদি সীতা আবার বিয়ে করেই তাতেই বা কী?

মনোরম সহজ উত্তর দিল না। বলল—ডিভোর্সের পর এক বছর পূর্ণ হতে আর মাস তিনেক বাকি। তারপর আইনত সীতা বিয়ে করতে পারে। কিন্তু—

—কিন্তু কী?

—আমার কয়েকটা কথা ছিল।

সমীরের ভ্রূ কোঁচকানোই ছিল, একটু অধৈর্যের গলায় বলে—আমাকে এ সব ব্যাপারের মধ্যে টেনো না মনোরম। আমি ইনভলভড হতে চাই না। তা ছাড়া সীতার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক তো চুকেই গেছে। আবার কেন? লিভ হার অ্যালোন।

মনোরম মাথা নাড়ল। বলল—তা হয় না। সীতা এখনও আমার কাছ থেকে মাসোহারা পায়।

—তাতে কী?

—তাতে এটুকু প্রমাণ হয় যে, সে আমার ওপর এখনও কিছুটা নির্ভরশীল। নীতিগতভাবে তার সম্বন্ধে দু-চারটে কথা আমি বললে দোষ হয় না।

—কিন্তু আমাকে কেন জড়াচ্ছ?

—আপনাকে জড়াচ্ছি না। সীতার কোনও খবর পাওয়ার উপায় আমার নেই। আপনি ও বাড়ির জামাই, আপনি খবর পান। তাই আপনাকে ছাড়া আর উপায় কী?

—তুমি বরং সীতাকে চিঠি লেখো, কিংবা টেলিফোন করো।

—টেলিফোন করলে ও ফোন রেখে দেবে। চিঠি ছিঁড়ে ফেলবে।

সমীরের ভদ্র ও সুকুমার মুখে ইতিমধ্যে অধৈর্যের ভাব ফুটে উঠেছে। মনোরম সেটা লক্ষ করে। তবু সমীর বলে—কী বলতে চাও?

গোলের সামনে একজন ফরোয়ার্ড ল্যাং খেয়ে মাটিতে গড়াচ্ছে। চারদিক থেকে প্রবল একটা চিৎকার ওঠে। রেফারির বাঁশি বাজে। সমীর হঠাৎ দুহাতে মাথাটা ধরে ধরা গলায় চেঁচিয়ে বলে—গড। পেনাল্টি!

স্পটে বল বসানো হয়েছে। কিন্তু কে কিক নেবে তা নিয়ে একটু ঠেলাঠেলি হতে থাকে। কেউ এগোয় না। মাঠসুদ্ধ লোক ঝুঁকে আছে ব্যাপারটার দিকে। সমীর নিথর। কথাগুলো আটকে আছে মনোরমের গলায়। পেনাল্টি শটটা নিতে ওরা বড় দেরি করতে থাকে। মনোরমের ইচ্ছে করে, উঠে গিয়ে শটটা দিয়ে ফিরে এসে সমীরকে কথাগুলো বলে।

কালো লম্বা একটা ছেলে অবশেষে এগিয়ে যায়। কোমরে হাত দিয়ে হাত দশেক দূর থেকে বলটাকে দেখে। দৌড়োয়। ডান পায়ে কিকটা নেয়। কোমর সমান উঁচু হয়ে ভীমরুলের ডাক ডেকে বলটা গোলে ঢুকে যায়। মাঠ স্তব্ধ।

সেই স্তব্ধতার মধ্যেই মাঠের মাঝখানে বলটা চলে আসে। দুপাশে খেলোয়াড়রা দাঁড়ায় যথাযথ। সমীর অস্ফুট গলায় বলে—গড।

তারপর সিগারেট ধরায়।

মোটে আর একটা গোলের লিড থাকছে। হাফটাইম পর্যন্ত ব্যাপারটা যথেষ্ট নিরাপদ নয়। মনোরম সমীরের মুখ দেখে ব্যাপারটা আঁচ করে নিল।

চিন্তিত সমীর মনোরমের দিকে মুখ ফেরায় এবং স্বয়ংক্রিয় হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই এগিয়ে দেয়।

—কী বলছিলে যেন!

মনোরম একটা শ্বাস ফেলে বলে—সীতার কথা।

—ও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো।

—আসলে সীতার কথাও আমি বলতে চাইছি না।

—তবে কী বলতে চাইছ?

—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা।

—বলো।

—মানস লাহিড়ি আমার বন্ধু ছিল, আমাদের বাসায় আসত-টাসত। এবং নামকরা জিমন্যাস্ট বলে আমি তাকে যথেষ্ট খাতির করতাম। সে সীতার খুব প্রশংসা করত। ক্রমে সীতার ভাল লাগতে থাকে। মানস লাহিড়িকে তো আপনি জানেন, কী রকম পেটা প্রকাণ্ড শরীর, কাঁধের হাড় ভাঙা বলে বাঁ দিকটা একটু বেঁকে থাকে, তবু খুবই পুরুষালি চেহারা। অন্য দিকে সীতা একটা চড়াই পাখির মতো ছোট্ট আর নরম আর সুন্দর।

—গুডনেস! সমীর আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে।

ও বিরক্ত হয়েছে মনে করে মনোরম থেমে যায়। কিন্তু তারপরই দেখে কর্নার ফ্লাগের কাছ পর্যন্ত গিয়ে সমীরের টিমের রাইট-আউট বলটা সেন্টার করতে পারেনি। বল লাইন পার হয়ে গেছে। গোল কিক।

—কী বলছিলে যেন?

—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা।

—বলো।

—কোনও অন্য পুরুষ যখন কোনও বিবাহিতা মহিলার প্রশংসা শুরু করে এবং সেই মহিলা যখন সেই প্রশংসা গ্রহণ করে খুশি হতে থাকে তখন তাদের মধ্যে একটা যৌন ঋণ গড়ে ওঠে।

—কীসের ঋণ।

—যৌন ঋণ।

—ওঃ গড!

পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকে একজন খেলোয়াড় বলটা বাইরে মেরেছে। মনোরম গম্ভীরভাবে সিগারেটে টান দেয়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে।

—কী বলছিলে মনোরম? কীসের ঋণ?

—যৌন ঋণ।

—সেটা কী ব্যাপার?

—পরস্পরের কাছে তখন একটা না-বলা দাবি-দাওয়া তৈরি হতে থাকে। অপরিশোধ্য একটা ঋণ গড়ে ওঠে। ঠিক ভালবাসা এ নয়, এটুকুর জন্য কেউ ঘর-সংসার ভাঙে না, তবু এও এক ধরনের স্খলন বা পতন। পরস্পরকে যখনই ভাল লাগতে থাকে, তখনই ভিতরে ভিতরে একটা বাঁধ ভাঙার ইচ্ছে উঁকি দিতে থাকে। যেহেতু সেটা অবৈধ সেই জন্যই সেটা আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে।

—ডিসগাস্টিং। বি পাল খেললে এরকমটা হত না।

—কার কথা বলছেন?

—বি পাল। আমাদের স্ট্রাইকার। গোল-লাইন থেকে বলটা ব্যাক করতে পারা ছেলেখেলা ছিল, মজুমদার পারল না দেখলে?

—আমি মানস লাহিড়ির কথা বলছিলাম।

—ওঃ হ্যাঁ, বলো।

—আসলে মানস লাহিড়ির কথাও নয়।

—তবে কার কথা।

—স্বামী-স্ত্রীর কথা।

—বলো।

—বিয়ের ছয়-সাত বছর পর আর পরস্পরকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর তেমন উত্তেজনা থাকে না।

—বটেই তো।

—সীতার আর আমারও ছিল না।

—হুঁ, হুঁ।

—আর তখন মানস লাহিড়ি আসত।

—ঠিক।

—আর তখন আমরা যখন, অর্থাৎ আমি আর সীতা যখন শারীরিক দিক দিয়ে মিলিত হতাম, মানে—বুঝতেই পারছেন—

—ও-গুডনেস—

সমীরের টিম অন্য টিমের গোলপোস্ট ছেঁকে ধরেছে। পর পর চারজন গোলে মারল। পোস্ট, বার খেলোয়াড়ের গা থেকে ফিরে এল। শেষ শটটা গোলকিপার উড়িয়ে দিল বারের ওপর দিয়ে। কর্নার।

কর্নার কিকটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে মনোরম।

কিক থেকে একটা নিষ্ফলা হেড। তারপর গোল-কিক আবার।

শ্বাস ফেলে সমীর বলল—বলো।

—যখন আমরা মিলিত হতাম—মানে শারীরিকভাবে, বুঝলেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো।

—তখন আমার প্রায়ই মনে হত সীতা আমার কথা ভাবছে না।

—তবে কার কথা?

—মনে হত, সীতা চোখ বুজে আমার জায়গায় আর একজনকে ভেবে নিচ্ছে এবং তাতে তার সমস্ত

শরীরে একটা বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। মনে মনে সে তখন সেই ঋণ শোধ দিচ্ছে।

—মাই গুডনেস। সমীর চাপা তীব্র গলায় বলে।

মনোরম চমকে মাঠের দিকে তাকাল। না, মাঠে কোনও ঘটনা ঘটেনি। মাঝ-মাঠে একজন বল নিয়ে দুর্বল পায়ে দৌড়োচ্ছে। বেরোতে পারবে না।

সমীর তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মনোরম লজ্জা পায়।

—কী বলছ মনোরম?

—আমার ওরকম মনে হত।

—কেন?

—মনে হওয়াকে কেউ ঠেকাতে পারে না।

সমীর দ্রুত সিগারেটে টান দেয়। বলে—তারপর?

মনোরম দুঃখিত গলায় বলে—আমার একটা দোষ, আমি বড্ড বেশি কৌতূহলী। সব ব্যাপারটা আমি জানতে চাই। তাই সীতাকে আমি জিজ্ঞেস করি। মানস লাহিড়িকেও।

—বলো কী?

মনোরম ম্লান একটু হাসল। বলল—দুজনেই অস্বীকার করেছিল । কিন্তু আমি জানতাম ওরা মিছে কথা বলছে। কিন্তু ব্যাপারটা আমার পক্ষে কী রকম কঠিন হয়ে দাঁড়াল ভেবে দেখুন। আমি সীতার স্বামী, তার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি, সম্পূর্ণ বৈধ ভাবে। অথচ জানছি, আমি নই, তার বুক জুড়ে আর একজনের কাছে ঋণ। আমি সেই আর একজনের প্রতিনিধি হয়ে সেই ঋণ শোধ নিচ্ছি মাত্র। এভাবেই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ক্রমে অবৈধ হয়ে ওঠে।

সমীরের মুখের সুকুমার ভাবটুকু ভেদ করে একটা ঘেন্নার ভাব ফুটে ওঠে । সে বলল—ডিসগাস্টিং। এ সব কী বলছ মনোরম।

—আমি সীতা বা মানসের কথা বলতে চাইছি না। আমি আসলে জানতে চাইছি সব স্বামী-স্ত্রীরই কি এরকম হয়? এরকম হওয়াটাই কি স্বাভাবিক?

—নিশ্চয়ই নয়।

—আপনি কখনও গীতাদিকে জিজ্ঞেস করেছেন?

—কী?

—তিনি কখনও আর কাউকে...

পলকে ফণা তোলে সমীর। দুখানা চোখ ধ্বক ধ্বক করে ওঠে। মনোরম মুখ আড়াল করে উদ্যত হাতে, যেন বা মার ঠেকাবে।

—রিডিকুলাস মনোরম। ভেরি রিডিকুলাস। তুমি কি পাগল?

মনোরম অবাক হয়ে টের পায়, সমীরের টিম একটা গোল দিয়েছে। ৩-১। সমস্ত মাঠ ফেটে পড়ছে উল্লাসে । সবুজ গ্যালারির ওপর শূন্যে ভাসছে ছাতা, উড়ছে জুতো, জামা। সমীর এক পলক তাকিয়ে দেখল মাত্র। উত্তেজিত হল না।

মনোরম আস্তে আস্তে বলল—আমার যন্ত্রণাটা ঠিক এইভাবে শুরু হয় । অথচ কখনও সীতা বা মানস লাহিড়ি পরস্পরের দিকে এক পাও এগোয়নি। বৈঠকখানা ঘরে তারা বরাবরের মতো দুটো দূরের চেয়ারে বসে থেকেছে, হেসেছে, স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেছে। কিন্তু আমি কেন—আমারই কেন য় শান্তি ছিল না।

সমীর হঠাৎ উঠতে উঠতে বলে—মনোরম, তুমি কি খেলাটা আর দেখবে? দেখলে দেখো। আমি যাচ্ছি।

—না। বলে মনোরম উঠে সমীরের পিছু নেয়।

গ্যালারির কলরোল তখনও থামেনি। উদ্দণ্ড নাচ নাচছে লোকজন। একজন বুড়ো মোটা মানুষ একসঙ্গে তিনটে সিগারেট ধরিয়ে টানছে, তাকে ঘিরে ভিড়। গ্যালারির সরু রাস্তাটা দিয়ে তারা বেরিয়ে আসে। আগে সমীর, পিছনে মনোরম। সদর পার হয়ে অরা বড় রাস্তায় এসে পড়ে।

সমীর দ্রুত লম্বা পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছিল, যেন বা মনোরম তার সঙ্গে নেই। হঠাৎ থমকে সমীর মুখ

ফিরিয়ে বলল—পুরুষমানুষের অনেক কাজ থাকে মনোরম। শুধু বউয়ের চিন্তা নিয়ে থাকলেই তার চলে না।

মনোরম দাঁড়িয়ে গেল। সমীর পিছন ফিরে আর তাকাল না, নিজের গাড়ির দিকে চলে গেল।

বিষণ্ণ মনোরম বড় রাস্তা ছেড়ে একা মাঠের মধ্যে নামল। তারপর প্রকাণ্ড মাঠ খানা-জল-কাদা ভেঙে পার হতে থাকল। প্রকাণ্ড আকাশের নীচে মাঠখানা বড় অফুরান, ক্লান্তিকর লাগছিল তার।

॥ দুই ॥

ঝরঝর করে খানিকটা জল পড়ল কাঁধে। ব্লাউজের হাতটা ভিজে গেল। সীতা মুখ তুলে দেখে, ট্রামের জানালার খাঁজে জল জমে আসছে। ময়দানের দিক সাদা করে আর এক ঝাঁক বৃষ্টি আসছে। নড়বড়ে জানালাটা বন্ধ করতে একবার চেষ্টা করল সীতা। পারল না। এক ভিড় লোক তাকে দেখছে। সকলের চোখের সামনে দ্বিতীয়বার জানালা বন্ধ করার চেষ্টা করতে তার লজ্জা করছিল। অস্বস্তিতে কাঁটা হয়ে বসে থাকে সীতা। ঝরঝর করে জল পড়তেই থাকে। সরে বসবে যে তার উপায় নেই, পাশে মুশকোমতো এক পুরুষমানুষ বসে আছে। লোভী মুখচোখ, আড়ে আড়ে তাকিয়ে দেখছে।

কেনাকাটা করাটা সীতাব একটা নেশার মতো। দরকার থাক বা না থাক, সীতা বরাবর দুপুরের দিকে প্রায়ই বেরিয়ে পড়ে। গড়িয়াহাটা বা নিউ মার্কেটে ঘুরে ঘুরে টুকটাক জিনিস কেনে, বেশি টাকার জিনিস নয়, সস্তা বাহারি চটি, হাতব্যাগ, স্টিলের ছাঁকনি বা চামচ, ডোনার কিংবা অন্য কোনও রূপটান। সংসারে কোনও জিনিস ফেলা যায় না। যখন সীতার সংসার ছিল তখন সব কিছুই কাজে লাগত। এখন তার নিজের সংসার বলে কিছু নেই। তবু নেশাটা রয়ে গেছে। দু পিস ব্লাউজের লন কাপড় কিনেছে সে, একটা শাড়িতে লাগানোর ফলস পাড়, এক কৌটো কাজল, ফাউন্ডেশন, ভাইঝির জন্য স্টিলের চেন-এ একটা ঝকমকে লকেট, এরকম আরও কিছু কাজ বা অকাজের জিনিস। এ সব তার কোলের ওপর জড়ো হয়ে আছে। তার ওপর ভ্যানিটি ব্যাগ আর ভাঁজ করা ছাতা। ব্যাগটা ছোট বলে সব জিনিস আঁটেনি। ব্লাউজপিসের প্যাকেটটা ভিজে যাচ্ছে। অস্বস্তিতে আবার চোখ তুলে জলের উৎসটা দেখে সীতা। বৃষ্টিও এসে গেল। ছাঁট আসছে।

পাশের লোকটা হঠাৎ ফিস ফিস করে বলে—জানালাটা বন্ধ করে দেব।

সীতা ঘাড়টা একটু নাড়ল মাত্র।

লোকটা উঠে সীতার ওপর দিয়ে ঝুঁকে জানলাটা বন্ধ করতে চেষ্টা করে। সীতা লোকটার বগলের ঘেমো গন্ধ পায়। বুক পেট গুলিয়ে ওঠে তার। লোকটা জানলা বন্ধ করতে বেশ সময় নিতে থাকে। ততক্ষণ দমবন্ধ করে বসে থাকে সীতা। এবং নির্ভুল ভাবে টের পায়, লোকটা তার নিজের বুকটা হালকাভাবে তার কপালে ছোঁয়াল। জানলাটা বন্ধ করে হাতটা টেনে নেওয়ার সময় খুব কৌশলে সেই হাতটা সীতার কাঁধ স্পর্শ করে গেল। সীতা দাঁতে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে নিজেকে সামলে নেয়। মেয়েদের শরীরের প্রতি পুরুষের দাবি-দাওয়ার শেষ নেই। হাঁটু, কনুই, হাত যা দিয়ে হোক একটু ছোঁয়ানো চাই।

জানলা বন্ধ করে লোকটা চেপে বসল। সীতা লোকটার প্রকাণ্ড ভারী উরুর ঘন স্পর্শ পেল। নিজের উরুতে। যতদূর সম্ভব জানলা ঘেঁষে বসল। ঘামতে লাগল। অস্বস্তি। জানলা বন্ধ, ফলে লোকের ঘামের গন্ধ, ভ্যাপসা গরম, পাশের লোকটার উরু, এবং ক্রমে কাঁধের স্পর্শও সীতাকে আক্রমণ করে। লোকটা বুঝে গেছে, সীতা কিছু বলবে না, সে লাজুক মুখচোরা মেয়ে। তাই লোকটা ট্রাম থেমে আবার চললেই ঝাঁকুনি লাগার ভান করে ঢলে পড়ছে সামান্য। আর কেউ কিছু টের পায় না, কেবল সীতা পায়। সে ঘামে লাল হয়, আর দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। এ সব নতুন নয়, তবু সীতার ঠিক সহ্য হয় না।

ট্রামটা থেমে গেল। রেসকোর্স পার হয়ে ব্রিজটায় উঠবার মুখে। সামনে একটা ট্রাম বোধ হয় খারাপ। সময় লাগবে। ট্রামের ভেতরটা ক্রমে ভেপে পচে ফুলে উঠছে। পচে যাচ্ছে মানুষের শরীর। চারদিক থেকে চোরাচোখের আক্রমণ। পাশের লোকটা ঘেঁষে আসে। ঘাম। গরম। চমকা বৃষ্টিটা থেমে আবার রোদ উঠেছে বাইরে। বড় উজ্জ্বল রাংতারোদ।

সীতা ছোট্ট রুমালে মুখ, গলা মুছল। আর তখনই আবার লোকটার হাতে তার কনুই লাগে। সীতা আড়ষ্ট হয়ে নিজের কোলে হাত দুখানা ফেলে রাখে। অন্যমনস্ক থাকার জন্য সে একটা কোনও চিন্তা করার চেষ্টা করে কিছুক্ষণ। কোনও সুন্দর চিন্তা এলই না।

কেবলই ভেঙে-যাওয়া সংসারের কথাই মনে পড়ছিল সীতার। দুটি ঘর ছিল তাদের। মাঝখানের দরজায় একটা হালকা আকাশি রঙের সার্টিনের পর্দা। সন্ধেবেলা ঝোড়ো কলকাতার হাওয়া সেই পর্দাটিকে ওড়াত বারবার। টিউবলাইটের আলোয় দুঘরের কোথাও কোনও অন্ধকার ছিল না। এ ঘরে মেঝেয় উবু হয়ে বসে যত্নে পেয়ালায় চা ছাঁকতে ছাঁকতে সে দেখতে পেত ও ঘরে ক্লান্ত মনোরম চেয়ার এলিয়ে বসে আছে। শুধু শার্ট ছেড়েছে আর জুতোজোড়া। পরনে ফুল প্যান্ট, আর স্যান্ডো গেঞ্জি। চোখ বোজা। যতখানি ক্লান্ত তার চেয়ে বেশি ভান করত, সীতার একটু আদর-সোহাগের জন্য। আদর-সোহাগের বড় কাঙাল ছিল মনোরম। রোগ-ভোগা মানুষ একটু নেই-আঁকড়ে আর মাথাভরা চিন্তা-দুশ্চিন্তার বাসা। চা করতে করতে সীতা মাঝে মাঝে তাকাত। মায়া-মমতায় ভরে উঠত বুক। সেটা ঠিক প্রেম নয়, গাঢ় মমতা। করুণাও। সে যাই হোক, একভাবে না একভাবে তাদের জোড় মিলেছিল তো! মনোরমের সেই চা আর সীতার স্পর্শের জন্য অপেক্ষারত দৃশ্যটা মনে পড়ে।

দৃশ্যটা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করে সীতা। পারে না। কান্না পায়। কেবলই মনে পড়ে দুঘরের মাঝখানে পর্দা উড়ছে হাওয়ায়, ধু ধু করে জ্বলছে নীলাভ আলো। কোনওখানে অন্ধকার নেই। ও ঘরে তার ক্লান্ত কাঙাল স্বামী মনোরম। ভিতু খুঁতখুঁতে, অসম্ভব পরনির্ভরশীল।

সীতা শুনেছে এখন মনোরম বড় বড় চুল রাখে, লম্বা জুলপি, আর খুব আধুনিক পোশাক-টোশাক পরে। কেন এ সব করে মনোরম তা সীতা জানে না, কিন্তু তখন মনোরম ভাল পোশাক পরত না। সীতা কখনও ঝকমকে শার্ট বা প্যান্ট করে দিলে রাগ করত। ক্রপ করে ছোট্ট চুল রাখত মনোরম। তারা খুব অদ্ভুতভাবে শুত, মনোরমের স্বভাব ছিল সীতার বুকে মুখ গুঁজে শোওয়ার। ওই কদমছাঁট চুল খোঁচা দিত সীতার শরীরে। প্রথমে বিরক্ত হত সীতা। তারপর বুঝেছিল মানুষটা ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে, জেগেও নানা ভয়ের উদ্বেগের চিন্তা করে। মনে মনে বড্ড একা অসহায় ছিল তার মানুষটা। তাই সীতাকে আঁকড়ে ধরত অমন। বুকে মাথা গুঁজে শুত, এবং সেই শোওয়ার মধ্যে কোনও যৌনকাতরতা ছিল না। ছিল নির্ভরশীলতা। তাই সীতা ওই কদমছাঁট চুলওলা মাথাটা বুকের মধ্যে ধরে রাখতে শিখেছিল। খোঁচা টের পেত না। এবং এমনই অভ্যাসের গুণ যে, ক্রমে ওভাবে মনোরম না শুলে তার অস্বস্তি হতে থাকত। ঘুমের মধ্যে কথা বলত মনোরম। কখনও চেঁচিয়ে উঠত ভয়ে। উঠে বসত। তারপর সীতাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে বাচ্চা ছেলের মতো আকুলি-ব্যাকুলি করত। সীতা ঘুম ভেঙে বলত—আহা, ষাট ষাট। এই তো আমি রয়েছি, ভয় কী? ঠিক যেমন শিশুকে মা ভোলায়। গানের গলা ছিল না মনোরমের। কিন্তু প্রায়দিনই একটা গান সে গাইত। হঠাৎ হঠাৎ বাথরুমে শোওয়ার ঘরে। কিংবা খেতে বসে গেয়ে উঠত—জয় জগদীশ হরে...। একটাই লাইন মাত্র। সীতা হাসত—মোটে আধখানা লাইন ছাড়া আর কিছু জানো না? মনোরম কেমন বিষণ্ণ হেসে একদিন বলেছিল—ছেলেবেলায় ইস্কুলে এই গানটা ছিল আমাদের প্রেয়ার। মনে আছে, ইস্কুলে খুব লম্বা সাত-আট ধাপ সিঁড়ি ছিল, সেখানে সারি দিয়ে তিনশো ছেলে দাঁড়িয়ে ওই গান গাইতাম। যন্ত্রের মতো। গানের অর্থ কিছু বুঝতাম না। একদিন কী যে হল। অনেক দিন টানা বর্ষার পর সেদিন রোদ উঠেছে। বাহান্ন দিন টাইফয়েডে ভুগে সেদিন সকালে আমার দাদা মনোময় মারা যায়। আগের রাতে দাদার বাড়াবাড়ি হওয়ায় আমাকে প্রতিবেশীদের এক বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের বাড়ি থেকেই সকালে খেয়েদেয়ে ইস্কুলে যাব বলে বেরিয়েছি, রাস্তায় পা দিয়েই শুনলাম, আমাদের বাড়ির দিক থেকে কান্নার রোল উঠেছে। যেই শুনলাম অমনি ইস্কুলের দিকে দৌড়োতে শুরু করলাম। দুকানে হাত চেপে দৌড়োচ্ছি, কাঁধের ঝোলানো বইয়ের ব্যাগটা টপাটপ ধাক্কা দিচ্ছে কোমরে, ঘেমে হাঁফিয়ে যাচ্ছি, তবু প্রথম মৃত্যু-অভিজ্ঞতার হাত থেকে আমি প্রাণপণে পালাতে লাগলাম। ইস্কুলে সেদিনও প্রার্থনার সারিতে দাঁড়িয়ে রোজকার মতো গাইছি—জয় জগদীশ হরে...। গাইতে গাইতে দেখি চোখ ভরে জল নেমেছে। চারদিকে আকাশ কী গভীর নীল, কত বড় সেই আকাশ। তার তলায় আমরা কতটুকু-টুকু সব মানুষ। ছোট্ট মানুষ আমরা মস্ত আকাশের দিকে হাতজোড় করে গাইছি—জয় জগদীশ হরে...। সেইদিনই যেন গানটা মনের মধ্যে গেঁথে গেল। এখনও

অন্য মনে কেবলই মনে পড়ে ওই লাইন। আধখানা। সবটা মনে নেই। গাইলেই বহুকালের পুরনো একটা রোদভরা আকাশ ঝুঁকে পড়ে চোখের ওপরে, কোথা থেকে যেন একটা আনন্দের, বিষাদের গভীর ঢেউ এসে আমাকে তুলে নেয় আমি যেন তখন পৃথিবীর ধুলোময়লা থেকে ওপরে উঠে ভাসতে থাকি। তাই গাই।

এক একদিন ঘুম ভেঙে অন্ধকারে উঠে ঝুম হয়ে বসে থাকত মনোরম। সীতা ঘুমের মধ্যে বুকের ভিতরে কদমছাঁট চুলওলা মাথাটা না পেয়ে অস্বস্তি বোধ করে চোখ মেলে খুঁজতে গিয়ে দেখেছে, অন্ধকারে মনোরমের হাত মুঠো পাকানো, শরীর শক্ত, চোয়াল দৃঢ়ভাবে লেগে আছে। সীতা জানত, ওর সেই ট্রেন দুর্ঘটনার কথা মনে পড়েছে।

তখন ও এক বিদেশি ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি। ফার্স্ট ক্লাসে উড়িষ্যা-বিহার ঘুরে বেড়াত। রোগা হলেও সুন্দর মুখশ্রী আর চালাকচতুর হাবভাবের জন্য, চমৎকার ইংরিজি বলার জন্যই অত ভাল চাকরি পেয়েছিল মনোরম। প্রায় হাজার টাকা মাইনে পেত, তার ওপর টি এ ছিল অনেক। সেবার উড়িষ্যা যাওয়ার সময়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটে মাঝরাতে। তখনও মনোরমের বিয়ে হয়নি সীতার সঙ্গে। কী হয়েছিল তা সঠিক জানত না সীতা। তবে মনোরম দীর্ঘদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ফিরে আসে। চাকরিটা যায়নি, তবে কোম্পানি তাকে প্রতিনিধির কাজ থেকে অফিসে নিয়ে আসে নিরাপদ একটু উঁচুদরের কেরানির চাকরিতে। মাইনে কমল না, কিন্তু টি এ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মনোরম ছটফট করত অন্য কারণে। ওই যে কলকাতা ছেড়ে প্রায়ই বেরিয়ে পড়া রাতের গাড়িতে, ভোরের আবছা আলোয় গাড়ির জানলা খুলে দক্ষিণ বিহার আর উড়িষ্যার টিলা, উপত্যকা, নদী, পাহাড় আর জঙ্গল দেখে এক অবিশ্বাস্য, অসহ্য আনন্দ, সেইটাই কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার কাছ থেকে। কোম্পানির বম্বের অফিসে কিছুদিন কাজ করেছিল মনোরম। ভাল লাগল না। আবার বিহার-উড়িষ্যার শ্বাসরোধকারী প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়াবে, সন্ধ্যার আবছায়ায় পরেশনাথ পাহাড়ের পাদদেশে উশ্রী নদীর ছোট্ট পোলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে, ধারোয়ার তীরবর্তী টিলার গা বেয়ে উঠে যাবে আস্তে আস্তে, কয়লা খনির অঞ্চলগুলিতে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গভীর রাতে লরি ড্রাইভারের পাশে বসে দেখবে অন্ধকারের দ্রুতগামী সৌন্দর্য। অফিসের চাকরি সে সহ্য করতে পারত না। একটা নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি তখন অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ছিটকিনি, দরজার নব, নানা রকম অ্যাঙ্গেল আর গৃহস্থালীর জিনিস তৈরি করছিল। তাদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে আবার বিহার-উড়িষ্যা ঘুরে বেড়াতে লাগল মনোরম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না, ট্রেন খুব জোরে চললে বা আচমকা ঝাঁকুনি লাগলে সে ঘুম ভেঙে আতঙ্কে উঠে বসত, অনেকক্ষণ বুক কাঁপত তার, ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকত। তখন চাকরি ছেড়ে সেই কোম্পানিরই এজেন্সি নিল সে।

দেখা হয়েছিল শিমুলতলায়। পুজোর ছুটিতে। প্রবাসে বেড়াতে গেলে বাঙালিদের ভাব হয়। তেমন হয়েছিল। সীতা তার আগে কখনও প্রেমে পড়েনি। সদ্য-যুবতী, তখনও কৈশোরের গন্ধ গায়ে, তখনও শরীরে সেই আশ্চর্য স্বেদগন্ধ। ফুলের পাপড়ি ঝরে গিয়ে সদ্য ফলের গুটি ধরেছে। মনোরম পিছনে বনভূমি রেখে ঢালু রাস্তা বেয়ে নেমে আসছিল, একটু আনমনা, রুগ্ণ সুন্দর চিকন মুখশ্রী, বালকের মতো স্বভাব। তারা একসঙ্গে সকলের সাথে বনভোজন করতে গিয়েছিল। ইচ্ছে করে দলছুট হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তারা। বিহারের তীব্র শীত সবে দেখা দিচ্ছে। একটা তিরতিরে নদী বয়ে যাচ্ছিল, স্বচ্ছ জল, জলে তাদের ছায়া। ছায়ায় ঝুঁকে মনোরম ইংরিজিতে বলেছিল—মেরিলি র‍্যাং দ্য বেল, অ্যান্ড দে ওয়্যার ওয়েড...কী চমৎকার টনটনে উচ্চারণ সেই ইংরিজির। নিস্তব্ধপ্রায় সেই শাল জঙ্গলের ভিতরে বয়ে-যাওয়া নদীর শব্দের সঙ্গে কবিতার শব্দগুলিকে কী করে যে মিলিয়ে দিয়েছিল মনোরম। সামনেই পাহাড় ছিল, ওপরে নীল আকাশ, পাখিও কি ছিল না, আর প্রজাপতি। কী সব যে ছিল সেখানে কে জানে। ছিল বোধ হয় কবিতার সেই ঘণ্টাধ্বনিও তাদের মনে, আর ছিল শরীরে সুন্দর গন্ধ ও রোমহর্ষ, ছিল জলে ভেঙে-যাওয়া তাদের ছায়া। এ সবই থাকে। থাকে না কি। নদীর জলে একটা পাথর ছুড়ে মনোরম বলল—তুমিও ছুড়ে দাও, ওইখানে। সীতা ছুড়েছিল। কী হয়েছিল তাতে? কিন্তু মনোরম হেসেছিল, সীতাও। বহু দূর থেকে বনভোজনের দলছুট মানুষজনের গলার স্বর আসছিল। পোড়া পাতার গন্ধ। তবু নিস্তব্ধতাই ছিল। তাদের কথা বলে যাচ্ছিল সেই কুলুকুলুধ্বনিময় স্বচ্ছ জলের নদী,

গাছের পাতায় বাতাস, পাখির স্বর।

ভালবাসা কিনা কে জানে। তবে তারা কেউ কাউকে ছোঁয়নি, জাপটে ধরেনি, ওই নির্জনতা সত্ত্বেও। মনোরম শুধু বলেছিল—আমি এতদিন স্বপ্নের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতাম।

—সে কেমন? সীতা তার তখনও না যাওয়া কৈশোরের কৌতূহল থেকে প্রশ্ন করেছিল।

—ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রেমের শখ। এত বেশি শখ যে, ছেলেবেলা থেকেই আমি কাল্পনিক মেয়েদের সঙ্গে একা একা কথা বলি। সেই সব মেয়েদের একজন ছিল রিনা। কিন্তু রিনা ঠিক কাল্পনিক ছিল না। আমার আট-দশ বছর বয়সে আমি সত্যিই এক রিনাকে দেখেছিলাম। তারও বয়স ছিল আমার মতোই। পরিচয় ছিল না, কখনও কথা হয়নি, একবারের বেশি দেখা হয়নি, তার মুখ এখন আর আমার মনেও নেই। শুধু মনে আছে, এক বিয়েবাড়ির সিঁড়ির রেলিংয়ে ঝুঁকে সে বর-বউয়ের কড়িখেলা দেখছিল। পরনে লাল ফ্রক, মুখখানা ঘিরে ফ্রিলের মতো চিনেছাঁটের চুল। বয়স্কা এক মহিলার গলা তলার হলঘর থেকে তার নাম ধরে ডেকে বলেছিল—রিনা নীচে আয় না, অত লজ্জা কীসের! রিনা তার সুন্দর ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচের ভিড়ের মধ্যে নেমে গিয়েছিল। এতদিন আগেকার সে ঘটনা, আর আমিও এত ছোট ছিলাম যে, সেই স্মৃতি একটু সুগন্ধের মতো মাত্র অবশিষ্ট আছে। কখনও মনে হয় সে ঘটনা ঘটেইনি, আমার মাথা তা কল্পনা করে নিয়েছে, অথবা আমি কখনও স্বপ্ন দেখেছিলাম। ওই উৎসবের বাড়ি আর ওই মেয়ের কথা আমি অনেক ভেবেছি, কখনও সত্য কখনও কাল্পনিক মনে হয়েছে। তবে সেই নামটা কী করে মনে রয়ে গেছে, মনে রয়ে গেছে যে মেয়েটি বড় সুন্দর ছিল—যার সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি। কিন্তু তাতে আমার কোনও অসুবিধা হয় না। আমার মনে যে সব অচেনা মুখ ভেসে যায়, তাদের কাউকে কাউকে রিনা বলে মনে হয়। ওই নামে ডাকি, সাড়া পাই, ভালবাসা জেগে ওঠে, বিশ্বাস হয় কি?

—না।

—তবে তোমাকে বলি, আমার মেম-বউয়ের কথা?

—বউ? বলে ভীষণ উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে থেকেছিল সীতা।

—না না, আসলে সে কেউ না। আমাদের আলমারিতে ছিল পাথরের তৈরি এক মেমসাহেব পুতুল। তার গোলাপি গা, গোলাপি গাউন, হাঁটু পর্যন্ত সেই গাউনের ঝুল, চোখের তারা নীল। ছেলেবেলায় ঠাকুমা সেই পুতুলটা দেখিয়ে বলত—তোর বউ। আশ্চর্যের কথা, এখনও মাঝে মাঝে যখন কখনও আমার কাল্পনিক বউয়ের কথা ভাবি, তখন ঠিক সেই গোলাপি গা, সোনালি ফ্রক, নীল চোখ, মধুরঙের চুলওলা পুতুলটাই চোখে ভেসে ওঠে। হায়, তার বাস্তবতা নেই, তবু সে আমার মনের মধ্যে চলা ফেরা করে, ঘরদোর গুছিয়ে রাখে, গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আমার কাল্পনিক সন্তানের চুল আঁচড়ে দেয়, দিনশেষে জানলার ধারে বসে আমার অপেক্ষায় চেয়ে থাকে।

—এখনও? আজও?

মিটমিট করে হেসে মনোরম বলেছিল—ছেলেবেলায় আমি খুব অদ্ভুত ছিলাম। দরজা, জানালা, দেয়ালের সঙ্গে কথা বলতাম। কত সব কথা।

মানুষের সঙ্গেই আমার কথা হত কম। কিন্তু কথা হত কল্পনার মানুষদের সাথে। রোজ যাদের দেখতাম, তাদেরই কাউকে কাউকে মনে মনে কুড়িয়ে আনতাম, কল্পনায় খেলব বলে। আমাদের মফস্বল শহরের স্টেশনে একটা নির্জন সুন্দর ওভারব্রিজ আছে। সাধারণত লোকে হেঁটেই লাইন পার হয়, ওভারব্রিজ বড় একটা ব্যবহার করে না। আমাদের ওভারব্রিজটা তাই জনশূন্য পড়ে থাকত। আমি সন্ধেবেলায় ওখানে দাঁড়িয়ে প্রায়ই দূরের দিকে চেয়ে থাকতাম। আমি যে-স্বপ্নের জগতে বাস করতাম, সেখানে বাস করতে গেলে, চেনা লোক, বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্ঠ লোকজন এক বিষম বাধা। তাতে স্বপ্নের সুতো বারবার ছিঁড়ে যায়। আমারও তাই তেমন কেউ ছিল না, তাই আমারও অধিকাংশ বিকেল কাটত নিঃসঙ্গভাবে ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দূরের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে। কল্পনার ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যেত। সেদিন সন্ধে সাতটার শেষ ট্রেন আমাদের ছোট স্টেশন ছেড়ে গেছে। ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম শূন্য প্ল্যাটফর্মে কিছু ছড়ানো মালপত্রের মাঝখানে একটি তোরঙ্গের ওপর মেয়েটি বসে আছে। উদ্বিগ্ন তার মুখচোখ। কাছাকাছি সময়ে আর ট্রেন নেই, পরের গাড়ি ভোরবেলায়।

—আমার শরীরে কোনও রোগ নেই, তবু এ ক'দিন আমার শরীর জ্বরজ্বর করেছে। মাথা ধরেছে। ইন্টার রেল ওয়েটলিফটিং-এ আমি ছিলাম একজন জাজ, কিন্তু জাজমেন্টও দিয়েছি আবোলতাবোল। কিছু ভাল করে লক্ষই করিনি। ভাবছি কী করে পাতিয়ালায় যাব। এইরকম তোমাকে ছেড়ে।

সীতা তেমনি মুখ নিচু করে থাকে।

—শুনছ?

—হুঁ।

—কিছু বলো।

—কী বলব?

—কীভাবে যাব পাতিয়ালায়? ওখানে কোচদের ট্রেনিং তো অনেক সময় নেবে আরও। খড়্গপুরে মাত্র ক'দিনেই যা অবস্থা হয়েছিল...।

সীতা একটা শ্বাস ফেলল। কিছু বলল না।

—কিছু বলো।

সীতা একটু সংকোচ বোধ করছিল। তবু বলল—এক বছর হতে আরও তিন মাস বাকি আছে। তারপর তো...

ঝকঝক করে ওঠে মানসের চোখ, সীতার দিকে ঝুঁকে বলে—তারপর কী?

সীতা সুন্দব দাঁতে নীচের ঠোঁট কামড়াল।

মানস মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলে—ও সব কে আর মানছে? তিন মাস আমি অপেক্ষা করতে পারছি না।

—তাই কি হয়?

—কেন হয় না?

—তিনটে মাস চলে যাবে দেখতে দেখতে।

—তিনটে মাস কিছু কম সময় নয় সীতা। আমবা ইচ্ছে করলে এই তিনটে মাস গেইন করতে পারি।

—ও যদি বাধা দেয়?

—কে?

—ও। বলে মাথা নোয়ায় সীতা।

—মনোরম?

—হুঁ।

—মনোরম। মনোরম কেন বাধা দেবে?

—যদি দেয়?

—কেন দেবে? ওর কোনও ইন্টারেস্ট তো আর নেই।

—নেই? ঠিক জানেন?

মানস শব্দ করে হাসে।

—নেই আমি জানি। তা ছাড়া মনোবম এখন ধ্বংসস্তূপ। জাস্ট এ হিপ অফ ডেব্রিস। বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ওর আর নেই।

সীতা চুপ করে থাকে।

—আজকাল রাস্তায় বাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়ায়।

—থাকগে। আমি শুনতে চাই না। সীতা বলে।

—থাক। আমিও ঠিক বলতে চাইনি। তবে এক সময়ে ও আমার বন্ধু ছিল। আই ফিল ফর হিম।

সহজেই পাওয়া গেল ট্যাক্সি। বড় রাস্তার মোড়েই সওয়ারি নামাচ্ছিল ট্যাক্সিটা। মানস 'চলো' বলে দৌড়ে গিয়ে ধরল। ড্রাইভার 'কোথায় যাবেন?' এবং তারপর, 'গাড়ি খারাপ আছে দাদা' বলে এড়াতে চেয়েছিল। মানস কোনও কথাই গ্রাহ্য করল না। শান্ত হাতে দরজা খুলে সীতাকে আগে উঠতে দিল, তারপর নিজে উঠল। দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারকে বলল—গোলমাল কোরো না, যেদিকে বলছি সেদিকে যাবে, নইলে...ড্রাইভার ঘাড় ঘুড়িয়ে এক পলক দেখে নিল মানসকে, তারপর স্টার্ট দিল।

সীতা জানে, এ অবস্থায় মনোরম হলে ট্যাক্সিওয়ালাই জিতে যেত। মনোরম কিছুতেই এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ট্যাক্সি ধরতে পারত না।

মানস একটু ঘন হয়ে বসল। ট্রামে সেই মুশকো লোকটার মতোই অবিকল। তবে সীতা এবার সরে গেল না। মানসের একটু ভাঙা চৌকো মুখ, মাথায় পাতলা চুল, চমৎকার দুখানা হরিণ চোখে এক ধরনের মারাত্মক সৌন্দর্য আছে। ওর শরীরটা যেমন কর্কশ আর প্রকাণ্ড আর জোরালো, চোখ দুখানা তেমনই মায়াবী। কাজলের মতো টানা একটা রেখা আছে ওর চোখে, জন্মগত। কথা যখন বলে তখন বড় সুন্দর শোনায় ওর গলা, ঘোষণাকারীদের মতো।

হাত বাড়িয়ে নরম জোরালো পাঞ্জায় সীতার হাত ধরল মানস। সীতা কোনও সংকোচ বোধ করে না। কেবল একটা অস্বস্তি তার হয়। সেটা হাস্যকর অস্বস্তি। মনোরম খুব সিগারেট খেত। তাই যখনই মনোরমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হত সীতা, তখনই সিগারেটের গন্ধ পেত। সিগারেটের জন্য সে কম বকেনি মনোরমকে। কিন্তু গন্ধটা তার বুকে, শিরায়, সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। যেন পুরুষের গায়ে ওই গন্ধ থাকবেই। ওটাই বুঝি পুরুষের গন্ধ। মানস সিগারেট খায় না। ট্যাক্সিতে এত কাছাকাছি বসেও সীতা তাই পুরুষের সেই অমোঘ গন্ধটি পাচ্ছিল না। একটা কেমন অস্বস্তি হয় তার। পুরুষের সেই অমোঘ গন্ধটির জন্য সে উন্মুখ হয় বুঝি মনে মনে।

ব্যাপারটা কিছু নয়। সকলকেই যে এক রকমের হতে হবে তার কী মানে আছে। সীতার হাতখানা নিয়ে আঙুল আঙুলে আশ্লেষে খেলা করল মানস। সীতা বাধা দিল না। একজনের সঙ্গে বউ হয়ে থাকার অভ্যাস ছেড়ে আর একজনের বউ হওয়ার অভ্যাস রপ্ত করা সহজ নয়। এই নতুন অভ্যাসকে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল সীতা।

—কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—আগে কিছু খাই। বড্ড খিদে।

—জানি। খুব খিদে পায় আপনার।

মানস হাসল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলল—ঠিক ধরেছ। আমার শরীরটা যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি আমার প্রকাণ্ড খিদে। সব রকম খিদে।

অর্থপূর্ণ হাসছিল মানস। সীতার খাটো ব্লাউজের তলায় পেট পিঠ খোলা। মানসের হাত সীতার করতল ছেড়ে উঠে এল কোমরে। নরম আঙুলে সে সীতার শরীরের মাংসে আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। মানস এতকাল এ সব করেনি। এখন বোধহয় ওর ধৈর্য ভেঙে যাচ্ছে। মুখের সামনে মাংস, তবু খাবে না, এ কী রকম। সীতা একটু হাসে। তার অনিচ্ছা হয় না। আর একটু ঘন হয়ে বসে মানসের শরীরের সঙ্গে। পেটের কাছে মানসের হাতটা চেপে ধরে রাখে এক হাতে। তার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। সে অভ্যাস করে নেবে। এই বড় চেহারার শক্ত মানুষটির কাছাকাছি বসে সে নির্ভরতা পাচ্ছিল।

মানস ফিসফিস করে বলল—আমাকে 'তুমি' করে বলো।

—বলব।

—এখনই।

—তুমি।

— ব্যস, হয়ে গেল। বলে হাসল মানস।

সীতা কিছু বুঝতে পারেনি, আচমকা খোঁপার নীচে তার ঘাড়টা চেপে ধরে মানস। অন্য হাতে থুতনি ধরে একপলকে মুখটা ফিরিয়ে নেয় তার দিকে। চুমু খায়। ছোট্ট চুমু, কয়েক সেকেন্ডের।

সীতা ছাড়া পেয়ে বলল—ট্যাক্সিতে? ওঃ মা।

—ও দেখছে না।

সীতা খুব আস্তে বলে—ওর সামনে আয়না রয়েছে।

—দেখলেই কী? আস্তে বলে মানস।

—কী ভাববে?

—কিছু ভাববে না। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাদের অভ্যাস আছে দেখে।

—যাঃ। সীতা হাসল।

এবং মানস আর একবার কাণ্ডটা করল। এবার একটু বেশি সময় নিয়ে। তার মুখের লালাতে ঠোঁট ভিজে গেল সীতার। তবু ভালই লাগল। একটু কাঁটা হয়ে রইল সে, ট্যাক্সিওয়ালাটার জন্য। কিন্তু শরীরে এক ধরনের উত্তাপ ছড়িয়ে গেল। নতুন মানুষটিরই উত্তাপ। সীতা বুঝে যাচ্ছিল, সে পারবে। এরকম আত্মবিশ্বাসী, সাহসী, সরল ব্যবহারের মানুষ সে তো আগে দেখেনি। এর অভ্যাসকে নিজের অভ্যাস করে নেওয়া শক্ত নয়। সীতা জানে ট্যাক্সিওয়ালাটা দেখছে সবই, ভয়ে কিছু বলছে না। নিখুঁত চালিয়ে নিচ্ছে গাড়ি।

—বড় রেস্তরাঁয় যাব না, কেমন? মানস বলে, স্বরে গাঢ় ভালবাসা।

—যা তোমার খুশি।

—বড় রেস্তরাঁয় ভিড় কথা হয় না।

সীতা মৃদু প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলে—কথা তো হয়েই গেল!

—কী কথা হল।

—এই যে, যা করলে, এটাও তো কথাই।

মানস হাসল খুব। একটু অন্ধকার এখন। তাই মানসের হরিণ চোখজোড়া দেখতে পাচ্ছে না সীতা। দেখতে ইচ্ছে করছিল খুব।

গড়ের ময়দান ছেড়ে চৌরঙ্গিতে পড়তেই রাস্তার আলো অপসৃয়মাণ উজ্জ্বলতা ফেলছিল গাড়ির মধ্যে। এই আলো, সেই আলো, লাল-সবুজ-সাদা। সেইসব আলোতে পলকে পলকে মুখখানা পালটে যায়। মানসের মুখ খুব কাছে। ভাল দেখা যাচ্ছে না। ভালবাসায় স্নেহে ওর মাথায় হাত রাখল সীতা। ওর হরিণ চোখ একবার আলোকে স্পষ্ট, আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। সীতা নিবিড় চোখে দেখে।

—চুল উঠে যাচ্ছে বুঝি? মানসের মাথার চুল নেড়ে সীতা বলল।

—প্রায়। টাক পড়ে যাবে শিগগির। তার আগে টোপর না পরলে...

—টোপর? একটু অবাক গলায় সীতা বলে।

—নয় কেন?

—টোপর পরা মানে তো সামাজিক বিয়ে, তা কি হবে?

—হবে না কেন? একটু অস্বস্তির গলায় মানস বলে।

সীতা হাসল একটু, বিষণ্ণ হাসিটি। বলল—তা কি হয়? কুমারী মেয়েরই সম্প্রদান হয়।

মানস হেলে পড়েছিল সীতার গায়ে, উঠে বসল।

—না হয় রেজেস্ট্রিই হল। টোপর পরাটা না হয় এ জন্মে বাদ দিলাম।

সীতা হঠাৎ তার চোখভরা জল টের পেয়ে আঁচল তুলল চোখে, বলল—টোপর পরার শখ থাকলে না হয় আমি সরে যাই...

—কী বলে রে মেয়েটা? এঃ মা, কাঁদছ? বলে মানস দুহাতে তাকে টেনে নেয় এবং তখন মানসের শরীরের মাখনের মতো নরম এবং লোহার মতো শক্ত দুরকম পেশির অস্তিত্ব টের পায় সীতা।

—কাঁদে না, কাঁদে না। টোপরটা তো ঠাট্টার কথা, আজকাল কেউ পরতেই চায় না। মানস আকুল গলায় বলে।

—না। তা কেন? বিয়েতে আলো, সানাই, টোপর-সিঁথিমোর, কড়িখেলা এ সবের একটা আলাদা স্বাদ। অনেকে বিয়ে বলতে এ সব ভাবে। তুমিও ভাব।

—কে বলল?

—আমি জানি।

—আমার বয়স কত জান?

—কত?

—একত্রিশ। এ বয়সে যে রোমাঞ্চ-টোমাঞ্চ সব ঝরে যেতে থাকে। আমি স্বপ্ন দেখি না।

—শুভদৃষ্টির কথাও কখনও ভাব না?

—ও সব নিয়ে ভাববার সময় কোথায়?

—আর ফুলশয্যা?

—তুমি ঠাট্টা করছ।
—না গো।
—শোনো, আমি বড্ড ব্যস্ত মানুষ। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াই। তিন-চার বার ইউরোপ, ফার ইস্ট ঘুরেছি। অনেক দেখতে দেখতে আর অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমার ও সব সংস্কার কেটে গেছে। লক্ষ্মীটি, একদম ভেবো না। আমি সত্যি ঠাট্টা করছিলাম।
আর তখন সীতার ভাল লাগছিল খুব, মস্ত বুকে হেলান দিয়ে বসে থাকতে। সে মনে মনে হিসেব করে দেখল, যদি মানসের একত্রিশ হয়, মনোরমের এখন ছত্রিশ এবং মানস তার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। সীতা কলকাতার রাস্তায় একটা বিজ্ঞাপনের হেডিং দেখেছে প্রায়ই—গেট ইওরসেলফ এ ইয়ং হাজব্যান্ড। সে কথাটা ভাবতে ভাবতে সে হঠাৎ আস্তে বলল—আই অ্যাম গেটিং...
—কী?
—এ ইয়ংগার হাজব্যান্ড। বলে হাসল সীতা, সম্মোহিতের হাসি।
মানসের সাহসী ও সরল হাত একটু ওপরে উঠেছে তখন। বুকে।
ট্যাক্সিওয়ালা পার্ক স্ট্রিটের ট্র্যাফিক সিগন্যাল পার হয়ে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—কোথায় যাবেন?
—চৌরঙ্গি মার্কেট। মানস ভেবে রেখেছিল জায়গাটা। চট করে বলল। ভাবল না। এবং যেখানে হাত ছিল সেখানেই রেখে দিল। সরাল না।
বড় অবাক-করা সাহস ওর। সীতা ঠিক এরকমই চেয়েছিল।
সুরেন ব্যানার্জি রোডে ট্যাক্সি ছেড়ে ওরা ঢুকল চৌরঙ্গি মার্কেটে। ছোট্ট ছিমছাম একটা রেস্তরাঁ। খদ্দের নেই।
অনেক খাবারের অর্ডার দিল মানস। দইবড়া, চপ, ঘুগনি।
—আর কী খাবে?
—আরও? চোখ কপালে তোলে সীতা।
—খাও না বলেই তুমি রোগা।
সীতা মুখে রুমাল চেপে স্রোতস্বিনীর মতো হাসে—মেয়েরা অত খায় না মশাই।
—কারও খাওয়া দেখলে তুমি ঘেন্না পাও না তো? অনেকে পায়।
—যাঃ! যে খেতে পারে সে খাবে না কেন? ঘেন্নার কী?
—আমার বাসায় তো বড় পরিবার। সেখানে অনেকে আছে যারা আমার খাওয়া দেখতে পারে না।
—আমি পারব। ভয় নেই।
সেই তৃপ্তির হাসিটা আবার হাসে মানস। চৌকো থুতনি আর চোয়ালে হাসিটা খুব জোরালো দেখায়। ঝকঝকে সাজানো দাঁত। মুখে খুব সুন্দর একটা সুস্থতার গন্ধ পেয়েছিল সীতা, চুমুর সময়ে। হরিণ চোখ, তাতে দীর্ঘ পাতা। এত জোরালো মুখে চোখ দুটো বড় বেমানান রকমের মায়াবী। 'বড় পরিবার' কথাটা সীতার মনের মধ্যে নড়ছিল। একটু সময় নিল সে, বলল—বিয়ের পর তোমার পরিবারের কে কী বলবে?
—বললেই শুনছে কে? আমি তো গভর্নমেন্টের ফ্ল্যাট পেয়েই গেছি তারাতলায়। অগাস্টে অ্যালটমেন্ট, তুমি তো জানো।
—আলাদা থাকাটাই তো সব নয়। সম্পর্ক তো থাকবেই। আর যাতায়াতও।
—সব সম্পর্ক কেটে দিচ্ছি।
—কেন?
—কেটে না দিয়ে উপায় কী?
সীতা আবার সংশয়ের যন্ত্রণা ভোগ করে বলে—কেন কেটে দিচ্ছ? আমার জন্যই তো।
—ঠিক তা নয়। তবে তোমাকে নিয়ে আলাদা থাকতে চাই। একদম আলাদা আর একা।
—কেন? প্রশ্ন করেই আবার সীতার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। চোখে জল চলে আসতে থাকে। আজকাল তার এরকম হয়। ছন্নছাড়া, কারুণহীন কান্না পায়। খুব কি বেশি অভিমানী হয়ে গেছে সে?
মানস তার হরিণ চোখ দুখানা সম্পূর্ণ মেলে চেয়ে থাকে। তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর

পড়ে-থাকা সীতার একখানা হাত চেপে ধরে বলে—ও কী। সীতা।

মুখোমুখি বসে ছিল তারা। মানস উঠে সীতার পাশে এসে বসল, কাঁধের ওপর হাত রেখে বলল, কী হল হঠাৎ?

—আমার জন্যই তুমি পরিবার ছাড়ছ তো।

—কে বলল?

—বলতে হয় না, টের পাওয়া যায়।

—কিছু জানো না। আমরা কি সুখী পরিবারে বাস করি? ছোট্ট বাসা, জায়গা নেই, রোজ ঝগড়াঝাঁটি, সে এক বিচ্ছিরি পরিবেশ। আমার মা বাবা নেই, শুধু দুই ভাই, তিন কাকা কাকিমা আর খুড়তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে থাকি। পিছুটানও কিছুই না। ও সংসার তো একদিন ছাড়তে হতই। আমি অনেকদিন ধরে ঠিক করে রেখেছিলাম যে, বিয়ের পরই আলাদা হব; বিশ্বাস করো।

সীতা সামলে গেল। হাসলও একটু। বলল—আমার সব সময়ে কেন যে কান্না পায়।

—কেন কান্না পাবে? আমরা খুব সুখী হব, দেখো।

—কী করে বুঝলে?

আবেগভরে মানস বলে—আমি তোমাকে সুখী করবই। প্রতিজ্ঞা।

হালকা হাসি হাসছিল সীতা, বলল—গায়ের জোরে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে অন্য কথা বলে মানস—শুধু তোমার নামটা পালটে দেব।

—কেন?

—ও নামে তোমাকে ডাকতে আমার ভাল লাগে না।

—কেন গো?

—মনোরম ডাকত।

—তাতে কী? মানুষের তো একটাই নাম, সবাই ডাকে।

—তাতে মজা নেই। আলাদা নামে ডাকলেই মজা।

—নাম নিয়ে তুমি একটা কিছু ভেবেছ নিশ্চয়ই?

—ভেবেছি।

—কী?

—'সীতা' নামটার জন্যই তুমি অত দুঃখী-দুঃখী ভাব করে থাক। যেন চারধারে তোমার অশোকবন, রাক্ষসের পাহারা, যেন নির্বাসনে আছ।

'অশোকবন' কথাটায় একটা বিস্মৃতপ্রায় বনভূমির ছায়া সীতার চোখের ওপর দুলে গেল বুঝি? এক পলকের অন্যমনস্কতা কাটিয়ে সে বলল—ডেকো। যে-নামে খুশি।

—আমি ভেবে রেখেছি।

—কী?

—মৌ।

সীতা একটু অবাক হয়ে আবার হেসে ফেলে—বেশ এক অক্ষরের নাম তো?

—ভাল নয়?

—তুমি যে নাম দেবে, তাই ভাল।

—না। তোমার পছন্দ হয়নি?

—হয়েছে। ডাকলে কেউ ভুল করে শুনবে 'বউ' বলে ডাকছ।

—আসলে তো তাই ডাকা। মৌ মানে মধু।

—জানি।

—বাংলার বধু, বুকে তার মধু, পড়নি?

—জানি। সীতা স্মিতমুখে মুখ তুলে মানসের মুখে চেয়ে থাকে।

নিঃশব্দ পায়ে হঠাৎ বেয়ারা খাবার রেখে যায়।

—খাও। মানস গাঢ় চোখে তাকিয়ে বলে।

—আর কি খিদে থাকে?
—কেন?
—থাকে না গো। ভেতরটা আনন্দে ফেটে পড়ছে।
মানস খুব খুশি হয়। ভারী বোকার মতো হাসতেই থাকে। অকপট হাসি। একটু ঘন হয়ে আসে। সীতা ঘুগনির বাটিতে চামচ ডোবায়।
—ঝাল। মানস বলল।
—ঝালই তো ভাল।
—আমি ঝাল খেতে পারি না।
—তবে তোমাকে রোজ শুকতুনি রেঁধে দেব।
—আমি খাই ফ্যানসুদ্ধু ভাত, লাল আটার রুটি, খোসাসুদ্ধু তরকারি, কাঁচা সবজি।
—ভিটামিন?
—ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ক্যালোরি। আমার কখনও অসুখ হয় না।
—বলতে নেই।
—কী?
—'অসুখ হয় না' বলতে নেই।
—বলব না তা হলে।
সীতা ঘুগনির সুন্দর স্বাদ জিভে নিয়ে উজ্জ্বল চোখে মানসের দিকে তাকাল । সে সুখী হবে।
—আমার শুধু একটা ভয়। সীতা মুখ টিপে বলল।
— কীসের ভয়?
—আমার একটা অতীত আছে।
—তাতে কী?
—কোনওদিন যদি ও কিছু করে? যদি পিছু নেয়, যদি প্রতিশোধ নেয়?
ভ্রূ কুঁচকে চেয়েছিল মানস। প্রবল হাতে হঠাৎ সীতার হাতটা চেপে ধরে বলল—তা হলে ও আমার হাতে শেষ হয়ে যাবে।
সীতা ততটা উদ্বেগে নয়, যতটা ঠাট্টার গলায় বলল—ভয় তোমাকেও।
—কেন?
—যদি কখনও তোমার মনে কিছু হয়?
তক্ষুনি আবেগে মানস প্রায় সীতাকে বুকে টেনে নিতে যাচ্ছিল। রেস্তোরাঁ বলে পারল না। কিন্তু তার মুখচোখ লাল হয়ে গেল উত্তেজনায়, আবেগে, ভালবাসায়। প্রায় বুজে-যাওয়া গলায় বলল—কোনওদিন না। তুমি এ সব কী বলছ ? আমি তোমার জন্য—তোমার জন্য—বলতে বলতে কথা খুঁজে না পেয়ে মানস রুমাল বের করে মুখ মুছল।
পুরুষকে পাগল করার আয়ুধগুলি মেয়েদের প্রকৃতিদত্ত। এই প্রকাণ্ড মানুষটার শরীরে এখন আর হাড়গোড় নেই। একতাল পিণ্ডের মতো সীতার অভিমান, সংশয় আর ভালবাসার উত্তাপে গলে গলে যাচ্ছে। এখুনি সর্বস্ব দিয়ে দিতে প্রস্তুত। ও এখন সীতার জন্য দশদিন উপোস করতে পারে, খুন করতে পারে, যা খুশি করতে পারে।
সীতা সতর্ক হয়ে গেল। ওকে পাগল করার ইচ্ছে তার নেই। বরং গভীর মায়ায় সীতা বলল—তোমার কথা আমাকে কখনও কিছু বলো না।
মানস আস্তে আস্তে সহজ হয়ে বসল। রেডিয়োর ঘোষণাকারীর মতো গম্ভীর ঘুমভাঙা সুন্দর গলায় বলল—কী বলব। আমার ছেলেবেলা সুন্দর ছিল না। অল্প বয়সে বাবা মারা গেছে, আমরা দু ভাই আর মা কাকাদের কাছে ছিলাম। দুঃখে কষ্টেই। কাকারা খারাপ লোক নয়, কাকিমারাও ভাল ব্যবহার করেছে, কিন্তু মা আমাদের শান্তি দেয়নি। স্বামী হারিয়ে মা বড় অভিমানী, খুঁতখুঁতে হয়ে গিয়েছিল। কাকিমাদের বা কাকাদের সঙ্গে একটু কিছু হলেই কাঁদত, বিলাপ করত, আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত রাস্তায়, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বলে। এইভাবেই ক্রমে কাকাদের আর কাকিমাদের ধৈর্য ভেঙে

গিয়েছিল। ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি। তাই মাকে নিয়ে আলাদা হব বলে ছেলেবেলা থেকেই চাকরির চেষ্টা করতাম। করেছিও চাকরি। খেলাধুলোয় ভাল ছিলাম বলে স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই চাকরি করেছি। আলাদা বাসা করার মতো টাকা পেতাম না, তবু কিছু টাকা আসত। এইভাবে বড় হয়েছি আর কী?

—কখনও স্বপ্ন দেখনি তুমি?

—কীসের স্বপ্ন?

—অনেকে তো অনেক রকম স্বপ্ন-টপ্ন দেখে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল মানস। ভেবে ভেবে বলল—স্বপ্ন ছাড়া বোধহয় মানুষ নেই। আমিও কি দেখিনি? অলিম্পিকে যাব, সোনা আনব—এ সব খুব স্বপ্ন দেখতাম। হল না। ন্যাশনাল মিট-এ বার থেকে পড়ে যাই, তারপর আর জিমন্যাস্টিকসে ফিরে যাওয়া হল না।

—কখনও মেয়েদের কথা ভাবনি?

ম্লান হাসে মানস, বলে—মেয়ে! তাদের কথা চিন্তা করতে সাহসই পেতাম না। মা আর ভাইকে নিয়ে আলাদা একটা বাসা হবে, শুধু সেই চিন্তাই করতাম। মাত্র তো কয়েক বছর আগে রেলে চাকরি পেয়েছি। কিন্তু ততদিনে মা মরে গেছে। কাকাদের সংসারে কিছু টাকাপয়সা দিই বলে কাকারাও আর ছাড়েনি। রয়ে গেলাম। মেয়েদের চিন্তা প্রথম শুরু হয় তোমাকে দেখে। মনোরম তো একটা ক্রিপল, ওর মনও সুস্থ নয়। ওর ঘরে তোমাকে দেখে আমার কী যে হত!

বলে আবার গাঢ় চোখে তাকায় মানস। হঠাৎ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে—তোমার কিছু হত না আমাকে দেখে?

সীতা অস্বস্তি বোধ করল একটু। না, হত না। মনোরম বড় ভুল করেছিল ওই একটা জায়গায়। মানসকে দেখে কেন কিছু মনে হবে সীতার? তখন তো সীতা সেই কদমছাঁট চুলওলা মাথাটাকে নিজের বুকের মধ্যে নিতে শিখে গিয়েছিল।

সীতা মৃদুস্বরে একটা মিথ্যে কথা বলল—হত।

বলে মুখ নামিয়ে নিল টেবিলের ওপর। টেবিলে গাঢ় সবুজ রঙের কাচ তাতে তার আবছা মুখচ্ছবি, ও কি নদীর জলে তার ছায়া?

—কী হত?

—কী জানি। অত কি বলা যায়?

—বলো না। আমি বুঝে নিয়েছি।

সীতা হাসল।

—চলো, কোথাও যাই।

—কোথায়?

—চলো না।

—রাত হয়ে যাচ্ছে।

—তাতে কী? তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।

সীতা চুপ করে বসে থাকে। মাথা নোয়ানো।

—ভয় পাচ্ছ? আমাকে? একটা জীবন আমার সঙ্গেই তো থাকতে হবে।

সীতা একটু চমকায়। ঠিকই তো? ভয়ের কী? বাধ্য মেয়ের মতো সে উঠল।

ট্যাক্সি ধরে তারা এল মস্ত একটা ক্লাব ঘরে। বহু পুরনো আমলের প্রকাণ্ড ক্লাব, সাহেবরা তৈরি করেছিল। সামনে লন, তারপর পোর্টিকো, রিশেপশন হল। মানস সীতার হাত ধরে নিয়ে গেল, কোথাও বাধা পেল না, কেউ চেয়েও দেখল না। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। ক্লাব ঘর প্রায় ফাঁকা। দু-চারজন খুব দামি পোশাক পরা লোক গেলাস হাতে বসে আছে, চোখ নিমীলিত।

তারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। কেউ নেই। একটা ঘরে সারি সারি টেবিল টেনিসের টেবিল পাতা। সব খালি, কেবল একটা টেবিলে দুজন ক্লান্ত ছেলে একনাগাড়ে খেলে যাচ্ছে। খুটখাট-টিং শব্দ হচ্ছে। ঘরটা পেরিয়ে তারা আর একটা ঘরে এল। ফাঁকা, আলো জ্বলছে। সুন্দর সাজানো ঘর।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মুখ ঘোরাল মানস। আর তখনই সীতা হঠাৎ বুঝতে পারল, মানস প্রকৃতিস্থ নেই। ওর চোখ জ্বলজ্বল করছে, মুখে রক্তাভা, ঠোঁট নড়ছে। সীতার একটুও ভয় করল না।

মানস এগিয়ে এসে তার দুকাঁধ ধরে বলল—একটা কথা...

—বলো।

—আমার কাছে মেয়েরা রহস্যই থেকে গেছে। মানসের গলা কাঁপল।

—জানি।

—আমি মেয়েদের কিছু জানি না। তাদের শরীর...তুমি আমাকে এই এক্সপিরিয়েন্সটা দেবে?

নির্দ্বিধায় সীতা বলে—দেব।

—এখনই। দ্রুত দৌড়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে এল মানস।

পর মুহূর্তেই তারা পাগল হয়ে যাচ্ছিল। ডিভান না সোফা কে জানে, তার ওপর তারা ঘূর্ণি ঝড়ের মতো ওলটপালট খাচ্ছিল।

প্রথম—কিন্তু সীতার এ তো প্রথম নয়। সে তো কুমারী নয়। তার রহস্য দেখেছিল প্রথম আর একজন। বনভূমি পিছনে রেখে একটা ঢালু বেয়ে নেমে এসেছিল এক কৃশ ও সুন্দর পুরুষ। বহুদিন, সে কি বহুদিন হয়ে গেল? সেই পুরুষ মনোরম না হয়ে মানস হতে পারত। হলে সে আজ কত সুখী হত।

ঝড়টা যখন তাকে ঘিরে ফেটে পড়ছে, তখন সীতা আকুল শ্বাস টানছিল বার বার। কোথাও...কোথাও...কোথাও সামান্য একটু সিগারেটের গন্ধ নেই। নেই কেন? তার পিপাসায় সীতা শুঁকছিল মানসের মুখ, গাল, গলা, শ্বাস। না নেই। কিন্তু একটু সিগারেটের কণামাত্র গন্ধের জন্য বড় পাগল পাগল লাগছিল সীতার। সে অস্ফুট গলায় চেঁচিয়ে বলল—এ রকম নয়। না, না...

বসন খোলার মুহূর্তেই থেমে গেল মানস। একটু উদভ্রান্ত সে। কিন্তু চট করে নিজেকে সংযত করার অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী। ঘোলাটে চোখে সে সীতার দিকে চেয়ে বলে—না?

সীতা কষ্টে হাসল একটু। মাথা নেড়ে জানাল, না।

—কেন?

সীতা উত্তর দিল না।

মানস একপলকে গায়ের জ্বর ঝেড়ে ফেলল। হাসল। বলল—তা হলে থাক। আমার তাড়া নেই।

টিক-টক-টুং শব্দ আসছে। বলটা মেঝেতে লাফিয়ে পড়ল। গড়াল। একটা অস্পষ্ট গলা শোনা গেল—নাইন সিক্স...সাইড আউট। আবার টিক্-ট্-টি্-টক্ শব্দ।

যখন বেরিয়ে আসছিল তারা তখনও পাশের ঘরে সেই দুটি ক্লান্ত ছেলে ফাঁকা ঘরে একনাগাড়ে টেবিল টেনিস খেলে যাচ্ছে। টিক্-টক্-টিক্-টক্-টিক্-টক্...

আবার ট্যাক্সি। আবছা অন্ধকার। বাইরের আলো নানা রং ফেলে যাচ্ছে তাদের ওপর।

—আমার তাড়া নেই।

সীতা একটু হাসল, স্নায়ুবিকারের হাসি।

মানস রাগ করেনি, একটু হতাশ হয়েছে বোধহয়। কিন্তু সে কিছু না। আবার বলল—যখন নিমন্ত্রণ করে পাতপিঁড়ি পেড়ে খাওয়াবে, তখন খাব।

—কী?

—তোমাকে।

সীতা হাসে।

—পাতিয়ালায় যাওয়ার আগে আমি বিয়ে করব সীতা।

—আইন?

—দূর হোক গে।

সীতা শ্বাস টানে, একটা সুন্দর সিগারেটের গন্ধ আসছে কোথা থেকে। সীতা চেয়ে দেখে, ড্রাইভারের পাশে বসা অ্যাসিস্ট্যান্ট ছেলেটা একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বুক ভরে বাতাস টানল সীতা।

বাড়ির সামনে নেমে যাওয়ার আগে সীতা হঠাৎ জিগ্যেস করল—তুমি সিগারেট খাও না?

—না। কেন?

—খাও না কেন?
মানস বুঝতে না পেরে বলে—আমার কোনও নেশা নেই। সিগারেট খেলে দমের ক্ষতি হয়।
—খুব ক্ষতি।
মানস হাসল, বলল—কেন, সিগারেট খাওয়া তুমি পছন্দ কর?
—মাঝে মাঝে খেয়ো, যদি খুব ক্ষতি না হয়।
মানস সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল—খাব। আমার ঠিক সহ্য হয় না। তবে মাঝে মাঝে খাব, এবার থেকে। ঠিক আছে?
সীতা সুন্দর ভালবাসার হাসি হাসল। নেমে যেতে যেতে বলল—খেয়ো। মাঝে মাঝে।
—কাল আসব যখন তোমার কাছে, তখন...
—আচ্ছা।
—যাই।

দাদার ঘরে তখনও মক্কেল আছে। আলো জ্বলছে। কথাবার্তা শুনতে পেল সীতা। সিঁড়িটা অন্ধকার। সীতা পা টিপে টিপে উঠে এল দোতলায়।
বারান্দায় আলো জ্বলছে। বউদি রেলিং থেকে ঝুঁকে আকাশ দেখছে। এ সময়টায় বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে বউদি রোজই সিঁড়িব মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, যতক্ষণ দাদা উঠে না আসে। দ্বিতীয় পক্ষের বউ, তাই এখনও স্বামীর জন্যে আগ্রহ শেষ হয়নি।
—ঠাকুরঝি এলে?
—হুঁ।
—কত রাত হল! প্রায় সাড়ে দশটা।
—একটু ঘুরে এলাম। ঘরে ভাল লাগে না।
—কোথায়?
—অনেক জায়গায়।
—একা?
সীতা ভ্রূ কোঁচকাল। বউদির বয়স কম। কৌতূহল বড্ড বেশি।
সীতা বলল—না। দুজন।
—আর কে?
—তুমি চিনবে না।
—তোমার ভাই ভীষণ সাহস।
সীতা একটু বিরক্ত হয়ে বলল—বউদি, আমি সধবাও নই, কুমারীও নই, আমি হিসেবের বাইরের মানুষ। আমার জন্য কারও কিছু এসে যায় না।
—তা অবশ্য ঠিক। বলে বউদি চুপ করে যায়। তারপরই হঠাৎ প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলে বলল—দেখো না, বৃষ্টি এসে গেল প্রায়, তবু মক্কেলগুলো যাচ্ছে না।
এই ছেলেমানুষিটুকুর জন্যই বউদিটাকে খারাপ লাগে না সীতার। দাদার আগের পক্ষের একটা ছেলে, বিলু। দার্জিলিঙে স্কুলে পড়ে। দাদা ইচ্ছে করেই সরিয়ে দিয়েছে তাকে, যাতে সৎমায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকে। কিন্তু দরকার ছিল না। বিলুকে ভালই বাসে বউদি। প্রতি সপ্তাহে চিঠি দেয়। মা-মরা ছেলেটার জন্য কাঁদেও মাঝে মাঝে।
এ সময়ে বাড়িটা নিঃঝুম। বাবা তার ঘরে শুয়ে পড়েছে ন'টায়।
সীতার একটু ক্লান্তি লাগছিল। কিন্তু মনে কোনও অবসাদ নেই। সেখানে রঙিন আলো জ্বলছে।
ঘরে এসে টিউবলাইটটা জ্বালে সীতা। তার একার ঘর। ফাঁকা, নিঃঝুম চারদিক। কাপড় না-ছেড়েই বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। একটু শুয়ে থাকে চোখ বুজে। ঝোড়ো বিকেলটার কথা মনে করার চেষ্টা করে। মাথাটা টিপ-টিপ করছে। অনেকদিন বাদে এত চুমুতে ঠোঁট ফুলে আছে সীতার। ভারী লাগছে, ডান

গালে কামড় দিয়েছিল মানস, তার জ্বালা। চোখ বুজে একটু হাসে সীতা। গা এলিয়ে দেয়। প্রলয়ের মতো একটা প্রবল বাতাস আসে, ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘরে। জলকণা মেশানো বাতাস। ঠাণ্ডা। আজ রাতে কিছু খাবে না সীতা, কাপড় ছাড়বে না, ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমোবে? না, ঘুম আসবে না ঠিক। আজ এতদিনের মধ্যে প্রথম মানস এতটা এগোল। শরীরের কাছে শরীরের কত কথা জমে থাকে। মুখ টিপে সীতা আবার হাসে। হঠাৎ ঝড়ে একটা জানালার পাল্লা ঠাস করে শব্দ করে। একটু চমকায় সে। জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘর ভিজে যাচ্ছে হ্যাঁচলায়, ভিজুক গে। চোখ বুজে একটা ঝিমঝিমানির মধ্যে চলে যাচ্ছিল সীতা। হঠাৎ শুনতে পেল ফাঁকা হলঘরে দুজন ক্লান্ত ছেলে টেবিল টেনিস খেলছে। টিক-টক-টিক-টক...টিক-টক...

চমকে চোখ মেলে চায় সে। ধু-ধু আলো জ্বলছে ঘরে। নীল পর্দা কি ওটা? নীলই তো। পর্দাটা উড়ছে হাওয়ায়। সীতা সমস্তটা মন নিয়ে উঠে বসে। পরদার ওপাশ কী?

কিছু না। অন্ধকার। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে বারান্দা, তার রেলিং। অঝোর বৃষ্টি।

সীতা হাতমুখ ধুয়ে এসে বাতি নেবাল। দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ল। নির্ঘুম চোখে তার মনে পড়ল, মনোরমের আর কিছুই নেই।

বিয়ের পরই চাকরি ছেড়ে সীতার নামে এজেন্সিটা নিয়েছিল মনোরম। হঠাৎ বাজারে নতুন ধরনের অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি জিনিসপত্রের চাহিদা দেখা দিয়েছিল। বড়লোক না হলেও ঢের টাকা রোজগার করেছিল সে। টাকা রাখত লকারে, আয়কর ফাঁকি দিতে সোনা কিনেছিল অনেক। জমি কিনেছিল। সবই সীতার নামে। ঠাট্টা করে বলত—আমি হচ্ছি সীতা ব্যানার্জির ম্যানেজার। সবাই তাই জানে।

সীতা কোনও খোঁজখবর রাখত না। মাঝেমধ্যে কাগজপত্র আর চেকে সই দিত, লকার খুলতে তাকেই নিয়ে যেত মনোরম। ব্যাঙ্কে তারা লকার খুলবার যে কোড ব্যবহার করত তা ছিল 'লাভ'। এখনও লকারটা সীতার নামেই আছে। মাঝে মাঝে সে যায় লকার খুলতে, এখনও। কোড বলে—'লাভ'। বলবার সময়ে কিছু কি মনে হয়?

ডিভোর্সের সময়ে সে ব্যবসাটা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল মনোরমকে। দাদা ছাড়তে দেয়নি। বলেছে, ও পুরুষমানুষ, ভবিষ্যতে আবার দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু তুই মেয়ে, তোর নামে কোম্পানি, ও কেউ না। এবং আইনমাফিক ম্যানেজারের চাকরি থেকে সীতা মনোরম ব্যানার্জিকে বরখাস্ত করে। তারপর থেকে দাদাই কোম্পানি দেখে, চালায়। লকারে টাকা, সোনা, যাদবপুরে সেন্ট্রাল রোড-এ জমি, সব নিয়ে সীতার কোনও ভাবনা নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, এভাবে মনোরমকে নিংড়ে না নিলেও হত।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ হতে থাকে। আধোঘুমে সীতা শুনতে পায়, ফাঁকা ঘরে দুই ক্লান্ত খেলোয়াড়ের একটানা টেবিল টেনিস খেলার শব্দ। টিক-টক...টিক-টক...টিক-টক...

॥ তিন ॥

আমি এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব।

আমি উল্টে রেখেছি বই, আলো নিবিয়ে দিয়েছি। এখন আর কাউকেই আমার কিছু বলার নেই। আমার মাথার নীচে একটিমাত্র শক্ত বালিশ, বিছানাটা একটু স্যাঁতসেঁতে, বেডকভারটা ময়লা। তা হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। আমি এই একটু ভেজা ভেজা বিছানায়, ময়লা চাদরে ঠিক ঘুমিয়ে পড়ব।

শুভরাত্রি হে আমার টেবিল-ল্যাম্প। হাতঘড়ি, বিদায়। বিদায় সিগারেট। কাল আবার দেখা হবে। বিদায়, জেমস বন্ড। কাল আবার দেখা হবে সমুদ্রের তীরে, বিকিনি-পরা ওই মেয়েটি—কী যেন নাম—তার পাশে। শুভরাত্রি হে আমার দেয়ালের ক্যালেন্ডারের ছবি। শুভরাত্রি হে আমার জানলার পাশে বকুল গাছ। রাত্রির আকাশ, বিদায়। আমি মনোরম, তোমাদের মনোরম। এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। না, ভুল...ভুল বললাম; ঘুমের আগে এই যে একটু সময়—যখন সমস্ত শরীরে রিমঝিম করে নেমে আসছে চেতনাহীনতা, যখন শ্রাবণ জুড়ে কেবল ঝিঁঝি পোকার ডাক—তখন এই সময়টুকুতে আমি আর মনোরম নই, তখন আমি এক শিশু ছেলে, যার ডাকনাম ছিল ঝুমু। মা আর বাবার সেই ছোট্ট ঝুমু। বারো মাস অসুখে ভুগে যার রক্তহীন, সাদা, রোগা ডিগডিগে চেহারা। ডান হাতে মাদুলি, গলায় কবচ। এখন

আমি সেই ছোট্ট ঝুমু—একটু নির্বোধ, আর একটু অসহায়!...কেউ কিছু বলছ? না, আমার আর কিছুই দরকার হবে না। মানুষ ঠিক ঘুমিয়ে পড়ে। ওই তো ঘুম আসছে ডাকপিওনের মতো। সে আমাদের গলির মুখের ল্যাম্প-পোস্ট পার হয়ে এল। হাইড্র্যান্টের জল উপচে রাস্তা বুঝি একাকার। সে বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে জলময় জায়গাটুকু পার হয়। এখন সে সদরে, রাস্তার মৃদু আলো ঠিক জ্যোৎস্নার মতো পড়ল তার অস্পষ্ট মুখে। শেষ-হওয়া সিগারেটের অংশটুকু ছুড়ে ফেলে দিল সে। উঠে আসছে নিঃশব্দে। দরজার বাইরে পাপোষে সে তার জুতোয় লেগে থাকা অন্ধকারের কণাগুলি মুছে নিচ্ছে। হাঁসের মতো গা ঝাড়া দিয়ে সে শরীর থেকে জলকণার মতো ঝেড়ে ফেলছে অন্ধকার। এখন সে ঘরের মধ্যে । কবজি উলটে ঘড়ি দেখে সে বলল—ভাবনাচিন্তা করার সময় আর অল্পই আছে।

জানি, আমি তা জানি। আমার জানলার পাশে বকুলের ডালপালায় খেলছে বাতাস। কোন দূরের রাস্তায় ঠুন-ঠুন করে চলে যাচ্ছে একজন একা রিকশাওয়ালা। কোথায় যেন ট্যাক্সির মিটার জলতরঙ্গের মতো টুং-টাং ঘুরে গেল। বালিশের নীচে টিক টিক শব্দ করছে আমার হাতঘড়ি। বিদায় হে রাতের শব্দরা। হে কোমল অন্ধকার, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি হে আমার জানালার আলো। শুভরাত্রি হে দেয়ালের অচেনা ছায়ারা। বিদায় হাতঘড়ি, বিদায় ক্যালেন্ডারের ছবি, বিদায় শেষ সিগারেট। স্বপ্ন ও বাস্তবের মতো দিনশেষে এখন আমি ঘুমিয়ে পড়ব। আসছে ঘুমের অন্ধকার তরঙ্গেরা। একের পর এক। বিদায় হে চিন্তাশক্তি। বিদায় বাস্তবতা। শুভরাত্রি হে স্বাবলম্বন। ওই আমার ঘুম, তার দীর্ঘ আঙুল বাড়িয়ে দিল আমার ভিতরে। সে বোতাম টিপে দিতে থাকে একে একে। আর আমার শরীরের ভিতরে যে অন্ধকার সেইখানে নীল লাল স্বপ্নের মৃদু আলোগুলি জ্বলে ওঠে। সেই আলোতে দেখা যায়, এক জনশূন্য বিশাল প্রেক্ষাগৃহ, তার দেয়ালে দেয়ালে ফ্রেস্কোতে আঁকা আমার শৈশবের ছবি। পর্দার ওপাশে মঞ্চে কারা যেন অশিবার্থ টানাটানি করে দৃশ্যপট সাজাচ্ছে। পর্দা অকস্মাৎ সরে যায়। দেখা যায়, ঘাটের পৈঠার মতো দীর্ঘ টানা কয়েকটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়িতে শ-তিনেক ছেলে দাঁড়িয়ে—গাইছে—জয় জগদীশ হরে...

বাইরে কি বৃষ্টি? বৃষ্টিই। ঝড়ের বাতাস দিচ্ছে। পাশ ফিরে শুল মনোরম। তার এলানো হাত পড়ে আছে বিছানায়। বিস্তৃত হাতখানা যতদূর যায় কিছুই স্পর্শ করে না। কেউ নেই। একটু ঠান্ডা, স্যাঁতসেঁতে বিছানায় পড়ে আছে নিরুপায় হাতখানা। বাইরে ঝড়। কী অঝোর বৃষ্টি! মনোরম সেই বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেল না। সে তখন তার শৈশবের স্বপ্ন দেখছিল।

কয়েকদিন বাদে মামার সঙ্গে কানোরিয়াদের বাড়িতে গিয়েছিল মনোরম। সেখানে কাঠের কাজ হচ্ছে। মনোরম কাঠ চেনে না, প্রতি সি এফটি কোনটার কত দাম তা জানে না। আসলে কাঠের ব্যবসায় তার মন নেই। এক একটা ব্যবসা আছে যার নো-হাউ জানতে বিস্তর সময় লেগে যায়। কাঠ হচ্ছে সেই ব্যবসা। 'পুরাতন বাড়ি ভাঙা হইতেছে'—খবরের কাগজে এরকম বিজ্ঞাপন দেখলেই মামা সেখানে মনোরমকে নিয়ে যায়। কড়ি-বরগা দেখেই ধরে ফেলে কোনটা কী কাঠ। সত্তর, আশি, কি একশো, দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ির অভাব নেই কলকাতায়। বিস্তর জমি নিয়ে হাতির মতো পড়ে আছে। বড় বড় সব ঘর পুরনো আমলের। দু-তিন তলা সব বাড়ি, এখনকার দশতলার কাছাকাছি উঁচু। সে সব ভেঙে নতুন ধরনের মাল্টিস্টোরিড বাড়ি উঠছে, অফিস আর ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়ার জন্য। আটটা-দশটা ফ্লোর, নতুন ধরনের সব গ্যাজেটস, অ্যামেনিটিস। তাই পুরনো বাড়ি আর থাকছে না কলকাতায়। পুরনো বাড়ি, বিশেষ করে সাহেববাড়ি হলে তার কাঠ হবে আসল বার্মা-টিক, বাজারে পাওয়া যায় না। সত্তর থেকে দেড়শো বছরের কাঠ, রস মরে ঝুন হয়ে গেছে। চেরাইয়ের পর পালিশ করলে রঙিন কাচের মতো দেখায়। মামা বিস্তর নিলাম ডেকে গোলা ভর্তি করেছে সেই দুর্লভ কাঠে। কাজেই বড়লোকদের বাড়ির কাজ হেসে-খেলে পায় মামা।

ওল্ড বালিগঞ্জে একটা নির্জন রাস্তায় বাড়ি। এখনও বাড়িটা শেষ হয়নি। কানোরিয়ারা বড়লোক সে তো জানা কথা। কিন্তু কতটা তা ঠিক জানা ছিল না মনোরমের। বাড়িটা দেখে তাক লেগে গেল। বেশি বড় নয়, বড়জোর পাঁচ সোয়া পাঁচ কাঠা জুড়ে একটা কংক্রিটের স্বপ্ন। সামনে একটা লন, একধারে টেনিস কোর্ট, সেটা পেরোলে থামহীন একটা গাড়ি-বারান্দা—একটা বৃত্তাকার প্রকাণ্ড সিমেন্টের চাকতি শূন্যে ঝুলে আছে। বৈঠকখানার কোনও দরজাই যেন নেই, এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল পর্যন্ত

চওড়া-চওড়ি হাঁ হয়ে আছে। দরজা নেই নয়। আছে। সে দরজা দেয়ালের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। চারিদিকে কাচ আর কাচ। ঘরের একদিকে মেঝেয় একটা মস্ত চৌবাচ্চার মতো ডিপ্রেশন। সেখানে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে। সেই জায়গাটায় নিখুঁত মাপে ভারী 'কোজি' সোফাসেট তৈরি করে বসানো হচ্ছে। ভেতরের দিকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি একটা প্যাঁচ খাওয়া ঢাল হয়ে উঠে গেছে, সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ আলাদা আলাদা কংক্রিটের স্ল্যাব, জাবদা সিঁড়ি নয়। তিনতলা বাড়ির জন্য বসানো হচ্ছে লিফট। ডানদিকে ঘুরে আরও একটু ভেতরে এগোলে দেখা যায়, ঘরের মধ্যেই ছোট্ট একটা মিনিয়েচার দীঘি—'লিলিপুল'। তার ওপরে একটা খেলাঘরের ব্রিজের মতো চমৎকার ব্রিজ। 'লিলিপুল'-এর উপরে ছাদটা কাচের, প্রাকৃতিক আলো আসবার জন্য।

দেখাশুনো করছেন এক মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ার, তার পরনে সাদা লুঙ্গির মতো কাপড়, সাদা জামা, কপালে তিলক, পায়ে চটি। গম্ভীর এবং শান্ত মানুষ। মুখে কথা প্রায় নেইই। মামার হেডমিস্ত্রি আজ কাজে আসেনি, তার জন্য মামা তাকে বিস্তর কৈফিয়ত দিচ্ছিল এখনও জলশূন্য লিলিপুলের ধারে দাঁড়িয়ে। ইঞ্জিনিয়ার লোকটা হাতে ব্লু-প্রিন্ট দেখেছে, ভ্রূ সামান্য কোঁচকানো, উত্তর দিচ্ছে না। উত্তর পেতে মামার সময় লাগবে বিবেচনা করে মনোরম উঠে এল উপরে, চমৎকার সিঁড়িটা বেয়ে। কোনটা ঘর, কোনটা প্যাসেজ, কোনটা বারান্দা কিছু বোঝা যায় না। সবটাই নিস্তব্ধ স্বপ্নদৃশ্যের মতো। এমনকী কত টাকা খরচ হচ্ছে বাড়িটায়, তারও কোনও হিসেব পায় না সে। চার-পাঁচ লাখ হতে পারে, বিশ-ত্রিশ লাখও হওয়া সম্ভব। আরও বেশি হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। এখনও সর্বত্র মেঝেয় মার্বেল ঘষা হয়নি, দেয়ালে পলেস্তারা পড়েনি। কোণের দুটো ঘর শেষ হয়েছে, সেখানে মিস্ত্রিরা কাঠের আসবাব বানাচ্ছে। মাঝারি বড়লোকেরা, বড় জোর প্রবর্তক বা আমকার থেকে আসবাব কিনে আনে। এরা বাজারি আসবাব কেনে না। ঘরের মাপজোক আর ডিজাইন অনুযায়ী আসবাব তৈরি করিয়ে নেয়। মামা মোটে তিনটে শোওয়ার ঘর আর দরজা জানলার খানিকটা কন্ট্রাক্ট পেয়েছে। সেটাও বোধহয় বিশ-ত্রিশ হাজার টাকার।

মনোরমকে দেখে মিস্ত্রিরা কাজ থেকে চোখ তুলে তাকাল। তাদের চোখে ভয়।

রাধু বলল—কী হবে বাবু, হেডমিস্ত্রি আজ এল না।

মনোরম বাড়িটায় ঘুরে সব দেখে কেমন একরকমের হয়ে গিয়েছিল। একটা ছোট্ট জায়গায় এত টাকার কারবার দেখে মাথাটা গরম। একটু ঝেঁঝে বলল—তাতে কী? তোমরা কাজ জানো না।

—জানি তো, কিন্তু সকালে আজ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব খুব রাগ করেছে। ভয়ে আমাদের হাত চলছে না। যদি এদিক ওদিক হয়ে যায়।

মনোরম কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বেরিয়ে এল। তিনতলায় উঠল ধীরে ধীরে। অনেক মানুষ খাটছে। কেউ বিড়ি খাচ্ছে না, গল্প করছে না। সব চুপচাপ। চারিদিকে একটা সম্ভ্রম আর ভয়-ভয় ভাব। রাজমিস্ত্রিরা কাজ করতে করতে চোরা-চোখে তাকে দেখল, যেন একটু বেশি মন দিয়ে কাজ করতে লাগল। বাড়ির মালিক কে তারা জানে না। মনোরমের পরনে স্ট্রাইপওলা বেলবটস, গুরু পাঞ্জাবি, চোখে রোদচশমা ইস্পাতের ফ্রেমে। মিস্ত্রিরা বুঝতে পারছে না, এই লোকটা মালিকপক্ষের কেউ কিনা। মনোরম খানিকটা মালিকপক্ষের মতোই অবহেলার ভঙ্গিতে একটু ঘুরে দেখল চারদিক। এ তলায় ঘর বেশি নেই, যা আছে তার চারটে দেয়ালই ঘষা কাচের, মস্ত একটা রুফ-গার্ডেনের প্রস্তুতি চলছে।

লিফট এখনও বসানো হয়নি। কুয়োর মতো গহ্বরটা নেমে গেছে। চতুষ্কোণ, একটু অন্ধকার। দরজা নেই। মনোরম ফাঁকা জায়গাটায় মুখ বাড়িয়ে নীচে তাকাল। হাত-পা শিরশির করে উঠল তার। ভার্টিগো। এক পা পিছিয়ে এল। দেয়াল ধরে দাঁড়াল একটু। জিভটা নড়ছে মুখের ভিতরে। শরীরে একটা সংকোচন। একটা দুর্ঘটনার স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার করে দিল মাথা।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে তাকাল। কাচের ঘর এবং ছাদের বাগানের সুন্দর বিস্তারটি দেখল। মানুষ কত বড়লোক হয়! তিনতলা বাড়ির জন্য লিফট লাগায়, ছাদে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাগান তৈরি করে, ঘরের মধ্যে বানায় পদ্মসরোবর। ছোকরারা কেন বিপ্লবের কথা শহরের দেওয়াল জুড়ে লেখে, তার একটা অর্থ যেন খুঁজে পায় সে। ডিনামাইট সহজপ্রাপ্য হলে সেও একটা কিছু এক্ষুনি করত। পকেট হাতড়ে সে বের করল সস্তা সিগারেটের প্যাকেট। সীতা চলে যাওয়ার পর তার বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে এ পর্যন্ত মোট

পাঁচ মাসের। দুশো কুড়ি টাকার দুঘরের ফ্ল্যাট পূর্ণ দাস রোডে। পুরনো বাড়িওলা একটা আশ্রমকে বাড়িটা দান করেছে। আশ্রমের লোকেরা দুঁদে বাড়িওলা নয়, তার ওপর ধর্মকর্ম করে, তাই ঠিক তাড়ে ধাক্কা দিচ্ছে না। কিন্তু গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীরা প্রায়ই আসে আজকাল, দেখা করে যায়, মিষ্টি হেসে তার আর্থিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করে। মনোরম তাদের ধর্মকথায় টেনে নিয়ে যায়। তারা অস্বস্তি বোধ করে।

পরিপূর্ণ ফুসফুসে সিগারেটের ধোঁয়া ভরে নিল মনোরম। মাথাটা ঝিম করে ওঠে। সমস্ত শরীর একটা রহস্যময় আনন্দে ভরে যায়। আকাশ টেরিলিনের মতো মসৃণ এবং নীল। শুধু এক কোণে ময়লা রুমালের মতো একখণ্ড বেমানান মেঘ। রুফ গার্ডেনের রেলিঙে হাত রেখে মনোরম একটু দাঁড়িয়ে থাকে। দমকা বাতাসে দ্রুত পুড়ে যাচ্ছে সিগারেট। সে একটু শ্বাস ফেলে নেমে এল।

অনেকক্ষণ চেষ্টায় মামা মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ারটিকে কেবল মাথা নাড়ানোয় সফল হয়েছে। কথা ফোটেনি। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখল মনোরম, লিফটের কুয়োর মধ্যে ছুড়ে দিল সিগারেট। এগোল।

—মাই নেফিউ। পরিচয় দিল মামা।

মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ার এক ঝলক তাকাল মাত্র, রিকগনাইজ করল না।

—টুমরো দি হেডমিস্ত্রি উইল ডেফিনিটলি কাম। ময়মনসিংহের অ্যাকসেন্টে ইংরেজিটা বলল মামা।

ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক একটু ভ্রূ কোঁচকাল মাত্র।

—অলরাইট? মামা জিজ্ঞেস করে।

ভদ্রলোক হাতের প্ল্যানটার দিকে নীরবে তাকিয়ে একটা শ্বাস ছাড়ল।

মামা রুমালে ঘাম মুছে মনোরমের দিকে তাকাল। মনোরম মামার মুখ দেখে বুঝতে পারে, এতক্ষণ মামার খুব খাটুনি গেছে।

লন ঘেষে মামার দিশি গাড়িটা দাঁড় করানো। তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘন নীল রঙের জাপানি ক্রাউন গাড়ি, তার নীলাভ কাচের ভেতর দিয়ে ভেতরে চমৎকার মেয়ে-শরীরের মতো নরম গদি দেখা যাচ্ছে। কী অ্যারিস্টোক্র্যাট তার ড্যাশবোর্ড আর হুইল। এয়ারকন্ডিশনড। মনোরম ঝুঁকে গাড়িটা একটু দেখল। ভারী পছন্দ হয়ে গেল তার।

মামা তার গাড়ির লক খুলতে খুলতে বলে—সাড়ে চারজন মানুষের জন্য এত ব্যাপার-স্যাপার।

—কারা সাড়ে চারজন?

—কানোরিয়ারা। বুড়োবুড়ি, ছেলে আর ছেলের বউ। আর বোধহয় একটা বাচ্চা।

—মোটে?

—তাও ছেলে আর ছেলের বউ চোদ্দোবার বিজনেস টুর আর হানিমুন করতে ইউরোপ আমেরিকা যাচ্ছে, বুড়োবুড়ির তীর্থ করাই বাই। থাকবেটা কে গুচ্ছের চাকরবাকর ছাড়া? ঝুমু, মাদ্রাজিরা কেমন লোক হয়?

—ভালই। জেন্টল।

—আমিও তো তাই জানি। কিন্তু এ লোকটাকে ঠিক বোঝা যায় না। বিশ মিনিট ধরে বোঝালাম, কিছু বুঝেছে কিনা কে জানে। তোকে নিয়েই হয়েছে আমার মুশকিল, ইংরিজিটা ভালই বলিস, কিন্তু বিজনেসটা একদম বুঝিস না। তোকে দিয়ে যে আমার কী লাভ হবে। ভেবেছিলাম, ইংরিজিটা তোকে দিয়ে বলিয়ে যদি ইমপ্রেস করা যায়, কিন্তু তুই বলবি কি? শুধু ইংরিজিতে কি কিছু হয়? একটু যদি বুঝতিস।

দিশি গাড়িটা চলছে। ক্রাউন গাড়িটার ছায়া এখনও মনোরমের চোখে ভাসে। দিশি গাড়িটায় বসে তার মনে হয় সে একটা ইঞ্জিন লাগানো মুড়ির টিনের মধ্যে বসে আছে।

মামার চেহারাটা লম্বা, সুড়ুঙ্গে, মাথা প্রায় গাড়ির ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। একটু কুঁজো হয়ে বসে স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে। রোগা বলে গায়ের হাওয়াই শার্ট লটর পটর করে। প্যান্টে পাছার দিকটা টান হয় না মাংসের অভাবে। বছরখানেক আগে প্রথম স্ট্রোক হয়ে গেছে। এখন আর একা বেরোতে সাহস পায় না, মনোরমকে সঙ্গে নেয়।

কানোরিয়াদের নির্মীয়মাণ বাড়িটার কথা ভাবতে ভাবতে মনোরম হঠাৎ বলল—ওরা খুব বড়লোক।

—কারা?
—কানোরিয়ারা।
মামা মন দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে একটা গম্ভীর 'হুঁ' দিল।
তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ।
হঠাৎ মামা তিক্ত গলায় বলে—বাঙালির ছেলে যে কবে ব্যবসা শিখবে।
মনোরম হাই তোলে। প্রসঙ্গটা আসছে।
—কিছুই তো পারলি না। এজেন্সি পেয়েছিলি, তা সে পরের তৈরি মাল বেচে কমিশন পেতিস। কাঠের কারবার তো তা নয়, এ হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু তুই শিখছিস কোথায়?
—শিখছি তো। সময় লাগবে।
—নন্-বেঙ্গলিরা কলকাতায় ওইসব বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে, গাড়ি দাবড়াচ্ছে। আর তোদের কেবল আলোচনা গবেষণা আর মেয়েছেলেদের মতো ছিঁচকাঁদুনে সেন্টিমেন্ট।
—নেতাজি এলে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো। বাঙালি জাগবে।
কথাটা মামার প্রাণের কথা। কিন্তু মনোরমের মুখে শুনতে ঠিক প্রস্তুত ছিল না বলে, মামা রাস্তা থেকে চোখ টপ করে সরিয়ে একবার মনোরমের মুখ দেখে নেয়। ঠাট্টা কিনা তা বুঝতে চেষ্টা করে।
—ঝুমু।
মনোরম মুখখানা স্বাভাবিক রেখেই বলে—উঁ।
—অবিশ্বাসের কী? বিনা প্রমাণে তো এতগুলো লোক ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।
—কিন্তু কোনজন? শৌলমারির সন্ন্যাসী, না গোপবন্ধুনগরে যাকে দেখা গিয়েছিল সেই সাধু, নাকি রাশিয়াতে চিনা ডেলিগেটদের ছবিতে যে লোকটার আইডেন্টিফিকেশন নিয়ে কথা উঠেছিল, কিংবা নেহরুর অন্তিমশয্যার পাশে যাকে দেখা গিয়েছিল! কোনজন, সেইটেই প্রবলেম।
—যে-ই হোক, তিনি আছেন। মামা একটু অধৈর্যের গলায় বলে। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে—আর তিনি আছেন সন্ন্যাস নিয়ে।
—কী করে বুঝলে।
—বার্মায় তখন তিনি খুব ব্যস্ত, সেই ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর এক সঙ্গী তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে এক মন্দিরে নিয়ে যায়। মন্দিরে গিয়েই তিনি কাঁদতে থাকেন, তারপর মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকেন, সঙ্গীকে তিনি পরে বলেছিলেন—জানো না, মন্দির-টন্দির এখন আর আমি যাই না। হাতে অনেক কাজ, মন্দিরে গেলে আমার কাজ পড়ে থাকবে। কিছুই করতে পারব না। কাজ শেষ হোক, তারপর আমি তো সন্ন্যাস নেবই। সন্ন্যাস তাঁর রক্তে ছিল। আমার কাছে যে বই আর পত্রিকাগুলো আছে তা পড়ে দেখিস, প্রতি সপ্তাহে আমাদের একটা মিট হয়, যেতে পারিস।
—আমি অবিশ্বাস করছি না।
—তোমরা জাত-অবিশ্বাসী। তোমাদের জেনারেশন। অবিশ্বাসী বলেই তোমরা কোনও রিলেশন এস্টাব্লিশ করতে পার না। যে বয়সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রবল ভালবাসা থাকার কথা, সে বয়সে তোমাদের বিয়ে ভেঙে যায়। দেশপ্রেম তোমাদের কাছে হাসিঠাট্টার ব্যাপার; ট্র্যাডিশন, মরালিটি এ সব তোমরা ভেবেও দেখ না। ডিসগাসটিং।
মনোরম চুপ করেছিল।
একটা সিগারেটের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল মামা। মনোরমের দিকে একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল—এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক নিয়ে আয়।
—তোমার না সিগারেট বারণ?
—গোল্ডফ্লেক বারণ নয়। যা। তুই আমাকে অ্যাজিটেট করেছিস।
মনোরম সিগারেট কিনে এনে দেখে মামা ড্রাইভিং সিট থেকে সরে বসেছে। মাথা এলানো, চোখ বোজা। সিগারেট প্যাকেট আর খুচরো টাকা-পয়সা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলল—তুই চালা। আমার নার্ভ ঠিক নেই।
মনোরম ক্ষীণ একটু হেসে ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে বলে—কেন?

মামা তেমনি ঘাড় হেলিয়ে চোখ বুজে সিগারেট খেল কিছুক্ষণ। আস্তে করে বলল—যা বুঝিস না তা নিয়ে কখনও ঠাট্টা করিস না।

মনোরম গাড়িটা চালাতে চালাতে বলে—মামা, যদি কেউ আসেই কোথাও থেকে, তবে সে এখনও আসছে না কেন? আমরা তো ঘোর বিপন্ন! যে-ই আসুক তার আসতে আর দেরি করা উচিত নয়।

—আসবে দেখিস। একদিন ভারতবর্ষ শাসন করবে সন্ন্যাসীরা।

মনোরম ভিতরে হাসল। বাইরে মুখখানা স্বাভাবিক।

মামা আবার বলে—বাঙালি-বাঙালি করি, কারণ গত সাতাশ বছর কলকাতায় থেকে আমি কখনও এ শহরটাকে বাঙালির শহর বলে ভাবতে পারি না। এ শহরটায় কয়েকটা বাঙালি পকেট আছে মাত্র। যে সব জায়গায় ক্যাপিটাল আর বিজনেসের খেলা, সেখানে তারা কোথায়? ভাল বাড়ি, ভাল গাড়ি, ভাল ইন্ডাস্ট্রি, তাদের ক'টা? এ সব তো নেই-ই, তার ওপর নেই আদর্শবোধ। খাওয়া-পরার ধান্ধায় ঘোর ক্ষতি নেই, তার সঙ্গে সমাজ সংসার নিয়ে একটু ভাববি তো! তুই কোন ভাষায় কথা বলিস, কোন দেশে বসত করিস, এগুলো নিয়ে ভাববি না? আমি তো জানি প্রতিটি মানুষ তার নিজের, পরিবারের, দেশের এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী।

মনোরম চুপ করে থাকে। মামার বাঙালিপ্রেমটা পরিচিত মহলে বেশ বিখ্যাত ব্যাপার। দার্জিলিং যাওয়ার সময়ে একবার মামা স্টিমার পেরিয়ে মনিহারিঘাটে ট্রেনে উঠবার সময়ে পুরো একটা কম্পার্টমেন্টে কেবল বাঙালি বোঝাই করেছিল। ওই রোগা চেহারা, কিন্তু অসামান্য তেজ। দরজা জুড়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে মূর্তিমান দাঁড়িয়ে পথ আটকে ছিল মামা। কেউ উঠতে গেলেই প্রশ্ন—আপনি বাঙালি? 'না' বললে হটো, 'হ্যাঁ' বললে ওঠো। মনোরমের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে, সে যে মামার কাঠগোলায় কাজ পেয়েছে, তা ভাগ্নে বলে ততটা নয়, যতটা বাঙালি বলে।

—তোর কত টাকা বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে বলছিলি? মামা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

—পাঁচ মাস।

—তাতে কত দাঁড়াচ্ছে?

—দুশো কুড়ি টাকা মাসে।

—এগারো শো?

—ও-রকম। তবে আপাতত অর্ধেকটা দিয়ে দিলে একটা আপস করে নেওয়া যায়।

—তা তুই ওখানে আছিস কেন এখনও? আমার বাড়িতে নীচের তলায় অনেকগুলো ঘর ফাঁকা।

—কেন, ফাঁকা কেন? বাঙালি ভাড়াটে পাচ্ছ না?

—তা নয়। আগের ভাড়াটেরা এমনই গোলমাল ঝগড়াঝাঁটি পাকিয়েছিল যে সেই থেকে তোর মামির হার্ট খারাপ। ভাড়াটে বসাব না। প্রেস্টিজে না লাগলে চলে আয়।

—দেখি।

—দেখি কী? ভারী মালপত্রগুলো বেচে দে। একটা চৌকি আর দু-চারটে বাক্স হলেই তো তোর ঢের। একা মানুষ। আবার যদি কখনও সংসার-টংসার করিস তো সে তখন দেখা যাবে।

মনোরম উত্তর দেয় না।

—কী হে? ইচ্ছে নেই? তোর মামি একটু কচালে মানুষ বটে, কিন্তু লোক খারাপ নয়। বড় জোর তোর বউয়ের ব্যাপারে দু-চারটে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করবে। তার বেশি কিছু না। একটা ঘরে পড়ে থাকবি নীচের তলায়, কেউ ডিসটার্ব করবে না। ছেলেটা তো মানুষ না, মডার্ন বাঙালি। পোশাক বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাবা মরলে গদিতে বসবে। মাথায় কোনও আদর্শ-ফাদর্শ নেই। খেলে বেড়ায়, জলসায় সিনেমায় যায়। তুই থাকলে তবু...

মামা চুপ করে কী একটু ভাবে। বলে—প্রেস্টিজে লাগলে গোলায় থাকতে পারিস। অফিস ঘরখানায় একজন অনায়াসে থাকতে পারে। অবাঙালিরা কত কষ্ট করে কলকাতায় থাকে। এক পশ্চিমা পানওয়ালাকে দেখেছিলাম, হ্যারিসন রোডে মোট বারো ইঞ্চি ডেপথের একটা খোঁদল ভাড়া নিতে পেরেছিল। দেয়ালের গায়ে সেই খোঁদলে কাঠ-ফাট লাগিয়ে ওপরে দোকান, নীচে গেরস্থালি। রাতে ফুটপাথে রান্না করে খেত, শোয়ার সময়ে সেই বারো ইঞ্চি জায়গায় কাত হয়ে শুয়ে সামনে কাঠের তক্তা

লাগিয়ে নিত পড়ে যাওয়ার ভয়ে। ওই ভাবে দোতলা বাড়ি করেছিল। তো তুই কেন একা মানুষ দু' ঘরের অত ভাড়ার ফ্লাটে খামোখা থাকবি? টাকা নষ্ট। অন্য কারণেও ওই বাড়ি তোর ছাড়া উচিত।

—কেন?

—ওখানে থাকলেই পুরনো কথা মনে পড়বে, আর হা-হুতাশ করবি। বউমার কোনও খবর পাস?

—না।

মামা একটা শ্বাস ফেলে বলে—বউ নিয়ে ভাবতে হবে, এ আমরা কখনও কল্পনাও করিনি। আমাদের ধারণা ছিল, বিয়ে হলেই বউ আত্মীয় হয়ে গেল, এক মরা ছাড়া আর কোনও ছাড়ান কাটান নেই। গায়ের চামড়ার মতো হয়ে গেল। পাত কুড়িয়ে খায়, হামলে পড়ে সংসার করে, উচ্চুঙ্গে ঝগড়া করে, আবার মায়ের মতো ভালবাসে। বউ চলে যাবে, এ আবার কী কথা রে বাঙালির বাচ্চা?

দু-চার জায়গায় ঘুরে কাঠগোলায় ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল। মামার ছেলে বীরু বসে আছে। বাপের মতোই লম্বা তবে অতটা সুড়ুঙ্গে রোগা নয়। খেলাধুলো করে বলে ফিট চেহারা। মায়াদয়াহীন মুখ। মুখে হাসি নেই। গরম বলে জামা খুলে স্যান্ডো গেঞ্জি, ফুলপ্যান্ট পরে বসে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছে। একমাত্র বংশধর আর গম্ভীর প্রকৃতির বলে মামা ছেলেকে বড্ড ভয় পায়। ছেলেতে বাপেতে বড় একটা কথাবার্তা নেই। বীরুর নিজস্ব একটা ফিয়াট গাড়ি আছে, যেটা নিয়ে মাঝে মাঝে কয়েক দিনের জন্য হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যায়। সে যাই করুক, ছেলেটির হিসেবি বুদ্ধি প্রখর। আর একটা প্রখর জিনিস হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। কর্মচারীরা মামাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা ভক্তি করে, আবার মামার কাজে ফাঁকিও দেয়, চেয়েচিন্তে পাওনার বেশি টাকা আদায়ও করে। আর বীরুকে পায় ভয়।

মনোরমকে কী চোখে বীরু দেখে তা কে জানে। মনোরম তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। মনোরম যে বেশিদিন মামার কাঠগোলায় আড়াইশো টাকায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারি করবে না, এটা বীরু বোধহয় জানে। কাজেই সে মনোরমের প্রতি মনোযোগ দেয় না। কথাবার্তা হয়ই না বলতে গেলে। তারা যে মামাতো পিসতুতো ভাই, এ সম্পর্কটা বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই।

সামনের চালাঘরটাই আসলে অফিস। বুড়ো মানুষ ভূপতিচরণ ক্যাশ আগলে বসে থাকে। সামনে পিছনে কাঠ আর কাঠ। দাঁড় করানো, শোয়ানো তক্তা, বিম, টুকরো-টাকরা কাঠের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। চালা পেরিয়ে অফিসঘর। নামে মাত্র অফিসঘর, ওটা আসলে মামার জিরোবার জায়গা। ওপরে টিন, কাঠের বেড়া। একটা মজবুত চওড়া বেঞ্চ, তাতে ডানলোপিলোর গদি পাতা, তোয়ালে ঢাকা বালিশ। প্রথম স্ট্রোকের পর এ সব ব্যবস্থা হয়েছে। পিছনে করাতকল থেকে ঘষটানো আওয়াজ আসছে। মিহিন, মিষ্টি শব্দটা মনোরমের বড় ভাল লাগে। ঘুম পেয়ে যায়!

মামা ভূপতিচরণের দিকে একবার তাকায়, ভূপতিচরণ হতাশার ভঙ্গিতে মাথাটা হেলায়। ইঙ্গিতটা মনোরম বুঝে গেছে আজকাল। তার মানে বীরু ক্যাশ থেকে আজও টাকা নিয়েছে। মামা ভিতরের ঘরে ঢুকে যাওয়ার আগে একবার মুখ ফিরিয়ে বলে—ঝুমু, তুই একটু ক্যাশ-এ বোস। ভূপতির সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

মনোরমকে ক্যাশ বুঝিয়ে দিয়ে ভূপতিচরণ উঠে গেল। মনোরম বসল। মুখোমুখি বীরু। ভ্রূ কুঁচকে ফ্ল্যাট ফাইল খুলে কাগজপত্র দেখছে। একটা চূড়ান্ত অগ্রাহ্যের ভাব তার ভঙ্গিতে। চোখ তুলে তাকাল না। ভিতরের ঘরে এখন বীরুকে নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে মামার আর ভূপতিচরণের মধ্যে। বীরু বোধ হয় সেটা জানে। কাগজ দেখতে দেখতেই তার মুখে একটা তাচ্ছিল্যের মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সেই ও বুঝে গেছে, পৃথিবীটা ওর একার।

কপাল। মামার ছেলেটা এ রকম না হলে মনোরম চাকরিটা পেত না। সীতা চলে যাওয়ার পর তখনই একটা চাকরি না হলে মনোরমের চলছিল না। ল্যাং ল্যাং করে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছিল মনোরম। সেই সময়ে একদিন গ্র্যান্ড হোটেলের উল্টোদিকে পার্ক করা গাড়িগুলো আস্তে, ধীরে হেঁটে হেঁটে দেখছিল সে। গাড়ি দেখা তার একটা পাস্টাইম। জেফির, অস্টিন, কেমব্রিজ, হিলম্যান, প্যাকার্ড কত গাড়ি! দেখে দেখে ফুরোয় না। দেখতে দেখতে প্রতিটি মেকারের গাড়ি তার চেনা হয়ে গেছে। যে কোনও ছুটন্ত গাড়ি দূর থেকেই দেখে সে বলে দিতে পারে কোন মেকারের। নতুন কোনও গাড়ি কলকাতায় এসেছে কিনা তা দেখার জন্যই সে পার্কিং লট-এ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঠিক সে সময়ে একটা

ভোঁতা মুখ, বৈশিষ্ট্যহীন দিশি গাড়ির ভিতর থেকে মামা ডাকল—ঝুমু।

চাকরি হয়ে গেল।'আত্মীয়তা ঝরে গিয়েছিল অনেক আগেই। মা মারা গেছে বছর পনেরো, তারপর থেকে আর তেমন দেখাশুনা ছিল না। বড়লোক মামাকে এড়িয়েই চলত মনোরম বরাবর। কাজেই মামা যখন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াল এক ছুটির দুপুরে, তারপর বলল—'আমার কারখানায় ঢুকে পড়। কাজটাজ শেখ।' তখনই মনোরম বুঝে গিয়েছিল, এটা চাকরিই। মামা বস। তার আপত্তির কিছু ছিল না। ক'দিনের মধ্যেই সে বুঝে গিয়েছিল যে, সে আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-ট্যানেজার কিছু নয়। সর্বসাকুল্যে জনা ত্রিশেক মিস্তিরি, একজন ক্যাশিয়ার আর একজন ম্যানেজার নিয়ে কাঠের কারবার। কোম্পানি মামির নামে, ম্যানেজার মামা। আর কোনও স্টাফের দরকার হয় না। তবু মনোরমকে অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার করা হয়েছে কয়েকটি কারণে। প্রথমত প্রথম স্ট্রোকের পর মামা একা ঘোরাঘুরি করতে ভয় পায়। দু নম্বর, মনোরমের চোস্ত ইংরিজি বলা। আর একটা কারণ হল বীরু। মামার একমাত্র সন্তান, একটু বেশি বয়সে হয়েছিল।

মামা প্রায়ই বলে—বীরুর সঙ্গে তোর এখনও বন্ধুত্ব হয়নি ঝুমু?

—বন্ধুত্ব! একটু অবাক হয়ে মনোরম বলে—না তো! হওয়ার কথাও নয়।

—কেন?

—কী করে হবে? আমার ছত্রিশ, ওর বড় জোর তেইশ। তা ছাড়া...

—কী?

—বন্ধুত্বের দরকারই বা কী?

মামা শ্বাস ফেলে বলে—ঝুমু, তুই ওর সঙ্গে একটু কথা-টথা বলিস। আমি চাই ওর সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব হোক।

—এটাও কি চাকরির মধ্যে?

—তোর বড্ড খোঁচানো কথা। চাকরি আবার কী। মামাতো পিসতুতো ভাই তোরা, ভাবসাব থাকারই তো কথা!

—সব কিছু কি জোর করে হয়? বীরু অন্য ধরনের, আমি অন্য ধরনের।

—ও সব কোনও বাধা নয়। বন্ধুত্ব চাইলেই হয়।

—হয় না মামা।

—তুই তো খুব চালাক চতুর ছিলি বরাবর। তুই ঠিক পারবি।

মনোরম তখনই অবাক হয়েছিল। মামা স্পষ্টই চায় বীরুর সঙ্গে তাব মেলামেশা হোক।

আবার একদিন মামা প্রসঙ্গটা তোলে—ঝুমু, তুই যদি আমার ব্যবসাটা বুঝে নিতিস, তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। তুই শিখে নিয়ে ওকেও শেখাতে পারতিস।

—কার কথা বলছ?

—ওই হারামজাদা। ওকে আমি কিছু বুঝতে পারি না। কারবারটা আমার জলে যাবে।

—বীরুর কথা বলছ? ও খুব চালাক, চিন্তা কোরো না।

—চিন্তা করব না! বলিস কী?

—ও শিখে নেবে।

—অত সোজা নয় ঝুমু! এত ব্যাপারে ওর ইন্টারেস্ট ছড়ানো যে ও কনসেন্ট্রেট করতেই পারবে না। তাই তোকে বলি, তুই ওর সঙ্গে একটু মেলামেশা কর। ওকে একটু বোঝা। দ্যাখ যদি ফেরাতে পারিস। আলটিমেটলি আমি ম্যানেজারিটা তোকে দেব, বীরু থাকবে প্রপাইটার। তোর মামির সঙ্গে আমার কথা হয়ে আছে।

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন! ওকে একটু সময় দাও। বয়স হলে ও ব্যবসায় মন দেবে।

—ব্যস্ত হচ্ছি, আমার শরীরকে আমি ভয় পাই। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে, আবার কখন কী হয়ে যায়। ওর জন্য চিন্তা করে করে আমি আরও শেষ হয়ে যাচ্ছি।

—এত চিন্তার কী?

—মাসে দু-তিন হাজার টাকা ওর কীসে লাগে বল তো। কোথায় যায়, কী করে কিচ্ছু জানি না।

সেইজন্যই চাইছিলাম তুই একটু দ্যাখ। তোর সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি আছে, বহু লোক দেখেছিস, মিশেছিস। বীরুকে বুঝতে পারবি না?

মনোরম ব্যাপারটা সেই প্রথম গায়ে মাখে। মাসে দু-তিন হাজার টাকা একজন একা খরচ করে। আর সে নিজে ব্যাঙ্করাপ্ট। বীরুকে তখনই সে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিল।

মাসে থোক হাতখরচ পায়, তার ওপর মামিও কিছু লুকিয়ে দেয়। তবু বীরু এসে ক্যাশ থেকে টাকা নেয়। নির্দ্বিধায় নেয়, কারও কাছে জবাবদিহি করার কথা ভাবেই না। ছেলেটার এই দ্বিধাহীন ব্যবহারেই বোধহয় মামা ওকে ভয় পায়। চোখে চোখ রাখে না।

—নিচ্ছে নিক, টাকাটা তো শেষ পর্যন্ত ওরই। এ কথা একদিন বলেছিল মনোরম মামাকে।

—দ্যাখ ঝুমু, টাকা কারও নয়। যে রাখতে পারে তার লক্ষ্মী, যে ওড়ায় তার বালাই। এই বিতিকিচ্ছিরি চেহারার কাঠগোলার পেছনে কত লাখ টাকার কাজ হচ্ছে তা তো তুই বুঝিস। এত টাকা তো এমনি এমনি হয়নি। এর পেছনে আমার যেমন পরিশ্রম আছে, তেমনই আদর্শবোধও। বাঙালি ব্যবসা জানে না—এ অপবাদ আমি আমার জীবনে ঘুচিয়েছি। আর ওই হারামজাদা 'বাঙালি' কথাটার অর্থই জানে না, ব্যবসার 'ব' বোঝে না।

—তুমি বলো না ওকে।

—বলব! আমি? ও আমাকে বাড়ির চাকরবাকরের বেশি কিছু মনে করে নাকি? আমার পারসোনালিটি নেই, আমি জানি। পারসোনালিটি ব্যাপারটা হচ্ছে স্ট্রং লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস। আমি কী পছন্দ করি না, কী করি তা ওকে কোনওদিনই বোঝাতে পারিনি। ও যখন ছোট ছিল, তখন থেকেই ওর মুখের দিকে তাকালেই আমি বরাবর আত্মবিস্মৃত হয়েছি। অন্য ক্ষেত্রে আমার যাও-বা একটু ব্যক্তিত্ব আছে, ওর কাছে কিচ্ছু নেই। আমারই দোষ। কিন্তু এখন কিছু আর করার নেই। যদি তুই কিছু করতে পারিস।

—কী করব?

—আমার ধারণা, ও খুব সেফ লাইফ কাটায় না। ওকে ওয়াচ করা দরকার, গার্ড করাও দরকার। কোনদিন কী বিপদ ঘটাবে!

—কী বিপদ?

—কে জানে! আমি কী করে বলব? কিছুই জানি না, বলেছি তো। হঠাৎ তিন-চার দিনের জন্য না বলে উধাও হয়ে যায়। কখনও-সখনও একমাস, কোনও খবর পাই না। ভেবে ভেবে আমার একটা অসহ্য আতঙ্ক তৈরি হয়ে গেছে। কেবলই মনে হয়, শিগগিরই হঠাৎ একদিন ওর বদলে ওর ডেডবডি লোকে ধরাধরি করে বয়ে এনে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে...দুর্গা, দুর্গা...এ সব মনে হয় বলেই আমার স্ট্রোকটা হয়েছিল।

মনোরম বুঝতে পেরেছিল, তার দায়িত্ব বাড়ছে। একটা শ্বাস ফেলে বলল—তুমি আমাকে কী করতে বলো?

—তুই ওকে মাঝে মাঝে 'ফলো' কর।

—'ফলো'? মাই গু-উ-ডনেস!

—ঝুমু, ওকে ওয়াচ করা দরকার। অন্য উপায় নেই।

—'ফলো' করে কী করব?

—দেখবি ও কী করে। যদি বিপদে পড়ে তো সামলাস।

—আমি?

—নয় কেন?

—আমি পারব না মামা।

—কেন?

—আমি ঠিক...ঠিক সুস্থ নই। সেই অ্যাকসিডেন্টের পর আমারও আর আত্মবিশ্বাস নেই। কী যেন একটা হারিয়ে গেছে। আমি ভয় পাই।

—তবে বীরুর কী হবে ঝুমু? আমার যে তুই-ই সবচেয়ে ভরসা ছিলি।

—ফলো-টলো করা খুব রিস্কি মামা। বীরু টের পেলে?

—বীরু টের পাবে? মামা চোখ বড় বড় করল।

—পাবে না?

—তুই কি ভাবিস বীরু চারপাশটাকে লক্ষ করে? করলে আমি ভাবতাম নাকি? ও যখন গাড়ি চালায় তখন উন্মাদের মতো চালায়, আগুপিছু কিছু লক্ষ করে না। কারও তোয়াক্কা নেই, লক্ষ করবে কেন? তুই আমার গাড়িটা নিয়ে সেফলি ফলো করতে পারিস, ও কখনও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবেই না। গাড়ির নম্বর-প্লেট তো দূরের কথা, আস্ত গাড়িটাকেই ও নজর করবে না। আমি ওকে ফলো করে দেখেছি ঝুমু।

—করেছ?

—করেছি। কিন্তু পারি না। অত জোরে গাড়ি চালানোর নার্ভ আমার নেই। তা ছাড়া আফটার অল আমার ছেলে, তার সব কিছু ওয়াচ করতে আমার সংকোচ হয়। তোর তো তা নয়।

মনোরমের এই প্রথম মামার জন্য কষ্ট হয়েছিল খুব। যে লোকটা মনিহারিঘাটে একবার কামরার দরজা আটকে কেবল বাঙালি তুলেছিল গাড়িতে, তার সেই তেজ-টেজ বীরুর কাছে এসে কোথায় মিলিয়ে গেছে। নব্বই পারসেন্ট বাঙালির চাকরির জন্য যে লোকটা সব লড়াই করতে প্রস্তুত তার এ কেমন ব্যক্তিগত পরাজয়!

মনোরম নিমরাজি হয়েছিল। কাঠগোলায় বসে থাকার চেয়ে বরং একটু খোলা-আলো-বাতাসে একা একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া, ব্যাপারটা ভাবতে ভালই।

একদিন বীরু ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সামনেই দাঁড়ানো ওর ফিয়াটখানা। উঠল। গাড়িটা ছাড়তেই, মামা ভিতরঘর থেকে বেরিয়ে এসে চেঁচাল—ঝুমু, ফলো হিম! এই যে গাড়ির চাবি...মামা ছুড়ে দিয়েছিল চাবিটা।

মনোরম লুফে নিল। দৌড়ে গিয়ে মামার গাড়িটায় উঠে পড়ল। তখন উত্তেজনায় তার শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। বুকে স্কুটারের শব্দের মতো হুড়হুড় শব্দ। মামার ভোঁতা মুখওলা দিশি গাড়িটা ছাড়ল মনোরম। এবং বুঝতে পারল এ গাড়ি নিয়ে বীরুর বিদেশি ফিয়াট গাড়িটার পিছু নেওয়া বেশ শক্ত। তার ওপর বীরু তার ফিয়াট গাড়ির ইঞ্জিন মেকানিক দিয়ে হট্-আপ করিয়ে নিয়েছে। স্পিডের জন্য।

লেকের ভিতর দিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউ হয়ে যাচ্ছে গাড়িখানা। ভোঁতা-মুখ দেশি গাড়িটায় বসে দাঁতে দাঁত চাপল মনোরম। জিভটা তখন ধড়াধড় ধাক্কা দিচ্ছে বন্ধ দাঁতে। ঘামছিল মনোরম। গাড়ির গতি বাড়তেই মনে পড়ল সেই দুর্ঘটনা...ছুটন্ত ট্রেন তার লাইন ছেড়ে অসহায় মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছে—লোভী, কাণ্ডজ্ঞানহীন, লুঠেরা মানুষেরা ফিস-প্লেট খুলে রেখেছিল, অপেক্ষা করছিল অন্ধকারে...একটা প্রলয় ঝড়ের মধ্যে ট্রেনের কামরার নিরাপদ প্রথম শ্রেণীর বার্থসুদ্ধ মনোরম হঠাৎ এরোপ্লেনের মতো উড়ে যাচ্ছিল। অন্ধকার হয়ে গেল মাথা। আবার ফিরে এল আলো। ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে বীরুর ফিয়াট।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল মনোরম। দাঁতে দাঁত চেপে ভেবেছিল—নো মোর স্পিড ফর মি। আমি এখন একটা স্লো-মোশান ম্যান। জোকার।

মামা হতাশ হয়নি। বলেছিল—লেগে থাক। তুই-ই পারবি।

প্রথম প্রথম কয়েকবারই ব্যর্থ হল মনোরম। অলীক ছায়াছবির মতো মিলিয়ে যায় বীরু আর তার ফিয়াট। কলকাতার ভিড়ে ঠিক জাদুকরের মতো বীরু তার অদৃশ্য রাস্তা করে নেয়। মনোরম হতাশ হয়। এক রাতে স্বপ্ন দেখল, বীরু তার গাড়ি নিয়ে আশি-নব্বই মাইল বেগে ছুটছে একটা দেয়ালের দিকে, সুইসাইড করবে। মামার দিশি গাড়িখানা ঝকাং ঝকাং করে মুড়ির টিনের শব্দ করতে করতে চলেছে। গাড়ির রেডিয়োতে মামার আকুল স্বর শোনা যাচ্ছে—ঝুমু, ওকে বাঁচা, ঝুমু-উ—। কিন্তু গাড়ি চলছে না। স্বপ্নের মধ্যেই ইডিও-মোটর অ্যাকশন হচ্ছিল মনোরমের। বীরুর গাড়িটা দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়ছে...ঠিক এই অবস্থায় ঘুম ভেঙে দেখল মনোরম, তার হাত দুটো সামনে বাড়ানো, একটা পা তোলা। স্বপ্নের মধ্যে সে চিৎকার করেছিল, সেই চিৎকারের শব্দ এখনও তার কানে লেগে আছে। যেন বা নিজের স্বপ্নের চিৎকারেই তার ঘুম ভেঙেছে।

মামার কিছু টাকা খরচ হল। মেকানিক দিয়ে পুরনো গাড়িখানা একটু 'হট-আপ' করাতে হল।

মেকানিক বলল—দিশি মেশিন, খুব বেশি স্পিড তুলবে না।

তারপর একদিন প্রাণপাত করল মনোরম। গাড়ি চালানোর অভ্যাস গেছে বহুদিন। গ্রেবালদের মোটর ট্রেনিং স্কুলে শিখেছিল। আশা ছিল, নিজের গাড়ি হবে একদিন। হয়নি। কাজেই অভ্যাসে মরচে পড়ে গেছে। তার ওপর দুর্ঘটনার স্মৃতি, ইডিও-মোটর অ্যাকশন, নড়ন্ত জিভ, সীতা। এতগুলো বাধা তার সব গতি কেড়ে নিচ্ছে আস্তে আস্তে। তবু সে একদিন বীরুকে ধরল এক দুপুরে। মামাদের বাড়ির সামনে থেকেই ফিয়াটখানা ছাড়ল। দশ গজ দূরে মনোরম মামার গাড়ির হুইলের পিছনে প্রকাণ্ড গোগো চশমা পরে বসে। গাড়িটা চলেছিল সেদিন। মনোরমের বুকে স্কুটার ডেকেছিল, মনে পড়েছিল সেই দুর্ঘটনা, জিভ নড়েছিল, সীতার জন্য দুঃখিত ছিল হৃদয়। ঘেমে নেয়ে গিয়েছিল সে। বীরুর মায়াবী ফিয়াট মুহূর্তে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। একটু অবহেলায় কাত হয়ে বসেছে বীরু, ডান হাতে আলতো ছুঁয়ে রেখেছে হুইল, ঠোঁটে সিগারেট। চেষ্টাহীন সেই চালানো। বিদেশি মসৃণ গাড়িখানা সিল্কের অলীক রাস্তায় পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছনে দিশি গাড়িখানায় মনোরমের শ্বাস গাঢ় ও দ্রুত হয়ে উঠছে তখন, ধোঁয়াচ্ছে গোঙানো ইঞ্জিন, ঘাম, স্বপ্ন ও স্মৃতির কুয়াশায় আচ্ছন্ন সম্মুখ। সে কী প্রাণপণে দিক ঠিক রেখেছিল মনোরম। ইনট্যুইশনের ওপর ভর করে বাঁক নিয়েছিল, কারণ বীরু হারিয়ে যাচ্ছিল প্রায়ই। এসপ্ল্যানেডেই যাচ্ছে বীরু—এই আন্দাজে চালিয়ে অবশেষে লেনিন সরণির মোড়ে ট্রাফিকে সে বীরুর গাড়ির দশখানা গাড়ির পিছনে থামল।

সেদিন বীরু খুব বেশি দূর যায়নি। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ে ঢুকে একটা চওড়া সম্ভ্রান্ত গলিতে গাড়ি দাঁড় করাল। অবহেলার ভঙ্গিতে নামল, দরজা লক না করে এবং গাড়িটার দিকে একবারও পিছু ফিরে না তাকিয়ে ঢুকে গেল একটা মস্ত দোকানে। ধীরে ধীরে দিশি গাড়িটাকে দোকানের সামনে আনল মনোরম। দেখল, রেডিয়ো আর গ্রামোফোনের খুব বড় দোকান। সামনে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত কাচ লাগানো দুটো শো-কেসে অজস্র রেডিয়ো, গ্রামোফোনের ডিসপ্লে। ঠিক গোয়েন্দার মতো সতর্ক চোখে তাকিয়ে রইল মনোরম। বাইরে দিনের আলো। কাচের গায়ে নানা রকম প্রতিবিম্ব পড়েছে। ওই সব প্রতিবিম্বের জন্য ভিতরটা ভাল দেখা যায় না। তবু প্রাণপণে লক্ষ করল মনোরম। ভিতরের মৃদু আলোয় দেখল, দোকানের ভিতরে আর একটা কাচের পার্টিশন আছে। সেই পার্টিশনের কাচের পাল্লা ঠেলে বীরুর লম্বা চেহারাটা ভিতরে ঢুকে গেল। ঝাঁয়-ঝিক ঝাঁয়-ঝিক ঝাঁয়-ঝিক করে একটা পপ মিউজিক বাজছে ভিতরে। রক্ত গরম করা বাদ্যযন্ত্র। শুনলেই হাত-পা নাচের জন্য দামাল হয়ে ওঠে। কাচের পাল্লাটা খুললেই গাঁক গাঁক করে শব্দটা বেরিয়ে আসছে। পাল্লাটা বন্ধ হলেই শব্দ মৃদু হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অবিরল শব্দটা হয়েই চলেছে।

মনোরম অনেকক্ষণ বসে সিগারেট পোড়াল। তারপর বীরু বেরিয়ে এল। একটা ধৈর্যহীন চাপা উত্তেজনাময় চেহারা তার, অসুখী, অতৃপ্ত। তার পিছনে কয়েকজন লোক ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এল একটা দামি সুন্দর স্টিরিও সিস্টেম। সেই জিনিসটা গাড়ির পিছনে তুলে আবার গাড়ি ছাড়ে বীরু। মনোরমের আবার সেই প্রাণান্তকর পিছু-নেওয়া। রিচি রোডের একটা চমৎকার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, তেমনি লক না করে, পিছু না ফিরে ঢুকে গেল ভিতরে। একটু পরে দুজন দারোয়ান-চেহারার লোক এসে দুটো বাক্সের মতো স্পিকার আর রেকর্ড প্লেয়ার সহ স্টিরিওটা নামিয়ে নিয়ে গেল। ধৈর্যশীল মনোরম ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইল। বীরুর গাড়িটা হিম হতে লাগল। মনোরম দু'বার পেচ্ছাপ করল, প্রায় দেড় প্যাকেট সিগারেট খেয়ে ফেলল। অনেক রাতে নেমে এল বীরু। শিস দিচ্ছে, একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বোধহয় কিছুটা মদ খেয়েছে। গাড়িতে উঠে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ঘুমের ঝিমুনি এসে গিয়েছিল মনোরমের। চটকা ভেঙে সোজা হয়ে বসল। রাত হয়ে গেছে। এত রাতে পিছু নিলে বীরু টের পাবে। ভাবল মনোরম। কিন্তু বীরু কিছু লক্ষ করেছে বলে মনে হল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়িটা ছাড়ল। তেমন স্পিড দিল না এবার। আস্তে ধীরে বাড়ি ফিরে গেল। বীরু বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পর মনোরম দিশি গাড়িটা গ্যারেজে তুলে মামার দারোয়ানের হাতে চাবি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল। সেই রাতে সাফল্যের আনন্দে তার ভাল ঘুম হয়।

পরদিন মামা সব শুনে ভ্রূ কুঁচকে বলল—অ্যাপার্টমেন্ট হাউস? ওখানে ও করে কী?

—কে জানে। চেনাশোনা কেউ থাকতে পারে।

—ভাড়া দেয়নি তো?
—কে জানে।
—খোঁজ নে।
—আমি কি ডিটেকটিভ হয়ে যাচ্ছি মামা?
মামা চিন্তিত মুখ তুলে বলেছিল—তোকে এর জন্য না হয় কিছু বেশি টাকা দেব। ওকে দেখিস ঝুমু।
দেখেছে মনোরম। খোঁজ নিয়ে জেনেছে, অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটায় আটশো টাকা ভাড়ায় একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে বীরু। মাঝে মাঝে থাকে সেখানে। তার বেশি কিছু জানা যায়নি। মনোরম অনেক ভেবেছে, বুঝতে পারেনি, কেন বীরু নিজেদের অমন প্রকাণ্ড বাড়ি থাকতে এবং সেখানে অতগুলো খালি ঘর থাকতে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করেছে। মামাও ভেবে পায়নি। দু'জনে চিন্তিতভাবে দু'জনের দিকে চেয়ে থেকেছে। মামা শ্বাস ফেলে বলেছে—ঝুমু, লক্ষ রাখিস। আমার একটাই সন্তান।
বীরুর কলেজের সামনেও অপেক্ষা করেছে মনোরম। বিশাল ইউনিভার্সিটি কলেজ। অনেকগুলো বিল্ডিং, করিডোর, মাঠ, ছেলেমেয়ে, ঠিক থৈ পাওয়া মুশকিল। তবু মনোরম ঘাপটি মেরে ঘুরেছে কলেজের মাঠে, করিডোরে, দালানে। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, বীরু তাকে লক্ষ করেনি। এক দঙ্গল মেয়ের সাথে করিডোরে প্রায়ই আড্ডা দেয় বীরু। সকলের প্রতি সমান মনোযোগ। ক্ষতিকর কিছু নয়, একদিন শুধু কলেজ ভেঙে যাওয়ার পর মনোরম দেখেছিল, একটা ফাঁকা ক্লাশঘরের দরজার চৌকাঠে বীরু দাঁড়িয়ে। লম্বা শরীরটা ঝুঁকে আছে, দরজায় কাঠের ওপর হাত তুলে ভর রেখেছে শরীরের। ওর দীর্ঘ শরীরের আড়ালে একটা চৌখশ, সুন্দর, প্রায় কিশোরী মেয়ে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে। মেয়েটির বয়স এত কম, মুখে এমন একটা নিষ্পাপ ভাব যে, সহজেই যে কেউ প্রেমে পড়তে পারে। মনোরম দেখছিল, বীরু কথা বলতে বলতে ডান হাতে মেয়েটির বাঁ বগলের শর্ট স্লিভসের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে কাতুকুতু দিচ্ছে। মেয়েটি হেসে বলছে—যাঃ, রীতা এ কথা বলতেই পারে না।
—সত্যিই বলেছে, গৌরী প্রেগন্যান্ট।
—রীতাটা মিথ্যুক।
—তা হলে সত্যিটা কী? তুমি প্রেগন্যান্ট নও?
—যাঃ! বলে মেয়েটি একটুমাত্র লাজুক ভাব করে খিলখিল হাসল। বলল—একদম ফ্রি আছি বাবা। ভয় নেই।
এইটুকু শুনেছিল মনোরম, সেদিন। ধৈর্যহীন, অতৃপ্ত যুবা বীরু চট করে হাতের ভরটা তুলে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, চলি।
মামাকে এটা জানানো যায় না। জানায়নি সে। বীরু যে ওই মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করছে না, সেটা বোঝা গেল আর একদিন। অপরাহ্ণের ফাঁকা ক্লাশঘরে বসে সে অন্য এক মেয়ের সাথে দ্বৈত রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিল। একটা উঁচু ডেস্কের দু'ধারে দু'জন, ডেস্কের ওপর নামানো মাথা, থুঁতনিতে থুঁতনি ঠেকে আছে। অনুচ্চ স্বরে, আবেগভরে এবং সুন্দর গলায় দু'জনে গাইছিল—অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ...সারাক্ষণই গানের মধ্যে তারা পরস্পরকে চুম্বন করছিল। দেখে ভারী উত্তেজিত হয়েছিল মনোরম। আগের দিনের সেই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তা হলে বীরু প্রেম করছে না? কেন করছে না? কী সুন্দর মেয়ে, অনায়াসে মিস ক্যালকাটা জিতে যেতে পারে, অমন সুন্দর মেয়ে বীরু পাবে কোথায়! মেয়েটা ইচ্ছে করলে মনোরমকে সীতার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারে, আর বীরু ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। হায় ঈশ্বর! প্রেম করবি না তো ওর বগলে তুই কেন হাত দিলি বীরু। কেন জিজ্ঞেস করলি, ও প্রেগন্যান্ট কিনা। ঠাট্টা নয় তো? ঠাট্টা। এরকম ঠাট্টা কোনও মেয়েকে করা যায়, আর এরকম ঠাট্টা শুনে কোনও মেয়ে হাসে, মনোরম জানত না। মাথা গরম হয়ে গেল মনোরমের। তার সামনে একটা উত্তেজক নতুন জগতের ছবি ফুটে উঠেছিল।
দক্ষিণ কলকাতার একটা নামকরা গানের স্কুল থেকে একদিন চমৎকার শরীরওলা একটি মেয়েকে গাড়িতে তুলল বীরু। মনোরমের দিশি গাড়িটা প্রায় বীরুর ফিয়াটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালায়। ইচ্ছে করলে ওভারটেকও করতে পারে। মনোরম লক্ষ করে, মেয়েটার নিজের প্রকাণ্ড একখানা হাম্বার গাড়ি আছে। বীরুর গাড়িতে ওঠার আগে মেয়েটি নিজের গাড়ির ড্রাইভারকে গিয়ে নিচু স্বরে কী বলল,

গাড়িটা চলে গেল। মেয়েটা জিভ দিয়ে ওপর ঠোঁট চেটে বীরুর পাশে উঠে বসল, খোঁপা ঠিক করল। সহজ ভঙ্গি, বীরু তাকে নিয়ে এল তার অ্যাপার্টমেন্টে। দু'জনে নেমে এগিয়ে গিয়েছিল, মেয়েটা হঠাৎ থেমে বলল—ওই যাঃ! ব্যাগটা ফেলে এসেছি।

—তাতে কী হয়েছে?

—দাঁড়াও না, নিয়ে আসি। ব্যাগটা না থাকলে বড্ড হেলপলেস লাগে।

দৌড়ে গাড়ির সিট থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে মেয়েটা বীরুর সঙ্গে বাড়িটায় ঢুকে গেল।

মাঝে মধ্যেই এটা হতে থাকে। মনোরম একান্তভাবে পিছু নেয়। এবং লক্ষ করে, মেয়েটার স্বভাবই হচ্ছে ব্যাগ ফেলে যাওয়া। ক'দিনই মেয়েটা ব্যাগ ফেলে গেল। দু-একবার মনে পড়তে ফিরে এল। অন্য কয়েকবার ব্যাগটা পড়েই রইল গাড়িতে। ওরা বাড়ি থেকে বেরোত অন্তত তিন-চার ঘণ্টা পরে। ওরা কী করে এতক্ষণ তা জলের মতো পরিষ্কার। অথচ মেয়েটা ভাড়াটে মেয়েমানুষ নয়। তার গাড়ি আছে, যে স্কুলে সে গান শেখে তা খুবই উঁচু জাতের, চেহারা বড়ঘরের মেয়ের মতো। তবে কি বীরু প্রেম করছে অবশেষে? মনোরম দিশি গাড়িটায় বসে ভাবত আর ঘামত।

সাহস বেড়েছিল মনোরমের। কৌতূহলও। মেয়েটা প্রায়ই ব্যাগ ফেলে যায়। একদিন মনোরম থাকতে না পেরে নেমে আসে। চারদিক চেয়ে দেখে। কেউ লক্ষ করে না। সোজা গিয়ে বীরুর লক-না-করা গাড়ির দরজা খুলে গাড়ির ভিতরে ঢোকে। তুঁতে রঙের ব্যাগটা পড়ে আছে অবহেলায়। সে খোলে। প্রথমে কিছু সাধারণ জিনিস পায়। আইব্রো পেনসিল, লিপস্টিক, পাউডারের কেস, ফাউন্ডেশন, ক্লিপ, রাংতার প্যাকেট মাথা ধরার বড়ি, কয়েকটা ট্র্যাংকুলাইজার ট্যাবলেট এবং তারপরই বেরিয়ে আসে কন্ট্রাসেপটিভ ট্যাবলেটের একটা প্রায় খালি প্যাকেট। একুশটা ট্যাবলেট থাকে। তার মধ্যে মোটে দুটো অবশিষ্ট আছে। মনোরম সভয়ে নেমে আসে। দিশি গাড়িটায় বসে ক্রমান্বয়ে সিগারেট খায়।

গত শীতে পাঁচটা টেস্ট খেলাই দেখল বীরু। বাইরের টেস্ট খেলা দেখতে প্লেনে যাতায়াত করল কানপুর, মাদ্রাজ, দিল্লি, আর বম্বে। এলাহি টাকার কারবার। ক'জন ভারতীয় পাঁচটা টেস্ট খেলা দেখার ঝুঁকি নিতে পারে মনোরমের হিসেবে আসে না। শেষে টেস্ট খেলা দেখে ফেরার সময়ে একটা সিন্ধি টিন-এজারকে পেয়ে গেল বীরু। ভারী সুন্দর, উগ্র এবং ছটফটে মেয়েটি। এক ঝলকে মেমসাহেব বললে ভুল হয়। পিঙ্গল চুল, মিনি স্কার্ট আর খয়েরি চোখের তারা। দমদমে বীরুকে আনতে গিয়েছিল মনোরম। মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল বীরু। মেয়েটির সঙ্গে তার বাবা ছিল। অ্যারিস্টোক্র্যাট চেহারা। বোঝা গেল মেয়েটির দানাপানির অভাব নেই। তিন-চার দিন পরেই বীরু তার অ্যাপার্টমেন্টে এনে তুলল তাকে। মেয়েটি খুব হাসছিল, মুখচোখ ঝলমল করছে খুশিতে। মনোরম বুঝতে পারে, এই মেয়েটিও জানে বীরু তাকে কোথায় নিয়ে যাবে এবং সেখানে কী হবে। জেনেও বিন্দুমাত্র ভয় নেই। মনোরম হাই তোলে। তার বিস্ময়বোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কিছুদিনেই মনোরম বুঝতে পারে, বীরু তার আটশো টাকার অ্যাপার্টমেন্টের চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করে। এবং কোনও মেয়েই বেশ্যা নয়। বাছাই, চমৎকার মেয়ে সব। কেউই রোগা বা মোটা নয়, গরিবঘরের নয়, হাঘরে নয়, বীরুর চেয়েও ঢের বড়লোকের বাড়ির মেয়েও আছে তার মধ্যে। এবং কারও সঙ্গেই বীরুর প্রেম নেই। এক একদিন এক দঙ্গল পুরুষ আর মেয়ে বন্ধু নিয়েও ও ঢুকে যায় অ্যাপার্টমেন্টে। ক্রমশ সাহসী মনোরম দিশি গাড়ি ছেড়ে ঢুকে পড়ে বাড়িটায়। লিফটে উঠে আসে ওপরে। মোজেইক মেঝের ওপরে নিঃশব্দে হেঁটে এসে বীরুর চমৎকার অ্যাপার্টমেন্টের ফ্লাশ-ডোরে কান রেখে শোনে ভিতরে ঝিক-ঝাঁই ঝিক-ঝাই ইও ইও ইও ইও টিরিকিটি টিরিকিটি টিরিকিটি ঝাঁই এরকম সব অদ্ভুত শব্দে স্টিরিও বাজছে। ঝনাৎ করে পড়ে ভেঙে গেল মদের গেলাশ। উদ্দণ্ড নাচের শব্দ। হো-হো চিৎকার। কণ্টকিত হয়েছে মনোরম। হঠাৎ দরজা খুলে ঢুকে যেতে ইচ্ছে হয়েছে উদ্দাম আনন্দিত ঘরখানার মধ্যে। পাপ হবে না, কেউ দোষ দেখবে না। ঢুকবে?

তক্ষুনি নড়ন্ত জিভটাকে টের পেয়েছে সে। মনে পড়ে সেই দুর্ঘটনা। মনে পড়ে বয়স, সীতা। ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। নিঃশব্দে নেমে এসেছে মনোরম। দিশি গাড়িটায় বসে সিগারেট টেনেছে।

ছেলেটার কোন ক্লান্তি নেই। সারা শীতকাল একনাগাড়ে টেনিস খেলল একটা ক্লাবে। একটু দূর থেকে, পার্কের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মনোরম দেখে গেল টেনিস বলের এ কোর্ট থেকে ও কোর্ট যাতায়াত, আর পফ পফ শব্দ শুনল। ফার্স্ট ডিভিশন লিগে খেলে গেল ক্রিকেট। গ্রীষ্মে একটা দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাবে খোলা মাঠে জলে কাদায় ভূত হয়ে ফুটবল লাথিয়ে গেল। কোনও খেলাই খুব মন্দ খেলে না। কিন্তু কেমন একটু নিরাসক্ত উদাসীন ভাব। যেন কোনও কিছুতেই গা নেই।

ও কি নিরাসক্ত, সন্ন্যাসী? না কি পাষণ্ড?

ইউ এস আই এস-এর সামনে ছাত্রদের একটা র‍্যালি ছিল, ভিয়েতনামের যুদ্ধের প্রতিবাদে। সেদিন একটা হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনের মাউথপিস মুখের কাছে টেনে বীরু বক্তৃতা করল। প্রথমে ধীরে ধীরে ভিয়েতনামের যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করল, মার্কিন ভূমিকার পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিল, সিয়াটোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করল, প্রসঙ্গত ইয়োরোপ এবং এশিয়ায় মার্কিন দুমুখো নীতির চমৎকার সমালোচনা করল, সমাজতন্ত্র কী এবং সমগ্র এশিয়ার অর্থনৈতিক মুক্তি কী ভাবে আসবে তা বলে গেল বিশুদ্ধ বাংলায়। বলতে বলতে থেমে গেল না, কিন্তু ভাবতে ভাবতে বলল, থেমে থেমে। ঝোড়ো আবেগ নেই, কিন্তু নিবেদনটি ভারী আন্তরিক। ও যে এত ভাল বাংলা জানে কে জানত তা? কিংবা রাজনীতির এত খবর রাখে, জানে ভূগোল ইতিহাস? দাঁড়াল ঠিক তরুণ এক বিদ্রোহীর মতো। এত সুন্দর ভঙ্গিটি!

সব রকমের জুয়া খেলে বীরু। সাট্টা থেকে ঘোড়দৌড়। ঘোড়দৌড়ের মাঠে একদিন মুখোমুখি পড়ে গেল মনোরম। অবিরল হারছিল বীরু। মুখে একটু বিরক্তির চিহ্ন দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু হতাশা বা ভেঙে-পড়া ভাব ছিল না। রেজাল্ট ওঠা মাত্র হাতের টিকিট দুমড়ে ফেলে দিচ্ছিল। আবার লম্বা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল কাউন্টারের দিকে। বীরু কিছুই দেখে না—এই বিশ্বাসে মনোরম সেদিন তেমন আড়াল হয়নি। খোলাখুলি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘোড়াদের স্টার্টিং পয়েন্টে হাঁটিয়ে নেওয়া হচ্ছে পঞ্চম রেস-এর আগে। রেলিং ধরে বীরু দাঁড়িয়ে ঘোড়া দেখল, তারপর হঠাৎ কাউন্টারে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াতেই মুখোমুখি।

একটু অবাক হল বীরু, সামান্য কৌতূহল দেখা গেল চোখে। ঘাবড়ে গেল না একটুও। বরং মনোরম ঘাবড়ে যাচ্ছিল।

বীরু একটু এগিয়ে এসে বলে—তুমি খেল?

—খেলি।

—দেখিনে তো কখনও!

—গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে আসি না তো!

—আমি তো দুই স্ট্যান্ডেই খেলি। বলে মিষ্টি করে হাসল। বলল—কী খেলছ এটায়?

—ঠিক করিনি।

—আমি 'ডাকু'র ওপর অনেক টাকা খেলছি, কিন্তু হবে না, দিনটা খারাপ। কুড়িটা জ্যাকপট মিলিয়ে রেখেছিলাম। সবক'টা গেছে ফিফ্‌থ রেস-এর মধ্যে।

—কত হেরেছিস?

—হাজারের ওপর তো বটেই। এখনও হিসেব করিনি। তুমি?

—গোটা পঞ্চাশ।

—মোটে? তুমি তো লাকি। আবার হাসল বীরু।

—আর খেলিস না।

—কেন? বীরু ভ্রূ তোলে।

—খামোকা খেলবি। এক একটা দিন অনেকে কেবল হারে।

—আমি রোজ হারি। হারজিত তো আছেই। তবে এ রেসটার পর কেটে পড়ব। ভাল লাগছে না।

—আমিও।

—কোথায় যাবে?

—ঠিক নেই। মামার কাছে যেতে পারি।

—ঠিক আছে। একসঙ্গে ফিরব। আমার গাড়ি নেই, গ্যারেজে দিয়েছি, ট্যাক্সিতে ফেরা যাবে।

সেটা জানত মনোরম। তাই একটু বিপদে পড়ল। তারও গাড়ি আছে। মামার দিশি গাড়িটা। বলল—আমার গাড়ি আছে।

অবাক হয়ে বীরু বলে—নিজের গাড়ি?

—না না, মামার গাড়িটাই। কয়েক ঘণ্টার জন্য চেয়ে এনেছি।

—বাবা দিল? কাউকে তো দেয় না।

—আমি তো বিজনেস টুর-এ আছি।

—তাই বলো। নইলে দিত না।

রেস-এর পর তারা গাড়িতে এসে উঠল। বীরু গাড়িতে বসে চারদিকে চেয়ে গাড়িটা একটু দেখে বলে—রদ্দি জিনিস।

—কী?

—এটা। গাড়িটা।

—দিশি মাল, আর কত ভাল হবে।

—তুমি তো ভালই চালাও।

—অভ্যেস।

—অভ্যেস কেন? বাবা তোমাকে দিয়েই সফারের কাজ করায় নাকি?

—না, তা নয়। স্ট্রোকের পর নিজে চালাতে ভরসা পায় না, আমিই চালাই।

—অঃ!

একটু চুপ।

—বাবা তোমাকে কত দেয়?

—দেয় কিছু। আমার চলে যায়।

—তোমার একটা বিজনেস ছিল না?

—ছিল। বেহাত হয়ে গেছে।

—শুনেছি, খুব রোজগার করতে?

—হত মন্দ না।

—তা হলে এখন চলে যাচ্ছে কী করে? বাবা বেশি দেওয়ার লোক নয়।

—একা মানুষ তো, চলে যায়।

—একা তো আমিও।

—তুই একা কেন? মামা মামি কি হিসেবের মধ্যে নয়?

—হলেও তারা ডিপেন্ডেন্ট তো নয়। বরং আমিই ডিপেন্ডেন্ট। একা আমারই তো কত খরচ! গাড়িটা বাঁয়ে ঘুরিয়ে নাও, সামনের রাস্তায়।

—কেন?

—আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে রিচি রোডে, যাব।

একটু চমকে গিয়েছিল মনোরম। ওর যে একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে সেটা জানতে মনোরমকে কত কষ্ট করতে হয়েছে; আর সেই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য খবরটা ও কত সহজেই দিয়ে দিচ্ছে নিজে। বিন্দুমাত্র গোপন করবার চেষ্টা নেই। একটু হতাশ হয় মনোরম।

মনোরম গাড়ি ঘোরাল।

—যাবে আমার অ্যাপার্টমেন্টে?

—সেখানে তুই কী করিস?

—অনেক কিছু। তবে বেশিরভাগ সময়ে বসে রেস্ট নিই, আর বই পড়ি। তুমি ড্রিঙ্ক করো?

—কী বলছিস?

—ড্রিঙ্ক করো তো?

একটু ভাবল মনোরম। বলল—করি।

—আমার ফ্ল্যাটে একটা ছোট্ট বার আছে। যাবে? রেস-এর পর তোমার টায়ার্ড লাগছে না?
—লাগছে।
—তা হলে চলো। ওল্ড স্মাগলার হুইস্কি খাওয়াব।
একটু চুপ।
—মামা জানে?
—কী?
—তোর যে একটা ফ্ল্যাট আছে!
—জানলে জানে। আমি তো লুকোইনি, আবার আগ বাড়িয়ে কিছু বলিওনি।
—বলিসনি কেন?
—ওটা আমার একার জায়গা। আমার মেয়েবন্ধুরা আসে। ছেলেবন্ধুরা আসে। গেট-টুগেদার হয়। নাচ-গানও হয়। বাবা মা জানলে ওখানে হানা দিতে থাকবে। ফ্ল্যাট নেওয়ার উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হবে তা হলে।
—আমাকে তবে নিচ্ছিস কেন?
বীরু হাসে, বলে—এমনিই। রেস-এর মাঠে তোমাকে দেখে খুব মায়া হল। ভারী ছন্নছাড়া দেখাচ্ছিল তোমাকে। ভাবলাম হঠাৎ বিপাকে পড়ে বাবার চাকরি করছ, নিশ্চয় তুমি খুব সুখে নেই। তাই ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একটু ড্রিঙ্ক করি।
মনোরম একটু হেসে বলল—তুই আমার ছোট ভাই, তা জানিস?
—সম্পর্কটা এখন খুঁচিয়ে তুলবে নাকি?
—না, না, এমনি বললাম।
—আত্মীয়তা ব্যাপারটা আমি দু' চোখে দেখতে পারি না। ওটার মধ্যে অনেক ভণ্ডামি আছে।
—কীরকম?
—আত্মীয় বলেই অনেকে অনেকের কাছ থেকে কিছু সম্মান বা সুবিধে পায়, যেটা তাদের পাওনা নয়। সম্মান বা সুবিধে পাওয়ার জন্য মিনিমাম কিছু যোগ্যতা থাকা দরকার। কেবল আত্মীয়তা কখনও সেই যোগ্যতা হতে পারে না। সেইজন্য আমি গুরুজনটন মানি না।
মনোরম বুঝেছে, মাথা নাড়ল।
বীরু কী সুন্দর নরম ব্যবহার করছিল সেদিন! ভাবা যায় না। বীরু যে এত নরম এবং বিষণ্ণ স্বরে কথা বলতে পারে, তা কে জানত?
গোপনে গোয়েন্দার মতো দিনের পর দিন যে ফ্ল্যাটটার ওপর নজর রাখত মনোরম সেই ফ্ল্যাটে সেদিন সে অনায়াসে ঢুকল।
ফ্ল্যাটটা ভালই। এ সব ফ্ল্যাট যেমন হয়, তেমনি। তিনখানা ঘর, ডাইনিং স্পেস-কাম-বৈঠকখানা, সবই আছে, কিন্তু আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই। একটা বেশ বড় খাট, তাতে ফোম রবারের গদি, গদির ওপর মণিপুরি চাদরে ঢাকা বিছানা কুঁচকে আছে। চেয়ার টেবিলগুলো দামি কিন্তু যেখানে সেখানে ছড়ানো, মেঝে ভর্তি সিগারেটের শেষ টুকরো সব পড়ে আছে, টেবিলের ওপর ডাব্বাই অ্যাশ-ট্রে উপচে পড়ছে ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি আর সিগারেটের টুকরোয়। মেঝের ওপর পড়ে আছে স্টিরিওটা। রেকর্ডের গাদা দুটো স্পিকারের ওপর রাখা। মেয়েলি হাতের স্পর্শ নেই। অজস্র বই চোখে পড়ে। সবই ইংরিজি। দর্শন, রাজনীতি থেকে ডিটেকটিভ বই পর্যন্ত। বৈঠকখানা ঘরের দেয়ালে বিল্ট-ইন ক্যাবিনেট খুলে গেলাস বের করে বীরু, আর হুইস্কির বোতল। বলে—ডাইলিউট করতে হলে ট্যাপ থেকে জল মিশিয়ে নাও। আমি নিট খাই, সোডা-ফোডার ঝামেলা নেই।
সন্ধে নাগাদ অনেকটাই মাতাল হয়ে গিয়েছিল মনোরম। কথা একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। পেটে পুরনো গ্যাসট্রিকের ব্যথা, খালি পেটে অ্যালকোহল পড়তে চিন চিন করে উঠছিল মাঝে মাঝে। ব্যথাটা কমাতেই বেশি খেল মনোরম।
—তোর মেয়ে-বন্ধুরা এখানে আসে?
—আসবে না কেন?

—একা?

—একাও।

আবার কিছুক্ষণ মদ খেল দু'জন।

—বীরু।

—উঁ।

—মেয়েবন্ধুদের মধ্যে কাকে তোর ভাল লাগে সবচেয়ে?

—সবাইকে। অদ্ভুত মদির হাসি হাসে বীরু, বলে—কে ভাল নয় বলো! মেয়েরা সবাই এত ভাল, এত সিমপ্যাথেটিক। আই লাভ দেম।

—কাউকে বেশি ভাল লাগে না?

—কাউকে অন্য কারও চেয়ে বেশি ভাল লাগতে পারে। তবে সকলেরই আলাদা রকমের ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আছে।

—ধর, কারও সঙ্গে প্রেম করিস না?

—প্রেমই তো। শুধু আন্ডারওয়্যার পরে বসে ছিল বীরু বেতের গোল চেয়ারে। লম্বা পা দুখানা সামনে ছড়ানো। এমনভাবে 'প্রেমই তো' বলল, যেন ভিয়েতনামে মার্কিন নীতির নিন্দে করছে।

—তোর গার্ল ফ্রেন্ডদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কে?

—কে সুন্দর নয়! হাসল বীরু—সবাই নিজের মতো করে সুন্দর। আমি একদম হারিয়ে যাই ওদের মধ্যে। আজকাল আমার এমন হয়েছে যে রাতে শুয়ে যদি কারও কথা ভাবি তা হলে ওর চোখ ওর মুখে এসে বসে, এর ঠোঁট তার মুখে চলে যায়। বিশেষ কাউকে মনে পড়ে না। সে এক ভারী ঝামেলা। শোওয়ার সময়ে বিশেষ একজনকে ভাবতে ইচ্ছে করে, পারি না।

—কাকে?

—রোজ তো একজনকে নয়!

—তোর বন্ধুদের মধ্যে একজন আছে না, গৌরী! মাতাল মনোরম বলে ফেলল।

একটু স্থির হয়ে যায় বীরু, তারপর বলে, জানলে কী করে?

মনোরম মনে মনে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু ফেরার উপায় নেই।

খুব চালাক হওয়ার চেষ্টা করে বলল—গৌরী তো কমন নাম! আন্দাজে টোপ ফেললাম একটা।

—আন্দাজে! বলে একটু হাসে বীরু, তারপর বিষণ্ণ মুখে বলে—আন্দাজে হলেও লাগিয়েছ ঠিক। গৌরী একজন আছে।

—সে আসে?

—আসবে কী, সে এখন নার্সিং হোমে।

—কেন?

—বড্ড বোকা মেয়ে। আজকাল কেউ যে অত বোকা আছে তা জানতাম না।

মনোরম ধৈর্যভরে পান করল আর একটুক্ষণ।

—কী হয়েছে?

—অ্যাকলেমশিয়া। তার ওপর ডানদিকটা পড়ে গেছে।

—সে সব তো বাচ্চা-টাচ্চা হলে হয়।

—তাই তো হয়েছে। প্রি-ম্যাচিওর বাচ্চা একটা।

—কী করে হল?

—যেমন করে হয়। আজকাল যে এমন বোকা মেয়ে আছে, কে জানত। প্রেগন্যান্সিটা কেবলই অস্বীকার করে যেত। অথচ আমরা জানতাম। আমার মতো ওর অনেক বিশ্বস্ত এবং সৎ বন্ধু ছিল। ও স্বীকার করলে আমরা খুব সেফলি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতাম, কেউ জানত না। ও লজ্জায় কোনওদিন স্বীকার করেনি।

—বাঁচবে?

—চান্স কম। প্রচুর হেমারেজ হয়েছে। 'কোমা'য় পড়ে আছে। কথা-টথা বলতে পারে না, জ্ঞানও ঠিক নেই। কাল থেকেই মনটা তাই খারাপ। মাঠ থেকেও সেজন্যই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

—তুই ওকে ভালবাসিস না বীরু?

—বাসি। বিশেষ করে আজ তো ওকেই ভালবাসছি। কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হওয়া তো ভালবাসাই, না?

—ও যদি বাঁচে?

—খুব ভাল হয় তা হলে। আমি একটা পার্টি দেব।

—বিয়ে করবি ওকে বীরু?

—বিয়ে? বীরু তাকায়। একটু ভাবে। তারপর বলে—ওকেই কেন করব?

—বড় ভাল দেখতে মেয়েটা।

—কোথায় দেখলে? একটুও বিস্মিত না হয়ে সাধারণভাবে প্রশ্ন করে বীরু।

—দেখেছি।

—হ্যাঁ, ভালই। বিয়ে ওকেও করতে পারি। কোনও প্রেজুডিস নেই।

—কে ওকে প্রেগন্যান্ট করল?

—কে জানে। যেই হোক, গৌরীর সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ওরই দোষ। মুঠো মুঠো ট্যাবলেট বাজারে বিক্রি হয়। কত মেয়ে নিজেরাই গিয়ে কেনে। ওরই কেবল লজ্জা আর লজ্জা।

—তুই ওকে বিয়ে করিস বীরু।

—আগে বাঁচুক তো! তুমি কি আরও খাবে? খেয়ো না। গাড়ি নিয়ে যাবে তো, না খাওয়াই ভাল। আমি আজ বাড়ি ফিরছি না। আর একটু খেয়ে পড়ে থাকব।

—বাড়িতে খবর দেব?

—না না, কোনও দরকার নেই। মাঝে মাঝে আমি ফিরি না, সবাই জানে। তুমি যাও।

শূন্য গেলাস রেখে মনোরম উঠে এসেছিল।

সেই একটা সুদিন এসেছিল। তার পরদিন থেকেই বীরু আবার আলাদা মানুষ। গ্রাহ্য করে না, তাকায় না। কথা তো নেই-ই, আবার একজন অচেনা মানুষ হয়ে যায় বীরু।

খুঁজে খুঁজে নার্সিং হোমটা বের করেছিল মনোরম। মেয়েটা বেঁচে গেছে। বীরু আবার গাড়ি দাবড়াচ্ছে। মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টে। ওর ঘরে উদ্দাম বেজে যাচ্ছে স্টিরিওতে নাচের বাজনা। মনোরমের কথা কি মনে রেখেছে বীরু? না ভুলে গেছে?

ও কি উদাসীন সন্ন্যাসী? ও কি পাষণ্ড? ওকে ঠিক বুঝতে পারে না মনোরম। একেই কি জেনারেশন গ্যাপ বলে? বীরুর পিছু নিতে নিতেই মনোরম তার পোশাক পালটে ফেলল। রাখল বড় চুল, জুলফি। দিশি গাড়িটা নিয়ে সে যেমন বীরুর ফিয়াটের সঙ্গে তার দূরত্বটা কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছে, তেমনি জেনারেশন গ্যাপটাও অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে।

সেই মায়াদয়াহীন মুখখানা! বীরু বসে আছে টেবিলের উল্টোদিকে। ফাইলপত্র ঘাঁটছে। মনোরম অস্বস্তির সঙ্গে চেয়ে ছিল।

ফাইলটা বন্ধ করে বীরু মুখ তুলল। হঠাৎ আতঙ্কিত আনন্দে মনোরম দেখে ও হাসছে।

—তোমার বউকে কাল দেখলাম।

—কে! কার কথা বলছিস?

—তোমার বউ সীতা।

সীতা! বউ! বউদি নয়? একটু অবাক হয় মনোরম।

—কোথায়?

—নিউ মার্কেটে। শি হ্যাড কোম্পানি।

—ওঃ! তোকে চিনল?

—এক-আধবারের দেখা, ঠিক চিনতে পারেনি। আমি চিনেছি। মেয়েদের মুখ আমার মনে থাকে।

—কথা-টথা বললি?

—হুঁ। সেইটেই একটা ভুল হয়ে গেল।

—ভুল?

—চিনতে পেরেই হঠাৎ 'বউদি' বলে ডেকে ফেলেছিলাম। খুব ঘাবড়ে গেল। তাই এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম। একটু কষ্টে চিনল। দু-চারটে কথাবার্তা হল।

—বউদি বলে ডাকলি?

—তবে কী বলে? বউদিই তো হয়! ছাই সেটাও একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল।

—কেন?

—সঙ্গে যে লোকটা ছিল, ওয়েলবিল্ট কেভম্যান, সে লোকটা আমার দিকে ভীষণভাবে চেয়ে রইল। আমি বউদির সঙ্গে কথা বলছি, আর লোকটা অপলক চেয়ে আছে, যেন খেয়ে ফেলবে। যখন চলে আসছি তখন লোকটা আমাকে ডাকল, একটু আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল—আপনি ওকে বউদি ডাকলেন, কিন্তু ও এখন কারও বউ নয়, জানেন? আমিও ভেবে দেখলাম কথাটা ঠিক। ক্ষমা-টমা চেয়ে নিলাম। ও নিজেই বলল—বরং ওকে নাম ধরে ডাকতে পারেন, কিংবা মিস সান্যাল বলে। আমি সেটাও মেনে নিলাম। চলে আসবার সময়ে তোমার এক্স-বউকে ডেকে বললাম—সীতা চলি।

মনোরম কিছু শুনছিল না। শুধু বলল—হুঁ।

—লোকটা রুস্তম টাইপের, আর খুব জেলাস। গায়ে অনেক মাংস, সাতটা বাঘে খেয়ে শেষ করতে পারে না।

কৌতুকভরে বীরু চেয়ে আছে মনোরমের মুখের দিকে। মনোরম মুখটা ফিরিয়ে নেয়। জিভটা সব সময়েই নড়ে, কিন্তু অভ্যাস বলে সব সময়ে মনোরম তা টের পায় না। এখন পেল। মুখের ভিতরে যেন একটা হৃৎপিণ্ড, অবিরল তার মৃদু শব্দ।

॥ চার ॥

দিন যায়। মাঝে মাঝে খুব মেঘ করে আসে। বৃষ্টি হয়। কখনও রোদ উঠে নীল জলের মতো আকাশ দেখা যায়। ঘরে ভাল লাগে না। স্পষ্টই বোঝে, বাড়িতে কুমারী-জীবনে যেমন ছিল সে, তেমনটি আর নেই। বিবাহিতা অবস্থায় যেমন ছিল, তেমনটাও নেই। দাদাই যা একটু সহজ। কিন্তু সীতার সঙ্গে দাদার দেখা হয় কতটুকু সময়! মক্কেল আর কোর্ট-কাছারি নিয়ে দাদা বড় ব্যস্ত।

মনোরম জামাই হিসেবে এ বাড়ির কারও পছন্দের ছিল না। তবু সবাই এক রকম তাকেই ছোট জামাই হিসেবে মেনে নিয়েছিল। সীতা ভুল করেছে, এ কথা সবাই বুঝত। সীতাও বুঝেছে, একটু দেরিতে।

বাবা ইদানীং কানে বড় কম শোনে। একটা যন্ত্র আছে কানে পরবার। তাতেও খুব একটা কাজ হয়নি। একটু চেঁচিয়ে বললে শোনে।

"মেয়ে, কখনও পরপুরুষের সঙ্গে একা রাস্তায় হেঁটো না।"

"মেয়ে, বাবা আর ভাই ছাড়া কোনও পুরুষের উপহার নিয়ো না।"

বিয়ের আগে এ সব কথা একটা ক্ষুদে বই থেকে বাবা তাকে মাঝে মাঝে পড়ে শোনাত। বইটার নাম ছিল, নারীর নীতি। উপদেশ দুটো সীতা মানেনি। শিমুলতলার প্রকৃতিতে কী একটা ছিল, মাদকতাময়, বাধা ছিন্ন করার নিমন্ত্রণ।

বিয়েটা পছন্দের না হোক, বাবা তবু বিয়ের পর সেই বইটা থেকেই আবার শোনাত—স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের বিশ্রামের জায়গা। যখন খেটেখুটে সে ফিরে আসবে, তখনই তাকে অভাব-অভিযোগের কথা বোলো না। তাকে সেবা দিয়ো, সুস্থ করে তুলো, তারপর মৃদু নম্র ভাবে যা বলার বলো। মনে রেখো, তুমি তাকে তোমার দিকে আকৃষ্ট করে রাখার চেষ্টা করলে সে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসবে। সার্থক হবে না সে। বরং তাকে আদর্শের দিকে ঠেলে দিয়ো, সে পৃথিবী জয় করবে...ইত্যাদি। বয়সে অনেক বড় ছিল মনোরম, সীতার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়। বাবাকে এ ব্যাপারটা খুব খুশি করেছিল, স্বামীর সঙ্গে বয়সের বেশি তফাত থাকাই নাকি ভাল, এগুলো মনে রাখার কথা নয়। সীতা রাখেনি। উপদেশ

হচ্ছে পেটেন্ট ওষুধের মতো। রোগ কী তা না জেনেই কিনে এনে খাও। সকলেরই তো একই রোগ নয়। বিশেষ অসুখের জন্য বিশেষ ওষুধ দরকার। তার জীবনে উপদেশটা ঠিক খাটেনি। তবু বিয়ের পর বহুকাল বাবা তাকে নারীর নীতি পড়ে শুনিয়েছে। মনোরমকে কোনও আদর্শের দিকেই ঠেলে দিতে পারেনি সীতা। তারা প্রেম করেছে, রতিক্রিয়া করেছে, খেয়েছে, ঘুরেছে। ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, আবার ভাবও। সন্দেহ এবং অবিশ্বাস এসেছে, আবার প্রেমও করেছে। এবং তারপর ক্লান্তি এসেছিল। এল নিস্পৃহতা। যত বয়স বাড়ছিল, ততই মনোরম পুরোপুরি বাধ্য পরিচারিকা তৈরি করতে চেয়েছিল সীতাকে। প্রেমের কথা, ভালবাসার স্পর্শ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অনেক সময়ে শরীর ঘাঁটত না একনাগাড়ে সপ্তাহভর। কেবল বুকের মাঝখানে কামগন্ধহীন মাথাটা এগিয়ে দিত। সীতা মাঝে মাঝে সে মাথাটা সন্তর্পণে বালিশে তুলে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছে। মানস এসে বসত বাইরের ঘরে। একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসত, কিন্তু তার হাসি, আন্তরিকতাময় কথাবার্তা শরীরের দূরত্বটুকু অতিক্রম করত অনায়াসে। কিন্তু এগুলো কারণ নয়। আসল কারণ ওই সন্দেহ। মাঝেমধ্যে একটা অস্পষ্ট যৌনঋণ-এর কথা উল্লেখ করতে থাকে মনোরম। ক্বচিৎ কদাচিৎ যখন তারা শরীরে শরীর মেলাত, তখন মনোরমের ছিল শ্বাসকষ্টের মতো দম ফেলতে ফেলতে ওই প্রশ্ন—বলো তো, আমি কে?

—তুমি! তুমি তো তুমিই! আবার কে?

—না, না, ঠিক করে বলো। ঠিক করে বলো। আমি কে?

—তা হলে জানি না।

—তা হলে আমি বলি?

—বলো।

—রাগ করবে না?

—কী এমন বলবে যে রাগ করব?

—আমি এখন—আমি বোধ হয়—মানস লাহিড়ি!

—কী বলছ?

—নই?

—তুমি অন্য লোক হতে যাবে কেন?

—আমি অন্য লোক নই। কিন্তু তুমি যাকে ভাব?

—ভাবব? ভাবব আবার কী? কেন ভাবব?

—আমি তো পুরনো হয়ে গেছি। আমি তো আর উত্তেজক নই। এই বয়সেই স্বামী-স্ত্রী অন্য মানুষকে ভাবতে শুরু করে।

স্তব্ধ হয়ে থেকেছে সীতা। বুকের ওপর মানুষ, কত কাছের মানুষ, তবু কী অস্বস্তিকর জটিলতা।

কোনওদিন বা সুখকর ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে—

—মানুষের মন, তার কোনও ছবি দেখা যায় না।

—কী বলছ?

—মানুষ মনে যে কে কাকে ভাবে!

সীতা ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে—স্পষ্ট করে বলো।

—আমি এখন তোমার মনের ভিতরটা দেখতে চাই।

—কেন?

—দেখতে চাই, সেখানে কে আছে!

—তুমি কি পাগল?

—কেন?

—তুমি আমাকে সন্দেহ কর?

মনোরম চুপ।

সীতা দু'হাতে মনোরমের বাহু খামচে ধরে বলেছে—বলো, সন্দেহ করার মতো তুমি কী দেখেছ! কী করেছি আমি?

—কিছু দেখিনি। শুধু দেখেছি, তোমরা বাইরের ঘরের টেবিলের দু'পাশে দুজন বসে আছ। তুমি উল বুনছ, মানস তোমার দিকে চেয়ে আছে। আর কিছু না।

—তবে?

—কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তোমাদের দু'জনের মাঝখানে একটা অদৃশ্য সার্কল। বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো কী একটা যাতায়াত করছে। একটা বলয়, সেটা শূন্য, অদৃশ্য, কিন্তু আছে। তোমরা ভালবাসার কথা বলো না। কিন্তু ও তোমাকে কমপ্লিমেন্ট দেয়, যা আমি আগে দিতাম তোমাকে, এখন আর দিতে পারি না। আমার স্টক ফুরিয়েছে। তোমাকে পেয়েছি যখন, তখনই হারিয়েছি। রহস্য শেষ হয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু ও নতুন, বাইরে থেকে এসেছে। ওর দেওয়ার আছে অনেক। তুমিও নিচ্ছ। জমে উঠছে ঋণ। সে ঋণ কী ভাবে শোধ হবে?

সীতা কেঁদেছে, না বুঝে।

মনোরম তবু বলেছে—সেই ঋণ শোধ হয় কল্পনায়। আমার শরীরে চলে আসে মানস লাহিড়ি।

কাঁদতে কাঁদতেও সীতা রেগে গিয়ে বলেছে—কল্পনা। সে তো তোমারই! তুমি মেয়েদের নিয়ে কল্পনা করতে না?

—এখনও করি। করি বলেই ধরতে পারি।

—না, আমি তোমার মতো স্বপ্ন দেখি না। আমার অত কল্পনাশক্তি নেই। কারও ধার আমি ধারি না।

এইভাবে মাঝরাতে উঠে তাদের ঝগড়া হত। প্রচণ্ড ঝগড়া।

মনোরম ভুল করেছিল তার নিজের কল্পনাশক্তিই খেয়ে ফেলেছে তাকে। নিজের দোষ সে সীতার ওপর আরোপ করতে শুরু করেছিল।

কিন্তু মানস আসত। উল বুনত সীতা। মানস বসে থাকত। না, দূরত্বটা কখনও অতিক্রম করত না মানস। তার আছে নিজেকে ধরে রাখার অমানুষিক ক্ষমতা। কিন্তু থেমে-থাকা স্টার্ট-দেওয়া মোটরগাড়ি যেমন কাঁপে, তেমনই কি কেঁপেছে মানস! বিবাহ-বিচ্ছেদের পরও সে সীতার শরীর আক্রমণ করেনি বহুদিন। অপেক্ষা করেছে। মাত্র সেদিন সে...

কিন্তু ঘুরেফিরে সেই মানসই এল। মনোরম ভুল বলেছিল বটে, তবু ভুলটাকে সত্যি করে দিল নাকি সীতা! এখন যদি মনোরম কখনও সামনে এসে দাঁড়ায়, যদি প্রশ্ন করে, তবে মূক হয়ে মাথা নত করে নেবে না কি সে?

বাবা সেই ক্ষুদে বইটা থেকে তাকে উপদেশ শুনিয়েছে কুমারী অবস্থায়। বিবাহিতা জীবনে। কিন্তু যখন এই তৃতীয় অবস্থায় সে ফিরে এসেছে বাপের বাড়িতে, তখন আর বাবা সেই ক্ষুদে বইটা পড়ে তাকে শোনায় না। বেশির ভাগ সময়েই কানের যন্ত্রটা বাবা আজকাল খুলে রাখে।

গোপন কোনও কথা বলতে হলে দাদা বাবাকে ছাদে নিয়ে যায়। সেখানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে। সীতা এবার এলেও দাদা ওরকমভাবে বাবাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়েছে। বাবা সীতাকে কিছু বলেনি। কেবল তাঁর দন্তহীন মুখে বার বার ঠোঁট জোড়া গিলে ফেলেছে বাবা। চারদিকে চেয়ে কী যেন খুঁজেছে। এ সময়ে বোধহয় মৃতা স্ত্রীকেই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল মানুষটার। ছেলেমেয়েদের কথা বাবা আর বুঝতে পারে না। স্ত্রী বেঁচে থাকলে একমাত্র তার কথাই মানুষটা বুঝতে পারত।

নীচে দাদার অফিসঘরে টেলিফোন আছে। ওপরের হলঘরে তার এক্সটেনশন। 'কল' এলে দুটো ফোনই বাজে। নিয়ম হল টেলিফোনে রিং হলে নীচে দাদা ধরে, ওপরে সীতা, বাবা কিংবা বউদি। দাদার কল হলে ছেড়ে দেয়, নিজেদের 'কল' হলে দাদা ছেড়ে দেয়।

সেদিন বউদি কালীঘাট গেছে, সীতা বাথরুমে। বাবা হলঘরে বসে কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ছে। সে সময়ে টেলিফোন বাজছিল। বাবা ধরল না। সীতার গায়ে তখন সাবান। সে চেঁচিয়ে বলল—বাবা,

ফোনটা ধরো। শোনার কথা নয় বাবার। বেজে বেজে টেলিফোন থেমে গেল। নীচে দাদা ধরেছে। একটু পরেই দাদা সিঁড়ির গোড়ায় এসে চেঁচিয়ে বলল—সীতা, ফোনটা ধর। তোর 'কল'।

কোনওক্রমে গায়ে কাপড় জড়িয়ে বেরিয়ে এসছিল সীতা। ফোন কানে নিল। কোনও শব্দ হল না। হ্যালো, হ্যালো, অনেকবার করল সে। কোনও উত্তর নেই। বোধহয় ছেড়ে দিয়েছে। ফোনটা রেখে দেওয়ার আগে তার অস্পষ্টভাবে মনে হল, ওপাশে যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের অস্ফুট আওয়াজ হল। ভ্রূ কোঁচকাল সীতা। ভুলই হবে। রেখে দিল। বাবাকে বলল—ফোনটা ধরনি কেন বাবা, দেখ তো লাইনটা কেটে গেল।

বলেই লক্ষ করল, বাবার কানে যন্ত্রটা নেই। বাবার ঘর থেকে যন্ত্রটা নিয়ে এল সীতা। বাবার কানে লাগাতে লাগাতে বলল—কেন যে যন্ত্রটা পরে থাক না।

বাবা হঠাৎ মুখ তুলে আঁতকে উঠে বলে—না, না! ওটা লাগাস না।

সীতা অবাক হয়ে বলল—কেন?

বাবা সীতার ঠোঁট নড়া দেখে বলে—ওটার আর দরকার নেই।

—বাঃ! তুমি যে এটা না হলে শুনতে পাও না!

বাবা চোখটা সরিয়ে নিয়ে বলে—অনেক শুনেছি। সারা জীবন। আর কিছু শুনতে চাই না। ঠাকুর করুন, যে ক'টা দিন বাঁচি, আর যেন কিছু শুনতে না হয়। এটা ফেলে দে।

এইভাবেই বাবা তার পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার জগতে চলে গেছে। স্বেচ্ছায় নির্বাসন। মাঝে মাঝে বাবার ঘরে যেতে ইচ্ছে করে সীতার। যায়। বাবা চোখ সরিয়ে নেয়। আর বারবার দন্তহীন মুখে নিজের ঠোঁটজোড়া গিলে ফেলতে থাকে। কচ্ছপের মুখের মতো। কথা বলে না। বলতে পারে না। বাঁধানো দাঁতের পাটিজোড়া বাবা ছেড়ে রেখেছে, খাওয়ার সময় ছাড়া পরে না। চশমাও খুলেই রেখে দেয় বেশির ভাগ সময়। একটু বুড়োটে, আর কুঁজো হয়ে বসে থাকে ঘরে। যেন বা নকল দাঁত, নকল চোখ, নকল কান, কিছুরই আর প্রয়োজন নেই বাবার। ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্যই—এরকম বিশ্বাসে সব নির্মোক ঝেড়ে ফেলে প্রতীক্ষায় বসে আছে বাবা। কীসের? এক পরিপূর্ণতম নিস্তব্ধতার? নিশ্ছিদ্র এক অন্ধকারের? অন্তহীন ঘুমের? বাবা কিছুই শোনে না। চারধারে এক নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ। সীতা মাঝে মাঝে যায়। বসে থাকে। ক্ষুদে বইটা থেকে উপদেশগুলো বাবা আর কোনওদিনই শোনাবে না, বুঝতে পারে। বাবার নিস্তব্ধতার কাছে ক্ষণেক বসে থাকে সে। ঠিক সহ্য করতে পারে না। অসহ্য হয়ে উঠে আসে।

নতুন কেনা একটা শাড়িতে 'ফলস' লাগাচ্ছিল সীতা। বউদি এসে একটু দাঁড়িয়ে দেখল।

—নতুন শাড়ি?

—হুঁ।

—কে দিল?

—কে দেবে? নিজেই কিনলাম।

—শাড়িটার অনেক দাম নিয়েছে?

—মন্দ না।

—আশি নব্বই?

—ওরকমই।

বউদি একটা শ্বাস ছাড়ে, বলে—ঠাকুরঝি, তোমার কত টাকা! তুমি কত স্বাধীন!

—তুমি কি গরিব? পরাধীন?

—তা নয়। তবে ইচ্ছেমতো কিছু কিনে আনব, তার তো উপায় নেই! যা করব, সব অনুমতি নিয়ে করতে হবে। তুমি বেশ আছ।

—এরকম 'বেশ' থাকতে চাও নাকি?

—চাই-ই তো।

—কেন?

—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সব সংসারটা হাটকে মাটকে দিয়ে চলে যাই। মেয়েমানুষ হওয়া একটা অভিশাপ।

—ওরকম সবাই বলে। আবার এ সব নিয়েই থাকে।

—তুমি তো থাকোনি।

সীতা দাঁতে ঠোঁট চাপে। আস্তে বলে—ও সব কথা থাক বউদি। তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

বউদি চলে গেলে অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে ফলসটার দিকে চেয়ে থাকে সীতা। ফুটপাতের দোকান থেকে কেনা ফলস মাপে অনেকটা ছোট হল, শাড়ির পুরো কুঁচিটা ঢাকা পড়বে না। খুব ঠকে সীতা। দেখেশুনে কেনে, তবু ঠিক ঠকে যায়। বরাবর। মনোরম খুব রাগ করত, বলত—মেয়েদের অভ্যাসই হচ্ছে সস্তা খোঁজা। সারা কলকাতা দু'নম্বর মালে ছেয়ে গেছে, আসল-নকল চিনবার উপায়ই নেই, কেন নিজে নিজে কিনতে যাও?

ফলসটায় ঠকে গেছে বলে সীতার মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। এতটাই খারাপ হল যে, উঠে বিছানায় গিয়ে শুল। এবং একটু পরে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে মনে মনে প্রাণপণে তার কান্নার গূঢ় কারণটাও বোধহয় খুঁজে দেখছিল। কারণটা খুঁজে পেল একটু পরে। বউদি একটা কথা বলেছিল—তোমার কত টাকা। তুমি কত স্বাধীন। কথাটার মধ্যে কিছু নেই। তবু আছে। মনোরমের সর্বস্ব কেড়ে না নিলেও পারত সে। বীরু সেদিন বলছিল, মনোরম তার কৃপণ মামার কাঠগোলায় চাকরি করছে। বীরু ছেলেটা মুখ-পলকা। হেসে বলেছিল—আমার বাবার কাছে কাজ করা মানে কিন্তু সুখে থাকা নয়। জানো তো। না জানলেও বোঝে সীতা। সুখে নেই।

মানস আবার কাল চলে যাবে দিল্লি। চার-পাঁচ দিন পরে ফিরবে ফোন করল দুপুরে।

—আজ বিকেলে ফ্রি থেকো মৌ।

—আমি তো সব সময়ে ফ্রি।

—একটু ঘুরব।

—আচ্ছা।

—দিল্লি যাচ্ছি।

—জানি তো।

—ভাল লাগে না।

সীতা হাসল। শব্দ করে। যাতে মানস ফোনে হাসিটা শোনে।

—বেশি দিন তো নয়।

—তা নয়। দুঃখিত গলায় মানস বলে—কিন্তু সারাজীবনই এরকম মাঝে মাঝে আমাকে চলে যেতে হবে। ছেড়ে থাকতে পারব তো?

সীতা শ্বাস ফেলল, এবং সেটাও শুনতে পেল মানস। আবেগের সঙ্গে বলল—মাঝে মাঝে তোমাকেও নিয়ে যাব।

—যেয়ো।

—আমি সেই ক্লাবটা থেকে ফোন করছি।

—কোন ক্লাব?

—সেই ক্লাবটা, যেখানে সেদিন...হাসিটা ফোনে শোনাল মানস।

সীতা একটু হাসল।

মানস বলল—ইচ্ছে করলে আজ আবার আমরা এখানে আসতে পারি।

সীতা উত্তর দিল না।

—রেডি থেকো। পাঁচটায়।

কথা শেষ হয়ে যায়। তবু একটু ফোন ধরে থাকে দু'জন। পরস্পরের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনে।

ফোনে শ্বাসের শব্দ শুনলে সীতার কেমন একটু অন্যমনস্কতা আসে। ক'দিন আগে একটা ফোন কল কেটে গিয়েছিল। কেটে গিয়েছিল? নাকি কেউ সত্যি ছিল ওপাশে? একটা অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনেছিল সীতা। ভুল? তাই হবে। কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে।

ফোন রেখে দেয়।

ছুটন্ত ট্যাক্সিতে বার বার সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করছিল মানস। হাওয়ায় দেশলাইয়ের কাঠি নিবে যাচ্ছে বার বাব। সীতা হাসছিল।

—ওভাবে নয়। হাত দুটো 'কাপ' করে নাও। সীতা বলে।

—কাপ? সেটাই তো হচ্ছে না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকছে।

—থাক, খেতে হবে না।

—খাবই। এই ড্রাইভার রোখ্‌কে।

ট্যাক্সি দাঁড়ালে সিগারেটটা ধরাতে চেষ্টা করে মানস। সীতা দেশলাই কেড়ে নেয়। নিজে যত্নে ধরিয়ে দেয়। ট্যাক্সি আবার চলে।

—কেন যে ছাই লোকে খায় এটা। কী আছে সিগারেটের মধ্যে?

বোধহয় ভালবাসা। মনে মনে এই কথা বলে সীতা। মুখ টিপে হাসে। দেখে, ধোঁয়া লেগে মানসের দুই হরিণ-চোখ ভরা জল।

—আর খেয়ো না।

—কেন?

—অভ্যেস নেই। কাশবে।

—আমার মুখে কি কোনও দুর্গন্ধ আছে সীতা?

—সীতা নয়, মৌ। তুমিই নাম দিয়েছিলে।

—সিগারেটের ধোঁয়ায় মাথা আবছা হয়ে গেছে। কিছু ভাবতে পারছি না। গন্ধ নেই তো?

—না তো! তোমার মুখের গন্ধ সুন্দর।

—তবে কেন সিগারেট খেতে বললে আমাকে?

—পুরুষেরা সিগারেট খায়, দেখতে আমার ভাল লাগে।

—শুধু দেখার জন্য একজনেব না-খাওয়ার অভ্যাস নষ্ট করছ?

—খেয়ো না।

—রাগ করে বলছ?

—না, আমার অত সহজে বাগ হয় না।

—সিগারেট তো আমি খাচ্ছিই। অভ্যাস করে নেব।

—না। মাঝে মাঝে খেয়ো। পুরুষের মুখ কাছাকাছি এলে একটুখানি সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যায়, সেটা ভীষণ ভাল লাগে।

—আচ্ছা। মনোরম খুব খেত না?

—খেত। কিন্তু তার সঙ্গে এটার কোনও সম্পর্ক নেই।

—জানি। সেদিনকার ওই লম্বা ছেলেটা কে?

—বীরু। আমার মামাশ্বশুরের ছেলে।

—তোমার মামাশ্বশুর? বলে মানস চেয়ে থাকে। খুব অবাক চোখ। সীতা অবাক হওয়ার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে বলে—কী হল?

—মামাশ্বশুরের ছেলে?

—হ্যাঁ। দেওর।

—কী বলছ মৌ?

হঠাৎ খেয়াল হতে সীতা জিভ কাটে। ঠিক তো। তার আর কোনও মামাশ্বশুর নেই, দেওর নেই।

মুখ নিচু করে একটু লাজুক ভঙ্গি করল সীতা।

—ভুল হয়ে গিয়েছিল।

মানসকে একটু পাঁশুটে দেখায়। সিগারেটটা আধখাওয়া করে ফেলে দিয়ে বলে—ঠিক আছে।

—না, ঠিক নেই। তুমি রাগ করেছ। সীতা একটু ঘন হয়ে বসে।

—রাগ করিনি। তবে কেমন একটু লাগে। তুমি ঠিক ভুলতে পারছ না।

—ভুলছি। এইমাত্র সব ভুলে গেলাম। দেখ, আর এরকম হবে না।

মানস একটু থমথমে মুখে বলে—ভুলবে কী করে, যদি কলকাতাময় মনোরমের আত্মীয়তা ছড়ানো থাকে!

—ওর বেশি আত্মীয় নেই।

—নেই?

—না। ওর বুড়ো বাবা—বলে তাকিয়ে একটু হাসে সীতা, বলে—দেখ, শ্বশুর বলিনি কিন্তু।

মানস হাসে।

—ওর বুড়ো বাবা ওর ছোটভাইয়ের কাছে থাকে দূরের এক মফস্বল শহরে। সে বাড়িতে আমি মোটে বার দুই গেছি। ও বেশি সম্পর্কও রাখত না। মা নেই। এখানে যারা আছে, তারা সব মামা, মাসি, পিসি গোছের। সে সব সম্পর্কও আলগা হয়ে গেছে।

—তোমাকে আমি খুব দূরে নিয়ে গিয়ে থাকব।

—কেন? ওর আত্মীয়দের ভয়ে?

—হুঁ। আমার রেলের চাকরি। ইচ্ছে করলেই বদলি হতে পারি।

—আমার কলকাতা ভাল লাগে।

—কেন?

—আমার লাগে। একটা শখ আছে আমার, ঘুরে ঘুরে এ-জায়গা সে-জায়গা থেকে জিনিসপত্র কেনা। কিনতে যে কী ভীষণ ভাল লাগে! কলকাতা ছাড়া এরকম দোকান আর দোকান তো কোথাও নেই!

—আচ্ছা, তা হলে কলকাতাতেই থাকব। ফ্ল্যাট তো পেয়েছিই।

—আমি কিন্তু খুব জিনিস কিনি, আর ঠকে আসি।

—কিনো।

—ঠকলে বকবে না তো?

—না। মেয়েরা তো ঠকেই। কলকাতায় এই যে এত দোকান, এত ফিরিঅলা, এরা তো মেয়েদের ঠকিয়েই বেঁচে আছে।

—তুমি কত মেয়ে চেনো!

—একজনকে তো চিনি। তাকে চিনলেই সব চেনা হয়ে যায়।

—আমি একটা গ্লাটন। সামনে আস্ত একটা মুরগির রোস্ট, নিচু হয়ে সেটার গন্ধ শুঁকে বলল মানস।

—গ্লাটন মানে কী?

—লোভী। পেটুক।

—যাঃ। তুমি কি তাই?

—নয়?

—একদম নয়। তোমার শরীর আন্দাজে ওইটুকু আবার খাওয়া নাকি! একটা তো এইটুকুন মাত্র মুরগি!

—আস্ত মুরগি।

—হোকগে।

—খাওয়া কমাব, বুঝলে মৌ?

—কেন?

—তুমি খাবে এইটুকুন, আমি খাব অ্যাতো, সেটা কি ভাল দেখাবে?

—মোটেই তুমি অ্যাতো খাও না।
—খাই।
—খাও তো খাও।
—তবে তুমি খাওয়া বাড়াও।
—মেয়েরা বেশি খেতে পারে না।
—কে বলেছে? এসপ্ল্যানেডে বিকেলের দিকে মেয়েরা যা গপাগপ ফুচকা খায় না, দারা সিং অত খেতে পারবে না।
সীতা মুখে আঁচল তুলে হাসল।
—তুমি খাও না বলেই রোগা হয়ে অ্যানিমিক।
—স্লিম থাকাই তো ভাল। মোটা মেয়েরা বেশি ভোগে। আমার কোনও অসুখ নেই।
—তোমার ঠিক অ্যানিমিয়া আছে। ডাক্তারের কাছে গেলেই ধরা পড়বে।
—থাকলে আছে।
—থাকবে কেন?
—থাকলে অপছন্দ নাকি? বিয়ে বাতিল করবে?
দু'জনে দু'পলক পরস্পরের দিকে চেয়ে থেকে হেসে ফেলে।
—আইসক্রিমটা নাড়াচাড়া করছ মৌ, খাচ্ছ না।
—ভীষণ ঠাণ্ডা, দাঁত শিরশির করে। গলা বসে যাবে।
—তবে পকৌড়া খাও।
—ভাল লাগছে না। তুমি খাও, আমি দেখি।
আস্তে ধীরে খাচ্ছিল মানস, মাঝে মাঝে তাকিয়ে হাসছিল। একদৃষ্টে চেয়েছিল সীতা। সুন্দর মেদহীন চৌকো পুরুষ মুখশ্রী। কাঁধ দুটো কতদূর ছড়ানো। মস্ত হাত। দেখতে ভাল লাগে। অনেকদিন ধরে দেখছে সীতা। তবু এ নতুন করে দেখা। এ ভাবে দেখা হয়নি। এই ডবলডেকারের মতো মানুষটার কাছে সে পাখির মতো ছোট্ট। বোধহয় মানসের মাথা কোনওদিনই বুকে নিতে হবে না সীতার। এবার উল্টো নিয়ম হবে। তাকেই পাখির মতো বুকে নিয়ে শুয়ে থাকবে লোকটা। সারা রাত।
হঠাৎ সীতা আস্তে করে বলে—তুমি স্বপ্ন দেখ না?
—স্বপ্ন? একটু হাঁ করে চেয়ে থাকে মানস। তারপর অনেকক্ষণ বাদে হাসে—স্বপ্ন, মৌ? না, দেখি না। আমি খুব সাউন্ড স্লিপার। কেন?
—এমনিই। অনেকে ঘুমের মধ্যে কথা বলে।
—আগে থেকে সাবধান হচ্ছ? ভয় নেই, ও সব হয় তাদের যারা স্নায়ুর রোগে ভোগে।
—তাই!
আবার চুপ। দুজনেই। সীতা সাদা আঙুলে কাচের টেবিলে একটা শূন্য আঁকল। তারপর মুখ তুলে হাসল।
ট্যাক্সিটা বাঁক ঘুরতেই অন্ধকারের মধ্যে স্টিমারের মতো ঝলমল করে ওঠে ক্লাব। চারধারে যেন বা কালো নদী। স্টিমার চলেছে।
গাছগাছালিতে বাতাস মর্মরধ্বনি তুলেছে। আলোকিত টেনিস লন। সাইটস্ক্রিনের আড়ালে বলে দেখা যায় না কিছু। হঠাৎ পক করে বলের শব্দ আসে।
আজও কেউ বড় একটা ফিরে তাকায় না। তারা সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। টেবল-টেনিসের টেবিলে খুব ভিড় আজ। বহু খেলোয়াড়। চারদিকে বেয়ারাদের দ্রুত আনাগোনা।
মানস মুখ ফিরিয়ে হাসল। বলল—আজ শনিবার।
—তাতে কী?
—ভিড়।
—ও।

—শনিবারে কলকাতার মানুষ পাগল হয়ে যায়।
—আমরাও কি শনিবারের পাগল?
—না। চিরকালের।
করিডোরে একজন লোক শ্লথ পায়ে আগে আগে হাঁটছিল। কথা শুনেই বোধহয় ফিরে তাকাল। অচেনা লোক। খুব ফরসা সুন্দর চেহারা, অবিকল সাহেবদের মতো। লালচে একজোড়া গোঁফ, লালচে চুল এলোমেলো হয়ে আছে মাথায়। মুখে সামান্য ক্লান্তির ছাপ। একটু হাসল কি লোকটা?
সীতা সিঁটিয়ে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, সে কিছু অন্যায় করছে না। সে কোনও অপরাধ করেনি।
পিঠে মানসের আলতো হাত তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিছু ভয় নেই।
ঘরটা খালিই ছিল। ঠিক আগের দিনের মতো। মানস দরজাটা আগেই বন্ধ করে দিল। ফিরে ইঙ্গিতময় হাসি হাসল একটু। ঠিক সেই মুহূর্তেই সীতার মনে পড়ে, ক'দিন আগে কেটে যাওয়া টেলিফোন কল। লাইনটা কি কেটে গিয়েছিল সত্যিই? না কি কেউ দীর্ঘশ্বাসই কেবল শুনিয়েছিল তাকে?
ভ্রূ আপনা থেকেই কুঁচকে গেল সীতার।
—কী হল? কিছু ভাবছ? মানস প্রশ্ন করে।
সীতা উত্তর দেয় না। শুনতেই পায় না প্রশ্নটা।
ঘরের একদিকে চমৎকার একটা পুরনো আমলের ড্রেসিং টেবিল। বেলজিয়ামের মসৃণ কাচ বসানো। সীতা ধীর পায়ে উঠে গিয়ে একটু দাঁড়াল আয়নার সামনে। অ্যানিমিক? বোধ হয়। তাকে খুব রোগা আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। মিছে কথা বলেছিল সীতা মানসকে। তার আজকাল খুব অম্বল হয়, মাথা ধরে। হয়তো খুব শিগগিরই অসুখ হবে। আমার অসুখ নেই, এ কথাটা খুব ভেবে বলেনি সে। একটু পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মানস। এতক্ষণে ওর পোশাকটা লক্ষ করেনি সীতা তেমন করে। খুব ঝকঝকে একটা চেক প্যান্ট পরনে, গায়ে সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি। বুকের চৌকো পাটা ফুটে আছে গেঞ্জির ওপর। বাঁ কাঁধটা ভাঙা, একটু নোয়ানো। খুবই বড় শক্তিমানের চেহারা। ওর পাশে সে কি আধখানা, না সিকিভাগ?
মানস এগিয়ে আসে।
সীতা আস্তে করে বলে—তোমাদের দু'জনের খুব অদ্ভুত মিল।
—কাদের দু'জনের কথা বলছ?
—তোমার আর ওর।
—ও কে?
—মনোরম।
—মিল?
—দুটো খুব অদ্ভুত মিল।
—কী?
—তোমাদের দুজনের নামই 'ম' দিয়ে শুরু। আর...
—আর?
—তোমাদের দুজনেরই একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।
মানস এগিয়ে এসেছিল অনেকটা, তবু দূরত্ব ছিল একটুখানি। সেই দূরত্বটা রয়েই গেল। মানসের মুখটা আস্তে আস্তে একটু গম্ভীর হয়ে যায়।
বলল—ম্লৌ, আমাকে তুমি সিগারেট খাওয়া শিখিয়েছ কেন?
—এমনিই। ভাল লাগে।
—না।
—তবে কেন? অবাক হয়ে প্রশ্ন করে সীতা।
—মনোরমের সঙ্গে আমার আরও মিল বের করতে।

—তার মানে?

—তুমি কি আমার মধ্যে মনোরমকেই চাও?

সীতা মূক হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

—ঝুমু, তুই বাসাটা ছেড়ে দে। আমার বাড়িতে চলে আয়। যা বাকি বকেয়া পড়েছে তা আমি দিয়ে দেব।

—কেন?

—ওয়াচ হিম। ওয়াচ হিজ স্টেপস।

—কোনও লাভ নেই।

—কেন?

—ওর ভিতরে কিছু সাহেবি ব্যাপার ঢুকে গেছে।

—সেটা কী?

—সব বুঝবার তোমার দরকার কী?

—আমার ছেলে, আর আমার বুঝবার দরকার নেই?

—জেনারেশন গ্যাপ বোঝো?

—বুঝব না কেন? বুঝি কিন্তু মানি না। ও সব বানানো কথা।

—হবে।

—ঝুমু, আমার কেবলই মনে হয় ও শিগগিরই নিজেকে শেষ করবে।

মনোরম চুপ করে থাকে।

—তুই সব সময়ে আমার আর ওর কাছাকাছি থাক ঝুমু।

—মানুষ তো আমি একটা, দু'জনের কাছে থাকব কী করে?

—সময় ভাগ করে নে। না, বরং তুই ওর কাছে কাছেই থাক। ওরই বিপদ বেশি।

—এ কথা বলছ কেন? কীসের বিপদ?

—ও তো কিছু বলে না, কিন্তু মনে হয়, ও একটা প্রবলেমের মধ্যে আছে।

—প্রবলেমের মধ্যে সবাই থাকে।

—কিন্তু বীরুর তো প্রবলেমের কোনও কারণ নেই। ভেবে পাই না, ওর প্রবলেমের কী থাকতে পারে। তাই মনে হয়, ওর বড় বিপদ।

বিপদ? না কিছুই খুঁজে পায় না, ভেবে পায় না মনোরম। ও খারাপ মেয়েমানুষের কাছে যায় না যে রোগ নিয়ে আসবে। ওর মেয়েবন্ধুরা অভিজাত পরিবারের। অবৈধ সন্তানের ভয় নেই, খোলা বাজারে বিক্রি হয় কন্ট্রাসেপটিভ। ওর প্রেমের কোনও ঝামেলা নেই, কারণ ঘুমের সময়ে ওর কারও মুখ মনে পড়ে না। জুয়ায় অনেক টাকা হেরে গেলেও ওর অনেক থাকবে।

প্রবলেমটা খুঁজে পায় না বটে মনোরম, কিন্তু খুঁজে ফেরে। দিশি গাড়িটা নিয়ে সে ক্লান্তিহীন ছোটে বীরুর পিছনে। বীরু মুহুর্মুহু পোশাক কেনে, কেনে গ্রামোফোনের উত্তেজক ডিস্ক, ভাল হোটেলে খায়, নাচে, খেলে বেড়ায় বড় ছোট ক্লাবে, সাঁতরায়, মেয়েদের নিয়ে যায় অ্যাপার্টমেন্টে, মনোরম সারা কলকাতা বীরুর ফিয়াটটাকে তাড়া করে ফেরে। বীরু বিতর্কসভায় বক্তৃতা করে, ভিয়েতনামে মার্কিন বোমারু বিমানের কাণ্ডকারখানার হুবহু বর্ণনা দেয়, লাইফ ম্যাগাজিনের পাতা খুলে জনসাধারণকে দেখায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মর্মন্তুদ ছবি। কিন্তু কোথাও থেমে নেই বীরু। চলছে। চলবে।

অনেক রাতে যখন বাসায় ফেরে মনোরম, তখন ক্লান্ত লাগে। বড় ক্লান্ত লাগে। রাতে সে প্রায় কিছুই খায় না। দুধে পাঁউরুটি ভিজিয়ে বিস্বাদ দলাগুলি গিলে ফেলে। দু' ঘরেই জ্বেলে দেয় টিউবলাইটগুলি। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়। মাঝে মাঝে ওপরের দিকে চেয়ে দেখে।

কী দেখে মনোরম? দেখে নীলচে স্বপ্নের আলো। জানালার বুটিদার পর্দাগুলি উড়ছে বাতাসে। ঠিক মনে হয়, ঘরের ভিতরে রয়েছে তার প্রিয় মেয়েমানুষটি। সে কে? রিনা? চপলা? না কি এক প্রাণহীন মেমসাহেব-পুতুল প্রাণ পেয়ে ঘুরছে তার শূন্য ঘরে? সীতা নয় তো?

রক্তমাংসময় একজনকেই পেয়েছিল মনোরম। সীতা। যতক্ষণ সিগারেট না শেষ হয়, ততক্ষণ রাস্তায় পায়চারি করে সে। কখনও দুটো-তিনটে সিগারেট ফুরিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলে মনোরম। কাল্পনিক কথা, এক কাল্পনিক স্ত্রীর সঙ্গে। মাঝে মাঝে হাঁটতে হাঁটতে থেমে যায়। কল্পনাটা এমনই সত্যের মতো জোরালো হয়ে ওঠে যে তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। গভীর রাতে নির্জন পূর্ণদাস রোডে কেউ তার সেই মূকাভিনয় দেখে না। দেখলে তারা দেখত, একজন প্রেমিক কেমন তার শূন্যনির্মিত নায়িকার সঙ্গে অবিকল আসল মানুষের মতো প্রেম করে।

রাত গভীর হলে সে তার ছয় বাই সাত খাটে গিয়ে শোয়। মস্ত খাট। বিছানাটা একটু স্যাঁতসেঁতে। ফুটপাথ থেকে দু' টাকা জমা রেখে আট আনা ভাড়ায় আনা ডিটেকটিভ বই খুলে বসে। হাই ওঠে। জল খায়। টেবিল ল্যাম্প নেবায়। শেষ সিগারেটটাকে পিষে মারে মেঝের ওপর। তারপর ঘুমোবার জন্য চোখ বোজে।

অমনি কল্পনায় ভিন্ন পৃথিবী জেগে উঠতে থাকে। শরীরের ভিতরে নিকষ কালো অন্ধকারে জ্বলে ওঠে নীল লাল স্বপ্নের আলো। অবিকল এক জনহীন প্রেক্ষাগৃহ। আসবাব টানাটানি করে কারা পর্দার ওপাশে মঞ্চে দৃশ্যপট সাজাচ্ছে। পরদা সরে যায়। দীর্ঘ পৈঠার মতো ইস্কুলবাড়ির কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তাতে তিনশো ছেলে দাঁড়িয়ে গায়—জয় জগদীশ হরে...

শূন্য বিছানায় তার প্রসারিত হাতখানা পড়ে থাকে। কিছুই স্পর্শ করে না।

সকাল দশটা থেকে কাঠগোলা। মাঝখানে একটু লাঞ্চ ব্রেক। মামাবাড়ি থেকে ভাত আসে। মামা-ভাগ্নে খায়। খেতে খেতে মামা বলে—ঝুমু, ওয়াচ হিম।

আজকাল বাঙালির কথা মামা ভুলে যাচ্ছে। নেতাজির কথাও। নিরুদ্দেশ সেই মানুষটিব জন্য আর অপেক্ষা করতে ভয় পায় মামা। ফার্স্ট স্ট্রোক হয়ে গেছে। বীরু থেকে যাচ্ছে বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে।

ফিস ফিস্ করে একটা লোক কানের কাছে বলে—ব্যানার্জি না?

তখন বীরু তার গাড়িটা রেখে দ্রুতবেগে ঢুকে যাচ্ছে স্টক এক্সচেঞ্জে। অনুসরণ করতে করতে বাধা পেয়ে মনোরম থেমে ফিরে তাকায়। চিনতে পারে না। মস্ত একটা কাঠামোয় নড়বড় করে দুলেদুলে মাংস আর চামড়ায়। চোখের নীচে কালি। ক্লান্ত মানুষ একটা।

টেলিফোনে যেমন শোনা যায় মানুষের গলা, তেমনি, ফিসফিসিয়ে বলে—বিসোয়াস্ হিযাব।

—বিশ্বাস! কী হয়েছে, চেনা যায় না?

—বলছি। খুব ব্যস্ত?

মনোরম মুখটা একটু বাঁকা করে হাসে—না। জাস্ট একজনকে চেজ করছিলাম।

—চেজ?

—অলমোস্ট ডিটেকশন জব। জিরো জিরো সেভেন।

—কাকে?

—এক বড়লোকের লক্কা ছেলেকে।

বিশ্বাস ক্ষীণ একটু হাসল—চা খাবেন?

—চা? বিশ্বাস, চায়ের কথা বলছেন? আপনাকে দেখেই একটা তেষ্টা পেয়েছিল, উবে গেল। অফ অল থিংস গরমের দুপুরে চা কেন?

—দি ওয়ার্ল্ড ইজ লস্ট ব্যানার্জি।

—কী হয়েছে?

—স্ট্রোক।

বিশ্বাস জোর করে চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। বসল দু'জন।

—স্ট্রোক? মনোরম বলে।

—স্ট্রোক।

—ব্যাপারটা কী রকম হয় বিশ্বাস?

—স্ট্যাবিং-এর মতো। বুকে। বিশ্বাস করবেন না। মনে হয় এতগুলো স্ট্যাবিং যদি বুকে হচ্ছেই, তবে মরছি না কেন?

—হুঁ?

—বিশ্বাস করবেন না। মৃত্যুযন্ত্রণা তবু মৃত্যু নয়। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তার ওপর ডায়েবেটিসটাও ধরে ফেলল এই বয়সে। হাঁটাচলা ছিল না তো, কেবল গাড়ি দাবড়াতাম। ব্যানার্জি, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

—শুনছি।

—আপনি একটা ওপেনিং চেয়েছিলেন। ম্যানেজারি করবেন?

—ম্যানেজারি, বিশ্বাস? এ নিয়ে গোটা দুই করেছি, কোনওটাতেই সুবিধে করতে পারিনি। আপনারটা থার্ড অফার।

—আমার ম্যানেজারিতে পারবেন। আমি বদ হলেও, কথা দিলে কথা রাখি।

—টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন?

—জানেন তো ব্যানার্জি, আমার বিজনেস খুব ক্লিন নয়। কিছু গোস্ট মানি খেলা করে। কাজেই—

—কী?

—ওয়াচ ইয়োর স্টেপস।

—সেই রসিদের বিজনেসটাও কি এর মধ্যে?

—এভরিথিং। আমার ব্যবসাগুলো ছোট, প্রত্যেকটার জন্য আলাদা ম্যানেজার রাখব কী করে? তবে টাকা দেব, ওভার অল প্রায় সাতশ। কিন্তু খুব সাবধানে হ্যান্ডেল করবেন। কী, রাজি?

—দেখি।

—দেখি-টেখি নয়। আমি লোক খুঁজছি কতদিন ধরে। আজই কথা দিয়ে দিন।

—বিশ্বাস, এখন আমি যে চাকরিটা করছি তাতে আমি টায়ার্ড, একটা অল্পবয়সি ছেলেকে দিনরাত চেজ করা. ওর মতো স্পিড আমার নেই, হাঁফিয়ে পড়ি।

—চেজ করেন কেন?

—ওয়াচ করার জন্য, যাতে সে বিপদে না পড়ে। বিপদ কিছু নেই, তবু তার বাবার ধারণা সে বিপদে পড়বেই। তাই।

—খুব ফাস্ট লাইফ লিড করে?

—খুব। আমার এমপ্লয়ারের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।

—আচ্ছা, কবে আসছেন?

—শিগগিরই।

—কিন্তু মনে রাখবেন, আমার ম্যানেজারি কিন্তু অন্ধকার জগতে। এভরিথিং ব্ল্যাক।

—জানি বিশ্বাস। চলি।

—শিগগিরই আসছেন?

—হুঁ।

মনোরম বিদায় নেয়।

আবার একদিন বীরুর পিছু নিয়ে সে এসে পড়ে সমীরের অফিসের সামনে। জোহানসন অ্যান্ড রো-র সাদা সম্ভ্রান্ত অফিস বাড়িটা। বীরুকে কলকাতার ভিড়ে হারিয়ে যেতে দিয়ে মনোরম গাড়ি পার্ক করে। নামে। আঙুলে গাড়ির চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে ঢুকে যায় ভিতরে।

সমীর ঠিক সেদিনের মতোই সুকুমার কোমল মুখশ্রী তুলে বলে—আরে মনোরম।

মনোরম হাসে—কী খবর?

—তোমার খবর কী?
—একরকম।
—বোসো। চা খাও।
—না। আমি কাজে আছি।
—বোসো, একটু কথা আছে।
—কী?
—সীতার সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছে।
—কীসের?
—তুমি তো জানই যে ও বিয়ে করছে।
—আন্দাজ করেছিলাম। মানসকে?
—মানসকে। সীতা চাইছে তোমার বিজনেস-টিজনেস যা আছে ওর নামে, সব তোমাকে ফিরিয়ে দেয়।
—ফিরিয়ে দেবে? তবে নিল কেন?
—মানুষ তো ভুল করেই! ও বলছিল, এ সব যতদিন না ফেরত দিচ্ছে, ততদিন ও তোমাকে ভুলতে পারছে না। কাজেই তোমাকে ও অনুরোধ জানাচ্ছে, তুমি নাও। অভিমান কোরো না।
মাথাটা নিচু হয়ে আসে মনোরমের। সে কাচের নীচে সেই ছবিটা দেখতে পায়। বনভূমি, তাতে শেষবেলার রাঙা রোদ, উপুড় হয়ে পড়ে আছে কয়েকটা গোরুর গাড়ি। আদিবাসী পুরুষ ও রমণীরা রাঁধছে।
সে মুখ তুলে বলল—এ সব জায়গায় আমি অনেকবার গেছি।
—কোন জায়গার কথা বলছ?
—এই যে ছবিতে। সাঁওতাল পরগনা, বিহার, উড়িষ্যায় এরকম সব অদ্ভুত বনে-জঙ্গলে আমি একসময়ে খুব ঘুরে বেড়াতাম।
সমীর করুণ চোখে চেয়ে থাকে।
—বিয়েটা কবে?
—ওরা খুব দেরি করবে না। মানস বোধহয় বদলি হয়ে যাচ্ছে আদ্রায়। বিয়ের পরেই সেখানে চলে যাবে। আমি সীতাকে কী বলব মনোরম? তুমি তো জানো, আমি কোনও ব্যাপারে নিজেকে জড়াই না। কিন্তু এ ব্যাপারটা নিয়ে সীতা এত কান্নাকাটি করেছিল যে, আমি কথা দিয়েছি তোমাকে কমিউনিকেট করব। তুমি না এলে আমিই যেতাম।
—কিছু ভাবিনি এখনও। দেখি।
—ও খুব শান্তিতে নেই।
মনোরম মনে মনে বলে—যতদিন পৃথিবীতে বনভূমি থাকবে, নদীর জলে শব্দ হবে, তত দিন ভুলবে না। জ্বলবে।
বিদায় না নিয়েই একটু অন্যমনস্কভাবে বেরিয়ে এল মনোরম।
ট্রাম কোম্পানির বুথ থেকে টেলিফোন করল সীতার বাড়িতে। রিং-এর শব্দ হচ্ছে। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে মনোরমের। সীতা কি কথা বলবে তার সঙ্গে? এরকম ঘটনা ঘটবে কি?
মেয়েলি মিষ্টি গলায় ভেসে আসে 'হ্যালো।'
—সীতা! দম বন্ধ হয়ে আসে মনোরমের। বুকে উতরোল ঢেউ।
—ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।
একটু পরে সীতা বলল—হ্যালো।
মনোরম কিছু বলতে পারে না প্রথমে।
সীতার গলাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে—কে?
মনোরম চোখ বুজে, আস্তে আস্তে বলে যায়—মেরিলি র‍্যাং দ্য বেল, অ্যান্ড দে ওয়্যার ওয়েড...
—কে? চিৎকার করে ওঠে সীতা।

মনোরম ফোন রেখে দেয়।
ডিভোর্সের পর এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে কবে। সময় কত তাড়াতাড়ি যায়।

সীতা সব ফিরিয়ে দিচ্ছে। খুশি হবারই কথা মনোরমের। মামার গাড়িটা নিয়ে বীরুকে তাড়া করতে করতে এক সময়ে ক্লান্তি লাগে তার। পিছু-নেওয়া ছেড়ে সে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় অন্য রাস্তায়। আপনমনে ঘুরে বেড়ায়।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে এল চাঁদনি চকে। তার দোকানটা এখানেই। নেমে সে দোকানঘরে উঠে এল। মনোরমের আমলে সাকুল্যে চারজন কর্মচারী ছিল। এখন বেড়েছে। পুরনোর কেউ নেই। চমৎকার সানমাইকা লাগানো কাউন্টার, দেয়াল ডিসটেম্পার করা, ডিসপ্লে বোর্ড, কাচের আলমারি। সীতার দাদা ব্যবসা ভালই বোঝে। অনেকটা বড় হয়েছে দোকান। রমরম্ করে চলছে। ভাল জামাকাপড় পরা একজন অল্পবয়সি ছোকরা কাউন্টারের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনোরমকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—বলুন।

মনোরম গ্রাহ্য করল না। চারদিকে চেয়ে দোকানঘরটা দেখল। দোকানের নাম এখনও এস ব্যানার্জি প্রাইভেট লিমিটেড। সীতা এখনও ব্যানার্জি নামে সই করে। আপনমনে একটু হাসে মনোরম। কাউন্টারের ছেলেরা চেয়ে থাকে।

বাইরে একটা টেম্পো থেমেছে। কুলিরা মাল তুলে দিয়ে যাচ্ছে দোকানে। ছেলেটা ওপাশটায় গেল।

একা দাঁড়িয়ে থাকে মনোরম। এই দোকান-টোকান সবই সে উপহার দিয়েছিল সীতাকে। কিছু আয়কর ফাঁকি দিয়েছিল বটে, তবু তার ব্যবসাটা ছিল পরিষ্কার, দাগহীন এবং সৎ। এ সব আবার তাকে ফিরিয়ে দিলে সীতা তাকে ভুলে যেতে পারবে। পারবে কি?

কেন ভুলতে দেবে মনোরম? দেবে না। সে ফিরিয়ে নেবে না কিছুই। বিছানায় যখন মানস ঝুঁকে পড়বে সীতার ওপর, একদিন চুপি চুপি ঠিক মানসের শরীরে ভর করবে মনোরম। ভূতের মতো। থাক। মনোরম কিছুই ফিরিয়ে নেবে না। তার চেয়ে সে বিশ্বাসের অন্ধকার, বিপজ্জনক ব্যবসায় নেমে যাবে।

একটু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বেরিয়ে এসে গাড়ি ছাড়ে সে। মনটা হঠাৎ ভাল লাগে। আজ সে সম্পূর্ণ দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিতে পারল।

সমীরকে ফোন করল সে।

—শুনুন, আমি বিজনেস ফেরত নেব না। কিছুই নেব না।

—কেন মনোরম?

—শুনুন, আপনি হয়তো ঠিক বুঝবেন না ব্যাপারটা। তবু বলছি। সীতা ব্যবসা কেড়ে নিয়ে আমার ক্ষতিই করতে চেয়েছিল। ম্যানেজারি থেকে বরখাস্ত করেছিল আমাকে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি। আমি মরে যাইনি। সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা মানুষের হয় তা টাকাপয়সার নয়, বিষয়-সম্পত্তিরও নয়। মানুষ হারায় তার সময়।

—কী বলছ, বুঝতে পারছি না।

—আমার হারিয়েছে, ক্ষতি হয়েছে কেবলমাত্র সময়ের। সীতা আমার বিজনেস ফিরিয়ে দিতে পারে, কিন্তু হারানো সময়টা কে ফিরিয়ে দেবে? এক বছরে আমার বয়স বেড়ে গেছে ঢের। কিছু শুরু করব আবার, তা হয় না। আমি পারব না। ওকে বলে দেবেন।

—তুমি আর একবার ভেবে দেখো।

—একবার কেন? আমি আরও বহুবার ভাবব, সারাজীবন ধরে। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। আমি আমার এক বন্ধুর ব্যবসায়ে নামছি। ব্যবসা বন্ধুর, আমি সেখানে চাকরি করব। অ্যান্ড দ্যাটস অল।

ফোনটা করে খুবই শান্তি পায় মনোরম।

—তুই আমাকে ছেড়ে যেতে চাস ঝুমু? মামা একদিন ক্লান্ত বিষণ্ন গলায় বলে। মামার রোগা

চেহারাটা আরও একটু ভেঙে গেছে। চোখের নীচে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম কালো রেখা সব ফুটে উঠেছে। সম্ভবত শিগগিরই আবার স্ট্রোক হবে মামার।

—বীরুর সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি কি পারি মামা? ওর কত কম বয়েস, কত স্পিড ওর। কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে বীরু! আমি কি পারি পাল্লা দিতে? আমার বয়সও হল।

—কিন্তু তুই-ই বীরুকে ফেরাতে পারিস। আমি দেখেছি ও তোর সঙ্গে কথা-টথা বলে, হাসে, ঠাট্টা করে। অবিশ্বাস্য। ও যে কারও সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে পারে তা জানতামই না। আমার বড় আশা ছিল, তুই কিছু একটা পারবি।

মনোরম একটু ভেবেচিন্তে বলে—মামা, বীরুর পিছু-নেওয়ার চাকরি একদিন তো শেষ হবেই। একদিন বীরু ঠিকই ব্যবসা-ট্যাবসা বুঝে নেবে। তখন আমার চাকরিও শেষ হয়ে যাবে।

—না। তোকে আমি ম্যানেজার করব।

—কেন করবে? আমি যে কাঠের কিছুই জানি না। কিছুই শিখলাম না। বীরু মালিক হলে যে আমাকে রাখবে তারও কিছু ঠিক নেই। বয়সও হয়ে যাবে ততদিনে। পথ বন্ধ হয়ে যাবে সব। তার চেয়ে এখনই আমাকে ছেড়ে দাও।

—যেখানে যাচ্ছিস সেখানেও তো চাকরিই করবি।

—প্রথমে তাই কথা ছিল। পরে আমি কষাকষি করে আমাকে ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে নিতে রাজি করিয়েছি। কমিশন পাব।

—কীরকম ব্যবসা?

—ব্ল্যাক। ভীষণ কালো। জাল-জোচ্চুরি-স্মাগলিং সবই আছে।

—যাবি?

—যাব না কেন? আমার এ বয়সে আর ভাল বা খারাপ কিছু হওয়ার নেই।

—যাবিই? বীরুর একটা কিছু ব্যবস্থা করে যা। ওকে ফেরা।

—কোথায় ফেরাব মামা? আমার তো ওকে কিছু শেখানোর নেই। ও আমার চেয়ে দশগুণ বেশি পড়াশুনো করেছে। অনেক বেশি বুদ্ধিমান। ভয়ংকর আত্মবিশ্বাসী। ওকে আমি কোথায় ফেরাব? ও আমাকে উড়িয়ে বেরিয়ে যাবে। বরং ও-ই আমাকে টেনে নিচ্ছে ওর দিকে। দেখো, এই বয়সে আমি লম্বা চুল আর জুলফি রাখছি, পরছি বেলবটমের সঙ্গে পাঞ্জাবি। আর কিছুদিন বীরুর পিছু নিলে আমিই বীরু হয়ে যাব।

—আর কিছুদিন থাক ঝুমু। আমার জন্যই থাক।

—আমার বাড়িভাড়াটা এখনও বাকি পড়ে আছে মামা।

—আজই নিয়ে যাস। ভূপতিকে বলে রাখছি। থাকবি? কিছুদিন?

—দেখি। বিশ্বাসকে একটা খবর দিয়ে দিতে হবে। ওরও স্ট্রোক, খুব ভেঙে পড়েছে। সময় দিতে চাইছে না।

—ওই বিপদের ব্যবসাতে কেন যাবি ঝুমু?

—কিছু তো করতেই হবে মামা। ওপনিং কোথায়? বাজার তো দেখছ। তা ছাড়া বিপদই বা কী, সবাই করছে।

মামা খুব গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আস্তে করে বলে—তোর সঙ্গে তো তেমন সম্পর্ক ছিল না আমার। আজকাল আত্মীয়তার গিঁট তো আলগা হয়েই যাচ্ছে। কিন্তু এ ক'দিনে তোর ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে ঝুমু। তুই চলে যাবি ভাবলে বুকটা কেমন করে। আমি কেবল তোকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করলাম। তোর দিকটা ভাবিনি। ঝুমু, তোর জন্য কী করব বল তো?

—কী করবে? আমার খুব অসময়ে তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল।

—স্ট্রোক-ফোক হলে ওই সেন্টিমেন্টটা খুব বেড়ে যায়, জানিস? ভীষণ বেড়ে যায়। স্ট্রোক হচ্ছে গাড়ি ছাড়বার ফার্স্ট ওয়ার্নিং, তখনই মানুষ গাড়ির জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বেশি করে আত্মীয়দের মুখ দেখে নেয়।

—চুপ করো। বিরক্ত হয়ে মনোরম উঠে যায়। কাঠগোলার পিছনে একটু পরিষ্কার জায়গায় গিয়ে

সিগারেট ধরায়। করাত-কলের মিষ্টি ঘসটানো শব্দটা আসে।

বর্ষা যায়। শরৎ যায়। শীত আসি-আসি করে। বিশ্বাস ফোনে তার ফিসফিস স্বরে বলে—ব্যানার্জি, আর কত সময় নেবেন? আমি আর পারছি না।

—আর ক'টা দিন, বিশ্বাস। মনোরম বলে—আর একটু সময় দিন।

—সময় কে কাকে দেয় মশাই! সময়ের কি ট্রানজাকশন হয়? সময় ফুরোয়। ব্যানার্জি, একটা ফাইনাল কিছু বলুন। অন্য লোক নিতে ভরসা হয় না। এ ব্যবসাতে ফেইথফুল লোক না হলে...আমি আর কত অপেক্ষা করব ব্যানার্জি? টেল সামথিং।

—একটু, আর একটু...

আজকাল প্রায় একটা জিনিস লক্ষ করে মনোরম। বীরু মাঝে মাঝে তার ফিয়াট দাঁড় করায় ওষুধের দোকানের সামনে। কী যেন কিনে আনে, তারপর আবার গাড়ি ছাড়ে। প্রায় দিনই, প্রতিদিনই বীরু আজকাল কাণ্ডটা করে।

কী কেনে ও? ঘুমের ওষুধ নয় তো!

মনোরম সতর্ক হতে থাকে। একদিন বীরু ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়ি ছাড়ল। মনোরম গাড়ি থেকে নেমে ঢুকল দোকানটায়।

—একটু আগে যে লম্বা ছেলেটা এসেছিল, ও কিছু কিনল?

কাউন্টারের আধবুড়ো লোকটা কাগজ পড়ছিল। মুখ তুলে একটু বিস্ময়ভরে বলে—হুঁ।

—কী?

—অনেকগুলো ট্র্যাংকুলাইজার, কয়েকটা ঘুমের ওষুধ, নিউরোসিসের জন্য কয়েক রকমের বড়ি।

—প্রেসক্রিপশন?

—ছিল না। এ সব কিনতে আজকাল আর প্রেসক্রিপশন লাগে না। সবাই নিজের নিজের ডাক্তার।

—অসুখটা কী?

লোকটা মাথা নাড়ল—কে জানে মশাই! জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—কারণ আছে। ও একটু ডিসব্যালান্সড।

লোকটা নিজের নাকটা মুঠোয় ধরে বলল—এ সব ড্রাগই আজকাল মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে। রোগটা বোধহয় পাগলামি। দেশে পাগল বাড়ছে।

মনোরম বেরিয়ে আসে। আকাশ ভরা রোদ। এখন হেমন্তকাল। কলকাতা এখন পাখির বুকের মতো কবোষ্ণ। গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে তার কাঁধে ব্যথা, কোমর ধরে আছে, মাথা ভার। হেমন্তের সুন্দর আলোতে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় একটু হেঁটে বেড়াতে পারলে বেশ হত। কিন্তু জগদ্দল গাড়িটা রয়েছে সঙ্গে আর সামনে উধাও বীরু।

ক্লান্তভাবে আবার গাড়িতে ওঠে সে। ছাড়ে। ক্লান্তিহীন বীরু কি ধরা পড়ল বয়সের হাতে? নাকি অসুখ? কিংবা কর্মফল? ওষুধ কিনছে। পাগলামির ওষুধ, নার্ভের ওষুধ, ঘুমের ওষুধ! বড় অবাক কাণ্ড। মনোরমের ভ্রূ কুঁচকে যায়। চিন্তিতভাবে সে চেয়ে থাকে সামনের রাস্তায়। চলন্ত গাড়িটা গিলে ফেলছে রাস্তাকে।

রাতে খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে আজ। সেটা টের পাওয়ার কথা নয়। বীরুর পিছু পিছু অনেক রাত পর্যন্ত ধাওয়া করে করে অবশেষে প্রায় রাত সাড়ে বারোটায় বীরুর গাড়ি ঢুকল রিচি রোডে। তখন লোডশেডিং। সেই অন্ধকারে হঠাৎ বানডাকা জ্যোৎস্না দেখতে পেল মনোরম।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে বীরু গাড়ি দাঁড় করাল না আজ। একটু এগিয়ে গেল। বাঁ ধারে একটা মস্ত

ফাঁকা পার্ক। হিম পড়েছে। কেউ কোথাও নেই। বীরু নামল। দুধের মতো সাদা পোশাক পরেছে বীরু। সাদা ঢিলে বুশশার্ট, সাদা প্যান্ট, সাদা জুতো। জ্যোৎস্নায় ওর লম্বা, সাদা অবয়বটা অপ্রাকৃত দেখায়।

গাড়ি ফেলে রেখে বীরু লম্বা পায়ে রেলিং ডিঙিয়ে পার্কে ঢুকল। খুব ধীরে হাঁটছে। মাঠের মাঝখানে চলে গেল। দাঁড়াল। আড়মোড়া ভাঙছে। স্লো-মোশন ছবির মতো নড়াচড়া করছে। জ্যোৎস্নায় এবং কুয়াশায় একটু আবছা। গাড়ির অন্ধকারে বসে মনোরম দেখতে থাকে। বীরু এক-পা এক-পা করে দৌড়ে ক্রিকেটের বোলারের মতো হাত ঘোরাল। ব্যাটসম্যানের মতো মারল বল। দু' পায়ে একটি জটিল দ্রুত নাচ নেচেই থেমে যায়। ডিসকাস ছোড়ার ভঙ্গি করে। তারপর ধীরে, খুব ধীরে হাঁটে, ঠিক যেমন চাঁদের মাটিতে নীল আর্মস্ট্রং হেঁটেছিল। ঘুরে দাঁড়ায় আবার। স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু মনে হয় যেন চেয়ে আছে মনোরমের গাড়ির দিকেই। দেখছে।

মনোরম গাড়ির দরজা খুলে নামল। গরম জামা পরেনি, একটু শীত করে। রেলিংটা টপকায় মনোরম। হাঁটতে থাকে। কী জ্যোৎস্না, কী জ্যোৎস্না! নীলাভ হলুদ কুয়াশায় মাখা স্বপ্নের আলো। সেই আলোতে ভিন্ন গ্রহ থেকে আসা অপরিচিত মানুষের মতো লম্বা সাদা অবয়ব বীরুর। স্থির দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে মহাকাশের সাদা পোশাক।

—বীরু।

—এসো। ভাবছিলাম, তোমাকে ডাকব।

—তুই জানিস যে আমি তোর পিছু নিই?

—আগে জানতাম না। ক'দিন হয় জানি। জেনেও প্রথম ভেবেছিলাম অচেনা কেউ চেজ করছে। তাই একটু চমকে গিয়েছিলাম। তারপর লক্ষ করলাম, তুমি।

—আমার দোষ নেই। মামার অর্ডার।

—বাবা কিছু জানতে চায়?

—চায়।

—আমাকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দিতাম। এত কষ্ট করতে হত না তোমাকে।

—কষ্ট কী? এটাই আমার চাকরি।

—বুঝতে পারছি। তোমার জন্য কষ্ট হয়।

—মামা যেদিন তোর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবে, সেদিন আমার এ চাকরিটা শেষ হবে। তখন হয়তো আমি কাঠগোলার ম্যানেজারি পাব। নয়তো একটা বাজে, বিপজ্জনক অসৎ ব্যবসাতে নেমে যাব। ও দুটো চাকরির চেয়ে এটা বোধ হয় একটু বেটার ছিল। তবে ক্লান্তিকর। তুই বড্ড স্পিডি।

বীরু তেমনি ধীর ভঙ্গিতে একটু হাঁটছে এদিক ওদিক। অদ্ভুত প্রাকৃতিক আলোতে ও হাঁটছে বলে মনে হয় না। যেন একটু জমাট, লম্বাটে একটা কুয়াশায় তৈরি ভৌতিক মূর্তি দুলে দুলে যাচ্ছে।

—বাবা কোনওদিনই আমার সব জানতে পারবে না।

—সেটা মামা স্বীকার করে না। কিন্তু বোঝে। তাই আমাকে লাগিয়েছে মামা। তার বিশ্বাস, আমি তোমাকে বুঝব। তোর পিছু নিয়ে নিয়ে আমি এখন পাক্কা জেমস বন্ড হয়ে গেছি।

বীরু হাসল। মসৃণ কামানো গালে জ্যোৎস্না ঝিকিয়ে ওঠে একটু।

—তুমি কী বুঝলে? শান্ত স্বরে জিগ্যেস করে বীরু।

—কিছু না।

—কী বুঝতে চাও?

—তুই ওষুধ কিনছিস কেন? ও সব ওষুধ প্রেসক্রিপশন ছাড়া খাওয়া খুব ডেঞ্জারাস।

—আজকাল সব ওষুধের পোটেন্সি এত কমিয়ে দেয় ওরা যে কাজ হয় না।

ধীরে ধীরে হেঁটে বীরু একটু দূরে যায়। আবার দুলে দুলে কাছে আসে। মনোরমের ভয় হয়, বুঝি বীরু জ্যোৎস্না আর কুয়াশায় হঠাৎ মিলিয়ে যাবে।

—বিয়ে করবি না বীরু?

—করব হয়তো কখনও।

—গৌরীকে করিস।

বীরু হাসল। বলল—তুমিই গৌরীর প্রেমে পড়ে গেছ।

—বোধহয়। তুই বলেছিলি কষ্ট হওয়াকেই ভালবাসা বলে। আমারও কষ্ট হয় ওই মেয়েটার জন্য।

—বিয়ে করে কী হবে?

—আমি তোর অনেক কিছু নকল করেছি বীরু। পোশাক, চুল, জুলফি, গাড়ির স্পিড। তোর পিছু নিয়ে নিয়ে তোর কাছে শিখেছি অনেক। কেবল তোর ক্রুয়েলটিটা শিখতে পারছি না। তুই এ মেয়েটাকে ভাল না বেসে পারিস কী করে?

টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশে তাকিয়ে থাকে বীরু। প্যান্টের পকেটে দুই হাত। একটুক্ষণ স্থির থাকে।

—আমি খুব নিষ্ঠুর?

—মনে হয়।

—ইদানীং আমি খুব নেশা করছি। গাঁজা, আফিং, এল-এস-ডি, কিছু বাকি নেই। কিছু হয় না তাতে।

—কেন করছিস?

—টু ফরগেট সামথিং।

—কী?

—তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলছ? কেন? তুমি আমার কতটুকু জানো?

—কিছুই না। বীরু, আমার মনে হচ্ছে দিনে দিনে তুই আমার আরও অচেনা হয়ে যাচ্ছিস। এখনই তোকে আমার পৃথিবীর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, যেন বা তুই অন্য গ্রহের লোক। আমি তোর মতো হার্টলেস হতে চাই। আমাকে শিখিয়ে দে।

বীরু হাসে। যথারীতি কোমল জ্যোৎস্নার লাবণ্য ওর কেঠো মসৃণ গালে এক ফোঁটা মোমের মতো ঝরে পড়ল। বলল—কেন হার্টলেস হতে চাও?

মনোরম বলে—আমরা কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলে পাগল হতাম। এখনও দ্যাখ, বউয়ের দুঃখ ভুলতে পারি না। তুই কত মেয়েকে ভুলে যাস, আমি একজনকেই পারি না।

—আমি একটা জিনিস ভুলতে পারছি না।

—কী?

—যাদবপুর রেল স্টেশনে এক বান্ধবীকে তুলতে গিয়েছিলাম গাড়িতে, ট্রেনের দেরি ছিল, কথা বলছিলাম দু'জনে। ভালবাসার কথা। নকল কথা সব। লাইক কসমেটিকস। ঘুরতে ঘুরতে স্টেশনের একদিকে শেড-এর তলায় গেছি, বান্ধবীটি হঠাৎ দু'পা সরে এসে বলল—মাগো, ওটা কী? দেখলাম, একটা বাচ্চা ছেলে শুয়ে আছে ভিখিরিদের বিছানায়। এত রোগা যে ভাল করে না নজর করলে দেখাই যায় না। ঠিক কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো দুখানা হাত নোংরা কাঁথার স্তূপ থেকে শূন্যে উঠে একটু নড়ছে, অবিকল সেইরকমই দুখানা পা। এত নির্জীব যে খুব ধীরে ধীরে একটু একটু নড়ে, আবার কাঁথায় লুকোয়। তার গায়ের চামড়া আশি-নব্বুই বছরের বুড়োর মতো কোঁচকানো, দুলদুল করছে। হিউম্যান ফর্ম, কিন্তু কী করে বেঁচে আছে বোঝা মুশকিল। চমকে যাই যখন দেখি, তার উরুর ফাঁকে রয়েছে পিউবিক হেয়ার, পুরুষাঙ্গ। বাচ্চা ছেলের তো পিউবিক হেয়ার থাকার কথা নয়। একটা উলোঝুলো বুড়ি বসে উকুন মারছিল, সে নিজে থেকেই ডেকে বলল—ষোলো বছর বয়স বাবু, রোগে ভুগে ওই দশা। ছেলেবেলা থেকেই বাড়ন নেই।—কিছুই না ব্যাপারটা, কিন্তু সেই থেকে ভুলতে পারি না।

—কেন বীরু?

—কী জানি! কলকাতায় ভিখিরি-টিকিরি তো কত দেখেছি! কত কুঠে, আধমরা, ডিফর্মড। কিন্তু এটা কিছুতেই ভুলতে পারি না। হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে, চমকে উঠি। পিউবিক হেয়ার সমেত একটা বাচ্চা তার কাঁকড়ার মতো হাত পা নাড়ছে। ভীষণ ভয় করে। যত দিন যাচ্ছে, তত সেঁটে বসে যাচ্ছে ছবিটা মনের মধ্যে। কী যে করি!

মনোরম কী বলবে! চুপ করে থাকে।

বীরু মহাকাশচারীর মতোই চাঁদের মাটিতে হাঁটে। ভ্রূ কুঁচকে বলে—বুদ্ধদেব যেন কী কী দেখেছিল? বার্ধক্য, রোগ, মৃত্যু আর সন্ন্যাস, না?

—বোধহয়।
—পিউবিক হেয়ার সমেত বাচ্চা ছেলের ফর্ম দেখলে বুদ্ধদেব কী করত বলো তো?
—কী জানি।
—পাগল হয়ে যেত। কিন্তু আমি কী করি? কী করি বলো তো?
—কী করবি?
—ভাবছি। আস্তে আস্তে অপ্রাকৃত চাঁদের আলোয় ঘুরে বেড়ায় সাদা দীর্ঘ অবয়ব। আস্তে করে বলে—নিষ্ঠুর নই, বুঝেছ? বাড়ি যাও।
—কেন?
—আমি একটু একা থাকি।
পকেটে হাত, চিন্তিত মুখটা নোয়ানো, বীরু আস্তে আস্তে কুয়াশার শরীর নিয়ে ঘোরে। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার সময়ে দূর থেকে দৃশ্যটা অস্পষ্ট দেখে মনোরম।

॥ ছয় ॥

অনেক অসুখে ভুগে উঠল সীতা। টাইফয়েড হয়েছিল, তার সঙ্গে স্নায়বিক রোগ, জ্বর সেরে যাওয়ার পরও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারত না।
আজকাল বারান্দা পর্যন্ত যেতে পারে সে। গায়ে একটা পশমি চাদর জড়িয়ে রেলিং ধরে বসে থাকে চেয়ারে। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে দুর্বলতায়। হাতে পায়ে শীত। সারা গায়ে খড়ি উঠছে। শরীবের সমস্ত রক্ত কে যেন সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে। এত সাদা দেখায় তাকে। কাগজের মতো পাতলা হয়ে গেছে সে। যেন ওজন নেই।
বিয়েটা পিছিয়ে গেছে। আদ্রায় জয়েন করেছে মানস। কোয়ার্টার পেয়েছে। মাঝে মাঝে আসে। পাতিয়ালার কোচিং-এ সে যাচ্ছে না। যেতে ভয় পায়।
বলে—আমি চোখের আড়াল হলেই না জানি তুমি কী ঘটিয়ে বসবে!
—কী ঘটাব।
—কী জানি! ভয় করে। তোমাকে অসুখের সময়ে দেখে মনে হত পুটুস করে মরে যাবে বুঝি! সাদা হাতে নীল শিরা দেখা যাচ্ছে, চোখে কালি, শ্বাস ফেলছ না-ফেলার মতো। কী যে আপসেট করে দাও।
এক এক সময়ে আদ্রার কথা ভাবতে ভালই লাগে সীতার। সেখানে বোধহয় নির্জনতা আছে। বনভূমি, একটা কলস্বরা নদী। কলকাতার মতো সেটা দোকানের শহর নয়। না হোক। তবু সেখানে ভুতুড়ে টেলিফোন যাবে না।
আবার মনে হয়, কলকাতা ছেড়ে যাবে? সারা দুপুর ঘুরে ঘুরে জিনিস কেনা, সে যে কী ভাল! কাজের জিনিস, অকাজের জিনিস, ঠকে আসবে, তারপর দাঁতে ঠোঁট কামড়াবে, আবার পরদিন বেরোবে ঠকতে, কণ্টকিত শরীরে মাঝে মাঝে শুনবে সেই গোস্ট কল। গোস্ট? হবেও বা।
সেরে উঠছে সীতা, আজকাল এ সব রোগ সহজেই সারে।

একটা ম্যাক্সি কিনেছিল সীতা শখ করে, বহুদিন আগে। সুটকেশ ঘাটতে গিয়ে টেনে বের করল। ফুল ভয়েলের ওপর পিঙ্ক লাল আর কালো চমৎকার নকশা, হাতে সূক্ষ্ম লেসের ফ্রিল। ম্যাক্সি পরার কথা তার নয়। পরবার জন্য বা ব্যবহার করার জন্য নয়, শখ করে কত অকাজের জিনিসই সে যে কেনে?
ম্যাক্সিটা বুকে করে সে আয়নার সামনে এল। খুব রোগা হয়ে গেছে সে। সাদা। কিন্তু তার মুখে অসুখের ফলে কোনও বুড়োটে ছাপ পড়েনি। বরং যেন বা বয়স কমে গেছে তার। বালিকার মতো দেখাচ্ছে।
দরজা বন্ধ করে আসে সীতা। শাড়ি ছেড়ে ম্যাক্সিটা পরে নেয়। পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুল। শরীরটা একটু আঁট বুঝি। ঘুরেফিরে আয়নায় দেখে সে নিজেকে। ওমা, সে তো আর যুবতী নেই। একদম না।

ঠিক কিশোরী সীতা। পাতলা, ফরসা, ছোট্টটি। বুকটা দেখে হেসে ফেলে সে। স্তনভার নেই। বোঝাই যায় না বুকে কিছু আছে। শুধু দুধারে কুঁচির ওপর একটু একটু ঢেউ। ঠিক প্রথম যেমন হয়। আস্তে আস্তে পা ফেলে আয়না থেকে দূরে গেল সীতা। দেখল। কাছে এল। দেখল। কোনও ভুল নেই। সেইরকম অবিকল, যেমন সে ছিল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলে ভাবতে বসল সীতা। পশ্চাৎগামী রেলগাড়ির মতো সে ফিরে যাচ্ছিল সেই বয়সে। নানা বয়সের স্মৃতি চলন্ত রেলগাড়ি থেকে আলোর চৌখুপি ফেলে যাচ্ছে।

একদিন দুপুরে টেলিফোন এল।

—মিসেস লাহিড়ি আছেন?

—লাহিড়ি! না তো! লাহিড়ি কেউ নেই। রং নাম্বার।

সীতা ফোন নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল।

ওপাশে কণ্ঠস্বরটা আঁতকে উঠে বলে—না, না, রং নাম্বার নয়! আপনি কে বলুন!

—আমি! অবাক হয়ে সীতা বলে—আমি সীতা ব্যানার্জি।

—ব্যানার্জি? কণ্ঠস্বরটা যেন বিষম খায়, বলে—মৌ, তুমি এখনও ব্যানার্জি?

—ওঃ! বলে ভয় পেয়ে চুপ করে যায় সীতা।

—কী?

—ভুল হয়েছিল।

অধৈর্যেব গলায় মানস বলে—মৌ, ডিসগাস্টিং।

—ভুল তো মানুষ করেই। আমি ভাবলাম বোধহয় এজেন্সিব ব্যাপারে কেউ কিছু জানতে চাইছে। এজেন্সিটা তো ওই নামেই।

—ঠিক আছে। ক্ষমা করলাম।

—কখন এসেছ কলকাতায়?

—সকালে। কিন্তু এবার দেখা হচ্ছে না, এক্ষুনি বার্নপুরে যাচ্ছি। ফোন করছি হাওড়া থেকে। অল ইন্ডিযা মিট, ভীষণ ব্যস্ত। কেমন আছ?

—ভাল।

—আমাকে ছেড়েও ভাল?

—না, না, তা বলিনি। এমনি ভালই।

—ভাল থাকো, ছেড়ে দিচ্ছি।

ম্যাক্সিটা মাঝে মাঝে বের করে পবে সীতা। বালিকা সেজে বসে থাকে। দুটো বিনুনি ঝুলিয়ে দেয়। আয়নায় তাকিয়ে হাসে। একটা পশ্চাৎগামী রেলগাড়ি তাকে তখন তুলে নিয়ে যায়, আলোর চৌখুপিগুলি নানা রং ফেলে যেতে থাকে।

সীতা আস্তে আস্তে আবার বাস্তায় বেরোয়, একা একা চলে যায় গড়িয়াহাটা, এসপ্ল্যানেড, নিউমার্কেট, হাতিবাগান। ঘুরে ঘুরে কেনে কাজের জিনিস, অকাজের জিনিস। ভাল লাগে। বড় ভাল লাগে।

মাঝে মাঝে একটা চমকা ভয় বুক খামচে ধরে। চলে যেতে হবে কলকাতা ছেড়ে? সে কলকাতার বাইবে যাওয়ার কথা ভাবতেই পাবে না যেন। কলকাতার বাইরে গিয়ে তার কখনও ভাল লাগেনি। একবার লেগেছিল। শিমুলতলায়।

॥ সাত ॥

আজকাল ঘুমের মধ্যেও মনোরম একটা আর্ত চিৎকার শুনতে পায়—ফলো হিম, ঝুমু, ওয়াচ হিম।

অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে মনোরম পাশ ফেরে। নিস্তব্ধ গলায় ঘুমের মধ্যেই বলে—আমি কি পারি মামা? ওর সঙ্গে আমি কি পারি?

—ও যে মরবে ঝুমু! ও যে শীগগির মরবে! একদিন ওর ডেডবডি ধরাধরি করে নিয়ে আসবে রাস্তার লোক।

—মরে যদি কে ঠেকাবে?

—তুই ঠেকাবি ঝুমু। ফলো হিম।

—আমার যৌবন বয়স শেষ হয়ে গেছে মামা। অত স্পিড আমি কোথায় পাব? আমি তত বড় নই যে ওকে ঢেকে রাখব, বা ওকে আড়াল করব।

—দয়া কর ঝুমু, তুই পারবি। তোর মতো ওকে কেউ বোঝে না। আমিও না।

—কী বুঝেছি মামা? কখনও মনে হয় ও চাঁদের মাটির ওপর হাঁটছে, ঠিক যেমন নীল আর্মস্ট্রং হেঁটেছিল চাঁদে। কখনও মনে হয়, ও এক অন্য গ্রহ থেকে আসা মানুষ, জ্যোৎস্নামাখা হলুদ কুয়াশায় হঠাৎ মিলিয়ে যাবে। মামা, বীরু কি রিয়ালি?

—কী বলছিস ঝুমু? রিয়াল নয়?

—বীরু নামে সত্যিই কেউ আছে?

—নেই! কী বলিস তুই! বীরু নেই?

—আছে হয়তো। অন্য পৃথিবীতে।

—তুই কি পাগল? অন্য পৃথিবী আবার কী?

—জানো তো টেলিফোনের একটা তার-এ হাজার ফ্রিকোয়েন্সিতে হাজার মানুষের কথা ভেসে চলে! ধরো, একটাই তার, তাতে আমি কথা বলছি বিশ্বাসের সঙ্গে, তুমি সেই মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। বিশ্বাসের কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ না, আমিও শুনতে পাচ্ছি না সেই মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ারের কথা। ঠিক তেমনি, এই আমরা যেখানে বাস করি, সেই পৃথিবীতেই বসবাস করে বীরু। কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা, পৃথিবী আলাদা।

—তোর বড্ড হেঁয়ালি কথা! তবু যদি সত্যি হয়, ঝুমু, আমি তোর মাইনে বাড়িয়ে দেব, তোকে ম্যানেজার করব, তুই বীরুর ফ্রিকোয়েন্সিতে ঢুকে পড়।

—চেষ্টা করছি মামা, পারছি না। বয়স হয়ে গেছে, তা ছাড়া আমারও কি দুঃখ-টুঃখ কিছু থাকতে নেই মামা? দেখ, নড়ন্ত জিভ, একটা অ্যাকসিডেন্টের স্মৃতি, সীতা, স্বপ্নের মেয়েরা ইডিও-মোটর অ্যাকশন—সব মিলিয়ে একটা জাল, এই জাল ছিঁড়ে সহজে কি বেরোনো যায়! চেষ্টা করছি।

—কর! তুই যা চাস তোকে আমি সব দেব।

—জানি মামা।

—কী জানিস?

—বীরুর জন্যই তুমি আমাকে ভালবাসো। কিন্তু এখন আমার ঘুমের সময়, তুমি আর স্বপ্নের মধ্যে আমাকে ডেকো না। আমি ঘুমোব, আমি উলটে রেখেছি বই, নিবিয়ে দিয়েছি বাতি। অন্ধকারে আমার শরীরের ভিতরে এক্ষুনি জ্বলে উঠবে নীল লাল স্বপ্নের আলোগুলি। ওই তো মোড়ের তে-মাথা পেরিয়ে হেঁটে আসছে আমার ঘুম, অবিকল মানুষের মতো, হাঁসের মতো গায়ের অন্ধকার কণাগুলি ঝেড়ে ফেলে সে আসবে কাছে। সম্মোহনের দীর্ঘ আঙুলগুলি নড়বে চোখের সামনে। তোমরা যাও...আমি ঘুমিয়ে পড়ব...

একটু স্যাঁতসেঁতে বিছানাটা। ফাঁকা। মনোরমের হাত এলিয়ে পড়ে থাকে। সেই হাত কিছুই স্পর্শ করে না।

ঠিক দুপুরবেলায় চোখের রোদ-চশমাটা খুলে মনোরম এসপ্ল্যানেডের ট্রামগুমটির টেলিফোন বুথ-এ ঢুকে গেল। ডায়াল করল, পয়সা ফেলল।

—হ্যালো। একটা চাপা সতর্ক গলা ভেসে আসে।
—দিস ইজ জেমস বন্ড।
—কে?
—জিরো জিরো সেভেন।
—গুডনেস। ব্যানার্জি?
—ইয়াঃ।
—বিসোয়াস হিয়ার। আমাকে আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে ব্যানার্জি? মানুষের আয়ুর তো শেষ আছে!
ফিসফিস করে একটা ভৌতিক গলায় কথা বলে বিশ্বাস।
—জানি বিশ্বাস। আমি একটা ট্রাফিক জ্যাম-এ পড়ে গেছি। সামনে একটা ফিয়াট গাড়ি, সেটাকে পেরোতে পারছি না। সেটাকে পেরোতে পারলেই আপনার কাছে পৌঁছে যাব। আর কয়েকটা দিন।
—ফিয়াট গাড়ি? কী বলছেন ব্যানার্জি? কার গাড়ি?
—সেই ছেলেটার পিছু-নেওয়া এখনও শেষ হয়নি বিশ্বাস।
—এখনও তাকে চেজ করছেন?
—এখনও?
—সে মরেনি তা হলে?
—না।
—তবে বোধহয় সে আরও কিছুকাল বেঁচে থাকবে, কিন্তু আমি বোধহয় বাঁচব না ব্যানার্জি।
—কেন?
—আমার গলাটা কেমন বসে গেছে, লক্ষ করেছেন?
—হুঁ।
—ক্যানসার।
—যাঃ।
—বায়োপসি করিয়েছি। মাসখানেকের মধ্যেই হাসপাতালে বেড নেব।
মনোরম চুপ করে থাকে।
—ব্যানার্জি।
—উঁ।
—সময় নেই। একদম না। আমার বাচ্চারা মাইনর, বউটা বুদ্ধি রাখে না। এত সব কে দেখবে? আপনাকে ছাড়া আমার চলবে না। আপনি কথা দিয়েছিলেন।
মনোরম একটা শ্বাস ছাড়ল।
—শুনছেন ব্যানার্জি?
—শুনছি।
—নতুন বিজনেস ওপেন করব ভাবছিলাম। ড্রাগ, নারকোটিকস। ম্যারিজুয়ানা থেকে হাশিস পর্যন্ত। খুব বাজার এখন। কিন্তু কী করে করব?
—দেখছি বিশ্বাস। আর কয়েকটা দিন।
—আপনাকে চাই-ই। ঠাট্টা নয় ব্যানার্জি, আপনি সত্যিকারের জিরো জিরো সেভেন হতে পারবেন। আমি একজন রিয়্যাল জিরো জিরো সেভেন চাই। হাত মেলান ভাই।
মনোরম হাসল।
—হাসবেন না। হাতটা বাড়ান...বাড়িয়েছেন?
মনোরম শূন্যে তার হাতটা সত্যিই বাড়িয়ে দিয়ে বলল—বাড়িয়েছি।
—আমিও বাড়িয়েছি...এইবার ধরুন হাতটা...মুঠো করুন।
—করেছি।
শূন্যেই হাত মুঠো করে মনোরম, শেকহ্যান্ডের ভঙ্গিতে।

—দ্যাটস দ্য বন্ড। আমরা কিন্তু হাত মিলিয়েছি ব্যানার্জি।
—ইয়াঃ।
টেলিফোনটা হুক-এ ঝুলিয়ে রাখে মনোরম।

এ বছর কলকাতায় খুব শীত পড়ে গেল। উত্তুরে হু-হু হাওয়া দেয়। ময়দানের গাছগুলো থেকে পাতা খসে খসে পড়ে গেল সব। দেহাতিরা সেই পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বালে, হাত-পা সেঁকে নেয়। বেকার আর ভবঘুরেরা পার্কে পার্কে বেঞ্চে আর ঘাসে শুয়ে কবোষ্ণ রোদে ঘুমোয় সারা বেলা। এসপ্ল্যানেডের চাতালে তিব্বতি কিংবা ভুটিয়া মেয়েরা সস্তায় সোয়েটার বিক্রি করছে। তাদের ঘিরে এ বছর ভিড় বেড়েছে। শহরতলির দিকে আপ লোকাল ট্রেনগুলো ছুটির দিনে বোঝাই হয়ে যায়। শীতের পিকনিকে যাচ্ছে কলকাতার মানুষ। চিড়িয়াখানায় ভিড়, সিনেমা হল-এ লাইন। শীতের রোদ মাখাবার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ে লোকজন।

একটা তিব্বতি মেয়ের কাছ থেকে তার হলদে দাঁতের হাসি সমেত একটা পুলওভার কিনল মনোরম। সাদা। বুকে আর পেটে পাশাপাশি চারটে চারটে আটটা সবুজ বরফি। পুলওভারটা পরে বেরোলে যে কেউ মনোরমকে দুবার ফিরে দেখে।

'বাটা' বিজ্ঞাপন দিচ্ছে—'শীতকালেই তো সাজগোজ'। মনোরমও তাই ভাবে। এই শীতে সে একটু সাজবে। একজোড়া চমৎকার জুতো কিনে ফেলল সে। ক্রোকোডাইল প্যাটার্নের চামড়া। হাঁটুতে পকেটওলা একটা মার্কিনি কায়দার প্যান্ট করল, যার সেলাইগুলো দূর থেকে দেখা যায়। মামা টাকা দিচ্ছে। দেওয়ার হাত একটু একটু করে আসছে মামার।

পুরনো বন্ধুদের এক-আধজনের সঙ্গে দেখা হলে তারা জিগ্যেস করে—কী ব্যাপার? চিনতেই পারা যায় না যে!

মনোরম উত্তর দেয়—জেমস বন্ড হয়ে গেছি ভাই, কমপ্লিট জিরো জিরো সেভেন।

—কাজ-কারবার?

—নতুন ব্যবসা খুলছি ভাই। কর ফাঁকি দিতে চাও, কি নতুন ধরনের নেশা করতে চাও, যা চাও কন্ট্যাক্ট বিসোয়াস অ্যান্ড ব্যানার্জি। শিগগিরই স্টার্ট করব।

কিন্তু ঝোলাচ্ছে বীরুটা। আর মামা। বিশ্বাসকে কথা দেওয়া আছে। কিন্তু মামা ছাড়ে না কিছুতেই। প্রতি মাসে টাকা বাড়াচ্ছে আজকাল। বলে—আর ক'টা দিন একটু দ্যাখ।

এই শীতে বীরু নতুন পোশাক তেমন কিছু করল না। শীতের শুরুতে মাসখানেকের জন্য হিল্লি-দিল্লি কোথায় কোথায় ঘুরে এল। ততদিন মামা দিনরাত তাকে কাঠের তত্ত্ব বোঝাত। মনোরমের জন্য নয়। মামার ধারণা, মনোরম শিখে বীরুকে শেখাবে। যদি বীরু না-ই শেখে কোনওদিন, তবে মনোরম ম্যানেজার হয়ে চালিয়ে নেবে কারবার। বীরুর যেন কষ্ট না হয়।

তিন দিকে ঘেরা জালের মধ্যে বীরু দাঁড়িয়ে আছে। একটা দিক খোলা। সেই খোলা দিক দিয়ে ছুটে আসে রক্তাক্ত বল। বীরুর হাতে ব্যাটটা চমকায়। কিন্তু বলের লাইনটা ধরতে পারে না, স্ট্যাম্প ভেঙে জালে লাফিয়ে পড়ে বল। পরের পর এরকম হতে থাকে। বীরু বলের লাইন দেখতে পাচ্ছে না। যে-ছেলেটা বল করছে সে নতুন, স্কুল ক্রিকেটার। বল তেমন কিছু ভাল করে না। তবু বারবারই বীরু বল খেলতে পারল না। নেট প্র্যাকটিসের বাঁধা সময় পার হয়ে গেলে সে বেরিয়ে এল।

মনোরম বশংবদ দাঁড়িয়ে আছে মাঠের ধারে। বীরুর ওপর সতর্ক চোখ।

বীরু তাকে দেখে একটু হাসল। তারপর তার ফিয়াটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল—বাবার চাকরিটা করে যাচ্ছ তা হলে এখনও?

—করছি।

—করো। কিন্তু কিছু জানার নেই। আমিই জানি না।

—এখনও ভুলতে পারছিস না বীরু?

—কী?

—সেই স্টেশনে যেটা দেখেছিলি।

বীরু একটা শ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ল—না।

—কেন?

—গেঁথে গেছে। অটো সাজেশানের মতো। মানুষের অনেক সময় হয়, খেতে বসলে সবচেয়ে ঘেন্নার কথা মনে পড়ে, একা ঘরে মনে পড়ে ভূতের গল্প। অনেকটা সেই রকমই। যত ভুলতে চাই, তত মনে পড়ে।

—কী করবি?

—ভাবছি।

—তুই একটুও ভাবছিস না।

—ভাবছি। তুমি অস্থির হয়ো না। চাকরিটা করে যাও।

—বীরু, মামার বড় ভয়, তুই সুইসাইড-ফাইড করবি না তো কখনও?

—সুইসাইড! বীরু একটু থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ একটি বিদ্যুৎ খেলে যায় ওর চোখে, বলে—ভাবিনি তো কখনও!

মনোরম ভীষণ হতাশ হয়ে বলে—ভাবিসনি! তবে কি আমিই তোকে মনে করিয়ে দিলাম?

—দিলে। সুইসাইডের কথা ভাবতে বোধহয় মন্দ লাগে না কখনও কখনও! মাঝে মাঝে ভাবব।

—কেন ভাববি বীরু? ভাবিস না। আমি কথাটা উইথড্র করে নিচ্ছি।

—ভয় পেয়ো না। সুইসাইডের চিন্তা কখনও করিনি। চিন্তাটা করতে বোধহয় ভালই লাগবে।

—যদি ওটাও অটো সাজেশানে দাঁড়িয়ে যায়?

বীরু ধীর পায়ে তার ফিয়াটের দিকে হেঁটে চলে গেল। আর ফিরে তাকাল না।

ক'দিনের মধ্যেই বীরু ছেঁটে ফেলল লম্বা চুল, জুলফি। শুধু ছোট একটু গোঁফ রেখে দিল। এই শীতে একটা আধময়লা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরতে লাগল। ফিয়াটটা গ্যারেজেই পড়ে থাকে। বীরু হাঁটে। এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা। গলিঘুঁজিতে চলে যায়। দিশি গাড়িটা নিয়ে বড্ড বিপদে পড়ে গেল মনোরম। এখন আর গাড়িতে বীরুকে অনুসরণ করার মানেই হয় না। সব গলিতে গাড়ি ঢোকে না, তা ছাড়া মানুষের হাঁটার গতির সমান ধীর গতিতে গাড়ি চালানো যায় না সব সময়ে। অতএব গাড়ি ছেড়ে হাঁটা ধরে মনোরম। এবং প্রথম ধাক্কাতেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এতদূর হাঁটার অভ্যাস ছিল না তার। তার ওপর লম্বা পায়ে বীরু জোরে হেঁটে যায়, তাল রাখতে গিয়ে দমসম হয়ে পড়ে সে। তবু তীব্র এক আকর্ষণে সে ঠিকই চলে। পিছু ছাড়ে না। বীরু টের পায়। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। কখনও হাসে একটু, ম্লান হাসি। কখনও চাপা গলায় বলে—বাক আপ।

বুধবার রাতে বীরুকে তার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে যেতে দেখেছে মনোরম। তারপর ফিরে গেছে পূর্ণদাস রোডের ফ্ল্যাটে। পরদিন সকালে আবার এসেছে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। দাঁড়িয়ে থেকেছে। সারাদিন বীরু নামল না। দারোয়ানের কাছে খোঁজ নিল মনোরম। না সাহেব নামেনি। অনেক রাত পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। বীরু নামল না। পরদিনও না।

তৃতীয় দিন মনোরমের বুক কাঁপছিল। দারোয়ান মাথা নেড়ে বলল—কিছু জানি না। এত বড় ফ্ল্যাট বাড়ি, কে কখন আসে যায়!

সন্ধেবেলায় চাঁদ ওঠে। মনোরম হেঁটে গেল পার্ক পর্যন্ত। কুয়াশা আছে। হলুদ জ্যোৎস্না। দু-চারজন লোক আছে পার্কে, সঙ্গে কারও কারও প্রেমিকা বা ভাড়াটে মেয়েছেলে। মনোরম পার্কটার একটা কোণে দাঁড়িয়ে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে চেয়ে রইল। বীরুর ঘরে যথারীতি অন্ধকার। তিনদিন ধরে আলো জ্বলছে না ওর ঘরে। মনোরম যখন সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল তখন দেখে তার হাত থরথর করে কাঁপছে। পেট ডাকছে কলকল করে। উদ্বেগে সে অনেকক্ষণ কিছু খাওয়ার কথা মনে করেনি।

অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করল মনোরম। পার্ক ক্রমে নির্জন হয়ে গেল। সে একা। হিম পড়ে তার গা ভিজছে, মাথা ভিজছে। ঠাণ্ডায় চোখে জল আসে। গলায় ব্যথা, একটু একটু কাশি। হাতে পায়ে খিল ধরা ভাব। ঝিঝি লেগেছে। এ কয় মাসে বীরুকে সে ভালবেসে ফেলেছিল, তা আজ বুঝতে পারল। ওই অ্যাপার্টমেন্টে কী হয়েছে তা এত রাতে জানতে যেতে সাহস হল না তার। কোত্থেকে একটা রাতচরা পুলিশ খৈঁটে লাঠি দোলাতে দোলাতে কাছে এসে বলল—কেয়া?

মনোরম মাথা নেড়ে বলে—কুছ নহি।

—তব?

মনোরম হাঁটতে থাকে। পার্কের রেলিং ডিঙিয়ে রাস্তায় পড়ে। ফিরে আসে পূর্ণদাস রোডের ফ্ল্যাটে। ঘুমোতে পারে না। স্বপ্ন দেখে না। তার কোনও ইডিও-মোটর অ্যাকশনও হয় না আজ। রোজ কয়েকবার যে কথাটা তার মনে পড়ে সেই ট্রেন দুর্ঘটনাও মনে পড়ে না। ঘরের বাতি নিবিয়ে সে বসে থাকে জানালার পাশে। সিগারেট খায়। তার নিঃসঙ্গতায় কেবলমাত্র সঙ্গে দেয় নড়ন্ত জিভটা। টুক টুক করে নড়ছে। নড়ছেই। সে বড় মর্মান্তিকভাবে বুঝতে পারে, বীরুকে সে বড্ড ভালবেসে ফেলেছিল। বড্ড বেশি। বোধ হয় আর কিছু করার নেই।

খুব ভোরবেলা সে আর একবার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কুয়াশায় গাঢ় আকাশে বহু দূর উঠে গেছে বাড়িটা। অন্ধকার জানালা সব। কোলাপসিবল গেট বন্ধ। বীরুর জানলায় আলো নেই।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে থাকে। শীতটা কি খুবই পড়ল এবার? হাত পা সিঁটিয়ে যাচ্ছে। ভোর-আলোয় দুটো হাত চোখের সামনে তুলে ধরে দেখে সে। হাত দুটো রক্তহীন, সাদা, আঙুলের ডগায় চামড়া কুঁচকে আছে, অনেকক্ষণ জলে ভিজলে যেমন হয়। শরীরে একটা কাঁপুনি। শীতের জন্যই? নাকি অন্তর্নিহিত গূঢ় শোক থেকে উঠে আসছে শরীর জুড়ে এক নিস্তব্ধ ক্রন্দন? নাকি ভয়? অনিশ্চয়তা? হাঁটে, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নয়। খানিকটা উদভ্রান্তের মতো।

তবু ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে সে হাজির হয় কাঠগোলায়। বীরুর ফিয়াটটা বাইরে দাঁড়ানো। আপাদমস্তক শিউরে ওঠে মনোরম।

মামা বাইরের চালায় বসে আছে। কী গভীর হয়ে চোখের কোলে কালি পড়েছে। ঘুমহীন জ্বালাভরা চোখ। কষ্টে শ্বাস টানছে।

—তিন দিন তুই দেখাই দিসনি ঝুমু। বীরুর খবর কী?

—একই খবর। বীরুর গাড়িটা দেখছি—সতর্ক গলায় বলে মনোরম।

গভীর ক্লান্তিতে মামা বলে—আমিই এনেছি ওটা। গ্যারেজে পড়ে আছে, মাঝে মাঝে চালু না করলে ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাবে। ওর ঘরে গাড়ির চাবিটা পড়ে ছিল। ভাবলাম নিয়ে বেরোই। কখন হুট করে এসে হাজির হবে, তখন গাড়ি রেডি না পেলেই তো মাথা গরম হবে। তাই ইঞ্জিনটা চালু রাখছি।

—ও।

—কী করছে এখন হারামজাদা?

—মামা, এবার আমাকে ছেড়ে দাও। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার সেই বন্ধুর গলায় হঠাৎ ক্যান্সার ধরা পড়েছে। বেশি দিন নেই।

—যাবি? বলে যেন হাতের ভর স্খলিত হয়ে যায় মামার। রোগা লম্বা শরীরটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

—ঝুমু! মামা হাঁফানির শ্বাস টেনে বলে।

—বলো মামা। মনোরম মামার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে—কী হয়েছে তোমার?

—শোন, ও যখনই ফিরুক, যবেই ফিরুক, ওর সব সাজানো রইল। ওর ঘর সাজানো আছে, ব্যবসাপত্র সব গুছিয়ে রাখা আছে, ওর গাড়ির ইঞ্জিন আমি চালু রাখছি। ওকে বলিস, আমার যা সাধ্য সব করে রেখেছি ওর জন্য।

—বীরু তো সবই জানে মামা।

—ভূপতিকে সব বুঝিয়ে গেলাম, তুইও দেখিস।

—তোমার কী হয়েছে?

—ঝুমু, প্রদীপ নিবে গেলে একটা তেলপোড়া গন্ধ পাওয়া যায় জানিস তো?
—হ্যাঁ, বিচ্ছিরি গন্ধ।
—সেই গন্ধটা মানুষ যখন আর পায় না, তখনই বুঝতে হবে তার আর মরার দেরি নেই।
—তার মানে?
—ও একটা তুক। মানুষ মরার আগে নেবানো প্রদীপের সামনে বসেও সেই গন্ধটা পায় না। আমি গতকাল সন্ধের সময়ে পুজোর পর প্রদীপটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে অনেকক্ষণ বসে গন্ধটা পাওয়ার চেষ্টা করলাম। পেলাম না। ঝুমু, আমারও আর দেরি নেই।
—এ সব কথার কোনও মানে হয় না মামা।
—তুই যেন কার সঙ্গে ব্যবসাতে নাবছিস?
—বন্ধু।
—যাবিই ঝুমু?
—কথা দিয়েছি।
—তা হলে যা। ফাঁকে ফাঁকে এসে একটু বীরুকে দেখে যাস। তোর মামিকেও।
—দেখব মামা।
মনোরম কাঠগোলা থেকে বেরিয়ে আসে। মামা এখনও কিছুদিন টের পাবে না। বীরু তো এরকম কতদিন ডুব দিয়ে থেকেছে। সে রকমই কিছু ভেবে নিশ্চিন্ত থাকবে। মনোরম একটা সত্যিকারের দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
সামনেই গোল পার্কের ওপর শীতের প্রকাণ্ড আকাশ রোদভরা হয়ে ঝুঁকে আছে। হঠাৎ কলকাতা মুছে যায়। আবছা স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে মনোরম দেখতে পায় ঘাটের পৈঠার মতো দীর্ঘ সব সিঁড়ি। ইস্কুলবাড়ির তিনশো ছেলে সেই সিঁড়িতে সারি সারি দাঁড়িয়ে জোড়হাতে গাইছে—জয় জগদীশ হরে...
বহু দিনের পুরনো সেই আকাশ অতীত থেকে হঠাৎ আজ ঝুঁকে পড়ে মনোরমের চোখের ওপর। হাতের উল্টো পিঠে সে চোখের জল মুছে নেয়।

কলকাতায় এবার কি খুব শীত পড়েছে। এত রোদ্দুরে হাঁটে মনোরম, তবুও শরীর তার কেঁপে ওঠে। হাত দুটো সামনে সিঁটানো। হাঁটে মনোরম। শীত যায় না। গাড়ির শব্দ হয় চারপাশে, মানুষের পদশব্দ থেকে যায় পথে। মনোরম আর কারও পিছু নেয় না কখনও। রাতে সে তার ঠাণ্ডা বিছানায় এসে শোয়। একটু ওম-এর জন্য বড় খুঁতখুঁত করে তার শরীর। চোখ বুজতে না বুজতেই ফুলের পাপড়ির মতো স্বপ্নরা ঝরে পড়ে চোখে। মনে পড়ে সেই দুর্ঘটনা। চমকে উঠে বসে সে। ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে।
টেলিফোনে একদিন বিশ্বাসের নম্বর ডায়াল করল মনোরম অবশেষে।
গমগমে একটা গলা উত্তর দিল—হ্যালিও...
মনোরম ভাবে, তবে কি ক্যানসার সেরে গেছে বিশ্বাসের। আবার সেই রোগমুক্ত প্রকাণ্ড চেহারাটা লু-বাতাসের মতো মুখের ওপর শ্বাস ফেলে বলবে—ব্যানার্জি, বিসোয়াস হিয়ার।
—হ্যালিও...
মনোরম জিগ্যেস করে—বিশ্বাস?
—ও।
—উনি তো হাসপাতালে আছেন।
—কিছু বলার ছিল?
—না। ঠিক আছে।

বাড়িভাড়া আবার বাকি পড়ে। জমে উঠেছে ঋণ। মনোরম হাঁটে। ওপেনিং খোঁজে। পায় না। বয়স

হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। তবু হাঁটে মনোরম। এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা। সেই অ্যাপার্টমেন্টের সামনে কখনও যায় না। যায় না মামার কাঠগোলাতেও। বিশ্বাসকে আর কখনও ফোন করেনি মনোরম। থাক, সে কিছুই জানতে চায় না। মনোময় যেদিন মারা যায়, সেদিন সকালে সে প্রতিবেশীর বাসা থেকে ইস্কুলে বেরিয়ে, বাড়ির দিক থেকে কান্নার রোল শুনে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ইস্কুলে। প্রার্থনার সারিতে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল। আজও পালায়, অবিকল সেইরকম। কল্পনা করে, মামা রোজ এসে কাঠগোলায় বসছে, নিবন্ত প্রদীপের গন্ধ আবার ফিরে পেয়েছে মামা। বীরু তাকে ফাঁকি দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বোধহয় পালিয়ে গিয়েছিল মাঝরাতে। তারপর বোধহয় গিয়েছিল গৌরীর কাছে। ওরা দূরে কোথাও আছে, একসঙ্গে। বিশ্বাস অপারেশনের পর ভাল হয়ে আবার দাবড়াচ্ছে তার পুরনো বিদেশি গাড়ি, মদ খাচ্ছে, ফুর্তি করছে, বেশি রাতে বাড়ি ফিরে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ছুড়ে দিচ্ছে এক পাটি জুতো...

কল্পনায় সবই থাক। সত্যি কী, তা জানতে চায় না মনোরম। এবারের শীতে কলকাতা বড় সুন্দর। এ রকমই সুন্দর থাক সব কিছু। ভাবতে ভাবতে তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। সে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পায় বিশ্বাসকে, শোঁ করে গাড়িতে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল—'বাই...' গ্র্যান্ড হোটেলের উল্টোদিকে পার্কিং লট-এ থেমে থাকা ভোঁতামুখ গাড়ি থেকে মামা যেন ডাক দেয়—ঝুমু! আর কখনও ভিড়ের মধ্যে সামনে লম্বা বীরু হাঁটতে থাকে। ভ্রূ কুঁচকে পিছু ফিরে চায়, হাসে কখনও বলে—বাক আপ।

অবিকল এইভাবে একদিন সীতাকে দেখতে পায় মনোরম। তখন দুপুর। নিউ মার্কেটের ছায়ায় ছায়ায় শীত গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মনোরম। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন। গায়ে সাদার ওপর সবুজ বরফিওলা পুলওভার, মার্কিনি ছাঁটের প্যান্ট পরনে, পায়ে ক্রোকোডাইল মোকাসিন। ছায়া, তবু রোদ চশমাটাও ছিল চোখে, হঠাৎ দেখে, উল্টোদিক থেকে সীতা হেঁটে হেঁটে আসছে। পুরনো স্বভাব সীতার, দোকানের সাজানো জিনিস দেখছে নিচু হয়ে। এক পা এক পা করে হেঁটে আসে সীতা।

স্বপ্নই। বিভ্রম। এক্ষুনি কল্পনার সীতা মিলিয়ে যাবে। তবু যতক্ষণ তাকে দেখা যায় ততক্ষণ দেখবে বলে চোখে পিপাসা নিয়ে তাকিয়ে থাকে মনোরম। বহু দিন সীতাকে দেখেনি। সেই কতদিন আগে দেখেছিল এসপ্ল্যানেডের চাতালে, মেঘভাঙা রোদে। মহার্ঘ মানুষের মতো মাটি থেকে যেন একটু ওপরে শূন্যে পায়ের আলপনা ফেলে চলে গিয়েছিল। প্রাকৃতিক আলোগুলি রঙ্গমঞ্চের ফোকাসের মতো এসে পড়েছিল ওর গায়ে। তারপর বহুদিন বাদে আবার কল্পনায় দেখা হল । মনোরম চেয়ে থাকে।

সীতা হেঁটে আসছে। কাল্পনিক। তবু অপেক্ষা করে মনোরম। যদি তাকে না দেখে এরকমই হেঁটে আসতে থাকে, তবে সোজা এসে মনোরমের বুকে ধাক্কা খাবে। ঠিক যেমন স্থবির গাড়িতে চলন্ত ইঞ্জিন এসে লেগে যায়। সেই বিভ্রম, সেই প্রবল কাল্পনিক সংঘর্ষের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে মনোরম। সীতা অনন্ত পথ পার হয়ে আসছে। একটু একটু করে। বড় একটা দোষ ছিল ওর, যা খুশি কিনে আনত। কলকাতার দোকান ছেয়ে গেছে নকল দু নম্বর মালে। রোজ ঠকে আসত। বকত মনোরম। ঠিক সেই রকমই বালিকার মতো অপার কৌতূহলভরা চোখে দোকানের সাজানো জিনিস দেখছে আজও। মনোরমকে দেখেনি। সচেতন নয়। মনোরমের বিভ্রমের পথ ধরে আসছে সীতা, কল্পনা, স্বপ্ন।

মনোরম ভুল করেছিল।

সীতা তাকে দেখেছিল ঠিকই। দোকানের আয়নায় প্রতিবিম্বিত মনোরমকে। একটু চমক কি লেগেছিল? কে জানে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ভুল হয়ে গেল বিচ্ছেদ, অন্য এক পুরুষ, বহুকালের অদর্শন। তীব্র অভিমানে ফুলে উঠল সীতার বালিকা-মুখের দুটি ঠোঁট, ভ্রূ কুঁচকে গেল।

একটুও ভাবল না সীতা, অপেক্ষা করল না, কোনও ভূমিকাও না। কিশোরীর মতো দ্রুত নৃত্য-ছন্দে কয়েক পা দৌড়ে গেল মনোরমের দিকে। বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কৃশ, সাদা মুখখানা তুলে ধরে বলল—আমার যে কী ভীষণ অসুখ করেছিল!

মনোরম তাকিয়েই থাকে। বিভ্রম?

সীতা তার রোগা, পাণ্ডুর ডান হাতখানা তুলে নিঃসংকোচে তাকে দেখাল, বলল—দেখো কত রোগা হয়ে গেছি।

পৃথিবীতে মানুষের আয়ু খুব বেশিদিন নয়। বয়ে যাচ্ছে সময়। দ্রুত, কলস্বরা। মনোরম তাই বিনা প্রশ্নে সীতার রোগা হাতখানা ছুঁল।

সেই মুহূর্তেই তাদের চারধার থেকে কলকাতা মুছে যাচ্ছিল। জেগে উঠল বনভূমি। অদূরে নদীর শব্দ।

বাসস্টপে কেউ নেই
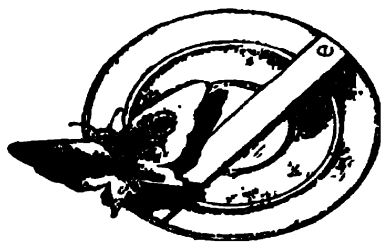
ঘুমচোখে নিজের ঘর থেকে বেরোবার মুখে পাশের ঘরের পর্দাটা সাবধানে সরিয়ে রবি তার বাবাকে দেখতে পায়। খোলা স্টেটসম্যানের আড়াল থেকে ধোঁয়া উঠছে, আর সামনে একটা ক্ষুদে টেবিলের ওপর এক জোড়া পা, পায়ের পাশে একটা গরম কফির কাপ। ওই স্টেটসম্যান, পা আর কফির কাপ—ওই তার বাবা। রবি প্যান্টের পকেটে হাত ভরে রিভলভারটা বের করে আনল। সেটা তুলল, এক চোখ ছোট করে লক্ষ্যস্থির করল। তারপর টিপল ট্রিগার।

ঠিসুং...ঠিসুং...ঠিসুং...তিনটে বুলেট ছুটে গেল চোখের নিমেষে। স্টেটসম্যানটা খসে পড়ে যায় প্রথমে, দামি স্প্রিংয়ের ওপর দুর্ধর্ষ নরম ফোম রবারের গদির ওপর ঢলে পড়ে যায় বাবা, গদির ওপর দুলতে থাকে শরীর। বাবা চমৎকার একটা মৃত্যু চিৎকার দেয়—আঃ আ আ আ...

রবি হাসে একটু। রিভলভারটা আবার পকেটে ভরে দু' পা এগোয়, তার বাবা দেবাশিস শুয়ে থেকেই তার দিকে চেয়ে বলে—শট্। শট।

রবির ঘুমমাখা কচি মুখে চাপা রহস্যময় হাসি। বলে—নাইস অব ইউ টেলিং দ্যাট।

দেবাশিস উঠে বসে। জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠোঁটে নেয়। স্টেটসম্যানটা দিয়ে মুখ ঢাকার আগে বলে—প্রসিড টুওয়ার্ডস দা বাথরুম ম্যান।

—ইয়া। বলে রবি হাই তোলে। ডাকে—দিদি।

অমনি অন্য পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে আধবুড়ি ঝি চাঁপার হাসিমুখ উঁকি দেয়—সোনা।

দুহাত বাড়িয়ে রবি ঘুমন্ত গলায় বলে—কোল।

চাঁপা তাকে কোলে নেয়। এই সকালের প্রথম বাথরুমে যাওয়াটা বড় অপছন্দ রবির। একটু সময় সে দিদির কোলে উঠে থাকে রোজ সকালে। কাঁধে মাথা রেখে হাই তোলে।

চাঁপা কানে কানে বলে—আজ রবিবার।

—হুঁ।

—ছুটি।

—ইঁয়া।

—সোনাবাবু আজ কোথায় কোথায় যাবে বাবার সঙ্গে?

কচি মুখখানা একরকম সুস্বাদু হাসিতে ভরে যায় রবির। প্রকাণ্ড শার্সিওলা চওড়া জানালার কাছে এসে চাঁপা পর্দা সরিয়ে দেয়। সাত তলার ওপর থেকে বিশাল কলকাতার দৃশ্য ছবির মতো জেগে ওঠে। নীচে একটা মস্ত পার্ক। পার্কের মাঝখানে পুকুর। চারধারে বাঁধানো রাস্তায় লোকজন হাঁটছে।

ও ঘরে টেলিফোন বাজে, রিসিভার তুলে নেওয়ার 'কিট' শব্দ হয়। তারপর দেবাশিসের স্বর—হ্যালো।

রবি বলে—ফোন।

চাঁপা বলে—হুঁ।

—কার ফোন বলো তো?

—বাবার বন্ধু কেউ।

—না, মণিমার। রবি বলে।

চাঁপার মুখখানা একটু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—এবার চলো, মুখখানা ধুয়ে নেবে।

রবি হাই তোলে, বলে—কাল রাতের গল্পটা শেষ করোনি।

চাঁপা হাসে—বলব। দাঁত মাজতে মাজতে।

ও ঘর থেকে দেবাশিসের হাসির শব্দ আসে। বলে—আজই? ...হুঁ...হুঁ...না, না, রবিবার শুধু রবির দিন। এ দিনটা ওর সঙ্গে কাটাই।...আচ্ছা...

রবি উৎকর্ণ হয়ে শোনে। বলে—ঠিক মণিমা।

—এখন চলো তো। চাঁপা বলে।

বাথরুমে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে করতে হাই তোলে রবি। চাঁপা তার ছোট্ট ব্রাশে পেস্ট লাগাতে যাচ্ছিল, রবি রাগের স্বরে বলে—না, না পেস্ট না।

—তবে কী দিয়ে মাজবে?

—তোমার কালো মাজনটা দিয়ে।

—ও তো ঝাল মাজন! পেস্ট মিষ্টি।

—না, পেস্ট বিচ্ছিরি। ফেনা হলে আমার বমি পায়।

—বাবা যদি টের পায় আমার মাজন দিয়ে মেজেছ তা হলে রাগ করবে কিন্তু।

—টের পাবে কী করে! চুপ চুপ করে মেজে দাও। আঙুল দিয়ে কিন্তু। ব্রাশ বিচ্ছিরি।

চাঁপার বুড়ো মুখখানা মায়ার হাসিতে ভরে ওঠে। সে রান্নাঘর থেকে তার সস্তা কালো মাজনের শিশি নিয়ে এসে দাঁত মেজে দিতে থাকে।

রবি ভ্রূ কুঁচকে বলে—গল্পটা বলবে না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর...কতটা যেন বলেছিলাম সোনাবাবু?

—তোমার কিছু মনে থাকে না। শিবুচরণ রাত্তির বেলা একা মাছ ধরতে গিয়েছিল নৌকোয়। জাল টেনে তুলতেই দেখে মাছের সঙ্গে একটা কেউটে সাপ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ লালটেমের আলোয় জাল খুলতেই মাছের সঙ্গে একটা কেউটে সাপ বেরিয়ে এল। ছোট্ট নৌকো, চার হাত খানেক হবে। তার এধারে শিবুচরণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে লালটেম জ্বলছে, ওধারে ফণা তুলে কালকেউটে। আর খোলের মধ্যে জ্যান্ত মাছগুলো তখনও দাপাচ্ছে। চারধারে কালিঢালা অন্ধকার নিশুত নিঃঝুম। মাঝগাঙে শিবুচরণের সে কী বিপদ! নড়তে চড়তে পারে না, ভয় বুদ্ধিভ্রংশ হাতে পায়ে সাড় নেই।

রবি প্রথম কুলকুচোটা সেরে নিয়েই বলে—জলে ঝাঁপ দিল না কেন?

চাঁপা একটু থতিয়ে গিয়ে বড় বড় চোখ করে চায়—ঠিক তো সোনাবাবু! কী বুদ্ধি বাবা তোমার ওইটুকুন মাথায়! উঃ!

বলে চাঁপা রবির মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে কোলে তুলে নেয়। মাথাটা কাঁধে চেপে রেখে বলে—সোনাবাবুর মাথার মধ্যে বুদ্ধির বাসা। এমনটি আর দেখিনি।

রবি মুখ টিপে অহংকারের হাসি হেসে মুখ লুকিয়ে বলে—উঃ তারপর বলো না।

—হ্যাঁ, তা শিবুচরণের হাতে পায়ে তো খিল ধরে গেছে তখন। কাঁপুনি উঠছে। ভাবছে এই মলুম, এই গেলুম আর বাপভাই ছানাপোনার মুখগুলো দেখতে পাব না। কালসাপে খেলে আমাকে গো! কে কোথায় আছ মানুষজন, এসে পরাণটা রাখো। কিন্তু কোথায় কে। শীতের মাঝরাতে মাঝগাঙে জনমনিষ্যি নেই। শিবুচরণ বুঝল যে মানুষজনকে ডাকা বৃথা। কেউ তার ডাক শুনতে পাবে না। তখন ভয়ের চোটে শিবু রামনাম করতে থাকে, কিন্তু সাপটা নড়ে না। শিবুর মনে হল, তাই তো রামনাম তো ভূতের মন্ত্র। তখন সে মা মনসাকে ডাকতে থাকল। তাতে যেন আরও জো পেয়ে সাপটা এধার ওধার গোটা-দুই ছোবল মারল। লালটেমটা মাঝখানে থাকতে রক্ষে! কিন্তু সে আর কতক্ষণ। শিবু বুঝে গেল মা মনসা কুপিত আছেন কোনও কারণে তার ওপর। ডেকে কাজ হবে না হিতে বিপরীত হয় যদি! তখন শিবুচরণ মনে করল গাঁয়ের পুরুতমশাই বলেন বটে বাপ পিতেমোর আত্মা...সোনাবাবু বোসো।

চাঁপা ডাইনিং রুমে এনে চেয়ার টেবিলে বসায় রবিকে। রবি বিরক্ত হয়ে চাঁপাকে আঁকড়ে ধরে বলে—উঃ! তুমি আগে বোসো, আমি তোমার কোলে বসব।

চাঁপা চারধারে চেয়ে কানে কানে বলে—আমি কি চেয়ারে বসতে পারি? বাবা দেখলে যে রাগ করবে।

—একটুও রাগ করবে না। উঃ বোসো! কথা শোনো না কেন?

—বসছি বসছি। বলে চাঁপা তাকে কোলে নিয়ে বসে। প্লেটে সেঁকা রুটি মাখন, দুধের গেলাস রেখে যায় প্রীতম চাকর। রেখে সে বলে—রবিবাবু, কাল যখম সন্ধেবেলা আমি ঘুমোচ্ছিলাম তখন কে আমার

মেয়েটি যে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে কে জানে? আমি মাত্র এইটুকু দেখেছিলাম। আর মনে হয়েছিল মেয়েটি যেন আমার আবছাভাবে চেনা। এর বেশি আর বাস্তবে কিছু ঘটেনি, ঘটেছিল বোধহয় কল্পনায়।

মনোরমের আবার সেই হাসি, শব্দহীন, অর্থময়।

—বলুন না। বলে শরীরের সুগন্ধ নিয়ে কাছাকাছি এগিয়ে গিয়েছিল সীতা। উন্মুখ পানপাত্রের মতো।

—তারপর তাকে আবার দেখি আমাদের ফুলবাগানে, শীতকালের ভোরবেলায়। পাড়ার বাচ্চা মেয়েরা রোজ সকালে আমাদের বাগান থেকে ফুল চুরি করে নিয়ে যায়। একদিন রাতে ঘুম হয়নি, সারারাত ভয়ঙ্কর সব কল্পনার ছবি দেখেছি। সকালে তেষ্টা পেল আর খোলা বাতাসের জন্য আকুল ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে এলাম। বাগান তখন ঘন কুয়াশায় ঝিম মেরে আছে। আমি দেখলাম, বাগানের ফটকের কাছে একটি মেয়ে ভিখিরির মতো দাঁড়িয়ে। ও কি ফুলচোর? আমি সাড়া দিইনি, চেয়েছিলাম। সেও একদৃষ্টে আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ মৃদু হাসল। আমি ভয়ঙ্কর চমকে উঠে চিনলাম, এ সেই মেয়ে যাকে আমি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখেছিলাম এবং আরও আগে কবে থেকে যেন চেনা ছিল। সে হেসে এগিয়ে আসতে থাকে ফটক পার হয়ে। আমি হিম হয়ে দাঁড়িয়ে, তার পরনে নীল শাড়ি, গলায় কাশ্মীরি স্কার্ফ জড়ানো, ঠিক যেরকম স্কার্ফ আমার মায়ের একটা আছে, নীল শাড়িটাও যেন চেনা। সে লাল সুরকির পথ দিয়ে অনেকটা এগিয়ে এসে মিহি গলায় জিগ্যেস করল—এ বাসায় তুমি থাকো? আমি মাথা নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ। সে হাসল—তোমাকে সেদিন দেখেছিলুম স্টেশনের ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়েছিলে। বিড়বিড় করে কী বকো তুমি বলো তো? তোমার ঠোঁট নড়ছিল। আমি হেসে মাথা নেড়ে বললাম—কী জানি, হবে হয়তো। সে এবার কাছে এগিয়ে আসে, খুব কাছে। বলে—আমি সেই ছেলেবেলায় কবে তোমাকে দেখেছিলাম, আর এখন তুমি কত বড় হয়ে গেছ। তুমি কেমন মানুষ হয়েছ তা তো জানি না। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি খুব সৎ আর তোমার মনে খুব মায়া। আমি হাসলাম—কী জানি! জানি না। সে বাগানের দিকে একবার ফিরে দেখে নিল, বলল—সৎ লোকেরা কখনও সুখী হয় না। তুমিও দুঃখী বোধ হয়। আর দেখছি তুমি তেমন সবল হওনি, দৃঢ়চেতা হওনি, তাই না? আমি মাথা নাড়ি—হ্যাঁ, ঠিক তাই। সে সুন্দর সকালের রোদের মতোই ফুটফুটে হাসি হাসল—ছেলেবেলার কবেকার এই পুরনো ভুলে-যাওয়া মফস্বল শহরে এতদিন পর আমি আবার কেন এসেছি জান? তোমার জন্যই। বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—আসব তোমার কাছে, মাঝে মাঝে আসব। শুধু এই খুব অসময়ে দেখা হবে, যখন মানুষ ঘুমোয় কিংবা কেউ থাকে না কোথাও। অসময়ে—মনে রেখো। বলতে বলতে সে পিছন ফিরল। আমাদের বাগানে গাছপালা ঘন, সারাদিন ছায়ায় অন্ধকার হয়ে থাকে। সে এইসব গাছগাছালির মায়াময় ছায়াচ্ছন্নতার ভিতরে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল না। আমি আবার ভোরবেলায় উঠলাম পরদিন। আমাদের কুয়াশায় আচ্ছন্ন বাগানে কেউ ছিল না। আমি সুরকির পথ ধরে বাগান থেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। ঝুম কুয়াশায় খুব ভোর-আলোর ভিতরে যতদূর চোখ যায় চেয়ে দেখলাম, সব শূন্য। সে নেই। তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে, এ ভুল। আমি আগের দিন ভোরে বাস্তবিক কাউকেই দেখিনি। সে আমার কল্পনা। ফিকে বিষাদে আমার মন ছেয়ে গেল। তবে আমার একটা সুবিধে এই যে আমার কিছু হারায় না। আমি কল্পনায় সব পেয়ে যাই। সেখানে সেও রয়ে গেল চিরদিনের মতো। ভাবতে ভাবতে আমি ভোর, শীতল, প্রায়ান্ধকার জনশূন্য রাস্তায় রাস্তায় অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। স্বপ্নের সেই মেয়েটি আমাকে কথা দিয়েও ভুলে গেছে বলে কোনও ক্ষোভ রইল না।—ইচ্ছে থাকলেও আমি রোজ রাতে একই স্বপ্ন দেখতে পারি কি? তবে দুঃখ কীসের? ফিরে এসে দেখি ফটকের কাছে আমার ছোট বোন মাধবীলতার আর্চের কাছে দাঁড়িয়ে, মা বারান্দায়। শুধু আমি সামান্য বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি, আমার বোনের পরনে চেনা নীল শাড়ি, আর মায়ের গলায় সেই কাশ্মীরি স্কার্ফ জড়ানো।

—এ তো স্বপ্ন।

—স্বপ্ন না থাকলে এই অতি সুকঠিন, বিবর্ণ বাস্তবতা নিয়ে আমি কীভাবে বেঁচে থাকব? একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি, আমার মশারির এক ধার তুলে সে আমার দিকে ঝুঁকে চেয়ে আছে।

আমার চেতনা জুড়ে তীব্র ভয় লাফিয়ে উঠল। বল-এর মতো লাফাতে লাগল আমার হৃৎপিণ্ড। সে মৃদু হাসল—তুমি খুব দুর্বল? কেন? আমি জবাব দিলাম না। সেদিন তার পোশাক ছিল গোলাপি, তাতে জরির কাজ। সে স্নেহের একটি হাত আমার বুকের ওপর ফেলে রেখে ধীরে ধীরে বসল। আমি দেখলাম, সে সালোয়ার আর কামিজ পরে আছে। আমার স্মৃতি তার টানে আমাকে একবার অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে কী যেন দেখে নিতে বলল। আমি কিছুই মনে করতে পারলাম না। সে আবার মৃদু হেসে বলল—ছেলেবেলা থেকেই তুমি দুর্বল। তোমার মাথায় স্বপ্নের বাসা, তোমার মনে একরত্তি বাস্তবতা নেই। বলতে বলতে সে আরও ঝুঁকে পড়ে সামান্য তীব্রস্বরে বলল—আমাকে মনে পড়ে না তোমার? একদিন আমরা বনভোজনে গিয়েছিলাম ছেলেমেয়েরা। দলছাড়া হয়ে তুমি আর আমি পালালাম নদীর ধারে। তুমি ছিলে ভিতু, আমি সব সময়ে তোমাকে সাহস দিতাম। সেই নদীর ধারে আমি তোমাকে কবিতা শুনিয়েছিলাম। তুমি ছিলে বোকা, আসলে কবিতার ভিতর দিয়েই আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম যে, আমি তোমাকে...। তুমি ভয়ংকর অস্বস্তি আর অস্থিরতায় তার মানে বুঝবার চেষ্টা করোনি। তুমি বলেছিলে, পায়ে পড়ি ফিরে চলো। মনে পড়ে? আমি বললাম—না। মনে পড়ে না। আবার সেই হাসি হাসল সে—দ্বিধামুক্ত, কোমল কিন্তু জীবনশক্তিতে ভরা। বলল—তুমি সব পেয়েও পেতে চাও না, কেবল পালাতে চাও স্বপ্নের ভিতরে। তাই আমাকে অনেক রাস্তা পার হতে হল। তার গলার স্বরে এবার আস্তে আস্তে আমার সামান্য সাহস ফিরে আসে। বললাম—কোথা থেকে এলে তুমি অত বাক্সবোঝা নিয়ে? রেল গাড়িতেই তুমি কি এসেছ? অনেক দূরে থাকো কি তুমি? না, ছেলেবেলার তোমাকে আমার মনে নেই। তুমি কি রিনা? কিংবা আর কেউ, যাকে আমার মনে নেই? সে আমার মাথার ঝুঁটি নেড়ে দিল, বলল—তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। হায়! আমাকে তোমার মনে পড়ল না? অথচ কতদূর থেকে আমি এলুম শুধু তোমার জন্যই। কথা বোলো না, আমার হাত ধরে চুপ করে শুয়ে থাকো। শোনো, আমি তোমাকে একদিন আমাদের বাড়ির একটা গোপন কুঠুরির তালা খুলে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেই ঘরে ছিল কাঠের একটা পুরনো সিন্দুক। তার ভেতরে ছিল অনেক কাগজপত্র, রহস্যময় অনেক পুরনো দলিল, অনেক চিঠি। তুমি আর আমি আমাদের নিষেধের ছেলেবেলায় এক দুপুরে বসে অনেক চিঠি পড়েছিলুম একসঙ্গে। সেইসব চিঠি ছিল আমার মা আর বাবার মধ্যে লেখা প্রেমপত্র। না ভুল বললাম, শুধু প্রেমপত্র নয়, সেগুলো বিয়ের পরে লেখা। কিছু সাংসারিক কথাও তার মধ্যে ছিল। পড়তে পড়তে, হাসতে হাসতে আমরা এক সময়ে দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিলুম। সেই কাঠের সিন্দুকের ওপর অনেক পুরনো কাগজের গন্ধের মধ্যে। মনে পড়ে? তোমার মনে নেই, কেননা সে সবই অতি তুচ্ছ ঘটনা, খুব সামান্য, তাদের যত্ন করে আমিই মনে রেখেছি এতদিন। হায়! সে সব তুচ্ছ ঘটনা ছাড়া আমার আর কিছু নেই। তোমাকে সেইসব ফিরিয়ে দিতে এসেছি। দিয়ে গেলুম। আমি তার হাত মুঠো করে ধরে রইলুম। সে অন্ধকার ঘরের চারদিকে চাইল। বলল—এই ঘরে আর কে থাকে? ওই বিছানায় তোমার বুড়ি ঠাকুমা আর ছোট ভাই বোন, না? আর পাশের ঘরে তোমার মা বাবা, তাই না? আর এই ছোট্ট বিছানায় তুমি! সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল—সুন্দর সংসার তোমাদের। শান্ত পরিপাটি ভাল মানুষদের পরিবার। তোমাদের ঘরের আনাচে কানাচে সুন্দর সব স্বপ্নেরা ঘুরে বেড়ায়, প্রজাপতির মতো ওড়ে কল্পনা। এরকম পরিবারই আমি ভালবাসি। এতদিন হয়ে গেছে, এখন আর বলাই যায় না যে, আমি তোমাকে...। সে থেমে শুধু আমার দিকে চেয়ে রইল। ঘরে কোথাও আলো ছিল না, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। কামিজের কলারে জরি তার ঘাড়ের সুন্দর রঙের ওপর জ্বলছে। তার মেরুন ঠোঁট থেকে শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে যাচ্ছে ঘরের বাতাস। তার নরম হাত ক্রমশ গলে যাচ্ছে আমার হাতের মৃদু উত্তাপে। সে অনেকক্ষণ ওইভাবে বসে রইল। আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে মৃদু গলায় বলল—ঘুমোও। যতক্ষণ ঘুমিয়ে না পড়ো ততক্ষণ বসে থাকব। তৎক্ষণাৎ আমি বললাম—তা হলে ঘুমোব না। এসো, দুজনে জেগে থাকি। সে তার দুটো আঙুল আমার চোখের ওপর রাখল, সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর জুড়ে নেমে এল সম্মোহন, ঘুমের এক ঢল।

নিথর হয়ে গল্পটা শুনেছিল সীতা। প্রায় কিশোরী-বয়সি সে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেছিল—সেই বনভোজনে কী কবিতা সে শুনিয়েছিল?

মনোরম তৃপ্তির হাসি হেসে একটা নুড়ি ছুড়ে দিল জলে, বলল—মেরিলি র‍্যাং দ্য বেল, অ্যান্ড ওয়্যার ওয়েড...।

সীতা মুখ নিচু করে ছিল তারপর। নদীটা তট অতিক্রম করে তার বুকে উঠে এল। তারপর বুক জুড়ে বয়ে যেতে লাগল। তখন দুরে দু-একটা কণ্ঠস্বর তাদের নাম ধরে ডাকছিল। তারা কেউ উত্তর দিল না। শুনতে পেল না।

সীতা মৃদুস্বরে বলল—এ সবই গল্প।

—গল্পই। তোমাকে বলি, চপলা ছাড়া কোনও অনাত্মীয়া মেয়ের গা আমি কখনও ছুঁইনি, ছোঁয়ার মতো করে। অনাত্মীয়াই বা বলি কী করে। চপলা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়াই ছিল। আমরা দেশের বাড়িতে যখন যেতাম, তখন বাচ্চা ছেলেমেয়েদের একটা বেশ বড় দঙ্গল এক ঢালাও বিছানায় শুতাম। তখন প্রায়ই চপলা আমার মাথার বালিশে ভাগ বসাত। আমার অসতর্ক ঠোঁটে চুমু খেত, ভয়ে আমি কাঠ হয়ে থাকতাম। সঞ্জীবচন্দ্রের একটা উপন্যাসে ছেলেবেলায় আমি একটা প্রেমের ঘটনা পড়ি। নায়িকা তেলের প্রদীপ হাতে রাত্রিবেলায় নায়ককে দেয়ালের ছবি দেখাচ্ছে ঘুরে ঘুরে। ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ নায়ক মুখ ফিরিয়ে বলল—তোমার গায়ে কী আশ্চর্য সদগন্ধ। শুনে প্রদীপ ফেলে নায়িকা ছুটে পালিয়ে গেল। ওই কথা দীর্ঘকাল ধরে গুনগুন করে ওঠার মতো আমার মনে রয়ে গেছে, তোমার গায়ে কী আশ্চর্য সদগন্ধ। চপলার শরীরের গন্ধ মনে নেই। বোধহয় সে ঘামের তেলের, কচি ঠোঁটের মিলিত গন্ধ—কিশোরী বা বালিকার গায়ে বোধহয় ওইরকম গন্ধ থাকে। তবু এখনও যখন গভীর রাতে কল্পনায় চপলা চুপি চুপি মশারি সরিয়ে সেই ছেলেবেলার দেশের রাত্রির মতো কাছে আসে, তখন এখনও আমি ফিসফিস করে বলে উঠি—তোমার গায়ে কী আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ। চপলা প্রদীপ ফেলে পালায়।

এটুকু বলে মনোরম প্রতীক্ষায় চেয়েছিল।

কী বলবে সীতা? তবে সে ইঙ্গিত বুঝেছিল। অবশেষে বলল—সে সব তো স্বপ্নে!

—স্বপ্নই। কিন্তু আর তো কখনও তাদের স্বপ্ন দেখব না।

—কেন?

মনোরম তীব্র হাতে আবার নুড়ি ছুড়ে মারল জলে, বলল—সে সব রেখে গেলাম ওইখানে। নদীতে। চপলা, রিনা, আর সব...

—তবে কী থাকল?

—তুমি বলো তো?

—...

—আমি কি আর কখনও সেই আশ্চর্য গন্ধ পাব? পাব না বোধহয়, না?

কৃত্রিম দুঃখে ভরা গলায় বলেছিল মনোরম।

—কী জানি।

—তুমি বলো।

মনোরম স্পর্শ করেছিল তাকে, কী সাহস। অনেকক্ষণ বুক ভরে টেনেছিল বাতাস, নতুন ফোটা ফুলের গন্ধ যেমন নেয় লোকে ঠিক তেমনি। সীতাব সুন্দর গন্ধ নিয়েছিল মনোরম। বলেছিল—আমি আর স্বপ্ন চাই না।

প্রবাসে, বিদেশে ছুটিতে যায় যুবক-যুবতীরা। কাছাকাছি হয়, একটু রং ছোড়াছুড়ি করে। কলকাতায় পা দিয়ে সব ভুলে যায়। বাইরে থেকে ঘরে এসে যেমন বাইরের ধুলো হাত-পা থেকে ধুয়ে ফেলে লোক তেমনি ধুয়ে ফেলে সব স্মৃতি। কিন্তু সীতা ভোলেনি। কলকাতায় ফিরেও।

সীতার দেওয়া টেলিফোন নম্বরটা হারিয়ে ফেলেনি মনোরমও। টেলিফোন করেছিল।

আজ বহুকাল বাদে বৃষ্টিতে-ধোয়া ময়দান পেরিয়ে, ব্রিজ পেরিয়ে, ঢালু বেয়ে যখন নেমে যাচ্ছে ট্রামগাড়ি, তখন সীতা স্পষ্ট সেই বহুকালের পুরনো টেলিফোনটা কানে তুলে শুনছিল কাঁপা কাঁপা একটা

ভিতু গলা—আমি মনোরম। তুমি কি সীতা?
গায়ে কাঁটা দেয়। এখনও।
কলকাতায় তো সেই বনভূমি নেই, স্বচ্ছ জলের নদীটিও নেই। তবু মানুষ ইচ্ছে করলে মনে মনে সেই বনভূমি আর সেই নদী সৃষ্টি করে নিতে পারে। তারা নিয়েছিল।
ভালবাসা? হবেও বা। তখন মনোরম বড় ছন্নছাড়া, চাকরি ছেড়ে এজেন্সি নেওয়ার কথা বলে। সীতার বাবা ব্যাপারটা আন্দাজ করে বলল—ও ছেলে এখনও লাইন পাচ্ছে না, ও কেরিয়ার তৈরি হচ্ছে?
তবু বিয়ে হয়েছিল। যেসব ছেলেরা নিজেরা যেচে মেয়েদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে, তাদের কেমন যেন পছন্দ হয় না সীতার। মনোরমও করেনি। সীতা করেছিল প্রস্তাব।
তারা সুখী হয়েছিল কিনা তা ঠিক বুঝতে বা ভাবতে চেষ্টা করেনি সীতা। সে শুধু ধীরে ধীরে কদমছাঁট চুলওলা মাথাটাকে ক্রমে নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে রাখতে শিখেছিল। ভালবাসা কি ওইরকমই কিছু? আর একজনের ইচ্ছাকে নিজেরও ইচ্ছা করে নেওয়া? নাকি আরও বড় বিশাল কিছু?
সীতা ভেবে পায় না। আজও বড় মনে পড়ে, দুঘরের মাঝখানে নীল পর্দাটা উড়ছে ঝোড়ো হাওয়ায়, দুঘর উদ্ভাসিত আলো। এ ঘরে চা ছাঁকছে সীতা, ও ঘরে ক্লান্ত মনোরম বসে আছে। অপেক্ষায়। কেবলই এই দৃশ্যটা মনে পড়ে। ঘরের আনাচে কানাচে সুখ তার অঙ্কুরের ডানা মেলেছিল কিনা কে জানে। তবু দৃশ্যটা বোধহয় আজ সুখী করে সীতাকে। দুঃখীও করে।
ট্রামগাড়ি অনেকক্ষণ ধরে থেমে থেমে চলে। রাস্তা যেন আর ফুরোয় না। বৃষ্টি থেমে গেছে কখন। শেষ বেলার রোদ উঠেছে। খোলা জানালা দিয়ে উদাসীন চেয়েছিল সীতা। পাশে বসা পুরুষ কিংবা মানুষের লোভী চোখের আক্রমণ আর টের পাচ্ছিল না সীতা।

একটা মেঘের স্তরের ভেতর সূর্য ডুবে গেল। সীতা বাড়ির রাস্তায় এসে পড়ল যখন, তখন হালকা অন্ধকার ছেয়ে যাচ্ছে। একটু অন্যমনে হাঁটছিল, বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়ানো অপেক্ষারত মানুষটিকে সে প্রথমে লক্ষ করেনি। কাছাকাছি হতেই লোকটা তীব্র শ্বাসের শব্দ করে ডাকল—সীতা।
চমকে উঠে তাকিয়ে সে মজবুত কাঠামোর প্রকাণ্ড শরীরওলা মানসকে দেখতে পেল। মানস লাহিড়ি।
এক পা এগিয়ে এসে মানস বলে—এখন বাড়িতে ঢুকো না।
—কেন?
—তা হলে আর বেরোতে পারবে না, আবার পারমিশান-ফারমিশান নিতে হবে। তার দরকার কী? চলো কেটে পড়ি, ঘুরে-টুরে একেবারে ফিরবে।
—সেই জন্যই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তায়?
—সেই জন্যই। তোমাকে মাঝপথে ধরব বলে। চলো জিনিসগুলো আমাকে দাও—নিচ্ছি। কোথায় গিয়েছিলে?
—মাঝে মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। এমনি ঘুরে এলাম একটু।
—ট্যাক্সি নেব?
সীতা হাসল। বলল—ট্যাক্সি কেন? অনেক দূরের প্রোগ্রাম।
—না, না। কোনও প্রোগ্রাম নেই। যেখানে খুশি একটু যাব। কত কথা জমে আছে।
দুজনে আবার বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকে। পাশাপাশি।
—খড়্গপুরে গিয়েছিলাম কদিনের জন্য। মানস বলে।
—জানি তো। সীতা হাসল।
—জানো তো বটেই। কিন্তু এ ক'দিন তোমাকে না দেখে কীরকম কেটেছিল খড়্গপুরে তা তো বলিনি।
সীতা মাথা নিচু করল একটু। কথা বলল না।

বন্ধুবান্ধবদের বলছি, যদি কাউকে কিছু টাকা পাইয়ে দিতে পারি। আপনার অবস্থা তো ভাল যাচ্ছে না ব্যানার্জি।

মনোরম মাথা নেড়ে বলল—না।

বিশ্বাস দুঃখিত গলায় বলল—দ্যাট উওম্যান?

মনোরম শ্বাস ছেড়ে বলে—দ্যাট উওম্যান।

বিশ্বাস গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলে—ব্যানার্জি, বউ বিশ্বাসী না হলে ভারী মুশকিল। আমাদের মতো বয়সে পুরুষ মানুষের বউ ছাড়া আর বিশ্বস্ত কেউ তেমন থাকে না। আমারও সব কিছু বউয়ের নামে। বাড়ি, গাড়ি এভরিথিং। বউটা দজ্জালও বটে, কিন্তু ফেইথফুল।

মনোরম টাকরা দিয়ে নড়ন্ত জিভটাকে চেপে ধরে থাকে। রক্তের ঝাপটা তার মুখে লাগে। কান দুটো গরম হয়ে ওঠে।

বিশ্বাস সেটা খেয়াল করল না। বলল—দুপুরে বিজনেস পিক আওয়ার্স বলে বিয়ার বেশি খাই না। তারপর সন্ধে হলে স্কচ থেকে শুরু করে দেশি কত কী গিলব তার ঠিক নেই। রাত দশটায় যখন ফিরব বউ ফারনেস হয়ে আছে। কলিং বেল টিপে আধতলা সিঁড়ি নেমে রেলিংয়ের পাশে লুকিয়ে বসে থাকি। বউ দরজা হাট করে খুলে দেয়, তারপর উঁকিঝুঁকি না দিয়ে ভিতরে অপেক্ষা করে। আমি তখন আবার উঠে আসি। ভিতরে ঢুকি না। বাইরে থেকে এক পাটি জুতো পা থেকে খুলে ভিতরে ছুড়ে দিয়ে অপেক্ষা করি। যদি জুতোটা খুব জোরে ঘর থেকে ব্যাক করে আসে তবে বুঝি বউ আজ আপসে আসবে না. জোর খিচান হবে। যদি জুতো ব্যাক না করে তবে বুঝি বউ খুব খিচান করবে না, বউ বড় জোর বাপ-মা তুলে দু-একটা গালাগাল দেবে।

মনোরম এক নাগাড়ে হাসছে। গাল ব্যথা হয়ে গেল। বলল—থামুন মশাই, বিষম খাব।

—ব্যাপারটা কিন্তু একজ্যাক্টলি এরকম। বাড়িয়ে বলছি না। যেদিন খিচান হয় সেদিন বউ মারধোরও করে। চুল ধরে টানতে টানতে বাথরুমে নিয়ে যায়, তারপর দরজা বন্ধ করে...

—বাথরুমে কেন?

—বাঃ, ছেলেমেয়েরা রয়েছে না! বলে বিশ্বাস সুখী গৃহস্থের মতো হাসে। বিশ্বাসের চেহারাটা যদিও মা দুর্গার পায়ের তলাকার অসুরটার মতোই—কালো, প্রকাণ্ড রোমশ এবং বিপজ্জনক, তবু এখন তার মুখখানা একটা গার্হস্থ্য সুখের লাবণ্যে ভরে গেল। বলল—কিন্তু তবু আমার বউ ফেইথফুল। লাইক এ বিচ। নানারকম মেয়েলি রোগে ভুগে শরীরটা শেষ করেছে। আমি আবার একটু বেশি সেক্সি, তাই আমাকে ঠিক এন্টারটেন করতে পারে না, অ্যান্ড আই গো টু আদার গার্লস।

—বউ জানে?

বিশ্বাস মৃদুস্বরে বলে—জানে মানে আন্দাজ করে। তবে চুপচাপ থাকে। ভেরি কনসিডারেট। এটা তো ঠিক যে সে শরীরটা দিতে পারে না। তাই শরীর আমি বাইরে থেকে কিনি। কিন্তু তা ছাড়া আমিও ফেইথফুল।

বিশ্বাস মৃদুস্বরে বললেও ওর ফিসফাস কথা দশ হাত দূর থেকে শোনা যায়। মনোরম আশপাশের টেবিলে একটু চেয়ে দেখে নিল। তারপর বলল—আপনি সুখী?

—খুব। আপনার কেসটা কী?

—বনত না।

—কেন?

—বুঝতে পারতাম না। তবে আমাদের দুজনেরই ছিল পরস্পরের প্রতি এক রকমের রিপালশান। সেটা বেড়ে বেড়ে একসময়ে কানেকশন কেটে গেল।

—স্যাড।

মনোরম মৃদু একটু হাসল। বলল—আরও স্যাড যে, আমিও অন্য সকলের মতো বউয়ের নামে টাকা রাখতাম, জমি কিনেছিলাম, লকারেও কিছু ছিল। সেগুলো হাতছাড়া হয়ে গেল।

—কিছু রিয়ালাইজ করতে পারেননি?

—না। আমি প্রায় ব্যাঙ্করাপ্ট। আমার সম্বন্ধী দুঁদে অ্যাডভোকেট। ডিভোর্সের সময়ে মাসোহারা ও

বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। বিশ্বাস, আমার একটা ওপেনিং দরকার। যে কোনও একটা কাজ। আমি আবার দাঁড়াতে চাই।

বিশ্বাস গম্ভীর এবং সমবেদনার মুখ করে বলল—দেখব ব্যানার্জি, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।

—দেখবেন।

বিয়ার শেষ করে দুজনেই উঠেছিল। বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। ভেজা পার্ক স্ট্রিটটাকে কুচকুচে কালো দেখাচ্ছিল। জলে ছায়া ফেলে নিথর দাঁড়িয়ে ছিল বিশ্বাসের গাড়িখানা। পুরনো মরিস। তার সাদা রংটা থেকে মেঘভাঙা রোদ পিছলে আসছে।

বিশ্বাসের গাড়িতে একটা লিফট পেতে পারত মনোরম। কিন্তু রেস্তরাঁর দরজায় বিশ্বাস তার একজন চেনা লোক পেয়ে গেল হঠাৎ।

অবিকল টেলিফোনে কথা বলার মতো বিশ্বাস চেঁচিয়ে বলল—হ্যালো। অরোরা, ইজনট ইট? বিসোয়াস হিয়ার।

দুজনে আবার ঢুকে যাচ্ছিল রেস্তরাঁয়। বিশ্বাস ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—আচ্ছা ব্যানার্জি, বাই।

মনোরম হাতটা তুলল। তারপর পার্ক স্ট্রিট ধরে হাঁটতে লাগল পশ্চিমমুখো।

ময়দানের ধার ঘেঁষে দক্ষিণমুখো ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। এতক্ষণ লোকজন বৃষ্টির জন্য আটকে ছিল গাড়ি-বারান্দায়, দোকানঘরে, বাস-স্টপের শেড-এ। এখন সব সরষেদানার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে চারধারে। ট্রাম বন্ধ, বাসে তাই লাদাই ভিড়। হাতে পায়ে চুম্বকওয়ালা কলকাত্তাই লোকেরা বাসের গায়ে সেঁটে আছে অবলীলায়। বাসের গা থেকে অন্তত তিন হাত বেরিয়ে আছে মানুষের নশ্বর শরীর।

মনোরমের ঠিক এক্ষুনি কোথাও যাওয়ার নেই। যতক্ষণ বিয়ারের গন্ধ শরীরে আছে ততক্ষণ গড়িয়াহাটার কাছে মামার কাঠগোলায় ফেরা যাবে না। বৃষ্টির পর এসপ্লানেড এখন ভারী ঝলমলে, রঙিন শো-উইনডোতে দোকানের হাজার জিনিস, রঙিন পোশাকের মানুষ, রঙিন বিজ্ঞাপন। টেকনিকালার ছবির মতো চারদিকের চেহারা এখন ধুলোটে ভাবটা ধুয়ে যাওয়ার পর। কাজ না থাকলেও এসপ্লানেডে ঘুরলে সময় কেটে যায়।

রাস্তা পার হয়ে মেট্রোর উল্টোদিকে ট্যাক্সির চাতালে তখন উঠে-যাওয়া পসারিরা দ্রুত ফুচকার ঝুড়ি, ভেলপুরির বাক্স, ছুরি কাঁচি কিংবা মনোহারি জিনিস সাজাচ্ছে। ট্রাম টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা ট্রাম। তারই একটাতে উঠে একটুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থাকবে ভেবেছিল মনোরম। ফুটপাথ ছেড়ে ইট-বাঁধানো চাতালটায় নামতে গিয়েও সে বাড়ানো পা টেনে নিল। সীতা না?

সীতাই। সোনা রঙের মুর্শিদাবাদি শাড়ি পরনে, ডান হাতে ধরা দু-একটা কাগজের প্যাকেট বুকে চেপে সাবধানে হাঁটছে। বাঁ হাতে শাড়িটা একটু তুলে পা ফেলছে। মাথা নোয়ানো। পাতলা গড়ন, ছিপছিপে ছোট্ট সীতা। নরম মুখশ্রী, কাগজের মতো পাতলা ধারালো ছোট্ট নাক, লম্বাটে মুখখানা, ছোট্ট কপাল, চোখের তারা দুটি ঈষৎ তাম্রাভ, মাথার চুল বব করা। বেশ একটু দূরে সীতা, ওর মুখখানা সঠিক দেখতে পেল না মনোরম। কিন্তু দূর থেকে দেখেই সবটুকু সীতাকে মনে পড়ে গেল। ছয়-সাত বছর ধরে সীতার সবটুকু দেখার কিছুই তো বাকি ছিল না। আশ্চর্য কার্যকারণ। একটু আগে বিয়ারের বোতল সামনে নিয়ে সে হোঁতকা বিশ্বাসটার কাছে সীতার কথা বলছিল।

একটা রগ মাথার মধ্যে ঝিনন করে চিড়িক দেয়। মনোরম গাছের মতো দাঁড়িয়ে থেকে দেখে, কী সুন্দর অপরূপ রোদে সীতা একটু ভেঙে নুয়ে মহার্ঘ মানুষের মতো হেঁটে চলেছে। সব জায়গা থেকে হঠাৎ সূর্যরশ্মিগুলি থিয়েটারের আলোর মতো এসে ওকে উদ্ভাসিত করে। পিছনে মরা গাছ, মেঘলা আকাশ, এসপ্লানেড ইস্টের বাড়ির আকাশরেখা, চার দিকে ফড়ে, দালাল, দোকানির আনাগোনা। কিন্তু আবহের আলো এই ভিড়ে কেবলমাত্র সীতাকেই উদ্ভাসিত করে। সোনালি শাড়িটা আগাগোড়া সোনালি, কোথাও কোনও কাজ নেই, আঁচল নেই, সোনালি ব্লাউজ, পায়ে কালো সরু স্ট্রাপের চপ্পল—সবটুকু ঝলসায় এই রোদে, কিংবা রোদই ঝলসে ওঠে ওকে পেয়ে? পেটে অঢেল বিয়ার, তাই ঠিক বুঝতে পারে না মনোরম। তলপেটটা জলে ভারী হয়ে টনটন করছে, একটা কেমন গরমি ভাপ বেরোচ্ছে শরীর থেকে, আকণ্ঠ তেষ্টা। ভিখিরি যেমন ঐশ্বর্যের দিকে তাকায়, তেমনি অপলক তাকিয়ে

থাকে মনোরম। মনে হয় এই সীতাকে সে কখনও স্পর্শ করেনি।

কোথায় যাচ্ছে সীতা? কোথায় এসেছিল? বোধহয় বেহালার ট্রাম ধরতেই যাচ্ছে। ওদিকের ট্রাম চালু আছে কি? চালু থাকলেও এই ভিড়ে উঠতে পারবে তো সীতা? ভাবল একটু মনোরম।

সীতা ট্রাম লাইন বরাবর হেঁটে গেল। একটু দাঁড়াল, চেয়ে দেখল দু'ধারে। তারপর দুটো থেমে থাকা ট্রামের মাঝ দিয়ে সুন্দর পদক্ষেপের বিভঙ্গ তুলে ওপাশে চলে গেল। দৃশ্যের শেষে যেমন মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়, নেমে আসে পর্দা, তেমনই হয়ে গেল চারধার। কিছু আর দেখার রইল না।

মনোরম চলল চাতালটা পেরিয়ে গোলঘরের দিকে। তীব্র অ্যামোনিয়ার গন্ধের ভিতরে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করল। এবং বেরিয়ে আসার পর টের পেল, ভীষণ একা আর ক্লান্ত লাগছে। কোথাও একটু যাওয়া দরকার এক্ষুনি। কারও সঙ্গে কথা বলে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকা দরকার। সীতাকে দেখার ধাক্কাটা সে ঠিক সামলাতে পারছে না। সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না যে, সে সত্যিই সীতাকে দেখেছে। এমন আচমকা হঠাৎ কেন যে দেখল। দেখল, কিন্তু দেখা হওয়া একে বলে না।

আকাশ আজ খেলছে। দ্রুত গুটিয়ে নিল রোদের চাদর। বৃষ্টিটা চেপে আসবে। দু-চারটে চড়বড়ে ফোঁটা মনোরমের আশেপাশে যেন বা হেঁটে গেল। ততক্ষণে অবশ্য মনোরম লম্বা পা ফেলে জোহানসন অ্যান্ড রো-র অফিস বাড়িটায় পৌঁছে গেছে।

পুরনো সাহেবি অফিস। বাড়িখানা সেই সাহেব আমলের গথিক ধরনের। শ্বেতপাথরের মতো সাদা রং, বৃষ্টিতে ভিজেও শুভ্রতা হারায়নি। সামনে খানিকটা সবুজ সযত্নরচিত জমি, শেকল দিয়ে ঘেরা। বাঁকা হয়ে ড্রাইভওয়ে ঢুকে গেছে। সার সার গাড়ি দাঁড়ানো। তার মধ্যে সমীরের সাদা গাড়িটা দেখল মনোরম। অফিসেই আছে।

চমৎকার কয়েকটা থামে ঘেরা পোর্টিকো পেরিয়ে রিসেপশনের মুখোমুখি হওয়ার আগে মনোরম আকাশটা দেখল। গির্জার ওপর ক্রুশচিহ্ন, তার ওপাশে আকাশটা সাদা বৃষ্টির চাদরে ঢাকা। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। সীতা ট্রামে উঠেছে? না হলে ভিজবে। খুব ভিজবে।

রিসেপশনের বাঙালি ছেলেটা চমৎকার ইংরেজিতে বলে—সমীর রয়? অ্যাকাউন্টস। আপ ফার্স্ট ফ্লোর।

মনোরম মাথা নেড়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। শ্বেতপাথরের প্রাচীন এবং রাজসিক সিঁড়ি। বহুকাল ধরে পায়ে পায়ে ক্ষয়ে গিয়ে ধাপগুলো নৌকোর খোলের মতে দেবে গেছে একটু। তবু সুন্দর দোতলার মেঝেতে পা দিলে মেজেতে পারসিক কার্পেটের সূক্ষ্ম এবং রঙিন সুতোর মতো কারুকাজ দেখা যায়। কোথাও কোথাও ফাটল ধরেছে, তবু তেলতেল করছে পরিষ্কার। মোটা দেওয়ালের মাঝখানে নিঃশব্দ করিডোর, তাতে বদ্ধ বাতাসের গন্ধ। অফিসবাড়িটায় পা দিলেই একটা 'গুডউইলের' অলক্ষ্য অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। গুডউইল। বিশ্বস্ততা এবং সুনাম।

একটা বড় হলঘরের একধারে টিকপ্লাইয়ে ঘেরা চেম্বার। সেখানে সমীর রায় বসে। সামনে প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তার ওধারে সমীর। মনোরমের ভায়রাভাই। কিংবা ভূতপূর্ব ভায়রাভাই। লম্বা চেহারায় এখন একটু মেদ জমেছে, রংটা কালোই ছিল, এখন ইটচাপা ঘাসের মতো ফরসা হয়েছে। ভাল খায়-দায়, গাড়ি চড়ে বেড়ায়, গায়ে গলায় রোদ লাগে না। সরু টাই, চেয়ারের পিছনে কোট ঝুলছে। ঝুঁকে একটা কাগজ দেখছিল সমীর। চমৎকার একজোড়া মদরঙের ফ্রেমের চশমার ওপর ওর বড় কপাল, লালচে চুল, টিকোলো নাক, এবং গভীর খাঁজওলা থুতনিতে আভিজাত্য ফুটে আছে। সেই মুখশ্রীতে ওর চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সটা ধরা যায় না। অনেক কম বলে মনে হয়।

মনোরমের কোনও কাজ নেই। ব্যস্ত সমীরের কাছে দু'দণ্ড বসা কি সম্ভব হবে! দু-চারটে কথা কি ও বলবে মনোরমের সাথে! একটু দ্বিধা ও অনিশ্চয়তায় ও টেবিলটার কাছাকাছি এল।

সমীর মুখ তুলে বলল—আরে, মনোরম! কী খবর?

তীক্ষ্ণ চোখে মনোরম সমীরের মুখখানা দেখে নিল। না, খুশি হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। চোখ দুটি সামান্য বিস্ফারিত হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। যারা অভিজাত তাদের একটা সুশিক্ষা আছেই, মনোভাব তারা ঢেকে রাখতে পারে। বিস্ময় এবং বিরক্তিকে অনায়াসে চাপা দিয়ে সমীর হাসল।

—একটু এলাম। খুব ব্যস্ত নাকি? মনোরম বলে।

—একটু, বলে সমীর চেয়ারে হেলান দিয়ে আঙুলে মাথার চুল পাট করতে করতে বলল—সাড়ে চারটেয় কিক অফ। ভাবছিলাম তাড়াতাড়ি কাজটাজ চুকিয়ে একটু মাঠে যাব। বলে ঘড়ি দেখে সমীর বলে—ঠিক আছে, তুমি বোসো। খানিকক্ষণ সময় আছে।

বিয়ারটা এখনও পেটে, ঘাম বা পেচ্ছাপের সঙ্গে এখনও পুরোটা বেরিয়ে যায়নি। মনোরম চেয়ার টেনে বসে হিসেব করে নিচ্ছিল, এতবড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা পার হয়ে সমীরের নাকে অ্যালকোহলের গন্ধটা যাচ্ছে কিনা। টেবিলের ওপর হেলাভরে পড়ে আছে এক প্যাকেট বেনসন আর হেজেস, ছোট্ট দেশলাই। মনোরম প্যাকেটটা টেনে সিগারেট ধরাল। সমীর লক্ষ না-করার ভান করে নিচু হয়ে একটা ড্রয়ার টেনে কী একটু দেখতে লাগল কাগজপত্র।

দামি সিগারেট, কিন্তু বিয়ারের পেটে কোনও ভাল গন্ধ পাওয়া মুশকিল। মনোরম যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল—গীতাদি ভাল?

—ভালই। একটা বাচ্চা হয়েছে জানো তো! ছেলে।

—না।

—সাড়ে তিন কেজি। রুমি ভাই পেয়ে খুব খুশি। দিনরাত বেড়ালের মতো থাবা গেড়ে ভাইয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে বসে আছে।

বলে এবার সত্যিকারের খুশির হাসি হাসল সমীর। মেয়ে রুমির পর দশ বছর বাদে ওদের ছেলে হল। খুশি হওয়ারই কথা।

মনোরম যান্ত্রিক এবং অন্যমনস্ক গলায় বলে—কংগ্র্যাচুলেশনস।

সমীর মাথার চুলে মুদ্রাদোষবশত আঙুল চালাতে চালাতে বলে—একটু বেশি বয়সে হল, ঠিকমতো মানুষ করে যেতে পারব কি না কে জানে!

সমীরের গলার স্বরটা ভারী এবং পরিষ্কার। একেই কি বাস্ ভয়েস বলে? এত ভদ্র এবং মাজা গলা যেন মনে হয় খুব উঁচু থেকে আসছে। এত শিক্ষিত ও ভদ্র গলায় কখনও কোনও অশ্লীল কথা বলা যায় না। সমীর বোধহয় তার বউকেও কখনও কোনও অশ্লীল কথা বলেনি, যা সবাই বলে। সীতাকে অনেক অশ্লীল কথা শিখিয়েছিল মনোরম, সীতা শুনে দুহাতে মুখ ঢেকে হাসতে হাসতে বলত—মাগো! পরে দু'-একটা ওইসব খারাপ কথা সীতাও বলত। ঠিক সুরে বা উচ্চারণে বলতে পারত না। তখন মনোরম হাসত। এবং ঠিক উচ্চারণটা আর সুরটা শেখাত। সীতা শিখতে চাইত না। সমীর আর গীতা কি অন্তরঙ্গ প্রবল সব মুহূর্তে ওরকম কিছু বলে? বোধহয় না। ওদের রক্ত অনেক উঁচু জাতের।

মনোরম সমীরের নম্র এবং সুন্দর কমনীয় মুখটির দিকে চেয়ে থেকে বলল—মানুষ করবার ভার আপনার ওপর নয়। টাকার ওপর। একটা হেভি ইন্সিওরেন্স করিয়ে রাখুন।

সামান্য একটু গম্ভীর হয়ে গেল সমীর। কিন্তু কথাটা গায়ে মাখল না। ডজ করে বেরিয়ে গেল। বলল—তার অবশ্য দরকার হবে না। যা আছে...বলে একটু দ্বিধাভরে থেমে থাকল। এত ভদ্র সমীর যে, টাকার কথাটা মুখে আনতে পারল না। মনোরমেরই ভুল। সমীররা তিন পুরুষের বড়লোক। ওর এক ভাই আমেরিকার হিউসটনে আছে, বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা মাইনে পায়, অন্য ভাই ফিলম প্রোডিউসার। সমীর নিজে বিলেতফেরত অ্যাকাউন্ট্যান্ট। সীতাদের পরিবারের উপযুক্ত জামাই। এ সব প্রায় ভুলেই গিয়েছিল মনোরম। প্রায় একবছর সীতাদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তেমনি চুলে আঙুল চালিয়ে সমীর বলে—তবে ছেলেকে মানুষ হতে দেখে যাওয়াটা বাপের একটা স্যাটিসফ্যাকশন।

মুখে কোনও বিরক্তির চিহ্ন নেই, তবু সমীরের বিরক্তিটা টের পাচ্ছিল মনোরম। ওর চোখ মনোরমের লম্বা চুল, বড় জুলপি আর কাজ করা পাঞ্জাবির ওপর থেমে থেমে সরে গেল। বোধহয় মনে মনে পোশাকটাকে সমীর পছন্দ করল না। কিন্তু কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলা সমীরের স্বভাব নয়। অভিজাতদের এইসব সুশিক্ষা থাকেই।

সমীর চোরাচোখে ঘড়িটা একবার দেখে নিল, বলল—তোমার কি কিছু বলার ছিল?

মনোরম মাথা নেড়ে বলল—না। একটু বসব বলে এসেছিলাম। বাইরে যা বৃষ্টি।

—বৃষ্টি। চোখ বড় করে বলে সমীর, তারপর একটু লাজুক হাসি হেসে বলে—বাইরের রোদ বা

কানে জল ঢেলে পালিয়ে গেল শুনি।

—তুই ঘুমোস কেন সন্ধেবেলা? বাবা রাগ করে না?

—ও ঘুম নয়। চোখ বুজে তোমার জন্য একটা গল্প ভাবছিলাম আর তুমি জল ঢেলে পালিয়ে গেলে। কানের মধ্যে এখনও জলটা ফচ ফচ করছে। আজ বাবাকে যদি বলে না দিই।

পকেট থেকে গম্ভীর ভাবে রিভলভারটা বের করে রবি তুলেই ট্রিগার টেপে।

ঠিসুং...ঠিসুং...ঠিসুং...আঃ আ আ, বলে প্রীতম টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দুধের গ্লাসে চুমুক দিয়ে রবি বলে—তারপর বলো।

চাঁপা অসহায় ভাবে বলে—কী যেন বলছিলাম।

—বড্ড ভুলে যাও তুমি।

—বুড়ো হচ্ছি না।

—বুড়ো হলে কি ভুলে যেতে হয়?

চাঁপা তার গালে গালটা ছুঁইয়েই সরিয়ে নেয় মুখ, বলে—বুড়ো পুরুতমশাই বলেন বাপপিতেমোর আত্মারা সব সময়ে আমাদের নাকি চোখে চোখে রাখেন। এমনিতে কিছু করতে পারেন না, কিন্তু প্রাণ ভরে ডাকলে তারা এসে আপদ বিপদের আসান করে দিয়ে যান। শিবুচরণ তখন ডাকতে থাকে—ও মোর বাপপিতেমো, তোমরা কে কোথায় আছ, দ্যাখোসে তোমাদের আদরের শিবের দশাখানা। নিশুত রাতে কে বা জানবে শিবেকে দংশেছে নিঘিন্নে জীব, কে ডাকবে ওঝা-বদ্যি, শিবে যে যায়...এইসব বিড়বিড় করে বলছে যখন, তখনই সাপটা হঠাৎ ঠিক মানুষের গলায় বলে—ওহে শিবুচরণ—

ও-ঘর থেকে পর্দাটা সরিয়ে দরজায় দাঁড়ায় দেবাশিস। একটু ভারী গলায় বলে—হারি আপ, হারি আপ—

—গী—মুখ ফিরিয়ে হাসে রবি। চাঁপা জড়োসড়ো হয়ে উঠে দাঁড়ায়, কোলে রবি।

দৃশ্যটা দেখে একটু হাসে দেবাশিস, পর্দাটা ফেলে দেয়। ও ঘর থেকে তার গলা পাওয়া যায়—ড্রেস আপ ম্যান, ড্রেস আপ।

—ইঁয়া। উত্তর দেয় রবি, তারপর দুটো টেস্ট দু' কামড় করে খেয়ে ফেলে দিয়ে বলে—দিদি, তাড়াতাড়ি করো।

—কিছু খেলে না সোনাবাবু!

—আঃ খেতে ইচ্ছে করছে না যে।

—দুধটুকু তবে দু' চুমুক, দাদা আমার।

—ইস্ কী যে যন্ত্রণা করো না।

বলে রবি ঢকঢক করে দুধটা খায়। হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে ডাকে—দিদি, তাড়াতাড়ি।

দেবাশিস ভিতরদিকের দরজা ভেজিয়ে দিল সাবধানে। রবি ও ঘরে পোশাক করছে। ঘড়িতে আটটা বাজে। তৃণা এখন নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেছে। ও একটু দেরিতে ওঠে। ওদের বাড়ির এখনকার দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে দেখে নিল দেবাশিস। তৃণার বর শচীন এখন বাগানে। এমন ফুল-পাগল, গাছ-উন্মাদ লোক কদাচিৎ দেখা যায়। কেবল মাত্র ওই গাছের জন্য ফুলের জন্য হাজরা রোডের সাতকাঠার মতো জমি সোনার দাম পেয়েও বেচবে না। ওই সাতকাঠার কোনও দরকারই হয় না ওদের, বাড়ির চারধারে বিস্তর জমি। বাড়ি ছাড়িয়ে রাস্তা, রাস্তার ও পাশে ওই ফালতু জমিটায় তার বাগান। এতক্ষণে সেখানে গাছপালার মধ্যে জমে গেছে শচীন। তৃণার এক ছেলে, এক মেয়ে, মনু আর রেবা। মনু টেনিস শিখতে যায় রবিবারে, রেবার নাচগানের ক্লাশ থাকে। আটটা থেকে সোয়া আটটার মধ্যে তৃণার চারধারে চাকর-বাকর ছাড়া কেউ বড় একটা থাকে না। অবশ্য থাকলেও ক্ষতি নেই। সবাই জানে, দেবাশিস আর তৃণার মধ্যে একটা প্লাস চিহ্ন আছে। এমন কী দেবাশিসের বউ চন্দনা আত্মহত্যা করেছিল না খুন হয়েছিল এ বিষয়ে সকলের সন্দেহ কাটেনি এখনও। পুলিশ অবশ্য কেস দিয়েছিল কোর্টে খুনের দায়ে দেবাশিসকে জড়িয়ে, তবে দুর্বল কেসটা টেকেনি। কিন্তু জনগণের মধ্যে এখনও সম্ভবত দেবাশিস

আসামি।

ডায়াল করার পর নির্ভুল রিং-এর শব্দ হতে থাকে আর দেবাশিসের একটা দুটো হৃৎস্পন্দন হারিয়ে যায়। শ্বাসের কেমন একটা কষ্ট হতে থাকে।

—হেল্লো। তৃণা বলে।

—দেব।

—বুঝেছি।

—কথা বলার অসুবিধে নেই তো!

—একটু আছে।

—ঘরে কেউ আছে নাকি?

—হুঁ।

—তা হলে দশ মিনিট পরে ফোন করব।

তৃণা একটু হাসে। বলে—না না, ভয় নেই এসময়ে কেউ থাকে নাকি! একে রোববার, তার ওপর বাদলা ছেড়ে কেমন শরতের রোদ উঠেছে। কেবল আমিই পড়ে আছি একা, কেউ নেই।

—কী করছিলে?

—টেলিফোনটা পাশে নিয়ে বসে ছিলাম, হাতে খোলা জীবনানন্দের সাতটি তারার তিমির; কিন্তু একটা কবিতাও পড়া হচ্ছিল না।

দেবাশিস গলাটা সাফ করে নিয়ে বলে—কী করবে আজ?

—কী আর! বসে থাকব। তুমি?

—আজকাল রবি ছুটির দিনগুলোয় চাঁপার কাছে থাকতে চায় না।

—বড় হচ্ছে তো, রক্তের টান টের পায়। শত হলেও তুমি বাপ।

—তুমি বেরোচ্ছ না?

তৃণা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—জানোই তো, চারদিকে লোকনিন্দের কাঁটাবেড়া, একা বেরোলেই শচীন এমন একরকম কুটিল চোখে তাকায়! আজকাল বুড়ো বয়সে বড্ড সাসপিশাস হয়েছে। ছেলেমেয়েরাও পছন্দ করে না। তাই আটকে থাকি ঘরে।

—দুর! ওটা কোনও কথা হল নাকি?

—তবে কথাটা কী রকম হলে মশাইয়ের পছন্দ?

—আমি বলি, তুমিও বেরিয়ে পড়ো, আমিও বেরিয়ে পড়ি।

—তারপর?

—কোথাও মিট করব।

তৃণা একটু চুপ করে থেকে বলে—দেব, রবি কিন্তু বড় হচ্ছে।

—কী করব?

—সাবধান হওয়া ভাল। যা কর ছেলেকে সাক্ষী রেখে কোরো না।

—তিনু, তুমি কিন্তু এতটা গেরস্ত মেয়ে ছিলে না, দিনদিন কী হয়ে যাচ্ছ?

—বয়স হচ্ছে।

—ও সব আমি বুঝি না। গত সাতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

—মিথ্যুক।

—কী বলছ?

—বলছি তুমি মিথ্যুক। তৃণা হাসে।

—কেন?

—পরশুদিনও তুমি সন্ধের পর গাড়ি পার্ক করে রেখেছিলে রাস্তায়, যেখান থেকে আমার শোয়ার ঘরের জানলা দেখা যায়।

বাঁ হাতে বুক চেপে ধরে দেবাশিস, শ্বাসকষ্ট। হৃৎস্পন্দন হারিয়ে যায় একটা...দুটো...। গভীর একটা শ্বাস টানে সে। বুকে বাতাসের তুফান টেনে নেয়।

দেবাশিস আস্তে করে বলে—কী করে বুঝলে যে আমি।
—তোমাকে যে আমি সবচেয়ে বেশি টের পাই।
—গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখেছ।
—না। আবছা গাড়িটা দেখেছি। আর দেখেছি ড্রাইভিং সিটে একটা সিগারেট আর দুটো চোখ জ্বলছে।
—যাঃ।
—আমি জানি দেব, সে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।
দেবাশিস দাঁত টিপে চোখ বুজে লজ্জাটাকে চেপে ধরে মনের মধ্যে। গলার স্বর কেমন অন্য মানুষের মতো হয়ে যায়, সে বলে—তুমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না।
—জানবে কী করে! তৃণা হাসে—তোমাকে যে না চেনে সে কী করে জানবে রাস্তায় কার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কে বসে আছে ড্রাইভিং সিটে একা ভূতের মতো! আমি ছাড়া এত মাথাব্যথা আর কার?
—তুমি অনেকক্ষণ বড় জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলে। পিছনে ঘরের আলো, তাই তোমার মুখ দেখতে পাইনি। যদি জানতাম যে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ!
—তা হলে কী করতে?
—তা হলে তক্ষুনি রাস্তায় নেমে ছক্করবাজি নাচ নেচে নিতাম।
—দেব, বয়স বাড়ছে।
দেবাশিস তৎক্ষণাৎ বলে—পাগলামিও।
—বুঝলাম। কিন্তু কেন? ওরকম কাঙালের মতো আমার বাড়ির পাশে বসে থাকবার মতো কী আছে? নতুন তো নয়।
দেবাশিস ঠিক উত্তরটা খুঁজে পায় না। রক্ত কলরোল তোলে। বুকে আছড়ে পড়ে অন্ধ জলোচ্ছ্বাস। সে বলে, তিনু, আমি বড় কাঙাল।
তৃণা একটু শ্বাস ফেলে। কিছু বলে না।
দেবাশিস বলে—শুনছ।
—কী?
—আমি বড় কাঙাল।
—কাঙাল কি না জানি না, তবে বাঙাল বটে।
—তার মানে?
—বাঙাল মানে বোকা। বুঝেছ?
—তাই বা কেন?
—রবি কোথায়? তোমার এ সব পাগলামির কথা তার কানে যাচ্ছে না তো?
—কানে গেলেই কী! ও বাচ্চা ছেলে, বুঝবে না।
তৃণা একটা মৃদু হাসি হেসে বলে—তুমি বাচ্চাদের কিছু জানো না। ওরা সব আজকাল পাকা বিচ্ছু হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া বাচ্চারা কিন্তু সব টের পায়।
দেবাশিস একটু হতাশার গলায় বলে—শোনো, রবির জন্য চিন্তার কিছু নেই। চিন্তা করে লাভও নেই। যদি টের পায় তো পাক। আগে বলো, তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি না।
তৃণা মৃদুস্বরে বলে—কোথায়?
—তুমি যেখানে বলবে।
—আমার লজ্জা করে। তোমার সঙ্গে যে তোমার ছেলে থাকবে!
—ও তোমায় চেনে না নাকি! এ সব নতুন ডেভেলপমেন্ট তোমার কবে থেকে মনে হচ্ছে?
—রবি বড় হচ্ছে তাই ভয় পাই। বুঝতে শিখছে।
—ভয় পেয়ো না। গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছি। ঘণ্টা খানেক চিড়িয়াখানা আর রেস্টুরেন্টে কাটাব। দুপুরে আমার বোনের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ। অবশ্য একা রবিরই নিমন্ত্রণ, ওদের বাড়িতে যে আমি খুব জনপ্রিয় নই তা তো জানোই, রবিকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আমি ফ্রি।

—তার মানে এগারোটা কি বারোটা হবে বেলা। আমি কি তোমার মতো স্বাধীন দেব? দুপুরে সকলের খাওয়ার সময়ে বাইরে থাকলে লোকে বলবে কী?

—তা হলে চিড়িয়াখানা বা রেস্টুরেন্টে এসো।

—তা হলে রবিকে চোখ এড়ানো যাবে না।

—উঃ। তুমি যে কী গোলমাল পাকাও না।

তৃণা হেসে বলে—আচ্ছা না হয় দুপুরের প্রোগ্রামই থাকল। কোথায় দেখা হবে।

—তুমি ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে থেকো।

দেবাশিস চোখের কোণ দিয়ে দেখে রবি এসে দাঁড়িয়েছে পর্দা সরিয়ে দরজার চৌকাঠে। স্ট্রেচলনের একটা হালকা নীল রঙের প্যান্ট আর দুধ-সাদা একটা টি-শার্ট পরনে, বুকের কাছে বাঁ ধারে মনোগ্রাম করা ওর নামের আদ্য অক্ষর। মাথায় থোপা থোপা চুলের ঘুরলি। একটু হাসি ছিল মুখে। সেটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে এখন।

—তা হলে? দেবাশিস ফোনে বলে।

—আচ্ছা ছাড়লাম।

—সো লং।

ফোনটা রেখে দেয় সে।

হাসিটা আর রবির মুখে নেই, মিলিয়ে গেছে, চেয়ে আছে বাবার দিকে। চোখে চোখে পড়তেই মুখটা সরিয়ে নিল।

দেবাশিস ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যে ঝড় থেমেছে, ঢেউ কমে এল, শুধু অবসাদ। টেনশনের পর এমনটা হয়, মুখে একটু সহজ হাসি ফুটিয়ে তোলা এখন বেশ শক্ত, টানাপোড়েন এখনও তো শেষ হয়নি। তৃণার সঙ্গে দুপুরে দেখা হবে, ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে। তার স্নায়ুর ভিতরে এখনও একটা তৃষ্ণার্ত উচাটন ভাব। দেখা হবে, পিপাসা বাড়বে, তবু এক সমুদ্রের তফাত থেকে যাবে সারা জীবন তৃণার সঙ্গে তার।

রবি মুখ তুলতে দেবাশিস ক্লিষ্ট একরকম হাসি হাসে। রবি কি সব বোঝে! বুকের মধ্যে একটা ভয় আচমকা হৃদ্‌যন্ত্রকে চেপে ধরে তার।

চতুর ভঙ্গিতে দেবাশিস এক পা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে বলে—দিস ইজ দেবাশিস দাশগুপ্ত।

বাড়ানো হাতখানা রবি ধরে শেকহ্যান্ড করতে করতে বলে—দিস ইজ নবীন দাশগুপ্ত, প্লিজড টু মিট ইউ।

রবির পিছনে চাঁপা দাঁড়িয়ে। পরিষ্কার শাড়ি পরেছে, চুল আঁচড়েছে। দেবাশিসের চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে ভারী নরম সুরে বলে—বাবা, আমি কি সোনাবাবুর সঙ্গে যাব?

দেবাশিস অবাক হয়ে বলে—কোথায়?

চাঁপা লাজুক গলায় বলে—সোনাবাবু ছাড়ছে না, কেবল সঙ্গে যেতে বলছে।

রবি করুণ মুখভাব করে বলে—দিদি যাবে বাবা?

দেবাশিস একটু ক্ষীণ হাসি হাসে, বলে—তোমার ইচ্ছে হলে যাবে, কিন্তু খাবে কোথায়? ওর তো নেমন্তন্ন নেই।

চাঁপার মুখ একটা হাসির ছটায় আলো হয়ে যায়, বলে—আমি কিছু খাব না, সকালে পান্তা খেয়ে নিয়েছি, সোনাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাকব, সেই আমার খাওয়া।

দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে, গাড়ির চাবিটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে দরজা খুলে লিফটের দিকে এগোয়।

দুই

প্রেম একরকম, পাপ আর একরকম; কোনটা প্রেম, কোনটা পাপ তা বোঝা যদিও মুশকিল, তবু কতগুলো লক্ষণ তৃণা জেনে গেছে। মনে মনে যখন সে দেবাশিসের কথা ভাবে তখন তার শচীনের দিকে তাকাতে লজ্জা করে, ছেলেমেয়ের দিকে চাইতে পারে না, আর বুকের মধ্যে একরকম তীব্র শুষ্ক বাতাস বয়, গলা শুকোয়, জিভ শুকোয়, বিনা কারণে চারদিকে চোরাচোখে তাকিয়ে দেখে। নিজের ছায়াটাকেও কেমন ভয়-ভয় করে।

বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরোতে গিয়েই তৃণা ভারী চমকে ওঠে। কিছু না, বাইরের বেসিনে শচীন খুবই নিবিষ্টভাবে তার বাগানের মাটিমাখা হাত ধুচ্ছে। বেঁটেখাটো মানুষ, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, বেশ শক্তসমর্থ চেহারা, চোখে মুখে একটা কঠোর পুরুষালী সৌন্দর্য আছে। শচীন তার দিকে তাকিয়েও দেখেনি, তবু তৃণা বাথরুমের দরজার পাল্লাটা ধরে নিজেকে সামলে নিল। খোলা শরীরের ওপর কেবল শাড়িটা কোনও রকমে জড়ানো। কেমন লজ্জা হল তার, তাড়াতাড়ি ডানদিকের আঁচল টেনে শরীরের উদোম অংশটুকু ঢেকে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত ঘবে চলে এল।

ঘরটা তার একার, সম্পূর্ণ একার। একধারে মস্ত খাট, বইয়ের শেলফ খাটের নাগালের মধ্যেই, অন্যধারে ড্রেসিং টেবিল, একটা ওয়ার্ডরোব, একটা আলমারি, সবই দামি আসবাব। মস্ত বড় বড় দুটো জানলা দিয়ে সকালের শারদীয় রোদ এসে মেঝে ভাসিয়ে দিচ্ছে, উজ্জ্বলতা প্রখর। সাধারণ সায়া ব্লাউজ পরে নিল সে, শাড়িটা ঠিক করে পরল, ওয়ার্ডরোব খুলে বাইরে বেরোনোর পোশাকি শাড়ি আর ম্যাচকরা ব্লাউজ বের করে পেতে রাখল বিছানায়। দূর থেকে একটু ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সেগুলো, তারপর আয়নার সামনে গিয়ে বসে। তার চেহারা ছিপছিপে, ফর্সা, মুখশ্রী হয়তো ভালই, কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক তার মুখের সজীবতা। চোখ কথা কয়, চোখ হাসে, নাকের পাটা কেঁপে ওঠে অল্প আবেগে। ঠোঁট ভারী, গাল ভারী, সব মিলিয়ে তার বয়স সত্যিকারের তুলনায় অনেক কম দেখায়। আবার বয়সের তলে তার কোথাও যে কোনও খাঁকতি নেই সেটাও বোঝা যায়। নিজেকে ভালবাসে তৃণা, ভালবাসার মতো বলেই। মাঝে মাঝে সে নিজের প্রেমে পড়ে যায়।

পাশের ঘরে শচীনের সাড়া পাওয়া যায়। সুরহীন একরকম গুনগুন শব্দ করে শচীন। গান নয়, অনেকটা গানের মতো। শচীনের ওই এক মুদ্রাদোষ। ওই সুরহীন গুনগুন শব্দ কি ওর একাকিত্বের?

যদি তাই হয়, তবু ওই একাকিত্বের জন্য তৃণা দায়ী নয়। দেবাশিসও নয়। একদা শচীনই ছিল তৃণার সর্বস্ব। কিন্তু শচীনের কে ছিল তৃণা? তৃণা তার ওই স্বরটা শোনে উৎকর্ণ হয়ে। দু'ঘরের মাঝখানের দরজা রাতে বন্ধ থাকে, দিনে মস্ত ভারী সাটিনের প্রর্দা ঝুলে থাকে। শচীন অবশ্য বেশিক্ষণ ঘরে থাকে না, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ওই পর্দা থাকে অনড় হয়ে। কেউ কারও ঘরে যায় না। এ বাড়ির আর এক কোণে থাকে ছেলেমেয়েরা। তাদের সঙ্গেও হুটহাট দেখা হয় না। হলেও কথাবার্তা হয় বড্ড কম। একমাত্র খাওয়ার সময়ে তৃণা সামনে থাকে। সেও এক নীরব শোকসভার মতো। সবাই চুপচাপ খেয়ে যায়। তৃণার চোখে জল আসে, কিন্তু তাতে লাভ কী? চোখের জলের মতো শক্তিশালী অস্ত্র যখন ব্যর্থ হয় তখন মানুষের আর কিছু নেই। সে তখন থাকে না। যেমন তৃণা এ বাড়িতে নেই, এ সংসারে নেই। মৃত্যুর পর বাঁধানো ফটো যেমন ঘরের দেয়ালে, সেও তেমনি। তাই তৃণা দায়ী নয়।

তৃণা ঘাড়ে গলায় পাউডারের নরম পাফ ছুঁইয়ে নেয়। সিঁদুর দেয়। সামান্য ক্রিম দু'হাতের তেলোয় মেখে মুখে ঘসে। এখন আর কিছু করার নেই। সারাদিন তার করার কিছু থাকেও না বড় একটা। যে লোকটা রান্না করে সে দুই হাজার টাকা পাইনে পায়। তার অর্থ, লোকটাকে শেখানোর কিছু নেই। যে সব চাকর বা ঝি ঘরদোর গুছিয়ে রাখে তারাও নিজেদের কাজ বোঝে। তৃণা শুধু ঘুরে ঘুরে একটু তদারক করে। কখনও নিজের হাতে কিছু রাঁধে। সে কারও মুখে তেমন রোচে না, তৃণাও রান্নাবান্না ভুলে গেছে। শুধু কবে কী কী রান্না হবে সেটা বলে দিয়ে আসে। তাই হয়। কেবল নিজের ঘরটাতে সে নিজে বইপত্র গোছায়, বিছানায় ঢাকনা দেয়, ওয়ার্ডরোব সাজায়, ড্রেসিং টেবিলে রূপটানের জিনিস মনের মতো করে রাখে, কাগজ ভিজিয়ে তা দিয়ে আয়না মোছে। এ ঘরে কেউ বড় একটা আসে না। এ তার নিজের ঘর। বড্ড ফাঁকা, বড্ড বড়। রাস্তার দিকে একটা ব্যালকনি আছে, সেখানে একা ভূতের মতো

কখনও দাঁড়ায়। কবিতার বই, পত্র-পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস আর ছবি আঁকার জলরং, মোটা কাগজ, তুলি—এই সবই তার সারাদিনের সঙ্গী। ইদানীং সে কবিতা লেখে, দু-একটা কাগজে পাঠায়। সে সব কবিতা দুঃখভারাক্রান্ত, নিঃসঙ্গতাবোধে মন্থর, ব্যক্তিগত হা-হুতাশে ভরা ভাবপ্রবণতা—এখনও ছাপা হয়নি। এক-আধটা কবিতা ছাপা হলে মন্দ লাগত না তার। যে সব ছবি সে এঁকেছে তার অধিকাংশই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। নারকোল গাছ, চাঁদ আর নদীতে নৌকো—এ ছবি আঁকা সবচেয়ে সোজা। তারপরই পাহাড়ের দৃশ্য। তৃণা আঁকতে তেমন শেখেনি, তুলি-রঙের ব্যবহারও জানে না। ছবি জ্যাবড়া হয়ে যায়, তবু আঁকে। ভাবে একটা এগজিবিশন করবে নাকি একাডেমি বা বিড়লা মিউজিয়ামে! করে লাভ নেই অবশ্য। কেউ পাত্তা দেবে না। ছবি আঁকার মাথামুণ্ডুই সে জানে না। তৃণা কলেজে ভাল ক্যারাম খেলত। বাড়িতে বিশাল দুই বোর্ড আছে। একা একা মাঝেমধ্যে গুটি সাজিয়ে টুকটাক স্ট্রাইকারে টোকা দিয়ে গুটি ফেলে সে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বলে খেলার কোনও টেনশন থাকে না, ক্লান্তি লাগে। নিজের প্রতিপক্ষ হয়ে একবার কালো, আবার উল্টোদিকে গিয়ে নিজের হয়ে সাদা গুটি ফেলে কতক্ষণ পারা যায়?

শচীন একটানা গুনগুন শব্দে কথাহীন সুরহীন একটা গান গেয়ে যাচ্ছে পাশের ঘরে। বনেদি বড়লোক, তাই নিজের হাতে প্রায় কিছুই করতে হয়নি তাকে। বাবাই করে গিয়েছিলেন। বাবার বিশাল সম্পত্তি চার ভাই ভাগ করে নিয়েও বড়লোকই আছে। বাড়িটা শচীনের ভাগে পড়েছে, সিমেন্টের কারবার নিয়েছে বড় ভাই, ছোট দু ভাই নিয়েছে একজন ওষুধের দোকান, অন্যজন ভাল কয়েকটা শেয়ার। শচীনরা চার ভাই-ই শিক্ষিত। সে নিজে ইঞ্জিনিয়ার। ভাল চাকরি করে বড় ফার্মে। একবার নিজের পয়সায় অন্যবার কোম্পানির খরচায় বিলেত ঘুরে এসেছে! পৃথিবীর সব দেশেও গেছে সে, চীন আর রাশিয়া ছাড়া। এমন মানুষ আর এমন ঘর পেলে কোন মেয়ে না বর্তে যায়! শক্তসমর্থ এবং কিছুটা নিরাসক্ত শচীন ভালবাসে ফুল, সুন্দর রং, ভালবাসে চিন্তাভাবনা, মানুষের প্রতি তার আগ্রহ আছে। তবু এইসব ছুটির দিনে বা অবসরে সে যখন বাগান করে, মন্থরভাবে নিজের ঘরে জার্নাল নাড়াচাড়া করে, যখন গুনগুন করে, তখন তাকে বড় নিষ্কর্মা মনে হয়।

ছুটির দিনে তাই তৃণার বাড়িতে অসহ্য লাগে। একা একরকম আর জন থাকা সত্ত্বেও একা আর একরকম।

বড় অদ্ভুত বাড়ি। সারাদিনেও একটা কিছু পড়ে না, ভাঙে না, দুধ উথলে পড়ে না, ডাল ধরে যায় না। সুশৃঙ্খলভাবে সব চলে। তৃণাকে কোনও প্রয়োজন হয় না কোথাও। একটা অ্যালসেশিয়ান আর একটা বুলডগ বক্সার কুকুর আছে। সে দুটোরও কোনও ডাকখোঁজ নেই। কেবল শচীনের বুড়ো কাকাতুয়াটা কথা বলে পাকা পাকা। কিন্তু সে হচ্ছে শেখানো বুলি, প্রাণ নেই। অর্থ না বুঝে পাখি বলে—তৃণা, কাছে এসো, তৃণা...তৃণা, কাছে এসো...

পাখিটা বুড়ো হয়েছে। একদিন মরে যাবে। তখন তৃণাকে কাছে ডাকার কেউ থাকবে না।

না, থাকবে। দেবাশিস। ও একটা পাগল। এমনভাবে ডাকে যে দেশসুদ্ধু, সমাজসুদ্ধু লোক জেনে যায়। শচীন জানে, ছেলেমেয়েরাও জেনে গেছে। তৃণার বুকের ভিতরটা সবসময় কাঁপে। কখনও নিষিদ্ধ সম্পর্কের উত্তেজনায়। কখনও ভয়ে। শচীন কিংবা ছেলেমেয়েরা তাকে বেশ্যার অধিক মনে করে না। আর দেবাশিস? সে কি তাকে নষ্ট মেয়েমানুষ, ছাড়া আর কিছু ভাবে?

কাকাতুয়াটা ডাকছে, কাছে গিয়ে একটু আদর করতে ইচ্ছে করে পাখিটাকে। মস্ত দাঁড়টা ঝোলানো আছে শচীনের ঘরের বারান্দায়। যেতে হলে ও ঘর দিয়ে যেতে হবে। শচীন না থাকলে যাওয়া যেত। কিন্তু ওঘর থেকে সমানে সুরহীন গুন গুন শব্দটা আসছে। শচীনের চোখের সামনে নিজেকে নিয়ে গেলেই তার নষ্ট মেয়েমানুষ বলে মনে হয় নিজেকে। এ বড় জ্বালা। ভদ্রলোক বলেই শচীন তাকে কিছু বলে না আজকাল। মাস ছয়েক আগে ধৈর্যহারা হয়ে একদিন চড়চাপড় আর ছড়ির ঘা দিয়েছিল কয়েকটা। তারপর থেকেই হয়তো অনুতাপ এসে থাকবে। কিন্তু তৃণা ওকে জানাবে কী করে যে ওর হাতের সেই মার বড় সুখের স্মৃতি হয়ে আছে তৃণার কাছে আজও। কারণ, তার বিবেক ও হৃদয় একটা শাস্তি সবসময়ে প্রত্যাশা করে।

তৃণা তার পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে উপুড়-করা বইটা তুলে পড়তে বসল। কবিতার বই, বহুবার

পড়া, মুখস্থ হয়ে গেছে। তবু খোলা সনেটটার দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু মন দিতে পারে না, বইটা রেখে প্যাড আর কলম টেনে নেয়। কলম খুলে ঝুঁকে পড়ে, ধৈর্যহীন চঞ্চলতায় কলম উদ্যত করে নাড়ে। কিছু লিখতে পারে না। কয়েকটা রোগা লম্বা লোকের চেহারা এঁকে ফেলে, তারপর সারা কাগজটা জুড়ে হিজিবিজি আঁকতে আর লিখতে থাকে। কাগজটা নষ্ট করে দলা পাকিয়ে ফেলে দেয়। আবার হিজিবিজি করে পরের কাগজটাতে।

কাকাতুয়াটা শচীনকে ডাকছে—শচীন, চোর এসেছে—শচীন চোর এসেছে—

শচীনের ঘর এখন নিস্তব্ধ। কেউ নেই। তৃণা উঠে শচীনের ঘরে উঁকি দেয়। গোছানো ঘর। বাপের আমলের বাড়িটা শচীন আবার নতুন করে একটু ভেঙে গড়ে নিয়েছে। নতুন করে তৈরি করার জন্যই ডাক পড়েছিল দেবাশিসের। সিভিল ড্রাফটসম্যান আর ইন্টিরিয়র ডেকরেটর 'ইনডেক'-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কথাটা বড্ড ভারী, ইনডেক এমন কিছু বড় কোম্পানি নয়। কলকাতায় ওরকম কোম্পানি শতাধিক আছে। তবু ইনডেক-এর কিছু সুনাম আছে। ইন্টিনিয়র ডেকরেশন ছাড়াও ওরা ছোটখাটো কনস্ট্রাকশন কিংবা রিনোভেশন করে। বাড়ির প্ল্যান করে দেয়। এত কিছু একসঙ্গে করে বলেই কাজ পায়। দেবাশিস দাশগুপ্ত এক সময়ে আর্টিস্ট ছিল। কমার্শিয়াল লাইনে চমৎকার নাম করেছিল সে। কিন্তু উচ্চাশা বলবতী হওয়ায় সে কিছু দিন সিনেমার পরিচালনায় হাত লাগাল। সবশেষে ইন্টিরিয়র ডেকরেশনে এসে মন লাগাতে পারল। আর্টিস্ট ছিল বলে এবং রং ও ডিজাইনের নিজস্ব চোখ আছে বলে, আর পূর্বতন গুডউইলের জন্য ওর দাঁড়াতে দেরি হয়নি। এখন চৌরঙ্গিতে অফিস করেছে। একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, দু'জন ড্র্যাফটসম্যান এবং আরও কয়েক জনকে মাইনে দিয়ে রেখেছে, একটি মেয়ে রিসেপশনিস্ট আছে। নিজস্ব চেম্বারটা এয়ারকন্ডিশন করা, নিজের কেনা ফ্ল্যাটে থাকে। একটা মরিস অক্সফোর্ড গাড়ি হাঁকায়।

কিন্তু এ হচ্ছে আজকের দেবাশিস, পুরনো দেবাশিসকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার।

এ বাড়ি রিনোভেট করতে দেবাশিস যেদিন এল, বাইরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে চতুর পায়ে শচীনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখছিল বাড়িটা। চোখে উগ্র স্পৃহা, চলাফেরায় কেজো লোকের তাড়া। শচীন বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিল। কোথায় দেয়াল ভেঙে ব্যালকনি হবে, কোথায় মেঝের টালি পালটাতে হবে। কোথায় নতুন ঘর তুলতে হবে, আর কেমনভাবে সাজাতে হবে পুরনো বাড়িটাকে আধুনিক করে তুলতে। শচীনের সঙ্গের এই লম্বাপানা সুগঠন লোকটাকে অহংকারী তৃণা খুব হেলাভরে এক-আধপলক দেখছে, লক্ষ করেনি। শচীনই তাকে ডাকে—তৃণা, তোমার যে কী সব প্ল্যান আছে তা দাশগুপ্তকে বুঝিয়ে দাও—

চায়ের টেবিলে ওরা তখন বসেছে। মুখোমুখি দেবাশিস। তৃণা তার দিকে একপলক তাকিয়েই মুখ নিচু করে প্যাডে একটা স্টাডি রুমের ছবি এঁকে দেখাতে যাচ্ছিল, দেবাশিস একটু ভোম্বলের মতো তাকিয়ে থেকে বলে—তৃণা না?

তৃণা চমকে উঠেছিল। তাকিয়ে একটু কষ্টে চিনতে পেরেছিল দেবাশিসকে। ছেলেবেলার কথা, চিনতে তো কষ্ট হবেই।

শচীন বলে—চেনেন নাকি?

দেবাশিস বড় চোখে চেয়ে বলে—চেনা কঠিন বটে, তৃণার তো এতকাল বেঁচে থাকার কথাই নয়। যা ভুগত, ভেবেছিলাম মরে-টরে গেছে বুঝি এতদিনে।

—বটে! বলে শচীন হাসে।

—বটেই তো! দেবাশিস অবাক হয়ে বলে—আমাদের মফস্বল শহরে পাশাপাশি বাস ছিল। ওর সবকিছু আমি জানি। ছেলেবেলায় দেখতুম, ও হয় বিছানায় পড়ে আছে, না হলে বড়জোর বারান্দা কি উঠোন পর্যন্ত এসে হাঁ করে অন্য খেলুড়িদের খেলা দেখছে। কখনও আমাশা, কখনও টাইফয়েড, কখনও নিউমোনিয়ায় যায়-যায় হয়ে যেত, আবার বেঁচেও থাকত টিক-টিক করে। আমরা যখন ও শহর ছেড়ে চলে আসি তখন ও বোধ হয় ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। আমার মা প্রায়ই দুঃখ করে বলত—'মদনবাবুর মেজো মেয়েটা বাঁচলে হয়।'

তৃণা ভারী লজ্জা পেয়েছিল। সত্যিই সে ভুগত। বলল—আহা, সে তো ছেলেবেলায়।

—তারপর তো আর তোমাকে দেখিনি। আমাকে চিনতে পারছ তো।

—পারছি।

—বলো তো কে!

—রাজেন জ্যাঠার ছেলে।

দেবাশিস হঠাৎ হা হা করে হেসে বলে—রাজেন জ্যাঠা আবার কী! আমার বাবাকে ওই নামে কেউ চিনতই না। হাড়কেপ্পন ছিল বলে বাবার নাম সবাই দিয়েছিল কেপ্পন দাশগুপ্ত। সেটা সংক্ষেপ হয়ে হয়ে লোকে বলত কেপুবাবু। আমাদেরও ছেলেবেলায় কেউ কোন বাড়ির ছেলে জিজ্ঞেস করলে বলতুম—আমি কেপুবাবুর ছেলে।

তৃণার সবটাই মনে আছে। যারা রোগে ভোগে তাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়। কেপুবাবুর ছেলে দেবাশিসকে সবাই চিনত ডানপিটে বলে। অমন হারামজাদা পাজি ছেলে বড় একটা দেখা যায় না। যত ছেলেবেলার কথা বলে উল্লেখ করেছিল দেবাশিস তত ছেলেমানুষ তখন তারা ছিল না। তখন রোগে-ভোগা তৃণার বয়স বছর তেরো, দেবাশিসের উনিশ কুড়ি। পাড়ার সব মেয়েকেই চিঠি দিত দেবাশিস, একমাত্র রোগজীর্ণ তৃণাকেই তেমন গুরুত্ব দেয়নি বলে চিঠি লেখেনি। বহুকাল পরে সেই উপেক্ষিত মেয়েটিকে পরিপূর্ণ ঘরসংসারের চালচিত্রের মধ্যে দেখে তার বিস্ময় আর শেষ হয় না।

বলল—মেয়েদের মুখ আমার ভীষণ মনে থাকে। নইলে তোমাকে চেনবার কথা নয়। বেঁচে আছ, তাই বিশ্বাস হতে চায় না। শচীনবাবুর ভাগ্যেই বোধ হয় বেঁচে আছ। ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন। তুমি বেঁচে না থাকলে শচীনবাবুকে আজও ব্যাচেলার থাকতে হত।

ঘটনাটা এরকম নিরীহভাবেই শুরু হয়েছিল। ইনডেক তাদের বাড়িটা ভেঙে মেরামত করছে, সাজিয়ে দিচ্ছে, ব্যালকনি বানাচ্ছে, জানলা বসাচ্ছে—সেইসব তদারক করতে সপ্তাহে এক-আধবার আসত দেবাশিস। ভারী ব্যস্ত ভাবসাব, চটপটে কেজো মানুষের মতো বিদ্যুৎগতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেত। গম্ভীর, পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন দেবাশিস কোনওদিকে তাকাত না। দেখাশোনা শেষ করে কোনওদিন তৃণাকে ডেকে বলত—চলি। কোনওদিন বা দূরত্বসূচক হালকা গলায় বলত—চা খাওয়াবে নাকি কাদম্বিনী?

ও নামটা সে নিয়েছিল রবি ঠাকুরের 'জীবিত ও মৃত' গল্প থেকে। 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।' একদিন লাইনটা উদ্ধৃত করে দেবাশিস বলেছিল—তুমি হচ্ছ সেই মানুষ, মরোনি প্রমাণ করার জন্যেই বেঁচে আছ, কিন্তু কী জানি, বিশ্বাস হতে চায় না।

উল্টে তৃণা এলিয়টের লাইন বলেছে—আই অ্যাম ল্যাজারাস, কাম ফ্রম দি ডেড, কাম টু টেল ইউ অল, আই শ্যাল টেল ইউ অল—

শচীন সবসময়ে বাড়ি থাকে না। রেবা আর মনু বড়লোকের ছেলেমেয়ে যেমন হয় তেমনি নিজেদের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তৃণা সারাদিন একা। সে ক্যারাম খেলতে পারে, টেবিল-টেনিস খেলতে পারে, একটু আধটু ছবি আঁকে, কবিতা লেখে! কিন্তু কোনওটাই তার সঙ্গী নয়। বরং কবিতার বই খুলে বসলে একরকম দূরের অবগাহন হয় তার। দেবাশিস নামকরা আর্টিস্ট, দুটো ফ্লপ ছবির পরিচালক, বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী মহলে তার গভীর যোগাযোগ। তৃণার সেইটেই অবাক লাগত। ওই ফাজিল, মেয়েবাজ, এঁচোড়েপাকা ছেলেটির মধ্যে এ সব এল কোত্থেকে!

কখনও চা বা কফি খেতে বসে দেবাশিস বলত—তৃণা, তোমার সত্যিই কিছু বলার আছে?

তৃণা অবাক হয়ে বলেছে—কী বলার থাকবে?

—ওই যে বলো, আই শ্যাল টেল ইউ অল।

—যাঃ, ও তো কোটেশন।

—মানুষ যখন কিছু উদ্ধৃত করে তখন তার সাবকনশাসে একটা উদ্দেশ্য থাকে।

—আমার কিছু নেই।

দেবাশিস গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবত।

রেখার জন্মদিনে সেবার দেবাশিসকে সস্ত্রীক নেমন্তন্ন করেছিল তৃণা। দেবাশিসের বউ এল তার সঙ্গে। মানানসই বউ। ভাল গড়ন, লম্বাটে চেহারা। রং কালো, মুখশ্রী খারাপ নয়। কিন্তু সারাক্ষণ কেবল

টাকা আর গয়না আর গাড়ি আর বাড়ির গল্প করল। বুদ্ধি কম, নইলে বোঝা উচিত ছিল যে-বাড়িতে বসে বড়লোকি গল্প করছে সে-বাড়ি তাদের একশোগুণ ধনী। হঠাৎ যারা বড়লোক হয় তারা টাকা দিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না, হা-ঘরের মতো বাজার ঘুরে রাজ্যের জিনিস কিনে ঘরে জঙ্গল বানায়, বনেদি বড়লোকেরা ওরকমভাবে টাকা ছিটোয় না, গরম দেখায় না। দেবাশিসের বউ চন্দনা টাকায় অন্ধ হয়ে চোখের সামনে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। মুখে বেড়ালের মতো একটা আহ্লাদি ভাব, চোখে সম্মোহন, বার বার স্বামীকে ধমক দিচ্ছিল। অনেক অতিথি ছিল বাড়িতে। ওদের সঙ্গে বেশিক্ষণ সময় কাটাতে পারেনি তৃণা। অল্প যেটুকু সময় কাটিয়েছিল তাতেই তার বড় লজ্জা করেছিল। দেবাশিসের বউ বস্তুজগৎ ছাড়া আর নিজের সুখদুঃখ ছাড়া কোনও খবর রাখে না।

এ সব বছর-দুই আগেকার ঘটনা। বাড়ি রিনোভেট করা সদ্য শেষ হয়েছে তখন। নতুন হয়ে ওঠা বাড়ি ঝলমল করছে। তৃণা নিজের ঘরটা বেশি সাজায়নি। বেশি সাজানো ঘর তার পছন্দ নয়। তাতে তার মনের ধূসরতা নষ্ট হয়ে যায়। একটু সাদাসিধে নরম রং, আর আলো-হাওয়ার ঘরই তার ভাল লাগে। ভাল লাগে বিষণ্ণতা, একা থাকা, কবিতা।

দেবাশিস বলেছিল—তৃণা, ইনডেক তোমার জন্য কিছু করতে পারল না, একটা ব্যালকনি ছাড়া।

—আমার জন্য ইনডেকের কিছু করার নেই যে, আমি ডেকরেশন ভালবাসি না।

—জানি। তুমি ক্লায়েন্ট হিসেবে যাচ্ছেতাই!

তৃণা হেসেছিল একটু।

বিপজ্জনক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলল—কিন্তু মেয়ে হিসেবে ইউনিক। ঠিক বয়সটিতে ঠিক সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা হলে বড় ভাল হত।

তৃণা ভয় পেয়ে বলে—ইস!

দুঃখের মুখ করে দেবাশিস বলে—আমার বউকে তো দেখেছ!

—দেখলাম!

—কেমন?

—সুন্দর।

—সুন্দর কিনা কে জিজ্ঞেস করেছে।

—তবে?

—স্বভাবের কথা বলছি।

—বাঃ! তা কী করে বলব! একবার তো মোটে দেখেছি, বেশি কথাবার্তাও হয়নি। তবে স্বভাব খারাপ নয় তো!

—ও টাকা আর স্ট্যাটাস ছাড়া কিছু বোঝে না, কোনও অনুভূতি নেই।

—তাতে কী! সব মেয়েই ওরকম।

—তুমি তো নও?

তৃণা বিষণ্ণ হয়ে বলেছে—আমার কথা ছেড়ে দাও, বহুদিন রোগে ভুগে ভুগে আমি একটু অ্যাবনরমাল। আমি যে বেশি ভাবি, বেশি চুপ করে অন্যমনস্ক থাকি, কবিতা লিখি—এ সব আমার অস্বাভাবিক মন থেকে তৈরি হয়েছে। এ-বাড়ির কেউ আমাকে তাই পছন্দ করে না। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ইন্টেলেকচুয়াল মা বলে ক্ষ্যাপায়।

—হবে।

—শোনো, নিজের বউয়ের নিন্দে বাইরে কোরো না। ওটা রুচির পরিচয় নয়। যেমনটি পেয়েছ তেমনটির সঙ্গেই মানিয়ে চলো। তুমি বড় ছটফটে, চঞ্চল, বহু মেয়েকে চিঠি দিতে। অত মন তুলে নাও কী করে? তোমার যাকে-তাকে হুট করে ভাল লাগে, আবার হুট করে অপছন্দ হয়ে যায়। মনটা কোথাও একটু স্থির না করলে সারা জীবন ছুটে বেড়াতে হবে।

দেবাশিস মৃদুস্বরে হেসে বলে—তুমি এত কথা জানলে কী করে? আমি তো এখনও তেমন করে বউয়ের নিন্দে তোমার কাছে করিইনি। কী একটা কী একটা বলতে শুরু করেছিলাম। তুমি আগ বাড়িয়ে এককাঁড়ি কথা বললে।

ভারী লজ্জা পেয়ে গেল তৃণা। আসলে তার মন বড় বেশি কল্পনাপ্রবণ, একটু কিছু ঘটলেই তার পিছনে একটা বিশাল কার্যকারণ ভেবে নেওয়া তার স্বভাব। একবার আলমারি আর বাক্সের এক থোকা চাবি হারিয়ে ফেলেছিল সে, তার আগের দিন বাড়ির একটা দোখনো চাকর বিদেয় হয়েছে। চাবিটা চেনা জায়গায় খুঁজে না পেয়েই তৃণা ভাবতে বসল, এ নিশ্চয়ই সেই চাকরটার কাজ। জিনিসপত্র কিছু হাতাতে না পেরে চাবিটা নিয়ে পালিয়েছে। এরপর গাঁয়ের লোক জুটিয়ে একদিন ফাঁক বুঝে হাজির হবে। তৃণাকে মেরে রেখে ডাকাতি করে নিয়ে যাবে। কাল্পনিক ব্যাপারটাকে এতদূর গুরুত্ব দিয়ে সে প্রচার করেছিল যে শচীন বাধ্য হয়ে থানা-পুলিশ করে। চাকরটার গাঁয়ে পর্যন্ত পুলিশকে সজাগ করা হয়। কিন্তু তিনদিনের মাথায় বাথরুমে সাবানের খোপে চাবিটা তৃণাই খুঁজে পায়।

তার মন ওইরকমই। দেবাশিসকে সে প্রায় অকারণে বউয়ের ব্যাপারে দায়ী করেছে, দেবাশিস তার প্রেমে পড়ে গেছে গোছের চাপা একটা আশঙ্কা প্রকাশ করে ফেলেছে। লজ্জা পেয়ে সে বলে—আমার কেমন যেন মনে হয় তোমাকে! সাধারণ জীবনে তুমি খুশি নও।

দেবাশিস শ্বাস ফেলে বলেছে—তা ঠিকই। তবে খুব ভয়ের কিছু নেই।

যাই বলুক, ব্যাপারটা অত নিরাপদ ছিল না। এটা বোঝা যেতই দেবাশিস তার বউকে ভালবাসে না। অন্য দিকে তৃণাকে ভালবাসে না শচীন। কিংবা তৃণার কল্পনাপ্রবণ মন যেন সেইটাই ভেবে নেয়। মিথ্যে নয় যে তৃণার একথা ভাবতে ভালই লাগত যে শচীন তাকে ভালবাসে না। রেবা ভালবাসে না, মনু ভালবাসে না। সংসারে কেউ তাকে ভালবাসে না। সে একা, সে বড় দুঃখী। তার এই দুঃখের কোনও ভিত্তি থাক বা না থাক, একথা ভাবতে তার ভাল লাগত। এই দুঃখই তাকে সবচেয়ে বড় রোমান্টিক সুখটা দিত। দুঃখের চিন্তা বা চিন্তার দুঃখ কারও কারও কাছে বড় সুস্বাদু।

দেবাশিস সেই রন্ধ্রপথের সন্ধান পেয়েছিল। এ বাড়ির অনেক কাটা ভাঙা দুর্বল স্থান সে যেমন খুঁজে বের করে মেরামত করে ঢেকে সাজিয়ে দিয়ে গেছে তেমনি তৃণার সঠিক দুর্বলতাটুকু জেনে নিল সে অনায়াসে। কিন্তু সারিয়ে দিয়ে গেল না, বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

তৃণার মন এমনই একটা কিছু চেয়েছিল। কোনও অঘটন, একটু পতন, একটু পাপ, সামান্য অপরাধবোধ উজ্জ্বলতম রঙের মতো স্পষ্ট করে দেয় জীবনকে। তার সেই দুর্বলতা দেবাশিস ফুলের মতো চয়ন করে নিজের বাটনহোল সাজাল লাল গোলাপের মতো। গোলাপটা লাল কেন? তৃণা ভেবে দেখেছে। লোকলজ্জার রাঙা আভায় তা লাল। কিছু পাপ কালো, কিছু পাপ রাঙা।

রাঙা শাড়িটা পরে নিল তৃণা। সাজল। ঘড়িতে এখনও বেশি বাজেনি, সময় আছে, থাকগে! তৃণা একটু ঘুরবে। তার পর বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াবে।

তিন

পেট্রল পাম্পে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নেমে দেবাশিস আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল। হাই তুলতে তুলতে বলল—বিশ লিটার। বলে পকেট থেকে ক্রেডিট কার্ডটা বের করে দিল।

রবি নেমে আইসক্রিমের স্টলটার কাছে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলে—বাবা, বন্ধ যে!

—কী আর করা যাবে!

রবি বুটের শব্দ করে ছুটে আসে—আজ কেন বন্ধ?

—একটু পরে খোলে। চলো, তোমাকে ক্যান্ডি কিনে দেব।

গাড়ির ভিতর থেকে চাঁপা ডেকে বলে—সোনাবাবু, তোমার জন্য আমি তো খাবার এনেছি, বাইরের জিনিস তবে কেন খাবে?

রবি তার বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছোট চোখে বাবাকে একটু দেখল। প্যান্ট-শার্ট-পরা দীর্ঘকায় বাবা, গলায় একটা সিল্কের ছাপা সাদা-কালো স্কার্ফ। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাবা জুতোর আগাটা তুলছে নামাচ্ছে, পকেটে হাত, ভ্রূ কোঁচকানো।

রবি ডান পা বাড়িয়ে ডান হাত মুঠো করে তুলে মুখ আড়াল করে দাঁড়াল। তারপর বাঁ হাত বাড়িয়ে

বক্সিংয়ের স্ট্যান্স তৈরি করে এগিয়ে এসে বাঁ হাতটা বাবার পেটে চালিয়ে দিয়ে মুখে শব্দ করে—হোয়্যাম!

দেবাশিস কোলকুঁজো হয়ে সরে যায়। তারপর সেও ঘুরে দাঁড়ায়। অবিকল রবির মতো স্ট্যান্স নিয়ে এগিয়ে ভুয়ো ঘুসি মারে তার মুখে, রবি চট করে মুখটা সরিয়ে নিয়ে ঘুরে এগিয়ে আসে। নিঃশব্দে দুজন দুজনের দিকে চোখ রেখে চক্কর খায়, ঘুসি চালায়। চাঁপা গাড়ি থেকে মুখ বার করে স্মিত চোখে চেয়ে থাকে। পেট্রল ভরতে ভরতে পাম্পের অ্যাটেনডেন্ট লোকটা খুব হাসে।

দেবাশিস পেটে ঘুসি খেয়ে উবু হয়ে বসে পড়ে। সামনে তেজি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রবি রেফারির মতো গুনতে থাকে—ওয়ান—টু—থ্রি—এইট—নাইন আউট! বলে শূন্যে আঙুল তুলে রবি।

দেবাশিস উঠে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে বলে—কংগ্র্যাচুলেশন ফর জাস্ট বিয়িং দা নিউ হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন অব দা ওয়ার্ল্ড।

—থ্যাংকস। হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়। মৃদু হাসে। তারপর আস্তে আস্তে বলে—মে আই পুট এ টেলিফোন কল?

—টু হুম?

—মাই ফ্রেন্ড রঞ্জন।

—গো এহেড।

দ্বিধাহীন গটমটে পায়ে রবি কাচের দরজা ঠেলে গিয়ে অফিস ঘরে ঢোকে। ফোন তুলে নেয় চালাক চতুর ভঙ্গিতে। দেবাশিস কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। শুনতে পায় রবি বলছে—হেল্লো, ইজ রঞ্জন অ্যারাউন্ড? ইয়েস, রঞ্জন, দিস ইজ রবি—আউট ফর ফান—ফার্স্ট টু জু, দেন টু মণিমা অ্যাট মানিকতলা—ইয়েস। ও নো, নট মহেশতলা, মানিকতলা—এম ফর—এম—ফর—

দরজার কাছ থেকে দেবাশিস প্রম্পট করে—মীরাট।

চোখের কোণ দিয়ে দেবাশিসকে একবার দেখে নিয়ে মাথা নাড়ে রবি। ফোনে বলে...এম ফর মাদার। এ ফর—

—এলাহাবাদ।

—এলাহাবাদ। রবি প্রতিধ্বনি করে—অ্যান্ড এন ফর নিউ দিল্লি আই ফর ইন্ডিয়া।

দেবাশিস আস্তে আস্তে সরে আসে। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে বসে। অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরায়। কথাটা কানে বিঁধে থাকে। এম ফর মাদার।

রবি যখন গাড়িতে এসে উঠল দেবাশিস একটু গম্ভীর। গাড়ি ছেড়ে চালাতে চালাতে বলে—তুমি ওভাবে স্পেলিং করছিলে কেন? ফোনে স্পেলিং করতে জায়গার নাম বলাই সুবিধা। মাদার কি কোনও জায়গা?

রবি একটু শিশু হাসি হাসে। বলে—জায়গাই তো!

—জায়গা? মাদার আবার কী রকম জায়গা?

—যেমন মাদারল্যান্ড।

দেবাশিস হাসে। তারপর শ্বাস ছেড়ে বলে—কিন্তু তুমি তো শুধু মাদার বললে, ল্যান্ড তো বলোনি।

লজ্জায় দু'হাতে চোখ ঢেকে একটু হাসে রবি। বলে—ভুল হয়েছিল।

গভীর একটা শ্বাস ফেলে দেবাশিস। রবি এখনও ভোলেনি, শুধু চেপে আছে। ওর ভিতরে হয়তো শুধু কষ্ট হয় মায়ের জন্য। কে জানে!

রবি সিটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসেছে, মুখে আঙুল, দুলছে সিটের ওপর, চাঁপা সতর্ক গলায় বলে—পড়ে যাবে সোনাবাবু।

—তোমার কেবল ভয়। বলে রবি ইচ্ছামতো দোল খায়। বলে—বাবা, আমি পিছনের সিটে বসব, দিদির কাছে?

—যাও। দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে বলে।

চাঁপা হাত বাড়িয়ে সিটের ওপর দিয়ে পিছনে টেনে নেয় রবিকে। সারাক্ষণ এরকমই করে রবি। একবার পিছনে যায়, একবার সামনে আসে। দুষ্টু হয়েছে খুব। দেবাশিস ওকে বকে না। মায়া হয়। ওর

কি বড় মায়ের কথা মনে পড়ে?

দেবাশিস চন্দনাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। একটা সময় অনেক মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল তার। কাকে বিয়ে করবে তার কিছুই ঠিক ছিল না। চন্দনা ছিল সে সব মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী আর কৌশলী। কুমারী অবস্থায় সে গর্ভে দেবাশিসের সন্তান নেয়। সেই অবস্থায় তাকে ফেলতে পারার সাধ্য দেবাশিসের হয়নি। চন্দনা সন্তান নষ্ট করতে দেয়নি। বলেছে—তুমি যদি বিয়ে না কর না করবে, ও আসুক কুমারী মায়ের কোলে।

সেটাই ছিল ওর কৌশল। দেবাশিস দু' মাসের গর্ভবতী চন্দনাকে বিয়ে করে আনল। যথাসময়ে রবি হল। ওর চার বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিল চন্দনা।

বড় রাগি ছিল, ভেবেচিন্তে কিছু করত না।

তৃণার সঙ্গে দেবাশিসের সম্পর্কটা তখনও তৈরি হয়নি। তৃণা মাঝে-মধ্যে তাকে ডাকত ছবি আঁকার সুলুকসন্ধান জানতে। ওটা তখন তার বাই। জলরঙা ছবি আঁকতে গিয়ে তুলির জ্যাবড়া দাগ আর অসহিষ্ণু টান দিয়ে হায়রান হত। দেবাশিস তাকে তুলি চালাতে শিখিয়েছিল। দুটো রঙের মাঝখানে কীভাবে একটা রঙের সঙ্গে আর একটাকে মেলাতে হয় তার কৌশল অভ্যাস করাত। কিন্তু তাতে সময় নিত বড্ড বেশি। ব্যস্ত দেবাশিস তার অর্থকরী সময়টা যে নষ্ট করছে তা খেয়াল করত না। বড় ভাল লাগত।

তৃণা দেখতে খুব সুন্দর তা তো নয়, উপরন্তু বিবাহিতা, দুটি বড় বড় সন্তানের মা, এমন মেয়ের প্রতি আকর্ষণবোধ বড় অদ্ভুত দেবাশিসের পক্ষে। সে তো মেয়ে কিছু কম দেখেনি! তৃণার প্রতি এই দুর্বলতার তবে কারণ কী?

কারণ একটাই, কৈশোরকাল। সেই বয়সটায় যাবতীয় স্মৃতি বড় মারাত্মক। তৃণার মধ্যে আর কিছু না থাক, ছিল সেই স্মৃতির সৌরভ তাকে ঘিরে। রোগা দুঃখী সেই কিশোরী মেয়েটাকে সে কবে ভুলে গিয়েছিল। দুরন্ত সময় তাকে নতুন করে ফিরিয়ে এনেছে তার কাছে। আর একটা কারণ চন্দনা নিজে।

তৃণার সুখের ঘর কেন ভাঙতে যাবে দেবাশিস? সে ভাল লোক ছিল না কোনওদিনই। তবু তার তো রুচি ছিল। সুযোগ পেলে সে যে-কোনও মেয়েকেই উপভোগ করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু পাগল হয় না তো কারও জন্য! আর তৃণা পাগল-করা মেয়েও নয়। যদিও তৃণার বয়স গড়িয়ে যায়নি, তবু তো ছেলেমেয়ের মা, গিন্নিবান্নি। এখন কি আর চোখে রং ছুড়ে দেয়ালা করে কেউ? ছবি-আঁকার ছলে তারা পরস্পরের দীর্ঘশ্বাস শুনেছিল। একজনের ছিল শচীন, অন্যজনের ছিল চন্দনা। তবু এও ঠিক, পৃথিবীতে কেউ কারও নয়।

দেবাশিস একটা জীবন যদি মেয়েবাজি না করত তবে তার চরিত্রে রাশ টানার অভ্যাস হত। কিংবা যদি চন্দনা হত মনের মতো বউ, তবে রাশ টানতে পারত চন্দনাই।

তা হল না। চন্দনা তাকে ঘরে টিকতে দিত না। কেবলই বলত—কোথায় ছবি আঁকা হচ্ছে, সব আমি জানি। তুমি মরো।

তখন সুন্দর ফ্ল্যাটটায় বাস করে তারা। লিফটে ওঠে নামে। গ্যারেজে গাড়ি। রবি তখন অজস্র কথা বলে। সংসারটা তখন সবে জমে উঠেছে।

একদিন ছুটির সকালে চন্দনা দেরি করে ঘুম থেকে উঠল। রবি ঘুমন্ত মাকে জ্বালাচ্ছিল খুব। উঠেই ঘা কতক দিল রবির পিঠে। যখন মারত তখন বড় নির্মমভাবে মারত, মায়া করত না, আবার একটু পরেই হামলে আদর করত। চন্দনার মাথায় একটু ছিট তো ছিলই।

সেদিন সকাল থেকেই চন্দনা বিগড়ে গেল।

দেবাশিস রোজকার মতো বসেছিল তার বাইরের ঘরে। সামনে খোলা স্টেটসম্যান, টুলের ওপর রাখা পা, পায়ের পাশে কফির কাপ। চন্দনা এসে স্টেটসম্যানটা কেড়ে নিল হাত থেকে। বলল—কী ভেবেছ তুমি?

—কী ভাবব? ক্লান্ত দেবাশিস জবাব দেয়।

—কত লোক অন্যায় করে ধরা পড়ে। তুমি কেন পড়ো না?

দেবাশিসের মনে পড়ে, সে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা হাত বাড়িয়ে নিয়েছিল। মনে মনে

প্রার্থনা করেছিল—হে ঈশ্বর, চন্দনা কেন বেঁচে আছে? মুখে বলেছিল— চুপ করো।

চন্দনা চুপ করল না। অসম্ভব রেগে গেল। উলটোপালটা বকতে লাগল দেবাশিসকে। গালাগাল দিল অজস্র। অবশেষে কাঁদল এবং কাঁদতে কাঁদতেই অসংলগ্ন বকতে লাগল একা—তুমি আমার বাবাকে ঠকিয়েছ...আমার ছেলেকে ঠকিয়েছ—তুমি আমাকে লুকিয়ে টাকা জমাও—

এ সব কথা বাস্তব সত্য নয়। কোনও মানেও হয় না। ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার মত দিল—অজস্র মাথাধরার বড়ি, ঘুমের পিল, তার ওপর নিজের নির্ধারিত অসুখের জন্য নিজস্ব প্রেসক্রিপশানে খাওয়া ওষুধ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ—সব মিলেমিশে একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে।

সেই মানসিক ভারসাম্যহীনতা আর স্নায়ুর বিকার থেকে কোনও দিন সুস্থ হতে পারেনি চন্দনা। একদিন মরল। সাততলা থেকে সোজা লাফিয়ে পড়ল। তখন খুব ভোর। দেবাশিস আর রবি তখনও ওঠেনি।

দেবাশিস অবশ্য ছাড়া পেয়ে গেল কোর্ট থেকে। কিন্তু বেঁচে চন্দনা যতটা না ছিল, মরে তার চেয়ে ঢের বেশি ফিরে এল জীবনে। তাকে ভুলতেই তখন তৃণার পিপাসা ইচ্ছে করে খুঁচিয়ে তোলে দেবাশিস। যা অবৈধ তার মতো মাদক আর কী আছে!

—বাবা! রবি ডাকে।

—উঁ। দেবাশিস অন্যমনস্ক উত্তর দেয়।

—চিড়িয়াখানায় আমরা কেন যাচ্ছি?

—যাবে না?

—অনেকবার গেছি তো। ভাল লাগেনি।

বিস্মিত দেবাশিস প্রশ্ন করে—তবে কোথায় যাবে?

রবি লজ্জার সঙ্গে বলে—বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।

—তবে?

—মণিমার কাছে চলো।

—ও। দেবাশিস গাড়ি থামিয়ে একটু হাসে। তারপর মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে—ঠিকই তো! সব ছুটির দিনে চিড়িয়াখানা কি আর ভাল লাগে।

—ফিরে যাই চলো।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলে—পার্ক স্ট্রিটের কোন রেস্টুরেন্টে কী যেন খাবে বলেছিলে। খাবে না?

রবি তার চালাক হাসিটা হেসে বলে—পিপিং।

দেবাশিস বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে—যাবে না?

—যাব। বুড়োদা, নিনকু, পল্টু, থাপি, ঝুমু আর নানির জন্য নিয়ে যাব। ওদের বলেছিলাম এই রবিবারে পিপিঙের খাবার খাওয়াব।

—হ্যাঁ?

—হ্যাঁ। রবি হাসে!

স্নিগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে দেবাশিস। গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়।

—বাবা।

—উঁ।

—মণিমা আমাকে খুব ভালবাসে।

—জানি তো।

—বুড়োদা, নিনকু, পল্টু সবাই।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। খুব ভালবাসে। গেলে ছাড়তেই চায় না। বলে—তুই আমাদের কাছে থাক।

—ও!

—আমি কেন ওদের কাছে থাকি না বাবা? মণিমা সকলের চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাসে।

দেবাশিস সামান্য গম্ভীর হয়ে যায়। প্রথমটায় কথা বলতে পারে না। অনেকক্ষণ রবি নিঃশব্দে বাবার

মুখখানা চেয়ে দেখে। মুখ দেখে বোধ হয় বুঝতে পারে, বাবা খুশি হয়নি।

পিছন থেকে চাঁপা বলে—তুমি বাড়িতে না থাকলে আমরা কার কাছে থাকব সোনাবাবু? বাবার যে তোমাকে ছাড়া ভীষণ মন খারাপ হয়।

—অল্প ক'দিন থাকব। উত্তর দেয় রবি।

—তারপর চলে আসবে? চাঁপা প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ। আমিও তো বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারি না।

ময়দানের ভিতর দিয়ে গাড়ি উড়িয়ে দেয় দেবাশিস। এম ফর মাদার—কথাটা ভুলতে পারে না সে। তার ফ্ল্যাটবাড়িতে চন্দনার কোনও ফটো নেই। ইচ্ছে করেই চন্দনার সব ফটো সে তার লকারে চাবি দিয়ে রেখেছে, যাতে রবির চোখে না পড়ে। এই বয়সে মাতৃহীনের মায়ের কথা বেশি মনে পড়া বড় কষ্টকর। চন্দনার শাড়ি পোশাক, রূপটানের সব জিনিসপত্র, তার হাতের কাগজ কিংবা যত চিহ্ন ছিল সবই সরিয়ে দিয়েছে দেবাশিস, শাড়িগুলো বিলিয়ে দিয়েছে একে-ওকে। মানিকতলায় বোন ফুলিকে কয়েকটা দামি শাড়ি দিয়েছে, ও নিতে চায়নি তবু জোর করে দিয়েছিল দেবাশিস—পড়ে থেকে নষ্ট হবে, তুই পর।

একদিন মনের ভুলে ফুলি একটা জয়পুরি ছাপওলা সিল্কের শাড়ি পড়েছিল রবির সামনে। রবি হাঁ করে কিছুক্ষণ দেখল শাড়িটা, তারপর মুখখানায় হাসি-কান্না মেশানো একরকম অদ্ভুতভাব করে বলল—মণিমা, আমার মায়ের ঠিক এমন একটা শাড়ি ছিল।

শিশুদের মনের খবর রাখা খুবই শক্ত। ওদের স্মৃতি কত দূরগামী, কত ছবির মতো স্পষ্ট ও নিখুঁত তা বুঝতে পেরে একরকম অদ্ভুত যন্ত্রণা পেয়েছিল দেবাশিস। পারতপক্ষে সে তার মায়ের কথা বলে না। জানে, সে মায়ের কথা বললে তার বাবা খুশি হয় না। এতটা বুদ্ধি ওই শিশু-মাথায়।

বুকের ভিতরটা চলকে ওঠে দেবাশিসের। ছেলেটার প্রতি হঠাৎ ভালবাসায় ছটফট করে। পার্কস্ট্রিটের একটা বড় রেস্টুরেন্টে বসে মেনুটা রবির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—তোমার যা ইচ্ছে অর্ডার দাও। যা খুশি।

বলে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

রবি অবাক হয়ে বাবার দিকে চায়। মিটমিটে চোখে বাবার মুখখানা দেখে বলে—আমার তো ক্ষিদে নেই।

দেবাশিস হতাশ হয়ে বলে—সে কী!

রবি মাথা নেড়ে বলে—দিদি সকালে কত খাইয়েছে! বলতে বলতে গেঞ্জিটা ওপর দিকে তুলে পেটটা দেখিয়ে বলে—পেট দ্যাখো কেমন ভর্তি।

দিনের মধ্যে একশোবার রবির গায়ে হাত দিয়ে দেখত চন্দনা, টেম্পারেচার আছে কি না! রবির গায়ে হাত দিয়ে আবার নিজের গা দেখত, কখনও বা দেবাশিসকে ডেকে বলত—দেখি তোমার গা রবির চেয়ে ঠাণ্ডা না গরম।

সব মায়েরই এই বাতিক থাকে। তার নিজের মায়েরও ছিল। আরও, দিনে একশোবার রবিকে খাওয়ানোর জন্য মাথা কুটত চন্দনা, খাইয়ে পেট দেখত। খেতে না চাইলে অনুনয় বিনয়, খোশামোদ, তারপর কিলচড় কষাত। বলত—না খেয়ে একদিন শেষ হয়ে যাবি। আমি মরলে কেউ তোর খাবার নিয়ে ভাববে ভেবেছিস?

খাওয়ার ব্যাপারটা হলেই ছোট্ট রবি মাকে পেট দেখাত।

গেঞ্জিটা নামিয়ে করুণ চোখে রবি বলে—খাব না বাবা।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলে—আচ্ছা।

—বাবা।

—উঁ।

—মণিমা তো মুরগি খায় না।

দেবাশিস খেয়াল করল। বলল—তাই তো। কিন্তু অর্ডার দিয়ে দিলাম যে।

—মণিমার জন্য কী নেবে?

—তুমিই বলো।

—সন্দেশ আর দই, হ্যাঁ বাবা?

—আচ্ছা।

রবি খুশি হয়ে হাসল। দেবাশিস রবির কথা শোনে। রবি যা চায় তাই দেয়। রবির যা ইচ্ছা তাই হয়। চন্দনার সময়ে তা হত না। রবি কিছু বায়না করলেই ক্ষেপে যেত চন্দনা। বকত। মারত। তবু সারাদিন চন্দনার পায়ে পায়ে ঘুরত রবি। বকা খেত, মার সহ্য করত, তবু আঁটালির মতো লেগেও থাকত।

ওই রাগি আহাম্মক মেয়েটার মধ্যে আকর্ষণীয় বস্তু কী ছিল? ভেবেই পায় না দেবাশিস। যে অবস্থায় চন্দনার বিয়ে হয়েছিল তাতে তার বাপের বাড়ির দিকের কেউ খুশি হয়নি। চন্দনার বাবা তাকে প্রচুর মারধর করে বেঁধে রেখেছিলেন, মা কাঁদতে কাঁদতে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হন। সেই গোলমাল হাঙ্গামার ভিতর থেকে চন্দনাকে খুব শালীনতার সঙ্গে বিয়ে করে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। দেবাশিস কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে একদিন ওদের বাড়ি চড়াও হয়। পাড়ার ছেলেদের আগে থাকতেই মোটা পুজোর চাঁদা দেওয়া ছিল। দেবাশিস চন্দনার বাবাকে শাসিয়ে এল—ফের ওর গায়ে হাত তুলবেন তো মুশকিল আছে।

চন্দনার বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। আজকাল ভদ্রলোক মানেই ভেড়ুয়া। এরপর থেকে চন্দনার ওপর অত্যাচার কমে গেল বটে, কিন্তু বাড়ির লোক তার সঙ্গে কথা বলত না। দেবাশিস তখন মানিকতলায় বোনের বাড়িতে আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। একজন গর্ভবতী মেয়েকে বিয়ে করে তোলা ভগ্নীপতি ভাল চোখে দেখেনি। বোনও রাজি ছিল না। চন্দনা প্রায়ই টেলিফোন করে বলত—বেশি কিছু তো চাইনি, কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে সিঁথিতে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে দাও। তা হলেই হবে।

দেবাশিস বলত—তা হবে না। সেটা তো পরাজয় মেনে নেওয়া। আমি তোমাকে ফুল ফ্লেজেড বিয়ে করে নিজের বাসায় তুলব।

তাই করছিল সে। পাগলের মতো ঘুরে যাদবপুরে বাসা ঠিক করে ফেলল। হাতে টাকার অভাব ছিল না। প্রচুর গয়না শাড়ি দিয়ে সাজিয়ে বিয়েবাড়ি ভাড়া করে পুরুত ডেকে বিয়ে করল। চন্দনার এক দাদা সম্প্রদান করে যান।

চন্দনার মতো একটা অপদার্থ মেয়ের জন্য এত পরিশ্রম আর হাঙ্গামা কেন করেছিল দেবাশিস, তা ভাবতে অবাক লাগে। বিয়ের অল্প কিছু পরেই চন্দনার তাগাদায় অভিজাত পাড়ায় অনেক টাকা দিয়ে পূর্ব-দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট কিনল। এই বিপুল উদ্যোগ বৃথা গেছে। বিয়ের অল্প কিছু পরেই দেবাশিস বুঝতে পারে, বিয়ে কোনও স্বর্গীয় বিধি নয়। চন্দনা তার বউ হওয়ার উপযুক্ত নয়। এত অগভীর মন, এত রাগ, অধৈর্য, এমন অর্থকেন্দ্রিক মন-সম্পন্ন মেয়ের সঙ্গে কী করে থাকবে সে। নিজে চরিত্রহীন হলেও তার কিছু শিল্পীসুলভ নিস্পৃহতা আছে, সামান্য কিছু ব্যবসায়িক সততা, কর্মনিষ্ঠা। তার মনে হত সারাদিন কাজের পর পুরুষ যখন বাসায় ফেরে তখন দগ্ধ দিনে ছায়ার মতো স্ত্রী তাকে আশ্রয় দেয়। স্ত্রী হচ্ছে বিশ্রামের জায়গা।

দেবাশিস প্রায়দিনই বাসায় ফিরে চন্দনাকে দেখতে পেত না। হয় মার্কেটিং, নয় সিনেমা-থিয়েটার, নয়তো বাপের বাড়ি চলে যেত চন্দনা। বিয়ের পর বাপের বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কীভাবে যেন নিদারুণ ভাল হয়ে গিয়েছিল। ওই সময়ে নিঃসঙ্গ তৃণা এক নিভৃত জলস্রোতে নৌকোর মতো তার কাছাকাছি এসে গেল। উতরোল স্রোত। কিন্তু নিশ্চিত। দেবাশিস কোনওদিনই কারও প্রেমে পড়েনি এতকাল। এবার পড়ল। এক অসহনীয় অবস্থায়। অসম্ভব এক প্রেম।

রবি এখন ওই তার মুখোমুখি বসে আছে। কী চোখে রবি চন্দনাকে দেখেছিল তা ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। ওই রাগি, অপদার্থ, অগভীর মাকে কেন অত ভালবাসত রবি? রবির কাছ থেকে তা জানতে ইচ্ছে হয়! জানতে ইচ্ছে করে, কোনওভাবে না কোনওভাবে ভালবাসার কোনও উপায় ছিল কি না!

বেয়ারা মস্ত একটা বাদামি কাগজের প্যাকেটে মোড়া বাক্স নিয়ে এল ট্রেতে। সঙ্গে বিল। দাম আর টিপ্‌স মিটিয়ে উঠে পড়ে দেবাশিস। ঘড়ি দেখল। এখনও অনেক সময় আছে। চিড়িয়াখানার সময়টা বেঁচে গেল।

চার

পোশাক যতই পরুক, আর যতই সাজুক, তৃণার মুখের দুঃখী ভাবটা কখনও যায় না। একটা অপরাধবোধে মাখা মুখখানায় করুণ হাসিহীন, শুকনো ভাব ফুটে থাকেই। চোখে ভীরু চঞ্চল ভাব।

বেরোবার মুখে দেখল, হুড়মুড় করে সাইকেল নিয়ে গেট দিয়ে ঢুকে এল মনু। চমৎকার লালরঙা স্পোর্টস সাইকেল। মনুর চেহারা বেশ বড়সড়। পরনে সাদা শর্টস, সাদা গেঞ্জি, কাঁধে একটা টার্কিশ তোয়ালে, পায়ে কেডস আর মোজা। হাত পায়ের গড়ন সুন্দর, বুকের পাটা বড়। হাতে টেনিস র‍্যাকেট। মাটিতে পা ঠেকিয়ে সাইকেলটা গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড় করাল। চোখ তুলে মৌন মুখে মাকে দেখল একবার।

ভারী পাল্লার কাচের দরজার সঙ্গে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল তৃণা। বুকের ভিতরটা কেমন চমকে ওঠে। ছেলের চোখে চোখ পড়তেই, হাত পায়ে সাড় থাকে না। মনু আজকাল কদাচিৎ কথা বলে। দিনের পর দিন একনাগাড়ে উপেক্ষা করে যায়।

কাচের দরজার কাছ থেকে একটুও নড়তে পারল না তৃণা। মনু সাইকেলে বসে থেকেই সাইকেলের ঠেস দেওয়ার কাঠিটা পা দিয়ে নামাল। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে লঘু পায়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। তৃণার দিকে এক পলক দেখল আবার। চোদ্দো বছরের ছেলের আন্দাজে মনুকে বড় দেখায়। চেহারাটা তো বড়ই, চোখের দৃষ্টিতে পাকা গাম্ভীর্য, এটা বোধ হয় ওর বাপের ধারা। বয়সের আন্দাজে ওর বাপও গম্ভীর, বয়স্কজনোচিত হাবভাব।

সামনেই মস্ত কয়েরের পাপোশ পাতা। মনু তার কেডসটা ঘষে নিচ্ছিল, দরজার চৌকাঠে হাত রেখে। ওর শরীরের স্বেদগন্ধ, রোদের গন্ধ তৃণার নাকে এল। সে যে এই বড়সড় সুন্দর চৌখস ছেলেটির মা তা কে বিশ্বাস করবে! চেহারায় অমিল, স্বভাবে অমিল, তার ওপর মনু আজকাল ডাকখোঁজ করেই না। কতকাল 'মা' ডাক শোনেনি তৃণা।

তাকে কাচের দরজায় অমন সিঁটিয়ে থাকতে দেখে মনু আবার একবার তাকাল, ভ্রূ কোঁচকাল। মনে মনে বোধ হয় কী একটু শুঁকে নিল বাতাসে। হঠাৎ চূড়ান্ত তরল গলায় বলল—চ্যানেল নাম্বার সিক্স। না?

তৃণা ভারী চমকে ওঠে। সত্যি কথা। সে যে সেন্টটা আনিয়েছে তা চ্যানেল নাম্বার সিক্স। কিন্তু এত ঘাবড়ে গিয়েছিল তৃণা যে উত্তর দিতে পারল না। কেবল বিশাল দুটি চক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকল ছেলের দিকে, ভূতগ্রস্তের মতো। কারণ, ছেলের চোখে চোখ রাখতে আজকাল তার মেরুদণ্ড ভেঙে নুয়ে যায়।

মনু অবশ্য তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করে না। চটপটে পায়ে ভিতরবাগে চলে যায়, লবি পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে। ও এখন ঠাণ্ডা জলে স্নান করবে, পোশাক পরবে, তারপর বেরোবে কোথাও।

ওর চলে-যাওয়ার রাস্তার দিকে অপলক চেয়ে থাকে তৃণা। তক্ষুনি বেরোতে পারে না। আস্তে আস্তে ঘুরে আসে। অনেকখানি মেঝে পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে দোতলায়। একটু বিশ্রাম করে যাবে।

মনু আর রেবার ঘর বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে। মাঝখানে হল, হলে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকের ঘর থেকে সে মৃদু একটা শিসের শব্দ শোনে। এক পা এক পা করে এগোয় দক্ষিণের দিকে। এদিকে সে আজকাল একদম আসে না। এলে ছেলেমেয়েরা বিরক্ত হয়, ভ্রূ কোঁচকায়, সামনে থেকে সরে যেতে চেষ্টা করে। এ বাড়িতে সে এক পক্ষ, আর ছেলে মেয়ে বাপ মিলে আর এক পক্ষ। মাঝখানে অদৃশ্য কুরুক্ষেত্রের বিচিত্র সব চোখের বাণ ছোটাছুটি করে, আর মৌনতার অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় পরস্পরের দিকে।

মনুর ঘরে মনু আছে। দরজা আধখোলা, পর্দা ঝুলছে। অন্যপাশে রেবার ঘর। ঘরটা নিস্তব্ধ। তৃণা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। না, ভিতরে কোনও শব্দ নেই। খুব দুঃসাহসে ভর করে সে কাঁপা, ঠাণ্ডা, দুর্বল হাতে পর্দা সরিয়ে ভিতরে পা দেয়। ফাঁকা ঘর। একধারে বইয়ের র‍্যাক, পড়ার টেবিল, ওয়ার্ডরোব, আলমারি, মাঝখানে দামি চেয়ার কয়েকটা। নিচু সেন্টার টেবিলে তাজা ফুল রাখা।

ঘরভর্তি মৃদু ধূপকাঠির সৌরভ। রেবার বয়স বারো, কিন্তু সে একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার মতোই থাকে। তৃণা ফোম রাবারের গদিআলা বিছানাটায় একটু বসে। বুকজোড়া ভয়। পড়ার টেবিলের ওপর স্ট্যান্ডে রেবার ছবি। পাতলা গড়নের ধারালো চেহারা। নাকখানা পাতলা ফিনফিনে, উদ্ধত। টানা চোখ।

সব মিলিয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে। সে তুলনায় মনুর চেহারাটা একটু ভোঁতা, রেবার মতো বুদ্ধি মনু রাখে না। রেবা মডার্ন স্কুলের ফার্স্ট গার্ল। সম্ভবত হায়ার সেকেন্ডারিতে স্ট্যান্ড করবে। মনু অত তীক্ষ্ণ নয়, সে কেবল টেনিস কিংবা অন্য কোনও খেলায় ভারতের এক নম্বর হতে চায়। হাসিখুশি আহ্লাদি ছেলে, মনটা সাদা। সেই কারণেই বোধ হয় কখনও সখনও মনু এক-আধটা কথা তার মার সঙ্গে বলে ফেলে।

কিন্তু রেবার গাম্ভীর্য একদম নিরেট আর আপসহীন। যেমন তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনই তীক্ষ্ণ তার উপেক্ষার ভঙ্গি। যতরকমভাবে অপমান এবং উপেক্ষা করা যায় ততরকমই করে রেবা। মার প্রতি মেয়ের এমন আক্রোশ কদাচিৎ কোনও মেয়ের মধ্যে দেখা যায়। মনুকে যতটা ভয় করে তৃণা, কিংবা শচীনকে, তার শতগুণ ভয় অর রেবাকে। মেয়েদের চোখ আর মন সব দেখে, সব ভাবে। ফ্রক-পরা রোগা মেয়েটাকে তৃণা তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ মানুষ বলে জানে।

ঘরে ধূপকাঠির গন্ধ, স্নো ক্রিম ফাউন্ডেসনের গন্ধ, ঘর-সুগন্ধির মৃদু সুবাস। দেওয়ালের রং হালকা নীল, আর ধূসর। বিপরীত দেওয়ালগুলি একরঙা। নানারকম আলোর ফিটিংস লাগানো, জানালা দরজায় পর্দা, পেলমেটে কেষ্টনগরের পুতুল সারি সারি সাজানো। বুককেসের ওপর একটা রেডিয়ো টেপরেকর্ডার, একধারে মিউজিক সিস্টেম আব সিডি এবং ক্যাসেটের ক্যাবিনেট। সমস্ত বাড়িটাই দেবাশিস সাজিয়েছিল। আসবাবপত্রগুলি সবই সাপ্লাই দিয়েছিল তার কোম্পানি।

ফটো-স্ট্যান্ডে রেবার ছবিটার দিকে ভীত চোখে চেয়ে ছিল তৃণা। তার মনে হচ্ছিল, সে রেবার মুখোমুখি বসে আছে। রেবা তাকে দেখছে। ফটোতে রেবার সুন্দর হাসিটা যেন আস্তে আস্তে পাল্টে শ্লেষ আর ঘৃণার হাসি হয়ে যাচ্ছে।

তৃণার বুক কেঁপে কান্নার গন্ধ মেখে একটা শ্বাস বেবিয়ে আসে। দূরে বৃষ্টি হলে যেমন জলের গন্ধ আসে বাতাসে তেমনই কান্নাটা ঘনিয়ে উঠছে। গন্ধ পায় তৃণা। কিন্তু বৃথা। কত তো কেঁদেছে তৃণা, কেউ পাত্তা দেয়নি।

তৃণা বহুকাল বাড়ির এদিকে আসেনি। রেবার ঘরে ঢোকেনি। এখন একা চোরের মতো ঢুকে তার বড় ভাল লাগছিল। বারো বছর বয়সে মেয়েরা মায়ের বন্ধু হয়ে ওঠে। এই বয়ঃসন্ধির সময়ে কত গোপন মেয়েলি তথ্যের লেনদেন হয় মা আর মেয়ের মধ্যে, এই বয়সেই বন্ধুত্ব হয়ে যায় পাকা। মেয়ে আর মেয়ে থাকে না, সখী হয়ে ওঠে।

কিন্তু হায়, বেবার সঙ্গে তৃণার কোনওদিনই আর সখিত্ব হবে না। ভিতু তৃণাকে মানসিক ভারসাম্যের শেষ সীমা পর্যন্ত ঠেলে দেবে রেবা—বুদ্ধিমতী এবং নিষ্ঠুর ওই মেয়েটা।

তৃণা উঠল, রেবা গানের স্কুলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে, কিন্তু নিঃশব্দে ফিরবে না। ওর ছটফটে দৌড়পায়ের আওয়াজ অনেক দূর থেকেই পাওয়া যায়। তাই সাহস করে তৃণা উঠে ঘুরে ঘুরে ওর ঘরটা দেখে। বুককেস খুলে বই হাতড়ায়। ওয়ার্ডরোবের ভিতরে ওর হরেক ফ্রক, ঘাগরা, প্যারালেলস আর শাড়িতে হাত বুলিয়ে নেয়। বিছানার ওপর একটা নাইটি পড়ে আছে। ভীষণ পাতলা একটা বিদেশি কাপড়ের তৈরি। সেটা গুছিয়ে ভাঁজ করে রেখে দেয়। বেডকভারটা টান করে একটু। পড়ার টেবিলটা সাজানো আছে। তবু একটু নেড়েচেড়ে রেখে দেয়, খুঁজতে খুঁজতে কয়েকটা ড্রইং খাতা পায় তৃণা, তাতে জলরঙা সব ছবি আঁকা। বুকের ভিতরটা ধুপধুপ করে ওঠে। রেবা কি ছবি আঁকে!

বুককেসের মাথায় রঙের বাক্স আর তুলির আণ্ডিল খুঁজে পায় তৃণা। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, রেবা ছবি আঁকে। দরজার পাশে একটা নিচু শেলফে তবলা ডুগি, হারমোনিয়ম, তানপুরা সব সাজানো। হারমোনিয়ামের বাক্সের ওপর একটা কবিতার বইও পেয়ে যায় সে। বুক একটা আনন্দ সদ্যোজাত পাখির ছানার মতো শব্দ করে। রেবা কি কবিতা পড়ে।

আবার গিয়ে বুককেসটা খোলে তৃণা। বইগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে রাখা নেই। তাই অসুবিধে হয়। তবু একটু খুঁজতেই তার মধ্যে কিছু কবিতার বই খুঁজে পায় তৃণা। অবাক হয়ে উল্টেপাল্টে বইগুলো দেখে সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যায়।

অন্যমনস্কতাবশত সে পায়ের শব্দটা শুনতে পায়নি, যখন শুনল তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

পর্দা সরিয়ে রেবা ঘরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল। রোগা তীক্ষ্ণ মুখখানা হঠাৎ সন্দিগ্ধ আর কুটিল হয়ে

উঠল। ভ্রূ কোঁচকানো, রেবা তার দিকে একপলক চাইল তারপর চোখ ফিরিয়ে পা নেড়ে চটিদুটো ঘরের কোণে ছুড়ে দিল। ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। একপলকে সে তাকিয়েছিল তৃণার দিকে তাতে চোখে একটু বুঝি বিস্ময়, আর একটু ঘৃণা। বাদবাকি ব্যবহারটা উপেক্ষার।

পরনে একটা কমলারঙের হালফ্যাশনের ফ্রক। রোগা হলেও রেবা বেশ লম্বা। গায়ে মাংস লাগলে একদিন ফিগারটা ভালই দেখাবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখের একটা ব্রণ টিপল। আঙুল দিয়ে ঘষল জায়গাটা।

বলল—কী বলতে এসেছ?

একটু চমকে উঠল তৃণা। এঘরে সে যে অনধিকারী তা মনে পড়ল। বিপদ যা ঘটবার তা ঘটে গেছে, সে তো আর পালাতে পারে না এখন। আস্তে করে বলল—তোর আজ তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে!

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে রেবা উত্তর দেয়—এ সময়েই ছুটি হয়। তাড়াতাড়ি আবার কী?

বলে আয়নায় মুখ দেখতে থাকে। আয়নার ভিতর দিয়েই বোধ হয় তৃণাকে এক-আধ পলক দেখে নিল। কিন্তু তৃণার সেদিকে তাকাতে সাহসই হল না। অপরাধীর মতো মুখ নিচু রেখে বলে—তুই কি ছবি আঁকিস রেবু?

রেবা একটু অবাক হয় বোধ হয়। বলে—হ্যাঁ আঁকি।

—জানতাম না তো।

—ক্লাসে আমাদের ড্রইং শেখায়। এ সবাই জানে।

—কবিতা পড়িস?

—পড়ি।

তৃণা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

রেবা একটু ঝাঁজ দিয়ে বলে—আর কী বলবে?

—কিছু না।

—আমার এখন অনেক কাজ আছে। পোশাক ছাড়ব। তুমি যাও।

—যাচ্ছি। তৃণা উঠে দাঁড়ায়। কোনও বয়সের মেয়েই মায়ের সামনে পোশাক ছাড়তে লজ্জা পায় না। তবু তৃণা সসঙ্কোচে উঠে দাঁড়াল। এই ঘরে তার উপস্থিতির কোনও জরুরি অজুহাত খুঁজে না পেয়ে দুর্বল গলায় বলে—তুই নতুন কী রেকর্ড কিনলি দেখতে এসেছিলাম।

রেবা উত্তর দিল না। আয়নায় মুখ দেখতে থাকল।

তৃণা একটু শুকনো গলায় বলে—তোর ওয়ার্ডরোবে শাড়ি দেখছিলাম। পরিস না কি?

—ইচ্ছে হলে পরি। তুমি যাও।

—যাচ্ছি। আমার তো অনেক শাড়ি। তুই নিবি?

—না।

—কেন?

—আমার অনেক আছে। দরকার হলে বাপি আরও কিনে দেবে।

তৃণা শ্বাস ছেড়ে আপন মনে ভ্রূ কুঁচকে মাথা নাড়ে। এ সত্য তার জানা। প্রয়োজন হলে শচীন রেবাকে বাজারসুদ্ধু শাড়ি কিনে এনে দেবে। রেবা নিজে গিয়েও কিনে আনতে পারে বাজার ঘুরে, পছন্দমতো। তবু বাঙালি ঘরের রেওয়াজ, বয়স হলে মেয়েরা মায়ের শাড়ি পরে। সেটা শাড়ির অভাবের জন্য নয়। নিজের শাড়ি পরিয়ে মা মেয়েকে দেখে। মুখ টিপে মনে মনে হাসে। মায়েরা ওই ভাবেই আবার জন্মায় মেয়ের মধ্যে। কিন্তু রেবার তা দরকার নেই।

মুখশোষ টের পায় তৃণা। হাতে পায়ে শীত, মাথা গরম, শ্বাস গরম। দু-পা হেঁটে যায় দরজার দিকে। একটু দাঁড়ায়। ফিরে তাকায় একবার। তার ভ্রূ কোঁচকানো, চোখে বিশুষ্ক কান্না। ওই গুয়ের গ্যাংলা মেয়েটা কত সহজে তার মা-পনা ঘুচিয়ে দেয়।

এ বাড়িতে দুটো ভাগ আছে। একদিকে তৃণা একা, অন্যদিকে শচীন, মনু আর রেবা। সিন্ডিকেট। ঘরগুলোর মাঝখানে যোজন-যোজন ব্যবধান পড়ে থাকে সারাদিন। তার পক্ষে কেউ নয়। তবু ওর

মধ্যে কি মনু একটু মায়ের টান টের পায়? অনেকদিন ভেবেছে তৃণা। ঠিক বুঝতে পারে না। ন' মাসে ছ' মাসে এক-আধবার মা বলে ডেকে ফেলে মনু। হয়তো কোনও কথা বলে ফেলে। খেতে বসে হয়তো এটা-ওটা চায়। তড়িঘড়ি এগিয়ে দেয় তৃণা। মনু কখনও কিছু বললে বাধ্য মেয়ের মতো তাই করে, তাই দেয়। কিন্তু বুকে এত কাঙালপনা নিয়েও তৃণা জানে, মনুর আসলে টান নেই। ও সোজা সরল ছেলে, দিনরাত খেলার কথা ভাবে, মাকে নিরন্তর ঘৃণা করার কথা মনে রাখতে পারে না। অন্যমনস্কতাবশত ভুলে যায়। একটু আগে কেমন স্মিতমুখে বলেছিল—চ্যানেল সিক্স না?

রেবার ভুল হয় না। নিরন্তর বুকে সাপের মতো পুষে রাখে উপেক্ষা আর ঘেন্না। কখনও তা থেকে অন্যমনস্ক হয় না রেবা। বয়স মোটে বারো বছর, এখনও ঋতুমতী নয় বোধ হয়, তবু কেমন সব গোপন করে রেখেছে মায়ের কাছে। কেমন স্বাধীন, ডাকাবুকো।

তৃণা যাই-যাই করেও খানিক দাঁড়ায়, বলে—আমার লকারে গাদা গয়না পড়ে আছে। পাঠিয়ে দেব'খন, পরিস।

—কে চেয়েছে?

—চাইতে হবে কেন? ও তো তোর পাওনা!

—আমি গয়না পরি না! তার ওপর সোনার গয়না! মাগো! বলে ঠোঁট মুখের একটা উৎকট ভঙ্গি করে রেবা।

তৃণা হ্যাংলার মতো হাসে৷ বলে— তা অবিশ্যি ঠিক। সলিড সোনার গয়না তোদের বয়সিরা আজকাল কেউ পরে না। বরং ভেঙে নতুন করে গড়িয়ে নিস।

—আমি পরব না। তুমি পরো।

—তুই তো একরত্তি মেয়ে, ওই রোগা শরীরে আর ক'খানা গয়নাই বা ধরবে। আমার অনেক আছে। তোকে দিয়েও থাকবে—তোরই তো সব।

—তোমার কিছুই আমাব নয়। না পরলে বিলিয়ে দিয়ো।

—কেন, পরবি না কেন?

—ইচ্ছে। শাড়ি গয়নার কথা শুনলে আমার মাথা ধরে। তুমি এখন যাও।

ভুল অস্ত্র। কিন্তু এ ঠিক তৃণার দিক থেকে লোভ দেখানো নয়। কিছুক্ষণ রেবার ঘরে থাকার জন্য এ হচ্ছে এলোপাথাড়ি কথা কওয়া, নইলে সে জানে, রেবার কিছু অভাব নেই। এখনকার মেয়েরা শাড়ি গয়নার নামে ঢলে পড়ে না।

রেবা খাটের অন্যধারে বসে পা দোলায়। পায়ের আঙুলের রুপোর চুটকিতে ঝুনঝুন শব্দ হয় একটু। খুব অবহেলার অনায়াস ভঙ্গি। তৃণার বারো বছর বয়সটা কেটেছে বিছানায়। ওই সময়ে এত সতেজ, প্রাপ্তবয়স্কতার ভাবভঙ্গি তার ছিল না। ওই বয়সে ছিল কত ভয়, সংশয়, কত আত্ম-অবিশ্বাস। তবু তৃণা মনে মনে একরকম খুশিই হয়। মেয়েটা তার মতো হবে বোধ হচ্ছে। ছবি আঁকে, কবিতা পড়ে, শাড়ি-গয়নার দিকে মন নেই।

ও ঘরের বাথরুম থেকে মনুর সুরহীন হিন্দি গান শোনা যায়। তার সঙ্গে জলের প্রবল শব্দ। সেই জলশব্দে তেষ্টা পায় তৃণার। আসলে বুকটা কাঠ হয়েই ছিল। জলের কথা খেয়াল হচ্ছিল না তার।

ভিখিরির মতো তৃণা বলে—একটু জল খাওয়াবি রেবু?

রেবা ভীষণ বিরক্ত হয়। তার রোগা, তিরতিরে বুদ্ধির মুখখানায় কোনও মুখোশ নেই। সহজেই রাগ, বিরক্তি, অভিমান বোঝা যায়। ভ্রূ, নাক, চোখ কুঁচকে উঠল। তবু পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে দেয়ালে পিয়ানো রিডের মতো একটা সুইচ টিপে ধরল।

ঠিন ঠিন করে গোটা-দুই সুরেলা আওয়াজ হল ভিতরে। অমনি ঝি দুর্গার মা এসে দাঁড়ায় দরজায়, নীরবে।

রেবা বলে—এক গ্লাস জল।

এরকমই হওয়ার কথা। রেবা নিজের হাতে জল গড়িয়ে দেবে না, এ কি জানত না তৃণা?

দুর্গার মা হলঘরের কুলার থেকে ঠাণ্ডা জল এনে দিল। ট্রের ওপর স্বচ্ছ কাটগ্লাসের পাত্র, ওপরে একটা কাচের ঢাকনা। জলটা হিরের মতো জ্বলছে। তৃণা সবটুকু খেয়ে নিল।

রেবা বলে, এবার হয়েছে? এখন যাও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তৃণা ভাল মেয়ের মতো বলে—এই খাড়া দুপুরে আবার বেরোবি নাকি?

—বেরোলেই বা।

—কোথায় যাবি?

—কাজ আছে।

—তুই যে কবিতার বইগুলো কিনেছিস ওগুলোর সব আমার নেই। এক আধখানা দিস তো, পড়ব।

রেবা উত্তর দিল না। ওয়ার্ডরোব থেকে পছন্দমতো পোশাক বের করতে লাগল। একটা লুঙ্গি আর কামিজ বের করে সাজাল বিছানার ওপর। বিশুদ্ধ সিল্কের হালকা জামরঙের লুঙ্গি। সোনালি সিল্কের ওপর ছুঁচের কাজ-করা কামিজ।

—বাঃ ভারী সুন্দর তো।

—কী সুন্দর! ঝামরে ওঠে রেবা।

—পোশাকটা। কবে করালি?

রেবা তার পাতলা ধারালো মুখখানা তুলে তৃণাকে এক পলকের কিছু বেশি লক্ষ করল। তৃণা চোখ সরিয়ে নেয়।

রেবা বলে—তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও।

তৃণা হ্যাংলার মতো তবু বলে—বড্ড রোদ উঠেছে আজ। ছাতা নিবি না?

—সে আমি বুঝব।

—রেবু, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

—ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।

—তুই অমন করছিস কেন?

রেবা উত্তর না দিয়ে তার ঘরের লাগোয়া নিজস্ব বাথরুমে চলে গেল। সশব্দে দরজা বন্ধ করল।

ফাঁকা ঘরে একা তৃণা দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যিই তার শরীর খারাপ লাগছিল। খুব খারাপ, যেন বা গা ভরে জ্বর আসছে। চোখে জ্বালা, হাত-পা কিছুই যেন তার বশে নেই। আর মাথার মধ্যে চিন্তার রাজ্যে একটা বিশৃঙ্খলা টের পায় সে। পূর্বাপর কোনও কথাই সাজিয়ে ভাবতে পারে না।

শরীরটা কাঁপছিল, খুব ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে তৃণা। হলঘরে হালকা অন্ধকার। ঠাণ্ডা। একটু দাঁড়ায়, তারপর অবশ হয়ে দেয়ালের গায়ে লাগানো নরম কৌচটায় বসে পড়ে। কৌচের পাশে মস্ত রঙিন কাঠের বাক্সে লাগানো পাতাবাহারের গাছের পাতা তার গাল স্পর্শ করে।

ঝিম মেরে একটুক্ষণ বসে থাকে তৃণা। কতকাল সে তার শরীরের কোনও খোঁজ রাখে না, ভিতরে ভিতরে কী অসুখ তৈরি হয়েছে কে জানে! মাথাটা ঠিক রাখতে পারছে না সে। স্খলিত হয়ে যাচ্ছে স্মৃতি, পারম্পর্যহীন সব এলোমেলো কথা ভেসে আসছে মনে। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে খুব।

একটা তীব্র শিসের শব্দে সে মুখ তোলে। গায়ে ব্যানলনের দুধসাদা গেঞ্জি, পরনে ব্লু-জিন্স পরা মনু নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ডান হাতের ব্রেসলেটে ঢিলা করে পরা ঘড়িটা দেখল। সময়টা বিশ্বাস হল না বুঝি। তারপর তৃণাকে লক্ষ না করেই আবার চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে।

পাতাবাহারের আড়াল থেকে মনুর সুন্দর চেহারাটা দেখে তৃণা। এই বয়সেই মনু মোটর চালায়, টেনিস খেলে, বিদেশি নাচ শেখে। তৃণার জগৎ থেকে অনেক দূরে ওর বসবাস। বড়সড় স্বাস্থ্যবান ওই ছেলেটা যে তার গর্ভজ সন্তান, তা তৃণার বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হলেও এক এক সময়ে বড় ভয় করে, এক এক সময়ে অহংকার হয়। কিন্তু এ তো সত্যি কথা, মনুর জগতে তৃণা বলে কেউ নেই।

সিঁড়ির মাথায় চলে গিয়েছিল মনু। এক্ষুনি নেমে যাবে।

তৃণার গলায় একটুও জোর ফুটল না। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল—মনু!

ডাকটা মনুর শোনার কথা নয়। মস্ত হলঘরটার অন্য প্রান্তে চলে গেছে সে। তার ওপর শিসে একটা গরম হিন্দি টিউন তুলছে। তা ছাড়া যৌবনবয়সের চিন্তা আছে, আর আছে ঘরের বাইরে জগতের আনন্দময় ডাক। মায়ের ক্ষীণকণ্ঠ তার শোনার কথা নয়। তবু দ্রুত 'দু' ধাপ সিঁড়ি চঞ্চল পায়ে নেমে

গিয়েও দাঁড়াল সে! একটু এপাশ ওপাশ তাকাল। হয়তো ক্ষীণ সন্দেহ হয়ে থাকবে যে কেউ ডেকেছে।
পাতাবাহারের আড়ালে মুখখানা ঢেকে তৃণা তেমনি ক্ষীণ গলায় বলে—মনু, আমি এখানে।
এবার মনু শুনতে পায়। ফিরে তাকায়। মুখে একটু ভ্যাবলা অবাক ভাব। শরীরটা যত বড়ই হোক, ওর বয়সে এখনও ছেলেরা মায়ের আঁচলধরা থাকে।
মনু তাকে দূর থেকে দেখল। রাঙা শাড়ি পরেছে তৃণা, মেখেছে দামি বিদেশি সুগন্ধ, আর নানা রূপটান। নষ্ট মেয়ের সাজ। একটু আগে বাড়িতে ঢোকার সময়ে তাই কি ঠাট্টা করে মনু বলেছিল—চ্যানেল নাম্বার সিক্স, না? নষ্টামিটা কি তৃণার শরীরে খুব স্পষ্ট হয়ে আছে?
মনু সিঁড়ির দু' ধাপ উঠে আসে। হলঘরটা লম্বা পদক্ষেপে পার হয়ে সামনে দাঁড়ায়। মুখে একটা গা-জ্বালানো ঠাট্টার হাসি। হালকা গলায় বলে—আরে! তুমি তো বেরিয়ে গেলে দেখলাম!
তৃণা তৃষিত মুখখানা তুলে ওকে দেখে। কী বিরাট, কী প্রকাণ্ড সব মানুষ এরা।
মাথা নেড়ে তৃণা বলে—যাইনি।
—যাওনি তো দেখতেই পাচ্ছি। কী ব্যাপার?
—তুই কোথায় যাচ্ছিস?
—বেরোচ্ছি।
—আমার শবীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।
শুনে মনুর মুখে খুব সামান্য, হালকা জলের মতো একটু উদ্বেগ খেলা করে গেল কি? বলল—শরীর খারাপ তো শুয়ে থাকো।
মনুর মুখখানা অবিকল তৃণার মতো। মাতৃমুখী ছেলে। ওর চোখে একটা মেয়েলি নম্রতা আছে। এ সবই তৃণার চিহ্ন। মনুর মুখে চোখে তৃণার চিহ্ন ছড়ানো আছে। অনেকদিন বাদে একটু লক্ষ করে তৃণা খুব গভীর একটা শ্বাস ফেলে।
মনু একটু ঝুঁকে তাকে দেখে নিয়ে বলে—খুব সেজেছ দেখছি। তবু তোমাকে খুব পেল দেখাচ্ছে। চোখও লাল। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।
—আমাকে একটু ধরে ধরে নিয়ে যাবি?
—এসো। বলে সঙ্গে সঙ্গে মনু হাত বাড়ায়।
ভারী অবাক মানে তৃণা, ও কি তাকে ছোঁবে? ঘেন্না করবে না ওর? তৃণা সঙ্কুচিত হয়ে বলে—তোর দেরি হচ্ছে না তো!
—হচ্ছে তো কী? এসো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই ঘরে।
তৃণা উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে চমকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মনু তাকে এক ঝটকায় পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে হেসে বলে—আরে! তুমি তো ভীষণ হালকা!
তৃণার মাথা ঘুরে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে। সে ককিয়ে কান্না গলায় বলে—ছেড়ে দে, ওরে!
—তুমি কি ভাবছ তোমাকে নিতে পারব না?
—ফেলে দিবি। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে তৃণা।
—দূর! আমি ওয়েটলিফটার, জানো না? তুমি তো মশার মতো হালকা। বলে দুহাতে তৃণার শরীরটার ওপরে নীচে একবার দুলিয়ে দেখায় মনু। তৃণা তখন ছেলের শরীরের সুঘ্রাণটি পায়। মৃদু সাবান পাউডার, আর জামাকাপড়ে ওয়ার্ডরোবের পোকা-তাড়ানো ওষুধের গন্ধ। এ সব ভেদ করে মনুর গায়ের রক্তমাংসের একটা গন্ধ, একটা স্পন্দন পায় না কি সে?
অনায়াসে মনু হলঘরটা পার হয়ে যায় তৃণাকে পাঁজাকোলে নিয়ে। তৃণা ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে ছিল, মুঠো হাতে খামচে ধরে ছিল মনুর গেঞ্জির বুকের কাছটা।
নরম বিছানায় মনু তৃণাকে ঝুপ করে নামিয়ে দিয়ে হাসে—দেখলে তো?
তৃণা একটু ক্ষীণ হেসে বলে—নিজের শরীরে অত নজর দিস না। নিজের নজর সবচেয়ে বেশি লাগে।
—সবাই আমাকে নজর দেয়। বন্ধুরা আমাকে স্যামসন বলে ডাকে।
—বালাই ষাট।

মনু ঠাট্টার হালকা এবং বোকাহাসি হাসে। বলে—চলি?

—কোথায় যাবি?

—যাওয়ার অনেক জায়গা আছে।

মনু মাথা ঝাঁকায়। দরজার কাছ থেকে একবার সাহেবি কায়দায় হাতটা তোলে। চলে যায়।

মনুর শরীরের সুঘ্রাণ এখনও ভরে আছে তৃণার শ্বাসপ্রশ্বাসে। ছোট থেকেই মনু মোটাসোটা ভারী ছেলে, টেনে ওকে কোলে তুলতে কষ্ট হত। তখন থেকে সবাই ছেলেটাকে নজর দেয়। এখন দেখনসই চেহারা হচ্ছে। পাঁচজনে তাকাবেই তো। ভাবতে এক রকম ভালই লাগে তৃণার। দুঃখ এই যে, ছেলে তার হয়েও তার নয়। একটু বুঝি বা কখনও মনের ভুলে মাকে মা বলে মনে করে। তারপরই আবার আলগা দেয়। দূরের লোক হয়ে যায় সব। তৃণা ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। কত রকম যে ভয় তার! সে চুপ করে শুয়ে মনুর কথা ভাবতে থাকে।

শচীন কোথায় গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরে এল। পাশের ঘর থেকে তার সুরহীন গুন গুন ধ্বনি আসে। হলঘরে ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছে। ঘোরের মধ্যে শুয়ে থেকে সেই ঘণ্টাধ্বনি শোনে তৃণা। শুনতে শুনতে হঠাৎ চমকে উঠে বলল, এগারোটা না?

বুকের মধ্যে ধুপ ধুপ করে। উত্তেজনায় নয়। হঠাৎ উঠে বসায় বুকে একটা চাপ লেগেছে। বাসস্টপটা খুব দূরে নয়। দেবাশিস এসে অপেক্ষা করবে। নিজের মানুষ-জনের কাছে বড্ড পুরনো হয়ে গেছে তৃণা, পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে এমন কাউকে চাই যার কাছে প্রতিদিন তৃণার জন্ম হয়।

সে উঠল। শরীর ভাল নেই। মন ভাল নেই। এই ভরদুপুরে সে যদি বেরিয়ে যায়, অনেকক্ষণ ফিরে না আসে তবু কারও কোনও উদ্বেগ থাকবে না। কেউ একফোঁটা চিন্তা করবে না তৃণার জন্য।

হলঘর থেকে রেবার উচ্চকিত স্বর পাওয়া গেল—বাপি!

শচীন গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়—হুঁ!

—আমি বেরোচ্ছি।

—আচ্ছা।

শচীন তার দাঁড়ে সব পাখিকে শেকল পরাতে পেরেছে। এ সংসারে তৃণার মতো পরাজিত কেউ না। শচীন একই সঙ্গে ছেলেমেয়ের মা ও বাবা, ওরা কোথায় কি যায় কী করে, তা তৃণার জানা নেই। যেমন, আজ দুপুরে কে কে বাড়িতে খাবে, বা কার বাইরে নিমন্ত্রণ আছে, তা সে জানে না। কেউ বলে না কিছু। যা বলে তা শচীনকে। একা, অভিমানে তৃণার ঠোঁট ফোলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার কোঁচকানো শাড়িটা ঠিকঠাক করে নেয়, বেরোবে।

বেরোবার মুখে সে হলঘর পেরোতে গিয়ে দেখে শচীন টবে গাছগুলি ঝুঁকে দেখছে। তৃণার দিকে পিছন ফেরানো। চল্লিশের কিছু ওপরে ওর বয়স, স্বাস্থ্য ভাল। তবু ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যে একজন বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি লক্ষ করা যায়। কিছু ধীরস্থির, চিন্তামগ্ন বিবেচকের মতো দেখতে, পাকা সংসারীর ছাপ চেহারায়।

তৃণা নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল। শচীনের টের পাওয়ার কথা নয়। তবু শচীন টের পেল। হঠাৎ ঝুঁকে কী একটা তুলে নিয়ে ফিরে সোজা তার দিকে তাকাল। হাতে একটা ছোট্ট রুমাল। তৃণার।

শচীন জিজ্ঞেস করে—এটা তোমার?

খুব সূক্ষ্ম কাপড় আর লেস দিয়ে তৈরি রুমালটা তারই। সোফায় বসে থাকার সময়ে পড়ে গিয়ে থাকবে।

তৃণা মাথা নাড়ল।

—এখানে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল। বলে শচীন রুমালটা সোফার ওপর আলতোভাবে রেখে দিয়ে আবার গাছ দেখতে লাগল। জাপান থেকে বেঁটে গাছ আনাচ্ছে, শুনেছে তৃণা। সে গাছ কাচের বাক্সে হলঘরে রাখা হবে। বোধ হয় সে ব্যাপারেই কোনও প্ল্যান করছে।

রুমালটা তুলে নিতে গিয়ে তৃণাকে শচীনের খুব কাছে চলে যেতে হল। তার শ্বাস প্রশ্বাস, গায়ের গন্ধ ও উত্তাপের পরিমণ্ডলটির ভিতরেই বোধ হয় চলে যেতে হল তাকে। তৃণা নিজের শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ টের পায়। অবশ্য শচীন খুবই অন্যমনস্ক। সে মোটে লক্ষই করল না তাকে।

তৃণা রুমালটা তুলে নিল। চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে। হঠাৎ দাঁড়াল, তার কিছু হারাবার ভয় নেই, কিন্তু পাওয়ার আশাও নেই। তা হলে রেবা আর মনুর পর এ লোকটাকে একটু পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? বেশ কিছুদিন আগে শচীন তাকে মেরেছিল। জীবনে ওই একবারই বোধহয় পদস্খলন হয়ে থাকবে লোকটার। তা ছাড়া আর কখনও তৃণার জন্য বোধ হয় কোনও আবেগ বোধ করেনি। শচীনের ওই মারটা একটা সুখস্মৃতির মতো কেন যে।

তৃণা আচমকা বলে—আমি যাচ্ছি।

শচীন শুনতে পেল না।

তৃণা মরিয়া হয়ে বলে—শুনছ!

অন্যমনস্ক শচীন দীর্ঘ উত্তর দেয়—উঁ...উঁ।

তারপর ধীরে ফিরে তাকায়। সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে মগ্ন চোখ।

—আমি একটু বেরোচ্ছি। তৃণা হাঁফধরা গলায় বলে।

শচীন বড় অবাক হয় বুঝি! বিস্ফারিত চোখে তার রাঙা পোশাকপরা চেহারাটা দেখে। অনেকক্ষণ পরে বলে—ওঃ!

শচীনের উত্তেজনা কম, রাগ কম। কিন্তু একরকমের কঠিন কর্তব্যনিষ্ঠার বর্ম পরে থাকে। স্ত্রী বিপথগামিনী বলে তার মনে নিশ্চয়ই কিছু প্রতিক্রিয়া হয় কিন্তু তা প্রকাশ করা তার রেওয়াজ নয়, এমন কী তৃণাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারলেও দেয়নি; চমৎকার সুখ-সুবিধের মধ্যে রেখে দিয়েছে। লোকলজ্জাকেও গায়ে মাখে না। এ কেমনতর লোক? এমন হতে পারে, সে তৃণাকে ভালবাসে না, কখনও বাসেনি। কিন্তু ভালবাসুক চাই না বাসুক, পুরুষের অধিকারবোধও কি থাকতে নেই? কিংবা আত্মসম্মানবোধ? তৃণার শরীর ভাল নয়, মাথার ভিতরটাও আজ গোলমেলে। নইলে সে এমন কাণ্ড করতে সাহসই পেত না। সে তো জানে, শচীনের তাকে নিয়ে কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সে কোথায় যায় বা না যায় তার খোঁজ কখনও রাখে না।

তৃণা খুব অসম্ভব একটা চেষ্টায় শচীনের ওপর নিজের চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। শচীন খুব গম্ভীর। অন্যমনস্কতা কেটে গেছে। একটি চিন্তিত দেখাচ্ছে মাত্র।

শচীন মাথাটা নেড়ে বলল—যাবে যাও। বলার কী?

এই উত্তরই আশা করেছিল তৃণা। কিন্তু আজ তার একটা মরিয়া ভাব এসেছে। কেবলই মনে হয়েছে টানবাঁধা উদ্বেগ ও শঙ্কায় ভরা এইসব সম্পর্কের ভিতরের সত্যটা তার জেনে নেওয়া দরকার। যেন আর খুব বেশি সময় নেই।

তাই তৃণা বলে—এ ছাড়া তোমার আব কিছু বলার নেই?

শচীন অবাক হয়ে বলে—কী থাকবে? এখন বলা-কওয়ার স্টেজ পার হয়ে গেছে।

তৃণা তার শুকনো ঠোঁট বিশুষ্ক দাঁতে চেপে ধরল। মুখে জল নেই, পাপোশের মতো খসখসে লাগছে জিভটা। কিন্তু আশ্চর্য যে বহু দিন পরে শচীনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার বুক কাঁপছে না, ভয়ও হচ্ছে না তেমন।

তৃণা বলে—আমি যদি একেবারে চলে যাই, তা হলেও কিছু বলার নেই।

—বলার অনেক কিছু মনে হয়। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে না।

—কেন?

—বলা মানে কাউকে শোনানো, আমার তো শোনানোর কেউ নেই।

তৃণা চুপ করে থাকে। কান্না আসে, কিন্তু কাঁদে না। তার কান্নার মূল্যই বা কী?

শচীন টেবিল থেকে জলের জগটা তুলে নিয়ে আলগা করে একটু জল খেল। তারপর তৃণার দিকে তাকিয়ে তেমনি চিন্তিত গলায় বলে—তুমি কি একেবারেই যাচ্ছ?

তৃণা কিছু বলল না। দুঃসাহসভরে তাকিয়ে থাকল।

শচীন বলে—এ সিদ্ধান্তটা আরও আগেই নিতে পারতে।

—তা হলে কী হত?

—তা হলে অন্তত উদ্বেগ আর মানসিক কষ্ট হত না। দেবাশিসবাবুও নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

তৃণা অধৈর্য হয়ে বলে—আমি সে-যাওয়ার কথা বলিনি।

—তবে?

—আমার মনে হচ্ছে আমি আর বেশি দিন বাঁচব না।

—ও। শচীন একটু চুপ করে থাকে। তারপর, যেন বুঝেছে, এমনভাবে মাথা নাড়ল। বলল—তাও মনে হওয়া সম্ভব। বহুকাল ধরেই তোমার নার্ভের ওপর চাপ যাচ্ছে। তার ওপর আছে নিজেকে ক্রমাগত অপরাধী ভেবে যাওয়ার হীনম্মন্যতা। এ অবস্থায় মরতে অনেকেই চাইবে।

— তুমি কি সিমপ্যাথি দেখাচ্ছ?

—না। কিন্তু তোমাকে সাহসী হতে বলছি। চোরের মতো বেঁচে আছ কেন? যা করেছ তা আরও সাহস আর স্পষ্টতার সঙ্গে করা উচিত ছিল।

—কী বলতে চাও তা আরও স্পষ্ট করে বলো।

শচীন তার দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইল, যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না তৃণার এই ব্যবহার। তারপর বলে—এ ঘরটা কথা বলার ঠিক জায়গা নয়। এসো।

বলে শচীন হলঘরের সামনের দিকের ঘরটায় ঢোকে। এই ঘরে পাতা রয়েছে সবুজ রঙের পিংপং টেবিল, ক্যারম, দাবা, দেয়ালে সাজানো টেনিস আর ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট। কাঠের ফ্রেমে গলফ্ কিট। একধারে জুতোর র‍্যাক, দেয়াল আলমারিতে সাজানো কয়েকটা বন্দুক, রাইফেল, কয়েকটা ভাল সোফা দেয়ালের সঙ্গে পাতা রয়েছে।

তৃণার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, শচীন তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে একটু আগ্রহ দেখাবে। ঘটনাটা যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে। কিন্তু জানে তৃণা, এত কথা বলে এ সমস্যার কোনও সুরাহা হওয়ার নয়।

ঘরটা একটু আবছায়া। শচীন ঢুকে তৃণার ঘরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। পিংপং খেলার জন্য এ ঘরে কয়েকটা খুব বেশি পাওয়ারের আলো লাগানো আছে। শচীন আলো জ্বালে। চোখ ধাঁধানো আলো।

তৃণার মাথার মধ্যে একটা বিকারের ভাব। বন্ধ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই তার মনে হয়, এ ঘরে একটা মিলনান্তক নাটক করার জন্যই শচীন তাকে ডেকে এনেছে। শেষমেশ জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরবে না তো। না না, তা হলে সহ্য করতে পারবে না তৃণা। বড় বিতৃষ্ণা হবে তা হলে।

শচীন পিংপং টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ার টেনে বসল, টেবিলের ওপরে সাবধানে নিজের হাত দু'খানার ভর রেখে তৃণার দিকে চেয়ে বলল—এবার বলো।

তৃণা ভ্রূ কুঁচকে বলে—আমি কী বলব?

—বলাটা তুমিই শুরু করেছ।

তৃণা একটু থমকে থাকে।

সময় চলে যাচ্ছে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে দেবাশিস তার গাড়ি নিয়ে এসে বসে থাকবে। সেটা ভাবতেই তার শরীরে অসুস্থতাকে ভাসিয়ে দিয়ে একটা জোয়ার আসে তীব্র, তীক্ষ্ণ আনন্দের। শচীনের দিকে তাকিয়ে তার এ লোকটার সঙ্গ করতে অনিচ্ছা হতে থাকে।

তৃণা শ্বাস ফেলে বলে—আমি বোধ হয় বেশিদিন বাঁচব না।

—সেটা হঠাৎ আজ বলছ কেন?

—আজ বলছি, আজই মনে হচ্ছে বলে।

শচীন মাথা নেড়ে ধীর স্বরে বলে—যদি মনে হয় তা হলে তার জন্যে আমরা কী করতে পারি?

তৃণা অধৈর্যের গলায় বলে—আমি কিছু করতে বলিনি।

—তবে?

তৃণা একটু ভাবে। ঠিকঠাক কথা মনে পড়ে না। হঠাৎ বলে—আমি এ বাড়িতে কী-রকমভাবে আছি তা কি তুমি জানো না?

শচীন চুপ করে চেয়ে রইল খানিক। তৃণার আজকের সাহসটা বোধহয় তারিফ করল মনে মনে।

তারপর বলল—বাইরে থেকে কেমন আছ তা জানি। কিন্তু মনের ভিতরে কেমন আছ তা কী করে জানব? প্রত্যেক মানুষই দুটো মানুষ।

—সে কেমন?

—বাইরেরটা আচার-আচরণ করে, সহবত রক্ষা করে, হাসে বা কাঁদে, ভালবাসে বা ঘেন্না করে। আর ভিতরের মানুষটা এক পাগল। বাইরের জনের সঙ্গে তার মিলমিশ নেই, বনিবনা নেই, একটা আপস-রফা হয়তো আছে। সেই ভিতরের মানুষটাকে জেনুইন অন্তর্যামী ছাড়া কেউ জানতে পারে না।

—আমি তত্ত্বকথা শুনতে চাই না।

শচীনকে খুব শান্ত ও নিরুদ্বেগ দেখাচ্ছে। এ মানুষটার এই শান্তভাবটা তৃণা কখনও ভাল মনে নিতে পারে না। শচীন শান্তমুখে বলে—তত্ত্বকথা মানেই তো আর পুঁথিপত্রের কথা নয়। জীবন থেকেই তত্ত্ব কিংবা দর্শন আসে। আমি তো স্পষ্ট করেই বলছি যে, তোমার জন্য আমরা কিছু আর করতে পারি না।

—তা জানি। আমি তবু একটা কথা জানতে চাই। তোমার চোখে এখন আমি কীরকম?

শচীন হাসল না। তবু একটু দুর্বোধ্য কৌতুক চিকমিক করে গেল তার চোখে। বলল—অ্যাপারেন্টলি তুমি তো এখনও বেশ সুন্দরীই। ফিগার ভাল, ছেলেমেয়ের মা বলে বোঝা যায় না।

তৃণা রেগে লাল হয়ে গেল। বলল—সেকথা জিজ্ঞেস করিনি।

—তবে?

—আমি জানতে চাইছি, তুমি আমাকে কী চোখে দেখ!

—ও। বলে শচীন তেমনই চুপ করে চেয়ে থাকে তার দিকে। চোখে কোনও ভাষা নেই, নীরব কৌতুক ছাড়া। বলে—তোমাকে আসলে আমি দেখিই না। অনেক চেষ্টা করে তবে এই না-দেখার অভ্যাস করেছি।

তৃণার এ সবই জানা। তবু বলল—এই যেমন এখন দেখছ! এখন কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না?'

—হচ্ছে।

—সেটা কেমন?

—রাস্তার ভিখিরিদের আমরা লক্ষ করি না। আবার তাদের মধ্যে কেউ যখন সাহসী হয়ে, কিংবা মরিয়া হয়ে কাছে এসে তাদের দুঃখের কথা বলে তখন তাকে দেখি, মায়া হয়, করুণা বোধ করি। এও ঠিক তেমনি, তোমার জন্য মায়া এবং করুণা হচ্ছে। আবার যখন ভিখিরিটা দঙ্গলে মিশে যাবে, তখন আবার তাকে লক্ষ করব না। আমরা কেউ কাউকে কনস্ট্যান্ট মনে রাখতে পারি না, সে যত ভালবাসার বা ঘেন্নার লোক হোক না কেন। কখনও মনে রাখি আবার ভুলে যাই, ফের মনে করি—এমনিভাবেই সম্পর্ক রাখি। মানুষ দুভাবে থাকে।

—সে কেমন?

—এক, কেবলমাত্র শারীরিকভাবে থাকে। দুই, মানুষের মনের মধ্যে থাকে। আমার কাছে, তুমি কেবল শারীরিকভাবে আছ, আমার মনের মধ্যে নেই।

তৃণা ভ্রূ কোঁচকায়। বিরক্তিতে নয়, যখন সে খুব অসহায় হয়ে পড়ে তখন ভ্রূ কোঁচকানো তার স্বভাব।

তৃণা শ্বাস ফেলে বলে—এটা সত্যি কথা নয়।

—তা হলে কোনটা সত্যি কথা? তুমি কি আমার মনের মধ্যে আছ?

তৃণা মাথা নেড়ে বলে—আমি সে কথা বলিনি। আমি জানতে চাই আমাকে—আমার প্রতি তোমার প্রতিক্রিয়া কী?

শচীন মাথাটা নামিয়ে সবুজ টেবিলের ওপর তার দুহাতের আঙুল দেখল। তারপর মুখ না তুলেই বলল—আমি খুব সিমপ্যাথেটিক। তোমার সমস্যাটা আমি বুঝি, তাই তোমাকে সাহসী হতে বলেছিলাম।

—আমাকে চলে যেতে বলছ?

শচীন মাথা নেড়ে বলল—না, তুমি এ বাড়িতে থেকেও যা খুশি করতে পারো। তাতে আমাদের যে কিছু আসে যায় না, তা তো তুমি বোঝোই, কিন্তু তোমার তাতে আসে যায়। তুমি কেবলই পাপবোধে কষ্ট পাচ্ছ, আমরা তোমাকে নিয়ে নানা জল্পনা করছি বলে সন্দেহ করছ। হয়তো একথাও ভাব যে, দেবাশিসবাবুর স্ত্রী তোমার জন্য আত্মহত্যা করেন। এ সব তোমার ভিতরে ক্ষয় ধরাচ্ছে। আমি

তোমাকে চলে যেতে বলছি না, কিন্তু গেলে তোমার দিক থেকেই ভাল হবে।

—আমি থাকি বা যাই, তাতে কি তোমাদের কিছু যায় আসে না?

—না।

—আর যদি মরে যাই?

—সেটা স্বতন্ত্র কথা। অন্য মানুষকে মরতে দেখলে আমাদের নিজের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে, তাই মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু, তুমি মরবে কেন?

—আমি ইচ্ছে করে মরব, এমন কথা বলিনি। কিন্তু মনে হয়, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না।

—তা হলে সেটা দুঃখের ব্যাপার হবে। যাতে মরতে না হয় এমন কিছু করাই ভাল। শরীর খারাপ হয়ে থাকলে ডাক্তার দেখাও।

তৃণা ঘুরে দরজার দিকে এগোয়। ছিটকিমি খুলতে হাত বাড়িয়ে বলে—দেখাব। কিন্তু দয়া করে মনে কোরো না যে, আমি তোমার বা তোমাদের করুণা পাওয়ার জন্য মরার কথা বলেছিলাম।

শচীন চেয়ার ঠেলে উঠল। কথা বলল না।

তৃণা আর একবারও ফিরে তাকাল না। দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল হলঘরে। তারপর সিঁড়ি ভেঙে বাগানের রাস্তা ধরে চলে আসে ফুটপাথে। খুব জোরে হাঁটতে থাকে।

আপন মনেই বিড়বিড় করে কথা বলছিল তৃণা—যাব না কেন? আমি তো তোমাদের কেউ না।

কোনও লক্ষ্য স্থির ছিল না বলে তৃণা ভুল রাস্তায় এসে পড়ল। ঘড়িতে খুব বেশি সময় নেই। দেবাশিস আসবে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে তাদের দেখা হবে। দেখা হলেই পৃথিবীর মরা রঙে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠবে।

তৃণা ঠিক করে ফেলল, আজ সে দেবাশিসকে বলবে, বরাবরের মতো চলে যাবে তৃণা, ওর কাছে।

সামনেই একটা থেমে-থাকা মোটর সাইকেল স্টার্ট দিচ্ছে অল্পবয়সি একটা ছেলে। স্টার্টারে লাথি মারছে লাফিয়ে উঠে। স্টার্ট নিচ্ছে না গাড়িটা, দু'-একবার গরগর করে থেমে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ রাস্তায় শব্দটা ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি হয়ে মস্ত বড় হয়ে যাচ্ছে। সেই শব্দটায় যেন তৃণা সংবিৎ ফিরে পেল। সে চারধারে তাকিয়ে দেখল এ তার রাস্তা নয়। ফাঁড়ি আরও উত্তরে।

সে ঘুরে হাঁটতে থাকে। পিছনে মোটরসাইকেলটা স্টার্ট নেয় এবং ভয়ঙ্কর একটা শব্দ তুলে মুখ ঘুরিয়ে তেড়ে আসে। ফুটপাথে উঠে যায় তৃণা। মোটর সাইকেলটা ঝোড়ো শব্দ তুলে তাকে পেরিয়ে চলে যায়।

পাঁচ

গাড়ির শব্দ পেয়েই ওপর থেকে ফুলি হাঁফাতে হাঁফাতে নেমে আসে। অল্পবয়সেই ফুলি বড় মোটা হয়ে গেছে। এক দঙ্গল ছেলেপুলের মা। তবু বোধ হয় সন্তানের তেষ্টা ওর মেটেনি। রবির জন্য একবুক ভালবাসা বয়ে বেড়ায়।

ফুলির আদর সোহাগ সবই সেকেলে ধাঁচের। রবি গাড়ি থেকে নামতে না-নামতেই ফুলি হাত বাড়িয়ে রাস্তাতেই ওকে বুকে টেনে নেয়। মৃদু সুখের ঘুনঘুনে শব্দ করতে করতে বলে—ধন আমার, মানিক আমার, গোপাল আমার...বলে মুখে বুকে মুখ ডুবিয়ে দেয়। রবি প্রথমটায় লজ্জা পায়। হাত-পা দিয়ে আদরটা ঠেকায়। কিন্তু তারও দুর্বলতা আছে। সারা সপ্তাহ ধরে সে এই অদ্ভুত গ্রাম্য আদরটুকুর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই দেখা যায়, রবি দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে তার মণিমাকে, কাঁধে মাথা রেখেছে। বলছে—রোজ রাতে আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখে মণিমা।

ফুলির বুকে বোধহয় এই কথায় একটা ঢেউ উঠে নতুন করে। সেই ঘুনঘুনে আদরের শব্দটা করতে করতে পিষে ফেলে রবিকে। আর রবি এবার নির্লজ্জের মতো আদর খায়।

ফুলির ছেলেপুলেরা সাড়া পেয়ে হইহই করে এসে ঘিরে ধরে রবিকে। রবি ওদের কাছে একটা বিরাট বিস্ময়। সে সাহেবদের মতো চমৎকার ইংরেজি বলে, অদ্ভুত সব দামি পোশাক পরে, নিখুঁত

সহবত মেনে চলে। ফুলির ছেলেমেয়েরা এ সব দেখে ভারী মজা পায়।

ফুলি তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে রবিকে ছেড়ে দিয়ে মুগ্ধচোখে একটু চেয়ে রইল, আপন মনেই বলল—রোগা হয়ে গেছে।

চাঁপা হটবক্স ফ্লাস্ক আর দই মিষ্টির ভাঁড় নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে—কিছু খেতে চায় না।

ফুলি মাথা নেড়ে বলে—খাবে কী? ওর ভিতরটা যে খাক হয়ে যায়। সে আমি বুঝি।

ফুলিদের আলাদা বসবার ঘর নেই। ঢুকতেই একটা লম্বাটে দরদালানের মতো আছে, সেখানে কয়েকখানা চেয়ার পাতা। ফুলির বর শিশির বি-এন-আর-এ চাকরি করে। বয়স বেশি নয়, কিন্তু ভারী প্রাচীনপন্থী। বছর বছর ছেলেপুলে হয় বলে দেবাশিস ওকে একবার বলেছিল—ভায়া, বউটাকে তো মেরে ফেলবে, ছেলেপুলেগুলোও মানুষ হবে না।

শিশির একটু ঘাড় তেড়া করে বলল—তা কী করব বলুন?

তখন দেবাশিস বলে—কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করো না কেন?

শুনে বড় রেগে গিয়েছিল শিশির, বলল—কেন, আমি কি নষ্ট মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছি নাকি যে ও সব ব্যবহার করব?

এই হচ্ছে শিশির। আধুনিক জগতের কোনও খোঁজই সে রাখে না, তার ধারণা চাঁদে মানুষ যাওয়ার ঘটনাটা স্রেফ কারসাজি আর পাবলিসিটি। আজও সে বিশ্বাস করে না যে চাঁদে মানুষ গেছে। কথা উঠলেই বিজ্ঞের মতো একটা 'হুঁ' দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেবাশিসকে সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। দেবাশিসের অর্থকরী সাফল্যকে সে হয়তো ঈর্ষা করে, কিংবা তার আধুনিক ফ্যাশানদুরস্ত হাবভাব, চালাক চতুর কথাবার্তা অপছন্দ করে।

দেবাশিস দরদালানের চেয়ারে বসল একটু। ভিতরের ঘরে রবিকে ঘিরে ধরে পিসতুতো ভাইবোন হল্লা করছে। মুর্গ-মুসল্লমের প্যাকেট হটবক্স থেকে বের করা হয়েছে বোধ হয়। তাই দেখে চেঁচাচ্ছে ফুলির আনন্দিত ছেলেমেয়েরা। বাথরুমের দিক থেকে গামছা-পরা শিশির বের হয়ে এল। দেবাশিসকে দেখে একটু হাসল। বলল—কী খবর? হাসিটা তেমন খুলল না।

—এই তো, চলে যাচ্ছে।

—রবিকে এনেছেন?

—হ্যাঁ, আওয়াজ পাচ্ছ না?

শিশির এবার সত্যিকারের হাসি হাসল। দেবাশিসকে যতই অপছন্দ করুক শিশির, রবির প্রতি তারও ভয়ঙ্কর টান আছে। রবি এলে সে রসগোল্লা কিনে আনে, টফি আনে, খেলনা। ডাকে রবিরাজ বলে।

ফুলি এক কাপ চা হাতে এল। শিশিরকে দেখে ঘোমটা দিল মাথায়। ওর চালচলনে এখনই কেমন গিন্নি-বান্নির ঠাট-ঠমক পাকা হয়ে গেছে। একগাল পান মুখে।

চা-টা একটা ছোট্ট টুলে দেবাশিসের সামনে রেখে হাঁসফাঁস করতে করতে বলে—সুজি করেছি, খাবে?

—না।

পানের পিক ফেলতে বাথরুমে মুখ বাড়িয়ে আবার ফিরে এল ফুলি। চাঁপার দিকে চেয়ে বলল—তুই দিনমান থাকবি তো চাঁপা, না কি দাদার সঙ্গে চলে যাবি? আমি একহাতে আজকের দিনটা সামলাতে পারি না। খুদে ডাকাতরা সারা বাড়ি তছনছ করে, তার ওপর আজ আবার ওদের বাপ শনিঠাকুরটি বাড়িতে আছেন। আমি বলি বরং তুই থেকে যা।

চাঁপা ঘাড় নাড়ল। বলে—সোনাবাবুর কাছ-ছাড়া হতে ভাল লাগে না।

মুখটা খুশিতে ভরে ওঠে ফুলির, বলে—আহা, রোগা হয়ে গেছে।

দেবাশিস ভদ্রতাবশত চায়ে চুমুক দেয়। আসলে ফুলির বাসার চা সে খেতে পারে না। চায়ের সুঘ্রাণ নেই, আছে কেবল লিকার আর গুচ্ছের দুধ-চিনি। দুধ বেশি পড়ে গেছে, ফলে চা সাদা দেখাচ্ছে। ছেলেবেলায় বেশি দুধের চাকে তারা বলত সাহেব চা। সাহেবদের রং ফরসা বলেই বোধ হয় উপমাটা দিয়ে থাকবে।

ফুলি, এ যে সাহেব চা। দেবাশিস বলে।

ফুলি প্রথমটায় বুঝতে পারে না। তারপর বুঝে লজ্জা পেয়ে বলে—তোমার তো আবার সব সাহেবি ব্যাপার। পাতলা লিকার অল্প দুধ-চিনি ও সব কি আর মনে থাকে। আমাদের বাঙালি বাড়িতে যেমনটি হয় তেমনটি করে দিয়েছি। আবার করে দিই।

—থাকগে। খারাপ লাগছে না। দেবাশিস বলে।

ফুলি সামনে মোড়া পেতে বসল। গায়ে মোটা মোটা গয়না, আঁচলে চাবি, সব মিলিয়ে ওর নড়াচড়ায় এক ঝনৎকার শব্দ হয়। জোরে শ্বাস ফেলে, শ্বাসের সঙ্গে একটা শারীরিক কষ্টে ওঃ বা আঃ শব্দ করে। সম্ভবত কোনও মেয়েলি রোগ আছে। শরীরের নানা আধি-ব্যাধির কথা বলে, কিন্তু বসে শুয়ে থাকে না কখনও। সারাদিন কাজকর্ম করছে স্টিম-রোলারের মতো।

বসে ফুলি বলল—দাদা, এবার রবির ব্যাপারে একটা কিছু ঠিক করো।

—কী ঠিক করব?

—ওকে আর তোমার ফাঁকা ভুতুড়ে ফ্ল্যাটে রেখে লাভ কী? সারাদিন ওর মনের মধ্যে নানা ভয়-ভীতি খোঁড়ে। দেখছ না, কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে। খাওয়ায় অরুচি, সারাদিন নাকি মুখ গোমড়া করে থাকে। সঙ্গী-সাথিও নেই।

—সব সয়ে যাবে।

—সইছে কোথায়। প্রায় সময়েই আমার কাছে এসে মায়ের কথা বলে। দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে রাখি, ঘুমের মধ্যে দেখি খুব চমকে চমকে ওঠে। এ সব ভাল লক্ষণ নয়। মুখে কিছু বলে না, লজ্জায়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাঁদে।

দেবাশিস একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে বলল—আমি তো ও যা চায় দিই।

—আহা! বাচ্চাদের কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে মা আর সঙ্গী। তা ও পায় কোথায়! আমি বলি, আমার কাছ থাক। মণিমা-মণিমা করে কেমন অস্থির হয় দেখনি?

দেবাশিস একটু হেসে বলে—তোরই তো অনেক ক'জন, তার ওপর আবার রবি এসে জুটলে—

ফুলি ধমকে ওঠে—ও সব অলক্ষুণে কথা বোলো না। ছেলেমেয়ে আবার বেশি হয় না কি?

দেবাশিস হাসে, বলে—তোর তা হলে এখনও ছেলেমেয়ের সাধ মেটেনি?

ফুলি কড়া গলায় বলে—না। মিটবেও না। আমি বাপু, ছেলেপুলে কখনও বাড়তি দেখি না। যত হবে তত চাইব। মা হয়েছি কীসের জন্য?

যদিও এটা কোনও যুক্তি নয়, তবু এর প্রতিবাদও হয় না। কারণ এ যুক্তির চেয়ে অনেক জোরালো জিনিস। এ হচ্ছে বিশ্বাস। শিশিরের সঙ্গে থেকেই বোধ হয় এইসব গ্রাম্যতা ওর মনে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তির লড়াই বোকামি। তাই দেবাশিস একটু চুপ করে থাকে। একটা সিগারেট ধরায়।

বলে—দেখি।

—দেখবে আবার কী। রবিকে আমার কাছে দিয়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি।

—ওখান থেকে ওর ইস্কুলটা কাছে হয়, তা ছাড়া একভাবে থেকে থেকে সেট হয়ে গেছে, এখন তোর এখানে এসে থাকলে দেখবি ওর মন বসছে না।

—কী কথা। এ বাড়িতে এলে ও কখনও যেতে চায় দেখেছ?

—সে এক-দু দিনের জন্য, পাকাপাকিভাবে থাকতে হলেই গোলমাল করবে।

—সে আমি বুঝব। তুমি বাপু ছেলেকে একেবারে সাহেব করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছ। আজকাল আমার সঙ্গেও ইংরিজি বলে ফেলে, কথায় কথায় 'সরি' আর 'থ্যাঙ্ক-ইউ' বলে।

শিশির গামছা ছেড়ে লুঙ্গি পরেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—আসলে গরিবের বাড়িতে রাখতে দাদার ভয়। এখানে খারাপ সহবত শিখবে। খানা-পিনাও তেমন সায়েন্টিফিক হবে না।

দেবাশিস মনের মধ্যে এ সব কথাই ভাবে। এখানে দঙ্গলের মধ্যে পড়ে রবি তার আচার আচরণ ভুলে যাবে, স্মার্টনেস হারাবে। চিৎকার করতে শিখবে, খারাপ কথা বলতে শিখবে। এবং হয়তো বা দেবাশিসকে একটু একটু করে বিস্মৃত হবে।

দেবাশিস মৃদু গলায় বলে—না, সে সব নয়। আসলে ও আছে বলেই ফ্ল্যাটটায় ফিরতে ইচ্ছে করে।

ফুলি বলে—তুমি আর কতক্ষণের জন্যই বা ফেরো। রাতটুকু কেটে গেলেই তো আবার টৌ-টো কোম্পানি। ও যে একা সেই একা।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলে—ভেবে দেখি।

—দাদা, আমি রবিকে বুক দিয়ে আগলে রাখব। একটুও চিন্তা কোরো না।

—সে আমি জানি। তবু একটু ভেবে দেখতে দে।

—ভাবতে ভাবতেই ওকে শেষ করে ফেলো না। এখানে থাকলে ও সব ভুলে থাকতে পারবে। ফাঁকা ঘরে থাকে বলেই ওর সব মনে পড়ে। আমার কাছে কত কথা এসে বলে।

দেবাশিস ফুলির দিকে একটু অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখছিল। ছেলেপুলের কী অপরিসীম সাধ ওর। গর্ভযন্ত্রণার কথা ভাবে না, ঝামেলার কথা ভাবে না। দুবার ওর পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে আজও দুঃখ করে। এই অভাব, দারিদ্র্য, দুঃসময়—এগুলো ওর কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। দুটি বা তিনটি সন্তানের সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও কখনও বোধ হয় চোখ তুলে দেখে না। শুনলে বলে—ও সব শোনাও পাপ।

দেবাশিস একটু হেসে বলে—পারিসও তুই!

ভিখিরির মতো ফুলি বলে—রবিকে দেবে দাদা?

দেবাশিস মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—আজ উঠি রে।

সে উঠে দাঁড়ায়। চাঁপা দৌড়ে গিয়ে রবিকে বলে—সোনাবাবু, এসো। বাবা চলে যাচ্ছে। দেখা করে যাও।

কিন্তু রবি সহজে আসে না। দেবাশিস সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। চাঁপা রবিকে হাত ধরে নিয়ে আসে। দেবাশিস দেখতে পায়, ইতিমধ্যেই রবির চুল ঝাঁকড়া হয়ে গেছে। গায়ের টি-শার্ট বুক পর্যন্ত গুটিয়ে তোলা। মুখে চোখে একটা আনন্দের বিভ্রান্তি। দেবাশিসের দিকে চেয়েই রবি দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলল—বাবা তুমি যাও।

দেবাশিস ক্লিষ্ট একটু হাসে। বলে—আচ্ছা।

ফুলি সিঁড়ি পর্যন্ত আসে। কয়েক ধাপ নামে দেবাশিসের সঙ্গে। গলা নিচু করে বলে—শোনো দাদা।

দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে বলে—উঁ।

—রবি তোমার কাছে থাকলে ক্ষতি হবে। ও বড় দুঃখী ছেলে। তুমি কেন বুঝতে পারছ না?

দেবাশিস হাসল। মড়ার মুখের মতো হাসি। তারপর ফুলিকে পিছনে ফেলে নেমে এল রাস্তায়।

গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে একটা কণ্ঠস্বর শুনে হঠাৎ ওপরে তাকাল। চমকে উঠল ভীষণ। দোতলার রেলিঙের ওপর দিয়ে আধখানা শরীর বাড়িয়ে ঝুঁকে আছে রবি। আশেপাশে পিসতুতো ভাইবোনেরা। খুব উত্তেজিতভাবে কী যেন দেখছে দূরে। হাত তুলে আঙুল দিয়ে পরস্পরকে দেখাচ্ছে। হয়তো কাটা ঘুড়ি। কিংবা হেলিকপ্টার।

দেবাশিসের বুকের ভিতরটায় প্রবল একটা ঝাঁকুনি লাগে। গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষলে যেমন হয়।

—রবি! বলে একটা চিৎকার দেয় সে।

মস্ত ভুল হয়ে গেল চিৎকারটা দিয়ে। এমন অবস্থায় কাউকে ডাকতে নেই। রবির মা সাততলা ফ্ল্যাট থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা যায়।

শরীরের আধখানা বাইরে ঝুলন্ত অবস্থায় রবি ডাকটা শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। দুলে উঠল শিশু-শরীর। শূন্য হাত বাড়িয়ে একটা অবলম্বনের জন্য অসহায়ভাবে হাত মুঠো করল। টালমাটাল ভয়ংকর কয়েকটি মুহূর্তের সন্ধিসময়। দেবাশিসের প্রায় সংজ্ঞাহীন শরীরটা টাল খেয়ে গাড়ির গায়ে ধাক্কা খায়। চোখ বুজে ফেলে সে। দাঁতে দাঁত চাপে।

রবি সামলে গেল। ওর ভাইবোনেরা ওকে ধরেছে। টেনে নামিয়ে নিচ্ছে রেলিং থেকে। ফুলি এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

দেবাশিস অবিশ্বাসভরে চেয়ে থাকে। রবি রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বাবার দিকে চেয়ে হাসে। তারপর হঠাৎ প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে আনে। বাপের দিকে তাক করে গুলি ছুড়তে থাকে-ঠিসুং...ঠিসুং...

দেবাশিস একবার ভাবল ফিরে যাবে ঝুলির বাসায়। তারপর ভাবল—থাক। ওরও তো ছেলেমেয়ে আছে। কেউ তো পড়ে মরেনি কখনও।

রবির দিকে চেয়ে দেবাশিস একটু হাসে। তার বুকে কোথায় যেন রবির খেলনা রিভলভারের মিথ্যে গুলি এসে লাগে। সে গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে কোনওক্রমে হুইলের পিছনে বসে পড়ে। তারপর গভীরভাবে কয়েকটা শ্বাস নেয়।

গাড়ি ছাড়ে। কিন্তু উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে কেবলই দোতলার রেলিং থেকে ঝুঁকে-থাকা রবির চেহারাটাকে দেখতে পায়। চমকে চমকে ওঠে। দাঁতে দাঁত চাপে। হুইলে তার মুঠো করা হাত প্রবল চাপে সাদা হয়ে যায়। পদে পদে ভুলভাবে গাড়ি চালাতে থাকে সে।...

রবির মা চন্দনা লাফিয়ে পড়েছিল সাততলা থেকে, কথাটা ভুলতে পারে না।

রবিও কি কিছু ভোলেনি? সব মনে রেখেছে।

তৃণার সঙ্গে দেখা হবে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে। দেবাশিস খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে থাকে।

ছয়

দুপুরের ফাঁকা রাস্তায় তৃণা একটু বেশি তাড়াতাড়ি হাঁটছিল । পিছনে কে যেন আসছে! ফিরে দেখল। কেউ না। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে, পিছনে কে আসছে। কে যেন চুপিচুপি আসছে। কার চোখ তীব্রভাবে, গোয়েন্দার মতো নজর করছে তাকে। কেউ নয়। তবু তৃণা প্রাণপণে হাঁটে। বড় রাস্তায় তুখোড় রোদ। দোকান বাজার বন্ধ। রাস্তা ফাঁকা ফাঁকা, তৃণা কি আজ খুন হবে? গোপন থেকে কোন আততায়ী কেবলই আসে তৃণার দিকে?

তৃণা চারধারে তাকায়। কেউ নয়। উল্টোবাগে চলে এসেছে অনেকখানি। বাসস্টপটা এখনও বেশ দূরে। তৃণা বেশি হাঁটতে পারে না। হাঁটা জিনিসটা বড্ড ক্লান্তিকর। রিকশাতেও সে কখনও ওঠে না। বড্ড মায়া হয়। দুপুরের পিচ-গলা রাস্তায়, এই চাবুক রোদে রোগা মানুষগুলো রিকশা টানে, তাতে সওয়ার হতে একদম ভাল লাগে না তার।

ল্যান্সডাউনের মোড়ে পেট্রল-পাম্পের কাছ ঘেঁষে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সিওলা হাঁটু তুলে বসে ছোট্ট একটা বই পড়ছে। সম্ভবত রেসের বই, কিংবা গীতাও হতে পারে। একা ট্যাক্সিতে তৃণা ওঠে না। ভয় করে । কিন্তু শরীরটা কেমন যেন কাঁপছে। ভয় করছে। উৎকণ্ঠা।

সাহস করে দু'পা এগোল তৃণা।

—ভাই, ট্যাক্সি কি যাবে?

—যাবে। ট্যাক্সিওলা গম্ভীরভাবে বলে।

ট্যাক্সিটা দক্ষিণদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। তৃণা উঠতেই ট্যাক্সিটা ওই দিকেই চলতে থাকে, তৃণা কিছু বলেনি। তখন সে সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল রেবার ঘরে সে বসে আছে, আর রেবা হৃদয়হীনা রেবা তার দিকে স্বচ্ছ শীতল চোখে তাকিয়ে পরমুহূর্তেই সে তার ছেলেকে দেখতে পায়। মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান মনু তাকে কোলে করে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। কী সুন্দর মনুর গায়ের গন্ধটুকু। আবার দেখে শচীন পিং পং টেবিলের ওপাশে বসে আছে, বলছে—তোমাকে আজকাল আমি লক্ষ করি না...

ভ্রূ কোঁচকায় তৃণা। তার সংসারে সে আজকাল আর নেই। কেউ তাকে লক্ষ করে না। এ কেমন? সে ও বাড়ির কারও মা, কারও গৃহকর্ত্রী। তার অতবড় পতন, ওই কলঙ্ক, পরকীয়া ভালবাসা; এ সব ওদের একেবারেই কেন উত্তেজিত ও দুঃখিত করে না? কেন ওদের শান্তি ও স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ আছে? এ কি শচীনের ষড়যন্ত্র! শচীন কি ওদের শিখিয়ে রেখেছে—ওর দিকে তাকিয়ো না, কথা বোলো না, ওকে উপেক্ষা করো। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই।

ট্যাক্সিওলা আয়না দিয়ে তাকে দেখছিল। ছোট আয়না, তাতে শুধু মধ্যবয়স্ক ও জোয়ান চেহারার ট্যাক্সিওলার ক্রূর চোখদুটো দেখা যায়। ফট করে চোখ পড়তেই চমকে উঠল তৃণা। আতঙ্কিত একটা শব্দ উঠে এসেছিল গলায়। অস্ফুট শব্দটা মুখে হাত চাপা দিয়ে আটকাল। বলল—থামুন।

—এইখানে নামবেন? বলে ট্যাক্সিওলা গাড়ি আস্তে করল।

—এইখানেই। বলে তৃণা অবাক হয়ে দেখে, সে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসেছে, এদিকে তার আসার কথা নয়। সে যাবে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে। বার বার সে কেন তবে সে-জায়গা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অন্যমনস্কতায়, বিভ্রমে? তৃণা আস্তে করে বলল—এটা কোন জায়গা। দেশপ্রিয় পার্ক?

—হ্যাঁ, এখানেই নামবেন? বলে মধ্যবয়স্ক জোয়ান লোকটা তার দিকে পরিপূর্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। লোকটার মুখে ঘাম, অশিক্ষার ছাপ! বন্যজন্তুর মতো একটা কামস্পৃহা লক্ষ করে তৃণা। বুকটা একটু কেঁপে ওঠে। গাড়ির দরজার হাতলটা কিছুতেই খুলতে পারছিল না তৃণা। খুব তাড়াহুড়ো করছিল। একবার মনে হল, লোকটা কোনও কৌশলে দরজাটা আটকে দেয়নি তো। যাতে তৃণা খুলতে না পারে। লোকটাই হঠাৎ তার প্রকাণ্ড ঘেমো হাতটা বাড়িয়ে তৃণার হাতটা ঠেলে লকটা খুলে দিল।

তৃণা নেমে চলে যাচ্ছিল। খুব তাড়া। লোকটা পিছনে থেকে খুব একটা ব্যঙ্গের গলায় বলল—ভাড়াটা কে দেবে?

তাড়াতাড়িতে আর ভয়ে কত ভুল হয়। তৃণা ব্যাগ খুলে ভাড়া দিয়ে দিল। লজ্জায় কান-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

ট্যাক্সিওলার চোখের সামনে থেকে তাড়াতাড়ি পালানোর জন্যই তৃণা এলোপাথাড়ি খানিক হাঁটল উদ্‌ভ্রান্তের মতো, চলে এল রাসবিহারী অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। কিছুতেই তার মনে পড়ছিল না এখান থেকে কোন রুটের বাস ফাঁড়ি পর্যন্ত যায়। মনটা বড় অশান্ত, বুকের মধ্যে কেবলই একটা পাখা ঝাপটানোর শব্দ, কাকাতুয়াটা ডাকছে...তৃণা...তৃণা...তৃণা...

আজ দুপুরের কলকাতাকে নিঝুমপুর নাম দেওয়া যায়। কেউ কোথাও নেই। ফাঁকা হু-হু, মন-কেমন-করা রাস্তা, রোদ গড়াচ্ছে, তৃণা ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে যাবে, কিন্তু সে বড় অনেক দূরের রাস্তা বলে মনে হয়। সে বড় অফুরান পথ। কোনওদিনই বুঝি যাওয়া যাবে না। বেলা একটা বেজে গেছে। তৃণার গায়ের চ্যানেল নাম্বার সিক্সের গন্ধটা অল্প অল্প করে উবে যাচ্ছে হাওয়ায়, বাতাসে চুল এলোমেলো।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল তৃণা। কী করে যাবে। সেই বারোটায় যাওয়ার কথা ছিল। দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতেই আবার হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করে পিছু ফিরে চাইল তৃণা। কে তার পিছনে আসছে? কে তাকে লক্ষ করছে নিবিষ্টভাবে?

আতঙ্কিত তৃণা হঠাৎ দেখল, একটা বিয়াল্লিশ নম্বর বাস মোড় নিচ্ছে। মনে পড়ল, এই বাসটা ফাঁড়ি হয়ে যায়। চলন্ত বাসটার সামনে দিয়ে হরিণ-দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল তৃণা। বিপন্নার মতো চিৎকার করে বলল—বেঁধে ভাঁই, বেঁধে...

প্রাইভেট বাস, যেখানে সেখানে থামে। এটাও থামল। তৃণা ভর্তি বাসটায় একটু কষ্ট করে উঠে পড়ে।

দেবাশিস যে উন্নতি করেছে তা এমনি নয়। কতগুলো অদ্ভুত গুণ আছে তার। একটা হল ধৈর্য। তৃণা বাস থেকে নামতে নামতেই দেখল, বাসস্টপে দেবাশিসের গাড়ি থেমে আছে। আর সামনের জানালা দিয়ে অবিরল সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে।

ক্লান্ত তৃণা হাতের তেলোয় চেপে চুল ঠিক করতে করতে এগিয়ে গেল। খুব ফ্যাকাশে একটু হাসল।

দেবাশিস কিন্তু গম্ভীর। দরজাটা খুলে দিয়ে বলল—উঠে পড়ো। তৃণা ঝুপ করে সিটে বসে বলল—অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ। আজ আমার বড় দেরি হয়ে গেল।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলল—ঠিক উল্টো।

—মানে?

—দেরিটা আমারই হয়েছে। তুমি আসার দু'মিনিট আগে আমি এলাম। মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, তুমি এসে ফিরে গেছ। আমিও চলে যাব যাব করছিলাম, হঠাৎ দেখি তুমি বাস থেকে নামলে। তোমার দেরি হল কেন?

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে চোখ বুজে বলে—ঠিক বেরোবার মুখেই কতগুলো ইনসিডেন্ট হয়ে গেল। রেবির ঘরে গিয়েছিলাম, ও ছিল না। হঠাৎ এসে বিশ্রী ব্যবহার করল। আর শচীনবাবুর সঙ্গেও একটু কথা কাটাকাটি, সেই থেকে মনটা এমন বিচ্ছিরি, আর অন্যমনস্ক, রাস্তা ভুল করে অনেকদূর চলে

গিয়েছিলাম। তোমার দেরি হল কেন?

দেবাশিস গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—তোমার সঙ্গে মিল আছে। ফুলির বাসায় রবিকে পৌঁছে দিয়ে বেরোবার সময়ে দেখি দোতলার রেলিং ধরে রবি...উঃ। মনশ্চক্ষে দৃশ্যটা দেখে একবার শিউরে ওঠে দেবাশিস। তারপর আস্তে করে বলে—রবিকে ফুলি কেড়ে রাখতে চাইছে। রবিও আর আমার সঙ্গ তেমন পছন্দ করে না।

তৃণা চুপ করে থাকে। একটা গভীর শ্বাস চাপতে গিয়ে বুকের ভিতরটা কুয়োর মতো গভীর গর্ত হয়ে যায়। অনেকক্ষণ বাদে সে বলল—কী ঠিক করলে, রবিকে ওখানেই রাখবে?

—রাখতে চাইনি। তবু রয়েই গেল বোধ হয়। ওকে রেখে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ভীষণ অন্যমনস্ক ছিলাম। দুটো ট্র্যাফিক সিগন্যাল ভায়োলেট করেছি, পুলিশ নাম্বার নিয়েছে। পার্ক সার্কাসে একটা বুড়ো লোককে ধাক্কাও দিয়েছি, তবে সে মরেনি। কিছুক্ষণ ওইরকম র‍্যাশ ড্রাইভ করে দেখলাম, আর গাড়ি চালানো উচিত হবে না। আস্তে আস্তে গাড়িটা নিয়ে অফিসে গেলাম। বন্ধ অফিস খুলে অনেকক্ষণ ফাঁকা ঘরে বসে রইলাম। ঠিক নরমাল ছিলাম না। সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছিল। রবি কেন আমাকে আর তেমন পছন্দ করছে না বলো তো। আমি তো ওকে সব দিই। তবু কেন? বুঝলে তৃণা, আজ ফাঁকা অফিস ঘরে বসে আমার মতো কেজো মানুষেরও চোখে জল এল।

—আস্তে চালাও, তুমি বড় অন্যমনস্ক। গাড়ি টাল খাচ্ছে।

দেবাশিস সামলে গেল। গাড়ি চালাতে চালাতে বলে—অফিসে বসেই একটা ডিসিসন নিলাম। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে গেলাম ফুলির বাড়িতে। তখন গাড়ি চালানোর মতো মনের অবস্থা নয়। গিয়ে বললাম—ফুলি, আজ থেকেই রবি তোর কাছে থাকল। ফুলির সে কী আনন্দ! ওই মোটা শরীর নিয়েও লাফ ঝাঁপ দৌড়োদৌড়ি লাগিয়ে দিল। রবি ঘুমোচ্ছিল, আমি আর ওকে ডাকিনি। ঘুমন্ত কপালে একটা চুমু রেখে চলে এসেছি। ছেলেটা বুঝি পর হয়ে গেল। যাকগে।

তৃণা কাঁদছিল। নীরবে, একটু ফোঁপানির শব্দ হচ্ছিল কেবল। দেবাশিস হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বলল—কেঁদো না। সব কিছু কি একসঙ্গে পাওয়া যায়?

তৃণা মুখ না তুলে কান্নায় যতিচিহ্ন দিয়ে দিয়ে বলে—আমিও চলে এসেছি। চিরকালের মতো, আর ফিরব না।

দেবাশিস একটু গম্ভীর হল। শান্ত গলায় বলে—ভালই করেছ। শচীন কিছু বলল না?

—অনেক কথা বলল। তত্ত্বকথা। আমাকে সাহসের সঙ্গে তোমার কাছে চলে আসতে উপদেশ দিল।

দেবাশিস একটু ভ্রূ কুঁচকে বিষয়টা ভেবে দেখে। তারপর বলে—শচীন ভেবেছে ও আমাকে চান্স দিচ্ছে। আই অ্যাম রেডি ফর দি ক্যাচ তৃণা। শচীন ইজ আউট।

তৃণা ঝুঁকে বসে কাঁদতে লাগল।

দেবাশিস কাঁদতে দিল তৃণাকে। একবার কেবল বলল—তোমার খিদে পায়নি তৃণা? আমার কিন্তু পেয়েছে।

তৃণা সে কথার উত্তর দিল না। কেবল নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

কান্নাটা বড়ই বিরক্তিকর। একটা মেয়ে সামনের সিটে উপুড় হয়ে বসে কাঁদছে—এ একটা সিন। গাড়ির কাচ দিয়ে বাইরে থেকেই দেখা যায়। অনেকে দেখছেও। দেবাশিস একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। বাড়িতে আজ রান্না হয়নি। ইচ্ছে ছিল রেস্টুরেন্টে খেয়ে নেবে। কিন্তু তৃণার এই বেসামাল অবস্থায় রেস্টুরেন্টে যাওয়া সম্ভব নয়। বাড়িতেই যেতে হয়। আজ সকাল পর্যন্ত কী তীব্র পিপাসা ছিল তৃণার জন্য। এখনও কি নেই? কিন্তু কেবলই রবির কথা মনে পড়ছে, রবিকে ফুলির কাছে রেখে এল দেবাশিস। বদলে কি তৃণাকে পেল চিরকালের মতো? দুজনকে দুদিকের পাল্লায় বসিয়ে দেখবে নাকি কোনদিকটা ভারী?

কিছুতেই কিন্তু ভাবা যাচ্ছে না যে তৃণা চলে এসেছে চিরকালের মতো। হাতের নাগালে বসে আছে। একই ফ্ল্যাটে এরপর থেকে তারা থাকবে। দেবাশিস ভেবেছিল, এ এক অসম্ভব প্রেম। দুটো নৌকো, স্রোত...আরও কী কী যেন।

তৃণা বাথরুমে স্নান করছে। দেবাশিস বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করে। বিকেল চারটে বাজে

মোটে। প্রীতম একবার চা দিয়ে গেছে। তারপর দোকানে গেছে খাবার আনতে। তৃণা এলে তারা খাবে।

দেবাশিস সিগারেট ধরিয়ে তার ফ্ল্যাটের বিশাল জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়। বহু নীচে ফুটপাথ। এই সেই খুনি জানলা। অত নীচে কী করে, কোন সাহসে লাফিয়ে পড়েছিল চন্দনা? হাত পা হঠাৎ নিশপিশিয়ে ওঠে তার।

ভাল করে পর্দা সরিয়ে পাল্লা খুলে ঝুঁকে দেখল দেবাশিস। ঝিম ঝিম করে ওঠে মাথা। অবলম্বনহীন শূন্যতা তাকে দু হাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করে, এসো এসো। সাততলার ওপর সারাদিন, সব ঋতুতেই প্রচণ্ড হাওয়া খেলা করে, কী বাতাস? মার মার করে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা, বুক জুড়োনো বাতাস। তবু অত হাওয়াতেও দেবাশিসের মুখে ঘাম ফুটে ওঠে। কত নীচে ফুটপাথ। কী তীব্র আকর্ষণ অধঃপাতের। সবসময়েই, অবিরল পৃথিবী তার বুকের কাছে সবাইকে টানছে। যখন জানলার চৌকাঠের অবলম্বন জীবনে শেষবারের মতো ছেড়ে দিয়েছিল চন্দনা, ফুটপাথ স্পর্শ করবার আগে এই যে অবলম্বনহীন দীর্ঘ শূন্যতা বেয়ে নেমে গিয়েছিল তার শরীর, এই শূন্যতাটুকু কীভাবে অতিক্রম করেছিল ও? বাঁচতে ইচ্ছে করেনি ফের? কারও কথা মনে পড়েনি? কেঁদেছিল? এই পথটুকু, এই শূন্যতাটুকুতে চন্দনা কি চন্দনা ছিল? খুব জানতে ইচ্ছে করে। দেবাশিস কোমর পর্যন্ত শরীরের ওপরের অংশ ঝুলিয়ে দিল জানলার বাইরে। চেয়ে রইল নীচের দিকে। পোকার মতো মানুষ হাঁটছে, গাড়ি যাচ্ছে, একটা-দুটো গাছ, কালো মিশমিশে রাস্তা। কী ভয়ংকর! মুখের সিগারেটটা বাতাসে পুড়ে গেল দ্রুত। শেষ অংশটা ছুড়ে দিল দেবাশিস। বাতাসে খানিকটা ভেসে গেল, তারপর অনেক অনেকক্ষণ ধরে পড়তে লাগল নীচে...নীচে...নীচে...।

বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ। তৃণা বেরিয়ে এল।

দেবাশিস শরীরটা তুলে আনল ভিতরে। বাতাস লেগে চোখে জল এসে গেছে।

তৃণার কান্না আর বিষণ্ণতা স্নানের পর ধুয়ে গেছে। কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। শোওয়ার ঘরে দুটো একা খাট, বিছানা পাতা। তার পাশে একটা পর্দা-ঘেরা সাজবার ঘর। জানলার পাশেই লম্বা আয়না-লাগানো সাজবার টেবিল। তৃণা সেখানে গিয়ে বসল। চন্দনা এখানে বসে সাজত।

তৃণা নিজেকে আয়নায় দেখল। কিছু তেমন দেখবার নেই। একটু সামান্য সাজগোজ করল। চুলটা ফেরাল। কোনওদিনই সে খুব একটা সাজে না।

আয়নায় দেবাশিসের ছায়া পড়ল। পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে একটু হাসি। চুলগুলো খুব এলোমেলো।

বলল—কেমন লাগছে তৃণা?

তৃণা বিষণ্ণ হেসে বলল—ভালই।

—আজ থেকে...বলে চুপ করে দেবাশিস। কী বলবে?

তৃণা কথাটা পূরণ করে নিল মনে মনে। লজ্জায় মাথা নোয়াল। বলল—তুমি যাও দেব। স্নান করে এসো।

দেবাশিস আঙুলে ধরা সিগারেটটা তুলে দেখাল, বলল—যাচ্ছি। সিগারেটটা শেষ করে নিই।

—অন্তত ও ঘরে যাও। পুরুষের সামনে আমি সাজতে পারি না।

—ও। বলে দেবাশিস পর্দার ওপারে গেল। ওখান থেকেই বলল—শোনো তৃণা, তোমার যা যা দরকার প্রীতমকে দিয়ে আনিয়ে নাও। আজ রোববার, দোকান অবশ্য সবই বন্ধ।

—কী আনাব? আমার কিছু দরকার নেই।

—এক কাপড়ে তো বেরিয়ে এসেছ।

—চন্দনার শাড়ি টাড়ি কিছু নেই?

—না। সব বিলিয়ে দিয়েছি।

—কেন দিলে?

—রবির জন্য। ও সব থাকলেই তো ওর মায়ের কথা মনে পড়ত।

তৃণা বেশ ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একথায় বুকে একটা ধাক্কা খেল। তবু হেসে বলে—তবু কি মনে পড়ে না?

—পড়ে। সেটা চেপে রাখে। আমার ফ্ল্যাটটা কিন্তু আমি সাজাইনি, চন্দনা সাজিয়েছিল। সেইভাবেই সব আছে। এক একবার ভাবতাম সাজানোর প্যাটার্ন পাল্টে দিই। কিন্তু সময় পাইনি, এত কাজ। সেই সাজানো ঘরে চন্দনার কথা ওর মনে তো পড়বেই। এবার তুমি সাজাও।

—দূর বোকা। মনে পড়া কি ওভাবে হয়! তুমি জানো না।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলল—আর রবির জন্য আমার ভাবনা নেই। ফুল্গির বাড়ির দঙ্গলে মিশে গেলে আর কিছু ওর মনে থাকবে না।

—সিগারেটটা শেষ হয়েছে?

—হয়েছে।

—এবার যাও। আমার এখন খুব খিদে পাচ্ছে।

—তোমার কী কী দরকার বললে না?

—অনেক কিছুই দরকার। কিছু তো আনিনি। সে পরে হলেও চলবে।

—লজ্জা কোরো না। এ তো আর পরের বাড়ি নয়। তোমার নিজের।

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে বলল—তাই বুঝি?

—নয়?

তৃণা একটু হেসে বলে—এত সহজে কি নিজের হয়? অনেক সময় লাগবে। আমাকে একটু সময় দিয়ো, তাড়া দিয়ো না।

দেবাশিস একটু উম্মাভরে পরদার ওপাশ থেকে বলে—কেন? সময় লাগবে কেন?

—লাগবে না! গাছ উপড়ে দেখো তার শিকড়ের সবটা কি একবারে উঠে আসে? কত শিকড় বাকড়ের ছেঁড়া সুতো কিছু কিছু মাটির মধ্যে থেকে যায়।

—তৃণা—

—উঁ।

—গাছ তো একটানে ওপড়ানো হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে তার শিকড়ের মাটি ক্ষয় হয়ে ছিল না কি!

—আবার বলছি, তুমি বোকা।

—কেন?

—উপমা দিয়ে কি সব বোঝানো যায়? গাছের সঙ্গে মানুষের কিছু তফাত আছেই।

পরদা সরিয়ে উত্তেজিত দেবাশিস ও ঘরে চলে এল হঠাৎ। মেঝেতে তৃণার কাছে বসে উর্ধ্বমুখ হয়ে বলল—তৃণা, আমি বড় কাঙাল।

—জানি তো।

—আজ আমার কেউ নেই।

তৃণা তাকিয়ে রইল।

দেবাশিস বলল—আর আমাকে এখন ও সব ভয়ের কথা বোলো না। তোমারও যদি ছেঁড়া শেকড় অন্য জায়গায় থেকে থাকে তবে আমার কী হবে? আজ থেকে রবিও পর হয়ে গেল।

তৃণা স্নিগ্ধস্বরে বলল—রবির জন্য তোমার বুকের ভিতরটা কেমন করে দেব, তা বোঝো না!

—ভীষণ বুঝি।

—ওটুকু কি আমার হতে নেই?

দেবাশিস চুপ করে গেল। জোব্বা জামার পকেট থেকে ফের সিগারেটের প্যাকেট বের করে আনল। ধরাল। তারপর মাথা নেড়ে বলল—বুঝেছি।

তৃণা তেমনি স্নিগ্ধস্বরে বলল—আমরা তো আর ঠিক সকলের মতো হতে পারি না।

দেবাশিস বলল—তাও ঠিক। তবে আমরা কী রকম হব তৃণা।

—খুব সুখী হব না, একটু কী যেন থেকে যাবে দুজনের মধ্যে।

—তুমি কী ভীষণ স্পষ্ট কথা বলছ আজ তৃণা।

—আজই বলে নেওয়া ভাল।

—কেন? আজই কেন?

তৃণা চোখ মুছে হাসিমুখে বলে—আজ সপ্তাহের ছুটির দিন। তোমার সময় আছে। কাল থেকে তো তুমি আবার ব্যস্ত মানুষ। তোমার কি আর সময় হবে?

—তুমি কথাটা ঘোরালে তৃণা।

—তুমি বাথরুমে যাও। আমার খিদে পেয়েছে!

দেবাশিস তবু বসে রইল। চুপচাপ। অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুলে বলে—তৃণা।

—বলো।

—মানুষকে তার সব সম্পর্ক থেকে ছিঁড়ে আনা যায় না। একজনকে ভাল না বাসলেই যে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল এমন নয়। আবার কাউকে ভালবাসলেই যে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠল এও নয়। তবে ভালবাসা দিয়ে আমার কী করব?

তৃণা কপালটা টিপে ধরে বলল—ও, আবার সেই তত্ত্বকথা! জানো না মেয়েরা তত্ত্বকথা ভালবাসে না! মাথা ধরেছে, তুমি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে প্রীতম। বড় রেস্টুরেন্টের দামি সব খাবার। প্রীতমের মুখে খুব একটা হাসি নেই। কেবল বিনয় আছে।

দেবাশিস যখন খাওয়ার টেবিলের ধারে এসে বসল তখনও তৃণা নিজের কপাল টিপে আছে, বলল—তোমার চাকরকে পাঠিয়ে একটু মাথা ধরার বড়ি আনিয়ে দাও।

দেবাশিস মৃদুস্বরে বলে—ও তোমার চাকর। অবশ্য পাঠানোর দরকার নেই। মাথাধরার বড়িটড়ি আছে বোধ হয়। খুঁজতে হবে।

—খিদে চেপে রাখলে, বা কাঁদলে আমার মাথা ধরে।

দেবাশিস চোখ তুলে ইঙ্গিতে প্রীতমকে সরিয়ে দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে তৃণার একখানা হাত ধরে বলল—তুমি প্রস্তুত হয়ে আসোনি জানি। হুট করে চলে এসেছ। তাই কাঁদছ। কিন্তু আমি মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম তোমার জন্য।

তৃণা হেসে বলল—খুব প্রস্তুত! একখানা শাড়িও যদি কিনে রাখতে। কাল আমাকে বাসি কাপড়ে সকালবেলাটা কাটাতে হবে, যতক্ষণ শাড়ি কেনা না হয়।

—একটা দিন সময় দাও! প্লিজ। কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ দোকান বন্ধ।

তৃণা মাথা নেড়ে বলল—সময়! সময়! দাঁড়াও, সময় নিয়ে কী একটা কবিতার লাইন মনে আসছে—

এল না। মাথাটা ফেটে যাচ্ছে যন্ত্রণায়!

দেবাশিস বলে—খেয়ে একটু রেস্ট নাও। শোওয়ার ঘরের পরদাগুলো টেনে দিচ্ছি, ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকো একটু।

—তুমি কোথায় যাবে?

—কোথাও না। তোমার কাছেই বসে থাকব। বক বক করব।

তৃণা সস্নেহে হাসল।

পাঁচটা প্রায় বাজে। সাততলা ফ্ল্যাটের শার্সির গায়ে অত্যন্ত উজ্জ্বল সোনালি রোদ এসে পড়েছে। এখনও অনেক বেলা আছে। অন্ধকার হতে এখনও অনেক বাকি। পরদায় ঢাকা শোওয়ার ঘরে শুয়ে আছে তৃণা। গায়ে খয়েরি পরদার আলোর আভা। দুটো বড়ি খাওয়ার পর আস্তে আস্তে মাথাধরাটা সেরে যাচ্ছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। তবু কি ঘুম আসে! দেবাশিস অনেকক্ষণ মাথাটা টিপে দিল। ঝিম মেরে শুয়ে ছিল তৃণা, ঘুমের ভান করে। সে ঘুমিয়েছে মনে করে দেবাশিস উঠে গেছে পা টিপে টিপে।

ঘরটা ঠিক অন্ধকার হয়নি। আবার আলোও নেই। সাততলার ওপর খুবই নিরাপদ আশ্রয়। একা শুয়ে আছে তৃণা। মাথা ধরা সেরে গেছে। নরম বিছানায় এলিয়ে আছে ক্লান্ত শরীর। এ একরকমের আলস্য। সুন্দর আলসেমি। কিন্তু ঘুম হবে না। আরও কতকাল ঘুম হবে না তৃণার।

সে চোখ চেয়ে দেখল ছাদের মসৃণ রং, চৌকো দেয়াল। দেয়ালে রহস্যময় আলো। চেয়ে থাকতেই সেই সুড়সুড়ির মতো একটা অনুভব। কে যেন দেখছে। খুব নিবিষ্টভাবে দেখছে তাকে।

চমকে উঠল তৃণা। মাথাটা একবার তুলে চারদিকে তাকাল। আবার মাথাটা বালিশে রেখে চোখ বোজে। কিন্তু অবিরল তার ওই অনুভূতি হয়, কে যেন দেখছে। ভীষণ দেখছে। চন্দনার ভূত? নাকি তার মনেরই প্রক্ষেপ? সে নিজেই হয়তো। ভাবতে ভাবতে মুখটা আস্তে ফেরাল তৃণা। চোখটা আপনা থেকেই খুলে গেল। আর ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠে বসে সে—কে? কে?

খাওয়ার ঘরের দিকটার দরজার পরদার ওপাশে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে পরদাটা আস্তে সরিয়ে মুখ বাড়াল ভিতরে। ভার গলায় বলে—আমি, প্রীতম।

তৃণা অবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ে থেকে বলে—কী চাও?

চাকরটা একটু ভয়ের হাসি হেসে বলে—সাহেব বলে গেলেন আপনি ঘুম থেকে উঠলে খবর দিতে, উনি একটু কোথায় বেরোলেন। এক্ষুনি আসবেন।

—কোথায় গেছেন?

—বলে যাননি। গাড়ি নিয়ে গেলেন দেখেছি।

—ও।

তৃণার বুকের ভিতরটা এখনও ঠক ঠক করছে। শ্লথ আঁচল টেনে নিয়ে সে উঠল। বলল—দাঁড়াও। তোমাদের ঘরটরগুলো আমাকে একটু দেখিয়ে দাও। চিনে রাখি।

চাকরটা উত্তর করল না, খুশিও হয়নি। তবু এক রকম বিরক্তি বা ঘেন্না চেপে-রাখা মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। ও হয়তো ভাবছে, সাহেব রাস্তার মেয়েছেলে ধরে এনেছে, রাখবে। দেবাশিস তো ওকে বলেনি যে তৃণা আসলে কে! বললেও বুঝবে না। এমন অবস্থায় দুটি মানুষের ভিতরকার প্রেমের সত্য কে কবে বুঝেছে! সবাই একটা কিছু ধরে নেয়।

শোওয়ার ঘর দুটো। একটা খাওয়ার ঘর। একটা বসবার। অনেকটা জায়গা নিয়ে খোলামেলা ফ্ল্যাট। দ্বিতীয় শোওয়ার ঘরটা রবির। সেখানে অনেক খেলনা, ট্রাইসাইকেল, ছবির বই, ছোট্ট ওয়ার্ডরোব। এই ঘরটায় একটু বেশিক্ষণ থাকল তৃণা। চাকরটাকে বলল—এককাপ কফি করে আনো।

ফোনটা বাজছে বসবার ঘরে। বাজছেই। চাকরটা রান্নাঘরে। ওখান থেকে শুনতে পাবে না। তৃণা ইতস্তত করছিল, ফোন কি সে ধরবে? পরমুহূর্তেই ভাবল অমূলক ভয়। এ বাড়িতে যদি তাকে থাকতেই হয় তবে এ সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলাই উচিত। সে উঠে এল বসবার ঘরে। ফোন হাতে নিয়ে অলস গলায় বলে—হ্যালো।

একটা কচি গলা শোনা গেল—বাপি?...ওঃ...থেমে গেল স্বরটা। তারপর নম্বরটা বলে জিজ্ঞেস করল—এটা কি ওই নম্বর?

তৃণা বুঝে নিল, রবি। ফোনের গায়ে লেখা নম্বরটা তৃণারও তো মুখস্থ। বলল—কে বলছ?

—তুমি কে? বলে কচি গলাটা অপেক্ষা করল। হঠাৎ ভয়ার্ত গলায় বলল—মা?

তৃণা এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। ফোনটা কানে চেপে দাঁড়িয়ে রইল। রবি ফোন করছে। যদি তৃণা রং নাম্বার বলে ফোন ছেড়ে দেয় তো রবি আবার ফোন করবে, শুধু আজ নয়, কালও করবে। হয়তো প্রায়ই বাবার সঙ্গে দরকার পড়বে তার, তৃণা কোথায় পালাবে? পালাবেই বা কেন? তবু প্রথম ধাক্কাটা সামলানোর জন্য একটু সময় দরকার। সে চোখ বুজে বলল—রং নাম্বার।

ফোন রেখে দিল। ভেবে পেল না, রবি কেন মা কিনা জিজ্ঞেস করল।

প্রীতম কফি করে এনেছে। সেই সময়েই ফোনটা আবার বাজে। প্রীতম তার দিকে তাকায়। তৃণা ঘাড় হেলিয়ে বলে—রবি ফোন করছে। ওকে আমার কথা-বোলো না।

প্রীতম ফোন তুলে নিয়ে বলে—হ্যালো। রবিবাবু?

—...

—না তো। ফোন বাজেনি।

—...

—সাহেব বাইরে গেছেন।

—...

—না আমি একা। তুমি আর আসবে না?

—...

— চাঁপাদি আসবে না? আচ্ছা বলে দেব। তোমার সব জিনিস কাল পাঠিয়ে দেব।

...

—আচ্ছা তুমি আসবে না কেন?

...

—এলে বলব। ছাড়ছি।

ফোন রেখে প্রীতম একবার আড়চোখে তৃণার দিকে চেয়ে বাইরে চলে গেল।

সাড়ে পাঁচটা। দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

তৃণা ভেবেছিল দেবাশিস এসেছে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলেই অপ্রস্তুত। দেবাশিস নয়। টেরিলিন পরা দিব্যি ঝকমকে একজন যুবা পুরুষ। সেও একটু অপ্রস্তুত। বলল—দেবাশিস নেই?

—না। বেরিয়েছে।

—ও। বলে খুব কৌতূহলভরে চেয়ে দেখল তৃণাকে।

তৃণা কি ওকে বসতে বলবে?

লোকটা নিজেই বলে—রবি নেই?

—না।

লোকটার চোখে স্পষ্টই একটা প্রশ্ন—আপনি কে? কিন্তু লোকটা সে প্রশ্ন করে না, ভদ্রতায় বাধে। তাই বলল—আমি রবির মামা।

—ও? আসুন।

—বসে আর কী হবে। কেউ নেই যখন। বলতে বলতেও যুবকটি কিন্তু ঘরে আসে। একটু ইতস্তত করে বসে। একটা শ্বাস ফেলে হাতে হাত ঘসে বলে—আপনি ওর রিলেটিভ বোধ হয়।

তৃণা মৃদু হেসে বলে—হ্যাঁ।

—চন্দনা আমার দিদি ছিল।

তৃণা তার এলো চুলের জট আঙুলে ছাড়াতে ছাড়াতে বলে—বুঝেছি, বুঝেছি। বসুন, ও এসে পড়বে।

যুবকটি ঘড়ি দেখে বলে—একটু বসতে পারি। আমি ভাবলাম—বলে একটু কথা সাজিয়ে নিয়ে বলে—আসলে কাল আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। বলছিলাম কী দেবাশিসদা তো যাবেনই, সেইসঙ্গে আপনিও... যদিও ঠিক আচমকা এভাবে—

তৃণার ছেলেটির জন্য মায়া হয়। বুঝতে পারছে না, বুঝতে চাইছে। বলল—কফি খান। ও এসে পড়বে।

ছেলেটি প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে তাকে দেখতে থাকে। চোখে চোখ পড়তেই সরিয়ে নেয়। কিন্তু দেখে। তৃণা কফি বানাতে বলবার ছল করে উঠে এল। রান্নাঘরে প্রীতমকে খবর দিয়ে শোওয়ার ঘরে গিয়ে বসে রইল চুপচাপ। শুনল, ওঘরে প্রীতমের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা। চাপা স্বর। এরকমই হবে এর পর থেকে। তৃণার জায়গাটা স্থির হতে অনেক সময় লাগবে। অনেক সময়। তৃণা শুষ্কমুখে বসে থাকে। চুলের জট ছাড়ায় অন্যমনে।

দেবাশিসের ফিরতে ছ'টা বেজে গেল। তখনও ছেলেটা বসে আছে সামনের ঘরে। আর দেবাশিসের হাতে কয়েকটা শাড়ির প্যাকেট, রজনীগন্ধার ডাঁটি, কসমেটিক্সের বাক্স, খাবারের বাক্স। চন্দনার ভাই সে সব দেখে অবাক। পর্দার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যটা দেখল তৃণা।

না, দেবাশিস খুব একটা ঘাবড়াল না। চালাক লোকরা এরকম বিপদে পড়লে খুব গম্ভীর হয়ে যায়। দেবাশিসও হল। দু-চারটি কী কথা হল ওদের। ছেলেটা চলে গেল।

দেবাশিস বেশ হাঁক ছেড়ে ডাকল—তৃণা।

তৃণা ঘরের মাঝখানটায় না গিয়ে পরদা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে—কী?

দেবাশিস একগাল হাসি হেসে বলল—সব এনেছি।

—কোত্থেকে?

—তোমাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে হঠাৎ মনে পড়ল যাদবপুরে যখন থাকতাম তখন দেখেছি ওই অঞ্চলে রবিবারে দোকান খোলা থাকে। গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম, দেখো তো সব!

সব দেখে তৃণা হেসে কুটিপাটি। বলল—কী এনেছ এ সব?

—কেন?

—এ রংচঙে শাড়ি আমি পরি নাকি?

—পরো না?

—এসব তো রেবা পরে। আর অত কসমেটিক্স! হায় রে আমি কবে আবার ও সব আলট্রা মডার্ন লিপস্টিক মাখি, কিংবা কাজল!

দেবাশিস হেসে বলে—এবার মেখো। বুড়ি সাজা তোমার কবে ঘুচবে বলো তো!

—মেয়ে বড় হয়েছে দেব, কদিন পরেই প্রেম করবে। এখনই করছে কি না কে জানে!

দেবাশিস হেসে বলে—বাঙালি মেয়েদের ওই হচ্ছে রোগ। তুমি সাজবে না কেন তৃণা?

তৃণা শুধু হাসল। স্নিগ্ধ হাসি। বলল—রবি ফোন করেছিল।

দেবাশিসের মুখের হাসিটা মরে গেল, বলল—কী বলল?

—আমি ধরেছিলাম। রং নাম্বার বলে ছেড়ে দিয়েছি। পরে আবার ফোন করেছিল, তখন প্রীতম ধরে।

দেবাশিস একটু ভেবে বলল—থাকগে।

উঠে পোশাক পাল্টে এল দেবাশিস। চা খেল ফের।

ডাকল—তৃণা।

—উঁ।

—কীভাবে শুরু করা যায় বলো তো।

—কী? কীসের কথা বলছ?

—বুঝতে পারছ না?

—না তো।

—তোমার আর আমার এই জীবনটা।

—শুরু আবার করবে কীভাবে?

—ধরো, বিয়ে হলে পুরুতের মন্ত্র, ফুলশয্যা-টয্যা দিয়ে একটা শুরু করা যায়। রেজিস্ট্রি করলে তারও সরকারি মন্ত্র আছে। আমরা কী দিয়ে শুরু করব?

তৃণা লজ্জা পেয়ে বলে—ও সব বোলো না। কানে লাগে। আমরা কিছু শুরু করলাম, নাকি শেষ করে এলাম?

—তোমার কি তাই মনে হয়? তার উত্তরে বলা যায় যে একটা শেষ না করলে অন্যটা শুরু করা যায় না তৃণা।

—ফের তত্ত্বকথা।

—তুমি যে শুরুটাকে শেষ বলছ!

—শোনো দেব, আমি কিছু শেষ করে আসিনি। শুরুর কথাও ভাবিনি। আমি বাড়িতে ভূতের তাড়া খেয়ে বেরিয়ে এসেছি। আমি কী করছি আমি নিজেও জানি না। মাথার ভিতরটায় বড় গণ্ডগোল। আজ আমি কিছু ভাবতে পারছি না। শুধু একটা জিনিস জানি।

—কী তৃণা? আগ্রহে দেবাশিস ঝুঁকে বসে।

—তোমাকে আমার ভীষণ দরকার এ সময়ে। আর কিছু না।

—তৃণা, তবে আমরা সেই আদিমভাবে শুরু করব। যখন কোনও অনুষ্ঠান ছিল না, কেবল শরীর ছিল।

—ছিঃ! ওভাবে বোলো না।

দেবাশিস হেলান দিয়ে বসে বলে—ছেলেবেলায় আমি ছিলাম বদমাশ। মেয়েদের হাতে চিঠি গুঁজে দিতাম। বসন্তবাবুর বাড়ির ছাদে প্রত্যেকদিন ঘুড়ি গোঁত্তা মেরে নামিয়ে দিতাম তাতে লেখা থাকত আই

লাভ ইউ। বসন্তবাবুর মেয়ে রানিকে উদ্দেশ করে। তখন শুরু করার কোনও প্রবলেম ছিল না। ভাবতে শিখিনি, রচনা করতে শিখিনি, সাজাতে শিখিনি, ওই ভাবেই শুরু করতাম। চন্দনার সঙ্গেও হুট করে শুরু। প্রথমে শরীর, তারপর ভালবাসার চেষ্টা, যেন ফ্রাস্টেশন অ্যান্ড দি এন্ড, তোমাকে নিয়ে তো সেভাবে শুরু করা যায় না। আজ আমার মস্ত প্রবলেম।

—আজকের দিনটা অত ভেবো না। মাথা ঠাণ্ডা করো।

দেবাশিস শ্বাস ছেড়ে বলে—আজকের দিনটা অদ্ভুত। বুঝলে? আজ রবিকে পার্মানেন্টলি ওর পিসির বাড়িতে দিয়ে এলাম। আর তারপরই শুনলাম তুমি চলে আসছ। শচীন কিছু বলল না?

—কী বলবে?

—অধিকার ছেড়ে দিল এক কথায়? তুমিই বা কী বলে এলে?

তৃণা ভ্রূ কুঁচকে বলে— কী বলব? আমি কিছু বলে আসিনি।

দেবাশিস চমকে উঠে বলে—বলে আসোনি?

—না। আমি প্রায়ই যেমন বেরোই তেমনি বেরিয়ে এসেছি।

—আমার কাছে এসেছ সে কথা কেউ জানে না?

—না।

—কাউকে বলোনি?

—না।

—বোকা।

—কেন?

—তুমি না ফিরলে ওরা তো থানা পুলিশ করবে। হাসপাতালে খোঁজ নেবে।

—নেবে! বলছ?

—নেবে না?

—আমার তো মনে হয় না। ওরা কি জানে যে আমি আছি?

—তুমি বোকা তৃণা। বলে আসলেই হয়। শচীনবাবু কি তোমাকে কামড়াত?

—তা নয়। ওরা আমাকে নিয়ে বহুকাল ভাবে না। আজ একটু ভাবুক।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলে—তা হয় না।

বলেই উঠে গেল দেবাশিস। ডায়াল করতে লাগল। তৃণা ওর কাছে গিয়ে বলল—ফোন কোরো না। কিছুক্ষণের জন্য আমাকে নিরুদ্দেশ থাকতে দাও। ওরা ভাবুক।

—তা হয় না। মাথা নাড়ল দেবাশিস। ফোন কানে তুলে শুনে বলল—এনগেজড।

তৃণা একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলল।

দেবাশিস ঘুরে বলল—আমি যা করব তা পাকাপাকি। কোনও অনিশ্চয়তা থাকবে না, দ্বিধা থাকবে না।

সাত

পৌনে সাতটা বাজেনি এখনও। বাজছে প্রায়। সাততলার ঘরের শার্সি দিয়ে দেখা যায়, কলকাতার ওপরকার আকাশটা মস্ত বড়। আকাশে তারা ফুটছে। শহরটা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, আলোয় আলোয় তিলোত্তমা।

বসবার ঘরটা অন্ধকার। কিংবা ঠিক অন্ধকার নয়। একটা রঙিন কাচের ঢাকনার ভিতরে শূন্য শক্তির আলো জ্বলছে। জানলার পর্দা সরানো। বাইরে চাঁদ। ঘরের ভিতরে জ্যোৎস্নার চৌকো চাঁপা রঙের আলো পড়ে আছে। আর ঝড়ের মতো বাতাস।

দেবাশিস একা ভূতের মতো বসে আছে। তার পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। সামনে দুটো ঠ্যাং ছড়ানো, সোফার কাঁধে হেলানো মাথা। ছাদের দিকে মুখ। দুটো হাত অসহায়ভাবে দুদিকে পড়ে আছে। সে তৃণার কথা ভাবছে। জলস্রোত উল্টোপাল্টা, পালে পাগলা বাতাস, তবু বিপরীতগামী দুটি নৌকো

একটা অন্যটার সঙ্গে জুড়ে গেল। বাঃ। বেশ।
তৃণা ওঘরে সাজছে। তারা বেড়াতে যাবে। তৃণা যেতে চায়নি। শরীরটা আজ ভাল নেই। দেবাশিস বলেছে—বেড়ালে মনটা একটু হালকা হয়। তোমার তো শেকড়ের প্রবলেম আছে।
তৃণা বেড়াতে ভালবাসে না। তার প্রিয় অভ্যাস ঘরের কোণে একা থাকা। ছবি আঁকবে, কবিতা লিখবে, বই পড়বে, গান শুনবে। কেউ কথা-টথা বলতে এলে বিরক্ত হয়। রোগে ভুগে ভুগে ছেলেবেলা থেকে ওর ওই অভ্যাস হয়ে গেছে।
ফোনটা বাজছে। দেবাশিস হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে নিল।
—হেল্লো।
মহিলাকণ্ঠে কে বলল—দেবাশিস দাশগুপ্ত আছেন?
—বলছি।
—ওঃ। দাদা...
ফুলি। ফুলির গলা টেলিফোনে কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। ভীষণ ভয় খেয়ে গেল দেবাশিস। শরীরটা ঝিম ঝিম করে উঠল বিদ্যুৎ স্পর্শে। রবির কোনও কিছু হয়নি তো।
—ফুলি। কী হয়েছে?
—তুমি ফিরেছ। বাঁচা গেল। রবি সেই থেকে বাবা-বাবা করছে। দুবার ফোন করেছিল।
—কী হয়েছে?
—কিছু না। কী হবে? অত ভেবো না তো। রবি আছে আমার কাছে আর আমি অনেক ছেলেপুলের মা।
দেবাশিস বিরক্ত হয়ে বলে—কী ব্যাপার বলবি তো!
—রবি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বলছে বাবা কেন দেরি করছে ফিরতে।
—মন খারাপ নাকি!
—না না। দস্যিপনা করছে সব সময়ে। বেশ আছে।
—ওকে ফোনটা দে।
একটু পরেই রবির গলা শোনা গেল—বাবা।
—বলো। ভারী স্নিগ্ধ হয়ে গেল দেবাশিসের গলা।
—আমরা বেড়াচ্ছি।
—কোথায়?
—ট্যাক্সি করে বেরিয়েছি। এখন আছি শ্যামবাজারে।
—সঙ্গে কে আছে?
—মণিমা, পিসেমশাই, নিন্‌কু...
—এনজয় ম্যান।
—বাবা, আমার বই, জামা, প্যান্ট খেলনা, সব কবে পাঠাবে?
—কাল প্রীতম দিয়ে আসবে।
—এখান থেকেই স্কুলে যাব তো?
—যেয়ো।
—আর দিদি আমার কাছেই থাকবে তো বাবা? দিদি গল্প না বললে আমার খাওয়া হয় না। মণিমা বলেছে, চাঁপা থাকুক।
—থাকুক।
—তুমি রাগ করোনি তো বাবা?
—রাগ? না রাগ করব কেন?
—আমি যে মণিমার কাছে চলে এলাম!
—তা বলে রাগ করব কেন?
—তুমি যে আমাকে ছাড়া থাকতে পারো না।

দেবাশিস একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—পারি বাবা। পারতে তো হবেই।

—নিনকু বলছিল—তোর বাবা তোকে ছাড়া একা একা ভয় পাবে দেখিস। আমাদের বাড়িতে কি ভূত আছে বাবা?

—ভূত? কে তোমাকে ভূতের কথা শেখাচ্ছে? ভূত-টুত আবার কী?

—থাপি বলছিল।

—কী বলছিল?

রবি বোধ হয় একটু লজ্জা পায়। একটু থেমে বলে—বাবা মানুষ মরে গেলে তো ভূত হয়। তাই—

—তাই কী?

—থাপি বলেছে। আমি না।

—কী বলেছে?

—বলেছে মা মরে গিয়ে নাকি ভূত হয়ে আছে ও বাড়িতে।

—ও সব বাজে কথা রবি। ও সব বিশ্বাস করতে নেই।

—বুড়োদাও বলেছে—ও বাড়িতে আর যাসনে রবি। গেলে তোর মা ঠিক তোর ঘাড় মটকে দেবে। ভূতেরা নাকি যাদের ভালবাসে তাদের মেরে নিজের কাছে নিয়ে যায়।

—ছিঃ রবি। এ সব কথা শিখলে তোমাকে আমি ওখান থেকে নিয়ে আসব।

—দিদিও আমাকে কত ভূতের গল্প বলে।

—আমি চাঁপাকে বারণ করে দেব। ও সব গল্প শুনো না।

—আচ্ছা। কিন্তু বাবা—

—বলো। দেবাশিসের গলাটা গম্ভীর।

—আমি যখন আফটারনুনে ফোন করেছিলাম তখন—

—তখন কী?

—আমার মনে হয়েছিল আমাদের বাড়িতে মা ফোন ধরেছে।

—কী যা তা বলছ?

—না না, ওটা রং নাম্বার ছিল। কিন্তু যে লেডি ফোনটা ধরেছিলেন তার গলা শুনে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল মার ভূত ঠিক ফোন ধরেছে?

—এ রকম ভাবতে নেই। আর ভেবো না।

—বাবা, কাল আমি ইস্কুলে যাব না।

—কেন?

—আমি তো স্কুল-ড্রেস আনিনি, বই খাতাও নয়।

দেবাশিস একটু ভেবে বলল—ঠিক আছে। পরশু থেকে যেয়ো। স্কুলে চিঠি লিখে দেব, বাস এবার ওখানে যাবে।

—কাল তা হলে ছুটি বাবা?

—ছুটি।

—তা হলে কোথায় বেড়াতে যাবে বলো তো।

—কোথায়?

রবি ফোনে হাসল। কী স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি। বলে—মণিমা বলেছে কাল আমরা তোমার ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাব।

দেবাশিস উদ্বিগ্ন হয়ে বলে—এখানে! এখানে কাল এসে কী করবে? আমি তো থাকব না।

—মণিমা বলছে কাল নিজে আমাকে নিয়ে যাবে, আমার সব জিনিস গুছিয়ে আনবে, আর আমাদের ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে দিয়ে আসবে।

—না, না তার দরকার নেই।

—যাব না?

—দরকার কী রবি? আমিই পাঠিয়ে দেব।

—দাঁড়াও তা হলে, মণিমাকে বলি।

ফোনের মাউথপিসে হাতচাপা দিয়ে রবি ফুলির সঙ্গে পরামর্শ করছে দৃশ্যটা স্পষ্টই দেখতে পায় দেবাশিস। খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করে। আর সেটুকু সময়ের মধ্যেই সে ভেবে দেখল তার মহিলা ভাগ্য ভাল নয়। প্রথমবার বিয়ে করেছিল চন্দনাকে। পেটে বাচ্চা সমেত। দ্বিতীয়বার যাকে আনছে তারও বড় বড় ছেলেমেয়ে, স্বামী, সংসার সব থেকে ছিঁড়ে আনতে হবে। কোনওবারই তার সহজ সরল বিয়ে হল না। যেন চুপি চুপি পাপ কাজ সারছে।

রবি বলল—হ্যালো?

—বলো।

—আমরা কাল যাব না।

—আচ্ছা।

—রবিবারে যাব।

দেবাশিস হেসে বলে—রবিবারে আমিই যাব।

—তা হলে?

—তা হলে কি রবি?

—আমি আমাদের ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাব কবে?

—আসবে। বেড়াতে আসবে কেন, এ তো তোমার নিজেরই ফ্ল্যাট। যখন খুশি আসতে পারবে। তবে এ সপ্তাহে নয়।

—কাল তা হলে আমরা ট্যাক্সিতে করে দক্ষিণেশ্বরে যাব।

—যেয়ো।

—ছাড়ছি বাবা। গুডনাইট।

—নাইট।

ফোন রেখে দিল দেবাশিস! ভ্রূ কোঁচকানো মুখটায় চিন্তার লেখা।

অন্ধকার ঘরে, পাশের ঘর থেকে আলো এসে লম্বা হয়ে পড়েছে। সেই আলো পিছনে নিয়ে ছায়ামূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে তৃণা।

দেবাশিস অস্ফুট একটা যন্ত্রণার শব্দ করল। যন্ত্রণাটা কোথায় তা বুঝতে পারছিল না।

বলল—রেডি তৃণা?

—হুঁ। কিন্তু আমার শরীরটা ভাল নেই।

—কী হয়েছে?

—কী করে বলব! আজ বড্ড টায়ার্ড।

—গাড়িতে তো বসেই থাকবে। খোলা হাওয়ায় দেখো, ভাল লাগবে।

—তোমার ফ্ল্যাটে খোলা বাতাসের অভাব নেই।

—না, না। চলো প্লিজ। এই ফ্ল্যাটটায় আমার একদম ভাল লাগে না।

—কেন, বেশ সুন্দর তো?

—কী জানি কেন। বেশিক্ষণ ভাল লাগে না।

তৃণা একটু হাসির শব্দ করে বলে—আমারও কি খারাপ লাগবে দেব?

—না। তোমার লাগবে না। আমার তো কতগুলো রিফ্লেক্স আছে। সবই তো তুমি জানো। দেয়ার আর বিটার মেমোরিজ, লোনলিনেস...সব মিলিয়ে একটা সাফোকেসনের মতো হয় মাঝে মাঝে। রবিটারও হত।

—রবি ফোনে তোমাকে ভূতের কথা কী বলছিল দেব?

—ছেলেমানুষ তো। কে যেন ভয় দেখিয়েছে, ওর মা নাকি ভূত হয়ে আছে এখানে।

তৃণা একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল—যখন দুপুরের পরে ফোন করেছিল তখন রবি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কে? মা?

—তুমি কী বললে?

—কী বলব। মিথ্যে করে বললাম রং নাম্বার।
—ঠিকই করেছ।
—ও কি ভেবেছিল ওর মায়ের ভূত কথা বলছে?
শব্দ করে হাসল দেবাশিস। বলল—হ্যাঁ। আচ্ছা পাগল আমার ছেলেটা।
—শোনো।
—কী?
—আর একটু পরে বেরোও। আমি একটু বসি। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিম করে উঠল।
দেবাশিস এগিয়ে তৃণার হাত ধরে এনে সোফায় বসায় যত্ন করে। নিজে তার পাশে বসে। হাতখানা ধরে থেকে বলে—তোমার নাড়ি বেশ দুর্বল।
তৃণা ঘাড় এলিয়ে রেখে বলল—আজকের দিনটা কেমন যেন ভাল নয়। বিশ্রী দিন।
উদ্বেগে দেবাশিস ঝুঁকে বলে—কেন তৃণা?
দেবাশিসের কাছে আসা মুখখানা হাত তুলে আটকায় তৃণা। বলে—এক একটা দিন আসে সকাল থেকেই কেবল সব কাজ ভুল হতে থাকে। যেন ভূতে পায় মানুষটাকে।
—কীরকম?
—দেখ না, কোনও দিনই তো আজকাল রেবার বা মনুর ঘরে যাই না! আজ যেন ভূতে পেল। গেলাম। রেবা হঠাৎ এসে পড়ল, চোরের মতো ধরা পড়ে গেলাম; কী বিশ্রী রকমের ব্যবহার যে করল ও!
—তুমি রেবাকে বড্ড ভালবাসো তৃণা।
—ভীষণ ভালবাসি। সেইজন্যই তো ও আমার বুক ভেঙে দেয়।
—সাতটা কিন্তু বেজে গেছে তৃণা।
—দাঁড়াও না। আজ কি একটা সাধারণ দিন! সকাল থেকেই সব অনিয়ম চলছে। অদ্ভুত দিনটি আজ। ঘড়ি-টড়ি দেখো না।
—দেখব না। বলো।
— তারপর মনু। ওকে বলেছিলাম, ঘরে পৌঁছে দে, শরীরটা ভাল না। তো ছেলে আমাকে ঝাপটে কোলে তুলে নিল। এমনিতে কথাও বলে না। তবে কেন আজ...? তারপর শচীনবাবু। সেও আজ অন্যরকম। রুমাল কুড়িয়ে দিল...অনেক কথা বলল...
—শোনো তৃণা, শচীনকে ফোনটা কিন্তু করা হয়নি।
—পরে কোরো।
—এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা তোমার খোঁজ করছে। ওদের কেন অযথা ভাবতে দিচ্ছ?
—ভাবুক। একটু ভাবুক। কোনওদিন তো ভাবে না।
—না তৃণা। তুমি ভুল করছ। যা করছ তা আরও বলিষ্ঠভাবে করো। চুরি তো করোনি।
তৃণা দেবাশিসের হাতটা ধরে বলল—আঃ! তোমার কেবল ভয়। শোনো না।
দেবাশিস শ্বাস ছেড়ে বলল—বলো।
—ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই আমাকে আজ ভূতে পেল।
—সে কী রকম?
—ভুল রাস্তায় চলে গেলাম। ঠিক যেন নিশি-পাওয়া মানুষের মতো একটা ছেলে মোটরসাইকেল চালিয়ে গেল, সেই শব্দে চেতনা হয়। তারপরও ফের ভুল। একটা ট্যাক্সিওলা নিয়ে গেল দেশপ্রিয় পার্কে। তাকে ডিরেকশন দিতে মনে ছিল না, রাস্তাটাও খেয়াল করিনি। তাই মনে হচ্ছে, আজকের দিনটা খুব অদ্ভুত।
—কী বলতে চাও তৃণা?
তৃণা অন্ধকারেই মুখ ফেরাল তার দিকে। বলল—এক একটা দিন আসে, ভুল দিয়ে শুরু হয়। ভুলে শেষ হয়। ভুতুড়ে দিন।
—না তৃণা, ভুল দিয়ে শেষ হচ্ছে না। তুমি বড্ড সেকেলে।

—না দেব। শোনো, আমি শুধু একটাই ঠিক কাজ করেছি আজ।
—কী?
—শচীনকে বলে আসিনি।
—বলে আসা উচিত ছিল। এটাই ভুল করেছ।
তৃণা মাথা নেড়ে বলে—না। বলে আসলেই ভুল করতাম।
দেবাশিস অধৈর্যের গলায় বলে—আমি এক্ষুনি ফের শচীনকে ফোন করছি।
বলেই বাধা না মেনে উঠে গেল দেবাশিস। ফোনের ওপর ঝুঁকে পড়ে অল্প আলোয় ঠাহর করে করে আস্তে আস্তে ডায়াল ঘোরাতে থাকে।
ফোনটা কানে তুলে অপেক্ষা করছে। তৃণা উঠে এল কাছে ফোনটা নিয়ে নিল হাত থেকে। রেখে দিতে যাচ্ছিল, শুনল ওপাশ থেকে একটা মেয়ের গলার স্বর বলে উঠল—হ্যালো।
রেবা বোধ হয়। তৃণা তাই ফোনটা কানে লাগায়।
ওপাশে চঞ্চল ও ধৈর্যহীন গলায় রেবা বলছে—কে? হ্যালো। কে?
উত্তর দিতে সাহস হল না তৃণার। কেবল খানিকক্ষণ শুনল।
রেবা চেঁচিয়ে তার বাবাকে ডাকছে—বাপি, দেখ, ফোনটা বাজল, কেউ সাড়া দিচ্ছে না এখন।
পরমুহূর্তেই শচীনের গলা—হ্যালো।
তৃণা মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে রাখল।
শচীন রেবাকে ডেকে বলল—গোস্ট কল। আজকাল টেলিফোনে যত গোলমাল।
বলেই আবার, শেষবারের মতো বলল, হ্যালো। কে?
কেউ না। আমি কেউ না। একথা মনে মনে বলে তৃণা।
দেবাশিস কানের কাছে মুখ নামিয়ে নরম গলায় বলে—তৃণা, বলতে পারলে না?
শচীন ফোন রেখে দিল।
তৃণা মাথা নেড়ে বলল—না। আজকের দিনটা থাক। দিনটা ভাল নয় দেব।
—খুব ভাল দিন তৃণা।
—না দেব, আজ কোনও ডিসিশন নেওয়া ঠিক হবে না।
—তা হলে কী করবে তৃণা?
—তা হলে...
তৃণা ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে ভাবে।
দেবাশিস অপেক্ষা করে উগ্র আগ্রহে।

গাড়ি থামল। গাড়ি চলে গেল।
নিজের বাড়ির সামনে একা দাঁড়িয়ে তৃণা। বুকে একটা খাঁ খাঁ আকাশ। সেই আকাশে নানা ভয়ের শকুন উড়ছে।
রাত আটটা বেজে গেছে। তবু তেমন রাত হয়নি। এখনও স্বচ্ছন্দে বাড়িতে ঢোকা যায়। কেউ ফিরেও তাকাবে না সে জন্য। দেবাশিসের গাড়িটা গড়িয়াহাটা রোডের মুখে গিয়ে বাঁ ধারে মোড় নিল।
তৃণা বাড়ির গেট দিয়ে ধীর পায়ে ঢোকে। মস্ত আলো জ্বলছে বাইরে। ছোট বাগানটার গাছপালার ওপর আলো পড়েছে। হাওয়া দিচ্ছে। চাঁদ উঠেছে। ফুলের গন্ধ মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছে বাতাস।
আজকের দিনটা দেবাশিসের কাছে ভিক্ষে নিল তৃণা। আজ দিনটা ভাল নয়। এই ভুতুড়ে দিনে এতবড় একটা সাহসের কাজ করতে তার ইচ্ছে করল না। আজকের দিনটি কেটে গেলে এরপর যে কোনওদিন সে চলে যাবে। কেন থাকবে এখানে? কেন থাকবে।
আস্তে ধীরে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। বাঁ ধারের ঘরটায় টেবিল-টেনিস খেলছে রেবা আর তার এক মাদ্রাজি মেয়ে-বন্ধু সরস্বতী। ছোটাছুটি করছে। হাসছে। তাকে কেউ দেখল না।

শচীনের কাকাতুয়াটা চেঁচিয়ে বলল—চোর এসেছে। চোর এসেছে। শচীন! শচীন!

তৃণা ধীরে তার ঘরে এসে দাঁড়ায়। আলো জ্বালে না। চুপ করে বিছানায় বসে থাকে কিছুক্ষণ, এবং বসে থাকতে থাকতেই টের পায়, বুকে আকাশ, আকাশে শকুন। মনটা ভাল থাকলে এই নিয়ে একটা কবিতা লিখত সে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তৃণা। অলক্ষে এবং নিজেরও অজান্তে চাকর এসে ডাকল—মা, খাবেন না? সবাই বসে আছে।

তৃণা উঠল। চাকরের মুখের মা ডাকটা কানে বাজতে থাকে। বাথরুম সেরে এসে খাওয়ার টেবিলে চলে গেল সে। রাতের খাওয়ার সময়টায় সে প্রায়ই থাকে। নিয়মও না থাকলেও ক্ষতি নেই, তবু নিয়ম।

খাওয়ার টেবিলে আজ সবাই খুব হাসি খুশি।

শচীন ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলছে। কথামৃতের গল্প। সবাই শুনছে। এ সব গল্পের মধ্যে অবশ্য তৃণাকে ওরা রাখে না। টেবিলের একধারে তৃণা চুপ করে বসে থাকে। টেবিলে সাজানো খাবার। যে যার প্লেটে তুলে নিয়ে খায়।

শচীন গল্পের শেষে বলল—জাপানের চালানটা এলে দেখবি। বামন গাছের এমন একটা বাগান করব।

—আমাদের স্কুলে ইকেবানা শেখায়। রেবা বলে।

মনু বলল—সে আবার কী?

—ফুলদানি সাজানো। খুব মজার। জাপানিরা স্বর্গ, মানুষ আর পৃথিবী এই প্যাটার্নে ফুল সাজায়। অদ্ভুত।

মনু বলে—জাপানিরা খুব প্রগ্রেসিভ। না বাবা?

—প্রগ্রেসিভ! শচীন বলে—তা ছাড়া ওদের মতো মাথা কারও নেই। শুধু দোষের মধ্যে বড্ড সেন্টিমেন্টাল, একটুতেই সুইসাইড করে।

— হারিকিরি। রেবা বলে।

—হারিকিরি নয়। মনু বলে—হারাকিরি।

এইরকম সব কথা।

রান্নার লোকটা নিঃশব্দে ঘরের একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। রোজই থাকে। চমৎকার রাঁধে সে। কোনও ভুল হয় না।

আজ হঠাৎ চাইনিজ চপ সুয়ের একচামচ মুখে তুলেই রেবা চেঁচিয়ে বলে—চিত্ত, আজ এটাতে নুন দাওনি!

চিত্ত শশব্যস্তে—দিয়েছিলাম তো!

—দাওনি। রেবা জোর গলায় বলে।

মনু একটু মুখে দিয়ে বলে—দিয়েছে। তবে কম হয়েছে।

শচীন বলল—টেস্ট কিন্তু দারুণ।

রেবা বিরক্ত হয়ে তার বাবার দিকে নুনের কৌটো এগিয়ে দেয়। কী ভেবে নিজেই নুন ছড়িয়ে দেয়। মনুর প্লেটেও দেয়।

তারপরই হঠাৎ তৃণার দিকে ফিরে বলে—মা, তোমাকে... ওঃ, তুমি তো এখনও খাওয়া শুরুই করোনি।

তৃণা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে রেবা তাকে মা বলে ডাকছে। গত এক বছর একবারও ডাকেনি। তার কানমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে রক্তের জোয়ারে। বুক ভেসে যায়, হৃদয় ক্ষরিত হয়। বহুকাল বাদে স্তনের ভিতরে যেন ঠেলে আসে দুধ। অস্থির তৃণা চেয়ারের হাতল চেপে ধরে। আনন্দ! আনন্দ! এত আনন্দ সে বুঝি জীবনে একবারও আর ভোগ করেনি। কেউ তার অবস্থা লক্ষ করছে না! ভাগ্যিস। শচীন ওদের বিদেশের একটা অভিজ্ঞতার গল্প করছে। ওরা কি জানে তৃণার ভিতরে একটা ট্যাপ কে যেন খুলে দিয়েছে। অবিরল নির্ঝরিণী বয়ে চলেছে তার শরীর দিয়ে। সেই স্রোত তার চারধারে সব কিছুকেই অবগাহন করাচ্ছে শব্দটা কান পেতে

শোনে তৃণা স্রোতের শব্দ।

পরদিন সকালে তৃণা কবিতার খাতা নিয়ে বসল।

আজও দেবাশিস আসবে। বিকেলবেলায়। বাসস্টপে।

নয়

সারা বাড়িতে আজ চন্দনার ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দেবাশিস একা সিগারেট খেল অনেকক্ষণ। আবার উঠল। জানালাটা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল রাস্তার ওপর। বহু নীচে ফুটপাথ। মাঝখানে নিরালম্ব শূন্যতা। চন্দনা কী করে অত সাহস পেল?

দেবাশিস তো পারে না। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে কলকাতা। ঘর সাজাবে বলে, ফুলশয্যা বলে ফুল এনেছিল সে। এখন এই নিশুতরাতে সেই গন্ধ ছড়াচ্ছে। কী গভীর সুগন্ধ। সুগন্ধটা টেনে রাখে তাকে।

দেবাশিস প্রেতের মতো একা এসে বসে সোফায়। মাথার চুল মুঠো করে ধরে। রবি নেই। রবি এখন মণিমার বুক ঘেঁষে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

একবার রবির ঘরে এল দেবাশিস। রোজ রাতেই আসে। ছোট ছোট শ্বাস ফেলে রবি ঘুমোয়। চেয়ে দেখে। পাশ ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আজ রবির ছোট্ট বিছানাটা ফাঁকা পড়ে আছে।

আজকের দিনটা কেমন যেন। হাতের মুঠো থেকে পয়সা হারিয়ে গেলে শিশু যেমন অবাক তেমনি লাগছিল দেবাশিসের।

রবি নেই। তৃণা নেই।

ভালই। এ একরকমের ভালই।

প্রেতের মতো ভয়ংকর শুকনো একটা হাসি হাসল দেবাশিস।

বুকে এখনও যেন রবির খেলনা পিস্তলের মিথ্যে গুলি বিঁধে আছে। বড় যন্ত্রণা।

অস্ফুট শব্দ করল দেবাশিস; যন্ত্রণাটার অর্থ বুঝতে পারল না।

কালই ইনডেক-এর একটা মস্ত কন্ট্রাক্ট শুরু হচ্ছে আসানসোলে। সকালের গাড়িতেই চলে যেতে হবে।

দেবাশিস শুল। ঘুম আসছে ভারী ক্লান্তির মতো। ঘুমচোখে মনে পড়ল, ভুল করে কাল বিকেলে বাসস্টপে আসতে বলেছে তৃণাকে। এসে ফিরে যাবে।

ফোন করবে? থাকগে। আজ একটা ভুলের দিন গেল। আজ আর ভুলগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করবে না। থাক। ভুলের দিনটা কেটে যাক।

আশ্চর্য ভ্রমণ

১
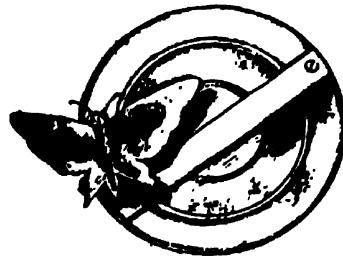
মশাইরা, ওই লোকটাকে একটু চুপ করতে বলবেন? কিছু লোক আছে যাদের গলায় কোনও ভাল্‌ভ থাকে না, অনর্গল কথা বেরিয়ে আসে। লোকটাকে লক্ষ করুন, যখন ট্রেনে উঠেছিল তখন একটা ক্রিম রঙা ভাল স্ট্রেচ প্যান্ট আর ইজিপসিয়ান বা টেরিকটনের হালকা রঙের চেক শার্ট ছিল পরনে। অনেকক্ষণ ট্রেন জার্নি করতে হবে বলে হিসেবি লোকটা ট্রেনে উঠেই এতগুলো মেয়ে-পুরুষের সামনে একটা লুঙি মাথা দিয়ে গলিয়ে নিয়ে দাঁতে চেপে ধরে লুঙির আড়ালে হড়হড় করে প্যান্ট ছাড়ল। জামাও। এখন দিব্যি গেরস্তের মতো গেঞ্জি আর লুঙি পরে বেঞ্চে পা তুলে বসেছে। হাতে হাতপাখা নড়ছে, সঙ্গে আটপৌরে একটা বউ, একটা বড় ছেলে, একটা ছোট মেয়ে। বউ বা ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলছে না। ও বসেই সামনের বেঞ্চে বসা মুখোমুখি একজন বিনয়ী চল্লিশের কাছাকাছি লোকের সঙ্গে তখন থেকে প্রথমে ফারাক্কা ব্রিজ, তারপর রাজনীতি, তারপর কন্যাকুমারিকা ভ্রমণের গল্প বলছে। লোকটার বয়স কত হবে? পঞ্চাশ! তা হতে পারে। এ বয়সে মানুষ কথা বলতে ভালবাসে। কেন বলুন তো! যে কারণই থাক, অত কথা, একনাগাড়ে শুনলে আমার পেট গুলোতে থাকে, মাথা ভার হয়, আর ভীষণ ক্লান্ত লাগে। ওকে একটু চুপ করতে বলুন ভাইসব। এটা ওর বাড়ি নয় যে লুঙি আর গেঞ্জি পরে বসবে, কিংবা হাতপাখায় হাওয়া খাবে। তাও সহ্য হয়, কিন্তু কথা!

আমি শুনতে পাচ্ছি কামরার সব মানুষই কিছু কিছু কথা বলছে। কে কাকে ডাকল, কে একটা মেয়ে খুব হাসছে—তাকে দেখতে পাচ্ছি না। পাশের কিউবিকলে কুলির সঙ্গে একজনের ঝগড়া শুনছিলাম একটু আগে। সেসব গায়ে লাগে না। কিন্তু ওই একনাগাড়ে কথা, অবিরল কথা, একই কণ্ঠস্বরে—ওটা ভীষণ একঘেয়ে। ওকে একটু চুপ করতে বলুন। ঠিক বটে, ওকে চুপ করার কথা আমারই বলা উচিত, কেননা আর সকলের হয়তো আমার মতো কথার অ্যালার্জি নেই। কিন্তু আমি মশাই, কখনও কাউকে প্রকাশ্যে, অনেকের সামনে কিছু বলতে পারি না। কারণ, প্রকাশ্যে কথা বলা মানেই হচ্ছে পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যেই কেউ বাসে বা ট্রামে, লোকজনের সামনে কিছু বলতে শুরু করে, তখনই দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের লোক তার দিকে মনোযোগী হয়ে ওঠে। হয়তো সবাই ভাবে এইবার এই একজন কিছু বলবে। শোনা যাক, এ লোকটা সাংঘাতিক কিছু বলতে পারে কি না। এই বলে সবাই তার দিকে উৎকর্ণ হয়ে তাকায়, কিছু একটা প্রত্যাশা করে। আমি যখনই টের পাই যে, লোকে আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে, আমার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছে, বা আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা করছে, তক্ষুনি আমি ঘাবড়ে যাই। আমার কথা আটকে যায়। ভাবনা-চিন্তা সব ছাই হয়ে ঘোলাটে মেরে যায়। তাই পারতপক্ষে আমি প্রকাশ্যে অচেনা জনসাধারণের সামনে কখনও মুখ খুলি না। বাসে-ট্রামে আমি কদাচিৎ লোককে সরে দাঁড়াতে বলি, বা সরে বসতে। রাস্তায়-ঘাটে সব সময়েই আমি চলাফেরা করি ফেরারি আসামির মতো সভয়ে। কলকাতায় আমার অন্তত তিনবার পকেটমার হয়েছে। কিন্তু একমাত্র প্রথমবার আমার ন' টাকা সমেত মানিব্যাগটা প্যান্টের বাঁ পকেট থেকে হাওয়া হয়ে গেলে আমি হ্যারিসন রোড আর চিৎপুর জংশনের কাছে দশ নম্বর বাসের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ভিড়ের ভিতর বলে উঠেছিলাম—আরে! ম্যানিব্যাগটা পকেটমার হয়ে গেল! সে কথা শুনে সবাই আমার দিকে অতি কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। তারপর শুরু হল কথা—ক' টাকা ছিল মশাই? ভাল করে দেখুন। বাসে-ট্রামে একটু সাবধানে...ইত্যাদি। লজ্জায় মরে যাই। তার মধ্যে নীচের তলার কন্ডাক্টর আবার গলাটা বাড়িয়ে বলল—টিকিট কাটার সময়ে অনেকের দেখেছি পকেটমার হয়, দাদারটা আবার সেরকম নয় তো। সবাই হেসেছিল। তাই পরের দু' বার যখন আমার পকেটমার হয়, দ্বিতীয়টা প্রথমটার প্রায় দশ বছর পর, এবং তৃতীয়টা দ্বিতীয়বারের পাঁচ বছর পর, তখন প্রথমটার স্মৃতি থেকে অভিজ্ঞতাবলে আমি টুঁ

শব্দও করিনি। খুব স্থির ও ঠাণ্ডা মাথায় প্রায় হাসিমুখে এবং স্বাভাবিক ভাবভঙ্গির সঙ্গেই আমি দাঁড়িয়ে থেকেছি। কেউ টেরও পায়নি যে আমার পকেটমার হয়েছে। আছে বটে কেউ কেউ যারা ট্রামে-বাসে ঝগড়ার জন্য মুখিয়ে থাকে, এবং যে কোনও উটকো কারণেই ঝেঁঝে উঠে চমৎকার যুক্তিতর্ক ও অপমান মিশিয়ে দারুণ চ্যাম্পিয়নের মতো ঝগড়া করে। যেমন আমার বন্ধু বিমল। একটা লোকের সঙ্গে নাগাড়ে আধঘণ্টা ঝগড়া করে বিমল তাকে রাগিয়ে এমন বেহেড করে দেয় যে লোকটা তেড়ে এসে বলে—ফের কথা বললে দাঁত খুলে নেব। তাতে বিমল বিচ্ছুর মতো হেসে বলেছিল—দাদা বুঝি ডেন্টিস্ট? এ কথায় চারদিকের সবাই, যারা অনেক প্রত্যাশা এবং মনোযোগের সঙ্গে ঝগড়াটা শুনছিল, তারা এমন পেট কাঁপিয়ে হেসে উঠল যে লোকটা মাথা নিচু করে পরের স্টপেই নেমে যায়। আমরা আজও জানি না যে ওই পরের স্টপটাই লোকটার গন্তব্য ছিল কি না। আমার আর এক বন্ধু দেবু একবার দুইয়ের বি বাসে দুটো লোককে বাগবাজার থেকে টানা ডালহৌসি অবধি এক নাগাড়ে ঝগড়া করতে শুনেছিল। তবে বউবাজারের মোড়ের কাছে এসে দুজনেরই কথা ফুরিয়ে যায়, আর পরস্পরকে অপমান করার মতো কথা তাদের স্টকে ছিল না, দমেরও কিছু ঘাটতি হয়ে থাকবে! তবু দুটো বেড়ালের মতো তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে আক্রোশে ফুঁসছিল, এবং তখনও একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে বলছিল—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ। সেই অন্যজন এর দিকে চেয়ে বলছিল—ঙ—ঙ—ঙঃ! এভাবে ভাষাহীন ঝগড়াটা ডালহৌসিতে এসে দুজনে নেমে যাওয়ার পর থামে। আমরা আজও জানি না, নেমে যাওয়ার পরও তারা দুজন ব্যাপারটা আরও কিছুদূর পর্যন্ত চালিয়েছিল কি না। কেউ কেউ এরকম পারে। যেমন একবার ভিড়ের ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো একজন বেঁটে ও অন্যজন লম্বা লোককে ঝগড়া করতে দেখেছিলাম। বেঁটে লোকটা তোতলা বলে ঝগড়ায় সুবিধে করতে পারছিল না। তাই সে একটা স্টপে নেমে পড়ে হঠাৎ ডান পা তুলে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর পাছায় কপাৎ করে একটা লাথি কষিয়ে হন হন করে হাঁটতে লাগল। লাথি-খাওয়া লোকটা প্রথমে বুঝতেই পারেনি সেটা লাথি ছিল কি না। ভিড়ের মধ্যে কত গুঁতো লাগে। সবাই যখন চেঁচিয়ে বলল—ও মশাই, আপনাকে লাথি মেরে পালাল যে। ধরুন ধরুন, ওই যাচ্ছে! তখন লম্বা লোকটা একটা হাতব্যাগ বগলে চেপে লাফ দিয়ে নেমে দৌড়োতে লাগল। তার ভাবভঙ্গি দেখে রাস্তার শান্তিপ্রিয় লোকেরা তখন তাকে ধরে ফেলেছে—আহা, কী করছেন মশাই! ছেড়ে দিন। লম্বা লোকটা আটকা পড়ে কেঁদে ফেলে আর কী—ছেড়ে দেব। ছেড়ে দেব কী মশাই! ও লোকটা আমাকে লাথি মেরে পালাচ্ছে। বলতে বলতে মরিয়া হয়ে লোকটা সবার হাত ছাড়িয়ে দৌড়োল। দৌড়ে সে যখন প্রায় বেঁটে লোকটাকে ধরে ফেলেছে তখন বেঁটেজন হঠাৎ দাড়িয়াবান্দা খেলার খেলুড়ির মতো নিচু হয়ে বাঁই করে উল্টোবাগে সরে গেল। লম্বা লোকটা যতবার তাকে ধরতে যায় ততবারই সে নানা কায়দায় সরে গিয়ে হাঁটতে থাকে। কী করুণ দৃশ্য! লাথি-খাওয়া লম্বা লোকটা কিছুতেই লাথি-মারা বেঁটে লোকটাকে ধরতে পারছে না। রাগে ফেটে পড়ছে তার মুখ, চোখে জল, বার বার সে চেষ্টা করছে ধরতে। বেঁটে লোকটা পালিয়েও যাচ্ছে না, কেবল চোর-পুলিশ খেলছে। চওড়া ফুটপাথ জুড়ে, প্রকাশ্য দিবালোকে সেই ব্যাপারটা কতক্ষণ চলেছিল বলা শক্ত। বাস আমাকে-সুদ্ধ দৃশ্যটা পার হয়ে এসেছিল। আমি মশাই, এসব নানা কারণেই রাস্তা-ঘাটে মুখ খুলি না।

ওই লুঙিপরা লোকটাকে কিছু বলাও আমার পক্ষে সম্ভব নয় বন্ধুগণ। যদি আমার হয়ে আপনারা কেউ বলেন! অবশ্য বন্ধুগণ, আমি জানি যে আপনারা অধিকাংশ লোকই আমার মতো। রাস্তায় ঘাটে, প্রকাশ্যে আজকাল কেউ বড় একটা কথা বলতে চায় না, দু' চারজন মুখফোঁড় ছাড়া। আমরা অধিকাংশই নীরবতার সমর্থক, কিছু ভিতু এবং লাজুকও। সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে আমরা বেঁচে-বর্তে থাকি, এবং যদিও এখন আর মানুষের ব্যক্তিগত সম্মান বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই, তবু খুবই সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে আমরা আমাদের ধোঁয়াটে আত্মসম্মান জিনিসটাকে রক্ষা করে চলি।

আপনাদের কারও কাছে ব্যথা কমানোর বড়ি আছে কি ভাইসব? গত কিছুদিন যাবৎ আমার একটা দাঁত বড় কষ্ট দিচ্ছে। ডানদিকের নীচের পাটির একদম শেষের বড় দাঁতটার নাম আমি দিয়েছি বড়দা। আর ঠিক তার আগের দাঁতটার নাম দিয়েছি মেজদা। এই মেজদাই হচ্ছে কালপ্রিট। কবে যেন সুপুরি খেতে গিয়ে দাঁতের একটা দেয়াল ধসে পড়ে। তারপর থেকেই মেজদা মাঝে মাঝে ঝিলিক দেয়। গভীর রাতে ব্যথায় ঘুম ভেঙে গেলে আমি উঠে বসে মেজদার সঙ্গে কথা বলি—জানো তো মেজদা,

অধিকাংশ ডেন্টিস্টই, ভাঙা দাঁত সম্পর্কে একটাই কথা বলে। তারা বলে, এ দাঁতের তো আর চিকিৎসা নেই, আসুন তুলে দিই। তা মেজদা, তোমার কি উচ্ছেদ হওয়ারই ইচ্ছে। এ কেমনতর উল্টোবুদ্ধি তোমার! যে ক'দিন পারো নিজের ভিত আঁকড়ে থাকাটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। কোন বোকা চায় ভিত থেকে উচ্ছেদ হয়ে আস্তাকুঁড়ে যেতে? নিজের ভবিষ্যৎ বুঝে কাজ করো মেজদা, আখের বলে একটা কথা আছে। কিন্তু বহু বলা সত্ত্বেও মেজদা শোনে না। মাঝে মাঝে সেই অবিমৃষ্যকারী জল ঘোলা করবেই। যেমন এখন ঝিলিক মারছে। পুরো ডান দিকটা ধরে গেল ব্যথায়। চোখে জল আসছে। মাথাটাও ব্যথা করছে দাঁতের ঝিলিকে। ভাইসব, কারও কাছে বড়ি নেই?

না বন্ধুগণ, আমি কারও কাছেই প্রকাশ্যে ট্যাবলেট চাইতে পারব না। যদি সহৃদয় কেউ থাকেন, যিনি মুখ দেখে ভিতরের ব্যথা টের পান, তিনি এগিয়ে আসুন অমোঘ পেইন-কিলার ট্যাবলেট নিয়ে। আর এই লুঙিপরা লোকটাকে বারণ করুন কথা বলতে। এখন ও কী বলছে আমি দাঁত ব্যথায় তা আর শুনতে পাচ্ছি না। কেবল বমন-উদ্রেককারী ওর গলার একঘেয়ে স্বর শোনা যাচ্ছে। মেজদা তাতেই আরও ক্ষেপে যাচ্ছে।

কোথায় ট্রেনটা থামল দাদা? বর্ধমান নাকি। সে যেন দরজার কাছে চেঁচিয়ে বলছে—উঠবেন না, উঠবেন না, এটা রিজার্ভড কামরা! সাবাস মশাই, ওইরকম স্পিরিটই তো চাই। কাউকে উঠতে দেবেন না। আমাদের হয়ে আপনি লড়ে যান তো। আমি খুবই ঈর্ষা বোধ করছি আপনার প্রতি। রেলের কামরায় বে-আইনি অনুপ্রবেশকারীদের আমি কখনও ধমকে ওরকম রাগের সঙ্গে কিছু বলতে পারিনি কোনওদিন। বড় জোর মিন মিন করে বলেছি—এটা তো রিজার্ভড কামরা। এমনভাবে বলেছি যে পরিষ্কার বোঝা গেছে কামরাটা রিজার্ভড কি না সে বিষয়ে আমারই সংশয় ও দ্বিধা রয়ে গেছে। ফলে আমি যে কামরা পাহারা দিই তাতে বরাবর উটকো লোক উঠে ভিড় করেছে। না বন্ধুগণ, আমি প্রতীক অর্থে কথাটা বলছি না। আমি যেরকম ঠিক সেই রকমই বোঝাতে চাইছি। মেজদা প্রচণ্ড ব্যথাচ্ছে। লুঙিপড়া লোকটা কথা বলছে। এখন আমার মাথা পরিষ্কার নেই। তার ওপর তো কামরাটার কেবল বসবার ব্যবস্থা আছে, শোওয়ার নেই। সারা রাতটা জেগে বা বসে বসে ঢুলতে ঢুলতে যেতে হবে। এই প্রচণ্ড দাঁত ব্যথা নিয়ে সেটা তবু সওয়া যেত। কিন্তু ভাইসব, দেখুন কপাল, আমার এই কিউবিকলে একজনও যুবতী মেয়ে নেই, সুন্দরী তো দূরের কথা। মোট বারোজনের মধ্যে লুঙিপরা লোকটার বউ আর বাচ্চা মেয়েটা বাদে আর দশজনই পুরুষ। মাঝে-মধ্যে এরকম গ্রহদোষ আমাদের হয়। সারা রাত কোন দিকে চেয়ে থাকব বন্ধুগণ? আমাদের পিছনের খোপে একটা মেয়ের গলা পাচ্ছি। আর অনেকটা দূরে একদম শেষপ্রান্তে বোধহয় এক পাল কলেজের ছাত্রী যাচ্ছে, খুব কলকল করছে তারা। কিন্তু হায়, আমি তো সেখানে নেই! আমার নিয়তি এই লাবণ্যহীন খোপটাই আমার জন্য নির্দিষ্ট রেখেছিল।

দেশলাইটা? এই যে। ভাববেন না যে দেশলাইটা দিতে গিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কথা শুরু করব মশাই। না, আমার স্বভাব সেরকম নয়। আমি নির্বোধ কি না তা আমি সঠিক জানি না। তবে এইটুকু জানি যে আমি ভাল কথা বলতে পারি না। যদি কেউ কথা বলে তবে তার উত্তরে বড় জোর হুঁ-হাঁ দিয়ে যেতে পারি, কিন্তু এখন আমার সে মনোভাবও নেই। মেজদা আমাকে একদম ভালবাসছে না। সে আমাকে ছেড়ে যাবেই। দার্জিলিঙে পৌঁছেই, তখনও যদি মেজদা ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে, তা হলে মেজদাকে উচ্ছেদের নোটিশ দিতেই হবে। আমার ধারণা, দার্জিলিঙের ঠাণ্ডায় দাঁতের ব্যথা বিলম্বিত পার হয়ে দ্রুত-এ পৌঁছে যাবে। কাজেই মেজদার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকারময় মনে হচ্ছে। সে যাকগে। ওঃ দেশলাইটা। হ্যাঁ দিন। দেশলাই জিনিসটা খুব অদ্ভুত। তুচ্ছ জিনিস তো, তাই চুরির দোষ অর্শায় না। কখন যে কারটা কার পকেটে চলে যায়!

না মশাই, এখন যে আমি কথা বলতে চাইছি না তা শুধু মেজদার জন্যই নয়, বা আমাদের এই খোপে যুবতী মেয়ে নেই বলে রাগ করার জন্যও নয়, কিংবা ওই লুঙিপরা লোকটা যে এখন বেনারসের রাবড়ির গল্প করছে তার জন্যও নয়। আমরা এখন যেদিকে যাচ্ছি সেই উত্তরদিকে, একটা ছোট্ট শহরে বহুকাল আগে এক শীতকালের ভোরবেলায় একবার একটা কোকিল ডেকেছিল। ডেকেছিল না বলে বরং বলি—কেঁদেছিল। সেরকম ডাক আমি আমার জীবনে আর দ্বিতীয়বার শুনিনি। ভাইসব, কোকিলের ডাক আমি আরও কতবার শুনেছি জীবনে! কিন্তু আমার জীবন শুরু হয়েছিল ওই একটিমাত্র কোকিলের

ডাকে। সে যেন বন্ধ ঘড়ির চাবিকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছিল জোর করে। বুকের হৃৎপিণ্ড হঠাৎ তুলে আছড়ে চালু করে দিল, ধমনীতে ধমনীতে মেল ট্রেনের মতো ছুটল রক্তস্রোত। শৈশবের অবচেতনার ঘুম থেকে আমি সচেতনতার মধ্যে জেগে উঠেছিলাম। কোটি বছরে একটা কোকিল মাত্র একবারই ওরকম ডাকে। আমার জীবনে, আমি জানি, আর ওরকমভাবে কোকিল কখনও ডাকবে না। তবু একবার আমি ঘুরতে ঘুরতে সেই ছোট্ট শহরে যাব। শুনেছি, সে শহর আর ছোট নেই, মস্ত বড় হয়েছে। তবু একবার নানা জায়গায় নানা স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে খুঁজে আমাকে একবার ঘুরে আসতেই হবে।

ব্যাপারটা আর একটু বুঝিয়ে বলি। বন্ধুগণ, আপনারা সবাই যে যার শৈশবের কথা একবার ভেবে দেখুন। তা হলেই বুঝতে পারবেন আমাদের শৈশবে একটা অবোধ ঘুমন্ত সময় যায়। জন্মের পর থেকে শিশু হাসে, কাঁদে, খায়, তারপর কথা বলে, হাঁটে, পড়ে গিয়ে ব্যথা পায় কিংবা অসুখে ভোগে। অর্থাৎ সব অনুভূতিই তার থাকে। তবু তার চারদিকে এক অচেতনতার আবরণ রেশম পোকার গুটির মতো তাকে ঘিরে থাকে। হয়তো আড়াই তিন বা চার বছর বয়স পর্যন্ত সময়টা এরকম অবোধ বিস্মৃতির সময়। তাই বড় হয়ে কেউই সেই অতি শৈশবের কথা মনে করতে পারে না। আমার ডান হাতে, কনুইয়ের ঠিক ওপরে দৃশ্যমান এক গভীর ক্ষতচিহ্ন আছে। দু' বছর বয়সে পিসির কোল থেকে বঁটির ওপর পড়ে গিয়ে ওটার সৃষ্টি, মা'র কাছে শুনেছি। কাটা জায়গাটা পরে সেপটিক হয়ে যায় এবং ডাক্তার দু'বার ওটা অপারেশন করেন। কিন্তু কিছুতেই অত বড় ঘটনাটা আমি মনে করতে পারি না। এরকম সকলেরই। অবশ্য সকলের সমান নয়। কারও কারও ঘুমন্ত শৈশব কিছু দীর্ঘস্থায়ী হয়, কারও স্বল্পস্থায়ী। কিন্তু এটা ঠিক যে, আমাদের সকলেরই অতি শৈশবে একটা ঘুমন্ত অবোধ অবচেতন সময় গেছে। আস্তে আস্তে আমাদের চারধারের সেই অবচেতনতার গুটি খসে গেছে, আমরা সচেতন হয়ে শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় পৃথিবীতে জেগে উঠেছি। আমি সেই বোধটাকে টের পেয়েছিলাম একবার।

আমার জীবনে সেই ঘুমন্ত শৈশবের খোলসটা থেকে বেরিয়ে আসার ঘটনাটা খুবই প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট। খুব ধারের ছুরি দিয়ে কে যেন আমার ঘুমন্ত ও জাগ্রত শৈশবকে দুই ভাগ করেছে। আমি স্পষ্ট সেই ভোরবেলার কথা মনে করতে পারি। তখন শীতকাল। কাটিহারে কী প্রচণ্ড শীত পড়ত ভাবা যায় না। খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ওভারকোট গায়ে বাগানে বেরিয়ে এসেছিলাম। চারধারে কুয়াশাময় নিস্তব্ধতা। রেলের বিশাল সাহেববাড়ির সামনে প্রকাণ্ড বাগান। কুয়াশায় দেখা যাচ্ছে লাল পপি ফুল অসংখ্য প্রজাপতির মতো গাছে গাছে বসে আছে, ডালিয়া ফুটেছে খুব। বাগানের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটা মস্ত মাদার গাছ ছিল। শীতে জবুথবু সেই গাছটার মগডাল কুয়াশায় আবছা। খুব বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে রহস্যময় আলো-আঁধারে বাগানের দিকে চেয়ে আছি, ঠিক সেই সময় হঠাৎ হু-হু-হু-হু করে মাদার গাছ থেকে কোকিলটা ডাকল। প্রথমে চমকে উঠলাম। ওই নিস্তব্ধ সকালে দু-চারটে পাখি ডাকছিল, কিছু পাতা খসছিল অস্পষ্ট শব্দে শিমুল গাছ থেকে, বহু দূর থেকে মালগাড়ির শানটিংয়ের আওয়াজ আসছিল। কিন্তু এসব শব্দ ছিল নিস্তব্ধতারই অঙ্গ। কিন্তু সব নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে তীব্র ও ভয়ঙ্কর সুন্দর স্বরে হঠাৎ ওই আশ্চর্য কোকিলের ডাক। আমি চমকে কেঁপে উঠলাম। আমার সেই বোধহীন শৈশবের ভিতরে সেই ডাক অবিরল প্রপাতের জলধারার মতো গড়িয়ে পড়ছিল। অবিরল ডেকে যাচ্ছে কোকিল, দাঁড়ি-কমা নেই, ক্লান্তি নেই। ছুরির ধারের মতো, ছুঁচের মতো, তীব্র আলোকরশ্মির মতো আমার ভিতরে সে ডাক ঢুকে যাচ্ছিল। শব্দে শব্দে পাগল হয়ে আমি শিশির-ভেজা ঘাস মাড়িয়ে দৌড়ে গেলাম বাগানের গভীরে। মাদার গাছটার নীচে আকুল হয়ে দাঁড়িয়ে আমি ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে খুঁজছি কোকিলটাকে। দেখা গেল না। কিন্তু সেই আশ্চর্য কোকিল আড়াল থেকে কেবলই ডাকল আর ডাকল। কাঁদল আর কাঁদল। আমি আনন্দে কিংবা দুঃখে অস্থির হয়ে সারা বাগানে ছুটে বেড়াতে লাগলাম। ওই শব্দ কখনও চাবুকের মতো আমাকে তাড়া করে, কখনও চুম্বকের মতো কাছে টেনে নেয়। কিন্তু স্টিমারের আলোর মতো সেই শব্দ এতকাল রহস্য ও দুর্বোধ্যতায় ঢাকা পৃথিবীর রূপ এবং আমার ভিতরকার 'আমি'কে হঠাৎ চিনিয়ে দিল। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে হঠাৎ শান দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলল সে, স্পর্শকাতর করে দিয়ে গেল। আমি কি হেসেছিলাম, নাকি কেঁদেছিলাম? কে জানে! তবে এইটুকুই স্থির জানি যে, সেই ডাক যে ভোরে শুনেছিলাম সেই ভোর থেকে আমার শৈশবকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। তার আগের দিন থেকে বাকি শৈশব অস্পষ্ট। কোথা থেকে

শীতকালের অসময়ে এসেছিল সেই কোকিল? সেকি কেবল আমাকে জাগিয়ে তোলার জন্যই? বন্ধুগণ, তাই ওই কোকিলের ডাক আমি কখনও ভুলতে পারি না।

কত বছর হয়ে গেল। আমি আর দ্বিতীয়বার সেরকম কোকিলের ডাক শুনিনি। হয়তো সেই কোকিলটাও সারা জীবনে ওরকম আর ডাকেনি। হয়তো সেই আশ্চর্য ডাক শেষবারের মতো ডেকে সেই কোকিল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছেড়ে চলে গেছে। আর আসবে না। বন্ধুগণ, ভাইসব, মশাইরা, আপনাদের কারও জীবনে কি কখনও ওইভাবে কোকিল ডেকেছিল? দেখুন, আজও সেই ডাক মনে হলে আমার কান্না পায়। আবার গভীর এক আনন্দ আজও স্টিমারের মতো আলো ফেলে যায় অন্ধকার বুকে।

কার্শিয়াং, টুং, সোনাদা, ঘুম, তারপরই দার্জিলিং। টয়-ট্রেনের কামরায় ঝুম হয়ে বসে আছি। কিছু দেখছি না। চোখ খোলা রাখাটাই একটা সমস্যা। মেজদা হঠাৎ রেগে-মেগে এভারেস্টের মতো উঁচু হয়ে উঠল নাকি! দুটো দাঁতের পাটি এক করলেই কেন তবে অবধারিত মেজদার মাথায় সবার আগে চাপ পড়ছে? সেই চাপে প্রাণ যায়। মাইরি মেজদা, এতকাল ঘর করে এবার সত্যিই চললে?

যে অধ্যাপক বন্ধুব বাড়িতে আমি উঠব, সে দেখি দার্জিলিং স্টেশনে বশংবদ হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তাঘাট কালো, গাছপালা সবুজ, বাড়িঘর ম্যাড়ম্যাড়ে আর আকাশ ময়লা মশারির মতো দেখাচ্ছিল। নভেম্বরের মাঝামাঝি শীতের তাড়া খেয়ে আর ধসের ভয়ে চেঞ্জারবা অধিকাংশই পালিয়েছে। গাড়ি থেকে মোট পঞ্চাশ-ষাটজন লোক নামল।

আমার বন্ধু মলয় হালদার বাঁদুরে টুপি, ওভারকোট, দস্তানায় একদম অচেনা মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে কোনও আবেগ প্রকাশ করল না। কেবল নিমীলিত চোখ চেয়ে ধীর গলায় বলল—ক'দিন আগেও চার পার্ট ট্রেন এসেছে। এখন মোটে দুই পার্ট। এখন কেউ দার্জিলিঙে আসে?

তাব মুখ থেকে দার্জিলিঙের নির্মল বাতাসে চড়া অ্যালকোহলের গন্ধ এল।

মেজদার জন্য কথা বলা পর্যন্ত আসছে না। মলয় সেজন্য অপেক্ষা না করে নিজেই ফের বলল—তুই রুমালে গাল চেপে আছিস কেন?

আমি বললাম—দাঁত।

সে বলল—ব্যথা?

আমি বললাম—ভীষণ। আগে একজন ডেন্টিস্টের কাছে চল, তারপর বাসায় যাব।

সে বলল—চল।

গেলাম। প্রৌঢ় ডেন্টিস্ট যখন একটা বাঁকানো শলা দিয়ে দাঁতটাকে খোঁচা দিচ্ছিলেন, তখন প্রবল যন্ত্রণার মধ্যেও আমি মৃদু একটা অ্যালকোহলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। দাঁত খুঁচিয়ে ডেন্টিস্ট বললেন—এ তো সিলিং চলবে না। ওয়াল ভেঙে গেছে, কেভিটিও নার্ভ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তুলে ফেলতে হবে।

খুব চড়া অ্যালকোহলের গন্ধ পেলাম। কষ্টে বললাম—তাই দিন।

ডেন্টিস্ট মাথা নেড়ে বললেন—আজ নয়। ওষুধ লিখে দিচ্ছি, ব্যথা কমলে তোলা যাবে।

আমি আরামদায়ক দাঁত তোলার চেয়ারটায় রাজার মতো যেমন বসেছিলাম তেমনি থেকেই বললাম—আমার দাঁতগুলোব অবস্থা কীরকম?

ডাক্তার হিটারে জল গরম করছিলেন হাত ধোওয়ার জন্য। মুখ ফিরিয়ে বললেন—খুব খারাপ।

চেম্বারের একদিকে কাচের জানালা। পর্দা সরানো। হঠাৎ দেখি আকাশের ময়লা মশারিটা কে যেন চালি করে তুলে ফেলেছে। আকাশ ঝকঝক করছে, পরিষ্কার। আর সেই আকাশে নিখুঁত একটা দাঁতের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘা উঁচু হয়ে আছে। তার কোথাও দেয়াল ভাঙেনি, পোকায় খায়নি। একটা হালকা মেঘ আটকে আছে দাঁতে, রোদের খড়কে সেটাকে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

ডাক্তার হাত ধুতে ধুতে বললেন—অনেক আগেই আপনার ডাক্তার দেখানো উচিত ছিল। তা হলে দাঁতটা বেঁচে যেত।

যদিও আমি পাবলিকের সামনে কথা বলতে পারি না, কিন্তু যে কোনও একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে আবার দ্বিধা আসে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম—ডাক্তারের কাছে আমি বরাবরই দেরি

করে যাই।

—কেন?

—আই হেট ডক্টরস।

খুবই আপত্তিকর কথা। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালই যে ডাক্তার কিছু মদ্যপান করে আছেন। কিছু অ্যালকোহল পেটে থাকলে অনেক কথাই গায়ে লাগে না। আমার কথা শুনে ডাক্তার হেসে বললেন—কেন বলুন তো?

প্রচণ্ড ব্যথায় মেজদা আরও কয়েক সেন্টিমিটার উঁচু হয়ে উঠল। তবু যেহেতু আমি একজন ডেন্টিস্টের চেম্বারেই বসে আছি, সেই হেতু মনস্তাত্ত্বিক এক ধরনের সাহস কাজ করছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রবল ঘুঁষি অবিরল খেয়েও যেমন সহনশীল মুষ্টিযোদ্ধা অটল থাকে, তেমনি আমিও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মেজদার ঘুঁষি খেতে খেতেও মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে বললাম—দেখুন, আমার শরীর সম্পর্কে আমার চেয়ে সব সময়েই ডাক্তাররা বেশি জানে, এ ব্যাপারটা আমি সহ্য করতে পারি না। যে শরীরটা আমি গত ছত্রিশ বছর ধরে বয়ে বেড়াচ্ছি, তার ভিতরকার সব খবর একজন উটকো ডাক্তার জানে, আমি জানি না। তাই ডাক্তারদের সম্পর্কে আমি জেলাস।

ডাক্তার ফের হাসলেন।

আমি বললাম—আরও একটা কারণ আছে।

ডাক্তার হাই তুললেন। বুঝলাম, যদিও আমার কথা শুনবার মতো উৎসাহ তাঁর বড় একটা নেই, তবু এই প্রায়-অফ-সিজিনে হাতে কাজ নেই বলেই বোধহয় তিনি একটা আড়াল থেকে ফিকে হলদে রঙের পানীয় ভরা একটা গ্লাস বের করে এনে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কী?

—একবার খুব সর্দি হয়ে আমি আমার কর্মস্থলে চার-পাঁচ দিন কামাই করি। যখন ফের কাজে যোগ দিতে যাই, তখন একটা দরখাস্তে সত্যি কথাটা লিখে ছুটির আবেদন করি। তখন কর্তৃপক্ষ বলেন যে দরখাস্তের সঙ্গে একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দরকার। আমি তাদের জানাই যে, আমার একটা বিচ্ছিরি আধকপালে সর্দি হয়েছিল। আমি ডাক্তার দেখাইনি, নিজেই নানা ধরনের ট্যাবলেট খেয়েছি। তাঁরা বললেন, এতে হবে না, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট অবশ্যই দিতে হবে। আমিও সেটা জানতাম। তবু পরীক্ষামূলকভাবে আমি আরও কিছু চিঠিপত্র লিখি। ম্যানেজিং কমিটি এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে জানাই যে, আমি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেব না, কারণ সেটা মিথ্যাচার হবে। আমি সৎ লোক, আমার আবেদনটিও সত্য। সুতরাং সেটাই গ্রাহ্য হোক। কিন্তু বৃথা, আমার আবেদন গ্রাহ্য হল না। সেই ক'দিনের ছুটি একস্ট্রা-অর্ডিনারি লিভ হিসেবে দেখানো হল, আমার সে ক'দিনের মাইনে কাটা গেল। তারপর আমি একজন ডাক্তারের কাছে গিয়ে চারটে টাকা দিয়ে একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পেয়ে যাই। ডাক্তার লিখে দিলেন যে, আমার লাম্বাগো এবং জ্বর হয়েছিল, তিনিই আমার চিকিৎসা করেছেন এবং তাঁর নির্দেশেই আমি কাজে যাইনি। সাজানো মিথ্যে কথা। এবার সেই সার্টিফিকেটটার সঙ্গে ফের একটা দরখাস্ত করে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলাম যে, সঙ্গের মেডিক্যাল সার্টিফিকেটটা সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং জোচ্চুরি। মাত্র চারটি টাকার বিনিময়ে ওটা আমি কিনেছি। তবু কি তাঁরা এরকম মিথ্যাচারপ্রবণ হতে তাঁদের কর্মচারীদের উৎসাহ দেবেন? এর ফলে প্রবল হই-চই হল, কিন্তু নিয়মটা পাল্টাল না।

ডাক্তারটির ধৈর্য অসীম। ফের হেসে বললেন—তা আপনি কী করতে চান? নিয়ম কি সহজে পাল্টানো যায়?

আমি মেজদাকে মনে মনে একটা ধমক দিয়ে ডাক্তারকে বললাম—কিন্তু আমি সত্যি কথা বলেছি। আমি মানুষটিও সৎ। আমার স্টেটমেন্ট কেন নেওয়া হবে না? আর, সবাই যখন জানে যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট টাকা দিয়ে কেনা যায়, এবং বহু মেডিক্যাল সার্টিফিকেটই সম্পূর্ণ মিথ্যা, তখন সেটাই কেন গ্রাহ্য হবে? ডক্টর, আর ইউ নট লাইসেন্সড্ টু টেল লাইজ অ্যাট টাইমস্? তার মানে অনেক ডাক্তার কখনও কখনও লাইসেন্সড লায়ারস?

ডাক্তার ফের হাই তুললেন।

আমি বললাম—সেই কারণেই আই হেট ডক্টরস।

বলে ভিজিট দিয়ে উঠে এলাম। ভিজিটারস রুমে এসে দেখি ছেঁড়া ঢাকনার সোফায় শুয়ে অকাতরে

ঘুমোচ্ছে মলয়। নেপালি কুলিটা আমার বাক্স-বিছানার ওপর বসে বিড়ি টানছে।

স্টেশনের দুই থাক নীচে মলয়ের বাসা। ছোট্ট কাঠের বাসাটি। ঘরে ঘরে চমৎকার দেয়াল জোড়া কাচের শার্সি লাগানো জানালা। নিটোল দাঁতের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দাঁত ব্যথায় আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মলয়ের বউকে সেই বহুকাল আগে ওদের রেজিস্ট্রি বিয়েতে সাক্ষী দিতে গিয়ে দেখেছিলাম। মুখটা মনে নেই। তার দিকেও ভাল করে তাকালাম না। ব্যথাহরা দুটো ট্যাবলেট একসঙ্গে খেয়ে বিছানা নিলাম। মেজদা, বিদায়। আমার প্রথম দাঁত তুমিই, যে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ। কিন্তু এই যে তুমি যাচ্ছ তার মানে হচ্ছে, শরীরের এক জায়গায় একটা নিখুঁত নকশার ভিতরে একটা খুঁত ঢুকে গেল।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠেই টের পেলাম মেজদা চুপ করে আছে। চারদিকে হিমযুগ। কম্বল মুড়ি দিয়ে উঠে বসলাম। বিছানার পাশেই একটা নিচু বেতের টেবিল, তাতে অনেক বই আর পত্রিকা ছড়ানো। একটা বছর তিনেকের বাচ্চা ছেলে কাগজপত্র ঘাঁটছিল। আমি উঠে বসতেই সে বলল—হ্যালো।

—হ্যালো। আমি বললাম।

বাচ্চাটা প্রচুর সোয়েটার, টুপি, গরম প্যান্ট, মোজায় ঝুব্বুস হয়ে আছে। চার চোখের কোলে কান্নার দাগ শুকিয়ে আছে, ফাটা গালে বসা ময়লা। বহুকাল বুঝি তাকে পরিষ্কার করানো বা স্নান করানো হয়নি। গায়ের গরম জামাগুলোও ভয়ঙ্কর নোংরা, যেন বহুকাল সেগুলো গা থেকে খোলা হয়নি। বাচ্চাটা হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়াতে আমি তার হাত ধরেই টের পাই হাতে চটচটে আঠা মতো কী যেন। বোধহয় লজেন্সের আঠা। ঘেন্না করল।

বাইরে একটা ছাইরঙা বিকেল। আকাশে মেঘ আছে কিনা ঠিক বুঝলাম না। শার্সি সব বন্ধ, তবু এমন শীত করছে যে মনে হয় প্রবল জ্বর এসেছে বুঝি। বেতের টেবিলটায় সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা রেখেছিলাম। দেখছি না। বাচ্চাটারই কাজ হবে।

নিচু হয়ে টেবিলের তলা থেকে শূন্য প্যাকেট আর অন্য ধারে কেবল রাংতায় মোড়া সিগারেট দেখতে পেয়ে তুলে আনলাম। দেশলাইটাও। বাচ্চাটা তাকিয়ে আছে। তাকে বললাম—তোমার মাকে চা দিতে বলো।

তক্ষুনি সে গুটগুট করে চলে গেল।

টেবিলে অত ম্যাগাজিন দেখে একটা তুলে নিয়ে দেখেই চমকে গেলাম। একটা ভয়ঙ্কর ধরনের ইলাস্ট্রেটেড ইংরিজি যৌন পত্রিকা। বাচ্চাটা এটাই উল্টোপাল্টে দেখছিল এতক্ষণ। নিরাবরণ এবং সুন্দরী মহিলাদের ছবি। কিছু মিথুন দৃশ্যের ফটোগ্রাফও আছে। সেটা রেখে অন্যগুলো একে একে তুলে দেখি, হয় যৌন না হয় তো ফিলমের ম্যাগাজিন সব। বেশির ভাগই ইংরিজি, দু-একটা বাংলাও আছে।

এই সামনের ঘরটাই মলয়ের স্টাডি-রুম বুঝতে পারছি। উঠে ঘুরে ঘুরে বুক-শেলফ দেখলাম। ওর বিষয় ছিল কেমিস্ট্রি, ডক্টরেটও করেছিল যতদূর জানি। এখন কেমিস্ট্রির বইয়ের ওপর ধুলোর আস্তরণ পড়েছে, মাকড়সা জাল বুনেছে।

বাচ্চাটা আবার গুটগুট করে হেঁটে এল ঘরে। নোংরা কিন্তু বড় সুন্দর মুখখানা তুলে বলল—আঙ্কল, মাদার ইজ নট হোম।

ওর ইংরিজি শুনে একটু থমকে গিয়ে বলি—হোয়াট অ্যাবাউট ইওর ফাদার?

সে অকপটে বলল—ড্রাঙ্ক। স্লিপিং।

বলি—ইজ নোবডি অ্যাবাউট?

সে বুঝতে পারল না। চেয়ে আছে। হেসে বাংলায় বলি—আর কেউ নেই?

সে মাথা নেড়ে বলে—ওনলি আয়া।

আমি বিনীত হয়ে বলি—টেল হার টু মেক টি।

সে চলে গেল। আমি বসে রইলাম। মেজদা চুপ করেছে বটে, কিন্তু তিনধারিয়ায় দু' টুকরো পাউরুটি আর এক কাপ তত-গরম-নয় চা ছাড়া দুপুরে আমি কিছু খাইনি। খিদে পেয়েছে। চা না হলে এখন হেড অফিসে ঘড়ি টিকটিক করবে। মেজদার যন্ত্রণার চেয়ে মাথার যন্ত্রণা কিছু কম নয়। ছত্রিশে আমি অনেক অভ্যাসের দাস। বিকেলের চা না হলে বিকেল পেরোলেই মাথা মেঘলা হয়ে যায়।

দার্জিলিঙে আমার কিছু দেখার নেই। বাইরে ছাইরঙা একটা বিকেল। সামনে অনেকখানি গড়িয়ে

নেমে গেছে শহর। ডান পাশে শহর উঠে গেছে বহু দূর। বর্ধমানের রাজবাড়ির নীল গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। সবই দেখা। খুব ছেলেবেলায় একবার বাগরাকোট হয়ে তিস্তার ওপর সেকালের অদ্ভুত করোনেশন সেতু হয়ে মিলিটারি জিপ-এ শিলিগুড়ি এসেছিলাম। সেখান থেকে বাবা দেখিয়ে দিয়েছিল—ওই হচ্ছে দার্জিলিং পাহাড়। সন্ধেবেলায় সেই পাহাড়ের গায়ে মালার মতো আলো জ্বলে উঠল। দেওয়ালির রাতের মতো তিনধারিয়ার সেই আলো দেখেছিলাম, এক আমার বয়সী মেয়ের সঙ্গে বসে। সে মেয়েটির সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি, কিন্তু মুখখানা মনে আছে, কী সুন্দর মুখ! পরদিন ফের করোনেশন ব্রিজ আর বাগরাকোট হয়ে ফিরে গিয়েছিলাম। দার্জিলিঙের পাহাড় বহুদূর রয়ে গিয়েছিল। বড় হয়ে আরও কয়েকবার দার্জিলিঙে বেড়িয়ে গেছি। দু'বার হোটেলে আর দু'বার এক খ্রিস্টান মিশানে থেকে গেছি। আশ্চর্য! তবু কেবলই মনে হয়েছে, শৈশবে শিলিগুড়ি থেকে দেখা দার্জিলিং পাহাড় আজও সেই একই দূর রয়ে গেছে। সেই দূরত্ব আজও অতিক্রম করা যায়নি।

গায়ের পোশাক এখনও খোলা হয়নি। পরনে প্যান্ট আর পুল-ওভার রয়ে গেছে। ওপরে কেবল একটা মাফলার নিয়ে চায়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার জানা দরকার, কেন আমি কোনওদিনই শিলিগুড়ি থেকে শৈশবে দেখা দার্জিলিং পাহাড় আজও পৌঁছোতে পারিনি।

শীতের জন্য প্যান্টের পকেটে দু'হাত ভরে মাথা নিচু করে হাঁটছি। চড়াই ভাঙতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। অভ্যাস নেই বলে দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তায় লোক চলাচল খুবই কম। দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলাম। সামনেই রাস্তাটা মোড় নিয়েছে। সেই মোড় পেরিয়ে হঠাৎ আড়াল থেকে একটা মেয়ে নেমে আসছিল। তার পরনে লম্বা কোট, কোটেরই সঙ্গে লাগানো ঘোমটার মাথা ঢাকা, হাতে বাজারের বাস্কেট। পিছনে পাহাড়ের নগ্ন লাল এবড়োখেবড়ো পটভূমি। মেয়েটা অন্যমনস্কভাবে হেঁটে আসতে আসতে হঠাৎ মুখ তুলে আমাকে দেখল। দেখেই একটু ম্লান হেসে বলল—কোথায় যাচ্ছেন?

বড় চমকে উঠি। চিনি না তো! অচেনা মহিলার দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করে বলি—এই যাচ্ছি একটু।

—বেড়াতে?

—হুঁ।

মহিলাটি আর কয়েক পা কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে—চা খেয়েছেন? আমার আয়াটি তো একদম হাবা, খাবারদাবারও নিশ্চয়ই কিছু দেয়নি? আমি সব সাজিয়ে রেখে গেছি, বলে গেছি যেন সাহেব উঠলেই দেয়। দেয়নি তো?

ও হোঃ! বুঝতে পেরে আমি হেসে ফেলি। এই তবে মলয়ের বউ? বলি—না। ভাবলাম একটু ঘুরে এসে খাব।

—তাই কি হয়? চলুন, খেয়েদেয়ে বেরোবেন। দাঁতের ব্যথা কমেনি।

—কমেছে।

মলয়ের বউ আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তার ঘোমটার চালচিত্রের ভিতরে পাশ-ফেরানো মুখখানিতে এই ছাইরঙা আলোতেও কয়েকটি খুঁত পরিষ্কার দেখতে পেলাম। আমার মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমি প্রায় সকলের মুখে এবং সর্বত্রই কিছু না কিছু খুঁত দেখতে পাই। আলটপকা দেখলে মলয়ের বউ দেখতে বেশ। যাকে ঢলঢলে মুখ বলা যায়, তাই। চোখ দুটিও খুব বড়। যার চোখ সুন্দর, তার মুখশ্রী যেমনই হোক, ওই চোখের জন্যই সে সুন্দর হয়ে ওঠে, এটা বরাবর দেখেছি। মলয়ের বউয়ের চোখ সুন্দর। কিন্তু তবু ওর খুঁতগুলো আমার চোখ এড়ায় না। যেমন—নাকটা লম্বা। নাকের হাড় এক জায়গায় ভাঙা। মুখে অজস্র ছিটে-তিল থাকার জন্য চামড়ার রং সব জায়গায় সমান নয়। ওর বাঁ ভ্রূ-তে একটা চুল অনেকখানি লম্বা হয়ে কপালে উঠে আছে। ওপরের পাটির দাঁত সামান্য উঁচু হওয়ায় ওর নাকের নীচের দিকের গড়নটা ভাল নয়।

মলয়ের বউ হাসিটা মুখে থাকতে থাকতেই বলে—কিছু কেনাকাটা করার ছিল, তাই বেরিয়েছিলাম। আপনার অসুবিধা হল।

—না, কিছু অসুবিধে হয়নি।

মলয়ের বউ একটা শ্বাস গোপন করল বলে মনে হল। বলল—সবই নিজের হাতে করতে হয়। সারাদিন তাই সময় পাই না। আমার হল শিবের সংসার।

ওর নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। ওদের রেজিস্ট্রি বিয়েতে সাক্ষী দিয়েছিলাম। সে বহুকাল হয়ে গেল। কী একটা মস্ত বড় নাম আছে মলয়ের বউয়ের শুচিস্মিতা বা মধুক্ষরা গোছের। কিন্তু মলয় ওকে বার বার একটা ডাকনামে ডাকছিল। ভারী মজার নামটি। এখন সেটা মনে পড়ছে না। নামটা অনেকটা টেঁকুর, হেঁচকি, হাঁচি বা ওইরকম গোছের কিছু। কিংবা ঘড়ি, কৌটো, চাবি বা চশমা গোছের কোনও নাম। যাই হোক, মনে পড়ছে না। নাম বড় ভুলে যাই।

আমাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে মলয়ের বউ ভিতরে গেল এবং তক্ষুনি ফিরে এসে বলল—ভিতরের ঘরে আসুন না, আপনার বন্ধু উঠেছে।

ভিতরের ঘরটার জানালার পাশেই দেয়ালের মতো পাহাড়ের লাল আর এবড়োখেবড়ো আড়াল। তাই এ ঘরে আলো আসে না। একটা হলুদ বালব জ্বলছে। এলেমেলো বিছানায় স্তূপাকার লেপ-কম্বল, সোয়েটার-কম্ফর্টার, দোমড়ানো বালিশ, হট-ওয়াটার ব্যাগ পড়ে আছে। খাটের রেলিংয়ে ঝুলছে প্যান্ট, শার্ট, শাড়ি, আন্ডারওয়ার, গেঞ্জি। আর সেই রাজ্যেব জিনিসের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে মলয়, মাথায় তিব্বতি টুপি, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে এখনও সেই ওভারকোট, প্যান্টও ছাড়েনি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে খুবই কাতরভাবে বসে আমার দিকে চেয়ে প্রথম কথা বলল—তলপেটে একটা ব্যথা ক্রনিক হয়ে গেছে, জানিস! বেশিদিন বাঁচব না। বলে লেপ, কাঁথা আর কম্বলগুলোকে অক্ষম হাতে টেনে টেনে বিছানায় আমার বসবার জায়গা করে দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল—বোস। টুকি বোধহয় চা-ফা দেবে। চা খাবি, নাকি একটু হুইস্কি?

টুকি! হ্যাঁ টুকিই তো মলয়ের বউয়ের নাম। মলয়কে বললাম—চা।

বাচ্চাটা ঘুরঘুর করে কী যেন খুঁজছে ঘবে। একটা বেঁটে আলমাবির ওপরটা দেখার জন্য টুল টেনে আনল শব্দ করে। তারপর একটা বেবি-কট-এব ভিতরে বিস্তর পরীক্ষার খাতার বান্ডিলের তলা দেখল হাটকে-মাটকে। খাটের তলায় উঁকি মারল। তারপব সোজা খাটে উঠে মলয়ের পায়ের ওপর চাপা বিশাল লেপটাব তলায় ঢুকে গেল গুঁড়ি মেরে।

মলয় তার অসহায় হাতে লেপের তলায় যেখানে বাচ্চাটা উঁচু হয়ে আছে, সেখানে একটা থাপ্পড় মেরে অত্যন্ত বিষ-গলায় বলল—গেট আউট, গেট আউট সোয়াইন।

বাচ্চাটা চমকাল না। লেপের তলায় সে তার খেলনা-পিয়ানো খুঁজে পেয়ে বের করে আনল। একবার কটাক্ষে বাবাকে দেখে গুটগুট করে ঘর থেকে চলে গেল। একটু পরেই তার পিয়ানোর শব্দ আসতে লাগল পাশের ঘর থেকে। কপালটা ডান হাতে টিপে ধরে মলয় বলে—ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

হট-ওয়াটার ব্যাগটা দেখলাম হিম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বহুকাল মলয়ের খবর রাখি না। লোকপরম্পরায় শুনেছিলাম ও চন্দননগর কলেজ থেকে টাকী, তারপর সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ, কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ হয়ে অবশেষে দার্জিলিঙে বদলি হয়ে এসেছে। মলয় কোনওদিনই চিঠিপত্র লেখা পছন্দ করে না, আমিও না। কেবল দার্জিলিঙে আসার দিন কুড়ি আগে ওকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, এবার শীতের বন্ধে ওরা দার্জিলিং-এ থাকবে কি না। ও মাত্র তিন লাইনে উত্তর দিল—ছুটিতে কোথাও যাই না। যাওয়ার জায়গা নেই। এখানে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, তিনবার ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খুব শীত। তবু আসতে চাইলে চলে আয়। আমি আছি।

ওর বড় ছেলে সম্পর্কে প্রশ্ন করতে দ্বিধা করছিলাম। ছেলেটাকে দেখছি না। বেঁচে আছে তো? বিয়ের কয়েক বছর পর ওদের ছেলে হয়েছিল, তার এখন প্রায় ছ' সাত বছর বয়স হওয়ার কথা।

বিছানাটা এত ঠাণ্ডা যে ভেজা-ভেজা লাগছে। নাকেব ভিতরে একটা তরল সর্দির জন্ম হল যেন কখন থেকে। গলার দু'ধারে ব্যথা। মেজদা একটা ঝলকানি দিয়ে ফের নিভে গেল। আর একটা গরমজলের ব্যাগ উঁকি মারছে লেপের তলা থেকে। সেটা টেনে এনে দেখি, ঠাণ্ডা। হাতে হাত ঘষে খুব হাল্কাভাবে বললাম—তোর বড় ছেলেটা কোথায়? দেখছি না!

—উঃ! বলে মুখ তোলে মলয়। একটা যন্ত্রণা চেপে রেখে বলে—হ্যাংওভারটাই সবচেয়ে বিশ্রী। তাই সারাদিন নেশা কাটলেই ভয় পাই। বড় ছেলে? তাকে কার্শিয়াঙে একটা বোর্ডিংয়ে দিয়েছে টুকি।

ছেলেটা খুব বদ হয়ে যাচ্ছিল। টুকির সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া হয় আজকাল। সেসব শুনে অনেক খারাপ কথা শিখে গিয়েছিল।

—তোদের ঝগড়া হয়?

—ভীষণ। মারপিটও হয়। বলে মলয় খুব অসহায়তা আর ক্লান্তিতে দেয়ালে মাথা হেলিয়ে দিল। বলল—আমার কলিগ-টলিগ কেউ আমার বাসায় আসে না। কলিগ কেন, কেউই আসে না। অনেকদিন বাদে তুই এলি। কিন্তু থাকতে পারবি না। এত অশান্তি যে কেউ থাকতে পারে না। তুই বিয়ে করিসনি?

—না।

—তা হলে করিস না।

শিবের সংসার কথাটা মিছে বলেনি টুকি। বছর দশেক আগে টুকি এই শিবের সংসারে আসে খুবই অদ্ভুতভাবে। তখন আমি নবীন পাল লেন-এর একটা বোর্ডিংয়ে থাকি। সারাদিন কাজকর্ম নেই, মাসের প্রথমে বাবা টাকা পাঠায়, বার তিনেক এম.এ. পরীক্ষার ফি জমা দিয়ে পরীক্ষা দিইনি, সকালে ব্যায়াম করে ডিমের পোচ খেতাম, রাতের শোয়ে হিন্দি সিনেমা দেখা হত প্রায়ই। সত্যিকারের কোনও কাজ ছিল না। একদিন উদ্‌ভ্রান্তভাবে দুপুরবেলায় মলয় এসে বলল—ইন্দ্রজিৎ, আজ আমি বিয়ে করেছি। কিন্তু খুব নার্ভাস লাগছে। একটা রিস্কি কাজ করতে পারবি?

মলয়ের কোনও একটা গ্রহের দোষ ছিল। তার প্রেম প্রায়ই পাকত না। নইলে ভাল ছাত্র, খুব দাপুটে ফুটবল আর ভলিবল খেলোয়াড়, চওড়া হাড় আর বড়সড় কাঠামোর মলয় উপেক্ষার পাত্র ছিল না। তবু আমরা জানি, বার চারেক হয়-হয় করেও মলয়ের প্রেম টেকেনি। তার প্রেমিকাদের বিয়ে করে নিয়ে যেত অন্য লোক। প্রতিবারই প্রেমিকার বিয়ের খবর পেয়ে মলয় চিৎকার করে বিশ্ববাসীকে জানিয়েছে যে সে এবার মদ খাবে, এবং খারাপ মেয়েদের পাড়ায় যাবে।

কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, মলয় নিজে থেকেই বহু পুরনো একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ বের করে দেখাল। চার বোন বসে আছে। প্রায় একই রকম চেহারা তাদের। বসা দুজন একটু মোটা, দাঁড়ানো দুজন কিছু রোগা। দাঁড়ানোদের একজনকে দেখিয়ে সে বলল—এই হচ্ছে টুকি। একসময়ে ও আমাকে রিফিউজ করেছিল। রিসেন্টলি খবর পাঠিয়েছে যে ও আমাকে এখন ভালবাসে। অবশ্য মাঝখানে বছর পাঁচ-ছয় দেখাশোনা হয়নি। চেহারাটা ঠিক এরকম আর নেই। এখন একটু বয়সের ছাপ পড়েছে। ফটোটা কীরকম দেখছিস?

বললাম—ভাল। বেশ ভাল।

মলয় খুশি হয়ে বলল—খবর পেয়ে দেখা করতে গিয়ে প্রথমেই বলে ফেললাম—দেখ, আমার বুক হাফসোল আর হাফসোল-এ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। এখন আর সিওর না হয়ে কিছু করতে চাই না। আই ওয়ান্ট ম্যারেজ ফার্স্ট। এসব শুনে ও রাজি হয়ে গেল। এই আমার প্রথম সাকসেস, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ওর বাড়ির লোকেরা রাজি নয়। ভয়ঙ্কর ঝামেলা করছে। ও কোথাও একা বেরোতে পারে না, সবসময়ে ভাইয়েরা পাহারা দেয়, মা-পিসি বা ওইরকম সব বয়স্ক আত্মীয়রা বাড়ির চারধারে নজর রাখছে। স্বজাত-স্বঘর। কোনও বাধা নেই, তবু দেবে না। কারণ, ওই টুকির রোজগারেই সংসার চলে। চাকরি-করা মেয়ে তো, তাই ছাড়তে চায় না। একমাত্র ওর বুড়ো বাবা রাজি, কিন্তু তাঁর মতের কোনও দাম নেই। প্যারালাইসিস হয়ে এক বছর পড়ে আছে বিছানায়। তাই ঠিক হয়েছে আমরা পালিয়ে বিয়ে করব। আজ বিকেল চারটেয় আমি ট্যাক্সি নিয়ে যাব, ওর বাড়ির উল্টোদিকে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে তিনবার হর্ন দেব। ও ছুটে বেরিয়ে এসে উঠে পড়বে। কেউ বাধা দিতে এলে দরকার মতো ঘুষিফুষিও চালাতে হতে পারে। রেজিস্ট্রার খাতা খুলে বসে থাকবে, আমরা ট্যাক্সি করে গেলেই বিয়ে দিয়ে দেবে। কিন্তু আজ সকাল থেকেই আমার নার্ভাস ডায়েরিয়া। হাত-পা অবশ লাগছে নার্ভাসনেসে। কয়েক গ্যালন জল খেয়েছি সকাল থেকে। বুদ্ধি ঠিক রাখতে পারছি না। এতকাল পর প্রথম সাকসেস, বিশ্বাস হচ্ছে না। ওদিকে টুকি এতক্ষণ তৈরি হয়ে বসে আছে, কিন্তু আমি কিছুতেই যেতে পারব না, গেলে আসল সময়ে ঠিক হাগা-টাগা পেয়ে যাবে। আমার বন্ধুদের মধ্যে তুই-ই সবচেয়ে মারকুট্টা আর স্মার্ট আছিস। তুই যা।

কথাটা ডাহা মিথ্যে। আমি কোনওকালে স্মার্ট ও মারকুট্টা ছিলাম না। তবু সেই উদ্দেশ্যমূলক প্রশংসা শুনেও খানিকটা গরম হয়েছিলাম। একটু গাঁই-মাই করে আমি রাজি হই। যদিও খুবই নার্ভাস লাগছিল,

তবু নিষ্কর্মা জীবনে একটা অ্যাডভেঞ্চার তো এল। পাইকপাড়ায় টুকিদের বাড়ির সামনে পৌনে চারটেয় ট্যাক্সি থামিয়ে তিনবার হর্ন দিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা সাদা দোতলা বাড়ি থেকে স্যুটকেস হাতে অচেনা একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। তার পিছনে পিছনে বুড়ি ছুঁড়ি আর ছোকরা-গোছের জনা পাঁচ-সাত মিলে খেউ-খেউ করতে করতে আসছিল। বুড়িদের দুজন তার হাত টেনে ধরবার চেষ্টা করল। তারা কাই-মাই করে কী বলছিল তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু টুকি খুব মহীয়সীর মতো গম্ভীর মুখে, দৃঢ়তার সঙ্গে ট্যাক্সির কাছে চলে এল। আমি দরজা খুলে ধরলাম। আমার চোখে রোদ-চশমা, নাকের নীচে মোটা গোঁফ, সিঁথি কাটা চুল—অর্থাৎ আমি মলয় নই। টুকি ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়ে থমকে বলল—আপনি?

আমি চাপা গলায় বললাম—আমি মলয়ের বন্ধু। উঠে পড়ুন।

টুকির থমকটা তখনও যায়নি, বলল—ও কোথায়?

—আমার বোর্ডিংয়ে। নার্ভাস ফিল করছে বলে আসেনি।

টুকি তবু ইতস্তত করে। ততক্ষণে তার পুরো পরিবার এসে ট্যাক্সি ঘিরে ফেলে বেদম চেঁচাচ্ছে। তাদের মেয়ে নাকি দিন-দুপুরে চুরি হয়ে যাচ্ছে, শিগগির কে কোথায় আছ এসো গো। মেয়ে গুম হয়ে গেল যে। তাই শুনে রাস্তায় লোক জমে গেছে, পাড়ার বাড়িঘরের দরজা-জানালা-বারান্দা লোকে ভরে যাচ্ছে। তার ওপর টুকি আমাকে চিনতে পারছে না। আর ট্যাক্সিওয়ালা তখন বার বার আমাকে ধমকাচ্ছে, হাঙ্গামা না করে আমি যেন ট্যাক্সিটা এখনি ছেড়ে দিই। কয়েকটা পাড়ার ছেলে, কিংবা টুকির ভাই-টাই কেউ হবে, পটাপট রাস্তা থেকে ঢিল কুড়িয়ে ট্যাক্সির দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল। লক্ষ্য স্থির না থাকায় টুকির আত্মীয়-স্বজনদের গায়ে ঢিল এসে পড়তেই একটা তুমুল চেঁচামেচি। আমি তীব্রগলায় টুকিকে ধমক দিয়ে বললাম—উঠে পড়ুন।

টুকি কিছুটা ঢিলের ভয়ে, কিছুটা বোধহয় আত্মসম্মান রক্ষার জন্য উঠে পড়ল। ট্যাক্সিওয়ালা জান-এর ভয়ে জোর চালিয়েছিল গাড়ি। অনেক দূর পর্যন্ত পিছন থেকে ঢিল এসে পড়েছিল, খেউ-খেউ চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসছিল টুকির স্বজনরা।

আমার সেই বীরত্বের কাহিনী দীর্ঘকাল বন্ধু এবং পরিচিত মহলে প্রচারিত হয়েছে। এরপর আরও কয়েকবার অনুরূপ কাজের জন্য দু-চারজন বন্ধু বা চেনা মানুষ আমাকে হায়ার করতে এসেছে। আমি রাজি হইনি।

দুটো ঠাণ্ডা হট-ওয়াটার ব্যাগ কোলে নিয়ে বসে আছি। কিছু করার নেই। লেপের তলা থেকে আর একটা ব্যাগ বের করে দিয়ে মলয় বলল—দ্যাখ তো, এটা বোধহয় এখনও একটু গরম আছে।

ধরে দেখি, গরম নেই, তবে গায়ের ভাপে লেপ-চাপা থাকায় একটু উষ্ণ ভাব। ভেজা শীত গায়ের তাপ শুষে নিচ্ছে। কোথাও একটু গরম নেই। হাতে হাত ঘষি। মলয় আঙুল দিয়ে চোখের পাতা টেনে খুলে চারদিকে তাকিয়ে বলল—টুকি কি বেরিয়ে গেল?

আমি বললাম—না।

ভিতরের ঘর থেকে কাপ-প্লেটের আওয়াজ পাচ্ছি। টুকি তার বাচ্চাকে ধমকাল—কেন তুমি রেকর্ড প্লেয়ারের ওপর বসেছিলে? ওটা কি নাগরদোলা? জানোয়ার কোথাকার, যাও, চলে যাও এখান থেকে!

কথার সঙ্গে সঙ্গে চড়-চাপড়ের শব্দ হয়। বাচ্চাটা কাঁদে না, কিন্তু গুট গুট করে এ ঘরে চলে আসে। তাকে দেখেই মলয় হুমকি দিয়ে ওঠে—এই, গেটাউট, গেটাউট।

বাচ্চাটা ফের ভিতরের ঘরে চলে যায়। তার মুখে কোনও ভাবান্তর দেখতে পেলাম না। খুবই নির্বিকার মুখ।

টুকি আর তার বুড়ি নেপালি আয়া যখন ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, টুকির পায়ের দিকে তাকিয়ে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মেয়েদের পায়ে মোজা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। তার ওপর টুকি একটা সাদা রঙের মোটা উলের মোজা পরেছে।

কেক, প্যাটিস, মিষ্টি—সবই দোকানের কেনা খাবার। চা-টা দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি তাই আগে এক কাপ চা হুড়হুড় করে মিকশ্চারের মতো গিলে ফেললাম।

একদম ভাল লাগছিল না। বাইরে ছাইরঙা বিকেলটা মরে পোড়া কয়লার মতো হয়ে এল। টুকির মুখে একটা বিরক্তি আর গোপন রোগের অবসাদ ফুটে আছে। মলয় এখনও নিজে থেকে চোখ খুলতে

পারছে না। আঙুল দিয়ে চোখের পাতা টেনে এক হাতে হাতড়ে হাতড়ে চায়ের কাপটা তুলে নিতেই স্পষ্ট দেখা গেল ওর হাত কাঁপছে, চায়ের কাপ-প্লেটে একটা থরথরানির শব্দ। ওদের বাচ্চাটা একমুঠো কেক দলা পাকিয়ে ইলেকট্রিক বালবের দিকে ছুঁড়ে মারল। কেউ গ্রাহ্য করল না।

২

সকালে ফের বৃষ্টি পড়ছে। কী ভয়ঙ্কর শীত! কেবলই মনে হয় শরীর ভরে বুঝি জ্বর আসছে। হাত-পা অবশ লাগে, বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

একটু বেলা হতেই, আটটা নাগাদ আকাশের মেঘ কেটে গেল। মলয় তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। টুকি তার বাচ্চাকে বাথরুমে নিয়ে গেছে। আমি পোশাক পরে বেরিয়ে আসি।

মেঘ কেটে যেতে শীতটা আরও ক্ষুরের ধারের মতো চনচনে হয়েছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা। আমি ম্যাল পার হয়ে খুব আস্তে আস্তে অবজারভেটরির দিকে উঠতে থাকি। উইনডামেয়ার হোটেলের প্রকাণ্ড রঙিন ছাতাগুলো আজও লাগানো হয়েছে। ছাতার তলায় চেয়ার টেবিল, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। হোটেল পার হয়ে একটু উঠতেই ডানদিকে কয়েকটা হানিমুন কটেজ। সেগুলো নিঃঝুম, শূন্য। সবাই চলে গেছে।

মহাকাল মন্দিরে উঠেও উত্তর দিকে কিছু দেখা গেল না। মেঘে ঢাকা। অনেক নীচে কেবল রেসকোর্সটা দেখা যাচ্ছে, ভেজা, শূন্য। দু-একটা পায়রা পাখা ঝাপটায় আশেপাশে। চারধারে মন্ত্র লেখা নিশানগুলি উড়ছে ফিস-ফিস করে। বহুকাল আগে কুচবিহার মিশনারি স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পরীক্ষা ভাল দিইনি, তাই মহাকালের কাছে মানসিক করেছিল মা, আমি পাশ করলে মহাকালে পায়রা উৎসর্গ করবে। আমি পাশ করে গেলাম, পায়রা দুটো অবশ্য দীর্ঘকাল দেওয়া হয়নি। কয়েক বছব বাদে আমার ধর্মভীরু মায়ের তাগাদায় এখানে এসে পায়রা উড়িয়ে দিয়ে যাই। উৎসর্গ করা শ'য়ে শ'য়ে পায়রা আজও আছে। জানি না, আমার-ছাড়া পায়রা দুটো আজও আছে কি না, থাকার কথা নয়। ওরা বেশিদিন বাঁচে না। তবু পায়রার ডানার শব্দ চারদিকে একটা বিস্মৃতির পরত ভেঙে ফেলতে থাকে।

আমার এটাই মুশকিল। মনে পড়ে, বড় বেশি মনে পড়ে। কীভাবে সুখী মানুষ হওয়া যায় এই বিষয়ে কিছু বিদেশি বই আমি প্রায়ই পড়ি। অতীতের প্রতি বেশি ভালবাসা, অতিরিক্ত শৈশবস্মৃতি মানুষকে বর্তমানের প্রতি নিস্পৃহ, উদাসীন করে তোলে। অসুখী করে।

রেলিংয়ের ওপর একটা পায়রা ঘাড়ে মুখ ডুবিয়ে রোদে বসে আছে। আস্তে তার পিঠ ছুঁই। সে একটু সরে বসে। উড়ে যায় না। আমার সেই পায়রা দুটো নিশ্চিত তাদের সন্তানসন্ততি রেখে গেছে। এটা হয়তো তাদেরই নাতিপুতি কেউ হবে। এই ভেবে তাকে আর একটু আদর করি। লোমের ভিতরে আঙুল ডোবাতেই পায়রার নরম হাড় আর উষ্ণতা আঙুলে লেগে যায়। সেই স্পর্শটা অনেকক্ষণ হাতে লেগে থাকে। মহাকালে পায়রা ওড়ানোর কথা ভুলতে পারি না। অসুখী হওয়াই আমার নিয়তি।

ফেরার পথে ম্যাল-এ কিছু লোকজন দেখা গেল। উত্তরে এখনও মেঘ জমে আছে। জলাপাহাড়ের তলায় গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে এক চাপ কুয়াশা। তবু ম্যাল-এ রোদ পড়েছে। লোকজনের মধ্যে আমি বেশ কয়েকজন বাঙালি চেহারার যুবতীকে দেখতে পাই। প্রচুর গরমজামায় তাদের যৌবনোচিত জিনিসগুলি ঢাকা, ফলে হোল্ডঅলে বাঁধা বিছানার মতো দেখাচ্ছে। শুধু মুখশ্রীর প্রতিই আমার আকর্ষণ বেশি। কাজেই একটা আধভেজা, ঠাণ্ডা বেঞ্চে বসে আমি সিগারেট ধরিয়ে ফেলি। মেজদা খুব ক্ষীণভাবে জানান দিচ্ছে যে সে এখনও হাল ছাড়েনি।

সবচেয়ে সাহসী যে মহিলাকে দেখছি, তার পরনে একটা টমেটো রঙের নাইলনের শাড়ি, আর একটামাত্র হাফকোট রয়েছে গায়ে। তার হাতে দস্তানা বা পায়ে মোজাও নেই। একটু মোটাসোটা ও ফর্সা মহিলাটি একটা টাট্টু ঘোড়ার ওপর একটা বাচ্চা ছেলেকে বসে থাকতে সাহায্য করছে। উল্টোদিক থেকে সহিসও অবশ্য ধরে আছে ছেলেটিকে। ঘোড়াটি নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে পাহাড় ও প্রকৃতি দেখছে। মহিলার খাটো ব্লাউজের নীচে কিছুটা পেট এবং আদুড় গলা ও মোজাহীন পা দেখে আমার নিজেরই শীত করছিল। মেয়েরা পারেও।

বন্ধুগণ, মাঝে-মধ্যে হঠাৎ পুরনো প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা কি একটা 'ক্লিশে'? অর্থাৎ পুরনো কায়দা? কিন্তু ভাইসব, আমার জীবনে এরকম সব ঘটনাই ঘটে—যা শুনলে হঠাৎ খুব চটকদার মনে হয়, অথচ আসলে কিছু নয়।

এই যেমন ওই ফর্সা মোটা মহিলাকে কয়েকবারই আমার চেনা-চেনা মনে হল। মাথার ঘোমটাটি কাঁধের ওপর খসে পড়তেই আমার মনের ভিতর এক বিচক্ষণ ইন্দ্রজিৎ বলে উঠল—ভাগ্যিস, মিতুনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি ইন্দ্রজিৎ।

ঠিকই। আমি ভাগ্যবান। নইলে ওই মোটা, বয়স্কা ও ভয়ঙ্কর রকমের বহির্মুখী চেহারার মহিলাটি আজ আমার বউ হত। আজ এই ম্যালের ঠাণ্ডা বেঞ্চে শীত-কাতর ছত্রিশ বছর বয়সী সে ইন্দ্রজিৎ বসে আছে, সে তত বোকা নয়। কিন্তু পিছু ফিরে তাকালে সেই ইউনিভার্সিটির আমলের যে ইন্দ্রজিৎকে আবছা দেখা যায় সে বড় বোকা ছিল। তার ভবিষ্যৎদৃষ্টি ছিল না। শীতে কেঁপে উঠে আমি ইন্দ্রজিতের ভাগ্যকে সাধুবাদ দিলাম।

বন্ধুগণ, ওই মহিলাটি আমার পুরনো প্রেমিকা। আমার না বলে বলা ভাল, ইন্দ্রজিতের। কারণ, নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এই যে আজকের আমি ইন্দ্রজিৎ, এর প্রেমিকা কিছুতেই ওই মিতুন নয়। মিতুন যার প্রেমিকা ছিল সে অন্য ইন্দ্রজিৎ। অবশ্য সে মিতুনও আলাদা।

সেই বোকা ইন্দ্রজিতের একটা প্রেম হয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময়। তখন অবশ্য ইন্দ্রজিৎ খুব বেশি প্রেমে পড়ত। সেটাই ছিল তার হবি। কিন্তু সে কখনওই মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সাহস পেত না। কিন্তু খুব অসহায়ভাবে, নিয়তির নির্দেশের মতো একা একা প্রেমে পড়ে যেত। যেমন সেই জয়া ঘোষ নামে মেয়েটি, রোল নাম্বার ফোরটিন। এম-এ ক্লাশের প্রথম ছ' মাস সে জয়া ঘোষের দিকে তাকিয়ে থেকে ক্লাস নষ্ট করেছে। শুধু অপলক তাকিয়ে থাকলে যে-কোনও মেয়েই সেটা টের পায়। না পাওয়াই আশ্চর্য, জয়া ঘোষও পেয়েছিল। প্রথম একমাস খানেক জয়া ইন্দ্রজিতের দিকে চোখ পড়লেই চোখ সরিয়ে নিত, খুব বিরক্তির ভাব দেখাত, কখনও কখনও লজ্জার ভাবও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়া ঘোষও চশমার ভিতর দিয়ে একটু ট্যারা চোখে ইন্দ্রজিৎকে দেখত। দুজনেরই ক্লাশ নষ্ট হত। কিন্তু ছ' মাসের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ জয়ার সঙ্গে কথাই বলতে পারল না। দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে সে জয়ার কথা খুব আন্তরিকভাবে বলে ফেলেছিল। তা শুনে সুবোধ, বিভূতি, মিহির সবাই অবাক। বলল—তা কথা-টথা বল। ঝুলিয়ে রেখে লাভ কী? ইন্দ্রজিৎ খুব ভয় পেয়ে বলল—ও বাবা, সে আমি পারব না।

শ্রীগোপাল মল্লিক লেন-এর ভিতর হানাবাড়ির মতো একটা বাড়িতে ছিল ইউনিভার্সিটির একটা আর্টস হোস্টেল। তার নীচের তলার ড্যাম্প লাগা অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জাগ্রত অবস্থার বারো আনা সময় সে জয়ার চিন্তা করেছে। উঁহু জয়ার সঙ্গে খুব সাদামাটা ভাবে তার আলাপ হবে না। আগে একটা ভুল বোঝাবুঝি হবে, একটা রাগারাগি হবে, জয়া তাকে খুব অপমান করবে, এবং তারপর জয়া ইন্দ্রজিতের মহত্ত্ব বুঝতে পেরে অভিমান আর আত্মগ্লানিতে চোখে জল আর বুকভরা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে একদিন সামনে এসে মাথা নত করে দাঁড়াবে। কিন্তু নাটক সেইখানেই শেষ হবে না, মাঝখানে আরও কিছু আবেগপ্রবণ ঘটনা ঘটবে। ইন্দ্রজিৎ কি সহজে ধরা দেবে জয়ার কাছে!

এসব ভাবত ইন্দ্রজিৎ, সময়টা ভারী চমৎকার কেটে যেত। সেই ষোলো-সতেরো বছর আগেও সিনেমায় বা সস্তা নভেলে এরকম সব গল্প থাকত। আর ইন্দ্রজিৎ ঠিক এরকমই সব গল্পের রোমান্স দিয়ে জয়া আর তার প্রেমের গল্প তৈরি করত মনে মনে। ক্লাশে নোট নিত না, হোস্টেলেও কদাচিৎ বইপত্র ছুঁত।

একবার সেমিনারে জয়া ঘোষ ঠিক ইন্দ্রজিতের পাশে এসে বসল। বোধহয় ইচ্ছে করেই। চোখ দিয়ে ইন্দ্রজিৎ তাকে অনেক জ্বালিয়েছে, এবার সে বোধহয় চোখের খেলাকে একটা কার্যকরী চেহারায় দাঁড় করাতে চাইছিল। দু'জনেই নার্ভাস, জয়া কিছু কম।

সেমিনারে একজন নামজাদা, কবি-অধ্যাপক বাংলা অনুবাদের সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। জয়া ঘোষ হঠাৎ বলল, আপনি তো নোট নিচ্ছেন না, কলমটা একটু দেবেন? আমার কলমটায় কালি ফুরিয়ে গেছে।

খুব ভুল করেছিল জয়া। তার কলমের কালি ফুরোল কি না কে জানে, কিন্তু ইন্দ্রজিতের বুক থেকে

প্রেমটুকু সেইক্ষণে পদ্মপাতার জলের মতো ফুরিয়ে গেল। খুব কাছ থেকে জয়ার দিকে তাকাতেই সে জয়ার কয়েকটা ভীষণ খুঁত দেখতে পেল। যেমন, জয়ার ওপরের ঠোঁটের লোম কিছু বড়, নাকের দু'ধারে রেখা গভীর, ভ্রূতে চুল প্রায় নেই, মুখের চামড়া খসখসে, কথা বলার সময়ে জয়ার দাঁত দেখা যাচ্ছিল, ফোলা মাড়ি এবং দাঁতে হলদে রং।

ইন্দ্রজিৎ কলমটা দিল, যথাসময়ে ফেরতও পেল ধন্যবাদ সহ। জয়া বলল—মাথা ধরেছে, একটু চা খেলে হত।

স্পষ্ট নিমন্ত্রণ, আহ্বান। ইন্দ্রজিৎ চুপ করে রইল খুবই রূঢ়ভাবে। পরদিন থেকে জয়ার দিকে আর কখনও তাকায়নি। সময়টা একদম ভ্যাকুয়াম হয়ে গেল।

ইন্দ্রজিৎ প্রেম ছাড়া থাকতেই পারত না। জয়া ঘোষের প্রতি অপছন্দ এসে যাওয়ার পর সাতদিন খুব খারাপ কাটে। তারপরই সে ঐন্দ্রিলা মুখার্জির প্রেমে পড়ে। ঐন্দ্রিলা অন্য সেকশানের মেয়ে, সুন্দরীই বলা যায়, তবে কিছু মোটাসোটা। ক্লাশে বসে তার দিকে তাকানোর প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সে অন্য সেকশনে পড়ে। ইন্দ্রজিৎ তাই অফ পিরিয়াড বা দুই পিরিয়ডের মাঝখানের লঘু সময়টুকুতে 'বি' সেকশনের সামনে পায়চারি করত। কিন্তু ঐন্দ্রিলার বোধহয় অনুভূতি খুব প্রখর ছিল না। সে বুঝতেই পারল না যে ইন্দ্রজিৎ তার জন্যই ক্লাশের সামনে ওরকম পায়চারি করে। ইন্দ্রজিতের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে সে নোট নিত, পাশের মেয়ের সঙ্গে গল্প করত, করিডোর দিয়ে হেঁটে যাতায়াতের সময়েও ইন্দ্রজিৎকে দেখে তার কোনও ভাবান্তর হত না। যেন সে গোরু,গাছ, দেওয়াল বা বৃষ্টি দেখছে এমনভাবেই কখনও-সখনও সকলের সঙ্গে ইন্দ্রজিৎকেও দেখেছে। সেটা দেখা নয়। এবং সিক্সথ ইয়ারে উঠতে না উঠতেই ঐন্দ্রিলার বিয়েও হয়ে গেল। সামারের পর সে এক সিঁথি ভর্তি সিঁদুর নিয়ে ক্লাশে এল।

সিক্সথ ইয়ারে উঠেও সেই বোকা ইন্দ্রজিৎ তখনও কোনও মেয়ের সঙ্গেই মুখোমুখি আলাপ করতে পারেনি। সেই জন্য তার ভারী দুঃখ হত। করিডোরে ছেলেরা মেয়েরা কেমন পরস্পরকে নাম ধরে ডাকাডাকি করে। মাধুরী কেমন অধীরকে ডেকে একদিন বলল—তোর সিগারেটটা দে তো, দু টান খাই। অধীর তার এঁটো জ্বলন্ত সিগারেট দিল, মাধুরীও খেল। তার ওরকম সব হয় না, অবশ্য এরকম সাদামাটা জলের মতো মেলামেশা পছন্দও করত না ইন্দ্রজিৎ। তার ধারণা ছিল, মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্কে হবে রহস্যময়, তীব্র আবেগ ও অভিমানপূর্ণ, স্পর্শকাতর, সে নিজে থেকে কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবে না, বরং কোনও মেয়ে যদি কখনও খুব অদ্ভুত কোনও পরিস্থিতি তৈরি করে তার কাছে আসে তো আসুক। সে অপেক্ষা করত, অপেক্ষা করতে ভালবাসত। একদিন তাদের টিউটোরিয়াল গ্রুপের দিদিমণি টাইপের বয়স্কা মহিলা নেলী রায় তার পাশেই বসে বলল—আগের দিন আসিনি, কী নোট দিয়েছে একটু দেখাবেন? ভয়ঙ্কর বিতৃষ্ণায় মুখ সরিয়ে নিয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। এরকম দু-চারজন আকর্ষণহীনা তার সঙ্গে কথা বলেছিল। কত যুবতী চারদিকে, তবু ইন্দ্রজিতের প্রতি কেউই কৌতূহলী নয় কেন? না কি আছে কেউ। ইন্দ্রজিৎ হয়তো টের পাচ্ছে না। আড়াল থেকে কেউ হয়তো দেখছে ইন্দ্রজিৎকে, লক্ষ রাখছে। যেমন তুষারক্ষেত্রে ধীরে ধীরে গভীর হ্রদের জন্ম হয়, তারপর একদিন সেই উৎস থেকে উৎসারিত স্রোত ধেয়ে যায় সমুদ্রের দিকে, তেমনি সেই আড়ালের যুবতীটির বুকে গোপনে তৈরি হচ্ছে সেই হ্রদ। চারদিকে লক্ষ রাখত ইন্দ্রজিৎ, কে তাকে দেখছে, কে-ই বা তার দিকে তাকিয়েই পলকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছে ধরা পড়ার লজ্জায়। তেমন কাউকে ধরতে পারেনি ইন্দ্রজিৎ, দু'চারজনকে কেবল সন্দেহ হয়েছিল।

কিন্তু মুশকিল এই যে, একমাত্র ক্লাশ ছাড়া অন্য কোথাও মেয়েদের খুব কাছাকাছি পাওয়া ইন্দ্রজিতের ভাগ্যে ঘটত না। কিন্তু এম.এ. ক্লাশে সে আমলে সুন্দরী মেয়ের রীতিমতো আকাল ছিল। সুন্দরীরা স্কুলের পরই প্রেম এবং বিবাহের রন্ধ্রপথে খসে যেতে শুরু করে। আই.এ. বা বি.এ. ক্লাশের পর ঝাড়াই বাছাই হয়ে অবশিষ্ট থাকে খুবই কম। নিতান্তই দু'-তিনজন এসে এম.এ. ক্লাশে পৌঁছোয় বটে, কিন্তু ততদিনে তারা খুবই বিচক্ষণ হয়ে ওঠে, আবেগ-প্রবণতা প্রায়ই থাকে না। তার ওপর তাদের স্তাবকসংখ্যাও এত বেশি যে সেই স্তাবকদের দেয়াল ভেদ করে ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ করা খুবই কষ্টকর ছিল তাদের পক্ষে। মুখচোরা, লাজুক এবং তত সুন্দর নয় ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ করবেই বা কেন তারা? তবু

ইন্দ্রজিৎ অপেক্ষা করত, অপেক্ষা করতে ভালবাসত।

ওই যে ম্যাল-এর ক্ষীণ রোদে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে একটা বাচ্চা ছেলেকে বসিয়ে ধরে আছে, কে বিশ্বাস করবে এখন যে ওই মিতুন ছিল সেই মুষ্টিমেয় সুন্দরীদের একজন, যারা প্রেম এবং বিবাহের অনেক বিপজ্জনক খানাখন্দ পেরিয়ে এম-এ. ক্লাশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আর সেই পিপাসার্ত এবং রোমান্টিক ইন্দ্রজিৎ এই আমি কেমন নিরাসক্তভাবে দৃশ্যটা দেখছি। বিয়ের বহু বছর পর যেমন স্বামী তার স্ত্রীর দিকে নিরাসক্তভাবে তাকায় আমার দৃষ্টিও সেইরকমই। তদুপরি আমি ভাগ্যবান এই কারণে যে, আমার সঙ্গে মিতুনের শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। সেই ইন্দ্রজিৎ যে আমিই ছিলাম, সেটা ভাবতে পর্যন্ত কষ্ট হয়। আর সেই কষ্ট এমনই বেদনাদায়ক যে মেজদা পর্যন্ত তাতে সায় দিয়ে কয়েকবার চমকে উঠল।

বন্ধুগণ, আমার বিশ্বাস মানুষের জীবনে ইচ্ছাপূরণের ঘটনা এক-আধবার ঘটে। যেন তখন সমস্ত পৃথিবীকে উপেক্ষা করে ঈশ্বর অলক্ষ্যে তার কাছেই এসে দাঁড়ান। তখন মানুষের মনে যে প্রার্থনা থাকে তা পূরণ করে দিয়ে চলে যান। সেই শুভক্ষণটাকে অবশ্য মানুষ ঠিক চিনতে পারে না। সে হয়তো তখন ভাবছে—ইস, কাল যে অফিসে ছাতাটা ফেলে এলাম, সেটা কি আর পাওয়া যাবে? পাওয়া যায়, এবং শেষ পর্যন্ত কেবল ছাতাটাই সে পায়। ঈশ্বর আর কিছু দিতে পারেন না, দেওয়ার অসীম ক্ষমতা থাকলেও। আমি একটি মেয়েকে জানি, একবার চাঁইবাসায় নিরালা দুপুরে ঘুম থেকে উঠে একটা ঘুঘুর করুণ ডাক শুনে তার মনে হয়েছিল—ইস, এখন যদি হেমন্তর সেই গানটা হত। ভাবতে ভাবতেই সে অন্যমনে ট্রানজিস্টার ছাড়তেই—আশ্চর্য—হেমন্তর সেই গানটাই বেজে উঠল। মেয়েটা এত অবাক যে, দীর্ঘকাল ব্যাপারটা ভুলতে পারেনি। আমি ঘটনাটা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। সে কী হারিয়েছিল তা সে জানত না।

ভাইসব, তা আমার জীবনেও, আমি টের পাই, সেই শুভক্ষণ এসেছিল এবং চলে গেছে, সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়েই, সিক্সথ ইয়ারে। আমি না বলে ইন্দ্রজিৎ বলাই ভাল। তখনকার ইন্দ্রজিৎ এখনকার আমার মতো সেয়ানা ছিল না। ইন্দ্রজিৎ জানত না কখন ঈশ্বর এসে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে তাকে বলে গেছেন—তথাস্তু।

তাই ইন্দ্রজিৎ যেমন চেয়েছিল তেমনই ঘটনা ঘটল একদিন। স্পেশাল পেপারের ক্লাশ করে সে যখন ফিরছিল, তখন করিডোরে জানালার ধারে দাঁড়ানো দুটি মেয়ে তাকে দেখে ফিস ফিস করে কী বলাবলি করল, তারপর উদ্দেশ্যমূলকভাবে হেসে উঠল। ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে তাকাতেই তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, এবং মুখ ফিরিয়েও তারা আঁচল চাপা দিয়ে হেসেছিল আরও খানিকক্ষণ। তাদের মধ্যে একজন ছিল ওই মিতুন। কী সুন্দর দেখতে ছিল মিতুন। টানা টানা চোখ, ফর্সা গা, লম্বাটে মুখ, ক্লাশে সে-ই বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর ছিল।

ইন্দ্রজিতের বরাবরই এক দোষ। মান-অপমান রাগ-বিরাগ সবই তার হয় কিছু দেরিতে, ঘটনা ঘটে যাওয়ার অনেক পর। কেউ তাকে অপমান করল কি না, বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য দেখাল কি না এটা বুঝতে তার সময় লাগে। অনেক ভেবে, এবং ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে যখন সে বুঝতে পারে যে এটা তাকে অপমান করা হয়েছে বা উপেক্ষা করা হয়েছে তখন সে একা একা রেগে ওঠে বা লজ্জাবোধ করতে থাকে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যায়, কিছুই করার থাকে না। তখন ইন্দ্রজিৎ একা একা মনে মনে প্রচণ্ড রাগ-অভিমানকে হজম করতে থাকে। এবং এইভাবেই তার একটা ক্রনিক অম্বলের অসুখের সৃষ্টি হয়েছিল। ভাইসব, তা বলে মনে করবেন না যে ইন্দ্রজিতের স্পর্শকাতরতা কিছু কম ছিল। মোটেই তা নয়, বন্ধুগণ। তবে ঘটনার মুহূর্তে ইন্দ্রজিৎ সব সময়েই কিছু দিশাহারা হয়ে যেত। কী করা উচিত বা কী বলা উচিত তা সে ঠিক করতে পারত না। তার রিফ্লেক্স ছিল কিছু বিলম্বিত, প্রতিক্রিয়া হত দেরিতে। আজও হয়।

সে রাতে ইন্দ্রজিতের ঘুম হয়নি। পরদিন সে ইউনিয়নের সেক্রেটারি এবং তার বন্ধু নেপালের কাছে গিয়ে হাজির। ভোটের জন্য নেপাল প্রায় সব ছেলে এবং মেয়েকে চিনত, খাতিরও রাখত। ইন্দ্রজিৎ তাকে গিয়ে বলল—একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে নেপাল। আমি খুব ইনসাল্ট ফিল করছি। কাল আমাকে দেখে মিতুন চৌধুরী আর মোহিনী রায় হেসেছে। আই ওয়ান্ট অ্যান এক্সপ্ল্যানেশন।

নেপাল তেমন উত্তেজিত হল না। আবার ইলেকশন আসছে, তাই সে খুব ব্যস্ত তখন। সব

শুনে-টুনে বলল—তোকে দেখে হাসবে কেন? এমনিই হেসেছে হয়তো, তুই সে সময়ে পাস করছিলি, তাই ভেবেছিস।

ওসব ইন্দ্রজিৎ অনেক ভেবেছে। অনেক ভেবে তবেই সে সিদ্ধান্তে আসে। এই তার স্বভাব। তাই সে ঘটনাটা আর একবার বিশ্লেষণ করে নেপালকে বলল—বুঝেছিস? সে সময়ে করিডোরে আর কেউ ছিল না। ওরা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একজন আর একজনকে ফিস ফিস করে কী বলল, তারপর হাসল।

ইলেকশনের চিন্তায় চিন্তিত নেপাল তেমনি গা-না-করা ভাব করে বলল—দেখি।

নেপাল দেখেছিল। আর তার ফলটা হল মারাত্মক। সে সময় ইন্দ্রজিৎ কল্যাণ নামে তার এক বন্ধুর সঙ্গে ক্লাশ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ইউনিভার্সিটির দীর্ঘ এবং জনশূন্য করিডোরগুলিতে ঘুরে বেড়াত। আর সে-বছর কোন টিম লিগ জিতবে বা কোন খেলোয়াড় সামনের বছর কোন টিমে যাবে এইসব নিয়ে গল্প করত। সেদিনও ওইরকম গল্প করতে করতে তারা একটা বাঁক ঘুরে তাদের ক্লাশের মুখোমুখি হতেই দেখতে পেল, নেপাল দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, আর তাকে দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে অর্ধচক্রাকারে গুটি ত্রিশেক মেয়ে দাঁড়িয়ে কাউ-কাউ করছে। তাকে দেখেই নেপাল সেই নারীব্যূহের ভিতর থেকে একখানা উদগ্রীব হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল—ইন্দ্রজিৎ, এই যে এখানে।

ইন্দ্রজিৎ দৃশ্যটা দেখেই বিপদের গন্ধ পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। নেপালের ডাকাডাকির উত্তরে সে কেবল—'পরে হবে, পরে হবে' বলে পালানোর চেষ্টায় ছিল। অত মেয়ে একসঙ্গে দেখে এবং তাদের ভাবভঙ্গি লক্ষ করে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। সে জানত, অত মেয়ের সামনে সে একটাও কথা বলতে পারবে না, হয়তো কেঁদে ফেলবে।

কিন্তু নেপাল ছাড়ল না। তারও জান-এর ভয় আছে। ছুটে এসে সে ইন্দ্রজিতের হাত চেপে ধরে বলল—তোকে নিয়েই হচ্ছে। ওরা বলছে, তোকে নিয়ে ওরা হাসাহাসি করেনি। মেয়েদের মধ্যে ব্যাপারটা চাউর হয়ে যাওয়ায় সবাই খাপ্পা। তুই ওদের সঙ্গে মুখোমুখি করে নে। নইলে আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে। পজিসনও খারাপ হয়ে যাবে।

অতএব ইন্দ্রজিৎকে যেতে হল। নেপাল টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল মেয়েদের পিছনে। দিয়ে সে ফের অর্ধচক্রাকার ব্যূহের ভিতরে গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। মেয়েরা নেপালের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে রইল, কেবল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ইন্দ্রজিৎকে দেখে নিল কয়েকজন।

নেপাল ডাকল—ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রজিৎ স্বপ্নোত্থিতের মতো বলল—অ্যাঁ।

—এইবার তোর কথা বল। কে তোকে দেখে হেসেছে?

—কেউ না। ইন্দ্রজিৎ ঢোঁক গিলে বলল।

ভীষণ উত্তেজিত ও ভীত নেপাল বলল—কেউ না মানে?

ইন্দ্রজিৎ বলল—মানে সবাই নয়, দুজন।

—তারা কারা?

দুজনের নাম তক্ষুনি মনে করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল ইন্দ্রজিৎকে। তার ওপর মিতুন চৌধুরী যেহেতু সুন্দর সেইহেতু তার নামটা মুখেই আনতে পারছিল না। অনেক কষ্টে বলল—মোহিনী রায়।

—আর একজন কে?

—রোল নাম্বার টুয়েন্টি থ্রি।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। মিতুন চৌধুরী তার দিকে ফিরেও না তাকিয়ে নেপালকে বলল—কী বলছে ও? আমরা। আমি?

তক্ষুনি এত ধকলের জন্যই বোধহয় ইন্দ্রজিতের একটা মরিয়া সাহস এল। বলল—আপনিই তো।

মিতুন চৌধুরী ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—আমি আপনাকে চিনিই না। এমন কী আপনি যে আমাদের ক্লাশে পড়েন তাও জানতাম না। হাসা তো দূরের কথা।

গল্পে উপন্যাসে বা সিনেমায় এরকমই হয়। এইভাবেই শুরু হয়, শেষ হয় অন্যভাবে। যেমনটা

ইন্দ্রজিৎ চেয়েছিল তেমনটাই ঘটছিল। কিন্তু 'চিনিই না' কথাটা শুনে তখনই নিভে গেল ইন্দ্রজিৎ। তার প্রতিক্রিয়া কিছু দেরিতে হয় ঠিকই, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল যে, এই অপমানই পৃথিবীর শেষতম অপমান। এরপর সে আর মানুষ থাকবে না, হয়তো মেঘ হয়ে যাবে, কিংবা ঘাস—যাদের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। সে যে এক ক্লাশে পড়ে, তাও জানে না মিতুন চৌধুরী? এ কেমন কথা? ভারী অবাক হয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। তবে কি এরকম অনেকেই আছে যারা জানে না যে, সে এক ক্লাশে পড়ে, বা এক পৃথিবীতে বাস করে!

কিন্তু ঈশ্বর তার সহায়। সে তখন একটা অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিল। ভেবেচিন্তে নয়, যেন তার কণ্ঠ থেকে ঈশ্বর কথা বললেন। সে বলেছিল—চেনেন না? ওঃ, তা হলে আমারই ভুল। তা হলে বরং আমিই ক্ষমা চাই। আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। চলি রে নেপাল।

বলে সে চলে এল। গোপনে চোখের জল মুছল। বস্তুত তার নিজের অস্তিত্ব বিষয়ক সংকট নিয়ে সে এত বেশি চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিল যে, নিজেকে অপমানিত পর্যন্ত বোধ করতে পারছিল না। পুরো একটা দিন সে মেঘ বা ঘাস হয়ে ছিল।

পরদিন ফের ইউনিভার্সিটিতে তাকে ধরল নেপাল—শোন ইন্দ্রজিৎ, কথা আছে।

ঘাস-ইন্দ্রজিৎ খুব অচেনা গলায় বলল—কী?

—গতকাল সবাই চলে গেলে মিতুন একা এসে আমার কাছে সব স্বীকার করেছে।

মেঘ-ইন্দ্রজিৎ বলল—কী বলেছে? আমাকে চেনে? আমি যে আছি তা জানে?

নেপাল অত কূট প্রশ্ন বোঝে না। বলল—খুব জানে। আর ওরা সত্যিই তোকে দেখে হেসেছিল।

কথাটা শুনে ইন্দ্রজিৎ যেন খুশি হল। এতক্ষণ তার অস্তিত্ব ছিল না, এখন আবার অস্তিত্বটা ফিরে আসছে। হেসেছিল? তা হাসুক না, তবু তো অস্তিত্ব স্বীকার করছে। বলল—তাই নাকি?

নেপাল বলল—গ্রীষ্মকালে একদিন তুই নাকি চুল ছেঁটে ঘাড়ে পাউডার দিয়ে ক্লাশে এসেছিলি। সেই দেখে সব মেয়েরা তোকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল। তারপর তোকে দেখলেই ওরা আর হাসি সামলাতে পারে না। তুই টের পাস না হয়তো, কিন্তু ওরা হাসে। সেদিন হঠাৎ মুখোমুখি হেসে ফেলেছিল বলে তুই ধরে ফেলেছিস।

সমস্ত পৃথিবী ফাটিয়ে ইন্দ্রজিতের চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল, রাগে। দুশো মাইল এক নাগাড়ে দৌড়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল, অপমানে।

সে ঘাড়ে পাউডার দিয়ে ক্লাশে গিয়েছিল! তাকে নিয়ে মেয়েরা গোপনে হাসাহাসি করে! আর সে কেবলই ভাবে, কোথায় কোন তুষারক্ষেত্রে গোপনে তৈরি হচ্ছে হ্রদ, একদিন স্রোত ঠিক আসবে তার দিকে!

কয়েকদিন ঘুমোয়নি ইন্দ্রজিৎ। ক্লাশে যায়নি। চুল ফের ছেঁটে ফেলল একদিন। রাতে ঘুমোত না বলে সেই প্রথম সে তার বিছানায় ছারপোকার অস্তিত্ব টের পায়। আগে হা-ক্লান্ত হয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়ত নিঃসাড়ে। টের পেত না। এখন জেগে থেকে পেল। এক সকালে চৌকি বের করে ফুটন্ত গরম জল ঢেলে অবাক হয়ে দেখল, কয়েক হাজার ছারপোকা জলের মধ্যে কালোজিরের মতো ছড়িয়ে থিক থিক করছে। অনেক রক্ত খেয়েছে শালারা—এই ভেবে সে ওই চূড়ান্ত মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও দুধ মাখন আর প্রোটিন খেতে শুরু করে। দিনে ঘুমোত। ফলে কয়েকদিনেই তার চেহারা ভাল হয়ে উঠল।

ইচ্ছাপূরণের ঘটনাটি ঘটে এরপর, এক বৃষ্টির দিনে। অধ্যাপকরা কেউই প্রায় আসেননি। ছাত্রছাত্রীও খুব কম। আগের রাত থেকে এক নাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। ট্রাম-বাস ভাল চলছে না। আকাশে গভীর মেঘ। প্রথম দুটো ক্লাশ হল না। ইন্দ্রজিৎ ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরাতে গিয়ে কিছুতেই ড্যাম্প-লাগা দেশলাই জ্বালতে পারছিল না।

পিছন থেকে কে যেন বলল—ইন্দ্রজিৎবাবু!

ইন্দ্রজিতের কাঁধ ও ঘাড় শক্ত হয়ে গেল, অনেকটা আর্থ্রারাইটিস হলে যেমন হয়।

মিতুন খুব নরম গলায় বলল—ভুল হয়েছিল। ক্ষমা চাইছি।

বলে মিতুন মাথা নিচু করবার আগেই ইন্দ্রজিৎ ঘুরে ভাগ্যক্রমে ওর টানা টানা চোখে ভরে-আসা জল দেখতে পেয়েছিল।

ভাইসব, হয়তো ঠিক বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু এইভাবেই, অর্থাৎ যেভাবে চেয়েছিল ইন্দ্রজিৎ, ঠিক সেইভাবেই ঘটেছিল সব। ঈশ্বর মাঝে মাঝে অলক্ষ্যে 'তথাস্তু' বলে চলে যান। আর আমাদের সাদামাটা সাধারণ জীবনও মাঝে মাঝে তাই গল্প, উপন্যাস বা ফিল্‌ম হয়ে ওঠে।

কী চমৎকার দৃশ্যটি! মিতুন মাথা নিচু করে সামনে দাঁড়িয়ে। বাঁ-হাত তুলে চোখের পতনশীল অশ্রু মুছে নিল। সবকিছুই ইন্দ্রজিতের ফেবারে। তবু ইন্দ্রজিৎ অমোঘভাবে কিছু ব্যাপার দেখতে পেল, যা দেখা তার উচিত নয়। যেমন, মিতুনের মাথার চুল খুব পাতলা। আরও পরে লক্ষ করেছিল, ওর দাঁতগুলো ফাঁক-ফাঁক, ওর চলনে একটা পাশদোলানি আছে।

এ সব সত্ত্বেও অবশ্য প্রেম হয়েছিল ঠিকই। বোধহয় সেটা চলেছিল মাস তিনেক।

৩

দুপুরে টুকি উল বুনতে এসে বসল আমার ঘরে। উল-বোনাটা উপলক্ষ মাত্র, আসলে ওর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিল, আমার কাছে এবার কিছু পতিনিন্দা করতে চায়। ভিতরের ঘরে যথারীতি মলয় পড়ে আছে বেহুঁশ হয়ে।

শীতটা আমার একদম সহ্য হয় না। বিস্তর লেপ কম্বল চাপা দিয়েও একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। ওম পাচ্ছি না। হাত-পা সিঁটিয়ে যাচ্ছে, শরীরের ভিতর সেই থরথরানি। জ্বর আসার মতো। সর্দি হলেই আমার একশো চার পাঁচ ডিগ্রি জ্বর উঠে যায়। দিনে একটা করে পাঁচ শো মিলিগ্রাম সি ভিটামিন ট্যাবলেট খাচ্ছি। তবু মনে হচ্ছে, সর্দিটা লাগবেই।

টুকি একটা গরম চাদরে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে নোংরা ঢাকনায় ঢাকা সোফায় বসেছিল। আমি ওকে দেখে উঠে বসেছি।

টুকি বলল—আপনার হট-ওয়াটার ব্যাগ গরম আছে তো?

ক্লিষ্ট একটু হেসে বললাম—না।

—না? বলে উঠে এল টুকি, বিছানার লেপ কম্বল সরিয়ে গরম জলের ব্যাগ খুঁজতে যাচ্ছিল।

বাধা দিয়ে আমি বললাম—হট-ওয়াটার ব্যাগ দেয়নি কেউ।

—দেয়নি? ও হরি। বলে টুকি ফের সোফায় গিয়ে বসে বলল—আমাদের আয়াটা ওইরকম। দশবার বললেও ভুলে যায়। আপনার কষ্ট হল।

—না না, কষ্ট নেই. দুপুরে আর বেশি গরমের দরকার কী?

বাইরে মেঘলা ছিল। একটু আগেও বৃষ্টি গেছে এক পশলা। টুকি একটু আনমনা চোখে বাইরে চেয়ে থেকে বলল—এ বছর খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ভয়ঙ্কর শীত পড়বে এবার। বলে একটা আচমকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—সবাই নেমে গেছে, ওর কলেজের কোনও কলিগই এখন নেই। কেবল আমরাই পড়ে থাকব। সারাটা শীত এই নিরালায় কীভাবে যে কটাবে!

আমি সমবেদনার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম—আপনারা কোথাও যান না?

টুকি সকৌতুকে একবার আমাকে দেখে বলল—কোথায় যাব? আমাদের কে আছে বলুন তো! ওর তো কেউই নেই। বলে ফের একটু আনমনা থেকে টুকি আমার দিকে চেয়ে হাসল, বলল—আর সেই যে হাঙ্গামা করে বিয়ে করলাম, আপনি তো নিজের চোখে দেখেছেন, সেই থেকে বাপের বাড়ির সঙ্গেও আমার সম্পর্ক নেই। বাবা মারা গেছেন, মা মৃত্যুশয্যায়, দাদারা-ভাইরা সব বাড়ির দখল নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করছে। আমার খোঁজও নেয় না।

বলতে বলতে টুকি কাঁদল। খুব নয়। একটু। তবে চোখের জল গোপনও করল না।

আমি সবই জানি। মলয়ের বাবা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে থাকতেন।

মলয়কে তিনি আবার ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণাও করেছিলেন। ফলে কলকাতায় মলয় ছিল একেবারে একা, স্বজনশূন্য। বিয়ের কিছু আগে ওর বাবার মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে কোনও এক জ্ঞাতি পোস্টকার্ড দিয়েছিল, তা সে চিঠি দেড়মাস পর ওর হাতে আসায় ও গুরুদশাও পালন করেনি। শ্রাদ্ধ-শান্তিও নয়। শুধু সেই বিকেলে কিছু কম কথা বলেছিল। আর কোনও শোকের চিহ্ন দেখিনি।

কোত্থেকে তার পড়ার বা থাকার খরচ আসত সে রহস্য জানি না। তবে তার কেউ ছিল না, এটা জানি। আজও মলয়ের টুকি বা বাচ্চারা ছাড়া কেউ নেই। বাস্তবিকই কেউ নেই।

টুকি বলল—সিজনের সময়ে এখানে প্রত্যেকের বাড়িতে লোক আসে। ওর কলিগরা বলে—দার্জিলিংয়ে এসে বড় বিপদে পড়েছি। আত্মীয় আর বন্ধুদের আনাগোনায় অস্থির। টুরিস্ট স্পটে আর পোস্টিং নেব না। আমি সে কথা শুনে দুঃখ পাই, জানেন? আমাদের বাসাতে কেউ আসে না। আত্মীয়স্বজন তো নেই-ই, তা ছাড়া ওর বন্ধু-বান্ধবও খুব বেশি ছিল না। অনেকদিন বাদে আপনি এলেন।

একটু অবাক হয়ে বলি—কেউ আসেনি কখনও?

—এসেছিল। টুকি মাথা নিচু করে কাঁটার ঘর গোনার ভান করে বলে—একবার আমার এক মাসতুতো বোন বিয়ের পর তার বরকে নিয়ে এসেছিল। গতবার সামারে। কিন্তু আপনার বন্ধু এমন করতে লাগল যে, মাত্র দেড়দিন থেকে ওরা হোটেলে ঘর পেয়ে চলে গেল।

—কী করেছিল মলয়?

—ওদের সঙ্গে কিছু করেনি। আমার সঙ্গে। বলে টুকি বুঝি ফের কাঁদে। সামলে নিয়ে বলে—আমাকে সহ্যই করতে পারে না। যখন ঝগড়া হয় তখন এমন সব কথা বলে যে কোনও আব্রু রাখে না। সকলের সামনেই বলে। আমার বোন আর ভগ্নীপতি লজ্জায় পালিয়ে গেল। এখনও আমার বাপের বাড়ির দিকের আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ আসতে চায়, আমি তাদের চিঠি লিখে বারণ করে দিই। প্রথম প্রথম ভাবতাম, ও বুঝি আমার দিককার আত্মীয়স্বজনদের সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তা নয়। আজকাল ও কাউকেই সহ্য করতে পারে না। গত পুজোর কিছু আগে ওর আগের কলেজের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট এলেন। সঙ্গে বউ, দুটো বড় বড় মেয়ে। ওঁরা শিলিগুড়ি থেকে মোটরে সকালবেলাতেই চলে এসেছিলেন। আপনার বন্ধু সকালবেলায় খুব একটা নেশা করে না, কেবল খোঁয়াড়ি ভাঙতে একটু-আধটু খায়, আর মেজাজ খারাপ করে বসে থাকে। কিন্তু সেদিন যেই ভদ্রলোক এলেন, অমনি আপনার বন্ধু ইচ্ছে করে এমন মাতলামি শুরু করল যে কী বলব! ভদ্রলোককে চারবার প্রণাম করল, তাঁর স্ত্রীর পায়ের ওপর পড়ে পাঁচ মিনিট ধরে অকারণে ক্ষমা চাইল, আর তাঁদের যুবতী মেয়েদের গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘষে এমন আদর করতে লাগল যে, পারলে তাঁরা ধুলো-পায়ে বিদায় হয়। একটা বেলা কোনও রকমে কাটিয়ে বিকেলে নানা অসুবিধের কথা বলে তাঁরা অন্য কলিগদের বাড়িতে গিয়ে উঠে বাঁচেন।

আমি হেসে ফেলেছিলাম। টুকি হাসল না। বলল—হাসছেন? আমার গা জ্বালা করে। যত দিন যাচ্ছে ততই খারাপ হয়ে যাচ্ছে ও। কোনও মানুষকে সহ্য করতে পারে না। যতক্ষণ পারে মাতাল হয়ে ঝিম মেরে থাকে। বাদবাকি সময় একা বসে থাকে ভ্যাবলার মতো।

—কলেজ করে কী করে?

—সে অভ্যাস। তা ছাড়া, ওদের প্রিন্সিপাল ভালমানুষ, ওকে বেশি ক্লাশ করতে হয় না। কলেজের পর আর এক মাতাল কলিগের বাড়িতে গিয়ে ব্রিজ খেলে, সেখান থেকে মাতাল হয়েই ফেরে। রাতে প্রায়দিনই এসে খায় না, অজ্ঞান হয়ে ঘুমোয়। আমি কেবল শীতকালটার কথা ভাবছি, ও ওইরকম ঝিম হয়ে থাকবে, একটা বাচ্চা আর একটা বুড়ি আয়া সম্বল করে একা আমি কী করে যে থাকব। অবশ্য এ সময়টায় জাম্বুরও শীতের ছুটি হয়ে যায়, কিন্তু এবার ও আসবে না। আমার সেই মাসতুতো বোনের কাছে যাবে, রাঁচিতে। ওদের স্কুলের এক টিচার রাঁচিতে থাকেন, তিনিই নিয়ে যাবেন, কথা হয়ে আছে। আমি আপত্তি করিনি, এখানে থেকে কী হবে! শীতকালটা বড্ড একা লাগবে। জাম্বু থাকলে ভাল হত। কিন্তু ওরই বা এখানে কোন আনন্দের ব্যাপার আছে? তার চেয়ে রাঁচি গেলে ভাল থাকবে। আমাদের মতো মা-বাপের কাছে বেশি না থাকাই ভাল।

আমি কয়েকটা হাঁচি দিলাম। অদ্ভুত ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। হাত-পা নাড়তে পারি না। গাঁটে-গাঁটে ব্যথা। ব্যথাহরা গুচ্ছের ট্যাবলেট ওপর-চাপান দিয়ে মেজদাকে চুপ করিয়ে রেখেছি। কিন্তু এই শীতে তার গোড়া অব্দি শিউরে ওঠে মাঝে মাঝে। টুকির দুঃখের কথা লেপ-কম্বলের ভিতর দিয়ে আমার খুব গভীরে যায় না। আসলে আজকাল কারও দুঃখেই তেমন দুঃখিত বোধ করি না। কী যে এক ধরনের দুঃখের প্রতিরোধ তৈরি হয়ে গেছে ভিতরে। খুব বেশি পেনিসিলিন খেলে যেমন আর পেনিসিলিনে

কাজ হতে চায় না, এও তেমনি। দুঃখের কথা রোজই কিছু অপরিষ্কার শ্বাস-বায়ুর সঙ্গে ভিতরে ঢুকে যায়, আবার শ্বাসের সঙ্গেই বেরিয়েও যায়। ভিতরটা নাড়া খায় না তেমন। তবু কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে যাই, মলয়ের এরকমই কিছু হবে বলে বরাবর মনে হত। কী বলব, কোনও উপমাই ঠিক মনে আসছে না। যেমন, ডাকঘরে মাঝে মাঝে এমন সব খাম দেয় যাতে ঠিকমতো আঠা লাগানো থাকে না, জলে ভিজিয়ে লাগিয়ে দিলে জুড়ে যায়, শুকোলেই চড়চড় করে খুলে হাঁ করে থাকে, ভিতরে কিছুই ধরে রাখতে পারে না। মলয়েরও আঠা কিছু কম। বরাবরই কম ছিল। উপমাটা জুতসই হল না বুঝি, কিংবা বরং ওর সঙ্গে ট্রানজিস্টার রেডিয়োর একটা তুলনা করা যেতে পারে। ট্রানজিস্টার রেডিয়োর যেমন এরিয়াল লাগে না, প্লাগ দেওয়ার দরকার হয় না, আপনিই বাজে, নিজের ভিতরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ মলয় কি তেমন? সংসারে ওর কারও সঙ্গেই যোগাযোগ বা সম্পর্ক না রাখলেও চলে। কারও কাছ থেকেই ওর কিছু নেওয়ার নেই।

আমি আমার শরীরের শীত, দাঁত-ব্যথা, মাথা-ধরা ইত্যাদি কষ্টগুলো সহ্য করতে করতে খুব আলগা ভাবে বললাম—আপনিও চলে যান না রাঁচিতে, বেড়িয়ে আসুন।

টুকি বোনা রেখে আমার দিকে চেয়ে ছিল। বলল—ঘরে তা হলে কিছু থাকবে না। সব চুরি হয়ে যাবে। বলে বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে নিজের করতল দেখল সে। পরে বলল—একেবারে চলে যেতে ইচ্ছে করে। সে চেষ্টাও ক'বার করেছি। কিন্তু ও তখন হাতে-পায়ে ধরে আটকায়। বলে, তুমি চলে গেলে আমার ভীষণ ভূতের ভয় করে, খিদে পায়। আরও বলে—তুমি চলে গেলে আমি একদম মদ্যপ আর চরিত্রহীন হয়ে যাব। যেন ও এখন মদ্যপ নয়।

চরিত্রহীনতার কথাটা আমি আর তুললাম না। হাসতে গিয়ে হঠাৎ চড়াক করে ঠোঁট ফেটে গেল। জিভে রক্তের নোনতা স্বাদ পেলাম।

ও ঘরে মলয় জেগেছে। কোনও শব্দ হয়নি। ব্যাটা গোয়েন্দার মতো জাগে। আমরা টের পেলাম যখন ও একটা ব্যথা-বেদনার কাতর শব্দ করে ডাকল—টুকি!

টুকি উত্তর দিল না।

মলয় ও-ঘরে আপন-মনে বলল—বেরিয়ে গেছে।

সিগারেট ধরানোর শব্দ পেলাম। টুকি উঠে ও ঘরে গেল।

—কোথায় ছিলে? মলয়ের গলা।

—ও ঘরে।

—আমার খিদে প্যায় না নাকি? বলে হঠাৎ চেঁচাল মলয়। প্রচণ্ড চেঁচানি।

—আস্তে। ঘরে লোক আছে।

—কে লোক?

—তোমার বন্ধু।

মলয় তেমনি চেঁচিয়ে বলে—তুমি উত্তর দিলে না কেন?

—ইচ্ছে করেই দিইনি।

বাইরে দুপুরের রোদ চিকচিক করছে এখন। আমার পোশাক পরাই আছে। ও ঘরে ধুন্ধুমার ঝগড়াটা লেগে উঠছে শুনে, আমি নিঃশব্দ উঠে জুতো পরে বেরিয়ে আসি।

অনেকটা দূর পর্যন্ত আমি মলয়ের গলার স্বরটা শুনতে পাচ্ছিলাম। ও ভীষণ চেঁচাচ্ছে। রাস্তার বাঁক পেরোতেই স্বরটা আর শোনা গেল না। অন্যমনে আমি গালে হাত বুলোলাম। হাতে উলের দস্তানা পরা, তবু টের পেলাম গালে তিন দিনের দাড়ি খড়খড় করছে। এত খড়খড়ে যে দস্তানা থেকে খানিকটা উলের আঁশ বোধ করি থুঁতনিতে লেগে রইল। থাকলে থাকুক গে। দাড়ি কামানোয় বড্ড আলসেমি আমার। তা ছাড়া এই শীতে কিছু করতে ইচ্ছেও করে না। ঠাণ্ডায় কান কটকট করছে, নাক দিয়ে অবিরল জল পড়ছে, চোখের কোল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। এ অবস্থায় দাড়ি কামানোর কথা ভাবা যায় না। কেই বা দেখছে আমাকে। আমার মুখটা কিছু লম্বা ছাঁটের, গালে মাংস কম। সেইজন্য একদিন দাড়ি না কামালেই আমাকে বড্ড রোগা দেখায়। তবু আমি একদিন পর পরই দাড়ি কামাই। প্রথম যখন সেফটি রেজারে দাড়ি কামাতে শুরু করি, তখন থেকেই উল্টো টান দিয়ে দিয়ে আমার দাড়ি নারকোলের দড়ির

মতো কড়া হয়ে গেছে। থুঁতনির বা গলার কাছের দাড়িতে অনেকবার রেজার চালাতে হয়, ফলে রোজই দাড়ির গোড়া ফেটে পুঁতির মতো রক্তবিন্দু বেরিয়ে আসে। ফুসকুড়ির মতো ওঠে। একটা দিন বিশ্রাম পেলে ফুসকুড়িগুলো মিইয়ে যায়। তখন কামাতে সুবিধে। তা ছাড়া বন্ধুগণ, সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে দাড়ি একটু বড় হলেই কামাতে ভাল, সদ্য-ওঠা দাড়ির চেয়ে। আমার এক সম্পর্কের ভাই বিলেতে মাস্টারি করে। বেশ আছে। বাড়ি করেছে, গাড়ি কিনেছে, মহা আরামে দিন কাটায়। গত বছরও এসেছিল, গোপনে একটা কথাই বলেছিল আমাকে—খুব আরামে আছি ভাবছ? যদি শীতকালে অন্ধকার থাকতে উঠে বাতি জ্বেলে রোজ দাড়ি কামাতে হত তো বুঝতে। সে যে কী কষ্ট। বন্ধুগণ, এ কষ্টটা আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝি। কিন্তু বোঝে না আমার বন্ধু বিজয় সেন। সে রোজ দু'বেলা দাড়ি কামায়। সারাদিন সে একটা কোম্পানির অন্যতম ডাইরেক্টার, বিকেলে আবার তার পার্টি থাকে। তারও দাড়ির গোড়া আমার মতোই। সে একবার আমেরিকা ট্যুর-এ গিয়ে চার-পাঁচ রকমের কেবল অটোমেটিক শেভার এনেছিল সেইগুলো দিয়ে কামায়। আমি তার যন্ত্রপাতি দেখে একদিন অবাক হয়ে বলেছিলাম—তুই কি কেবল দাড়িই কামাস? সে গম্ভীরভাবে বলেছিল—না। টাকাও। বস্তুত বন্ধুগণ, আমারও মনে হয় দাড়ি কামানোর সঙ্গে সফলতার একটা ক্ষীণ যোগাযোগ আছে। যদিও ভাইসব, আমি জানি না দাড়ি কামানো থেকেই সফলতা আসে, না সফলতা থেকেই দাড়ি কামানো, তবু বলতেই হয়, দুনিয়ার সফল লোকেরা রাত পোহাতেই দাড়ি কামায়।

এইসব অন্যমনে ভাবতে ভাবতে গভীর অন্যমনস্কতায় লাডেন লা রোড ধরে ম্যাল-এ উঠে এসেছিলাম। এক খণ্ড মেঘ গড়াতে গড়াতে বাঁ-ধারে উপত্যকায় নেমে যাচ্ছে। এখন রোদের খেলা চারদিকে। উত্তরের পাহাড় দেখা গেল, আবাব ঢেকে যাচ্ছে মেঘে। কাঞ্চনজঙ্ঘার গলায় মালার মতো একটা মেঘ পাক খেয়ে আছে, চুড়োটা শূন্যে এক ক্রেন থেকে কেউ ঝুলিয়ে রেখেছে মনে হয়, মাঝখানটা মেঘে খেয়ে ফেলেছে।

রোদে আজ কিছু মানুষ জুটেছে এখানে। বাচ্চারা ছুটছে, একটা বাচ্চা চাকা লাগানো জুতো পরে গড়িয়ে আসছিল হড়হড় করে, তার পিছনে তার মা ছুটে আসছে পড়ে যাবে, পড়ে যাবে বাবু বলতে বলতে। এ বেলা তার গায়ে কোটও নেই, শুধু গলায় একটা শালের মাফলার জড়ানো। পরনে একটা মেজেন্টা রঙের সিন্থেটিক শাড়ি। ওই রঙেরই একটা ফুলহাতা গরম ব্লাউজ আছে গায়ে। মিতুন।

বাচ্চাটা আমাকে পার হয়ে গড়িয়ে গিয়ে আর একটু হলেই লাডেন লা রোডের ঢালুতে পড়ত। চাকা লাগানো জুতোয় সে কতদূর, কী রকম গতিতে নেমে যেত বলা মুশকিল। আমি চোখ বুজে ফেলেছিলাম। কিন্তু বাচ্চাটা যে করেই হোক থেমে গেল। মিতুন গিয়ে ধরল তাকে। 'বড্ড দুষ্টু হয়েছ বাবু, একদম কথা শোনো না।' বলতে বলতে তাকে ফের চাকায় গড়িয়ে নিয়ে আসছিল মিতুন। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিলাম।

দেখা হয়ে গেল।

মিতুন বলল—তুমি?

আমার মাঙ্কি ক্যাপটা মাথার ওপর গোটানো রয়েছে। সময় মতো সেটা টেনে নামানো হয়নি। এখন আর কী করা যাবে? বললাম—সকালেই তোমাকে এখানে দেখেছি।

—দেখেছ? মিতুন অবাক—তবু কথা বলোনি?

—খুব শীত করছিল। আমি বললাম।

মিতুন খুব অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। ছেলেটা সেই ফাঁকে ফের চাকার জুতোয় গড়িয়ে যাচ্ছে দেখে মিতুন আবার ছুটল 'বাবু! বাবু!' বলতে বলতে। আমি দস্তানা খুলে গালে হাত বোলালাম। বেশ দাড়ি। কেমন দেখাচ্ছে আমাকে? শীতের কথাটা হঠাৎ বললাম কেন? পাগল ভাববে না তো?

মিতুন হাঁটু গেড়ে বসে তার বাচ্চার জুতো থেকে চাকা খুলে বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে ফের আমার সামনে এসে দাঁড়াল। অকপট বিস্ময়ভরা চোখ চেয়ে বলল—তুমি? ভাবতে পারছি না।

—এরকম মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায় মিতুন। বলে আমি নাকের গড়ানো জল মুছে নিলাম রুমালে।

ও বলল—কই আর দেখা হয়। সেই ইউনিভার্সিটির পর এই প্রথম দেখা হল। কবে এসেছ এখানে?

—কাল।

—মোটে? বলে ফের অবাক হয়ে মিতুন বলে—আমরা সেই কবে এসেছি। ট্রেনের রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি বলে আটকে আছি, নইলে আরও পনেরো দিন আগেই আমাদের নেমে যাওয়ার কথা।

—এখনও পাওনি?

—পেয়েছি। কাল চলে যাচ্ছি। যা বৃষ্টি, কেবল ভয় হচ্ছে আবার না ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তুমি ক'দিন থাকবে?

—বেশি না। কাল পরশুই নেমে যাব।

মিতুন খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল—তা হলে কালই চলো না। আমাদের তিনটে রিজার্ভেশন আছে, তার মধ্যে ঠেসে-ঠুসে তুমিও যেতে পারবে। যাবে?

আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলি—আমি এক্ষুনি কলকাতায় ফিরব না মিতুন। আরও কয়েক জায়গা হয়ে তারপর যাব।

—অ্যাভয়েড করলে না তো?

—না না।

মিতুন খুব হাসল। বলল—দাড়ি কামাওনি কেন?

—খুব শীত করছিল। আমি আবার বলি। এ বাক্যটা দ্বিতীয়বার বলা হল।

মিতুনের দুই গালে আর নাকের ডগায় লাল আভা, ঠাণ্ডার দেশে কিছুদিন থাকলেই এটা হয়। তিন-চারটে বিউটি স্পট দেখা দেয় মুখে। আমারও যদি ওরকম লালিমা হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চিত দাড়ির জন্য দেখা যাচ্ছে না। মিতুন খুব মায়া-দয়া নিয়ে হাসি-মুখে চেয়ে থেকে বলল—তোমার বরাবরই খুব শীত করত।

—এখনও করে। আমি বললাম। মনে আছে, মিতুনের সঙ্গে প্রেমটা শীতকাল পর্যন্ত গড়িয়েছিল। কলেজ স্ট্রিটের ওয়াই-এম-সি-এ তখন প্রেমের জন্য চিহ্নিত জায়গা ছিল। পর্দা-ফেলা কেবিনগুলি ছিল প্রেমের প্রথম ভয়-ভীতি কাটানোর চেম্বার। বয়-বেয়ারারা কেবিনে ঢুকত পেছনে ফিরে। খুব সুন্দর ব্যবস্থা। আজও সেই ব্যবস্থা আছে কি না জানি না। যা বলছিলাম, ঋতু বদলের সময়ে আমার বছরের দু' তিনবার ঠাণ্ডা লেগে যায়, সর্দি হয়, জ্বর উঠে যায় একশো তিন-চার বা পাঁচ। সেবার মিতুনের সঙ্গে আমার প্রেমের বছরেও লেগেছিল। মিতুনের সঙ্গে সেই কাঁচা সর্দি-লাগা মুখ নিয়ে বসে দেদার কথা বলেছিলাম। বড় সংক্রামক রোগ। ঠিক এক ঘণ্টা পরেই মিতুন হাঁচতে থাকে, এবং চোখে জল আসে। জ্বরের জন্য মাঝখানে তিন দিন প্রেমের বিরতি দিতে হয়েছিল। চতুর্থ দিন দুজনে ফের গিয়ে সেই কেবিনে বসলাম। দুজনেরই গলায় মাফলার, স্বর ভারী, চুল রুক্ষ। এবং ঘণ্টাখানেক আমরা খকখক কাশি আর মাঝে মাঝে হাঁচি দিয়েই আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম নিবেদন করেছিলাম, কথা খুব সামান্যই হয়েছিল।

মিতুন বলল—চলো, আমার বর আর ননদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

বর নয়, ননদ কথাটাই আমার ভিতরে বঁড়শির মতো গেঁথে গিয়ে সুতোয় টান লাগিয়ে দিল। আমি মিতুনের সঙ্গে যেতে যেতে বললাম—ওঃ, কতদিন হয়ে গেল!

মিতুন প্রতিধ্বনি করে বলল—কতদিন।

সেই শীতকালটা তখনও ভাল করে কাটেনি, তার আগেই মিতুনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। আমার ধারণা ওর বিশ্বাস, যখন মিতুনের বিয়ে হয় তখনও আমার কাছ থেকে সংক্রামিত সেই সর্দির কিছুটা ওর বুকে অবশিষ্ট ছিল। কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। একজনের কাছ থেকে পাওয়া সর্দি নিয়ে অন্যজনের সঙ্গে মালা বদল। আবার সেই সর্দি যদি ওর কাছ থেকে ওর বরের ভিতরেও সংক্রামিত হয়ে থাকে তবে কী মারাত্মক ব্যাপার হয়েছিল, একবার ভেবে দেখুন মশাইরা। প্রেমের চেয়ে সর্দি কত বেশি প্রত্যক্ষ ও সত্য।

মিতুনের বর আর ননদ একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসে আছে। বরটি বোধহয় ঘুমোচ্ছিল। কোলের ওপর মাথা ঝুঁকে আছে। তাকে উপেক্ষা করে ননদটিকেই আমি দেখি, এবং খুব আশান্বিত হয়ে উঠি। গায়ের রং শ্যামলাই বলা যায়। কিন্তু ভারী মিঠে রং। চোখ-মুখ খুবই অনুভূতিশীল, জাগ্রত। একটু রোগা

কি? কোট-টোট পরা বলে বোঝা যায় না। তবে খুবই কম বয়সি। কুড়ি-বাইশের বেশি নয়।

আমি ফের দাড়িতে হাত বোলালাম। খড়খড় করছে। না কামালে আমাকে রোগা দেখায়। বোকার মতো আমি আজ দাড়ি কামাইনি।

মিতুনের ননদ সনাতনী অবশ্য দাড়ি-ফাড়ি গ্রাহ্য করল না। ওর বয়সি মেয়েদের কাছে পুরুষ মাত্রই আয়না বিশেষ। কিছু মেয়ে আছে, এই বয়সে কোনও পুরুষকেই উপেক্ষা করে না। বরং প্রত্যেক পুরুষকেই খুব বেশি পাত্তা দেয়, এবং তাদের হাবভাব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে লাইফ-সাইজ আয়নার মতো নিজেকে দেখে যাচাই করে নেয়।

সনাতনী খুব আগ্রহের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলল—ওঃ, এই বুঝি তোমার সেই ইন্দ্রজিৎ, বউদি? এঁর কথাই বলতে?

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বলি—কী বলেছে মিতুন?

সনাতনী একমুখ হাসি নিয়ে বলল—সব বলেছে। আপনার সঙ্গে বউদির প্রেম ছিল।

সনাতনীর চমৎকার দাঁত দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম, তবু চমকানোটা ঠেকানো গেল না। বললাম—যাঃ।

মেয়েটি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে আমাকে দেখছিল, দুই চোখে দিপ দিপ করে আলো জ্বলে উঠল। সেই আলো আমার মুখে ফেলে সে খুঁজছে, কী দেখে তার বউদি এই লোকটার সঙ্গে প্রেম করত। দেখছে, আমি দাড়ি কামাইনি। থুঁতনিতে দু'চারটে দাড়ি পেকেছে, মোটা গোঁফেও দুটো সাদা চুল সবসময়ে খাড়া হয়ে থাকে। সে দুটোকে আমি দাঁড়ি কামানোর সময়ে প্রায়ই কাঁচির ডগা সাবধানে ঢুকিয়ে গোড়া থেকে কেটে দিই, এখন দিইনি, পাকা দুটো গোঁফের চুল নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে। তার ওপর আমাকে রোগাও দেখাচ্ছে নাকি? মেয়েটার চোখের সামনে আমি প্রচণ্ড হীনম্মন্যতায় মিইয়ে যাচ্ছিলাম।

কাঞ্চনজঙ্ঘা তার গলা থেকে মেঘের মালাটা খুলে কখন পাশের আর একটা পাহাড়কে পরিয়ে দিয়েছে। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ধারালো, কুটিল শরীর। ব্যায়ামবীরের মতো শরীরের সব পেশি ফুলিয়ে সে আমাদেব দেখাচ্ছে। কিন্তু দেখবে কে। মিতুনের স্বামীকে যেমন, তেমনি কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও আমি এক পলক দেখে উপেক্ষা করলাম। সনাতনীও গ্রাহ্য করল না কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। সে এখন তার বউদির ভূতপূর্ব প্রেমিককে দেখছে, খুব অবাক। বলল—বউদি, কী দারুণ রোমান্টিক ব্যাপার, না?

মিতুন বলল—কী?

—এই দেখা হওয়াটা ওঁর সঙ্গে তোমাব!

—হ্যাঁ, দারুণ। এই বলেই মিতুনের চোখে পড়ল, তার ছেলে ম্যালের রেলিং টপকানোর চেষ্টা করছে। অমনি 'বাবু! বাবু!' বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে গেল।

সনাতনীর সামনে একা দাঁড়িয়ে আমাব একটু লজ্জা করছিল। আমার টাকরা জ্বালা করলে, আর গলা খুশখুশ করলেই বুঝতে পারি যে আমার সর্দি লাগবে। তেমনি এই একটু শীতভাবের মতো লজ্জা বোধ করলেই আমি টেব পাই যে, আমি ফের প্রেমে পড়েছি। সনাতনীর মুখের দিকে আমি তাকাতেই পারছিলাম না। খানিকটা লজ্জায়, খানিকটা ভয়ে। লজ্জাটা প্রেমেব। আর ভয় হচ্ছে, কোনও মানুষেরই মুখশ্রী বা দেহলাবণ্য তো নিখুঁত নয়। সনাতনীর মুখ বা চেহারায় কোনও খুঁত নজরে পড়লেই আমার প্রেম-ভাবটা চট করে না কেটে যায়।

—বসুন না। সনাতনী বলল।

বসলাম। ও মাঝখানে ওপাশে মিতুনের স্বামী এখনও ঢুলছে—খুব চমৎকার ব্যালান্সে শরীরটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ভেঙে মুখটা নুয়ে পড়েছে। কোলের ওপর একটা দামি ইয়াসিকা ক্যামেরা বিপজ্জনক ভাবে পড়ি-পড়ি হয়ে আছে। অবশ্য সেটা একটা সরু স্ট্র্যাপে গলার সঙ্গে ঝোলানো। আমি অন্য পাশে বসলাম। বেঞ্চটা স্যাঁতস্যাঁত করছে। জলা পাহাড়ের দিক থেকে ভূতের মতো এক খামচা কুয়াশা নেমে আসছে। দুটো রুগ্‌ণ টাট্টু ঘোড়ায় চেপে এক জোড়া অল্পবয়সি মাড়োয়ারি স্বামী-স্ত্রী সেই কুয়াশায় ঢুকে আবছায়ায় রহস্যময় হয়ে গেল।

—বড়দা, ইনি হচ্ছেন সেই ইন্দ্রজিৎবাবু। সনাতনী দাদাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে বলল।

তার দাদা সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে সম্পূর্ণ জাগ্রত চোখে চেয়ে হাতজোড় করে বলল—ও।
কিন্তু নামটা চিনতে পারল বলে মনে হল না।
সনাতনী বলল—বুঝতে পারছ না?
লোকটা বলল—ঠিক প্লেস করতে পারছি না।
সনাতনী একটু চাপা গলায় বলে—বউদির সেই ইন্দ্রজিৎ। ইউনিভার্সিটির। মনে পড়ছে?
—ওঃ! বলে লোকটা নড়েচড়ে বসে ভারী খুশির হাসি হাসে। ফের হাত জোড় করে বলে—আমি সুব্রত রায়।
আমিও ফের হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। মিতুনের ওপর একটু রাগ হচ্ছিল। আমাদের প্রেমের ব্যাপারটা ও এত প্রচার করে দিয়েছে!
সনাতনীর কোলের ওপর দিয়ে সুব্রত এক প্যাকেট ফিল্টার টিপড কিং সাইজ দামি সিগারেট বাড়িয়ে দিল। হাতটা সনাতনীর কোল পর্যন্তই পৌঁছেছিল, আমি সিগারেটের জন্য হাত বাড়িয়ে সনাতনীর কোলের উপরকার বিপজ্জনক বিকিরণটি নীরবে অনুভব করলাম। হাতটা শিরশির করছিল।
সুব্রতর বয়স আমার মতোই হবে বোধহয়। কিংবা বছর দুয়েকের বড় হতে পারে। বেশ পয়সাকড়ি আছে, বোঝা যায়। পরনে একটা সাদা-কালো চেক-এর গরম স্যুট, গলায় কাশ্মীরি স্কার্ফ, হাতের ঘড়িটা দেখা যাচ্ছিল—খুব দামি বিশাল ঘড়ি। সুব্রত সিগারেট জ্বালিয়ে ঠ্যাং সামনে ছড়িয়ে চিত হয়ে আকাশমুখো ধোঁয়া ছেড়ে বলল—কাওয়ার্ড।
আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি—কে?
—আপনি। বলে সুব্রত হাসল হা-হা করে। ম্যাল-এর লোকেরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। কিন্তু ওই হাসিতেই প্রমাণ হয় যে, সুব্রতর বন্ধু হতে এক মিনিটও লাগে না কারও।
সে একটু বেঁটে লোক, বসা অবস্থাতেও বোঝা যায়। স্বাস্থ্যটা মোটার দিকেই। চোখে-মুখে বড়-ঘরের আহ্লাদি ছাপ আছে। তবে বোকা নয়, বেশ চালাক-চতুর মুখ-চোখ।
সনাতনী সম্মোহিতের মতো আমার দিকে অপলক চোখে একটু ক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—কী মিষ্টি!
আমি ভয়ে ভয়ে বলি— কী ?
—আপনাদের সেই অ্যাফেয়ারটা।
আমি অবাক হয়ে বলি—কোন অ্যাফেয়ারটা?
—আপনার আর বউদির। কী মিষ্টি আর রোমান্টিক। প্রথমটায় শুনে তো আমি বিশ্বাসই করিনি। ঠিক সিনেমা বা উপন্যাসের মতো। শুনে আমি বউদির হাত ধরে ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলাম—বউদি, সত্যি এরকম হয়েছিল? বানিয়ে বলছ না তো! সত্যি বলছ? আমাকে ছুঁয়ে বলো।
—আমি একবারেই বিশ্বাস করেছিলাম। সুব্রত হাই তুলে বলে।
—মোটেই না বড়দা। সনাতনী তার দাদার দিকে ফিরে ঝগড়ার গলায় বলে—মোটেই তুমি বিশ্বাস করোনি। তুমি শুনে বলেছিলে—মেয়েরা স্বামীর কাছে নিজের দাম বাড়ানোর জন্য ওরকম কত ফলস প্রেমের গল্প বলে। তাই শুনে বউদির সে কী রাগ!
আবার হাই তুলল সুব্রত, বলল—ওঃ, মুখে যাই বলি, ভিতরে ভিতরে বিশ্বাস করেছিলাম। অ্যান্ড আই ওয়াজ জেলাস। কেবল মনে হত, আমি স্বামী হলে কী হয়, মিতুনের নায়ক অন্য একজন।
—আহা! সনাতনী তার দাদাকে বকবার মতো করে বলে—যে পায় সেই আসল নায়ক। না ইন্দ্রজিৎবাবু?
রোদটা ঢেকে গিয়েছিল। ফের রোদ উঠেছে। আমি সনাতনীর কথায় মাথা নাড়লাম। বটেই তো, যে পায় সেই নায়ক।
সুব্রত ঘন ঘন হাই তুলছে। বলল—শরীরটা ঠাণ্ডা মেরে গেল যে রে সুন্তি!
সনাতনী মুখ ফিরিয়ে বলল—তা হলে আর কী! যাও আবার গিলে এসো।
—যাব? বলেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল সুব্রত। খুব আন্তরিকভাবে আমাকে বলল—চলুন, দু পেগ করে চাপিয়ে আসি। নইলে নিউমোনিয়া ধরে যাবে। লাঞ্চে একটু খেয়েছিলাম, সেটা কেটে গেছে।
আমি মাথা নেড়ে বললাম—আমি খাব না।

—খান না। সুব্রত অবাক হয়ে বলে—টিটুটালার নাকি?

—না না। আমি বিব্রত হয়ে বলি—আসলে খেতে ভয় পাই। মাতাল হলে অনেক গুপ্তকথা নাকি লোকে বলে ফেলে।

সুব্রত সেই হা-হা হাসি হাসল। সনাতনী তাকে ধমক দিয়ে বলে—তুমি খাবে তো যাও না। আমরা বসে গল্প করি। যাও।

—তোর বউদি টের পেলে ম্যানেজ করিস। বলে সুব্রত চলে গেল।

মিতুনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, ওর ছেলেটা খুবই দুরন্ত বোঝা যাচ্ছে। ছেলের পিছু পিছু হয় স্টেপ অ্যাসাইডের দিকে, নয়তো অবজারভেটরির দিকে, কিংবা অন্য কোনওদিকে চলে গেছে নিশ্চয়ই। তাতে কোনও অসুবিধে নেই। আমি আর সনাতনী পাশাপাশি বসে আছি। কাঞ্চনজঙ্ঘার গা থেকে ঠিকরে এসে একটা আলো আমাদের রাঙা করে রেখেছে।

—এত মিষ্টি আর রোমান্টিক যে বিশ্বাস হয় না। সনাতনী আমার দিকে তেমনি সম্মোহিতভাবে তাকিয়ে বলল—আপনি এখনও বিয়ে করেননি, না?

খুব আশান্বিত হয়ে আমি বলি—না।

—কী অদ্ভুত! ভাবা যায় না। সনাতনী বলে—আমি এখন সেই একই ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, কিন্তু ওরকম ঘটনা ভাবাই যায় না। প্রথম দিন থেকেই ছেলেদের সঙ্গে তুই-তোকারি, আড্ডা, সিগারেট কেড়ে খাওয়া। কিছু রোমান্স নেই। সবাই ভীষণ সেয়ানা, সেলফ কনশাস।

খুব সমবেদনার সঙ্গে বলি—হ্যাঁ, এখন আর সেই লাজুক, ভীরু, মুখচোরা ছেলেও তো দেখা যায় না।

মুখটা একটু বিরস হয়ে গেল সনাতনীর। বলল—না, না, লাজুক মুখচোরা ছেলে আমি দু' চক্ষে দেখতে পারি না। ছেলেরা হবে স্মার্ট, সাহসী, ফ্র্যাঙ্ক। মুখচোরা লাজুক আর অন্যমনস্ক পুরুষ একদম ভাল লাগে না।

আমার খুব শীত করে ওঠে। বার বার থুঁতনির দাড়িতে হাত বোলাচ্ছি। সনাতনী লক্ষ করছে দেখে হাত নামিয়ে নিই। ফের অজান্তে হাত চলে যায় থুঁতনিতে। দাড়ি।

—বউদি আপনার কথা খুব বলে। সনাতনী ফের সম্মোহিতের মতো তাকায়, বলে—বউদির ধারণা আপনি ওকে ভীষণ অপমান করেছিলেন। বউদির যখন দাদার সঙ্গে বিয়ের কথা চলছে, তখন নাকি বউদি আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। যেদিন রেজিস্ট্রি হওয়ার কথা সেদিন নাকি আপনি আসেননি।

দুঃখিত চিত্তে আমি মাথা নাড়লাম। ঠিকই। লুকিয়ে লাভ কী! মিতুন সব বলে দিয়েছে।

—কেন? সনাতনী জিজ্ঞেস করল।

সব কি বলা যায়! ওই যে মিতুনের দাঁতগুলো সামান্য ফাঁক ফাঁক ছিল, গায়ে একটু স্থূলতা ছিল, ওর হাঁটা-চলায় একটা পাশদোলানি লক্ষ করা যেত, বয়সও ছিল আমার সমান কিংবা একটু বড় বা ছোট—এসব নিয়ে আমি কয়েক দিন প্রচণ্ড ভেবেছিলাম। মিতুনের চুলও তেমন ঘন ছিল না। আরও কিছু খুঁত ছিল—তা সে কথা থাক। কিন্তু এসব ব্যাপার আমি খুব হিসেবি বুদ্ধি নিয়ে পাটোয়ারের মতো বসে বসে বিচার করে দেখেছিলাম। সবচেয়ে খারাপ লাগছিল বয়সটা। আমি যখন মধ্য-যৌবনে পৌঁছব, ততদিনে মিতুন বেশ বুড়োটে মেরে যাবে, যেমন এখন গেছে।

সনাতনীকে বললাম—আসলে হুইমসিক্যালি কিছু করা আমার ইচ্ছে ছিল না। তখনও চাকরি করি না, বাবার পয়সায় হোস্টেলে থাকি, সদ্যমাত্র এম এ পরীক্ষায় ড্রপ দিয়েছি। এসব ভেবে আর—

সনাতনী ভারী সুন্দর একটা সুগন্ধী নিশ্বাস ফেলে বলল—ঠিকই করেছিলেন। কিন্তু এসব কমার্শিয়াল কারণ ছাড়া কি অন্য কোনও কারণ ছিল না? বউদিকে নাকি আপনি পরে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, ওকে হারানোর ভয়েই আপনি ওকে বিয়ে করেননি। বিয়ে করলেই নাকি প্রেম নষ্ট হয়ে যায়। বউদি এরকম একটা গল্পও কোথায় পড়েছিল, বিয়ের রাতে নায়ক পালিয়ে যাচ্ছে, পাছে সে নায়িকাকে পেয়ে রহস্য নষ্ট করে ফেলে।

আমি গভীর শ্বাস ফেলে বলি—সত্যি।

সনাতনী একনাগাড়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। চোখে অপার্থিব সম্মোহিত দৃষ্টি। বলল—কী মিষ্টি!

কী রোমান্টিক! বউদির সঙ্গে আর আপনার এর পর দেখা হয়নি, না?

দুঃখিত চিত্তে আমি বলি—না।

—ইস! ও আরও দুঃখের সঙ্গে বলল—এখানেও দেখা না হলে ভাল হত। বউদি তো এখন বেশ মোটা হয়ে গেছে, ছেলের মা, গিন্নি-বান্নি। এ চেহারাটা না দেখলেই ভাল ছিল আপনার।

ওই মিতুনের ছেলে দৌড়ে আসছে। পিছনে মিতুন। হাঁফাচ্ছে। ছেলেটা সোজা আসতে আসতে হঠাৎ বাঁদিকে বাঁক নিয়ে ফের অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। মিতুন পারল না ধরতে। খসে-যাওয়া আঁচলটা কাঁধে তুলে খুব ক্লান্ত পায়ে চলে এল আমাদের কাছে।

—উঃ! বলে মিতুন বসে কিছুক্ষণ দম নিল। কথা বলতে পারছে না। আমরা খুব সমবেদনার সঙ্গে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাস্তবিক মিতুন বেশ মোটা হয়ে গেছে। ও কেন গায়ে গরম জামা বেশি রাখে না তাও বুঝলাম। ছেলের পিছনে প্রায় সময়েই ছোটাছুটি করে করে ওর বোধহয় ঘাম ছুটে যায়। মিতুন বেঞ্চে রাখা হাতব্যাগ থেকে একটা ত্রিপুরার বাঁশের তৈরি ফোল্ডিং পাখা বের করে হাওয়া খেতে খেতে বলল—হাঁপিয়ে গেছি, সুস্তি, তুমি যাও না, একটু বাবুকে দেখে রাখো। আমি আর পারছি না।

সনাতনী সেইরকম সম্মোহিত ভাবেই আমার দিকে চেয়ে চমৎকার একটু হেসে বলল—যাচ্ছি। বলেও চোখ সরাল না! তেমনি বিভোরভাবে বলল—বউদি বড্ড বোকা, তাই হুট করে দাদাকে বিয়ে করে একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি হলে কিন্তু ইন্দ্রজিৎকে ছেড়ে দিতাম না। পিছু নিতাম। যতদিন না ইন্দ্রজিৎকে পাচ্ছি, ততদিন তার পিছনে ধাওয়া করতাম। সারা জীবন। দরকার হলে লন্ডন, টোকিও, নিউইয়র্ক—যেখানে যেত ইন্দ্রজিৎ, ঠিক সেখানে ফলো করে চলে যেতাম। কী থ্রিলিং ব্যাপার হত বলুন তো! বলে ফের হেসে সে চোখ টিপে বলল—আপনারা একটু একা থাকুন। বলে চলে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে দম ফিরে পেয়ে মিতুন আমার দিকে তাকাল। আমার আবার শীত করছিল।

মিতুন খুব স্বাভাবিক কৌতূহলে বলল—আমার বরটা কোথায় গেল বলো তো?

—এই একটু! কাছেই। বলে গলা খাঁকারি দিলাম।

ও বুঝতে পেরে হাসল। বলল—ড্রিঙ্ক করতে?

—তাই বলছিল।

—আমারও একটু ইচ্ছে করছে এখন। যা টায়ার্ড লাগছে, একটু হলে বেশ হত।

—তুমি খাও? আমি ব্যথিত বিস্ময়ে বলি।

ও সান্ত্বনা দিয়ে বলে—এখানে এসে একটু-আধটু খাচ্ছি। এই তো আজ লাঞ্চেই খেয়েছি। এখনও বোধহয় গন্ধ আছে। বিশ্বাস করছ না তো!' বলে মুখটা এগিয়ে এনে বলল—দেখো, শুঁকে দেখো। বলে হাঁ করল।

আমি চোখ বুজে ফেললাম। মেয়েদের মুখের অভ্যন্তর দেখতে আমার কোনওদিনই ভাল লাগে না।

—গন্ধ পেলে? ও বলল।

—হুঁ।

—কীসের গন্ধ বলো তো?

—এলাচির।

ও হাসল—ও হরি! সে তো দুপুরের খাওয়ার পর দুটো বড় এলাচি আর একটা ছোট এলাচি খেয়েছিলাম। কিন্তু ব্রান্ডিও খেয়েছি, মাইরি! আমার কর্তাটিকে কেমন দেখলে?

—ভাল, বেশ ভাল।

—খুব। ও বলল—দু'রকম পুরুষ আছে, জানো? লেডি কিলার আর লেডি হিলার। আমার কর্তাটি দ্বিতীয় টাইপের। মেয়েদের ব্যথা-বেদনা-দুঃখ ও ভীষণ বোঝে। আর সব সময়ে প্যাসিফাই করার চেষ্টা করে। যখন বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে আসছি তখন খুব কেঁদেছিলাম। অমন কান্না মেয়েরা আজকাল আর শ্বশুরবাড়ি যেতে কাঁদে না।

বলে একটু অন্যমনস্কভাবে চুপ করল মিতুন। তারপর যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বলল—আমার অবশ্য কান্নার কারণও ছিল। তার কিছুদিন আগেই একজন আমার সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি ঘুমের ট্যাবলেট কিনতে গিয়েও পাইনি। প্রেসক্রিপশন ছাড়া দোকানদাররা দিতে রাজি হয়নি।

আমি খুব লজ্জার সঙ্গে মাথা নিচু করি।

ও বলে—সে যাকগে। আমি শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময়ে যখন কাঁদছিলাম, তখন হঠাৎ দেখি আমার বরও চোখের জল মুছছে। সেই দেখে এমন মায়া হল, বুঝলে। সব সময়ে আমার দুঃখে সুব্রত দুঃখ পায়। তাই আমি ওকে লেডি হিলার বলি। এমন কী ছেলে হওয়ার সময়ে আমার যখন পেইন উঠল, তখন ওরও পেইন হয়েছিল। রিফ্লেক্স পেইন আর কী! সুব্রত ভীষণ ভাল, জানো?

আনন্দে আমারও চোখে জল আসছিল। সামলে গেলাম।

আমার খুব শীত করছে। একটা গানের কলি মনে পড়ে কেবল—যেথা গান থেমে যায়, দীপ নেভে হায় মিলনের নিশি ভোরে, যদি মনে পড়ে সেথায় খুঁজিও মোরে...। শেয়ালদা সাউথ থেকে কিছুকাল কালীঘাট স্টেশন পর্যন্ত ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করেছিলাম। তখন হাফপ্যান্ট পরা, ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে একটা অন্ধ লোককে দেখেছি, গলায়-বাঁধা সিংগল রিডের হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইত। পুরনো আমলের গান শুনে বৃদ্ধ এবং প্রৌঢ়দের বুঝি যৌবন দিনের নানা ব্যথা-বেদনার কথা মনে পড়ত, তাই অনেককে খুব অন্যমনস্ক হয়ে যেতে দেখেছি। একটা বুড়ো লোক একবার লোকটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে খানিকটা গেয়েও ফেলেছিল। তা সেই অন্ধ লোকটা গাইত নিখুঁত। চোখ বুজে শুনলে মনে হত, জগন্ময় সামনে দাঁড়িয়ে গাইছে। এক এক কামরায় লোকটাকে পাঁচ-সাত টাকাও রোজগার করতে দেখেছি।

—কী ভাবছ? মিতুন জিজ্ঞেস করল।

আমি মনে মনে একটু চমকে উঠি। গানের কলিটা দিব্যি গুনগুন করছিল মনের মধ্যে। হঠাৎ চিন্তাটা কখন অর্থনীতির দিকে বেঁকে গেছে। আমি সেই অন্ধ লোকটার কথা অবাক হয়ে ভাবছি। প্রতি কামরায় পাঁচ টাকা গড় রোজগার হলে একটা ট্রেনের দশটা কামরায় রোজগার হয় পঞ্চাশ টাকা। আর দিনে এরকম দশটা ট্রেনেও যদি গান গেয়ে থাকে লোকটা তো তার দিনের রোজগারই ছিল পাঁচশো টাকা। কাটান-ছাড়ান দিয়ে যদি দিনে তিনশোও ধরি, তবে মাসে গিয়ে কত দাঁড়ায়? ন' হাজার! ভাবা যায় না। ভাবা যায় না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—সবই মনে পড়ে। আমি বড় বোকা ছিলাম।

—কিংবা খুব চালাক। মিতুন বলল।

আমি অপরাধীর মতো মুখ নিচু করে রইলাম। এবং ফের আমার সেই অন্ধ লোকটার কথা মনে পড়ল। 'যেথা গান থেমে যায়, দীপ নেভে হায়...' এই বিরহের মন-খারাপ-করা গানের পিছনে কী বিশাল অর্থনীতি! লোকটাকে অবশ্যই আয়কর দিতে হত না এবং সে মাসে নিট ন' হাজার টাকা কামাত, বছরে এক লক্ষ আট হাজার টাকা? আমি আরও কাটান-ছাড়ান দিয়ে হিসেব করতে লাগলাম। ধরা যাক, লোকটা প্রতি ট্রেনে মোট পাঁচটা কামরায় পাঁচ টাকা করে পঁচিশ টাকা রোজগার করত, এরকম পাঁচটা ট্রেন থেকে রোজগার হত একশ পঁচিশ। তা হলে মাসে দাঁড়াচ্ছে তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ, বছরে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা!

তাও ভাবা যায় না। ছেঁড়া হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে ঊর্ধ্বমুখ সেই অন্ধ ভিখিরির বিরহের গানটানগুলোর নতুন একটা অর্থ পেয়ে যাচ্ছি।

আমি বললাম—না মিতুন, আমি মোটেই চালাক ছিলাম না। আমার চেয়ে ঢের বেশি চালাক লোক পৃথিবীতে রয়ে গেছে। আর সেই ভেবেই আমার. মন মাঝে মাঝে খুব খারাপ হয়ে যায়। একটা হাফপ্যান্ট পরা, গেঞ্জি গায়ে, গলায় হারমোনিয়ামওয়ালা অন্ধ ভিখিরিও আমার চেয়ে ঢের বুদ্ধিমান মিতুন। বলেই থেমে গেলাম। মিতুন বুঝবে না। বলে লাভ নেই।

মিতুন একটু অবাক হয়ে চেয়েছিল আমার দিকে। বলল—হঠাৎ ভিখিরির সঙ্গে নিজের তুলনা করছ কেন ইন্দ্রজিৎ। ভালবাসা কি তোমাকে ভিখিরি করেছে নাকি? বলে মুখে আঁচল তুলে হাসল মিতুন।

আবার সেই পুরনো দিনের বিরহের গান। 'ভালবাসা মোরে ভিখারি করেছে...'

শীতে কেঁপে উঠে বললাম—গানের গলা থাকলে বিরহী ভিখিরি হওয়া যে কী ভীষণ প্রফিটেবল, তা তুমি জানো না।

. মিতুন বুঝল না, বুঝবে না, জানতাম। সেই অন্ধ ভিখিরির চিন্তা আমাকে এমনই পেয়ে বসেছে যে, কিছুতেই চিন্তাটা তাড়াতে পারছি না। বন্ধুগণ, গায়ের কোথাও মাছি বসলে তাড়িয়ে দিয়ে দেখবেন,

ফের উড়ে এসে সেখানেই বসেছে। বার বার একই জায়গায় মাছি এসে বসবেই। বড় জেদি। আমার চিন্তাগুলিও অবিকল মাছির মতোই। উড়িয়ে দিলেও ফের এসে বসে। অনেকক্ষণ ভুলতে পারি না। তখন যে কোনও কথাই বলি, তার মধ্যে বিদঘুটে চিন্তার ছায়া এসে পড়ে।

মিতুন বলল—পুরনো কথা থাক ইন্দ্রজিৎ। আমার কোনও দুঃখ নেই।

—আমারও। বলেই ঢোঁক গিললাম।

মিতুন অকপট ব্যথাতুর চোখে চেয়ে বলল— জানি।

তার ওই অদ্ভুত স্বরে 'জানি' কথাটা আমার বুকে ছোরার মতো গেঁথে গেল। তাড়াতাড়ি বললাম—আমি আজও বিয়ে করিনি মিতুন।

সে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়েছিল। ধীরে ফের আমার মুখের ওপর দুটি বড় বড় চোখ স্থাপন করে দ্বিধাভরে জিজ্ঞেস করল—কেন ইন্দ্রজিৎ?

—তোমার জন্য।

বলেই আমি সর্দির প্রথম হাঁচিটি হাঁচলাম। মিতুন অভিজ্ঞতাবলে একটু সরে বসল। মুখটায় আঁচল চাপা দিয়ে বোধহয় বীজাণুর সংক্রমণ আটকাল।

তারপর বলল—তাতে আমার কী যায় আসে ইন্দ্রজিৎ? একটু চুপ করে থেকে আবার বলে—একদিন গড়িয়াহাটায় নেপালদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাকে আমি তোমার কথা জিজ্ঞেসও করিনি। কিন্তু সে বোধহয় ভাবল যে, আমি এখনও সেই ব্যাপারটা মনের মধ্যে পুষে রেখেছি। তাই নিজের থেকেই তোমার অনেক খবর দিল। বলল, তুমি একবার ব্যবসা করতে গিয়েছিলে, একবার কিছুদিন ওকালতিরও চেষ্টা করেছ, ছ'বার চাকরি ছেড়েছ, আর বিয়ে করোনি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—হ্যাঁ। আমি দু'বার ইস্কুল মাস্টারি, দু'বার প্রফেসারের চাকরি, আর দু'বার কেরানিগিরি ছেড়েছি। ল' পাশ করেছিলুম মনের দুঃখে, কিছু করার ছিল না বলে। পসার জমাতে পারিনি। একটা ভারী মজার ব্যবসা করতে গিয়েছিলাম মিতুন। লোকে বুঝল না।

মিতুন সামান্য হাসছিল, বলল—কীসের ব্যবসা?

—সেটা ছিল একটা ইনসিওরেন্সের ব্যবসা। প্রেম ও বিবাহ বিষয়ক বিমা। ধরো ক-এর সঙ্গে খ-এর জেনুইন প্রেম হয়েছে। কিন্তু তাদের বিয়ে হবে কি না তা তো কেউ বলতে পারে না। হয়তো মা-বাবার আপত্তি আছে, বা অন্য কোনও প্রেমিক হুড়ো দিচ্ছে, কিংবা কিছুদিন প্রেম করার পর তাদের নিজেদেরই আর পরস্পরকে ভাল লাগল না। প্রেমের এই অনিশ্চয়তার জন্যই তখন ক আর খ গিয়ে তাদের প্রেমটা বিমা করে এল। যদি তাদের প্রেম বিয়েতে পর্যবসিত না হয় তবে তারা দুজনেই টাকা পাবে। প্রিমিয়াম কম, পলিসিও খুব বেশি টাকার করা চলবে না।

মিতুন একটা তিরতিরে হাসির ঝর্না খুলে দিল। বলল—মাগো।

আমি হাসলাম। বললাম—হাসি পাচ্ছে, কিন্তু ব্যবসাটা সত্যিই হাস্যকর ছিল না মিতুন। প্রেমে ব্যর্থ হলে যদি সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা হাতে আসে, তবে কত ভাল হয় ভেবে দেখো। ইচ্ছে করলে কাশ্মীর বা কুলু ভ্যালি বেরিয়ে আসা যায়, নেশা করা যায়, একটা স্টিরিও সিস্টেম কিনে ঘরে বসে গান শুনে দুঃখ ভোলা যায়। তা ছাড়া টাকাটাই তো ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের কাজ করে; তেমনি আবার ধরো, বিয়ের পর নতুন বর-বউ এসে তাদের ম্যারেজ ইনসিওর করল। যদি বিয়ে কখনও ভেঙে যায়, সেপারেশন বা ডিভোর্স হয় তো সেক্ষেত্রেও দুজনেই মোটা টাকা পাবে। ডিভোর্সের পর যে সুখী হয়েছে সে ওই টাকায় আরও সুখ কিনবে, যে দুঃখী হয়েছে সেও দুঃখ ভুলবার উপায় খুঁজে পাবে। টাকা জিনিসটা অনেকটা ফোম-রাবারের মতো, বেশি দুঃখ-টুঃখ গায়ে লাগতে দেয় না। এই আইডিয়া নিয়ে আমি ব্যবসা করতে গেলাম, ঘর-টর ভাড়া করে সাইনবোর্ডও লিখতে দিয়েছিলাম, কিন্তু লাইসেন্স বের করতে পারলাম না। যে শোনে সেই হাসে।

মিতুন অনেকক্ষণ পর হাসি সামলে বলে—বেশি বয়স পর্যন্ত বিয়ে না করলে মানুষের যে কত বাতিক গ্রো করে! আমার এক ভাশুর আছে, সব সময়ে পাঁউরুটি কিনতে হলেই বালিগঞ্জ থেকে বড়বাজারে যাবে। ওখানেই নাকি ভেজালহীন পাঁউরুটি একটামাত্র দোকান থেকে বিক্রি হয়। হাতঘড়িটা ক'বার দম দেয় জানো? দিনে চারবার। সকালবেলায় চাবি চারবার ঘুরিয়ে ঘড়িটার ব্রেকফাস্ট হয়,

দুপুরে আটপাক দিয়ে লাঞ্চ, বিকেলে চারবার ঘুরিয়ে টি, রাতে ফের আটবার পাক দিয়ে হয় ডিনার। ঘড়ি আর ভাশুর একসঙ্গে চলে।

মিতুনের হাসি থামে না। আমি একটু গম্ভীর হই। মিতুন হঠাৎ আমার সর্দির কথা ভুলে গিয়ে আমার ডান কাঁধের ওপরে প্রায় ঢলে পড়ে বলল—ইন্দ্রজিৎ, এবার বিয়ে করো।

সেই মুহূর্তে ভুতুড়ে কুয়াশা কেটে সোনার রোদ ঝরে পড়ল চারদিকে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেদার সোনালি রোদের চওড়া তক্তা টেরছা হয়ে এসে পড়ল চারদিকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা মাসল ফুলিয়ে বুক দিয়ে একটা মেঘের চাঁই ভেঙে ফেলে হাততালির জন্য গম্ভীরভাবে অপেক্ষা করছে।

আর বাস্তবিক, ঠিক এ সময়ে একটা হাততালির শব্দও হল। আমি ভীষণ চমকে উঠলাম। এবং চকিতে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। না, একটা হাততালিতে পাহাড়টা খুশি হয়নি, আরও চায়। ভ্রূকুটি করে চেয়ে আছে। দু' একটা হালকা মেঘের বল নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে লোফালুফি করছে।

যে লোকটা হাততালি দিচ্ছিল সে কিন্তু থামেনি। সমানে হাততালি দিয়ে যাচ্ছে। এবার সে হাততালির সঙ্গে মাতাল গলায় বলল—বিউটিফুল! ব্রাভো!

তাকিয়ে দেখি, মিতুনের বর সুব্রত। দুটো ভ্রূ ঈষৎ ওপরে তোলা, কপালে ভাঁজ, মুখে স্খলিত হাসি। আমি তাকাতেই আঙুল তুলে বলল—এক মিনিট। বলে ক্যামেরাটা বাগিয়ে ধরল।

মিতুন আমার কাঁধের কাছ থেকে মাথা সবিয়ে নিয়েছে ঝট করে। এবার ভ্রূ কুঁচকে স্বামীকে ধমক দিল—কী হচ্ছে কী?

সুব্রত গম্ভীরভাবে বলল—এক মিনিট। বলে ক্যামেরা ফোকাস করতে লাগল। পারছিল না। হাত সরে সরে যাচ্ছে। মিতুন উঠে গিয়ে ওর নড়া ধরে টেনে এনে পাশে বসিয়ে দিল।

সুব্রত বসে খানিক কাশল। তাবপব আমার সঙ্গে এক লহমায় বন্ধুত্ব পাতিয়ে বলল—ইন্দ্রজিৎ, তুমি একটা বলদ। আমি তোমাদের ঘনিষ্ঠ ছবিটা তুলতে যাচ্ছিলাম, তুমি তখন ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে কী মুণ্ডু দেখছিলে?

আমি স্তিমিত গলায় বললাম—কাঞ্চনজঙ্ঘা।

—দুস শালা! কাঞ্চনজঙ্ঘা পাথর আর বরফের পাহাড়, অনেকদিন একই রকম থাকবে। কিন্তু এই দুর্লভ ভঙ্গিটা তো চিরকাল ক্যামেরার জন্য বসে থাকবে না!

মিতুন খুব রেগে গিয়ে চাপা গলায় বলল—ছবি তুলতে চেয়েছিলে তো চুপচাপ দূর থেকে তুললেই পারতে। লোক জানিয়ে ওরকম হাততালি দিয়ে চেঁচাচ্ছিলে কেন? সবাই কী ভাবল বলো তো!

সুব্রত পা টান করে সামনে ছড়িয়ে মাথা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে বলল—দৃশ্যটা এত বিউটিফুল লাগল যে, আনন্দটা সামলাতে পারিনি। হৃদয় থেকে কোলাহল উঠে এল। মনে হচ্ছিল, আমাদের যেন বিয়ে-টিয়ে হয়নি, আমি এক নবীন যুবক। আর তুমি কুমারী এক যুবতী। এবার ওই ইন্দ্রজিৎ শালার সঙ্গে আমার জোব ফাইট হবে তোমাকে নিয়ে, খুব ফাইট হবে। আর তোমার সঙ্গে দারুণ প্রেম হবে আমার একদিন। তারপব ইন্দ্রজিৎকে তোমার কাছ থেকে আমি কেড়ে নেব।

এই বলে সুব্রত ঢুলতে লাগল। খুব খেয়েছে। শেষ বাক্যটা ও সম্পূর্ণ ভুল বলল। 'ইন্দ্রজিৎকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব' এই কথাটাই ভুল, হবে 'তোমাকে ইন্দ্রজিতের কাছ থেকে কেড়ে নেব'। কিন্তু মাতালরা ওরকম উল্টোপাল্টা বলে। আমি কিছু মনে করলাম না।

সুব্রত ঘুমিয়ে পড়েছে বলে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি মিতুনের দিকে চেয়ে বললাম—কাকে মিতুন?

মিতুন আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল—কী কাকে?

আমি একটু হতাশ হয়ে বলি—মনে নেই, একটু আগে যে বলেছিলে 'ইন্দ্রজিৎ এবার একটা বিয়ে করো।'

—ও। বলে মিতুন হাসল। বলল—কাকে তা কী করে বলি! ভাবিনি তো।

ভাবেনি? আশ্চর্য! এই এত হাতের কাছে সনাতনী থাকতেও মিতুন আমার জন্য কাউকে ভাবেনি? যদিও সনাতনীকে কোথাও এখন দেখা যাচ্ছে না, সম্ভবত মিতুনের ছেলের পিছু নিয়ে ছুটছে। তবু একটা টু দিলেও বোধ হয় সনাতনী শুনতে পাবে। এত কাছে সনাতনী, তবু মিতুল ভাবেনি! না ভেবে পারে

কী করে? এটা কি চূড়ান্ত অভদ্রতা নয়?

সুব্রত চটকা ভেঙে হাই তুলল। মাঝখানে মিতুন, দু পাশে আমরা। সুব্রত ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বলল—একটা সিগারেট দে তো ইন্দ্রজিৎ।

'তুই' শুনে আমি অবাক। 'আপনি' থেকে এত তাড়াতাড়ি কেউ 'তুমি' এবং তা থেকে 'তুই'তে নামতে পারে, এ আমি জীবনে দেখিনি। এবার সনাতনীর বদলে মিতুনের কোলের ওপরে এবং বুকের নীচে বিপজ্জনক আবহমণ্ডলে আমাদের সিগারেটের লেনদেন হল। সিগারেট নিয়ে সুব্রত একটু চোখ টিপল। ফের হাই তুলে বলল—মিতুন, তুমি ইন্দ্রজিৎকে আবার ভালবাসতে পারো না? একটুখানি?

—কী যা-তা বলছ?

—পারলে বেশ হত। ঠাণ্ডা মেরে গেছি, আবার একটু তেতে উঠতাম। একঘেয়ে ভাল লাগে না।

মিতুন ঝাঁঝরে উঠে বলে—তা তো লাগবেই না। তাই এখনও সুদেষ্ণা আর ভারতীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছ! বলে আমার দিকে ফিরে মিতুন বলে—জানো ইন্দ্রজিৎ, কী বদমাশ এই লোকটা! বিয়ের আগে একগাদা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াত। এখনও সেই মেয়েগুলো রেগুলার আমাদের বাড়িতে আসে, আড্ডা মারে। আর, আমিই তাদের চা করে খাওয়াই।

সুব্রত আবার হাই তুলে বলে—ভীষণ ঠাণ্ডা, বুঝলি ইন্দ্রজিৎ? জীবনটা বেজায় ঠাণ্ডা। আমি একদিন নিউমোনিয়া হয়ে মরে যাব। বলে ফের ঘাড় এলিয়ে দিল সুব্রত। ঘুমোতে লাগল।

আমি খুব সামান্য আশার সঙ্গে মিতুনকে বললাম—ভাবোনি এখনও?

মিতুন ভ্রূ তুলে বলল—কী ভাবিনি?

—আমি কাকে বিয়ে করব!

মিতুন গম্ভীর হয়ে বলল—আহা। বিয়ের কথাতে যে অস্থির হয়ে পড়লে বড়!

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম—বয়স হচ্ছে মিতুন। নাউ, অর নেভার।

মিতুন হেসে ব্যাগ থেকে একটা উলের বল আর দুটো কাঁটা বের করে বুনতে বুনতে বলল—কী করো-টরো আগে শুনি। স্বভাব-চরিত্র কেমন? বাড়িতে পুষ্যি ক'জন?

কী অপমান! কী গর্হিত অপমান। আমার সঙ্গে রেজিস্ট্রি করবে বলে এসে যে মেয়েটা একদিন হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল, সে এখন আমাকে যাচাই করছে! অবিকল পাত্রীর পিসি-খুড়ির মতো।

ম্লান হয়ে গেলাম। এক চাপ কুয়াশা এসে চারদিকে ঢেকে ফেলল। একটা গুণ্ডা মেঘ-কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে একেবারে 'নেই' করে দিল।

শীতে কাঁপা গলায় বললাম—আমি একটা ব্যাঙ্কে আছি মিতুন। সরকারি ব্যাঙ্ক।

—অফিসার না কেরানি? মিতুন নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞেস করে।

—প্রায়-অফিসার। আর একটা প্রমোশন পেলেই—

মিতুন হাই তুলে বলল—কত পাও-টাও? আচ্ছা যাকগে, সে জেনে নেওয়া যাবে। ক'জনের সংসার?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চোখে জল আসছে—অবশ্য শীতে না দুঃখে তা বলা মুশকিল। কিন্তু গলায় কথা এল না। দ্বিতীয় হাঁচিটা এল অসময়ে।

আবার মুখটা সরিয়ে নিল মিতুন। দুই হাতে কাঁটা ধরা আছে বলে মুখে চাপা দিতে পারল না। সর্দির ব্যাপারটা আমি ভুলিনি এখনও। এই সর্দি একদিন প্রেম হয়ে মিতুনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তারপর প্রেম ফের সর্দি হয়ে বেরিয়েও গিয়েছিল বুক থেকে।

কিন্তু এসব ভাবার সময় আমার নেই। ওরা কাল চলে যাবে। সময় বড় কম। তাই মিতুনের সর্দির ভয় উপেক্ষা করে আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম—শোনো মিতুন, খুব সিরিয়াস একটা কথা বলছি। আমি কাকে বিয়ে করতে চাই, জানো?

মিতুন ভয়ার্ত মুখে চেয়ে মুখটা যথাসম্ভব সরিয়ে নিয়ে হেলে বসে বলল—কাকে ইন্দ্রজিৎ?

—ওই যে তোমার ননদ, কী নাম যেন—

—সুস্তি? বলে অবাক হয়ে তাকায় মিতুন।

আমি মাথা নাড়লাম।

মিতুন এত অবাক যে আমার সর্দির কথা ভুলে গিয়ে সোজা হয়ে বসল। একটা শ্বাস ফেলে বলল- সুস্তি! কিন্তু—

আমি আশাভঙ্গের গন্ধ পেয়ে ব্যগ্র হয়ে বলি—কেন, কেউ আছে ওর?

মিতুন তাকিয়ে চিন্তান্বিত গলায় বলে— সে তো অনেক আছে। কিন্তু সে কথা ভাবছি না, তোমার বয়স কত ইন্দ্রজিৎ?

—ছত্রিশ।

—যাঃ! মিতুন অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে—ছত্রিশ হয় কী করে? আমার থেকে তুমি কি তবে সাত বছরের বড়?

আমি মাথা নেড়ে বললাম—না। আমরা একই সঙ্গে এম এ পড়তাম, একই বয়সে প্রায়। আমি কখনও ফেলও করিনি যে বয়সে বেশি হব। কিন্তু বয়সের কথা থাক মিতুন। আমি এখনও ব্যায়াম আর আসন করি সকালে। আর বয়সের কথাটা কি তোলা ভাল হচ্ছে মিতুন?

—কী বাজে বকছ? আমি এমনি বয়সের কথা তুললাম।

—আমি জানি, আজ থেকে পনেরো-ষোলো বছর আগে যখন আমি এম-এ পড়তাম, তখন আমার বয়স ছিল একুশ-বাইশ। তুমি আমাব চেয়ে সাত বছরের ছোট হলে তোমার বয়স ছিল চোদ্দ-পনেরো। সেটা অসম্ভব।

—আঃ! অত বোকো না তো! বলে মিতুন বিরক্ত হয়ে মুখটা বিকৃত করে বলে—একটা কথা পেলে সেটাকে তোমরা বড্ড ঘাঁটো। চুপ করো। আমাকে একটু ভাবতে দাও, সুস্তিকে তুমি তো এই একটু আগে প্রথম দেখলে, হঠাৎ এত পছন্দ হয়ে গেল কী করে?

আমি চুপ করে একটু হাসলাম কেবল। কী বলব? নিরন্তর এইভাবে আমি প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। একটাব পর একটা। প্রেম যেন এক গহীন খাদ, তার তলা নেই, আর আমারও পড়ে যাওয়ার শেষ নেই। এবার কোথাও আমার আছড়ে পড়ে যাওয়াটা একান্ত দরকার। হাতি পা ভাঙে ভাঙুক, মরলে মরব, তবু এই পতনশীলতা শেষ হোক।

একটু বাদে আমি সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করি—ভাবছ মিতুন?

মিতুন গম্ভীর গলায় বলে—ভাবছি। তোমাদের গোত্র তো শাণ্ডিল্য?

—হ্যাঁ। আমি আশান্বিত হয়ে বলি—আমরা ব্যানার্জি। তোমরা?

—ওরা রায় লেখে। কাশ্যপ গোত্র আসলে। বিয়ে হয়।

আমি প্রবল একটা বিদ্যুচ্চমক টের পাই বুকে। মেঘ কেটে ফের সোনার রোদ উঠেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে লাল করে দিয়েছে কমজোরি রোদ। খবর পেয়ে রডোডেনড্রন ঝোপ থেকে একটা প্রজাপতি উড়ে এসে আমার নাকের সামনে তার হলুদ ডানা চমকাল কিছুক্ষণ কর্তব্য হিসেবে। তারপর ফিরে গেল বিষয়-কর্মে।

—তা হলে? আমি বললাম।

মিতুন শ্বাস ফেলে বলল—বাব্বা, তোমরা পুরুষরা হ্যাংলাও বটে বাপু! আচ্ছা সুস্তি আসুক, বলে দেখব।

বলতে বলতেই মিতুনের ছেলেকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। পিছনে সনাতনী।

আমি টপ করে উঠে পড়ে বললাম—দোহাই মিতুন, আমার সামনে বোলো না। আমি চলে যাচ্ছি। একদম চলে গেলে, যখন আর আমাকে দৌড়ে গিয়েও ধরা যাবে না বলে মনে হবে, তখন বোলো।

—ওমা! কেন? বোসো, তোমার সামনেই বলছি।

—না, না। আমি ভীষণ ঘাবড়ে যাই। বলে আমি পালিয়ে আসি।

কী নিষ্ঠুর, ও হৃদয়হীন এই অরণ্য! এরকম কখনও দেখিনি। চারধারে গায়ে গায়ে কালো গাছ। বেত-ঝোপের মতো। গাছের রং এত নিকষ কালো হয়? দেখিনি তো কখনও। আর গাছগুলোও কী ভীষণ ভুতুড়ে; তাদের কারওই কোনও শাখা-প্রশাখা নেই, পাতা নেই, একটাও ফুল ফোটেনি কোথাও। যেন দাবানলে কবে পুড়ে গিয়েছিল, তাই শাখাহীন, নিষ্পত্র গাছের দগ্ধ কাণ্ডগুলিই কেবল দাঁড়িয়ে আছে। একটাও পাখি কখনও উড়ে এসে বসেনি এই গাছে, বাসা বাঁধেনি, ডিম পাড়েনি, গান গায়নি। কেবল চারধারে নিকষ গাছগুলি অন্ধকার কোলে করে বসে আছে। আমি তার ভিতর দিয়ে চলেছি। মন দুঃখে ভারাক্রান্ত। এমন করুণ অরণ্য দেখলে কার না মন খারাপ হয়! মাঝে মাঝে এক একটা ধপধপে সাদা গাছ অন্ধকারেও চকমক করে ওঠে। ঠিক যেমন যুদ্ধের সময়ে ব্ল্যাকআউটে মানুষেরা ধাক্কা খাবে বলে গাছে সাদা রং দেওয়া হত ঠিক সেরকম। খুব উঁচু নয় গাছগুলো, খুব মোটাও নয়। অনেকটা বেত-ঝোপের মতো কিন্তু, একটাও কাঁটা গায়ে লাগে না। বরং আমি যখন তাদের ভেদ করে চলেছি তখন তারা নুয়ে নুয়ে পড়ছে বিনীত মানুষের মতো। ভারী অদ্ভুত এখানকার মাটি।। মাটি বলে মনেই হয় না। তুলতুল করছে নরম, নাচলে ফোম রাবারের মতো দোল খায়। আমি কয়েকবার নেচে মাটিতে দোল খেলাম। ধুলো বালি কাঁকর কিচ্ছু নেই, শুধু সব জায়গায় ওই ফোম রাবার। ভারী অদ্ভুত জমিটা তো! একটু এসেই দেখি, বিশাল এক খাদ, খাদের ওপাশে আর একটু ঘন বড় ঝোপ। তারপর একটা উঁচু টিলা চোখা হয়ে অনেক দূর উঠে গেছে। বিস্ময়ভরে আমি সেই অদ্ভুত পাহাড়টা দেখি। জাপানের ফুজিয়ামার মতো নিখুঁত পাহাড়। আর তার গায়ে পাশাপাশি দুটি বড় গুহা, এক মাপের। আর সেই গুহা থেকে উষ্ণ বাতাস বেরিয়ে আসছে মাঝে মাঝে। খাদটা অনেক ঘুরে পার হয়ে কাছে এসে পাহাড়ের গায়ে পা রাখলাম। নরম পাহাড়, এও ফোম রাবারের তৈরি। পা বসে যায়, কিন্তু কোনও ছাপ থাকে না। পা তুলে নিলেই ফের নিটোল হয়ে যায়। অদ্ভুত। কিছুদুর ফাঁকা জমি হাঁটতে হাঁটতে মস্ত এক পুকুরের কাছে চলে আসি। সুন্দর লম্বাটে একটা দিঘি যেন। পাড়ে লম্বা সরু নিষ্পত্র আর শাখাহীন গাছের সারি। আমি পা বাড়িয়ে হঠাৎ পুকুরে নেমে পড়ি। জল বেশি নয়, গোড়ালিও ডুবল না। আর কী ভীষণ পিছল! দু'বার আছাড় খেয়ে সাবধানে এগোই ভারসাম্য রাখতে রাখতে। মনে হয় পুকুরের মেঝেটা একরকম নরম সাদা মার্বেলে তৈরি। সবটা সাদা নয়, মাঝখানে গোল একটা কালো চত্বর। ঠিক তার মাঝখানে একটা কুয়ো, তার মুখটা স্বচ্ছ মার্বেলে ঢাকা। আমি সেই কুয়োয় উঁকি দিই। অত্যন্ত গভীর অতল কুয়ো। তাতে অনেক দৃশ্য ভেসে বেড়াচ্ছে জলের ওপর। উঁকি দিয়েই আমি চমকে উঠে বুঝতে পারি, খুব নিষিদ্ধ জায়গায় আমি উঁকি দিয়েছি। উঠে দাঁড়িয়ে আমি আমার পিছনের পথটার দিকে তাকাই, এবং সব বুঝতে পারি।

আমি আসলে এতক্ষণ আমার নিজের মুখের ওপর দিয়ে হেঁটে এলাম। ওই অরণ্য আমারই না-কামানো দাড়ি-গোঁফ, নাকের পাহাড়। এখন আমি নিজেরই চোখের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। চোখের জলে আমার গোড়ালি এখনও ডুবে আছে। তবে কি আমি ঘুমের আগে কেঁদেছিলাম? নাকি ঘুমের মধ্যেও আমি কাঁদি? আমি চোখের ফুটোয় চোখ রাখলাম। জিজ্ঞেস করলাম—কেন কাঁদো ইন্দ্রজিৎ? কেউ উত্তর দিল না। কিন্তু শুনতে পেলাম, সেই গভীর গুহার মধ্যে হু-হু করে একটা কোকিল কাঁদছে আর কাঁদছে। মাদার গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভিত ইন্দ্রজিৎ। বুঝতে পারি, এই কুয়োর মধ্যেই ইন্দ্রজিতের গোটা জীবনটা মাইক্রোফিলম করে রাখা আছে। কিছুই হারায়নি। আমি গোড়ালি সমান জলে দাঁড়িয়ে দূরের সেই দাড়ির জঙ্গলের দিকে চেয়ে থাকি। কপাল! ইন্দ্রজিৎ যে কেন আজ দাড়ি কামাল না! এই একটু দাড়ির জন্য না জানি তাকে কত রুগ্‌ণ লেগেছিল। সনাতনী কি রুগ্‌ণতা পছন্দ করবে? আর, কালোর মধ্যে কয়েকটা বেমানান পাকা দাড়ি?

পুকুর উপচে জল গড়িয়ে পড়ল ইন্দ্রজিতের গাল বেয়ে। আমি গোড়ালি দিয়ে জল ঘেঁটে দিলাম। পায়ের পাতা দিয়ে আরও চলকে দিলাম জল। কাঁদুক, ইন্দ্রজিৎ একটু কাঁদুক।

স্বপ্নটা ভাঙল সকালে। ঘুম ভাঙতেই প্রথমে দাড়িতে হাত দিলাম। আধ ইঞ্চির কিছু কম হবে। শুঁয়োপোকার মতো শিরশিরিয়ে দিল হাতের তেলো। মনটা খাট্টা হয়ে গেল। গোটা দুই গরম জলের

ব্যাগ ছিল লেপের মধ্যে, তা ঠাণ্ডা মেরে গেছে। নাড়তেই তাদের ভিতরে জল পেট-ডাকার মতো কলকল করে উঠল। বাইরে রোদ দেখছি। কিন্তু তবু কী শীত।

বাথরুম থেকে কাঁপতে কাঁপতে ফিরবার সময় দেখি, মলয়ের মশারি নড়ছে। দাঁড়ালাম, স্ট্যান্ড থেকে মশারির দুটো ফাঁস খোলা। চোপসানো মশারির ভিতর থেকে জালবদ্ধ রুই মাছের মতো ছটফট করতে করতে মুখ বাড়িয়ে বেরিয়ে এল মলয়।

চোখের পাতা আঙুল দিয়ে টেনে খুলে আমার দিকে মিটমিট করে চেয়ে বলল—আজ ক'দিন?

আমি বিস্মিত হয়ে বলি—কীসের ক'দিন?

—তুই ক'দিন হল এসেছিস?

—ও। বলে হাসলাম, বললাম—থার্ড ডে।

ও মাথা নেড়ে বলল—রেকর্ড। থার্ড ডে পর্যন্ত কেউ থাকতে পারেনি এ বাসায়।

—কেন?

ও ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলল—আমি আর টুকি নাকি খুব ঝগড়া করি। তাই।

—ঝগড়া করিস কেন?

—আমি করি না। তবে টুকি বলে, আমি করি। আমি ভাবি, টুকি করে। কে যে আসলে করে তা বোঝা মুশকিল। এ বাড়িতে বোধ হয় একটা ঝগড়ার ভূত আছে, সেই ব্যাটাই আমাদের লাগিয়ে দেয়। তবে, আমি করি না। ঝগড়ার ভয়ে আমি সব সময়ে নেশায় থাকি।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—একহাতে তালি বাজে না মলয়।

—বাজে। মলয় খুব অবহেলায় বলল—আমাদের ছেলেবেলায় একটা চাকর ছিল, ফন্টে। সে পারত। তার কবজির জয়েন্টটা ভাঙা ছিল বোধ হয়। হাতটা জোরে নাড়লে হাতের তেলোটা লটপট করত। ফটাস ফটাস করে সেই কব্জির ওপর ঘা খেয়ে তালির শব্দ তুলত। আমরা একহাতে তালি বাজানো দেখেছি ইন্দ্রজিৎ। কেউ কেউ পারে।

আমি হেসে বলি—সে বাজলেও ঝগড়া কিন্তু বাস্তবিক একা করা যায় না। একজন প্রতিপক্ষ তো চাই।

মলয় বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলে—আমার দিদিমাকে দেখিসনি তাই বলছিস। খুব ঝগড়াটে ছিল। তার ঝগড়ার চোটে দাদামশাই অকালে মারা যান। ছেলেরা সব আলাদা হয়ে যায়। মেয়েরা টপাটপ যাকে-তাকে বিয়ে করে সরে পড়ে। ঝি-চাকর পর্যন্ত ছিল না। ফাঁকা বাড়িতে একা দিদিমা তখন কাক, বেড়াল এদের সঙ্গে ঝগড়া করত। কাক এসে ডেকেছে, কি বেড়াল জানলায় উঁকি মেরেছে তো দিদিমার মুখ ছুটত। তখন কাক বা বেড়াল যদি ডাকত তো দিদিমা দ্বিগুণ রেগে শাসিয়ে বলত—ফের মুখে মুখে জবাব দিচ্ছিস গু-খেগোর ব্যাটা? বলে মলয় হাতের তেলো চিত করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে—একাও ঝগড়া হয়।

আমি প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলে বললাম—টুকি চা করছে দেখে এলাম। ওঠ।

চায়ের কথায় মলয় মুখ বিকৃত করল। আমি দাঁড়ালাম না।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমি দাড়ি কামিয়ে নিলাম। গোঁফ ছাঁটার ছোট কাঁচিটা আনা হয়নি। থাকগে। মোটা গোঁফ এখনকার ফ্যাসন। কেবল একটাই অসুবিধে, গোঁফের চুল বেড়ে এসে আঁকশির মতো ঠোঁটের চামড়ায় লেগে সুড় সুড় করে। বার বার জিভ দিয়ে চেটে গোঁফের ডগা সরিয়ে দিতে হয়।

সর্দিটা এখনও ঠিক মতো লাগেনি। আমি তিন রকম ভিটামিন খাচ্ছি। কাল রাতে ফুটবাথ নিয়ে মোজা পরে শুয়েছি। তরুণ সর্দি অবশ্য জায়গা দখলের চেষ্টা করছে গলায়, বুকে, মাথায় ভিটামিনেরা লড়ছে। আমার শরীরটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়ে লড়াই দেখছে। যে জিতবে সে তার গলাতেই মালা দেবে।

মালার কথাতে মনটা চমকে ওঠে। একটা বিনি সুতোর মালা কি কোথাও গাঁথা হচ্ছে কাল রাত থেকে? কারও বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে এক অদৃশ্য প্রজাপতি কি মালা গাঁথেনি?

একটু বেলা হতেই আমি যথাসাধ্য সাজ-পোশাক করে বেরিয়ে পড়লাম।

স্টেশনের কাছে বড় রাস্তায় উঠবার মুখেই আমার সেই ডেন্টিস্ট ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওপর

থেকে তিনি দেখছিলেন আমাকে। ঠিক যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। গম্ভীর মুখ, গায়ে মস্ত কালো ওভারকোট, মাথায় টুপি, চোখে ভর্ৎসনা। আমি আর তার সঙ্গে এর মধ্যে দেখা করিনি।

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম—ব্যথাটা কমেছে ডাক্তারবাবু, তবে আপনার কাছে যাওয়ার সময় পাইনি। শিগগিরই যাব।

উনি গম্ভীর ভাবে বললেন—আপনি কে?

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বলি—চিনতে পারছেন না? বলে পরশু দিনের ঘটনা বললাম। উনি আমাকে প্রকাশ্য রাস্তাতেই হাঁ করতে বললেন। আমি হাঁ করলাম। উনি ভিতরে উঁকি দিয়ে বললেন—চিনেছি। সেই আপনি, যার ডাক্তারদের ওপর খুব রাগ?

—আজ্ঞে।

উনি বললেন—দাঁত দেখে লোক চিনি। নইলে কারও মুখই আমার মনে থাকে না।

—দাঁতটা কি তোলা একান্ত দরকার ডাক্তারবাবু? আমি ক্ষীণ আশার স্বরে জিজ্ঞেস করি।

—তোলাই উচিত। দুষ্টু দাঁতের চেয়ে—

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম—শূন্য মুখ ভাল?

উনি বিরক্ত হয়ে বললেন—না। দুষ্ট দাঁতের চেয়ে বাঁধানো দাঁত ভাল। দাঁতটা তুলে বাঁধিয়ে দিন, কিছু অসুবিধে হবে না। আমার নিজের সব ক'টা দাঁতই বাঁধানো।

শীতে আমি কেঁপে উঠি। বাঁধানো দাঁত! বাঁধানো দাঁত! ভাবতে ভাবতে বিদায় নিয়ে আমি চড়াই ভাঙি। বাঁধানো দাঁত, পাকা চুল, বয়স। এখনও বিয়ে হল না! ভাবতে ফের শীত করে।

রাঙা রোদের চেলি পরে কাঞ্চনজঙ্ঘা বসে আছে। মাথায় অপরূপ একটা সিঁথিমৌর। একটা মেঘের টায়রা ঝুলছে কপাল থেকে। আমার দিকে এক ঝলক কটাক্ষের রোদ ছুঁড়ে দিল।

লোবো'র দোকান থেকে বেরিয়ে একটা বুড়ো-মতো ক্ষয়া, ছোট চেহারার লোক আমাব আগে কাশতে কাশতে যাচ্ছে। তার পরনে একটা মিলিটারি রঙের পুরনো পুলওভার, কারখানার চিমনির যেরকম অদ্ভুত রং হয়, তেমন রঙের আর তেমনি চেহারার একটা পাতলুন, দুই বগলে দুটো মস্ত পাঁউরুটি। লোকটাকে আমি লক্ষই করতাম না। কিন্তু ওর হাঁটাটা কিছু অদ্ভুত। ডান পা-টা সামনে বাড়ানোর সময়ে ও একটা লাথি মারার ভঙ্গি করছিল। ঠিক যেন একটা অদৃশ্য ফুটবল লাথি মারতে মারতে নিয়ে চলেছে। অন্যমনস্কতার মধ্যেও আমি ওর হাঁটা লক্ষ করলাম। আমার মনের মধ্যে টিক টিক করে কী যেন নড়ে উঠল। একটা স্মৃতি। একটা দৃশ্য।

আজ সকালটাই শেষ সুযোগ। দুপুরের গাড়িতে মিতুন ওরা চলে যাবে। আমি তাই তাড়াতাড়ি হাঁটছিলাম। ম্যাল-এ ওরা নিশ্চয়ই খুব বেশিক্ষণ থাকবে না। বাঁধা-ছাঁদা আছে। বুড়ো লোকটাকে নিয়ে আমি ভাবলাম না।

অন্যমনস্কভাবে আমি হাঁটতে হাঁটতে লোকটাকে পেরিয়ে যাচ্ছি, একবার বে-খেয়ালে ওর মুখের দিকে তাকালাম। লোকটা কাশছে। একটা কম্ফর্টার গলা থেকে খুলে খুব কষ্টের সঙ্গে আবার গলায় জড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পারছে না, দুই বগলে দুটো পাঁউরুটি। হাত তুললেই বিপদ।

ভাবলাম, ওকে একটু সাহায্য করি। হয়তো এই সামান্য উপকারটুকুর জন্যই ঈশ্বর আমার উপঢৌকন সাজিয়ে রাখবেন অদূরের ম্যাল-এ। মানুষের ভাগ্য কোথায় কীভাবে ফেরে, কোন কর্মফল কীভাবে ফলে তা তো জানা নেই।

আমি লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম—দিন, আমি বেঁধে দিচ্ছি।

লোকটা জল-ভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে কাশিতে ভাঙা গলায় একটু অবাঙালি টানে বলল—তার চেয়ে পাঁউরুটি দুটো ধরলে হয় না? মাফলারটা আমিই বরং বাঁধি।

ঠিক। আমার খেয়াল ছিল না। পাঁউরুটি দুটো ধরলাম, লোকটা সাঙ্ঘাতিক শক্ত করে মাফলার বাঁধছে। তার মুখটা হাঁ হয়ে আছে, সামনের দিকে একটামাত্র খয়েরি দাঁত। মুখটা খামচা খামচা শীতের চিমটিতে লাল হয়ে আছে। আমার মনের মধ্যে আবার টিকটিকি ডাকল।

আমি হঠাৎ বললাম, চেলু না?

লোকটা ফঁৎ করে একটা শব্দ করে হাঁ হয়ে তাকাল। ফের কাশির দমক সামলে বলল—কৌন

চেলু?

—তুমি চেলু না? নবীন পাল লেন-এর কাছে কোথাও থাকতে?

—আমি? লোকটা অবাক।

—তুমিই। আমি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বলি—তোমাকে আমি প্রায়দিনই দেখেছি, পুরনো কাগজের গুদামের সামনে বসে বিড়ি খেতে। লোকে বলত পকেটমার।

—আমি চেলু-উলু কোই নাই। আমি পবন সিং।

আমি ধৈর্য হারাই না। নষ্ট করার মতো সময়ও আমার হাতে নেই। তাই বললাম—শোনো, বছর চৌদ্দ আগে আমহার্স্ট স্ট্রিটের কাছে এক ভুজাওলা খুন হয়। তখন রাত সাড়ে বারোটা হবে। আমি একা বৈঠকখানা দিয়ে ফিরছিলাম নাইট শো দেখে। আর কেউ দেখেনি, কিন্তু আমি ঠিকই দেখেছি—

—কী?

—তুমি খুন করেছিলে। তোমার হাতে এই বড় একটা ভোজালি ছিল। পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি।

লোকটা হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে পাঁউরুটি দুটো কেড়ে নিল। বলল—ঝুট।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম—কাউকে বলিনি। হুজ্জত আমি ভালবাসি না। কিন্তু জেনে রাখো, আমি সাক্ষী আছি। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।

সময় ছিল না। লোকটাকে নিয়ে আর বেশি ঘাঁটালাম না। যাকগে, বহুদিন হয়ে গেছে। পুরনো কথাটা তুলতামও না আমি। নিতান্ত লোকটা মিছে কথা বলে আমাকে চটিয়ে দিল, তাই।

আমি প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ম্যাল-এ চলে আসি। প্রথমটায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারদিকে চেয়ে ওদের কাউকেই দেখতে পাই না। অনেক লোক রয়েছে আজ ম্যাল-এ। উত্তরদিকের রেলিঙের কাছে বেশ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু লোক কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছে। গাছের ছায়ায় চিকরি-কাটা রোদ পড়েছে তাদের গায়ে।

আমি ঘুরে ঘুরে লোকের মুখ দেখে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘাড়ের কাছে কার একটা শ্বাস পড়ল। চমকে ফিরে তাকালাম। না, মিতুন নয়। চেলু। বিরক্ত হয়ে বললাম—এখন যাও তো। আমার জরুরি কাজ রয়েছে। পরে কথা হবে।

লোকটা বুঝল বোধহয়। পাঁউরুটি বগলে নিয়ে একটু করুণ চোখে চেয়ে থেকে চলে গেল ধীরে ধীরে। আমি খুঁজতে লাগলাম।

একজন ফিরোজা শাড়ি পরা, শাল গায়ে মহিলা দূরবীন কষে পাহাড় দেখছিল। আমি ডাকলাম—মিতুন!

মিতুন দূরবীন নামিয়ে হেসে এগিয়ে এল—হল না ইন্দ্রজিৎ। কিছু বুঝতে পারলাম না।।

আমি হাঁফাচ্ছিলাম। এতক্ষণে চড়াইয়ে উঠবার ক্লান্তি টের পাচ্ছি। কথা আসছিল না মুখে।

মিতুনের কষ্ট হল বোধহয় আমার অবস্থা দেখে। বলল—তুমি হাঁপিয়ে গেছ। এসো বসি। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই কখন থেকে একা এসে অপেক্ষা করছি। ওরা সব বাঁধা-ছাঁদা করছে।

দু'জনে বসলাম পাশাপাশি। দম ফিরে পেয়ে বললাম—কী হল?

মিতুন ঠোঁট উল্টে বলল—কিছু হল না। কাল রাতের খাওয়া হয়ে গেলে সুস্তি যখন শুতে যাচ্ছে, তখন ডেকে কথাটা পাড়লাম। বলেই মিতুন আমার দিকে একবার কটাক্ষ করে বলে নিল—ভেব না যে তুমি যেমন হ্যাংলার মতো বলেছিলে তেমনটাই বলেছি। বরং তোমার দিকটায় টেনেই বলেছিলাম। সাজিয়ে গুছিয়ে একটু ভূমিকা করে নিয়ে তবে বললাম।

আগ্রহেব সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম—কী হল?

—শুনে ভীষণ খুশি হল। মুখটা স্বপ্ন-স্বপ্ন হয়ে গেল খুশিতে। একটু শিউরেও উঠল আনন্দে। আমাকে ফট করে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল—কী দারুণ ব্যাপাব বলো তো বউদি! মোটে আমার উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, এর মধ্যেই এই নিয়ে পঁচিশটা প্রোপোজাল পেলাম। কী দারুণ ব্যাপার, বলো তো! এই বলে আমাকে ছেড়ে দৌড়ে চলে গেল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, আর আপন মনে বলে—কী দারুণ ব্যাপার, না? দার্জিলিং আসার পর থেকে এ পর্যন্ত

কেউ প্রোপোজ করেনি। এই প্রথম। এই বলে শুতে চলে গেল। আমার একটু অস্বস্তি লাগছিল, হ্যাঁ বা না কিছু তো বলল না! তাই ফের ওর ঘরে গিয়ে দেখি, ও ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমন্ত মুখটাতেও একটু সুখের হাসি লেগে আছে, আর ঘুমন্ত চোখ দুটোও যেন এক স্বপ্নে বিভোর। খুব ভাল লাগছিল দেখতে ওকে।

আমি সচেতন হয়ে বললাম—কী হল? বলেই বুঝতে পারলাম, প্রশ্নটা কয়েকবার করেছি।

কিছু হল না। কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘের ছায়ায় ম্লান হয়ে গেছে। লগ্ন পার হয়ে গেল, তার বর এল না। বিয়ের সাজ ছেড়ে ফেলেছে লগ্নভ্রষ্টা কনে।

মিতুন দুঃখিত মুখে বলল—আজ সকালেও ভাবছিলাম কিছু বলবে বুঝি। ওমা, কিছু না। কেবল বার বার আয়নায় মুখ দেখছে। কিছু বোঝা গেল না। তাই লজ্জার মাথা খেয়ে ফের জিজ্ঞেস করলাম। ও খুব ভাবের ঘোরে বলল—বউদি, এই বয়সে এতগুলো প্রোপোজাল। কী দারুণ বলো তো। তখন বুঝতে পারলাম, ও তোমার কথা ভেবেই দেখেনি, শুধু ক'জনের ভোট পেল সেইটে হিসেব করছে। বলে একটা কটাক্ষ করে বলল—আমরা কিন্তু এরকম ছিলাম না ইন্দ্রজিৎ।

আমি মাথা নাড়লাম।

মিতুন উঠে বলল—চলি ইন্দ্রজিৎ, আর সময় নেই। কলকাতায় আমাদের বাসায় যেয়ো এবার গিয়ে। খুব ভাল লাগবে।

—যাব? বলে আমি তাকাই।

মিতুন একটু নত হয়ে বলল—যেয়ো। সুন্তি না বলুক, আমি তো বলছি। আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি ইন্দ্রজিৎ। তোমাকে দেখলে বড্ড মায়া হয়। বলে চলে গেল মিতুন।

তিনদিন বাদে মেজদা এক্ষুনি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ঝিরঝির করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। তার মধ্যেই একটা লোক সামনে এসে দাঁড়ায়, দুই বগলে দুটো পাঁউরুটি। বলে—বাবু, কী হল?

অন্যমনস্ক আমি মাথা নেড়ে বললাম— হল না।

লোকটা মাথা চুলকোবার চেষ্টায় হাত উঁচু করতে গিয়ে থেমে, মাথা নিচু করে চুলকে নেয়। বলে—আমি চেলু-উলু কোই নাই।

—তুমিই চেলু। বলে বিরক্ত হয়ে আমি উঠে পড়লাম।

লোকটা আমার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলে—আমি শও রুপিয়া দিব আঁপনাকে। আমি চেলু-উলু কোই নাই। বলে একটা মাত্র দাঁত দেখিয়ে খুব হাসল সে।

আমি তাড়া দিয়ে বললাম—ভাগো হিঁয়াসে।

লোকটা পালিয়ে গেল।

ঠিক দুপুরে একটা খাদের ধারে বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম, দুপুরের ট্রেনটা ছেড়ে চলে গেল। বিদায়ের রুমাল উড়ল না। কেউ বলল না—দেখা হবে। দার্জিলিঙে আর কিছুই রইল না। শুধু মেঘ-বৃষ্টি-রোদ-শীত ছাড়া।

অন্যমনস্কভাবে ফিরে আসছিলাম। শেষ ভ্রমণকারীরা ফিরে যাচ্ছে। দার্জিলিং জনশূন্য হয়ে গেল প্রায়। শহরটা কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, ভুতুড়ে হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। জনমানুষ দেখা যায় না।

আমাকে চমকে দিয়ে পিছন থেকে একটা অশরীরী গলা যেন বলে উঠল—ভুজাওয়ালা আমার জরুকে নিয়ে নট্‌খট্ করেছিল।

ফিরে তাকিয়ে দেখি, চেলু। খাদের একদম ধারে দাঁড়িয়ে আছে। বগলে পাঁউরুটি দুটো নেই, কিন্তু ডান বগলে সিকিমি রাম-এর একটা চ্যাপটা বোতল থার্মোমিটারের মতো সযত্নে চেপে ধরে রেখেছে। খাদের একদম ধারে দাঁড়ানো, অল্প অল্প দোল খাচ্ছে শরীরটা। আমি হাঁ করে তাকালাম।

—সাচ বাত। চেলু হাসি-হাসি মুখে বলল।

তার বুড়ো-সুড়ো মুখে এমন একটা অকপট এবং সরল মিথ্যেবাদীর ছাপ ছিল যে, আমার ভিতরে বহুকাল আগের ঘুমন্ত এক জুনিয়ার উকিল জেগে উঠল। বাস্তবিক, আমি একবার আইন পাশ করে

কিছুদিন জুনিয়ার ছিলাম। চেলু সেই ঘুমন্ত উকিলটাকে খুঁচিয়ে তুলল।

আমি চিন্তিতভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে জেরা করার স্বরে জিজ্ঞেস করলাম—তখন তোমার জরু ছিল?

লোকটা চোখ সরিয়ে নিয়ে হঠাৎ বিনয়ের সঙ্গে বলে—ছিল একটা।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। ধমক দিয়ে বললাম—ঝুট। তোমার বউ ছিল না। বরং ভুজাওয়ালার বউ ছিল। আর তুমি তার বউয়ের সঙ্গে নটখট করেছিলে।

সম্পূর্ণ আন্দাজে বলা। কিন্তু লেগে গেল।

লোকটা খুব ব্যথিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর আরও বিনয়ের সঙ্গে বোকা-মুখে মাথা চুলকে বলল—ঠিক ইয়াদ হচ্ছে না। তবে ওই কিসিমের কিছু হোবে। তো আমি আপনাকে দো শো রুপিয়া দিব। লোক পুছলে বলবেন যে, আমি চেলু-উলু কোই নাই।

আমার ভিতরকার উকিলটা জেগেই গেছে। সহজে ঘুমোবে না। খুব গম্ভীরভাবে বললাম—তুমিই চেলু। তোমার কেসটা পরে ভেবে দেখব। এখন যাও তো, আমার মেজাজ ভাল নেই।

লোকটা কোনও কথা না বলে একটা সেলাম করল। সার্কাসের ক্লাউন যেমন ভাঁড়ামি করতে করতেও অনেক শক্ত খেলা দেখায়, তেমনি খাদের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে মাতাল শরীরের চমৎকার ভারসাম্য রাখতে রাখতে আব টলতে টলতে লোকটা চলে গেল। ডান পাটায় তেমনি একটা অদৃশ্য ফুটবলে লাথি মারতে মারতে। মাতালরা অবশ্য বড় একটা দুর্ঘটনায় পড়ে না।

আমি কতদুর বিষণ্ণ ও হতাশ হয়েছি তা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বুকে মাঝে মাঝে একটা পেরেক ঠোকার যন্ত্রণা হচ্ছে। আমার চারদিকের পৃথিবীটা ছাইবর্ণ। অল্প-স্বল্প বৃষ্টি পড়ছে। ভিজে যাচ্ছি, কিন্তু গ্রাহ্য করছি না। এক চাপ সাদা অবয়বহীন কুয়াশা গড়িয়ে নেমে আসছে। শরীরের ভিতরকার প্রতিরোধ কমে যাচ্ছে। টের পাচ্ছি সর্দি ও ভিটামিনের লড়াইতে ভিটামিনেরা জোর মার খাচ্ছে সর্দির হাতে। আমার শরীর সর্দিকেই মালা দেবে বলে তৈবি হয়েছে।

আপাদমস্তক কুয়াশায় ডুবে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ি। চারদিকে অদৃশ্য বৃষ্টির ফোঁটা হেঁটে চলেছে। সেই শব্দে একটু উন্মুখ হয়ে উঠি। ক'দিন জোর বৃষ্টি গেছে, যদি রাস্তার ধস নেমে রেলগাড়িটা আটকে যায়? বুকের ভিতরটায় দপ করে আলো জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ভিটামিনেরা দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ করে সর্দির ভাইরাসকে। সর্দি পিছু হটে যায়। শরীর তার উদ্যত মালা নামিয়ে রাখে।

পরমুহূর্তেই ভাবি, কী লাভ? সুস্তির কাছে আমি আয়না বই তো নয়। কী লাভ! ভাবতেই ভিতরকার আগুনটা মিইয়ে যায়। ভিটামিনেরা মাথা নিচু করে সরে আসে। সর্দির ভাইরাস লুঠেরার মতো শরীর দখল করতে থাকে।

৫

বিকেলে টুকি আমার জিভের তলা থেকে থার্মোমিটার টেনে নিয়ে দেখে বলল—একশো দুই।

আমি ম্লান হেসে বললাম—চার পর্যন্ত উঠবে।

—কেন যে এ সময়ে দার্জিলিঙে এলেন। আরও আগে আসা যেত না?

আমি চোখ বুজে বললাম—অনেক আগে আসার জন্য চেষ্টা করছিলাম। প্রত্যেকদিন রিজার্ভেশনের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতাম—ঘুলঘুলি পর্যন্ত পৌঁছবার অনেক আগেই টিকিট শেষ হয়ে যেত। এইভাবে রোজ গিয়ে দাঁড়াই, আর ফিরে আসি। অর্ধেক ছুটি এইভাবে শেষ হয়ে যায়। অবশ্য আশেপাশে ব্ল্যাকাররা ঘুরে বেড়াত, দশ, পাঁচ বেশি দিয়ে অনেকেই তাদের কাছ থেকে টিকিট কিনে নিল। আমি ভাবলাম, দেখিই না প্রপার চ্যানেলে কত দিনে পাওয়া যায়। সেইটে পেতে গিয়েই এত দেরি। পনেরো দিনের চেষ্টায় পেলাম।

টুকি একটা শ্বাস ফেলে বলে—এসে কষ্ট পেয়ে গেলেন।

আমিও শ্বাস ফেলে বললাম—ভীষণ কষ্ট।

টুকি অন্যমনস্ক হয়ে বলে—এ বছর বৃষ্টিটাও ছাড়ছে না। জলপাইগুড়ি কুচবিহারে খুব বন্যা হয়েছিল

শুনছি। কলকাতার ট্রেন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

জ্বরের ঘোরে আমি চেয়ে থাকি। বন্যা? আমার ভিতরটা হঠাৎ খুব অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মাথার ভিতরে ছুরির ধারের মতো একটা ব্যথা ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখের ডিম দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যন্ত্রণায়। ক্রমশ চেতনার বেলাভূমি ছেড়ে চলে যাচ্ছি এক মহাসমুদ্রের দিকে। জ্বরের ঘোরে বাস্তবতার মধ্যে কে যেন চামচে নেড়ে মিলিয়ে দেয় খানিক স্বপ্ন, স্মৃতি, মতিভ্রম। বন্যার কথায় চোখের সামনে আলিপুরদুয়ারের সেই ছেলেবেলার বন্যা ভেসে আসে।

ভরা বর্ষার পর একদিন সকালে উঠে দেখি বহুদূর পর্যন্ত একটা জলের চাদর বিছিয়ে আছে। মাঠ-ঘাট দেখা যায় না। তখন আলিপুরদুয়ার জংশনের নতুন পত্তন হচ্ছে মাত্র। অনেক মাঠ ছিল, ফাঁকা জমি ছিল। আমরা থাকতাম পশ্চিম দিকে, রেললাইনের ওপরে।

বহুদূর পর্যন্ত সেই জল দেখে একটু কেমন শিউরে উঠেছিলাম। আমাদের কোয়ার্টারের পাশেই রেল লাইন। সকালে সেদিন কোনও ট্রেন এল না। সবাই বলছে লাইন ভেঙেছে। গাড়ি বন্ধ। আমাদের তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। মিলিটারি আমলের একটা গাড়ির পেট্রল ট্যাঙ্ক কী করে আমাদের ঘর-গেরস্থালিতে ঢুকে গিয়েছিল। সেটাকে মা চালের ড্রাম বা জলপাত্র করবার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিদঘুটে আকৃতির জন্য সেটা কোনও কাজেই লাগত না। প্রতিবার যারা কোয়ার্টারের জানলা-দরজা রং করতে আসত তারা ওটাকেও রং করে দিয়ে যেত, আমাদের অনুরোধে; সেই অকেজো ট্যাঙ্কটাকে ভেলা বানিয়ে ভেসে পড়বার চেষ্টা করলাম। কিছু দূর সেটা ভেসেও গেল বেশ। সামনের মাঠ পার হয়ে একটা নিচু জমি, সম্ভবত সেখান থেকে মাটি তুলে রাস্তার ভিত উঁচু করা হয়েছিল। সেইখানে এসেই ট্যাঙ্কটার মুখের ন্যাকড়ার ছিপি গেল খুলে। পাক খেয়ে সেটা ডুবে যাচ্ছিল। লাফিয়ে নেমেই আমি টের পেলাম, আমাদের নিত্যকার দেখা পরিচিত সেই মাঠটায় আমার ডুব-জল। আর জলে একটা চোরা টান। বৃষ্টির জমা জল নয়, কোথা থেকে যেন জল আসছে। ভয়ঙ্কর জল।

সাঁতরে ফিরে এসে দেখি, বাসার সামনে সিঁড়ির নীচে গোড়ালি ডুব-জল ছিল, এখন সেখানে আরও এক বিঘত বেড়ে গেছে। বাবা চিন্তিত মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ঘরের ভিতরে চাকর রামজী আর মা মিলে জিনিসপত্র উঁচু জায়গায় তুলছে। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায়, ক্রমশ জলের চাদরটা উঁচু হয়ে উঠছে। সামনের রাস্তাটায় ওধার থেকে এক ঝলক পাতলা স্রোত এপাশে এসে পড়ছে তখন। সেই জলের ভিতর দিয়েই মা, আমার ছোট ভাইবোন আর দিদিকে নিয়ে উঁচু ভিতের তালুকদার বাড়িতে চলে গেল। বাবা আর আমি রইলাম।

এক অফুরান, অজানা উৎস থেকে জল আসছেই, আসছেই। আমাদের বারান্দার ভিত-এ ছলাৎ-ছল করে ভাঙছে ঢেউ। সামনের মাঠের ওপর দিয়ে নদীর ধার থেকে কারা কলার ভেলায় ভেসে আসছিল। দেখলাম, হঠাৎ জলের একটা ঘূর্ণিতে ভেলাটা পাক খেয়ে বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। মাথায় মোটঘাট নিয়ে লোকে বুক-জল ভেঙে চলেছে উঁচু ডাঙায়। তখন ডাঙা বলতে রেল লাইনের বাঁধটা জেগে আছে। আমাদের বারান্দায় কানায় কানায় জল উঠে এল দুপুরের আগেই। জলে কত কী ভেসে যাচ্ছে গেরস্থালির জিনিস। আমি কোমর-জলে নেমে গিয়ে একটা কৌটো ধরলাম। ফাঁকা দেখে জলে ফেলে দিলাম ফের।

চেনা জায়গাটা পাল্টে গেছে হঠাৎ। চেনা রাস্তাঘাট নেই, মাঠ নেই, গাছ ডুবে যাচ্ছে—সে এক অদ্ভুত বিস্ময়। থমথম করে জল বেড়ে যাচ্ছে।

বাবা ধমক দিয়ে বললেন—জলে যেয়ো না। স্রোত।

দুপুরের মধ্যেই বারান্দা ডুবে পাতলা জলের স্রোত নিরীহের মতো চৌকাঠ ডিঙোল। বাবা আর আমি খাটের প্রতিটি পায়ার নীচে চারটি করে ইঁট দিয়ে উঁচু করলাম। খাটের ওপর তোষক গুটিয়ে ট্রাঙ্ক বাক্স রাখা ছিল, বেজায় ভারী। বাবা একটা আগাথা ক্রিস্টির বই খুলে খাটে বসে রইলেন। ঘরে অবিরল জল ঢুকছে। ঘোলা স্রোতময় জল। স্রোতের ভিতরে একটা গভীর টানের শব্দ। যেন পিছনে এক গুপ্ত মহাসমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ ঘটে গেছে।

বাবা খাটের ওপর থেকে জিজ্ঞেস করেন—কত জল?

আমি একটা কাঠের রুল টানার স্কেল ডুবিয়ে মেপে বলি—ছ' ইঞ্চি।

ক্রমে স্কেলটার ডুব-জল হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে এক ফুট ছাড়িয়ে গেল। প্রবল একটা স্রোতের শব্দ চারদিক থেকে পাক খেয়ে খেয়ে আসে। সেই জলের মধ্যে চবাস চবাস করে ফের বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। ঘরের মধ্যে কেমন করে ঢেউ দিচ্ছে জলে। পুরনো জুতোর বাক্স, কাঠের রিল, ঘর মুছবার ন্যাতা, পুরনো ঝাঁটা, পায়খানার মগ চোখের সামনেই খোলা দরজা দিয়ে ভেসে চলে গেল মহাসমুদ্রে। কোমর-সমান জলে দাঁড়িয়ে মহা আনন্দে এঘর-ওঘর করি। রাশি রাশি ঘুরঘুরে পোকা জলের কানায় ওপরে দেয়ালে সেঁটে আছে। একটা মস্ত বিছে দেয়ালে লেগে ছিল, সাড়া পেয়ে চিড়চিড় করে জলে নেমে ফের গিয়ে একটা কাঠের বাক্সে সেঁধোল। পায়খানা ভাসিয়ে গু ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে-দোরে।

বাবা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করেন—কত জল?

জল মাপি না আর। জলের ওপর থেকে খাটের উপর পর্যন্ত মেপে বলি—আর এক ফুট বাকি।

বিকেল হতে না হতেই মেঘের আড়ালে আলো মরে এল। অনেক খুঁজে-পেতে রান্নাঘরের দুটো কংক্রিটের তাক-এর একটায় হ্যারিকেন পেয়ে জ্বাললাম। তক্ষুনি নজরে পড়ে একটা বাটিতে ঢাকা পাঁচ ছ'টা সেদ্ধ ডিম। ডিম বোধহয় রাতের জন্য রেখে গেছে মা। একটা ডিম খাই। দুটো হ্যারিকেন জ্বেলে একটা বাবাকে দিই, অন্যটা তুলে ধরে ফের এ ঘর-ও ঘর করি। জলে আলো পড়ে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে হয়। আমাদের চেনা ঘর-দোরে কে যেন বাইরের দুনিয়াকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘরের আব্রু ঘুচিয়ে অচেনা পৃথিবীর সঙ্গে তাকে এক করে দিয়েছে জল।

হাত-পা সিঁটিয়ে আসে। কখনও উঁচু পড়ার টেবিলে উঠে বসে থাকি। দেখি, কত কৌটো, শিশি, ভাঙা বাসনপত্র, পোঁটলা-পুঁটলির স্তূপ যত্ন করে জলের নাগালের বাইরে ওপরে তুলে রেখে গেছে মা। সংসারের কত অকেজো জিনিসও কাজে লাগবে বলে অকারণে তুলে রাখা হয়। সেই স্তূপের ওপরে বসে দেখি, মানুষের জমানো জিনিসের দিকে হাত বাড়িয়ে আসে নির্দয় উদাসীন পৃথিবীর দুর্যোগ।

একবার জলে নেমে দেখি আমার বুক ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রায়। বাবা ও ঘর থেকে ভয়ার্ত গলায় ডাকেন—ইনু, তুমি কোথায়?

—এ ঘরে।

—সাবধান! স্রোত।

স্রোতটা টের পাই। সাঁতরে ও ঘর থেকে এ ঘরে আসি। খাট আর ইঞ্চি ছয় বাকি আছে। ঢেউ উঠে খাটের ওপরটাও ভিজে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ঘর থেকে স্রোতের টানে উঠোনের দিকে ভেসে যাচ্ছে একটা ছাইদানি। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি, জলের চাপে, স্রোতে তা বন্ধ করা যায় না।

বাবা বই বন্ধ করে বললেন—এবার কী হবে? আরও যদি বাড়ে?

ভয় পেয়ে বলি—কী করব বাবা?

—তুমি কোনও তাকের ওপর উঠে বসে থাকো। খুব জল ঘেঁটেছ।

সবটুকু ডুবে যেতে আর খুব বেশি দেরি ছিল না। বাইরের জগতে কোনও মানুষের শব্দ নেই। একটা রেল ইঞ্জিনও কু দিল না। কেবল প্রবল বৃষ্টির শব্দের ভিতর দিয়ে জলের ঢেউ ভাঙার শব্দ এল। রান্নাঘরের তাকের ওপর বসে একটার পর একটা ডিম শেষ করি। হ্যারিকেনের আলোয় দেখি, থোপা থোপা কেঁচো জমে আছে আশেপাশে। একটা হেলে সাপ জল ভেঙে লিকলিক করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জল থমথম করে। জল গভীর। দরজার মাঝ বরাবর ছাড়িয়ে আর একটু ওপরে উঠেছে।

বাবা ডাকেন—ইনু।

আমি বলি—এখানে।

জলের ওপর দিয়ে দুজনের স্বর অন্যরকম হয়ে যায়। আমরা কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারব না, বুঝলাম। স্রোতময় জল আমাদের মাঝখান দিয়ে মহাসমুদ্রের দূরত্ব রচনা করছে। সেই সময়ে হাতে আধ-খাওয়া ডিম থেমে থাকে। জলের কল্লোলে কী একটা মহা-ভয় ও মহা-আনন্দে ভেসে আসে। হ্যারিকেনের আলোয় জল নাচে। আমাকে প্রার্থনা করে। হা-হা আনন্দে কখন ফের লাফিয়ে পড়ি জলে। তোলপাড় করি চারিদিক। দুই ঘরের মাঝখানে অন্ধকার স্রোত পেরোই। লণ্ঠন উঁচু করে বসে বাবা সভয়ে জল দেখেন। সেই উঁচু-করা লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মানুষের তুচ্ছতা বুঝতে পেরে সেই

শিশু বয়সেও বুঝি কেঁদেছিলাম।

আজ ফের দার্জিলিঙে জ্বরের ঘোরের মধ্যে সেই বন্যাটা এল। চারদিকে জল আর জল। লণ্ঠন উঁচুতে ধরে চেয়ে আছে কে? বাবা! না, বাবা নয়, ও তো টুকি।

—দার্জিলিঙে বন্যা হচ্ছে না তো টুকি?

টুকি হাসে—দার্জিলিঙে সেদিন বন্যা হবে, যেদিন সৃষ্টি রসাতলে যাবে বুঝলেন?

—তবে কি আলিপুরদুয়ারে?

টুকি থার্মোমিটার জিভের তলায় গুঁজে দিয়ে বলে—ডাক্তার আনতে যাচ্ছি, দাঁড়ান।

আমি মাথা নাড়ি—না। আমার জ্বর বেশিক্ষণ থাকে না। সুটকেসে কয়েকটা পেনিসিলিন আছে, আর পেইনকিলার। ওতেই হবে। জল কত উঠল? থার্মোমিটার মুখে নিয়েই বলি।

—দাঁড়ান, দেখছি। বলে থার্মোমিটারটার আরও একটু ঠেলে দিয়ে বলে—কথা বলবেন না, ভেঙে যাবে।

আমি জলের কল্লোল শুনতে পাই। ভেঙে গেছে পোল, ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়তলিতে। অঝোরে বৃষ্টি। সুন্তি, মিতুন ওরা সব ঝাপসা বৃষ্টির দিকে চেয়ে বসে আছে। পুরো এক শতাব্দী যদি ওই অঝোর বৃষ্টি না থামে? সব আটকে থাকবে। আমি দার্জিলিঙে, সুন্তি রাজপথে, ক্রমে জল উঠে আসবে ছ' হাজার ফুট উঁচুতে। ক্রমে জল—

টি এক্স আর মল্লিকবাবুর বড় মেয়ের পেটে একটা ব্যথা উঠেছিল, পেটের মধ্যে একটা নাড়ি জড়িয়ে গিয়েছিল অন্যটার সঙ্গে। কুচবিহার বা জলপাইগুড়ির হাসপাতালে নিয়ে গেলে বাঁচত। কিন্তু সেবার বন্যায় সব বন্ধ। কোথাও নেওয়া হল না। আলিপুরদুয়ারের হাসপাতাল কিছুই নয়। অপারেশন করার ব্যবস্থা ছিল না। লক্ষ্মীদি মরে গেল। ভরা আঠারো বছরের যুবতীর মৃতদেহ সেই প্রথম দেখি, চেনা মানুষের মড়াও সেই প্রথম।

ভোলা যায় না। আমার কণ্ঠদেশ ছুঁয়ে জলের বাড়ন থামল। আধঘণ্টা ওই ভাবেই থেমে রইল জল। তারপর কমতে লাগল। রাত দশটার সময়ে আমাদের ঘরে আধফুট পলিমাটি আর অজস্র পোকার গিজগিজ রেখে জল বারান্দার কানার নীচে নেমে গেল। মা, ভাইবোন, রামজী সব ফিরে এল। কোদাল আর টিনের টুকরোয় পলি পরিষ্কার করছি। সব ডিম খেয়ে ফেলার জন্য মা আমাকে বকছে। মল্লিকদের কোয়ার্টার থেকে কান্নার আওয়াজ এল সে সময়ে। আমরা সবাই থেমে উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম।

বাবা বলে উঠলেন—লক্ষ্মীকে আনল বোধ হয়।

মা ডিমের কথা ভুলে চোখ মুছে বলল—আহা, লক্ষ্মীটা এসে কত সেলাই-ফোঁড়াই করে নিয়ে গেছে আমাদের বাসা থেকে। এই সেদিনও লেস-এর নতুন নকশা তুলে নিয়ে গেল।

এক দুই মিনিট আমরা লক্ষ্মীদির জন্য চুপ করে রইলাম। কিন্তু সময় তো বেশি নয় মানুষের। ফের পলি পরিষ্কার করতে লাগি। মা রান্না চাপায়। আর আমাদের ঘর-সংসারের সেই নানা কাজ-কর্মের মধ্যে দূর থেকে এক শোকের বাতাস এসে বয়ে গেল বারবার।

—জল কত টুকি?

—চার।

আমি চোখ চাই। হেসে বলি—জ্বর নয়। জল।

—জল খাবেন?

মাথা নেড়ে বলি—না।

—তবে?

চোখ বুজে বলি—কিছু নয় টুকি। আপনি বুঝবেন না। বলে পাশ ফিরে শুয়ে থাকি।

আমার চারপাশে সেই কৈশোরের বন্যার জল বয়ে আনে কত ঘর-গেরস্থালির জিনিস। জল থেকে আমি একটা ভাসন্ত কৌটো তুলে নিই। ঢাকনা খুলে দেখি তাতে ছুঁচ, কুরুশকাঠি, হরেক রঙের সুতো। ফেলে দিই। একটা বিছে প্রশ্নচিহ্নের মতো বাঁকা হয়ে লেগে আছে দেয়ালে। জলের ওপরে উঁচুতে লণ্ঠন তুলে ধরে আছে বাবা।

সকালে ঘুম ভেঙেই বুঝতে পারি, জ্বর ছেড়ে গেছে। প্রচণ্ড শীত। বাইরে শার্সির গায়ে ঘন কুয়াশা লেগে আছে। কিছু দেখা যায় না।

উঠে বসতে ইচ্ছে করে না। নড়তে ইচ্ছে করে না। জ্বরের পর শরীর বড় অবসন্ন। ক্লান্ত। শুয়ে থাকি। কোনওখানে কোনও শব্দ নেই। কেবল সাদা কুয়াশা, কাচের শার্সি, আর আমি।

অনেক বেলায় টুকি ঘরে আসে। আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। টুকি এসে জাগাল—উঠুন। শরীর কেমন? বলে কপালে হাত রেখে খুশি গলায় বলে—ওমা। জ্বর নেই তো।

—আমার জ্বর বেশিক্ষণ থাকে না। একবার একজন ডাক্তার বলেছিল, আমার শরীরের নাকি প্রতিরোধ শক্তি খুব বেশি। তাই অমন ধাঁ করে জ্বর উঠে যায়। আবার কমেও যায়।

টুকি হেসে বলল—আহা। কাল রাতে বুঝি ডাক্তার আসেনি। আপনি তো অচৈতন্য। ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশন দিল, ওষুধ খাওয়ানো হল। এমনি এমনি কমেনি মশাই। আমি অনেক রাত পাশে বসে বার বার ব্যাগের জল পাল্টে গরম জল ভরে ভরে বিছানা গরম রেখেছি।

আমি বিস্মিত হয়ে বলি—এত কাণ্ড! টের পাইনি তো।

—টের পাবেন কী করে। যা জ্বর। বলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল টুকি। গলা নামিয়ে বলে—আপনার বন্ধু কাল রাতে যা কাণ্ড করেছে তা বলার নয়।

—কী?

—বলতে লজ্জা করে। বলে সে সজল চোখে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বলল—কাল আমি অনেক রাত পর্যন্ত এঘরে ছিলাম। ও তো জানতও না যে আপনার জ্বর হয়েছে। বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ মাঝ-রাতে উঠে বিছানায় আমাকে না দেখে উঠে এসেছে। আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বলল—তুমি ওর ঘরে গিয়ে কী করছিলে? এই বলে যে কী রাগ করল? কোনও কথাই বোঝাতে পারলাম না। ওর তখন বিশ্বাস হয়ে গেছে যে আমি—বলে টুকি চোখের জল মুছল। একটু সামলে নিয়ে বলল—তাই প্রথমে মারল। তারপর ফের অনেক আদর করল। শেষে আবার মদ গিলে পড়ে রইল।

—কেন?

—কে বলবে! ওইরকম। যাকগে, ওসব নিয়ে আপনি যেন ভাববেন না। আমাদের সম্পর্কটা একটু ভুতুড়ে। উঠুন চা করছি।

মলয় অনেক বেলায়, প্রায় এগারোটায় উঠে চোখের পাতা আঙুলে টেনে পৃথিবী দেখল।

আমাকে দেখে বিস্ময়ভরে বলল— তুই?

আমি মাথা নেড়ে বললাম—আমিই।

—যাসনি এখনও?

—না।

—সাবাস। এ প্রায় বিশ্ব রেকর্ড। কেউ পারেনি এ পর্যন্ত।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম— তুই টুকিকে ত্যাগ কর।

—কেন?

—আমি ওকে বিয়ে করব।

—বিয়ে? বলে মলয় মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে সচেতন করার চেষ্টা করল, নিজের পায়ে চিমটিও কাটল। বলল—নেশাটা খুব জোর ধরেছে দেখছি। কী বললি?

—ঠিকই শুনেছিস।

আমি গম্ভীর। মলয় ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে থেকে বলে—বিয়ে? টুকিকে?

—বিয়ে। টুকিকে। বলে আমি সিগারেটের প্যাকেট খুলছিলাম। মলয় অন্যমনস্ক ভাবে হাত বাড়াল। আমি ওকে একটা সিগারেট দিলাম।

সিগারেট ধরিয়ে মলয় হঠাৎ মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বলল—টুকির তো বিয়ে হয়ে গেছে। না কি! বলে আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ মাথা নেড়ে বলল—যাঃ, তা হয় না। আমাকে

রেঁধে দেবে কে?

—আয়া।

মলয় তখন আর কিছু ভেবে না পেয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বলে—আর আমার মশারি টাঙিয়ে দেবে কে?

আমার ভিতরকার জুনিয়ার উকিলটা হাই তুলে জেগে উঠল। আমি তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে বললাম—দার্জিলিঙে মশা নেই। মশারির দরকার হয় না।

মলয় উদাসভাবে বলল—হয়। মশার জন্য নয়; মশারি টাঙালে শীত কিছু কম লাগে। তাই আমরা টাঙাই।

আমি সওয়াল করার ভঙ্গিতে বললাম—তাতেও আটকায় না। মশারি একবার টাঙালেই তোর এক জীবন চলে যাবে। দরকার মতো মশারি থেকে বেরিয়ে আসবি, দরকার মতো ফের ঢুকে যাবি। মশারি না খুললেই হল।

মলয় ভীষণভাবে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ থমকে উঠল—আমাব ছেলেরা তোকে বাপ ডাকবে নাকি?

—না। কাকা কিংবা আঙ্কল।

হতাশ হয়ে মলয় বলে—সব তা হলে আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলি। টুকি কী-বলে। ও কি রাজি হয়েছে?

আমি একটু দ্বিধাভরে বলি—ওকে এখনও বলিনি। তবে বললে রাজি হবে বলেই মনে হয়।

মলয়ের মধ্যেও বোধহয় এক ঘুমন্ত উকিল জেগে ওঠার লক্ষণ দেখায়। মলয় চোখের পাতা টেনে যত দূর সম্ভব তীক্ষ্ণভাবে আমাকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করে—তুই কি টুকিকে ভালবাসিস?

আমি একটু দ্বিধায় পড়ে যাই। প্রশ্নটা খুব শক্ত। তবু চোখটা সরিয়ে নিয়ে আমি বলি—বাসব।

গভীর একটা শ্বাস ফেলে মলয় বলে—তা হয় না ইন্দ্রজিৎ। তুই টুকিকে ভালবাসতে পারবি না। ওর অনেক ডিফেক্ট, লক্ষ করিসনি? প্রথমত, বয়স হয়ে গেছে, চর্বি হয়ে ফিগারটাও আগের মতো নেই। মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, নাকটা ভাল নয়, তার ওপরে অসম্ভব মেজাজ। বলে মলয় খুব নিশ্চিন্তের হাসি হেসে বলে—তোকে তো জানি, কী ভীষণ খুঁতখুঁতে তুই। সেই কী একটা ঘোষ, কোন একটা মুখার্জি, একজন কী যেন চৌধুরী—এদেরও প্রেমে পড়েছিলি তুই, মনে আছে?

আমি মাথা নাড়লাম।

মলয় বলল—শেষ পর্যন্ত কারও সঙ্গেই তোর হল না। তার মানে, তুই কাউকেই শেষ পর্যন্ত ভালবাসতে পারিসনি। টুকিকেই কি পারবি ইন্দ্রজিৎ? খুব রিস্ক নিচ্ছিস। ওর ডিফেক্টগুলোও একটু ভেবে দেখ।

আমার ভিতরের উকিলটা ফেব হাই তুলে পাশ ফিরে শুল। আমি গম্ভীর একটা শ্বাস ফেললাম। কথাগুলো ভেবে দেখার মতো।

উঠতে যাচ্ছিলাম, মলয় বলল—শোন।

—কী?

—আরও একটা অসুবিধা আছে।

—কী সেটা?

—আমি টুকিকে ভীষণ ভালবাসি। ওকে ছাড়া একদিনও থাকতে পারি না। ভীষণ ভালবাসি।

আমি অবাক হয়ে বলি—ভালবাসিস?

—ভয়ঙ্কর। মলয় বলে—তোকে একটা ভূতের কথা বলেছিলাম না? আমাদের ঝগড়া-ঝাঁটির ব্যাপারটা সেই ব্যাটাই করে। নইলে, আমি তো ভেবেই পাই না, টুকি ছাড়া আমার আছেটা কে?

মলয়ের ছোট ছেলেটা গম্ভীরভাবে ঘরে এসে সোজা বাপের লেপের মধ্যে ঢুকে গিয়ে কী যেন খুঁজছে। মলয় ধমক দিয়ে বলল—কী খুঁজছ এখানে?

ছেলেটির করুণ গলা লেপের তলা থেকে শোনা গেল—অ্যামব্রেলা।

সত্যি সত্যি ছেলেটা বিছানার জঙ্গল থেকে একটা ছাতা টেনে আনল বাইরে। গম্ভীরভাবে চলে

গেল। ছেলের চলে-যাওয়ার দিকে চেয়ে থেকে মলয় ভাবালু গলায় বলে—মাই সন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলে—তুই টুকিকে নিয়ে গেলে আমার থাকল কী বল? মাতাল হয়ে পড়ে থাকি, তাই লোকে ভাবে আমার হৃদয় নেই। ভয় খাই রে ইন্দ্রজিৎ, কে কবে টুকিকে টেনে নিয়ে চলে যায়। তা হলে আমি একদম জমি ধরে নেব, আর উঠব না।

আমার বুকটা কেমন করে ওঠে। চোখে জল আসতে চায়। ধরা-গলায় বলি—নেব না।

—নিবি না তো? মলয় উৎসাহের সঙ্গে বলে।

—না। কথা দিচ্ছি।

—নিস না। আমি ওকে ভয়ঙ্কর ভালবাসি। তুই বরং টুকিকে গিয়ে কথাটা বলে আয়।

—কী?

—ওকে গিয়ে বল যে আমি ওকে ভীষণ ভালবাসি, ওকে ছাড়া বাঁচব না। যা।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি—দাঁড়া। টুকি বাজারে গেছে, আসুক।

মলয় আমার আর একটা সিগারেট নিয়ে ধরায়। খুব অধৈর্যের সঙ্গে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলে—আসছে না কেন বল তো? কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো?

—না, কী হবে! রোজ বাজার করছে।

—কী জানি, বড় ভয় করে। টুকি যা দুষ্টু না। সব সময়ে লাফিয়ে বা দৌড়ে চলাফেরা করবে। কোথায় কখন পড়ে-টড়ে যায়। দাঁড়া, গিয়ে দেখে আসি বলে মলয় উঠতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে টুকি ঘরে এসে ঢুকল। মুখ গম্ভীর, হাতে বাজারের বাস্কেট। একবার আমাদের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিক্ষেপ করে ভেতর দিকে চলে গেল।

মলয় খুব অবাক হয়ে টুকিকে দেখল, যতক্ষণ দেখা গেল চোখ ফেরাল না। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল—ইন্দ্রজিৎ, টুকিটা যা সুন্দর হয়েছে না, দেখতে। অনেকদিন পর ওকে ভাল করে দেখলাম।

ওঘরে টুকির গলার স্বর শোনা যাচ্ছে, ছেলেকে বলছে—কেন তুমি ছাতা নিয়ে তাক থেকে লাফ দিলে? ছাতাটা কি প্যারাস্যুট? এখন ছাতাটা সারাতে কে যাবে?

মলয় চাপা গলায় বলল—যা ইন্দ্রজিৎ। গিয়ে বলবি যে, আমি ওকে ভীষণ ভালবাসি। ওকে ছাড়া বাঁচব না। যা।

আমি যাচ্ছিলাম। মলয় ডেকে বলল—দাঁড়া।

—কী?

—সে ইট উইথ ফ্লাওয়ারস।

—ফ্লাওয়ারস! কিন্তু এখন ফুল কোথায় পাব?

—বাইরে আগাছার মতো কত গাঁদা ফুটে আছে। তাই একটা তোড়া বেঁধে নিয়ে যা।

বাইরে কুয়াশা কেটে গিয়ে ফুটফুটে রোদ উঠে পড়ল। কাঞ্চনজঙ্ঘা অহংকারে আরও দু হাজার ফুট উঁচু হয়ে উঁকি মারছে। দেখে নিচ্ছে, আর ক'জন ভ্রমণকারী অবশিষ্ট আছে দার্জিলিঙে। এখনও মুষ্টিমেয় কিছু আছে। তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা আলো-ছায়ার পরম্পরায় নানা রকম খেলা দেখাতে থাকে। যখন শেষ ভ্রমণকারীটিও চলে যাবে, যখন তাকে দেখার আর কেউ থাকবে না, তখন সে তার শীতের দীর্ঘ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়বে।

বিস্তর গাঁদা ফুটে আছে। আর মাঝে মাঝে লাল গোলাপ, ডালিয়া। আমি কাশতে কাশতে ফুল ছিঁড়ছি, এমন সময়ে সামনেই একটা খাড়াইয়ের ওপর থেকে একজন ডাকল—বাবু!

মুখ তুলে দেখি চেলু, একটা মাত্র দাঁতে খুব অমায়িক হাসি হাসছে। আমাকে তিনটে আঙুল তুলে দেখাল।

—কী? আমি প্রশ্ন করি।

—তিন শ'ও দিব। আমি পবন সিং, চেলু-উলু কোই নাই।

—তুমিই চেলু। আমি গম্ভীরভাবে বললাম—এখন আমার কাজ আছে। তুমি যাও।

লোকটা ম্লান মুখে চলে গেল । আমি কাশতে কাশতে তোড়া বাঁধি। মনটা ভাল নেই। এত রোদের

মধ্যেও চারদিকে একটা পোড়া ছাইয়ের রং দেখি। দার্জিলিঙের শেষ আকর্ষণটুকু কাল দুপুরের গাড়িতে চলে গেল। আমি গভীরভাবে সুস্তির কথা ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে সে যেন শরীর ধারণ করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

তাকে বললাম—সনাতনী।

সে সম্মোহিতের মতো বলে—উঁ।

ফুলের তোড়াটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম—নাও। আমার কথা ফুলই বলবে।

সনাতনী তোড়াটা নিয়ে বুকে ছুঁইয়ে বলল—কী মিষ্টি! কী রোমান্টিক!

—ফুল কী বলছে সনাতনী? শুনতে পাচ্ছ?

—পাচ্ছি। আপনি আমাকে—

—হ্যাঁ। ভীষণ।

—আমাকে ছাড়া—

—আমিও। সনাতনী বলল।

ঠিক এই কথায় টুকি বেরিয়ে এসে বলে— এ কী, কালই আপনার একশো চার জ্বর গেছে, আর এই ঠাণ্ডায় ফুল তুলছেন যে বড়? শিগগির ভেতরে গিয়ে লেপ চাপা দিন, আমারই ভোগান্তি।

সুস্তির ঘোর তখনও আমার মাথা থেকে যায়নি। এদিকে মলয়ের শেখানো কথাগুলিও মাথায় খেলছে। ফুলের তোড়াটা টুকির দিকে এগিয়ে দিয়ে খুব বিষণ্ণ মুখে বললাম—ফুলের কথা কি শুনতে পাও টুকি?

টুকি অবাক হয়ে বলে—ফুলের কথা। সে আবার কী?

আমি গম্ভীর গলায় বলি—ফুল বলছে, আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।

টুকি তোড়ার জন্য হাত বাড়িয়েছিল। যেন মুহূর্তে ফুলের মধ্যে সাপ দেখে সরিয়ে নিল হাত। তারপর হঠাৎ তার মুখ হয়ে গেল সাদা, কুঁকড়ে সরে যেতে যেতে সভয়ে বলতে লাগল—না না, তা হয় না ইন্দ্রজিৎবাবু। তা হয় না। আপনি খুব ভুল করছেন।

আমি ম্লান হেসে বললাম—কথাটা আমার নয় মলয়ের।

—কী কথা?

আমি 'তুমি' ছেড়ে ফের 'আপনি' করে বললাম—মলয় আপনাকে বলতে বলেছে যে, ও আপনাকে ভীষণ ভালবাসে। আপনাকে ছাড়া ও বাঁচবে না। ও বলেছিল—সে ইট উইথ ফ্লাওয়ার্স।

টুকি গভীর শ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঈষৎ লাল হয়ে বলে—ছি ছি, কী কাণ্ড বলুন তো? তাই আপনি রোগা শরীরে এসে ফুল তুলছেন এই শীতে! যান তো, ঘরে যান।

—মলয়কে কী বলব?

ও কেমন লজ্জা পেয়ে বলে—কী আবার। বলবেন ফুলের তোড়াটা আমি নিয়েছি।

—আর কিছু বলার নেই? যেমন আপনি ওকে ভীষণ ভালবাসেন, ওকে ছাড়া বাঁচবেন না?

—যাঃ। বলে টুকি মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—ও কিন্তু শুনবার জন্য খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছে।

—তা হলে বলবেন। টুকি বলে।

আমি আস্তে জিজ্ঞেস করি—উইথ ফ্লাওয়ারস?

হাসতে গিয়েছিল টুকি। হাসির মধ্যেই দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে নামল।

৬

বন্ধুগণ, আমি আমার হারানো দার্জিলিং এবারও খুঁজে পেলাম না। সেই কবে শিলিগুড়ি থেকে দেখা এক রহস্যময় মহাপর্বত মেঘের মতো ডেকেছিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা কোথায় কোন সুদূরে চলে গেছে। কতবার আসি, মনে হয়—এ নয়। এ শহর তো নয়। আমার সেই শৈশবের চোখে একটা শহরের ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল কল্পনায়। কিছুতেই সে ছবি মিলিয়ে যায় না। সে এক অদ্ভুত সুন্দর

ম্লান-আলোর উপত্যকা, চারধারে নীল পাহাড় হাসিমুখে চেয়ে আছে, শহরের মাঝখান দিয়ে নদী, নদীর ওপর ঝুলন্ত পোল। আকাশে রামধনু-রঙা নানাবর্ণের মেঘ ভেসে যায়। পথে পথে স্থলপদ্ম ফুটে থাকে। রাস্তা আকীর্ণ থাকে ঝরা ফুলে। দোয়েল শ্যামা ডাকে, আসে হরবোলা কাকাতুয়া। স্বর্গের পাখিরাও আসে। ফুলের মধু খেতে প্রজাপতিদের সঙ্গে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায় মেয়ে-পরীরা। মানুষ সেখানে জেগেও স্বপ্নের ভিতর বাস করে।

মশাইরা, দার্জিলিঙে ফুল ফোটে, পাখি গায়, মেঘ ভেসে যায়। তবু কিছুতেই ছবিটা মেলাতে পারি না। তাই পাঁচদিনের মাথায় ফিরে যাচ্ছি। ছুটি খুব বেশি বাকি নেই। আমার আরও কিছু দেখে যাওয়ার বাকি আছে। যেমন কাটিহারের সেই মাদার গাছটা—যেখান থেকে সেই আশ্চর্য কোকিল ডেকেছিল। কিংবা আলিপুরদুয়ার জংশনের পশ্চিমের মাঠটা, যেখানে ডুবে গিয়েছিল পেট্রলের ট্যাঙ্ক। কিংবা কুচবিহারের সেই ইস্কুলবাড়ি—যেখানে হোটেলের কাঁচা ঘরে প্রথম থাকতে গিয়ে মায়ের জন্য মন-কেমন-করায় ইন্দ্রজিৎ কেঁদেছিল হাপুস নয়নে।

মলয়ের কাছে বিদায় নিতে যাই। বলি—মলয়, যাচ্ছি।

নেশার ঘোর থেকে মলয় চোখ টেনে খুলে তাকাল। ভ্রূ কুঁচকে বলল—উইথ টুকি? অর উদাউট টুকি?

একটা বিখ্যাত টনিক কিনতে গেলে দোকানদাব যেমন সব সময়ে জিজ্ঞেস করে নেয়—উইথ ক্রিয়োজোট, অর উইদাউট ক্রিয়োজোট? কিংবা টুথপেস্ট কিনতে গেলে জিজ্ঞেস করে—উইথ ক্লোরোফিল, অর উইদাউট ক্লোরোফিল? ঠিক সেরকম স্বরেই মলয় জিজ্ঞেস করে।

আমি অহংকারের সঙ্গে বললাম—উইদাউট টুকি।

—থ্যাঙ্কস। ওকে বলিস যে আমি ওকে ভীষণ—

—বলেছি। আমি গাম্ভীর্য বজায় বাখি।

—উইথ ফ্লাওয়ারস! ও বলে। আবাব ঘুমিয়ে পড়ার আগে বলে—কেউ পারে না। তুই পারলি।

—কী পারলাম?

—এতদিন থাকতে। ওই ভূতটা কাউকে থাকতে দেয় না।

আমি একটা শ্বাস ফেললাম। টুকি ছলছলে চোখে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল—কী করে থাকব বলুন তো!

—আপনাদের খুব জ্বালিয়ে গেলাম। বলে ছেলেটাকে একটু আদর করি। আজও ওর গালে 'ক্যান্ডি'র আঠা। আমার হাতটা চটচটে হয়ে গেল।

টুকি বলল—শীত আসছে। একদম একা থাকব। ভীষণ একা।

কুলির মাথায় মাল তুলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। চড়াইয়ের একটা বাঁক পার হতেই মলয়ের বাড়িটা আড়াল পড়ে যায়। তখন আর ওদের জন্য কষ্ট হয় না। স্টেশন পর্যন্ত উঠতে উঠতেই ভুলতে থাকি। ভুলে যাওয়াই ভাল, ভুলে যাওয়াই স্বস্তিকর।

হাঁফাতে হাঁফাতে স্টেশনের মোড় পর্যন্ত উঠে এসেই দেখতে পাই, আজও নিজের প্রস্তরমূর্তি হয়ে ডেন্টিস্ট মশাই দাঁড়িয়ে আছেন। বাস্তবিক আমার একবাব সন্দেহ হল, দার্জিলিঙের অধিবাসীবৃন্দ হয়তো সময় থাকতেই তাদের প্রিয় দাঁতের ডাক্তারের একটি মূর্তি তৈরি করে এখানে স্থাপন করেছেন। মূর্তিটি খুবই নিখুঁত, সন্দেহ কী? তেমনি গম্ভীর মুখশ্রী, দু চোখে ভর্ৎসনা।

আমি লজ্জিতভাবে সেই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে অভ্যাসবশে হাঁ করলাম। উনি জীবন্ত হয়ে উঠে আমার দাঁত দেখে বললেন—ইন্দ্রজিৎবাবু না? যিনি ডাক্তারদের পছন্দ করেন না।

—অ্যাজ্ঞে হ্যাঁ।

উনি অত্যন্ত কঠোর গলায় বললেন—চলে যাচ্ছেন?

আমি খুব অনুতপ্ত হয়ে বলি—দাঁতটা তোলার সময় হল না।

উনি শ্বাস ছেড়ে বললেন—কষ্ট পাবেন। দাঁতের জন্য মায়া হচ্ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু দাঁত একটি অভ্যাসমাত্র। গত চোদ্দো বছর ধরে আমার আসল দাঁত নেই। বলে তিনি দাঁত কিড়মিড় করে আমাকে তার নিখুঁত বাঁধানো দাঁত দেখিয়ে বললেন—কেউ বুঝতেই পারে না যে এ নকল দাঁত। আমি নিজেও ভুলে যাই। এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, আমার বাঁধানো দাঁতে কাঁকর পড়লেও আমি শিউরে উঠি,

খড়কে দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করি, ভাল পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজিও। এমন কী আমার দাঁতেও মাঝে মাঝে ব্যথা হয়।

—বলেন কী? খুবই অবাক হই।

—অভ্যাস। বললেন ডাক্তার—তাই বলছিলাম, দাঁতটা তুলে ফেললেও পারতেন। দুষ্টু দাঁতের চেয়ে—

—বাঁধানো দাঁত ভাল। আমি তাড়াতাড়ি শ্লোগান পূরণ করলাম।

উনি খুব গম্ভীর স্বরে বললেন—আবার বড় আশা ছিল যে, আপনার দাঁতটা আমিই পাব। বলে তিনি হতাশার ভাব করে আবার স্ট্যাচু হয়ে গেলেন।

আমি সেই প্রস্তর-মূর্তিকে একটা কুণ্ঠিত নমস্কার এবং অস্ফুট 'আসি' বলে স্টেশনের দিকে হাঁটিতে লাগলাম। মনটা বিষাদে ভরে গেল। আমার বড় আশা ছিল যে, আপনার দাঁতটা আমিই পাব' এই হৃদয়বিদারক বাক্যটা কিছুতেই ভুলতে পারি না। উনি আমার বেয়াড়া দাঁতটাকে চেয়েছিলেন মাত্র। কী ক্ষতি ছিল দিয়ে দিলে? ভাইসব, আমি কাউকেই বড় একটা উপেক্ষা করতে পারি না। যখনই বাজারে যাই, আলুওলা পটলওলা ডাকাডাকি করে, কেউ যদি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে একবার বলে 'বাবু নিয়ে যান' তো আমি গলে যাই। এরকম কোমলমতি ও কোমলহৃদয় বলে যে ঢ্যাঁড়স আমি জন্মে খাই না, তা-ও ঢ্যাঁড়সওলা আধ কেজি ব্যাগের মধ্যে গুঁজে দেয়। বাসায় ধূপকাঠির স্তূপ থাকতেও একটা খোঁড়া ধূপকাঠিওলা প্রায় দিনই আমাকে চিমসে গন্ধওলা সব কাঠি গছায়। ফুটপাথের দোকান থেকে ওই স্বভাবের দরুন কত অকেজো জিনিস কিনে এনেছি। তার মধ্যে লাল বেলুন, বাঁশি, লজেন্স, ঝুটো গয়না সবই আছে। এমনই চক্ষুলজ্জা আমার যে, যখন পাজি মুদি ওজন কমায় বা পুরনো খবরের কাগজ কিনতে এসে কাগজওলা যখন ওজন বাড়ায়, তখনও আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পাখি বা প্রজাপতি দেখি। সেই আমার কোমল হৃদয় একজন ডেন্টিস্টের জন্য ব্যথিত হবে না কেন? কোনওদিন ভুলব না, তিনি আমার কাছে একটা মাত্র দাঁত চেয়েছিলেন।

দুপুরের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে একবুক শূন্যতা নিয়ে। এতই শূন্য যে তার বুক ঝাঁঝরা করে খোলা জানলা-দরজা দিয়ে রোদ, বাতাস এবং চড়াইপাখি আনাগোনা করছে। সে যেন যাওয়ার গাড়ি নয়। মনে হয় সে যেন আসবার গাড়ি। একটু আগেই সে এসে পৌঁছেছে, আর সব যাত্রী নেমে যাওয়াব পর সে দাঁড়িয়ে আছে, ধোলাই হতে যাবে বলে।

সন্দেহে আমি একজন কালো কোট-পরা লোককে জিজ্ঞেস করলাম—দাদা, গাড়ি যাবে তো?

তিনি উদাস উত্তর দিলেন—রোজই তো যায়।

বুঝতে পারলাম, দার্জিলিং থেকে চলে যাওয়ার আর প্রায় কেউই নেই। আমিই বোধহয় শেষ ভ্রমণকারী, চলে যাচ্ছি। এমন ফাঁকা গাড়ি দেখে আমি খুব বেছে বেছে একটা কামরায় দেখলাম—বেঞ্চের গায়ে একটা হলুদ প্রজাপতি বসে আছে। সেইটেয় উঠলাম।

জানলা দিয়ে দেখি, কাঞ্চনজঙ্ঘা 'উঁকি' মেরে দেখে নিচ্ছে, আমি উঠেছি কি না। শেষ ভ্রমণকারী চলে যাচ্ছে, তার আর কোনও কাজ রইল না। একটা হালকা মেঘের রুমাল উড়িয়ে সে আমাকে বিদায় জানাল। গত কিছুদিন যাবৎ সে ভ্রমণকারীদের অনেক কসরত দেখিয়েছে। আর কেউ দেখার রইল না। তাই সে পায়ের কাছ থেকে একটা ধূসর মোটা মেঘের কম্বল টেনে নিয়ে গা ঢাকা দিল, শুধু নাকখানা জেগে রইল উঁচুতে। তারপর ঘুমোতে লাগল। এমনকী বাতাসিয়া লুপ পার হয়ে গাড়ি যখন চলেছে, তখন আমি স্পষ্ট পাহাড়টার নাকের ডাক শুনতে পেলাম।

এক ফাঁকা কামরায় বসে আমি অবাক হয়ে পাহাড়ের নাক-ডাকা শুনতে শুনতে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলাম।

উঠে একটু এদিক ওদিক ভাল করে দেখতে গিয়েই অবাক হই, একটা বেঞ্চের পিঠের আড়ালে কুঁকড়ে শুয়ে বাস্তবিক একটা লোক নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। রোগা ছোট্ট মতো লোক, মুখটা একটা পুরনো গোল টুপি দিয়ে ঢাকা, পাতলুনের হাঁটুর কাছে পটি, আর নোংরা কোটের পকেট থেকে পিস্তলের নলের মতো একটা সিকিমি রাম-এর বোতলের মুখ বেরিয়ে আছে।

টুপিটা তুলে নিয়েই আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। লোকটা তৎক্ষণাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসল। মাথাটা

এদিক ওদিক ঝাঁকিয়ে ঘুম বা দুঃস্বপ্ন জলকণার মতো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল মাথা থেকে। জল থেকে উঠে আসা হাঁস যেমন ঝাড়ে।

তারপর একটা মাত্র দাঁত দেখিয়ে খুব হাসল সে। হাত তুলে চারটে আঙুল দেখিয়ে বলল—চারশ'ও দিব। আমি চেলু-উলু কোই নাই। ভুজাওলা-উজাওলা কোই কিসিকো সাথ আমার জান পহছান ছিল না।

আমি গম্ভীর ভাবটা বজায় রেখে বললাম—গাড়িতে উঠলে কখন? স্টেশনে তোমাকে দেখিনি তো।

লোকটা প্রশ্রয় পেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—স্টেশন থেকে না। ছোট ট্রেন তো আহিস্তা যায়। আমি রাস্তা থেকে টুক করে রানিং গাড়িতে উঠলাম, দেখলাম কী আপনি পাহাড়-উহার দেখছেন। তো ডিস্টার্ব না করে একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করে নিলাম।

খুবই সস্তা সিগারেট। এই ব্র্যান্ড আমি খাই না। তবু মায়া বশে আমি একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে ডাকলুম—চেলু।

লোকটা একটু চমকে উঠল। তারপর ব্যথাতুর মুখে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে—পবন সিং।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—না।

সে খুব ব্যথিত হয়ে বলল—পাঁচশও। শালা ভুজাওলা আমার জরুকে নিয়ে—

আমি ধমক দিয়ে বললাম—না। তুমি ভুজাওলার বউকে নিয়ে—

সে খুবই তেতো মুখে বলে—হোবে। অ্যানেক দিনের কথা তো, ঠিক ইয়াদ হচ্ছে না। তো সেই জরুটা ভুজাওয়ালার ভি ছিল না।

—তবে কার ছিল?

—ঠেলাওয়ালা রামরিখের। কিন্তু—বলে লোকটা টুপি তুলে মাথা চুলকে বলে—কিন্তু রামরিখের ভি জরু ও ছিল না। ছাতুওয়ালা রঘুবীর তাকে দেশ থেকে ফুসলিয়ে এনেছিল। কিঁউ কী, দেশে ওই জরুটার দুসরা আদমি ছিল। কিন্তু সে আদমিটার আগেও অন্য কেউ ছিল। ঠিক বুঝা মুশকিল বেপারটা।

—তবে জরুটা ছিল কার? আমি ফের জুনিয়ার উকিলটার জেগে ওঠা টের পাই।

লোকটা উদাসভাবে বলে—কৌন জানে! ছাতুওয়ালা রঘুবীর তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসে। রঘুবীরকে কুছ পয়সা-উইসা দিয়ে জরুটাকে রামরিখ নিয়ে নিল। তো রামরিখকে একদিন তাড়ির সঙ্গে জরী পিইয়ে দিল ভুজাওয়ালা, রামরিখ মিটিয়া কলেজে মরে গেল, আর জরুটাকে নিয়ে ভাগল ভুজাওয়ালা। তারপর—বলে খুব অস্বস্তির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে থাকে চেলু।

আমি আগ্রহী হয়ে বলি—দারুণ মেয়ে তো! তো সেই মেয়েটা এখন কোথায়?

উত্তর না দিয়ে চেলু তার কোটের বোতাম খুলে, শার্ট খুলে বুকটা আদুড় করে ফেলছিল। আমি ভাবলাম, লোকটা বুঝি বুকের হৃৎপিণ্ডের জায়গাটা দেখিয়ে খুব রোমান্টিক গলায় বলবে—এইখানে।

আশ্চর্য এই যে, লোকটা সত্যিই তার বুকের হৃৎপিণ্ডের কাছে জায়গাটা দেখিয়ে বলল—এইখানে।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে সে একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলল—দেখুন, আলোতে ভাল করে দেখুন। বলে সে জানলার দিকে ঘুরে বসে বুকটা দেখাল। দেখি হৃৎপিণ্ডের ওপর দিকটায় মস্ত একটা কাটা দাগ। দাগটা দড়ির মতো ফুলে তেলতেলে হয়ে আছে।

চেলু বুকের বোতাম আঁটতে আঁটতে বলল—ফুনসেলিং-এর তেলওয়ালা শালা চাক্কু মেরে জরুটাকে নিয়ে ভাগল। আমি এক বরিষ হাসপাতালে ছিলাম।

—তা হলে সেই তেলওলাব সঙ্গেই এখন—

চেলু মাথা নেড়ে বলে—না, না। তেলওয়ালা এখন মাদারিহাটে কাজ-কারবার করে, আমাকে কিছু টাকা-উকা দিয়ে মিটমাট করে নিয়েছে। জরুটা তার কাছেও নাই।

মাথা গরম হয়ে গেল। বললাম—তবে?

লোকটা রাম-এর বোতলের মুখটা শক্ত হাতে চেপে ধরে বলে—কৌন জানে! তেলওয়ালার কাছ থেকে এক গাড়িওয়ালা নিয়ে ভাগে।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললাম—গাড়িওয়ালার কাছেও নিশ্চয়ই নেই।

লোকটা খুব গম্ভীরভাবে বলে—সে বাত ঠিক। গাড়িওয়ালার লাশ দুই মাহিনা পরে গুলমা স্টেশনে পাওয়া যায়। তো বাবু, আমি পাঁচশো রুপিয়া দিব, মিটমাট করে নিন। আমি চেলু-উলু কোই নাই। লোকে পুছলে বলবেন কি আমি পবন সিং।

আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম—তুমিই চেলু।

চোখের পলকে লোকটার আরও এক বছর বয়স বেড়ে গেল। মুখের চামড়া আর একটু কুঁচকে যায়, চোখ আরও ঘোলা, পিঠটা একটু কুঁজো। লোকটা রাম-এর বোতল তুলে হড়হড় করে মুখে ঢালল। কিন্তু সেটা না গিলে কলকল করে কুলকুচো করতে লাগল। খুবই ব্যথিত মুখ।

কুলকুচো শেষ করে সে রামটা গিলে ফেলল এবং মুখ থেকে ফুড়ুক করে কুলের বিচির মতো একমাত্র দাঁতটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। তারপর যখন ঢেঁকুর তুলল লোকটা, তখন দেখি তার মুখটা সম্পূর্ণ ফোকলা।

সে গম্ভীর মুখে বলল—হুঁশও।

দাঁতের প্রতি এমন উদাসীনতা আমি কদাচিৎ কারও দেখেছি। মেজদা আমার মাড়ির হাড়-মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে, তবু মায়া বশে আমি তাকে তুলিনি। দার্জিলিঙে এক ডেন্টিস্টকে বিষণ্ণ ও হতাশার অন্ধকারে রেখে এসেছি। এখনও বাক্যটা ভুলতে পারি না 'আমার বড় আশা ছিল যে, আপনার দাঁতটা আমিই পাব'। আমার পুরো বত্রিশটা থেকে তাঁকে একটাও দিয়ে আসতে পারিনি। রবি ঠাকুরের কবিতায় পড়েছিলাম, এক কৃপণ রাজা-ভিখারিকে ঝুলি থেকে একটামাত্র কণা ভিক্ষে দিয়েছিল। তা সেই কণা সোনার কণা হয়ে ফিরে এসেছিল। ডেন্টিস্টও তো বলেইছিলেন, আমার দেওয়া দাঁতও তিনি ফিরিয়ে দেবেন সোনারুপো বা প্লাস্টিকে বাঁধিয়ে। আমি দিতে পারিনি। আর এই লোকটা, যার দাঁতের বংশে বাতি দিতে একটিমাত্র অবশিষ্ট ছিল, সেটাও কত অনায়াসে ভ্রূক্ষেপই না করে কুলের বিচির মতো ফুড়ুক করে ফেলে দিল।

এই প্রথম আমি চেলুর প্রতি একটু শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়ি। মুহূর্তের মধ্যে আরও এক বছর বয়স বেড়ে যাওয়াতে লোকটা আর একটু জড়সড় হয়ে বসে। বসে মিটমিট করে আমার দিকে চেয়ে বলে—হুশও বাবুজি?

আমি চিন্তিতভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম—গাড়িওলা খুন হওয়ার পর কী হয়েছিল?

লোকটা ফের ফোকলা হাসি হেসে বলে—শুনতে চান? গাড়িওয়ালার এক চাচাতো ভাই ছিল, কাপড়াওয়ালা। কলকাতার বড়বাজারে বহুত বড়া দোকান। তো সেই ভাই—

—বুঝলাম। আমি শ্বাস ফেলে বলি—তারপর সেই কাপড়ওলা—

সে মাথা নেড়ে বলে—আর জানি না, তবে আন্দাজ হয় কি কাপড়াওয়ালার ভি চৌপট হয়ে গেছে।

আমি মাথা নাড়লাম। তারপর তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম—সেই মেয়েটা দেখতে কীরকম ছিল চেলু?

লোকটা আতঙ্কে ফের বয়স বাড়িয়ে ফেলল। ব্যথিত হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলল—হুশও। আমি চেলু-উলু কোই নাই। পবন সিং।

আমি কঠিন গলায় বলি—সেই মেয়েটা কেমন ছিল?

লোকটা টুপি তুলে মাথা চুলকে বলে—ভাল ছিল। তবে 'মোস্ট বিউটিফুল' যেরকম হয় সেরকম না। অর্ডিনারি ভাল ছিল। পাতলি-উতলি, গোরা-উরা, আর নাক-টাক, চোখ-টোখ সব ভাল। কিন্তু 'মোস্ট বিউটিফুল' না।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম—খুব সুন্দর নয় তো তোমরা সবাই পাগল হলে কেন?

চেলু খুব মর্মাহত হয়ে বলে—কিন্তু বহুত পিয়ার জানত লায়লী। যখন যার কাছে থাকত এয়সন প্যার করত যে, তার মরদের গায়ে বাতাস ভি জোরে লাগত না। লায়লীর মতো কে ভালবাসবে? খুব ভাল খানা পাকাত, বহুত আচ্ছা করে ঘর সাজাত, মরদকে খুশ রাখবার জন্য তার জান কবুল ছিল। ওই দেখলে পুরুষেরা ঠিক থাকতে পারত না। আউরাত তো বহুত পাওয়া যায়, কিন্তু পিয়ার?

আমি গাম্ভীর্য না হারিয়ে বললাম—তো এখন যদি লায়লীর সঙ্গে দেখা হয় তো কী করবে? খুন

করবে না?

—খুন? বাপরে! বলে চেলু চোখ বড় করে আতঙ্কিত চোখে তাকায়। বলে—খুন কি? এখন তো বুড়ো হয়ে গেছি, তবু ফিন দেখা হলে একদম পায়ের ওপর গিরে গিয়ে বলব— লায়লী, একদফে ঐসন পিয়ার করো মেরে জান। দুনিয়াতে আর কেউ কভি ওইসব পিয়ার করেনি, তোমার মতো। একদফে ফিন করো, আর ওই পিয়ারের রোশনি থাকতে থাকতে আমার চোখের রোশনি খতম হয়ে যাক।

—খুন করবে না? অবাক হয়ে বলি।

—খুন! খুন আমি কখনও করি না। বলে চেলু চোখের জল মুছে বলল আপনার সঙ্গে লায়লীর দেখা হবে একদিন। তখন দেখবেন যে লায়লীকে কেউ খুন করতে পারে না। তার হাত কাঠের মতো হয়ে যাবে।

এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বলল যে আমার বুকটা ধক করে ওঠে। একটু ভয়ে ভয়ে বলি—না না। লায়লীর সঙ্গে আমার দেখা হবে কী করে?

লোকটা গম্ভীরভাবে বলে—হবে, জরুর হবে। দুনিয়ার সব পুরুষ মানুষের সঙ্গে লায়লীর একবার করে দেখা হবে।

আমি চমকে উঠে বলি—সে কী?

চেলু মাথা নেড়ে বলে—জরুর হবে। লায়লী আমাকে বলেছিল, হাত-ফেরতা হয়ে হয়ে সে হর-মানুষের কাছে একবার করে যাবে। কিন্তু থাকবে না। কেবল ঘুরবে আর ঘুরবে। ছাতুওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ভুজাওয়ালা, পকেট মারওয়ালা—

আঙুলের কড়ে গুনে হিসেব করতে করতে শেষ শব্দটায় একবার থেমে আমার দিকে তাকাল চেলু। আমি কিছু বললাম না।

চেলু কিছুক্ষণ গুনে খেই হারিয়ে বলল—আপনার কাছে ভি আসবে। ইনতেজার করুন। আসবেই।

মাঝখানে গাড়ি তিনবার থেমেছিল। কেউ ওঠেনি, কেউ নামেওনি। এখন কার্শিয়াঙের কাছাকাছি চলে এল কি রেলগাড়ি? কিছুতেই বুঝতে পারি না। হঠাৎ চারদিকে এক ভুতুড়ে কুয়াশা উঠে এল কোথা থেকে? এক ধারে গভীর খাদ, অন্য ধারে উঁচু পাহাড়, কিছুই দেখা যায় না। কেবল এক ভেজা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার চারদিকে। আলো মরে গেল। কেবল এক শূন্যের রেললাইনের ওপর দিয়ে ছোট্ট খেলনা গাড়ি দুলে দুলে কোথায় চলেছে।

গাড়িটা তার ধুকপুক চলার শব্দ দিয়ে বলে—কোথাও না, কোথাও না।

আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। হঠাৎ অনুভব করি, হলুদ প্রজাপতিটা এতক্ষণ পর হঠাৎ উড়াল দিল। অনায়াসে গাড়ির বাইরে চলে গেল, আবার চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে ঢুকে এল ভিতরে। আমার মাথার চারদিকে ফিনফিনে পাখনায় উড়ে বেড়াল খানিক। তারপর আমার মাথায় মৃদু একটু স্পর্শ করে ঝুপ করে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে রইল। গভীরভাবে টের পেতে থাকি, লায়লী এতদিনে ভারতবর্ষের সীমানা ছেড়ে বহু দূর সব শহর-বন্দরে পুরুষের বুকে বুকে ঘুরে ঘুরে এবার তার ফিরে-যাত্রা শুরু করেছে। তার যৌবন যায় না, বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় না, পুরুষের বুকে অনন্ত পিপাসা ও চির অতৃপ্তি জাগিয়ে দিয়ে সে কেবলই চলে।

গাড়ি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কোন শূন্যপথে? কোন অচেনার কাছে? কে সেই চিরযুবতী অপেক্ষা করছে সেইখানে, যেখানে স্টেশনের নামের ফলকে লেখা আছে—'কোথাও না!'

আমি সেই তীব্র মানসিক বিভ্রমে দু হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠি—চেলু!

চেলু একটা আর্ত চিৎকার দিয়ে দুহাতে আমাকে আঁকড়ে ধরে হাঁপাতে হাঁফাতে বলে—সাত শও বাবু, সাত শও। অ্যাঁ বাবু? সাত শও? অ্যাঁ! আমি চেলু-উলু কোই নাই। অ্যাঁ! সাত শও? বলতে বলতে চেলু আমাকে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। মুখের লালা, চোখের জল গঙ্গা-যমুনার মতো মিশে যায় তার বুড়ো থুতনির খাঁজে। সে কেবল বলে—সাত শও! সাত শও!

গাড়ি এসে কার্শিয়াঙে থামে।

শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের বাইরে বাগানের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এক ভাঁড় চা হাতে উত্তর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার গাড়ি কিছু লেট-এ আসবে। যদি বেশি লেট হয় তো পৌঁছতে ভোর হয়ে যাবে। যাক, আমার কোনও তাড়া নেই। আমি উত্তরদিকে চেয়ে সেই শৈশবের দার্জিলিং পাহাড় দেখবার চেষ্টা করি।

কিন্তু দেখার জো কী? শিলিগুড়ির অসংখ্য রিকশা চারধারে ঘুরে ঘুরে অবিরল প্যাঁ প্যাঁ করে যাচ্ছে, তার ওপরে অদূরে খোলা ওয়েটিং রুমের পিঁজরাপোল থেকে চ্যাঁ-ভ্যাঁ শব্দ। মিলিটারির গাড়ি এসে থামছে, চলে যাচ্ছে। অনবরত শান্টিংয়ের শব্দ, আর ইঞ্জিনের ভোঁ। তার ওপর বড্ড বেশি আলোয় আলোয় ছয়লাপ হয়ে আছে জায়গাটা। এত আলোতে দাঁড়ালে কিছুই ভাল দেখা যায় না। সামনে কয়েকটা বড় বড় গাছও আড়াল করেছে।

বাবা যখন আমাকে দার্জিলিং পাহাড় দেখিয়েছিলেন তখন শিলিগুড়ি ছিল ছোট্ট একটা নির্জন জায়গা। চারদিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতির মধ্যে একমুঠো মানুষের বসত। সেই শিলিগুড়ি তো এ নয়। আমি চায়ের ভাঁড় হাতে অনেকটা পুবদিকে সরে গিয়ে পরিষ্কার দার্জিলিং পাহাড় দেখতে পেলাম। ওই বাঁকা বিছের মতো তিনধারিয়ার আলো, ডাউ হিলের ডগায় দীপাবলী। কিন্তু এ মালটা সাচ্চা নয়। কিছুতেই ঠিক সেইরকম দেখতে পাই না। বারবার চেষ্টা করি। কেমন যেন মনে হয় ওই বিছে-হারের মতো তিনধারিয়ার আলো—ওই গয়নাটা বহুকাল আগে খাঁটি সোনার ছিল। ওটার বদলে কে যেন গিল্টি করা নকল জিনিস বসিয়ে দিয়ে গেছে। সেই পাহাড়টাকেও কে কবে লোপাট করে বিদেশি টুরিস্টদের কাছে দুর্লভ প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর দরে বেচে দিয়েছে গোপনে, তার বদলে এখন একটা ফ্যান্সি পাহাড় দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।

না, নেই। সেই পুরনো দিনের দার্জিলিং পাহাড়টা নেই। হতাশ হয়ে নিজের মালপত্রের কাছে ফিরে আসি। সেখানে চেলু বসে পাহারা দিচ্ছে।

আমাকে দেখে সে বুড়িয়ে যাওয়া মুখে হাসল। একটা সিগারেট ধরিয়েছিল, কিন্তু অর্ধেক খেতে না খেতেই দন্তহীন মুখের অজস্র লালায় সেটা ভিজে ফেটে তামাক বেরিয়ে পড়েছে। দুঃখিত চিত্তে চেলু সেটা ফেলে দিল।

হঠাৎ নড়েচড়ে বসে চেলু বলল—বাবু, আমাকে নোকর রাখবেন?

—নোকর? বলে অবাক হই।

চেলু খুব হাসে—নোকর। বুড়া বয়সে যাব কোথায়?

—তোমার জরু? বালবাচ্চা?

চেলু হাত উল্টে বলে—কোই নেই। দুইবার বিয়া করলাম। তো কারু সঙ্গে বেশিদিন বনে না। আমার দুই নম্বর জরুটা পরশু রোজ ভেগে গেছে।

আমি অবিশ্বাসভরে তার দিকে চেয়ে আছি দেখে সে ফের মাথা নেড়ে বলে—সাচ বাত।

—কার সঙ্গে ভাগল, কোথায় গেল, খোঁজ নাওনি?

—ফয়দা কী? বলে হাই তোলে চেলু। অলস গলায় বলে—কত লোক আছে দুনিয়ায়, যাওয়ার ভি কত জায়গা আছে। কারও সঙ্গে কোথাও ভেগে গেছে। তো আমার এখন কেউ নাই, আমাকে নোকর রাখবেন? চোরি-উরি করব না।

আমি চিন্তিতভাবে বলি—ভেবে দেখি।

চেলু একটু অন্যমনস্কভাবে গুনগুন করে গাইতে লাগল—মাহনে চাকর রাখো জি। তারপর হাই তুলে বলে—বহুত নিদ লাগছে। তো আমি এখানে শুয়ে থাকি বাবু, আপনি তো কয়দিন পরে এহি লাইনে কলকাত্তা যাবেন, তখন আমাকে এ জায়গা থেকে ডেকে নিবেন। অ্যাঁ বাবু?

এই বলে চেলু তার কোটটা মাটিতে বিছানার মতো বিছিয়ে পাতল, মাথার টুপিটা দিয়ে বালিশ বানিয়ে শুয়ে আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফোকলা মুখে সামান্য হেসে বলল—বেশি দিন আর বাঁচব না। যে ক'দিন আছি থাকতে দিন, পুলিশ-উলিশে খবর দিবেন না। বলে মাথা চুলকে সমর্থনের

আশায় চেয়ে রইল।

—তুমি ভুজাওলাকে ছুরি মেরেছিলে কেন?

চেলু সটান উঠে বসে সামান্য উত্তেজিত হয়ে বলে—শালা বহুত হারামি ছিল। লায়লী তো ভুজাওয়ালার আউরৎ ছিল না। লায়লী কারও আউরাৎ না। যৌন্ উকে নিবে লায়লী উসিকো হবে। না ভুজাওয়ালার, না ঠেলাওয়ালার, না আর কিসিকো। তো ভুজাওয়ালা লায়লীকে ছাড়তে চায়নি। উসি লিয়ে—

আমি বুঝলাম। গা একটু শিউরে উঠল।

চেলু আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে—একটু ভেবে দেখুন। একজন যদি লায়লীকে বেশি রোজ আটকে রাখে তো লায়লী কেমন করে দুনিয়ার সব মরদের কাছে যাবে? সবাই তো লায়লীর ইনতেজার করছে, টাইম তো কারও বেশি নেই।

এই বলে চেলু শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়বার আগে একখানা হাত তুলে বলল—ডেকে নিবেন কিন্তু।—

—আমি যদি অনেকদিন পরে ফিরি?

ঘুমন্ত গলায় চেলু বলে—আমাকে এইখানে পেয়ে যাবেন। সব সময়।

শিলিগুড়ি জংশনের খোলামেলা ওয়েটিং হলঘরের ভিখিরিদের কাঁথা-কানি, গরিব যাত্রীদের পোঁটলা-পুঁটলির মধ্যে, আর গাড়ির শব্দ, আর বাচ্চাদের চিল-চেঁচানি গোলমালে খুব নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়ল চেলু। তাকে এখানে এভাবে রেখে আমি রাতের গাড়ি ধরলাম।

বাই রেলগাড়ি, আমি কোথায় চলেছি?

রেলগাড়ি তার চলার শব্দ দিয়ে বলে—কোথাও না, কোথাও না।

ঠিক কথা বন্ধুগণ। কোথাও না। মশাইরা, এই কামরায় কোনও আলো নেই। ছিল কোনওদিন, চুরি হয়ে গেছে। অন্ধকারে পাখা ঘুরবারও কোনও শব্দ পাচ্ছি না। তার মানে, পাখাও নেই। ভ্যাপসা গরম। সহযাত্রীদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। গায়ে গায়ে ভিড় গন্ধ, শরীরের তাপ সবই টের পাচ্ছি। মাঝে মাঝে কেবল দেশলাই জ্বলে ওঠে। বিড়ি বা সিগারেটের আগুন কখনও ফুসফুসের ভোল্টেজ বেশি পেয়ে তেজি হচ্ছে, ভোল্টেজ কম পেয়ে মন্দা। সে আগুনে শুধু দু একটা মুখের আভাসমাত্র দেখা যায়। ভাইসব, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মুখ আমার দেখা হয়নি। কত মুখ দেখা বাকি রয়ে গেছে। কথার শব্দ আসে, কে কাকে যেন ডাকে, শ্বাস ওঠে-পড়ে—অন্ধকারে সবই টের পাই। জানলায় জানলায় অন্ধকার টাঙিয়ে দিচ্ছে কে, চোখে চোখে ঘুমের মলম। আমি আমার মজবুত স্যুটকেসটার ওপর বসে দেয়ালের কাঁধে পিঠ দিয়ে ঢুলছি। এটা বাথরুম যাওয়ার পথ, তাই যাতায়াতের পথে বারবার লোকের পা হোঁচট খাচ্ছে আমার গায়ে। উগ্র বিড়ির গন্ধে নাক জ্বালা করে। বাথরুমের দরজা খোলা হলেই অ্যামোনিয়ার গন্ধ এসে ঘুঁষি মারে। কিছু করার নেই বন্ধুগণ, রেলগাড়ি আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। তার চাকায় চাকায় বৈরাগ্যের শব্দ বাজে—কোথাও না, কোথাও না। ভাই রেলগাড়ি, তবে আমি যাচ্ছি কেন?

খুব কাছ থেকেই কে যেন ডাকল—নগেনবাবু!

আমি ঢুলতে ঢুলতে উত্তব দিলাম—হুঁ।

—আপনার দেশলাইটা একটু দেবেন!

—নিশ্চয়ই। এই যে—বলে আমি দেশলাইটা এগিয়ে দিলাম।

বন্ধুগণ, আমি জানি যে আমি নগেনবাবু নই। তবু কী যায়-আসে! অন্ধকারে কে নগেনবাবু, কে ইন্দ্রজিৎ তার চুলচেরা বিচারের কোনও অর্থ নেই। এই বিশাল বিশ্বের মুক্তির মধ্যে, অচেনা পরিবেশে, অন্ধকারে নগেনবাবু হয়ে যেতে আমার কোনও আপত্তির কারণ দেখি না।

কিছুক্ষণ বাদে আমিও অন্ধকারে খুব আন্তরিকভাবে ডাকলাম—নগেনবাবু।

জানি বন্ধুগণ, কেউ না কেউ সাড়া দেবেই।

—হুঁ। খুব কাছ থেকেই উত্তর এল।

বিনীতভাবে বললাম—আমার জলের বোতলটা খুব ছোট, শিলিগুড়িতে ভরেছিলাম, ফুরিয়ে গেছে।

আপনারটা একটু দেবেন?

—নিশ্চয়ই। এই যে—

অচেনা এক নগেনবাবু তার জলের বোতল এগিয়ে দেয়।

বা পাঁশে কে যেন খইনি ডলা শেষ করে একটা চাপড় মারে। খইনির গুঁড়ো এসে চোখে পড়ে। চোখ ডলতে ডলতে তাকে বলি—আরে এ নগেন, ক্যা করতা হ্যায়?

সে লোকটা সঙ্কুচিত হয়ে সরে বসে।

বন্ধুগণ, আমাদের মধ্যে কে যে প্রকৃত নগেনবাবু, তা বুঝে ওঠা খুবই মুশকিল। প্রকৃত নগেনবাবু কেউ থাকলেও তিনিও সমস্যায় পড়বেন। ভাববেন—আমিই কি নগেনবাবু? নাকি আমি নগেনবাবু নই! সে যাই হোক বন্ধুগণ, মানুষ যদি পরস্পরকে নগেনবাবু বলে ডাকতে শেখে তো পৃথিবীতে একটা প্রাথমিক শ্রেণী-চেতনার লোপ হতে পারে। যেমন এই অন্ধকার কামরায় বসে আমারও মনে হচ্ছে, পৃথিবীর কোটি কোটি নগেনের মধ্যে আমিও একজন। এক নগেন মরে গেলেও পৃথিবীতে নগেন থেকে যায়। এক নগেনকে সুপ্তি প্রত্যাখ্যান করলেও শেষ পর্যন্ত আর এক নগেনই তাকে পেয়ে যাবে। নিজেকে সেই নগেন ভেবে সুখে আমি শিউরে উঠলাম।

বন্ধুগণ, এই নগেন কথাটা থেকেই কি নগণ্য কথাটার উৎপত্তি? এই যে আমরা নগণ্য কিছু মানুষ পরস্পরকে নগেন বলে ডাকছি এবং ডাকে সাড়া দিচ্ছি, তার দ্বারা কী প্রমাণ হয়? আপনারা একটু ভেবে দেখবেন। আমরা যারা নগণ্য জনগণের মধ্যে পড়ি তাদের 'জনগণ' না বলে 'জনগেন' বললে কেমন হয়?

যিনি দেশলাই চেয়েছিলেন সেই নগেনবাবু বেশি কথা বলেন না। কিন্তু যিনি জলের বোতল দিয়েছিলেন সেই নগেনবাবু খুব আলাপি, সহৃদয়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় যাবেন নগেনবাবু?

অন্যমনস্কভাবে বললাম—কোথাও না নগেনবাবু।

তিনি অবাক হয়ে বললেন—তবে যাচ্ছেন যে!

আমি শ্বাস ফেলে বললাম—যাচ্ছি বটে। কিন্তু সেখানে যাওয়া যায় না।

—কেন, সেখানে বন্যা নাকি? বন্যা যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন সব জায়গায় যেতে পারবেন।

আমি গম্ভীরভাবে বলি—না নগেনবাবু। আমি কোনও বিশেষ জায়গায় যাওয়ার জন্য বেরোইনি। আমি বিশেষ একটা অবস্থায় ফিরে যেতে চাইছি।

—কী সেটা? নগেনবাবু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন।

—শৈশব। আমি বলি।

একথা শুনে অন্য যে কোনও নগেন ঘাবড়ে যেত, কিন্তু এ নগেনবাবু একদম ঘাবড়ান না। অন্ধকারে একটু হেসে বললেন—বুঝলেন মশাই নগেনবাবু ভারতীয়দের একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। তারা সবাই বরন্ ফিলজফার। আমাদের দেশের ভিখিরিও কথায় কথায় এমন চমৎকার দার্শনিক কথা বলে যে, অবাক হতে হয়। শৈশবে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা কি একটা ফিলজফি নয় নগেনবাবু?

আমি একটু লজ্জিত হয়ে বলি—না, ঠিক তা নয় নগেনবাবু। কথাটা একটু দার্শনিক হয়ে গেল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। আমি আমার শৈশবের কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। তিন চার বা পাঁচ বছর পরে পরে আমার শৈশবের জায়গাগুলো দেখতে বেরিয়ে পড়ি। অবশ্য সব জায়গায় যাওয়া হয় না, অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে থেকেছিলাম তো!

—ঘুরে ঘুরে কী খুঁজে বেড়ান নগেনবাবু? উনি আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করেন।

আমি কুণ্ঠার সঙ্গে বলি—সেই ছেলেবেলার অনুভূতিগুলি খুঁজি। তখন পৃথিবীটা যেমন ভাল লাগত এখন কেন তেমন লাগে না, তাই খুঁজে বেড়াই।

—আপনি কি খুব দুঃখী লোক নগেনবাবু?

—খুব। আমি একবার একটা কোকিলের ডাক শুনেছিলাম। সেই রকম ডাকতে কোনও কোকিল আর পারল না।

উনি একটা শ্বাস ফেলে বললেন—কথাটা মিথ্যে নয়। ছেলেবেলায় মায়ের হাতে ইলিশ মাছের ঝোল খেতাম, বেগুন আর সরষেবাটা দিয়ে রান্না। তেমন আর খেলাম কই? আমার বউ হুবহু সেইরকম

করেই রাঁধে, সেই সরষেবাটা আর বেগুন দিয়েই, কিন্তু সে স্বাদ আর হয় না। ছেলেবেলাটা বেশ ছিল।
—আজ্ঞে। আমি বললাম।
কিছুক্ষণ কথা হয় না। তিনি ইলিশ মাছ এবং আমি কোকিলের কথা ভেবেই বুঝি একটু আনমনা থাকি। আর ঠিক সেই সময়ে বাঙ্কের ওপর থেকে অন্ধকারে একটা চিকন সুন্দর মেয়ের গলা ডাক দেয়—বাবা।
'বাবা' ডাকটাই বিশ্বজনীন। অনেকটা 'নগেনে'র মতোই। তাই দু-তিনজন উত্তর দেয়—কী বলছিস?
মেয়েটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে থেকে আবার সতর্ক এবং চাপা গলায় ডাকে—বাবা।
এবার আমার সঙ্গে যিনি কথা বলছিলেন তিনি বলেন—অত জোরে চেঁচিয়ে বাবা বলে ডাকতে আছে? অন্ধকারে কে কার বাবা বুঝবে কী করে?
মেয়েটি যুবতীই হবে, সুন্দরীও হওয়া সম্ভব, একটু রাগ করে বলে—তুমি কোথায় কী করে বুঝব! চারদিকে সবাই কথা বলছে যে।
নগেনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন—ডাকছিস কেন?
—আমি নামব। মেয়েটি বলে। কী সুন্দর গলা! নিশ্চয়ই গান গায়।
—কেন? নগেনবাবু জিজ্ঞেস করেন।
—বাথরুমে যাব।
নগেনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন—যাবি কোথা দিয়ে, সব লোক রাস্তা আটকে বসে আছে! অন্ধকার তার ওপর। বাথরুমেও বোধকরি কিছু লোক পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বসে আছে। চেপে বসে থাক।
মেয়েটা একটু চুপ করে থেকে আবার বলে—মা বলছে মাও যাবে।
—ওঃ। বলে নগেনবাবু একটু কী ভেবে নিয়ে বলেন—নাম তা হলে, টর্চটা চ্যাঙাড়ি থেকে বের কর, অন্ধকারে কার ঘাড়ে পা দিবি।
—চ্যাঙাড়ি নীচের বেঞ্চের তলায়, বরং দেশলাইটা জ্বালো। মেয়েটা বলে।
নগেনবাবু আমার দিকে ঝুঁকে বললেন—নগেনবাবু, আপনার দেশলাইটা একটু দেবেন?
—নিশ্চয়ই। এই যে—বলে দেশলাই এগিয়ে দিয়ে চোখ পেতে থাকি।
মেয়েটা নামছে। নগেনবাবু দেশলাই জ্বালালেন। জংলা শাড়ি-পরা দীঘল একটি মেয়ে সেই দেশলাইয়ের তুচ্ছ আলোটুকু শত গুণ বাড়িয়ে নেমে এল। কৈশোর সদ্য পার হয়েছে, বসন্ত সমাগমে বৃক্ষের মতো তার দেহে পত্র-পুষ্পের সমারোহ। চোখে কাজল দিয়েছিল বুঝি, লেপটে গেছে, আর তাতে চোখ দুখানা আরও গভীর ও রহস্যময় দেখাচ্ছে। আমি অপলক চোখে চেয়ে রইলাম। আমাকে বিদ্যুৎস্পর্শের মতো চমকে দিয়ে মেয়েটি আমার গায়েই হোঁচট খেল। আর সেই দৃশ্য দেখে লজ্জায় মাথা নুইয়ে নিভে গেল নগেনবাবুর হাতের দেশলাই কাঠিটি।
এমন মনোরম অন্ধকার কদাচিৎ এসেছে আমার জীবনে। মেয়েটির আঁচল আমার মুখময় হয়ে গেল। তার একটি হাত টাল সামলাতে ভর দিল আমারই মাথায়। তার শরীর থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ উঠে আমাকে কোণঠাসা করে ধরে রইল।
একটি মুহূর্ত মাত্র। নগেনবাবু ফের দেশলাই জ্বাললেন। অন্ধকার হরিণের মতো ছুটে পালায়। এই যতটুকু দেখা গেল আলো-আঁধারিতে, তার বেশি দেখতে আমার ভয় করে। যদি ফের কোনও খুঁত নজরে পড়ে যায়? থাক, আমি আর দেখতে চাই না।
বন্ধুগণ, এ কথা ঠিকই যে আমি মেয়েদের আলো-আঁধারিতে দেখতেই ভালবাসি, স্পষ্ট আলোয়, মুখোমুখি মেয়েদের দেখতে নেই। পৃথিবীর সব মানুষই সুন্দর সুন্দর বলে পাগল হয়। আমারও ছেলেবেলা থেকে সেই পাগলামি। আমাদের এক অধ্যাপক ছিলেন—এ-টি-এম। তাকে আমরা সংক্ষেপে অ্যাটম বলে উল্লেখ করতাম। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন—ইন্দ্রজিৎ, একটা বেড়ালের চোখে সুন্দর মেয়ে বা কুচ্ছিৎ মেয়ের কী তফাত বলো তো? তোমরা যে সবাই সুন্দরের জন্য পাগল হও, সেটা কোনও কাজের কথা নয়। একটা বেড়ালের চোখ দিয়ে মেয়েদের দেখবার চেষ্টা কোরো। মোহ কেটে যাবে। তার কথা শুনে আমি সেই চেষ্টা কিছুদিন করেও ছিলাম। এমনকী নিজেকে বেড়াল ভাবতে ভাবতে আমার কিছু বদ-অভ্যাসও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে যাক। একটা বেড়াল কী

চোখে মেয়েদের দেখে সে রহস্য আমার আজও জানা হয়নি। নমস্য অ্যাটম কিন্তু বেড়ালের চোখ দিয়েই মেয়েদের দেখতেন, আজীবন বিয়ে করেননি। মেয়েদের প্রতি কোনও দুর্বলতা দেখাননি, মেয়েরাও দেখায়নি তাঁর প্রতি।

সেভক স্টেশন পার হয়ে গেল। তিস্তা ব্রিজের ওপর দিয়ে গাড়ি পার হল আস্তে আস্তে। বুকের মধ্যে উথলে ওঠে ঢেউ। বহু-বহু কাল আগে ওই দূরের তিস্তার ওপর করোনেশন ব্রিজ দিয়ে আমি একটা মিলিটারি জিপ-এ শিলিগুড়ি এসে দার্জিলিং পাহাড় দেখেছিলাম। কিছুতেই সেখানে আর যাওয়া হল না।

ভাই রেলগাড়ি, আমি কোথায় যাচ্ছি।

রেলগাড়ি বলে—কোথাও না, কোথাও না।

—আপনার দেশলাইটা! নগেনবাবু বললেন।

—থাক না নগেনবাবু, আপনার কাছেই থাক। আমি উদারভাবে বলি।

—না নগেনবাবু, আমার টর্চ আছে। দেশলাইয়ের দরকার নেই। উনি বললেন।

তখন বাঙ্কের ওপর থেকে এক বয়স্কা মহিলার গলা বলে—থাক না, দেশলাইটা রেখেই দাও বরং। টর্চ তো চ্যাঙাড়ির ভেতরে। আবার কখন আলোর দরকার হয়। দেশলাইটা রেখে দাও।

নগেনবাবু ভীষণ ভদ্রতা করে বললেন—না না, তা হয় না। পরের দেশলাই, আপনি নিন নগেনবাবু।

আমি অনিচ্ছার সঙ্গে বলি—থাক না।

—না, না। উনি লজ্জার সঙ্গে বলেন।

তখন ওপরের সেই বয়স্কা মহিলা বলেন—রুমি, তোর বাবা না নিক, তুই ভদ্রলোকের কাছ থেকে দেশলাইটা চেয়ে নে তো। এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, বাবলুটা কীরকম এঁকেবেঁকে শুয়ে আছে, একটু হলেই ওর হাতের ওপরে বসে পড়েছিলাম।

তখন অন্ধকারেই রুমি ডেকে বলে—শুনছেন, আপনার দেশলাইটা আমাদের দিন।

নগেনবাবুর হাত থেকে আমি খপ করে দেশলাইটা নিয়ে নিই। অন্ধকারে আর একটা হাত এগিয়ে আসে।

শূন্য হাতড়ে রুমি বলে—কোথায়?

আমিও হাতটা পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে বলি—এই যে।

কেউ কারও হাত ছুঁতে পারছি না। কয়েক মুহূর্ত। তারপরই হাতটাকে আর সরতে না দিয়ে আমি আবছা হাতটাকে চেপে ধরি। দুটি করতল এক হয়ে যায়। মাঝখানে দেশলাই। মনে মনে বলতে থাকি—যদিদং হৃদয়ং তব—

মেয়েটা চাপা গলায় বলে—ছেড়ে দিন।

—ধরেছেন তো দেশলাইটা? সতর্ক গলায় বলি।

—হ্যাঁ। তেমনি পাখির গলায় মেয়েটি বলে।

—ছাড়লাম। বলে ছেড়ে দিয়ে স্যুটকেসে বসে পড়ি।

সহানুভূতির সঙ্গে মেয়েটি একবার বলল—আপনার আর দেশলাই আছে তো?

আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম—অনেক, অনেক।

নগেনবাবু অন্ধকারেই দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করেন, আমি বসার পর আরও খানিকটা সময় ছাড় দিয়ে বললেন—আপনি কোথায় চাকরি করেন?

—ব্যাঙ্কে। খুব উৎসাহের সঙ্গে বলি। মধ্যবিত্ত পরিবার ব্যাঙ্কের চাকুরে পাত্র খুব পছন্দ করে।

—ওরা তো বেশ মাইনে-টাইনে দেয়, না? উনি একটু উৎসাহ দেখালেন।

—হ্যাঁ। মাইনে ভালই। তা ছাড়া বছরে একবার সপরিবারে বেড়ানোর খরচ। আমি হেসে যোগ করলাম—অবশ্য পরিবার বলতে আমার বাবা আর মা, বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইরা চাকরি করে। বিয়ে-টিয়ে এখনও করিনি।

—ব্রাহ্মণ?

—ব্যানার্জি। শাণ্ডিল্য।

উনি একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন—আমরা কায়স্থ। বলে উনি নিস্পৃহভাবে ঢুলতে লাগলেন। একটা আলোজ্বালা স্টেশন পেরিয়ে গাড়ি ফের অন্ধকারে পড়ল।

ভাই গাড়ি, কোথায় যাচ্ছি?

গাড়ি বলে—কোথাও না, কোথাও না।

রহস্যময় প্রকৃতি সারা রাত গাড়ির জানালায় দরজায় অন্ধকার রং লাগিয়েছিল। এবার সে জানলার সেই অন্ধকার ঘষে ঘষে তুলে দিব্যি ভোরবেলার সিনসিনারি টাঙিয়ে দিল। দেখি, ভোরের আবছা আলো ফুটেছে। গাছপালা মাঠ নদী দেখা যাচ্ছে। সূর্যও উঠে আসছে নিয়মমাফিক।

আমি আলিপুরদুয়ার জংশনে নেমে পড়লাম। নগেনবাবু, তাঁর স্ত্রী বা রুমি কেউ নামল না। তারা আরও দূরে যাবে। ভোরের আলোয় আমি রুমির মুখ দেখিনি। না দেখাই ভাল। শুধু আমার দেশলাইটা দিয়ে এলাম তাকে। যতবার জ্বালবে ততবার কি মনে পড়বে না? যতক্ষণ দেশলাইতে কাঠি আছে ততক্ষণ আমিও কি বেঁচে রইলাম না রুমির কাছে, বন্ধুগণ?

রিকশাওয়ালা সূর্যনগর পর্যন্ত যেতে তিন টাকা চাইল। রিকশাওয়ালা সর্বত্রই এরকম। যাহা চায় তাহা ভুল করে চায়...

বারবার রিকশা থামিয়ে আমি একটা বাড়ি খুঁজছিলাম। ভাইসব, গগন চক্রবর্তীর বাড়ি চেনেন? একসময়ে সামান্য কম্পাউন্ডারের চাকরি করতেন, সম্ভবত গত চার বছর তিনি শয্যাশায়ী। স্ট্রোক হয়েছিল। বছর চারেক আগে যখন এসেছিলাম, তখন তাঁর বাঁ হাত আর বাঁ পা নড়ে না, মশা এসে সেই হাত পা থেকে রক্ত খেয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে নিরাপদে চলে যায়। এখনও কি বেঁচে আছেন তিনি? সূর্যনগরে এত বাড়ি উঠেছে, এত গাছপালা গজিয়েছে যে আমি ঠিক চিনতে পারছি না। না, গগন চক্রবর্তীকে বিশেষ করে চেনার কিছু নেই। তবে এই সূর্যনগর পত্তনের সময়ে তিনিই ছিলেন প্রথম বসবাসকারীদের একজন। কেউ কেউ চিনতও তাঁকে। ছোটখাটো, চটপটে মানুষ, একটু তোতলা, রাগি কিন্তু সৎ মানুষ। আমার মামা। চার বছর আগে তিনি আমাকে চুপি চুপি কাছে ডেকে বলেছিলেন—শিঙারা খাওয়াবি?

খাওয়ানো হয়নি। মামি ডেকে বলেছিলেন—এই স্ট্রোক হওয়ার পরও লুকিয়ে-চুরিয়ে খায়। তুমি যেন বাবা, ওসব কিনে এনো না। অনেক কষ্টে টিকিয়ে রেখেছি।

তা সেই টিকে থাকারই সমস্যা। আপনারা চেনেন না তাঁকে? অবশ্য না চিনবারই কথা। বড় ভুলো-মন মানুষের। চার বছর শয্যাশায়ী থাকলে কেই বা মনে রাখবে!

বুড়ো কবিরাজমশাই অবশ্য চিনতে পারলেন। নাতিকে পায়খানা করাতে নিয়ে এসেছিলেন সামনের কাঁচা নর্দমায়। কবিরাজমশাইকে দেখেই আমি চিনতে পারি। বোধহয় একশো ছাড়িয়ে গেছে বয়স। বেশ চেহারা। লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শকুনের মতো চোখে চেয়ে নাতির মলের প্রকৃতি বুঝবার চেষ্টা করছিলেন বোধহয়।

আমি সামনে নেমে দাঁড়াতেই কবিরাজমশাই বললেন—কে?

বন্ধুগণ, এই এক সনাতন প্রশ্ন, যার বাস্তবিক উত্তর হয় না। সঠিক উত্তর দিলেও লাভ নেই। নিজের জীবন-বৃত্তান্ত শুনিয়ে যে প্রকৃত পরিচয় দেব তারও সময়াভাব।

বললাম—আমি এক নগেন। গগন চক্রবর্তীর বাড়িটা কোনদিকে বলতে পারেন?

—কোন গগন?

—চক্রবর্তী। কম্পাউন্ডার।

কবিরাজমশাই খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—হুঁ। কম্পাউন্ডার। কম্পাউন্ডার হওয়া অত সোজা নাকি! লেবেল দেখে ওষুধ মেলালেই কম্পাউন্ডার হয় না। জ্ঞান চাই। বলে ফের যা দেখছিলেন তাই দেখতে লাগলেন।

আমি বললাম—তার বাড়িটা?

কবিরাজমশাই ঘন পাকা ভ্রূ তুলে বলেন—সে কি বেঁচে আছে?

—জানি না।

—দেখি না অনেকদিন। নেই বুঝি। আরও ভেতরদিকে যাও, বাঁ দিকে ঘুরে তৃতীয়বাড়ি। সামনে এক জোড়া নারকেল গাছ আছে। তুমি তার কে হও?

—ভাগ্নে!

—ভাগ্নে! কেমনতরো ভাগ্নে? মামা বেঁচে আছে কি না সে খোঁজ জানো না। বিলেতে ছিলে নাকি?

—না, এই যোগাযোগ ছিল না আর কী।

—যোগাযোগ রাখতে বারণ করেছিল কে? যাও দেখো গিয়ে আছে কি না। না থাকারই কথা। আজকাল কেউ আর কারও খবর দেয় না। আশেপাশে কত বুড়ো মরে গেল, টেরই পাই না।

একটা কেলো কুকুর ঘুরঘুর করছে দেখে নাতিটা উঠে পড়েছে—ও দাদু, এই কুকুরটা সেদিন আমাকে চেটে দিয়েছিল! ওই আবার আসছে।

কবিরাজমশাই লাঠি তুলতেই কুকুর পালায়। রিকশায় উঠতে উঠতে শুনি তিনি নাতিকে শাসাচ্ছেন—এই হারামজাদা, উঠে পড়লি যে বড়! বোস, বসে পড়।

নাতি ফের বসে পড়ে।

৮

ভাই রিকশাওলা, আমি কোথায় যাচ্ছি?

তেলহীন চাকায়, চেন-এ, প্যাডলে একটা কষ্টকর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হচ্ছিল। সেই শব্দটা ভূতের মতো খোনা সুরে বলে—কেঁউ নেই, কেঁউ নেই।

রিকশা বাঁ দিকে ঘুরতেই আমি সেই জোড়া নারকোল গাছ আর দরমার বেড়া, টিনের ছাউনির বাড়িটা চিনতে পারি। আগে এই তুচ্ছ বাড়িটাও মামি লেপে-পুঁছে তকতকে রাখত। এখন বড় শ্রীহীন দেখাচ্ছিল। ফটকের মুখে বড় বড় ঘাস উঠেছে, ঝোপঝাড়ে ছেয়ে আছে ছাঁচতলা। মাটির ভিত-এ বড় বড় ইঁদুরের গর্ত।

মামা কি আছে? মামা কি নেই?

আমি রিকশাতেই বসে থাকি। নামতে সাহস হয় না। মামার ছেলেপুলে নেই, নিজে বিছানায় পড়ে থাকে, মামি লেখাপড়া জানে না। তাই বহুকাল মামার কোনও চিঠিপত্র পাই না, খবরও নয়। মা কলকাতায় উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে। মাঝে মাঝে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা গত দু বছর যাবৎ প্রায় দিন এক-আধবার বলে ওঠে—দাদা কি আর আছে? চারটে চিঠি দিয়েছি, উত্তর এল না। তাই রিকশা থেকে নামতে আমার ভয় করে। মামা যদি না থাকে তবে মাকে গিয়ে কী বলব?

ভাই রিকশাওলা, তার চেয়ে থাকগে, চলো এই দোরগোড়া থেকেই ফিরে যাই। কাজ কি পৃথিবীর সব সত্য জেনে? আমাদের দুঃখময় মানবজীবন দু-একটা সংবাদ ছাড়াই কেটে যাক। 'খবর নেই,' এইটুকু জেনে রাখাই সুখকর, 'মারা গেছেন' এই দুঃখদায়ক খবরের চেয়ে। নয় কি বন্ধুগণ?

রিকশাওলা জামা তুলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল—এই বাড়ি তো?

হ্যাঁ, এই বাড়িই। ভাই রিকশাওলা, আমি কোথাও যাব না, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। এ বাড়িতে কেউ নেই। আমি ভুল জায়গায় এসেছি। আমি কোনও খবর নিয়ে যেতে চাই না। ওই দেখ, এ বাড়িটায় কোনও পাখি ডাকছে না, হাওয়া বইছে না, একবুক শোকের বাতাস থমকে আছে। চলো, ফিরে যাই।

কিন্তু বন্ধুগণ, কথাগুলো বলতে পারলাম না। রিকশাওলার তীব্র চোখের চাউনি দেখে ভারী লজ্জা করছিল। তাই আমি অনিচ্ছার সঙ্গেও নেমে পড়লাম।

রিকশাওলা তিন টাকা চেয়েছিল। কিন্তু রিকশাওলারা সর্বত্রই এরকম। যাহা চায় তাহা ভুল করে চায়...।

আমি কুণ্ঠার সঙ্গে তাকে দুটি টাকা দিতে গেলেই সে খেঁকিয়ে উঠে আলিপুরদুয়ারের রিকশা-ভাড়ার হার সম্পর্কে আমাকে সচেতন করে তুলবার চেষ্টা করছিল। রিকশাওলারা সর্বত্রই এরকম। যাহা পায় তাহা চায় না। তাই আমি তাকে অতিরিক্ত মুনাফার ঝোঁক সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করতে

থাকি।

আর এই গোলমালে হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ ও শোকাচ্ছন্ন আমার নেই-মামার বাড়ির একটা ঝাঁপের জানলা খুলে গেল। আর সেই জানলা দিয়ে একটা সিংহগর্জনের মতো পুরুষকণ্ঠ চেঁচিয়ে রিকশাওলাদের জুলুম বিষয়ে স্পষ্ট মতামত দিতে লাগল।

জানলার মুখটা দেখে আমি বিস্ময়ে এত হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমার হাতে ধরে-থাকা নোটগুলো থেকে আমি না গুনে গোটা পাঁচেক নোট রিকশাওলার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম—মালগুলো ঘরে তুলে দিয়ে যাও।

রিকশাওলা সঙ্গে সঙ্গে এত সহৃদয় হাসি হাসল যে, সেই মৃত বাড়িটা প্রাণ পেয়ে জেগে উঠল। মূক হয়ে থাকা অজস্র পাখি হঠাৎ তারস্বরে ডাকতে লাগল। নেপথ্য থেকে কে যেন একটা অদৃশ্য পাখা চালিয়ে বাতাস বইয়ে দিল।

—আমার বাড়ির লোকের কাছ থেকে বেশি ভাড়া নেওয়া, অ্যাঁ! গগন চক্রবর্তী কি মরে গেছে নাকি রে ব্যাটা? এই বলতে বলতে একটু খুঁড়িয়ে মামা লাঠি হাতে বেরিয়ে এলেন।

রিকশাওলা সভয়ে পালায়। আমি আনন্দে চোখ মুছতে মুছতে প্রণাম করতেই মামা বজ্রগম্ভীর স্বরে বলেন—সব বেঁচে-টেঁচে আছে তো?

আমি তাঁর বেঁচে থাকায় এত কৃতজ্ঞ বোধ করছিলাম যে কথা আসছিল না। মাথা নাড়লাম কেবল।

মামা বললেন—এখন আর কে কেমন আছে জিজ্ঞেস করি না। শুধু বেঁচে আছে কি না সেইটে জানলেই যথেষ্ট।

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বললাম—মামি?

মামা তেমনি সিংহস্বরে বলেন—আছে রে আছে। কানে কম শোনে, রান্নাঘরে খুটখাট করছে বোধহয়।

শুনে চতুর্দিক আনন্দিত হয়ে ওঠে। উঠোনের একধারে শোওয়ার ঘর, অন্য ধারে রান্নাঘর। উঠোনের পূর্বদিকে কুমড়োর মাচা। তলায় খড়ি কেটে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। রান্নাঘরের পিছনে মস্ত বাগান। সেখানে কলার ঝাড়, কাঁঠালের গাছ, আম-জাম-জামরুলের অভয়-অরণ্য। দেখি, কুমড়ো লতায় ফুল ফুটেছে হলুদ বরণ, কাঁচা কুমড়ো-শিশুরা মা-গাছকে আঁকড়ে ধরে আনন্দে ঝুলে আছে। মৌমাছি কিংবা ভ্রমর বা অন্য সব পোকা-মাকড় গুনগুন করে গান গাইছে ফুলে ফুলে। গাছে আম-কাঁঠাল শেষ হয়ে গেছে কবে, তবু সেই গাছগুলিও যেন আগামী মরশুমের জন্য এখন থেকেই গর্ভধারণ করে মৃত্যুর ওপরে নিজেদের সবুজ নিশান ওড়াচ্ছে অহঙ্কারে।

ভুলে আমি মামাকে আর একবার প্রণাম করলাম। মামা পুরুষসিংহের মতো একটু পা টেনে টেনে উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন—ইনু এসেছে।

যারা কানে খাটো তারা খুব নিচু স্বরে কথা বলে—এটা কি লক্ষ করেছেন বন্ধুগণ? মামিও খুব ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—কে এসেছে?

—ইনু।

মামা ফিরে এসে দুটো জলচৌকি পেতে দাওয়ায় মুখোমুখি বসলেন। বললেন—হোমিওপ্যাথিই হচ্ছে আসল চিকিৎসা, বুঝলি! ওসব অ্যালোপ্যাথি, কবিরাজি কিছুই না। ওসব কত চিকিৎসা করিয়েছি, শেষমেষ জটেশ্বর ফোঁটাফেলা ওষুধ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখন হাঁটাচলা করি। বলে একটু চুপ করে থেকে বললেন—সব খাই। জটেশ্বর বলেছে, সব খাবেন, কিছু বাদ দেবেন না। বলে মামা খুব হাসেন। সেই হাসির উজ্জ্বলতা আমাকে স্পর্শ করে।

আর বন্ধুগণ, ভাইসব, মশাইরা, হে আমার প্রিয় নারীজাতি, এই মুহূর্তে আমি আমার বুড়ো মামার মুখের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ বুঝতে পারি, মানুষ কোথায় যাচ্ছে। হ্যাঁ বন্ধুগণ, আমি হঠাৎ এই সত্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত হই যে, মানুষ অমোঘভাবে চলেছে তার শৈশবের দিকে। লোকে যে বুড়ো বয়সকে দ্বিতীয় শৈশব কেন বলে, তা বুঝতে পারি এক লহমায়। শৈশবে আমাদেরও ছিল সর্বগ্রাসী খাই-খাই। আমার শৈশব মামার মধ্যে দেখে ভারী ভাল লাগে। কত ভাবে, কত কূট কৌশলে যে খাওয়ার ফিকির খুঁজতাম, কত কুপথ্যের দিকে ঝোঁক ছিল। এখন আর নেই। কিন্তু কিছুই হারায় না। সবই ফিরে আসে।

এবং এই দ্বিতীয় শৈশবেও তার গতি রুদ্ধ হয় না। সে ক্রমশ আরও যায়, এবং আবার মাতৃগর্ভের অন্ধকারে গিয়ে লুকিয়ে লুকোচুরি খেলার খেলুড়ির মতো ডাক দিয়ে বলে—টু-কি!

মামা আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিলেন। যদিও মামি কানে কম শোনেন, তবু সতর্কতাবশত মামা স্বর নিচু করে বললেন—গণেশের দোকানে সকালবেলায় অমৃতি ভাজে। একেবারে ঢাকাই অমৃতির স্বাদ। দুপুরের মধ্যেই সেগুলোর রস ঢুকে টসটসে হয়ে যায়। কিন্তু—বলে মামা একটু বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—সন্ধের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। খুব বিক্রি কিনা।

আমিও স্বর নিচু করে বলি—সন্ধের আগেই আনব মামা। দোহাই, মরে-টরে যেও না। বেঁচে থেকো।

মামি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে থমকে পড়েন। তারপর ফোকলা মুখে একগাল হেসে বললেন—ওমা, ইনু! তোর মামা বলে গেল, ইঁদুর এসেছে। তা ভাবলাম, সারা বাড়িময় ইঁদুর ঘুরছে, নতুন করে আবার আসবে কী! বসে বসে অমৃতির গল্প শুনছিস নাকি? ও মা, শিগগির জামাকাপড় ছাড়, হাত-মুখ ধো। ওঠ!

ভাইসব, এই সেই ছোট নদী। বিশ হাত চওড়া হবে না। ওপারে সেই আদিম পৃথিবী পড়ে আছে। অবারিত চাষ-আবাদ। সবুজের সমারোহ। নদীর জলে জীবনের কত শব্দ বয়ে যাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করি—কোথা হইতে আসিতেছ নদী?

নদী উত্তর দেয়—তোমার শৈশব হইতে।

বুড়ো বয়সের দোষবশত নদী অনর্গল বকবক করে বকাবকি করতে করতে বয়ে যাচ্ছে—এই ন্যাংটো ছেলেটা, ডুবে মরবি যে! উঠে যা, উঠে যা! এম্মা গো, ওই দেখ ভটচায বাড়ির মেজো বউ একগাদা নোংরা ফেলল আমার গায়ে! এই রে, সব ভালমানুষের ছেলেরা এখানে গুচ্ছের পাথর ফেলে শান বাঁধিয়ে বাঁধ দিয়ে রেখেছে, ঘষটানিতে বুক জ্বলে গেল বাবা। গু-খেগোর ব্যাটারা আবার পোল বানিয়েছে আমার ওপর দিয়ে! বর্ষাকাল ফের আসুক, পোল বানানো দেখাচ্ছি। দুই লাথিতে যদি ভেঙে না ফেলি তো...

বুড়ি নদীর প্রতি আমি খুবই সমবেদনা বোধ করি বন্ধুগণ। অবসর নাই তার, নাই তার শান্তির সময়। আমার সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখছি, বয়ে যাচ্ছে তো বয়েই যাচ্ছে। আমি সেই বুড়ি নদীকে ডেকে বলি—ঠাকুমা, ও ঠাকুমা, আমাকে আমার ছেলেবেলার গল্প শোনাবে?

ক্লান্তিতে হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে নদী বলে—আমার কি অত মনে থাকে বাছা! নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখ না, মনে পড়বে।

নদীর ধার ধরে চলে যাই বহু দূর। নানা রাস্তা ঘুরে আলিপুরদুয়ার জংশনের সেই নিচু মাঠের কাছে এসে দাঁড়াই। অনেক বাড়ি উঠেছে। চেনা যায় না। ঠিক কোন জায়গাটায় আমার পেট্রল-ট্যাঙ্কের ভেলাটা ডুবেছিল তা বুঝতে পারি না। অনেক বাড়ির মধ্যে কোনটা আমাদের বাসা ছিল তার দিশা পাই না।

অনেক কষ্টে একটা কাঁকুরে জমি খুঁজে পাই। এ জায়গাটুকু আমি চিনি। এই তো এখানে, আলিপুরদুয়ার ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে, এক সন্ধ্যাবেলা ছোট্ট মেয়ে আশা মিরচান্দানী ঘুরে ঘুরে ভাঙা বাংলায় বার বার বলেছিল—আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না—

এক অদ্ভুত আনন্দে শিউরে ওঠে গা। মনে পড়ে। মনে পড়ে।

এক রবিবারের সকালে দত্তবাড়ির ছেলে এসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। ওদের ক্যারম খেলায় তিনজন জুটেছে, একজন কম পড়েছিল, তাই। গিয়ে দেখি, আমার উল্টোদিকে জরির ফ্রক-পরা কী সুন্দর একটা মেয়ে। ফরসা, টুলটুলে, ঠিক আলুর পুতুল যেন। আর কী দুষ্টু চোখ। কী মুখর তার ঠোঁট।

প্রথম স্ট্রাইক করার সুযোগ পেয়ে আমি দুটো সাদা সমেত রেড ফেলে দিয়েছিলাম। বন্ধুগণ, ক্যারম আমি কিছুই জানি না। আসলে সেটা ছিল নেহাতই গায়ের জোরে মারা। ঝড়ে বক মরে—বাকিটা আপনারা জানেন।

সেই গুটি ফেলার অঘটন ঘটল, আর আমার জীবনেও এল প্রথম প্রেম। সে কী আসা। দুর্গের প্রাকার ভেঙে শত্রুসৈন্যের মতো মহোল্লাসে চিৎকার করতে করতে নানা ভাব ঢুকে পড়ছে বুকে। পাঁজর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। মনে আছে, প্রথম প্রেম আমার বুকে একটা সত্যিকারের ব্যথার সৃষ্টি করেছিল।

ক্যারম বোর্ডের ওপার থেকে আশা মিরচান্দানী তার অপরূপ চোখ তুলে বিস্ময়ভরে চেয়ে রইল। ঠোঁট নড়ল, কিন্তু কথা সরল না। অনেক কষ্টে কিছু পরে কেবল বলেছিল—হোয়াট এ স্ট্রাইক!

তখন কত বয়স হবে তার? বারো তেরো!

আমার দান ঘুরে এল, আমি আর গুটি ফেলতে পারি না। হাত ঘেমে যায়, মাথা ঝিমঝিম করে। আশা ওপার থেকে বলে—ইনু, সেভ দি গেম। প্লিজ ইনু! ইউ ক্যান স্নাব দেম ইফ ইউ ট্রাই।

আমাদের প্রতিপক্ষ দত্তবাড়ির ছেলে শিবু, আর আশার দাদা ব্রিজ। দুজনেই দিনরাত ক্যারম খেলে হাত পাকা করে ফেলেছে। শিবু গুটি ফেলতে ফেলতে বলে—ঝড়ে বক মরে—

বাকিটা আপনারা জানেন।

তো এইভাবেই শুরু হয়েছিল। এই কাঁকুরে জমিটায় আমরা ব্যাডমিন্টনের কোর্ট কেটেছিলাম। অনেক ছেলে জুটে খেলতাম। আমাদের খেলা শেষ হয়ে গেলে আশা আর কয়েকটা মেয়ে টুকটাক করে আকাশে কক তুলে খেলত। নরম-সরম ছিল বলে আশা ভাল খেলতে পারত না। একবার বেনু নামে একটা মেয়ে জোরে র‍্যাকেট চালানোতে শাটল ককটা এসে আশার চোখের নীচে লাগে। পলকের মধ্যে জায়গাটা লাল হয়ে ফুলে গেল। আজ পর্যন্ত আমি কোনও মানুষের শরীরে অত লালিমা দেখিনি। সে মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে বলত—ইনু, তুমি আমার সঙ্গে খেলো। তোমার সঙ্গে খেলতে আমার ভাল লাগে। ইউ আর সিমপ্যাথিটিক।

তখন ইংরিজি বলা ছিল ভারী কষ্টকর। মনে মনে অবিরল বাংলা থেকে ট্রানস্লেশন করে বলতে হত। প্রচুর ভুল-ভাল থেকে যেত। সেই ভয়ে আমি আশার সঙ্গে ভাব বিনিময়ের সময়ে বেশির ভাগ হাসি দিয়ে বা মাথা ঝাঁকিয়ে কাজ চালাতাম।

আমার জন্মদিনে নেমন্তন্নে এসে আশা আমাকে একটা ইংরিজি ট্রেজার আইল্যান্ড দিয়েছিল। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছিল—টু ইনু অন হিজ বার্থ ডে উইথ লাভ, আশা।

সেই বই আর জীবনেও পড়া হয়নি। বন্যায় অনেক জিনিসের সঙ্গে ভেসে গিয়েছিল সেই বই। আজও শুধু সেই অক্ষরগুলো ছাপা হয়ে আছে বুকের মধ্যে—উইথ লাভ, আশা।

সেবার ওরা বদলি হয়ে চলে গেল। যাওয়ার কয়েকদিন আগে, একদিন বিকেল গিয়ে সন্ধ্যা আসবার সময়ে এইখানে সেই মারাত্মক খেলা খেলেছিল আশা মিরচান্দানী। অনেকেই ছিল চারধারে দাঁড়িয়ে। মাঝখানে কয়েকজন ঘুরে ঘুরে বলছিল—আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না—

খেলতে খেলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ক্লান্ত খেলুড়িরা বাড়ি ফেরে। আশা যায়নি। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে সে, ফরসা মুখ লাল, কপালে ঘাম। তবু সে ঘুরছে ঘুরছে, আর বলছে—আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না—

চারধারে আর কেউ নেই। শুধু আমি। একা আশা ঘুরে ঘুরে আসে, আমার গায়ে ধাক্কা খায়। ফের সরে যায়। আবার আসে। তুমি আর ঘুরো না আশা এবার খেলা থামাও। এই জটিল বাক্যটা অনেকক্ষণ ধরে ইংরিজিতে মনে মনে ট্রানস্লেশন করার চেষ্টা করছিলাম। পারলাম না। আর সেই পাগলাটে খেলায় উন্মাদ হয়ে বার বার আশা সেই আলো-আঁধারিতে এসে এসে তার নরম গা দিয়ে ধাক্কা মেরে ঢেউ তুলে যাচ্ছে। কী বিভ্রম, কী মায়া ছিল সে খেলায়! যখন অন্ধকারে ঢেকে গেল চারিদিক, তখন প্রেমের দেবতা নেমে এলেন। চারধারে এক অলৌকিক ঘেরাটোপ তুলে দিলেন। আশা দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল অন্ধের মতো। আমার দুহাত বাড়ানো। আমার গলা জড়িয়ে উন্মুখ আশা একবার—মাত্র একবার আমার ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে চুমু খেয়েছিল। তারপরই পালিয়ে গিয়েছিল লজ্জায়।

এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এইখানে এক অদৃশ্য পাহাড়ের চূড়ায় কে আমাকে একবার হাওয়ায় উড়িয়ে এনেছিল। ক্ষণেক আমি তার চূড়ায় দাঁড়িয়ে স্বর্গের ঘণ্টাধ্বনি শুনেছিলাম।

কোথায় চলে গেছে আশা! কোন সফল সিন্ধি যুবকের ঘর করছে সে এখন।

কাঁকুরে জমিটার ওপর আমি আদরে জুতো ঘষলাম। ঘুরে ঘুরে বারবার জমিটার স্পন্দন টের

পাওয়ার চেষ্টা করি। প্রকাশ্য দিনের আলোয় হঠাৎ এক বিভ্রমবশত উবু হয়ে বসি মাটির ওপর। তারপর চোখের জল পড়ে দু ফোঁটা, গলায় সেই আবেগের দলা উঠে আসে। বিড় বিড় করে বলি—ফিরিয়ে দাও।

—কী খুঁজছেন? এই প্রশ্ন আমার পেছন থেকে এল।

চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি, ছোট্ট মেয়ে একটা। ফ্রক পরা, বারো-তেরো বছর বয়স। বেশ দেখতে।

আমি চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—কিছু না খুকি। কিছু না।

—তবে ওভাবে বসেছিলেন যে! আমার দাদু দেখে আমাকে ডেকে বলল—যা তো, দেখে আয়, ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই কিছু হারিয়েছে।

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম—যা হারিয়েছে তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এই বলে আমি চলে আসি। মাঠ-প্রান্তর, লোকালয়ে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াই একটা হারানো বইয়ের ছেঁড়া পাতা। পাই না। বলি—বুড়ি নদী, তুমি আমার কত কী ভাসিয়ে নিয়েছ।

নদী বলে—পাগল, ঘরে যা, ঘরে যা। সব ফিরিয়ে দেব একদিন। তখন বলবি—এত জঞ্জাল কোত্থেকে এল।

কলকাতায় ফিরে গেলে যখন কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করবে—কী হে ইন্দ্রজিৎ, কী রকম দেখলে দার্জিলিং? সিনচল লেক দেখেছ, কিংবা টাইগার হিল থেকে বিখ্যাত সূর্যোদয়, আর ঘুমের মনাস্টারি, জলদাপাড়া ফরেস্ট? তখন আমি কী উত্তর দেব? না, আমি এসব কিছুই এবার দেখিনি বন্ধুগণ, চোখের জলে আমার চোখ ভরা ছিল।

কটকটে রোদের মধ্যে একদিনের সফরে কুচবিহারে এসে নেমে পড়লাম। চোখে সানগ্লাস, হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ, দাড়ি কামানো, জামা-প্যান্ট দুর্ধর্ষ। এত ভাল দেখাচ্ছিল আমাকে যে, টিকিটচেকার আমার টিকিট চাইল। এখানে টিকিট চাওয়ার নিয়ম এখন আর নেই। দুবেলা রেল কোম্পানিকে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়ে একটা আপ আর একটা ডাউন গাড়ি চলে। গাড়ি বোঝাই লোক, কিন্তু বুকিং কাউন্টারে গিয়ে দেখুন বন্ধুগণ, সেখানে আনন্দিত মাছিরা কেমন উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে খেলা করছে। চড়াইপাখি তার বাসা তৈরি করছে ডিম পাড়বে বলে, মাকড়সা জাল বুনছে, প্রজাপতি বসে আছে নাকের ডগায়, একটা মৌচাক বুকিং কাউন্টারের ওপরে সযত্নে রচনা করছে মৌমাছিরা। শোনা যায়, কুচবিহার বামনহাটের লাইনে স্টেশনগুলির বুকিং ক্লার্করা হাই তুলে 'পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জেগে'। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার প্রায়ই ভূতের ভয়ও পায়। এত নির্জন সেখানকার টিকিটঘরের ঘুলঘুলি।

কালো চশমার ভেতর দিয়ে আমি কালচে শহরটিকে দেখি। তোর্সার বন্যায় সেবার কোমর-জল উঠেছিল মিশনারি ইস্কুলে। কিন্তু বন্যার কথা থাক বন্ধুগণ। বরং বলি, কুচবিহারের আকাশে বাতাসে আজও মালবিকা রায়ের ডান গালের আঁচিলটা উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেঙ্কিনস স্কুলের মাঠে এককালের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় এস দত্ত দাঁড়িয়ে, হাতে ব্যাট, একজন বল করছে দত্ত সপাটে মারছেন। চারদিকে ঘিরে চক্রাকারে ছেলেরা অপেক্ষা করছে, দত্ত কিন্তু প্রতিবার একজনের পর একজনকে নির্ভুল ক্যাচ দিচ্ছেন। ওইভাবে ক্যাচ ধরা অভ্যাস করাতেন। আমরা অন্য স্কুলের ছেলে, তারের বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে লোভী চোখে দেখতাম। ওই যে মিশনারি স্কুল, এখন চেনা যায় না। ওর ঘরে ঘরে টাঙানো ছিল মাতা মেরি ও যিশুর ছবি। হোস্টেল থেকে হ্যারিকেন আর বইপত্র নিয়ে ইস্কুলের নির্জন ক্লাশ-ঘরে পড়তে যেতাম রাত্রিবেলা। লণ্ঠনের আলোয় মনে হত, ফটো থেকে শিশু খ্রিস্ট এইমাত্র নেমে আসবেন।

খাওয়ার ঘন্টি বাজছে, না! হ্যাঁ বন্ধুগণ, তাই। হোস্টেলে সকালের ভাত খাওয়ার ঘন্টি বাজছে। যাব? পাত পেতে বসি গিয়ে একবার।

মদনমোহন বাড়ির সামনে পুকুরে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে প্রাচীন পামগাছ। ছায়া পড়ে আছে। একদিন দেখেছিলাম, বহুদূর গ্রাম থেকে মেয়েরা এসে বসে আছে উপোস করে। সঙ্গে সকলের ঘটভর্তি জল। রাজা আসবেন, রাজাকে না দেখে তাদের পারণ হবে না। বহুক্ষণ অপেক্ষার পর রাজার মোটরগাড়ি এসে থামল, ব্রিচেস-পরা রাজা নেমে এলেন, সদ্য পোলো খেলার মাঠ থেকে এসেছেন। আমি জীবনে

অত অবাক হইনি মানুষের সৌন্দর্য দেখে। সব মানুষের চেয়ে উঁচু, সব মানুষের চেয়ে রূপবান সেই অলৌকিক রাজাকে দেখে হিংসার বদলে এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে গিয়েছিল ভিতরটা। উপবাসী মেয়েরা উপুড় হয়ে পড়ল মাটির ওপর, ঘটের জলে ভিজিয়ে দিল মাটি। কেউ কেউ কেঁদে উঠল আনন্দে। রাজা নিমীলিত চোখে একবার হাতজোড় করে দাঁড়ালেন, তারপর ভ্রূক্ষেপ না করে বিশাল পদক্ষেপে মন্দিরের চত্বরে ঢুকে গেলেন। তখন তাঁর রাজত্ব চলে গেছে, তবু কী ভীষণভাবে তিনি রাজা ছিলেন!

রাসমেলার সময়ে মদনমোহন বাড়িতে নানা মানুষের মূর্তি করে এখানে সেখানে সাজিয়ে রাখা হয়। অবিকল মানুষের মতো দারোয়ান, বাউল, সন্ন্যাসী, মুচি, গৃহস্থবধূ, রিকশাওয়ালা। অবাক হয়ে দেখতাম। একবার দেখি, একটা দড়িঘেরা জায়গায় চারটে সাধু আর একটা পুরুতের মূর্তি বসানো আছে। সাধুগুলো তো জীবন্ত বটেই, কিন্তু পুরুতটা যেন আরও জীবন্ত। আমি অবাক বিস্ময়ে বলে উঠেছিলাম—আরে, পুরুতটা দেখ, ঠিক আসল পুরুতের মতো। বলতেই পুরুতমশাই খুব বিরক্ত হয়ে আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। সবাই হেসে ওঠে এবং আমি লজ্জায় পালিয়ে আসি।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। শীতের সকালে এক রূপমুগ্ধ বালক এই ইস্কুলের পাশের মাঠে কুয়াশা জড়ানো অদ্ভুত সকালে কেডস পায়ে দৌড়োতে আসত। আর দৌড়োতে দৌড়োতে সে সেই আধো-ভেজা উদ্ভিদের গন্ধমাখা আলো-আঁধারে কী করে যেন জিন পরীদের রাজ্যে চলে যেতে পারত। একটা বয়সের পর সে আবার এসে শরীরের ভার নিয়ে বসে আছে সাগরদীঘির পাড়ে। রোদে উত্তপ্ত কাঠের বেঞ্চ। সেই ইন্দ্রজিৎ। তবু সেও তো নয়! এই তো কাছেই মালবিকাদের বাড়ি। কোন লতায়-পাতায় আত্মীয়তা ছিল বলে তাদের বাড়িতে যেতাম গল্পের বই আনতে। মালবিকা কোনওদিন কথা বলেনি। তার ডান গালে একটা আশ্চর্য আঁচিল ছিল, কত নির্জনে একাকিত্বে সেই আঁচিলটার কথা ভেবেছি। সে এখনও আমার স্মৃতিতে কিশোরীই রয়ে গেছে, কেননা আর কখনও দেখা হয়নি। যাব একবার? চেনা দিলে ঠিক চিনবে। বলব—তখন লজ্জায় যা বলতে পারিনি, আজ বলতে এসেছি। আমার সমস্ত শৈশব হারিয়ে গেছে। তুমি সেটা আমাকে অল্প একটু ফিরিয়ে দেবে?

হিসেব করে বুঝতে পারি—বোকা! বেঁচে থাকলে তারও এখন না হোক ত্রিশের ওপর বয়স। এতদিন কি সে কুমারী হয়ে বসে আছে!

আপনমনে একটু হাসি।

মামার ঘুমের মধ্যে বিকট নাক ডাকে। তবু একই ঘরে আর একটা বাঁশের তৈরি চৌকিতে আমি ঠিকই ঘুমিয়ে পড়ি। এত ক্লান্তি—শরীরে, মনে। ঘুমিয়ে স্বপ্নও দেখি।

দেখি—একটা টেলিভিশনের পর্দায় একটা ছবি। অফিসে চারু পালিত টেলিফোন তুলে বিরক্ত হয়ে কাকে যেন বলছে—রোজ রোজ খোঁজ করেন কেন বলুন তো! বলেছিল তো সে দার্জিলিং গেছে, মাসের শেষে ফিরবে।...না, কোনও খবর দেয়নি, ছুটিও এক্সটেনশন করেনি। এই বলে বিরক্ত চারু পালিত ফোন রেখে দেয়। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলে—রোজ তোমার ফোন আসছে কেন হে? তুমি রয়েছ দার্জিলিঙে, এদিকে রোজ ক্রিং ক্রিং, মাথা ধরিয়ে দিল।

আমি হেসে বললাম—পালিতদা, আপনি ফোনের ওপর অত চটা কেন?

—চটব না? সাহেবরা এই এক যন্ত্র বের করেছে, যে কেউ যে কাউকে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে ডেকে গল্প জমাবে। কাজে ভারী অসুবিধে। তোমার তো আগে এত ফোন আসত না। দার্জিলিং থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো তো বাপু, ফোনের জ্বালায় অস্থির হয়ে গেলাম।

—আসব পালিতদা।

—হ্যাঁ তাড়াতাড়ি এসো। ওই ছাই শৈশব না কী যেন দেখতে গেছ, কোন মাথামুণ্ডু কোকিলের ডাক শুনতে গেছ, ওসব ছেড়ে হুটোপাটি করে চলে এসো। ফোনের গলা ক্রমেই বিরহ-কাতর হচ্ছে। তার ওপর ছুটির এক্সটেনশন চাইলেও পাবে না, পাওনা নেই। এরপর মাইনে কাটা যাবে কিন্তু।

আমি ঘুমঘোরে বললাম—আসছি পালিতদা।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি বেলা হয়েছে। তখন বুদ্ধি-বিবেচনা ফিরে আসে, আর হাত কামড়াতে ইচ্ছে

করে। পালিতদাকে একটা সাদামাটা প্রশ্নই করা হল না, ফোনটা করেছিল কে?

মামা লোক ডেকে মস্ত একছড়া আধপাকা মর্তমান কলা কাটালেন গাছ থেকে, এখন কুমড়োর ডগা কাটাচ্ছেন। আমাকে দেখে বলল—তেমন কিছুই দেওয়া গেল না। আম-কাঁঠালের সময়টায় যদি আসতিস!

—কী দিচ্ছ? এই কলার ছড়া, কুমড়োর ডগা সব নিতে হবে নাকি?

—নিবি না? তাই কি হয়! এসব মহামায়াকে দিস। আমরা বেঁচে থাকতে এসব নিতেই হবে রে।

—মামা, প্রেস্টিজ থাকে না যে!

এক খাঁচি অমৃতি এনে দিয়েছিলাম মামাকে। কী খুশি! খাঁচিটা মেঝেয় রেখে চারদিকে ঘুরে ঘুরে অমৃতি দেখেন আর বলেন—বাঃ! বাঃ!

বলেছিলাম—খাও।

—আগে তোর মামি এসে গোপালকে নিবেদন করুক, তবে তো খাওয়া। ঘরে বিগ্রহ থাকতে বাঘ ভালুকের মতো যা পাই তাই কি খাওয়া যায়! সে জো নেই।

—মামি এসে তো তোমাকে ইচ্ছেমতো খেতে দেবে না। বরং তুমিই নিবেদন করে নাও।

মামা ভারী অপ্রতিভ হেসে বলেছিলেন—আমি নিবেদন করলে হয় না। আমার বড় লোভের চোখ। ঠাকুরকে ভোগ দিতে গিয়ে মুখ রসস্থ হয়ে যায়। তোর মামিই দেবেখন।

শেষ পর্যন্ত মামিই দিয়েছিলেন। ছেলেপুলে নেই বলে মামির এক বাই, যত রাজ্যের পাড়ার বাচ্চা জুটিয়ে খাবার বিলোনো। খাবার-দাবার বড় একটা আসে না এখন, অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু তবু যদি কিছু আসে তো মামি বিলোবেনই। সেই রসের অমৃতি পনেরো আনা বাচ্চারা খেয়ে গেল। মামি চোখের জল মুছে আনন্দে বললেন—জ্যান্ত গোপালরা খেয়ে গেল। চোখ দুখানা ভরে যায় দেখলে। এই নাও, তোমার জন্য আস্ত একখানা রেখেছি, আর একটা ইনু খাবে। এই বলে মামাকে একটা দিলেন।

সে কী কষ্ট মামার! শেষে আমার ভাগেরটা লুকিয়ে মামাকে জোর করে খাওয়াই। কিছু না, একটা অমৃতি মাত্র। বড় কষ্ট হয়। বলি—মামা, আমার কাছে কলকাতায় চলো। ঢের অমৃতি খাওয়াব।

মামা ভারী শিশুর মতো হাসেন, বলেন—যাব, তাড়া কীসের! যাব'খন।

অদূরে নদী বয়ে যাচ্ছে। কত শৈশবকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সে, এখন দেহাবশেষ ছাই পাড়ের শ্মশান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে চলেছে মাটিকে সরস করবে বলে। নদীর জলে সেই অমোঘ শব্দ।

বলি—আর কবে যাবে মামা?

মামা উদাসভাবে বলেন—যাব'খন সামনের বছর। সব বেঁচে-বর্তে থাকুক। মহামায়াকে যত্ন করিস, মা তো ওই একটামাত্র।

—আমার সঙ্গে চলো। মাকে দেখে আসবে।

—পাগল! এই সবে ধানপান উঠল। এবার ডাল বসবে খেতে। এখন বেশ দুবেলা চারটি খাওয়া হয়, বুঝলি। শীত আসছে। ফুলকপি, কড়াইশুঁটি—

—কলকাতাতেও ও সব পাওয়া যায়।

—দূর বোকা! সে তো বাজারি মাল। আর এ তো আমার খেতে ফলবে। সকালবেলা কপিখেতে গেলে শিশির-ভেজা গজগজে পাতার মধ্যে সাদা মুখখানি দেখা—তার ব্যাপারই আলাদা। তা ছাড়া বুড়িটা আছে, ফাঁকা বাড়িটা আছে। এ সব ছেড়ে কি যাওয়া যায়! এখনও অনেক দিন বাঁচব, বুঝলি। হোমিওপ্যাথিতে কি না হয়! জটেশ্বর বলে, আমাকে একশো বছর হেসে-খেলে বাঁচিয়ে রাখবে। ইচ্ছা-মৃত্যু হবে।

দিনহাটার বিখ্যাত তামাকপাতা মামিকে খানিকটা এনে দিয়েছিলাম। কী খুশি, যেন কেউ কখনও দেয়নি তাকে তামাকপাতা। যখন দোক্তা ভাজলেন সারা বাড়ি মাৎ হয়ে গেল গন্ধে। সবাইকে ডেকে ডেকে বলেন—ভাগনে আমাদের সোনার টুকরো ছেলে! এই এত দোক্তাপাতা এনে দিয়েছে—

রান্নাঘরের দোরে বসে বলি—মামি, এত একা থাকো কী করে?

মামি বলেন—বাবা, একা কী? গাছপালা আছে, কুকুরটা আছে, বেড়ালটা আছে। পাখি-পক্ষীরা আসে। বুড়োটা সারাদিন প্যান প্যান, ঘ্যান ঘ্যান করে, বেশ সময় কেটে যায়। অভাবের সংসারে কত

কাজ থাকে বাবা মানুষের! যত গতর খাটাবে তত সাশ্রয়। পাড়া প্রতিবেশীরাও আপন বলে দেখে। কিছু একা লাগে না। আর বাড়িটারও তো আত্মা আছে, বুকে করে আগলে রেখেছে, কত ঝড়-বৃষ্টি-বাতাস আটকে রাখে। বেশ আছি।

পিছনের বাগানটায় কোমর সমান জঙ্গল। তারই মধ্যে একটা সরু পায়েহাঁটা রাস্তা, কুয়োর পাড়ে লেবুর ঝোপ। সেখানে দাঁড়ালে কত কথা মনে পড়ে। যখন আমরা আলিপুরদুয়ার জংশনে ছিলাম, তখন মামার বাগান থেকে কতবার পাকা কাঁঠাল, আম, জামরুল বয়ে নিয়ে গেছি। একবার পাকা কাঁঠাল ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে শিবের ষাঁড় গন্ধ পেয়ে তাড়া করেছিল। এক খাবলা কামড়েও নিয়েছিল, মনে আছে।

মামা তখন আড়াই তিন মাইল রাস্তা হেঁটে চলে যেতেন আমাদের বাসায়। মাকে ডেকে বলতেন— ও মহামায়া, তোরা দেখি পেঁয়াজ খাস!

মা লজ্জার হাসি হেসে বলেছে—তা সাহেববাড়িতে বোনের বিয়ে দিয়েছ, পেঁয়াজ না খেয়ে যাই কোথা! পড়েছি মোগলের হাতে—

মামা মাথা নেড়ে বলতেন—তা বটে। কখনও খাইনি, গন্ধটা কেমন যেন লাগে।

মামা আমাদের বাসাতেই জীবনে প্রথম মাংস খান। আর কখনও খাননি। তাঁদের বংশে মাংসের রেওয়াজ ছিল না। খেতে বসে বললেন—একটা অভিজ্ঞতা বাদ থাকে কেন! একটু খেয়েই দেখি।

খেয়ে বললেন—বেশ তো। শোলমাছের মতোই লাগে। আর একটু শক্ত এই যা। স্থলের জীব এই প্রথম খাচ্ছি।

মামার বাগানের গাছপালার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মনে পড়ে সব। সেই সব চেনা গাছগুলোকে নিবিড় চোখে দেখবার চেষ্টা করি। কেন যেন মনে হয়, আমার সেই ছেলেবেলায় এইসব গাছগুলি আরও বড় ছিল। এখন কি সব ছোট ছোট হয়ে গেছে? তাদেরও যাত্রা কি শৈশবের দিকে!

আগাছার গায়ে গায়ে নিরামিষভোজী মশারা বসে আছে। বাস্তবিক, লক্ষ করলে দেখা যায়, সব মশা-ই কিছু হিংস্র আমিষাশী নয়। কিছু বিনীত, ভদ্র ও হিংসাশূন্য হৃদয়ের মশা আজও রয়ে গেছে পৃথিবীতে। তারা কেবলমাত্র উদ্ভিদের রস পান করে তৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকে। আলিপুরদুয়ারের অন্য মশারা তেমন নয়, তাদের ধূর্তামি সর্বজনবিদিত। কাল রাতেও দেখেছি তারা তাঁতেব মশারির জাল ফাঁক করে, চোর যেমন সিঁদ কেটে ঘরে ঢোকে, তেমনি মশারির মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করছে। একটা চতুর মশা জালের মধ্যে একটুখানি মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তারপর আর পারছিল না, তখন আর একটা মশা এসে তার পিছনে বসে মাথা দিয়ে ঠেলা দিতে লাগল তাকে। দুজনের সম্মিলিত ঠেলা ধাক্কায় অবশেষে প্রথমজন জালের মধ্যে ফোকরটাকে একটু একটু ফাঁক করতে পেরে ঢুকে পড়ল। তার পন্থা ধরে পর পর আরও কয়েকজন। কিন্তু এই বাগানে বেঁটে ডাঁটা গাছে, কলাবতীর ঝাড়ে যারা বসে আছে, তারা আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। আমি নির্ভয়ে তাদের ধার-কাছ দিয়েই ঘুরতে লাগলাম। তারা গুনগুন করে বলে উঠল—পথ-ভোলা এক পথিক যেন গো সুখের কাননে, তুমি যাও—

বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, পৃথিবীতে সময়ের চেয়ে নিষ্ঠুর কিছু নেই। যেদিকেই যাই, দেখি মানুষের ছড়ানো বীজ থেকে গজিয়ে উঠেছে ঘরবাড়ি, মানুষ-ছানা, নতুন গাছ। সব পুরনো মাঠ প্রান্তর হারিয়ে গেছে। চেনা জায়গার সব চিহ্ন মুছে নিয়ে গেছে এক অদ্ভুত অদৃশ্য সময়-নদীর বান। শৈশবে যেমন আলো দেখেছি, অন্ধকার দেখেছি, তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বুড়ি নদী, তুমি আমার কত কী ভাসিয়ে নিয়ে গেছ!

নদী উত্তর দেয়—পাগল ছেলে, ফিরে যা, ফিরে যা। তোর যা হারিয়েছে সব ফিরিয়ে দেব একদিন। তখন বলবি—এত জঞ্জাল কোত্থেকে এল?

এক বোঝা কচুর শাক দিতে এসে কে এক যুবতী মেয়ে মামির রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে—ও পিসি, তোমাদের বাড়িতে কে এসেছে গো?

আমি সচকিত হয়ে উঠি। আমি কে এসেছি? সত্যিই তো, আমি কে এসেছি এখানে? আমি তো এখানকার কেউ না। বহিরাগত, আগন্তুক।

মামি ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন—ভাগ্নে। ভাল চাকরি করে। বেশ ছেলে।

যুবতী বলে—আমাদের বিন্তির সঙ্গে সম্বন্ধ হয় না?

আমি রান্নাঘরের বেড়ার ধার ঘেঁষে চুপটি করে লুকিয়ে দাঁড়াই। শুনি মামি বলছে—ওমা, ও তো কচি মেয়ে। আর একটু ডাগর হলে হয়। তো বিন্তির সঙ্গে কেন, তোর সঙ্গেই সম্বন্ধ করি।

যুবতী হেসে উঠে বলে—হ্যাত। আমার যে সব ঠিক হয়ে আছে।

এই বলে মেয়েটি পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময়ে তাকে একঝলক দেখি। কী আশ্চর্য বন্য চেহারা। বার বার লাগাম ছিঁড়বে, সওয়ারিকে পিঠ ঝাঁকিয়ে ফেলে দেবে, বশ মানবে না, কিন্তু দৌড় করাবে পিছু পিছু। তাকে দেখেই স্মৃতির গাছ নাড়া খায়। পুরনো তোরঙ্গ খুলে জীর্ণ স্মৃতি বের করে দেখি।

কুচবিহারে সেবার স্কুল ছেড়ে সদ্য কলেজে ঢুকেছি। রাজকীয় কলেজ হোস্টেলের তিনটে বাড়ি পাশাপাশি, এক ধু-ধু করা দীর্ঘ করিডোরে পরস্পর যোগাযোগ রাখছে। পুরনো বাড়ি। তার উত্তর দিকের ব্লকটি তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকত। মাঝরাতে সেখান থেকে বেড়াতে বেরোত ভূতেরা। অশরীরী পায়ের শব্দ কতবার হেঁটে গেছে নিশুত রাতে, রাত জেগে যারা পড়াশুনো করত তারা শুনেছে। শান্তনু বড়ুয়া নামে এক অসম সাহসী ছেলে একবার টর্চ জ্বেলে দেখেওছিল, সামনে দিয়ে পায়ের শব্দ হেঁটে গেল, কাউকে দেখা গেল না।

সেবার তোর্সার বন্যায় কুচবিহার ডুবে গেলে হাজার মানুষ উঁচু জমির কলেজ আর কলেজ হোস্টেলে উঠে জাঁকিয়ে বসে পড়ল। পড়াশুনো বন্ধ। আমরা মোট ছ-সাত জন ছেলে সাঁতার জানতাম বলে আমাদের উদ্ধারকার্যে নামিয়ে দেওয়া হল। হোস্টেল আর কলেজের মেঝেটুকু ছাড়া বাদবাকি শহরের মধ্যে নদী ঢুকে পড়েছে। বহুলোক আটকে আছে শহর আর শহরতলির নানা জায়গায়। কখনও একটা পলকা কলার ভেলায়, কখনও বা একবুক বা মাথাডুব জল ভেঙে আমরা অধ্যাপকদের উদ্ধার করে নিয়ে আসতাম, মাথায় মালপত্র কিংবা কাঁধে শিশুদের চাপিয়ে। ইংরিজির এক প্রফেসরের এগারোটি শিশু ছিল। তখনও ফ্যামিলি প্ল্যানিং চালু হয়নি। আমরা শিশু পারাপার করতে করতে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু হাঁফ ছাড়ার জায়গা নেই। আমাদের ঘরে, বিছানায়, বারান্দায় সর্বত্র লোক থিকথিক করছে। ভূতুড়ে বাড়িটা খুলে দেওয়া হয়েছে, ভূতেরা পালিয়েছে প্রাণভয়ে। তবু জায়গা হচ্ছে না। তাই বিশ্রাম বলে কিছু ছিল না। হোস্টেলের রান্নাঘরে বিশাল ডেগভর্তি খিচুড়ি রান্না হত। সেই গরম ডেগ গামছা দিয়ে দুদিকে দুজন ধরে জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতাম কলেজে। উপোসী মানুষেরা খিচুড়ি দেখে চেঁচিয়ে উঠত আনন্দে। হাসপাতাল থেকে এক ব্যারেল গুঁড়ো দুধ পাঠিয়ে দিয়েছিল। গরম জলে বালতির মধ্যে খাবলে খাবলে গুলে সেই দুধ নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের দিতাম। বিশ্রাম ছিল না। তারই মধ্যে দেখেছি, আমাদের ক্লাসের একটি মেয়ে সেই শরণার্থীদের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে আছে। তার চারধারে ছেঁড়াখোঁড়া সব কাঁথা তোষক, তুচ্ছ দু-একটা দীনহীন জিনিস, তার বাবা মা নিতান্ত অশিক্ষিত ও গেঁয়ো। সে যখন কলেজে আসে তখন তার পরিপাটি সাজ ও চলাফেরা দেখে কে বুঝত পারত যে সে ওইরকম এক গেঁয়ো গরিব পরিবারের মেয়ে! সেই নিষ্ঠুর বন্যাই তার সবকিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল বলে কী লজ্জা তার! আমাদের দেওয়া খিচুড়ি সে কিছুতেই থালা পেতে নিত না, সবসময়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে মাথা গুঁজে বসে থাকত, আমরা 'চিনি না, চিনি না' ভাব করে সরে আসতাম সেখান থেকে। দুদিন প্রায় সে না খেয়ে ছিল দ্বিতীয় দিন রাতে তাকে জোর করে খিচুড়ি দিয়েছিলাম বলে সে কেঁদে ফেলেছিল।

তিনদিনেও বন্যার জল নামল না। পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছিল, সেই জলের ঢল অবিরল নেমে আসছে। আকাশ ঘন মেঘে ডুবে যায় বার বার। জলের ওপর শব্দ তুলে বৃষ্টি পড়ে। একবুক সেই নোংরা জল ভেঙে বৃষ্টির অজস্র প্রহারে জর্জরিত হয়ে যখন মানুষের জন্য খিচুড়ি বা দুধ নিয়ে যাই, তখন আমাদের আড়ালে কিছু লোক ঘোঁট পাকায়। তারা সন্দেহ করে—সরকার সাহায্য দিচ্ছেন, আমরা সেই সাহায্যের টাকা বা চাল ডাল মেরে দিচ্ছি, বদলে অখাদ্য খাবার দিয়ে ভুলিয়ে রাখছি তাদের। এক সন্ধ্যাবেলা একদল খ্যাপা শরণার্থী হঠাৎ আমাদের ঘিরে ধরল, আমার জলে ভেজা গেঞ্জিটা পিছন থেকে কে যেন এক টানে ছিঁড়ে ফেলল। মা-বাপ তোলা গালাগাল আমাদের ক্লান্ত শরীরের ভেতর ঢুকছে, কিন্তু অপমান বোধ করার মতো শক্তিও তখন নেই, এত ক্লান্ত। যখন তারা আমাদের কজনকে টানা-হ্যাঁচড়া করে গালাগাল করছিল, দু-চারটে চড়-চাপড়ও যখন খাচ্ছি, তখন অন্য কিছু নয়, কেবল অপরিসীম

ক্লান্তি টের পেলাম প্রথম। খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করেছিল। হতভম্ব হয়ে ভ্যাবলার মতো বাক্যহারা চেয়ে আছি। ভেজা গা শিউরে শিউরে উঠছে। হঠাৎ সে সময়ে এক তিনকেলে বুড়ি তার কাঁথা গা থেকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে উঠে এল, তার রোগা হাতে কাঁকড়ার মতো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে লাগল লোকজন, আর আশ্চর্য জোর গলায় চেঁচিয়ে আক্রমণকারীদের বাপ-দাদা-চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করতে করতে বলতে লাগল—সোনার টুকরো ছেলেদের গায়ে হাত দিস, বজ্রপাত হবে মাথায়। কিছু লোকের দ্বিধা ছিলই। এক লহমায় তারা একজোট হয়ে আমাদের পক্ষ নিয়ে নিল বুড়ির চেঁচানিতে। সেই বাহে বুড়ির তেজ দেখে আমার বিস্ময়ভাব আজও কাটেনি। সেই বুড়িরই কাঁথা কম্বল বস্তার নীচে একটা জ্যান্ত মেয়ে-সাপ লুকিয়ে ছিল। সেইদিনই তাকে প্রথম দেখি। কী বিশাল চোখ, অদ্ভুত এক মায়া মাখানো শ্যামলা রং ছিল তার, প্রকাণ্ড চুল। বনবাদাড়ের তেজি উদ্ভিদের সঙ্গে তার হুবহু মিল। বন্ধুগণ, মানুষ বা মেয়েমানুষ কেউই গাছ নয়, আমি জানি। তবু সেই মেয়েটার মধ্যে একটা উদ্ভিদের ছায়া ছিল। ঝগড়া দেখে সে উঠে বসে আছে, হ্যারিকেনের আলোয় তার চোখ ঝলসাচ্ছে, মুখে কী আশ্চর্য একটা সুখের স্বপ্নভাঙা হাসি। সে উঠে এসে বুড়িকে ধরল, বলল—চলো ঠাকুমা, খুব হয়েছে। বলে আমাদের ক্লান্ত, অনুভূতিহীন, ভ্যাবলা মুখের দিকে চেয়ে সে একটু প্রশ্রয়ের হাসি হেসেছিল বুঝি। আমাদের মৃতদেহগুলিতে প্রাণসঞ্চার হল। আমরা ফের অপমান ভুলে গরম খিচুড়ির হাঁড়ি বয়ে নিয়ে জনে জনের কাছে যেতে লাগলাম।

সেই জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া শহরের ভেতর থেকে কী করে একটা কাঁঠালি চাঁপা ফুল জোগাড় করেছিল মেয়েটা! চারদিনের দিন সকালে যখন দুধ দিয়ে বেড়াচ্ছি তখন সে ডেকে আমার হাতে ফুলটা দিল, বলল—কেমন বাস দেখেন! তার কথায় অশিক্ষিত গ্রাম্য টান। তবু সেই বাহে মেয়ের দেওয়া ফুলটিই আমার স্কুল-কলেজের জীবনে পাওয়া প্রথম প্রাইজ। যে ছ-সাতজন সাঁতার জানতাম তার মধ্যে জনা চারেক জলে ভিজে জ্বরে পড়েছে, অবশিষ্ট জনা তিনেক তখন শেষজীবনীশক্তিটুকু দিয়ে লড়ছি। গলা বসে গেছে, কথা বেরোয় না। রোগা হয়ে গেছি। চোখ বসা, ঘুমহীন শরীরে সব লাবণ্য চলে গেছে। কেবল গেঞ্জি কিংবা খালি গা আর হাফপ্যান্ট পরা আমাদের মূর্তি। সেই কাঁঠালি চাঁপা ফুলটা আমাদের শ্রীহীন মুখকে বুঝি অপরূপ লাবণ্য দান করেছিল। বসা গলায় ফিসফিস করে বলেছিলাম—বাঃ, বেশ গন্ধ। মেয়েটি বলল—রেখে দেন।

চারদিনের দিন দুপুরের মধ্যে জলের লেভেল নেমে গেল। অনেকেই চলে গেল বিকেলের মধ্যে। কিছু শহরতলির লোক রয়ে গেল তাদের ঘরদোরে তখনও জল, সাপ, আরও কত কী! সেই মেয়েটাও ছিল। পঞ্চমদিন ভোর থেকে আনাগোনা শুরু করে সুযোগসন্ধানীরা। তারা খবর পেয়েছে, বন্যার ফলে এখন সস্তায় মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে। সকালে দুপুরে যখন আমরা থাকতাম না, তখন সুযোগ বুঝে তারা চুপি চুপি আসত। বিকেলের দিকে খবরটা রটে গেল। তখন শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চল জলশূন্য হয়েছে। বহু ছেলে জুটে গেল। চারজন ছোকরা মাড়োয়ারি ধরা পড়ল, আর দুজন বাঙালি। শান্তনুদা একজনের চুলের মুঠি চেপে ধরে কলেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। চুল ধরে মাথাটা নুইয়ে দিয়ে আমাকে ডেকে বলল—ইন্দ্রজিৎ, মার। আমি অবাক হয়ে দেখছি, মারব কী! আমি কখনও কাউকে মারিনি যে। শান্তনুদা চেঁচিয়ে ওঠে রাগে, বলে—মার বলছি। আর তখন সেই বাহে মেয়েটা কলেজের বারান্দা থেকে নেমে এল দৌড়ে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—এই লোকটা, এই লোকটাই আমাকে ফুসলাবার চেষ্টা করেছিল। মারেন ওকে, নাকমুখ ভেঙে দেন। সেই শুনে মারবার জন্য আমি হাত তুলেছিলাম। শান্তনুদা চেঁচিয়ে বলল—তলা থেকে গদাম করে ওপর দিকে হাত চালিয়ে মার। আর শিরদাঁড়ায় হাঁটু চালা, আমি ধরে রেখেছি—ভয় নেই। আমি তীব্র অনিচ্ছায়, অদ্ভুত দুর্বল হাতে তলা থেকে ওপরে হাত চালিয়ে একটা মারলাম। দুর্বল মার, তবু ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছিল টপ টপ করে। লোকটা হাতজোড় করে বলছে—মাফ চাই, মাফ চাই। শান্তনুদা ঝাঁকানি দিয়ে আমাকে ধমকায়—ও কী মার হচ্ছে! বরং তুই ধর, আমি মারছি। তা করতে অবশ্য মারকুট্টা ছেলেরা চলে এল, আমাকে সরিয়ে দিয়ে তারা লোকটার খবর করতে লাগল জোরালো হাতে-পায়ে। মেয়েটা উল্লাসে চিৎকার করছিল—মেরে ফেলেন, মেরে ফেলেন হারামজাদাকে।

ভাইসব, আমি মারতে পারি না। যদি সকালে উঠে ব্যায়াম করি বলে আমার শরীরটা তেমন খারাপ

নয়। কিন্তু মারধোরের জন্য যে একটু আলাদা নিষ্ঠুরতা বা দৃঢ়চিত্ততা—যাই বলুন, দরকার, তা আমার নেই। বন্যার পর থেকে সেই মেয়েটার সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছে। কখনও রাসমেলায়, রথযাত্রার সময়ে, এমনিতে রাস্তায়ও। তাকাতই না। মেয়েটার দিকে চেয়েও আমার অদ্ভুত ভয় হত। লোকটাকে যখন মেরে বাগানের বেড়ার ওপর ভেজা কাপড়ের মতো মেলে দিয়ে রাখা হয়েছিল প্রদর্শনীর জন্য, তখন মেয়েটা তার ফণা তোলা মুখে ফুঁসে ফুঁসে উঠেছিল আনন্দে। তবু কেবলই মনে হয়, এক সকালের দেওয়া কাঁঠালি চাঁপা ফুলটার গন্ধই আমার সারা জীবন ধরে কেন সঙ্গে সঙ্গে চলেছে? ভুলতে পারি না। বুড়ি নদী, তুমি আমার কত কী ভাসিয়ে নিয়ে গেলে!

নদী বলে—ঘরে যা, ঘরে যা, পাগল ছেলে। সামনেই সমুদ্র, তুই কেন উল্টোবাগে বয়ে যাচ্ছিস রে! মনে-পড়ার মতো জঞ্জাল আর নেই। ওসব ভাসিয়ে দিয়ে সামনের দিকে বয়ে যা।

যে মেয়েটা কচুর শাক দিয়ে চলে গেল সেও ওই মেয়েটির মতোই। তেমনি তীব্র চোখ, তীব্র শরীর, নিষ্ঠুরতা-প্রিয় তার মুখের আদল। তাকে দেখে সেই বন্যার স্মৃতি ফের ভাসিয়ে নিয়ে গেল বুক। মনের মধ্যে কত পলি জমেছে পুরু হবে!

রওনা হওয়ার সময়ে মামা আমার হাতে একটা পাকানো কাগজ দিয়ে বলেন—ইনু এই বাড়িঘর তোর নামেই সব লিখে দিলাম। আমরা মরে গেলে তুই এসে দখল নিস। অনেকটা জমি, তা ছাড়া চাষের জমিও আছে নদীর ওপারে।

আমি কুণ্ঠার সঙ্গে বলি—এখনই মরার কথা কী মামা! একশো বছর বাঁচবে বললে যে। এখন থাক।

—নিবি না?

—এখন থাক মামা।

—তুই যে এ জায়গা বড় ভালবাসিস ইনু! তোকে দেখেই বুঝি। এ জায়গা যে ভালবাসে তাকে ছাড়া কাকে দেব বল? সবাই কি আর মাটি গাছপালা ভিটের প্রাণ টের প্রায়? এরা সবাই যে কথা বলে শোনে ক'জন? আমি মরলে তুই এসে মাঝে মাঝে থাকিস। কলকাতার বাবু হয়েছিস, এখানে গেড়ে বসতে পারবি না জানি। তবু মাঝে মাঝে আসিস। আর একটা কথা—

—কী মামা?

—মহামায়াকে বলিস, যতদিন পারে যেন বেঁচে থাকে। যেমন করে হোক। ভাল হোমিওপ্যাথ দেখাস।

আমি মাথা নেড়ে বিদায় নিই। আগড় ঠেলে দাঁড়িয়ে মামি কাঁদে। মামা সিংহের গর্জনে বলেন—মালপত্র সাবধান। কলার ছড়াটা ফেলে যাস না, কুমড়োর ডগাগুলোয় পারলে একটু জল ছিটিয়ে নিস। ঠোঙায় কুমড়ো-ফুল দিয়ে দিয়েছে তোর মামি, বড়া ভেজে খাস...

শুনতে শুনতে রিকশা সূর্যনগর ছেড়ে চলে আসে।

৯

সন্ধেবেলায় শিলিগুড়ি জংশনে যখন নামছি, তখনও পেছন থেকে কে যেন কোমর ধরে টেনে বলে—নামছ কেন ইন্দ্রজিৎ? এই গাড়িটাই তোমাকে কাটিহারে নিয়ে যাবে। একবার দেখবে না সেই মাদার গাছটা, যেখানে সেই আশ্চর্য কোকিল ডেকেছিল একবার? চলো যাই।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—না থাক। হয়তো সেই মাদার গাছটা নেই, হয়তো বাড়িটা ভেঙে ফেলেছে।

—চলো, একবার দেখে আসি।

আমি দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলি—না, আমার ছুটি নেই। পালিতদা বলছে আমার আর ছুটি পাওনা নেই। তা ছাড়া টেলিফোনে কে যেন আমাকে রোজ ডাকছে।

—ও সব ছেঁদো কথা। চলো।

আমি সেই নাছোড় ইন্দ্রজিৎকে মিনতি করে বলি—না ইন্দ্রজিৎ। ওই একটা জায়গায় আমার আর কোনওদিন না যাওয়াই ভাল। গেলেই চিরকালের মতো জায়গাটা হারিয়ে যাবে। থাকগে। আমি বরং

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং মেল ধরে চলে যাই কলকাতায়। ছুটি নেই। বলে আমি ইন্দ্রজিতের হাত ছাড়িয়ে অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে নেমে পড়ি।

ওয়েটিং হলঘরে সেই একই জায়গায় চেলু শুয়ে আছে। একই ভাবে। চারদিকে দীন-দরিদ্র লোকের ভিড়, বাচ্চাদের চেঁচানি। সেদিন যাদের দেখে গেছি অবিকল তাদের মতোই মানুষ সব, এমনকী মোটঘাট পর্যন্ত একরকম। সেই একইভাবে চেলু শুয়ে আছে।

আমি তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে তার নাড়ি দেখি। নেই। বুকে হাত দিয়ে হৃৎপিণ্ডের শব্দ অনুভব করার চেষ্টা করি। শব্দ হচ্ছে না। নাকের কাছে হাত ধরি। শ্বাস চলছে না। আমি আস্তে করে ডাকি—চেলু।

অমনি চেলু দুই চোখ খুলে তাকায়। আমাকে চিনতে পারে। তার মুখটা ব্যথা-বেদনায় আরও একটু বুড়ো হয়ে যায়। কষ্টে দুটো হাত তোলে চেলু। দু' হাতে চারটে করে মোট আটটা আঙুল দেখায়।

আমি বুঝতে পারি। আটশ'।

আমি বলি—ঠিক আছে চেলু।

সে কষ্টে ফিসফিস করে বলে—লেকিন এখুন রুপিয়া-উপিয়া নাই। নোকর রাখবেন তো, খেটে শোধ দিয়ে দিব। লোকে পুছলে বলবেন কি আমি চেলু-উলু কোই নাই।

—আচ্ছা চেলু।

—পবন সিং। সে বলে।

—আচ্ছা পবন সিং।

তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। এই প্রথম তাকে আমি পবন সিং বলে ডাকলাম। সে আবার তার অতল ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার আগে বলে—যখন ইচ্ছা ডেকে নিবেন আমাকে। এখানেই পেয়ে যাবেন।

—আচ্ছা। তুমি ঘুমোও।

আবার নিথর হয়ে যায় সে। পাপবোধে বড় কষ্ট পাচ্ছে। তার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে, আমি স্পষ্ট টের পাই। কিন্তু কোথাও কোনও ফুটো খুঁজে পাচ্ছে না। নানা স্মৃতি, সুখ-দুঃখ, বেঁচে থাকার অভ্যাস সব এসে শরীরের রন্ধ্রগুলিতে ছিপির মতো মুখ আটকায়। আত্মাটা ঘরের মধ্যে তাড়া-খাওয়া চড়াইপাখির মতো ফরফর করে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার পাঁজরে ঘা দেয়, একবার মাথার হলঘরে উড়ে বেড়ায়। চিড়িক করে ডাকে। বেরোতে পারে না।

আমি একা নিউ জলপাইগুড়িতে এসে দার্জিলিং মেল ধরি।

কলকাতায় এসে ফের নিজেকে সেট করে নিই। ঢিলে নাট-বল্টুগুলো একটু টাইট দিই, কাজকর্মের প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে কানেকশন দিই। মা-বাবার হরেক প্রশ্নের আলগা উত্তর দিতে দিতে চটপটে হাতে দাড়ি কামাই, স্নান করি, ভাত খাই, পোশাক পরে নিই। বাবা মর্তমান কলার ছড়াটার ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকে, মা বলে—দাদা বাঁচবে আরও বলছিস?

—একশো বছর। তারপরও ইচ্ছা-মৃত্যু।

—আহা, তাই যেন হয়।

—এরকম কলা কলকাতায় হয় না; আর একটা দাও তো—বলে বাবা হাত বাড়ায় তৃতীয় কলাটার জন্য।

মা শ্বাস ফেলে কলা আনতে যায়।

অফিসে ঢুকতেই পালিতদা—ঠিক স্বপ্নে যেমন—তেমনি মুখ বিকৃত করে বলেন—এসেছ? বাঁচালে।

—কেন পালিতদা?

—রোজ টেলিফোন। কবে আসবে, কবে আসবে বলে মাথা গরম করে দিল। রোজ বারোটা নাগাদ ফোন আসে। তো বাপু, রেখে যাও কেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেই তো পারো। তা হলে আর ঝামেলা হয় না।

আমি লাজুক হাসি হাসলাম। স্বপ্ন সত্যি হচ্ছে। আমার বুকের মধ্যে দুরন্ত ধাক্কা দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড। আত্মাটাও একবার চিড়িক করে ডাকল। সত্যিকারের ব্যথা হতে লাগল বুকে। প্রচুর জল খেতে থাকি। ঘন ঘন বাথরুমে যেতে হচ্ছিল। দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা ট্রাফিক পুলিশের মতো পৌনে বারোটার কাছে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে টেলিফোন বাজে, পালিতদা বিরক্তমুখে ফোন তোলেন, আমি উঠতে উঠতে বলি—আমার?

—আরে না। সামন্তর ভায়রাভাই সামন্তকে চাইছে। তুমি বোসো।

একটা বিপজ্জনক বেয়ারার চেক হাত দিয়ে পাশ হয়ে গেল। ইনডেক্স কার্ডগুলিকে ফেলছি। পালিতদাকে জিজ্ঞেস করলেই হয়, কে ফোনটা করছে রোজ। তবু জিজ্ঞেস করি না। থাক, আর একটুক্ষণ রহস্য থাক। সে নিজেই বলুক, সে কে।

আবার বাথরুম থেকে আসি। ফের জল খাই। প্রায় না দেখে ফের একটা হাজার টাকার চেক ছেড়ে দিই।

দেয়াল-ঘড়িতে বারোটা। পৃথিবী থেমে আছে। পালিতদা স্থির, তার সিগারেটের ধোঁয়া পর্যন্ত ফ্রিজ হয়ে আছে। একটা লোক পাশ-বই নিয়ে হাত বাড়িয়ে মাঝ-পথে থেমে আছে। পেমেন্ট কাউন্টারের জয়ন্ত টাকা গোনার মাঝপথে আঁকা ছবি। বাইরে ট্র্যাফিক থেমে গেল। কলকাতা মুহূর্তের জন্য থেমে রইল।

খুব অন্যরকম শব্দে ফোন বেজে উঠল। একটু লাজুক শব্দ, দ্বিধায় জড়িত।

আমি পালিতদাকে সুযোগই দিলাম না। গম্ভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিলাম।

—ইন্দ্রজিৎবাবু আছেন? রহস্যময়ীর গলা।

—বলছি। অতিকষ্টে বলতে পারলাম।

—ও। বলে থমকে গেল গলাটা।

—আপনি কে? আমি জিজ্ঞেস করি।

—আপনি কবে ফিরেছেন?

—আজই সকালে।

—ও।

—আপনি কে বলছেন?

একটু থেমে সে বলে—আমি সেই সনাতনী। চিনতে পারছেন?

আমি শ্বাস ফেলে বলি—পারছি।

সনাতনী বোধহয় হাসল; পরিষ্কার মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম।

বলল—আমার একটা কথা ছিল।

—কী?

—বউদি দার্জিলিঙে আমাকে একটা কথা বলেছিল। সেই কথাটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি।

—কথাটা কেমন?

—খুব সুন্দর। কিন্তু বউদি বলে যে, ওইরকম কথা বলাই নাকি আপনার স্বভাব। সবাইকেই নাকি বলেন।

আমি মৃদুস্বরে বললাম—হ্যাঁ, সুস্তি। কিন্তু কথাটা কেউ কানে তোলে না আজকাল।

—প্লিজ, আপনি আমাকে সুস্তি ডাকবেন না। ও নামটা একদম ভাল লাগে না। আপনি সনাতনী ডাকবেন।

—আচ্ছা। আমি বলি।

—ও কথাটা আপনি সবাইকে বলেন কেন ইন্দ্রজিৎবাবু? বউদি বলে, আপনি নাকি মেয়েদের প্রত্যাখ্যান করতে ভীষণ ভালবাসেন। তাই ওরকম সব কথা বলে মেয়েদের রাজি করিয়ে আপনি একটা নিষ্ঠুর খেলা খেলেন।

চোখে জল আসছিল। ডানহাতে ফোন ধরে আছি। তাই বাঁ হাতে ডান দিকের পকেট থেকে কিছুতেই রুমালটা বের করতে পারছি না। হাত বদল করে যে বাঁ কানে ফোন নেব, তারও অসুবিধে।

কেন জানি না, বাঁ কানে ফোন ধরলে আমি ভাল শুনতে পাই না।

আমি জিভে আমার অশ্রুর নোনতা স্বাদ পেলাম। তেষ্টা পেয়েছিল, তাই সেই কয়েক ফোঁটা জল জিভে ভিজিয়ে অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলি—আমি কাউকে কাউকে ফিরিয়ে দিয়েছি সনাতনী।

—আমাকেও কি ফিরিয়ে দেবেন?

আমি অস্ফুট গলায় বললাম—সনাতনী, একটু অপেক্ষা করো। একটুক্ষণ মাত্র।

সুস্তি গাঢ় গলায় বলে—আহা বেচারা! আমি অপেক্ষা করছি। আপনি একটু ভেবে বলুন।

আমি ভাবতে লাগলাম। পরিষ্কার টের পাচ্ছি, আমার মাথার মধ্যে একটা অক্ষম কম্পিউটার যন্ত্রের ভেতর দিয়ে এর উত্তর খোঁজা হচ্ছে। আমার জীবনের যাবতীয় তথ্য এবং ঘটনার দলিল-দস্তাবেজ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যন্ত্রে। নানা শব্দ তুলে যন্ত্রটা উত্তর তৈরি করছে।

আমি সতর্ক গলায় বলি—ধরে আছো তো সনাতনী?

—আছি। আপনি ভাবুন।

কম্পিউটার মেশিনটা ছত্রিশ বছরের পুরনো। খুব ভাল কাজ করে না। তবু চেষ্টা করছে প্রাণপণে। যেন কোনও ভুল উত্তর না দিতে হয়। অনন্ত সময় কেটে যেতে থাকে। অফিস-সুদ্ধু লোক চেয়ে আছে আমার দিকে। সনাতনী কান পেতে আছে নেপথ্যে। টেলিফোনের কানেকশন কতক্ষণ থাকবে কে জানে। কত ভেজাল লাইন এসে ঢুকে যাবে, কত অচেনা লোক ক্রস-কানেকশনে অনর্গল কথার ফোয়ারা খুলে দেবে।

আমি বলি—সনাতনী, ধরে আছো তো?

—আছি। থাকব।

আমি প্রবলভাবে ভাবতে থাকি। এক সময়ে, সুখে বা দুঃখে, আমার চোখ ভরে আবার জল আসে। মুখে কথা আসছে না। সনাতনী অপেক্ষা করছে।

বন্ধুগণ, ভাইসব, মশাইরা, যন্ত্রটা কী উত্তর দেবে বলুন তো!

লাল নীল মানুষ
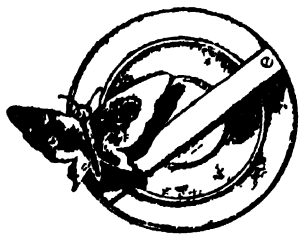
কুঞ্জনাথকে খুন করবে বলে তিনটে লোক মাঠের মধ্যে বসে ছিল। পটল, রেবন্ত আর কালিদাস।

কুঞ্জনাথ এ পথেই রোজ আসে। আজও আসবে।

রাত তেমন কিছু হয়নি। তবে নিশুত দেখাচ্ছে বটে। মাঘের এই মাঝামাঝি সময়টায় এইদিকে ডাহা শীত। তবে ইদানীং যেমন সব কিছু পাল্টে যাচ্ছে তেমনি হাওয়া বাতাসও। শীত নেই যে তা নয়, বরং শরীরে কালশিরে ফেলে দেওয়ার জোগাড়। এমন ঠাণ্ডা যে মনে হয় চারপাশের বাতাস দেয়ালের মতো জমে গেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আজ বিকেল থেকে এক ঝোড়ো হাওয়া কোত্থেকে নোংরা কাগজ উড়িয়ে আনার মতো একখানা মেঘ এনে ফেলল। সেই মেঘের ছোট টুকরোটাকেই বেলুনের মতো ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে অ্যাত্তো বড় করে এখন আকাশ ঢেকে ফেলেছে। খুব কালো হয়েছে চারধার। ভেজা মাটির গন্ধ আসছে।

তিনজনই আকাশে চেয়ে দেখে বার বার। জল এলে এই খোলা মাঠে বসে থাকা যাবে না। দৌড়ে গিয়ে কোথাও উঠতেই হবে। কুঞ্জনাথও দুর্যোগে খাল পেরিয়ে মাঠের পথে আসবে না। পিচ রাস্তায় ঘুরে যাবে। যদি তাই হয় তো কুঞ্জনাথের আরও এক দিনের আয়ু আছে, তা খণ্ডাবে কে? কিন্তু এ সব কাজ ফেলে রাখলে পরে আলিস্যি আসে, ধর্মভয়ও এসে যেতে পারে। রাত মোটে নটা। কুঞ্জনাথ স্টেশনে নামবে ছটা দশের গাড়িতে। সাড়ে ছটার পর আসবার বাস নেই। সুতরাং ওই সাড়ে ছটার বাসেই তাকে চাপতে হবে। বাজারে এসে নামতে নামতে সাড়ে সাতটা। কুঞ্জনাথ এখানে না নেমে আগের গাঁ শ্যামপুরেও নামতে পারে। তার কত কাজ চারদিকে! তা হলেও গড়িয়ে গড়িয়ে এখন সময় যা হয়েছে তাতে কুঞ্জনাথের এই বেলা আসার কথা । এখন কুঞ্জনাথই আগে আসে, না জল ঝড়ই আগে আসে সেটাই ভাবনা।

ছাতা নিয়ে বড় একটা কেউ খুন করতে বেরোয় না। এই তিনজনও বেরোয়নি। জল এলে ভরসা এক কাছেপিঠে হাবুর বাড়ি। তা সেও বড় হাতের নাগালে নয়। পুকুরপাড় ধরে ছুটে দু-দুটো বাগান পেরিয়ে তবে। তা করতে ভিজে জাম্বুবান হয়ে যাবে তারা।

পটলের হাতে একখানা ভারী কষাই-ছুরি আছে। এটাই কাজ সারার অস্ত্র। কুঞ্জনাথ যাতে আবার জোড়া-তাড়া দিয়ে না উঠতে পারে তার জন্য এবার ঠিক হয়েছে মুণ্ডু আর ধড় আলাদা করে দুটো কম করে দশ হাত তফাতে রেখে ভাল করে টর্চ মেরে দেখে নিতে হবে কাজটা সমাধা হয়েছে কি না। এর আগে কুঞ্জনাথ দুবার জোড়া দিয়ে উঠেছে।

কালিদাসের ধারণা কুঞ্জনাথের পকেটে হোমিওপ্যাথির একটা ওষুধ থাকে। মরার সময়ে টপ করে এক ফাঁকে খেয়ে নেয়। তাইতে জীয়নকাঠি ছোঁয়ার মতো ওর প্রাণটা ধুক ধুক করতে থাকে নাগাড়ে। ফলে শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররা সেলাই-টেলাই করে দিলে বেঁচেও যায়। কুঞ্জর বাপ হরিনাথ মস্ত হোমিও ডাক্তার ছিলেন। মরা মানুষ আকছার বাঁচাতেন। তিনি থাকতে এ অঞ্চলের লোকে সাপের বিষকে জল বলে ভাবত। কলেরাকে দাস্তর বেশি কিছু মনে করত না। এমনকী এত বিশ্বাস ছিল লোকের যে, মড়া শ্মশানে নেওয়ার পথেও হরি ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যেত। যদি বাঁচে।

মানুষের এমনি বাঁচার আকাঙ্ক্ষা! ভাবতে ভাবতে কালিদাস মনের ভুলে হাতের টর্চটা জ্বেলে ফেলল। ফটফটে আলো ফুটে ওঠে ঝোপঝাড়ে, রাস্তার সাদা মাটিতে। আলো জ্বালার কথা ছিল না। রেবন্ত 'হেঃ ই' করে উঠতেই কালিদাস কল টিপে আলো নেভায়।

পটল জানে আসল কাজটা তাকেই করতে হবে। রেবন্তর হাতে একটা মোটা লাঠি আছে, কালিদাসের কাছে টর্চ ছাড়াও একটা হালকা পলকা ছুরি আছে। কিন্তু কাজের সময় যত দায় তারই। লোকে জানে, তার হল পাকা হাত। তবু ঠিক কাজের সময়টায় পটল ভেতরে ভেতরে কেমন থম ধরে থাকে। একটু বেখাপ্পা কিছু শব্দ সাড়া বা স্পর্শ ঘটলে সে তিন হাত লাফিয়ে ওঠে। টর্চের আলোতেও

সে তেমনি চমকে গেল। একবার শুধু দাঁত কিড়মিড় করে। পটল টের পাচ্ছে, তার হাঁফির টানটা ঠাণ্ডায় কিছু তেজি হয়েছে। বুকে শব্দ হচ্ছে। মুখ দিয়ে রাশি রাশি বাতাস টানতে হচ্ছে। সাবধানে কিছু কেশে সে গয়ের ফেলল। এই রোগেই কি একদিন সে মরবে?

রেবন্ত হাতের আড়াল করে সিগারেট টানছে। সব ব্যাপারেই তার মাথা ঠাণ্ডা। অন্তত দেখায় তাই। কিন্তু আসলে সে তার কিশোরী শালী বনাকে ভাবছে। সবসময়েই আজকাল সে বনাকে ভাবে। সে যে ভাবে তা দুনিয়ার আর কেউ টের পায় না। বনাও না। যদি অন্তর্যামী কেউ থাকেন তো তিনি জানেন। আর কারও জানার উপায় নেই। বনাকে ভাবে, কারণ তাকে কোনওদিন পাবে না রেবন্ত। বনা স্বপ্নেও জানে না কখনও যে, তাকে রেবন্ত ভাবে। কিন্তু ওই একটুই রেবন্তর জীবনের আনন্দ। দুঃখ, বিষাদ, উৎসব, আমোদ, আতঙ্ক যাই ঘটুক জীবনে রেবন্ত তৎক্ষণাৎ বনাকে ভাবতে শুরু করে। আর তখন চোখের সামনের ঘটনাটা আর তাকে স্পর্শ করে না। সে একদম বনাময় হয়ে যায়। এখনও তাই হয়ে আছে সে। একটু বাদেই রক্ত ছিটকোবে, হাড় মাসে ইস্পাতের শব্দ উঠবে, গোঙানি, চেঁচানি কত কী ঘটতে থাকবে। এ সময়েও বনার চিন্তা তাকে অন্যমনস্ক রেখেছে। সব সময়ে রাখে। তাই তাকে ভারী ঠাণ্ডা আর ধীর স্থির দেখায়।

কুঞ্জর সঙ্গে রবি থাকবে। আর সেইটেই কালিদাসের চিন্তা। কুঞ্জকে মারার করা, রবিকে নয়। কালিদাসের ক্ষুদ্র বুদ্ধি। সে বোঝে, রবির বেঁচে থাকা মানে সাক্ষী রইল। রবি অবশ্য পালাবে। তা পালালেও কিছু না কিছু তো তার নজরে পড়বেই! সাক্ষীর শেষ রাখাটা ঠিক হচ্ছে কিনা তা সে ভেবে পায় না। যাই হোক, কুঞ্জর যে আজ আর শেষ রাখা হবে না তা কালিদাস খুব জানে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, কুঞ্জ প্রথম জখমে মুখ থুবড়ে পড়লেই সে গিয়ে তার পকেট হাতড়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশিটা সরিয়ে ফেলবে। এর আগের বার গলার নলি কাটা পড়েও কুঞ্জ বেঁচে যায়। তারও আগে বল্লম খেয়ে বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়েছিল। কুঞ্জ মরেনি। হোমিওপ্যাথি ছাড়া আর কী হতে পারে? কালিদাস অনেকক্ষণ ধরেই টের পাচ্ছে যে, পটলের হাঁফির টান উঠেছে। কাশছে মাঝে মাঝে।

খালের ওধারে সরু পিচের রাস্তা কল্যাণী কটন মিল অবধি গেছে। সেই রাস্তা থেকে আবার একটা পিচরাস্তা বাঁ ধারে ধনুকের মতো বেঁকে হাইস্কুলের বাহারি বাড়িটার গা ঘেঁষে তেঁতুলতলায় ঢুকেছে। তেঁতুলতলায় গা ঘেঁষাঘেঁষি লোকবসতি। বাইরের লোকজন নয়, তেঁতুলতলায় কল্যাণী কটন মিলের মালিক ভঞ্জদের বাস। তারাই একশো ঘর। জ্ঞাতিগুষ্টি দূরে যারা ছিল তারাও কিছু এসে গেড়ে বসেছে। ভঞ্জদের জামাই বংশও আছে কয়েক ঘর। কুঞ্জনাথের বাবা হরিনাথও ছিল এদের জামাই।

পিচ রাস্তা দিয়ে গুড় গুড় করে একটা স্কুটার গেল। খুব জোর যাচ্ছে। ধনুকের মতো বাঁকা পথে সেটা ঢুকতেই আলো দেখা গেল। রেবন্ত বহু দূরের আলোটা দেখে। গিরিধারী ভঞ্জই হবে। ললিতমোহনের এই একটি ছেলেই কিছু শৌখিন। স্টেশনের কাছে চায়ের দোকানে স্কুটার জমা রেখে রোজ ট্রেন ধরে কলকাতায় ফুর্তি করতে যায়। এতক্ষণে ফিরছে। তবে কুঞ্জর আসারও আর দেরি নেই।

কিন্তু বৃষ্টিও আসছে। ঠেকানো গেল না। বহু দূরের মাঠে বৃষ্টির ঝিন ঝিন শব্দ।

২

বাজারের মধ্যে ব্রজেশ্বরী গ্রন্থাগার। আসলে পুরোটাই এক মুদিখানা। একধারে হলদি কাঠের একটা মাঝারি আলমারিতে শ দুয়েক বই। আলমারির পাশে একটা চৌকি। তাতে মাদুর পাতা। চৌকির মাঝামাঝি একটা জানালা। ওপাশে খাল। গাছপালার ডগা জানলায় উঁকি মারে।

চৌকিতে বসে জানালার বাইরে ঘরের বিজলি বাতির আভায় যতটুকু দেখা যায় ততটুকু অন্ধকারে মাখা একটু সবুজ দেখছিল রাজু। খুব মন দিয়ে দেখছিল।

গ্রন্থাগার আর মুদির দোকান একসঙ্গে চালায় তেজেন। তার একটু লেখালেখির বাতিক আছে। রাজু এর আগে আরও কয়েকবার এসেছিল, তখন তেজেন তাকে গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ শুনিয়েছে। রাজু হাঁ হুঁ কিছু বলেনি। লেখা যেমনই হোক তেজেন লোকটা ভারী সরল। বি এ পাশ করে বসে বসে এইসব করে। প্রায়ই বলে—আমার কিছু হবে না, না রাজুবাবু?

গ্লাসের চা শেষ হয়ে গেছে। তেজেন পান আনাল। কুঞ্জ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্তা বলছে।

রাজুর হাতে পান দিয়ে তেজেন বলে—আপনি কিন্তু খুব রোগা হয়ে গেছেন।

রাজুকে এ কথাটা ভীষণ চমকে দেয়। বুকে ঘুলিয়ে ওঠে একটা ভয়। মাথা দপ দপ করতে থাকে।

কুঞ্জ তেজেনের দিকে চেয়ে চোখ টিপল। তারপর পানের পিক ফেলে—তোর মাথা। এই শীতে সকলেরই শরীরের রস কষ কিছু টেনে যায়।

—না। কিন্তু—তেজেন আরও কী বলতে যায়। কুঞ্জর ইঙ্গিতটা সে ধরতে পারেনি।

কুঞ্জ টপ করে বলে—রাজুর ঝোলায় দুটো বই আছে। চাইলেই রাজু তোর লাইব্রেরিতে দিয়ে দেবে।

রাজুর দিকে চেয়ে তেজেন সোৎসাহে বলে—কী বই?

রাজুর মুখটা সাদা দেখাচ্ছিল। চোখে একটা জ্বলজ্বলে চাউনি। শ্বাস জোরে চলছে। তেজেনের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়ল।

মুখ নামিয়ে রাজু তার শান্তিনিকেতনি ঝোলায় হাত পুরে দুটো বই বের করে দেয়। একটা নভেম্বর মাসের রিডারস ডাইজেস্ট আর একটা ইউ এস আই এস থেকে পাওয়া সল বেলোর উপন্যাস। তেজেনের লাইব্রেরির সভ্যরা ছোঁবেও না। তবু তেজেন খুশি হয়ে বলে—যদি দেন তো দু লাইন উপহার বলে লিখে দেবেন।

রাজু একটু হেসে বলে—দিলাম। লেখা-টেখার দরকার নেই।

এই তেজেনের দিকে চেয়েই রাজুর বুকের ভয়টা একটু থিতিয়ে পড়ে। বই-পাগল সাহিত্য-পাগল এই ছেলেটা কী ব্যর্থ চেষ্টায় লাইব্রেরি বানানোর কাজে লেগে আছে! ছোট থেকে এখন কেউ বড় হয় না। সে যুগ আর নেই। তেজেনের দিকে চেয়ে রাজু ওর ব্যর্থতাকে দেখতে পায়। ভারী মায়া হয় তার।

রবি কোথায় গিয়েছিল। একটা থলে হাতে দরজায় উদয় হয়ে বলল—জল আসছে কুঞ্জদা।

—চল। কুঞ্জ বলে—ওঠ রে রাজু।

তেজেন জিজ্ঞেস করে—আছেন তো কয়েকদিন?

রাজু মাথা নাড়ে—না, কাল পরশুই ফিরব।

—থাকুন না কদিন। একদিন সবাই মিলে বসি একসঙ্গে। এদিকে তো সাহিত্য নিয়ে কথা বলার লোক নেই।

—আবার আসব।

রাজু উঠে পড়ে।

রাস্তায় নেমে এসে যে তারা হন হন করে হাঁটা দেবে তার জো নেই। দুপা এগোতে না এগোতেই কেউ না কেউ কুঞ্জকে ডাকবেই। —ও কুঞ্জদা। কুঞ্জবাবু নাকি? এই কুঞ্জ।

সেবার কুঞ্জ ভোটে দাঁড়িয়ে খুব অল্পের জন্য হেরে যায়। তখন পুরনো কংগ্রেসে ছিল। তারপর হাওয়া বুঝে নতুন কংগ্রেসে নাম লেখাল। কিন্তু নমিনেশন পেল না। এখন রাজনীতির হাওয়া এত উল্টোপাল্টা যে, কোন দলে নাম লেখাবে তা বুঝতে পারছে না। তবে হাল ছাড়েনি। বাপ কিছু টাকা বোধ হয় রেখে গেছে, জমি আছে, বুড়ি দিদিমাও নাকি মরার সময় কিছু লিখে-টিখে দিতে পারে। তবে ভাগীদারও অনেক। ভাইরা আছে, তিন তিনটে বোন বিয়ের বাকি। কুঞ্জর সবচেয়ে বড় মূলধন তার মুখের মিষ্টি কথা। শরীরে রাগ নেই। কাউকে অবহেলা করে না। ওই আকাট বোকা রবি যে রবি সেও কুঞ্জর কাছে যথেষ্ট মূল্য পায়। তাই আঠা হয়ে লেগে থাকে। দু-দুবার কুঞ্জ মরতে মরতে বেঁচেছে। ঘাড়ের জখমের জন্য এখনও বাঁ দিকে মুখ ঘোরাতে পারে না ভাল করে। ঠাণ্ডা লাগলে ডান দিকের ফুসফুসে জল জমে যাওয়ার ভয় থাকে। তবু সে থেমে নেই। তার এই অসম্ভব কাজে ব্যস্ত জীবনটাকে রাজু তেমন পছন্দ করে না। কিন্তু কুঞ্জকে সে যে ভালবাসে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রাস্তায় তিন-চারজন লোক জুটল সঙ্গে। হাঁটার গতি কমে গেল। টর্চ জ্বেলে রবি পথ দেখাচ্ছে। চারদিকে নিকষ্যি অন্ধকার। আঁধারে রাজুর হাঁফ ধরে। সে কখনও আলো ভালবাসে, কখনও অন্ধকার, কখনও অনেক লোকজনের সঙ্গ তার পছন্দ, কখনও নির্জনতা। আজকাল তার এ সব হয়েছে। সেই যে

একদিন সেই ভয়াবহ স্বপ্নটা দেখেছিল, তারপর থেকে...

রবি বাঁ ধারে টর্চ ফেলে দাঁড়িয়ে। বড় রাস্তা থেকে পায়ের পথ নেমে গেছে। খালের ওপর কাঠের সাঁকো। সাঁকো পেরিয়ে মেঠো পথে গেলে পথ অর্ধেক। রাজু অনেকবার গেছে।

লোকজন বিদায় নিল এখান থেকে। কুঞ্জ ডাকল—রাজু, আয় রে।

রাজু সামনের গাছপালায় ঘন হয়ে ওঠা পাথুরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে চাপা স্বরে বলে—সাপ খোপ নেই তো!

বলেই রাজুর খেয়াল হয়, এ তার শহুরে ভয়। এখন শীতকাল, সাপ বড় বেরোয় না।

সাপের কথায় রবি টর্চের মুখ ঘুরিয়ে পিছনে ফেলে বলে—নেই আবার। মেলা আস্তিক। এই পোলের ধারেই তো কদমকে ঠুকেছিল। ইয়া চিতি। ওঝা ডাকার সময়ও দেয়নি।

কুঞ্জ বলল—ধুঃ! আয় তো। রোজ যাচ্ছি। রবিটার মাথায় কিছু নেই। কদমকে কামড়েছিল বদরুদ্দের বেড়ার ধারে, সে কি এখানে?

পোলের ওপর উঠে রবি টর্চ মেরে জল দেখে খুব বিজ্ঞের মতো বলে—দ্যাখো কুঞ্জদা, চিত্ত জানা ডিজেলে কেমন জল টানছে। এরপর কিন্তু কাদা ছাড়া খালে কিছু থাকবে না।

—তোর মাথা। চল, বৃষ্টি আসছে। কুঞ্জ সস্নেহে ধমক দেয়।

রাজু জানে, রবি একটা আস্ত ছাগল। বোধবুদ্ধি নেই, পেটে কথা রাখতে পারে না, রাস্তায় বেরোলেই লোকে পিছু লাগে, খ্যাপায়। অতিরিক্ত কথা কয় আর হাবিজাবি বকে বলে তিন মিনিটে লোকে ওকে বুঝে ফেলে, সঙ্গ এড়াতে চায়। কিন্তু ভোটপ্রার্থী কুঞ্জ হচ্ছে আলাদা ধাতের লোক। কারও ওপর না চটা, কাউকে এড়িয়ে না চলা, কাউকে অবহেলা বা অবজ্ঞা না করার একরকম অভ্যাস গজিয়ে গেছে তার। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই বোকা রবি ছায়া হয়ে ঘুরছে তার সঙ্গে, তবু কুঞ্জর মাথা এখনও বিগড়োয়নি।

রবিকে একটু আগু হতে দিয়ে কুঞ্জ আর রাজু পিছিয়ে পড়ল। কুঞ্জ নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে—তনু চিঠিপত্র দিয়েছে?

—দেবে না কেন? প্রায়ই দেয়।

—সব ভাল তো?

রাজু মনে মনে একটু কষ্ট পায়। এই একটা ব্যাপারে কুঞ্জ বোধ হয় বোকা।

রবি সামনে এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন দিকে টর্চ ঘুরিয়ে বলে—পা চালাও কুঞ্জদা। এসে গেল জল।

কুঞ্জ বলে—তুই এগো। আমরা কথা কইতে কইতে যাচ্ছি।

রবি এগোয়।

কুঞ্জ আগে, রাজু পিছনে হাঁটে। রাস্তা অন্ধকার বটে, তবে ঘন ঘন আকাশের ঝিলিকে পথ বেশ দেখা যাচ্ছে।

রাজু জানে কুঞ্জ আর একটু কিছু শুনতে চায়। কিন্তু বলার কিছুই নেই। তনু স্বামীর ঘরে সুখেই আছে। কিন্তু সে কথা কি শুনতে চায় কুঞ্জ? বরং ওর ইচ্ছে, এখনও তনু ওর কথা ভেবে স্বামীর ঘর করতে করতেও একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলুক। প্রতি চিঠিতে কুঞ্জর কুশল জানতে চাক। সেই মধ্যযুগীয় ব্যাপার আর কী!

আর এই একটা জায়গাতেই কুঞ্জ বোকা।

একটু চুপ থেকে কুঞ্জ বলে—সিতাংশুবাবুর এখন গ্রেড কত রে?

রাজু মৃদু স্বরে বলে—ইঞ্জিনিয়ারদের গ্রেড কে জানে বাবা? তবে শুনেছি, হাজার দেড়েকের ওপরে পায়।

—গাড়িও তো আছে?

এ সবই ভাল করে জানে কুঞ্জ। তবু প্রতিবার জিজ্ঞেস করে। এখনও কি নিজের সঙ্গে সিতাংশুকে মনে মনে মিলিয়ে দেখে কুঞ্জ? সিতাংশুর চেহারা মোটাসোটা, কালো, মাঝারি লম্বা। রাজপুত্তুর নয় বটে, কিন্তু সিতাংশু বিরাট বড়লোকের ছেলে, বিলেত-টিলেত ঘুরে এসেছে।

একমাত্র কুঞ্জই জানে না, তনু জীবনে কাউকে সত্যিকারের ভালটাল বাসেনি। খুবই চালাকচতুর ছিল তবু, ছিল কেন, এখনও আছে। খুবই পাকা বিষয়বুদ্ধি তার। স্কুল কলেজে পড়ার সময় রাজ্যের ছেলেকে প্রশ্রয় দিত, নিজের বাপ-ভাই ছাড়া আর বড় বাছবিচার করত না। তা বলে তনু গলেও পড়েনি কারও জন্য। নিজের বোনের জন্য রাজুর লজ্জা বরাবর। কিন্তু তনু যে আগুপিছু না ভেবে কাজ করবে না, হুট করে শরীরঘটিত কেলেঙ্কারি বাঁধাবে না, এ বিষয়ে মা-বাবার মতো রাজুও নিশ্চিন্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত তনু খুবই স্থিরবুদ্ধিতে কাজ করেছে। এম. এ পাশ করার পর বেছেগুছে নিজের পুরুষ সঙ্গীদের ভিতর থেকে সবচেয়ে সফল আর যোগ্য লোকটিকে বেছে নিয়ে বিয়ে করেছে। বিয়ের পর তনু হয়ে গেছে একেবারে অন্য মানুষ। ঘর-সংসার, টাকা জমানো, স্বামী-শাসন, শ্বশুর-শাশুড়িকে হাত করা ইত্যাদি খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে করছে। কে বলবে, এ বিয়ের আগেকার সেই বার-মুখী মেয়েটা!

তনু যখন কিশোরী তখন থেকে কুঞ্জর যাতায়াত। অন্যদের মতো তনু হয়তো কুঞ্জকেও প্রশ্রয় দিয়েছে। খুব ভালভাবে জানে না রাজু। তবে কুঞ্জর ভাব-সাব দেখে সন্দেহ হত। তনুর কোনও ভাবান্তর ছিল না, সে কুঞ্জকে যদি প্রশ্রয় দিয়েই থাকে তবে তা নিতান্তই অভ্যাসবশে দিয়েছে। তখন কুঞ্জর চেহারা খারাপ ছিল না, কিন্তু চেহারায় পটবার মেয়ে কি তনু? সুপুরুষ দেদার সঙ্গী তার চারদিকে গ্রহমণ্ডলের মতো লেগে থাকত। তনুর সঙ্গী ছেলে ছোকরারাও জানত, তনুকে নিয়ে ফূর্তি দুদিনের। চিড়িয়া একদিন ভাগবে। শুধু কুঞ্জই তা জানত না। আজও তাই জানতে চায়, তনুর স্মৃতিতে সে এখনও একটুখানিও আছে কি না। কুঞ্জ এখনও বিয়ে করেনি, করবে কি না বোঝাও যাচ্ছে না। তবে রাজু বোঝে কুঞ্জ খুব প্রাণপণে বড় হতে চাইছে। বড় কিছু হওয়ার, নামডাকওয়ালা হওয়ার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা।

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলল—তনুব বিয়েটা ভালই হয়েছে, কী বল রাজু?

রাজু সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করেই বলল—ভাল হয়েছে বুঝব কী করে? আজকাল বড় চাকরি বা গাড়ি-বাড়ি থাকলেই লোকে সেটা সাকসেস বলে ধরে নেয়। যেন ও ছাড়া জীবনে আর মহৎ কিছু নেই। আমি তো মনে করি, ওর চেয়ে সৎ, চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান, পরোপকারী লোককেই আসলে সাকসেসফুল লোক বলা উচিত।

খুশি হয়ে কুঞ্জ খুব আবেগের গলায় বলে—সে বড় ঠিক কথা। কিন্তু মেয়েরা এ সব বুঝতে চায় না কেন রে? বড় বোকা মেয়েমানুষ জাতটা।

মনে মনে রাজু বলে—কিংবা খুব চালাক।

পুকুরধার, বাগান, নারকোলকুঞ্জের ভিতর দিয়ে পথটা পাক খেতে খেতে গেছে। তারপরই মাঠ। রবি মাঠের ধারে পৌঁছে পিছনে টর্চ মেরে বলে—এসে গেল গো! ভেজা মাটির গন্ধ পাচ্ছি।

গাছের আড়াল সরে যেতেই হাওয়ার ঢল এসে লাগল বুকে। কী শীত! বাতাসে জলের হিম। এত হাওয়ায় শ্বাসকষ্ট হতে থাকে রাজুর। কান কনকন করতে থাকে, নাকের ডগায় জ্বালা। তবু এই মাঠখানা রাজুর বরাবর ভাল লাগে। তেপান্তবের মতো পড়ে আছে উজবুক একটা মাঠ। এখানে সেখানে চাষ হয় বটে, কিন্তু বেশির ভাগটাই এখনও সবুজ। একটা দুটো নৈর্ব্যক্তিক পুকুর আছে, মাঝে মাঝে গাড়লের মতো গজিয়েছে তাল বা নারকোল গাছ। মেঠো পথের ধারে ধারে ঝোপঝাড়ও আছে রহস্যের গন্ধ মেখে। জ্যোৎস্না ফুটলে এ মাঠে বিস্তর পরী নেমে আসবে বলে মনে হয়।

কয়েক কদম আগে আগে কুঞ্জ ভারী আনমনা হয়ে হাঁটছে। ওর মাথা ভর্তি এখন তনুর স্মৃতি। কত জ্যান্ত আর শরীরী হয়ে তনু ওর মনে হানা দেয় এখনও! ভেবে রাজুর কষ্ট হয়। কুঞ্জর সঙ্গে তনুর অসম্ভব বিয়েটা যদি ঘটনাচক্রে ঘটতই তা হলে কি রাজু খুশি হত? না, কিছুতেই না। তনু ঠিক লোককেই বিয়ে করেছে, এমনকী জাত বর্ণ পর্যন্ত মিলিয়ে। এখন এই বিরহে কাতর কুঞ্জটার জন্য তবে কেন কষ্ট রাজুর? মুখ ফুটে কোনওদিন তনুকে ভালবাসার কথা রাজুকে বলেনি কুঞ্জ, শুধু বরাবর আভাস দিয়েছে।

রবি এদিক ওদিক টর্চ ফেলছে। উল্টোপাল্টা হাওয়ায় মাঝে মাঝে তার গানের শব্দ আসছে। এই বিশাল মাঠে, ঢলানি হাওয়ায়, অন্ধকারে তারা তিনজন যেন বহু দূর-দূর হয়ে গেছে। যেন কেউ কারও নয়। যেই এই একা হওয়ার বোধ এল অমনি রাজুর বুক খামচে ধরল সেই ভয়। সকলের অজান্তে কে এক মৃত্যুর জাল ছুড়ে দিচ্ছে তাকে ধরার জন্য।

রাজুর হাঁফ ধরে যায়। গলার কাছে কী যেন পুঁটুলি পাকিয়ে উঠে ঠেলা দেয়। শরীরের কিছুই তার

বশে থাকে না।

গভীর কালো একটা পাথুরে আকাশে নীলাভ উজ্জ্বল এক রথ কোনাকুনি ধীর গতিতে উঠে যাচ্ছে— এই স্বপ্ন এক রাতে দেখেছিল সে। আর কিছু নয়, শুধু এক তারা চাঁদ সূর্যহীন নিকষ আকাশ, আর ওই ভুতুড়ে রথ। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল তার। শব্দহীন তলহীন ওই কালো আকাশ কখনও দেখেনি সে জীবনে। আর সেই নীল আলোয় মাখা রথই বা এল কোথা থেকে? যতবার সে রাতে ঘুমোতে গেল ততবার দেখল। হুবহু এক স্বপ্ন। কেউ কি দেখে এরকম। শেষ রাতটুকু জেগেই কাটাল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মাস তিনেক ধরে প্রতি রাত প্রায় জেগেই কাটে তার।

রথযাত্রায় ছাড়া সারা জীবনে রাজু আর রথ দেখল কই? তা ছাড়া ওরকম নীলাভ সুন্দর রথের ছবিটাই বা সে পেল কোথায়? আকাশটাই বা কালো কেন? কেন ধীরগতিতে রথ উপরে উঠে যাচ্ছে? অনেক যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে এই স্বপ্নের সামাজিক বাস্তব ব্যাখ্যা খুঁজে দেখেছে রাজু। কিছু পায়নি। কিন্তু উড়িয়েও দিতে পারেনি কিছুতেই। কেবলই মনে হয়, এই যৌবনের চৌকাঠেই বুঝি মৃত্যুদূত পরোয়ানা নিয়ে এল! কাউকেই স্বপ্নের কথা বলেনি সে। কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখেছে, এ স্বপ্ন মৃত্যুব ইঙ্গিত ছাড়া কিছুই নয়। গত তিন মাসে তার শরীর গেছে অর্ধেক হয়ে। খায় না ভাল করে, ঘুম নেই। সারাদিন একটা দূরের অস্পষ্ট সংকেত টের পায়। রাতে সেটা গাঢ় হয় আরও। মৃত্যু আসছে। আসছে।

এই মাঠের মধ্যে ঠিক তেমনি মনে হল। বড় দামাল হাওয়া, বড় খোলামেলা মাঠ, অনেক দূর হয়ে গেছে লোকজন।

কাতরস্বরে রাজু ডাকে—কুঞ্জ!

কিন্তু কুঞ্জ শোনে না। রাজুর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মুছে ফেলে দেয় বাতাস।

সামনে, কিছু দূরে তখন হঠাৎ রবির হাতের টর্চটা ছিটকে পড়েছে মাঠে। পড়ে লাশের মতো স্থির হয়ে একদিকে আলোর চোখ মেলে চেয়ে আছে। সেই আলোয় বিশাল প্রেতের ছায়া নড়ছে। কয়েকটা পা, লাঠি।

রবি কি একবার চেঁচাল? বোঝা গেল না, তবে সে টর্চটা কুড়িয়ে নেয়নি তা বোঝা যাচ্ছিল।

কুঞ্জ হেঁকে বলল—রাজু! ডাইনে নেমে যা।

কাঁপা গলায় রাজু বলে—কেন?

সে কথা কানে গেল না কুঞ্জব। দু হাত ওপরে তুলে পাগলের মতো সামনের দিকে ছুটতে ছুটতে সে চেঁচাতে লাগল—খুন! খুন! খুন!

রাজু খুনের মতো কিছু তেমন দেখতে পায়নি। কুঞ্জর মতো তার চোখ অত আঁধার-সওয়া নয়। বিজলি বাতি ছাড়া শহুরে রাজু ভারী অসহায়। কিন্তু কুঞ্জ যখন দেখেছে তখন ঠিকই দেখেছে।

রাজুব বুকে এমন ওলট পালট হচ্ছিল যে দম বন্ধ হয়ে আসাব জোগাড়। সে ডানদিকে মাঠের মধ্যে ছুটতে গিয়ে দেখে, পা চলে না। শরীরে খিল ধরে আসছে।

কুঞ্জ চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটছে সামনে। কিন্তু এই বিশাল মাঠে হাওয়ার ঢল ঠেলে সেই চিৎকার কোথাও যাচ্ছে না। দূরে ভঞ্জদের পাড়ায় নিওন বাতি জ্বলছে, রাস্তায় আলোর সারি। লোকজন রয়েছে। কিন্তু অত দূর পর্যন্ত কোনও সংবাদই পৌঁছচ্ছে না।

মাঠের মধ্যে বুদ্ধুর মতো দাঁড়িয়ে রাজু সিদ্ধান্ত নিল, কুঞ্জটা মরতে যাচ্ছে, মরবেই।

এটা ভাবতেই তার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কুঞ্জকে কি মরতে দেওয়া যায়? যার বুকে অত ভালবাসা? যে কখনও কাউকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করে না? কুঞ্জর মতো ভাল কজন?

রাজু অন্ধকারে পথের ঠাহর না পেয়ে সামনের দিকে জোর কদমে এগোতে থাকে। কয়েক কদম হেঁটে আচমকা দৌড় শুরু করে। ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে পরিশ্রমে। হাতে পায়ে খিল ধরছে, কুঁচকিতে খিঁচ। তবু প্রাণপণে দৌড়োয় রাজু।

ভঞ্জদের এলাকার উজ্জ্বল আলোর পর্দায় সে কয়েকটা কালো মানুষকে ভুঁইফোড় গজিয়ে উঠতে দেখে সামনে। ওদের হাতে লাঠি বা ওই জাতীয় সব অস্ত্র। মুখে কথা নেই।

এর পর থেকে রাজু সঙ্গে ছোরা রাখবে। খুব আফসোসের সঙ্গে সে উবু হয়ে বসে চারদিক খামচে ঢেলা খুঁজতে গিয়ে একটা ভারী মতো কী পেয়ে গেল। পাল্লাটা খুব দূরের নয়। মরিয়ার মতো চেঁচিয়ে

উঠল—খবরদার! শালা, খুন করে ফেলব! বলেই সে হাতের ভারী বস্তুটা ছোড়ে।

কারও লাগেনি, রাজু জানে। কিন্তু আততায়ীরা বোধ হয় তৃতীয় কোনও লোককে প্রত্যাশা করেনি। চেঁচানি আর ঢিল ছোড়া দেখে হতভম্ব হয়েই বোধ হয় হঠাৎ অন্ধকারে তারা 'নেই' হয়ে গেল।

রাজু পথে বসে হাঁফাতে থাকে। বুক অসম্ভব কাঁপছে গলা চিরে গেছে।

কুঞ্জ খুবই স্বাভাবিকভাবে মাঠে নেমে জ্বলন্ত টর্চটা কুড়িয়ে চারদিকে ফেলে। তারপর নরম স্বরে বলে—ব্যাটা ভেগেছে।

—কে? রাজু জিজ্ঞেস করে।

—রবি। বলে খুব হাসে কুঞ্জ।

—হাসছিস?

—হাসিই আসে রে! বিপদে আজ পর্যন্ত সঙ্গী পেলাম না। আজ শুধু তুই ছিলি। এই দ্যাখ না, রবিকে তো সবাই আমার ছায়া ভাবে। দ্যাখ, শালা লোক দেখেই টর্চ ফেলে আমাকে রেখে হাওয়া।

—ওরা কারা?

—কে বলবে? তবে ঠাকুরের ইচ্ছেয় শত্রুর তো অভাব নেই। উঠতে পারবি এখন? শরীর খারাপ লাগছে না তো!

রাজু ওঠে। পা দুর্বল, শরীরে থরো-থরো কাঁপুনি।

কুঞ্জ শান্ত গলায় বলে—চ, বৃষ্টি এল বলে।

ভারী নির্বিকার কুঞ্জ। যেন এরকম ঘটনা নিত্য ঘটছে। দেখে রাজুর রক্ত গরম হয়ে যায়। কুঞ্জর ঠাণ্ডা রক্ত তার একদম পছন্দ নয়। বলে—লোকগুলো কোথায় গেল দেখবি তো! পথে যদি আবার অ্যাটাক করে?

কুঞ্জ নিভু-নিভু টর্চটা হাতের তেলোয় ঠুকে তেজ বাড়ানোর অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বলল—আর মনে হয়, চেষ্টা করবে না। তোকে দেখে ভয় খেয়েছে। ঠাহর পায়নি তো তুই কে বা কেমন ধারা!

—চিনতে পারিসনি?

—না। রবি হয়তো দেখেছে।

রাজু খুবই রেগে যায় মনে মনে। কিন্তু ওঠেও। টের পায়, ঘটনাটা আচমকা ঘটায় তার কিছু উপকার হয়েছে। মনের স্যাঁতসেঁতে ছিচকাঁদুনে ভাবটা আর নেই। ঝরঝরে লাগছে।

৩

বনশ্রীর চেহারা ঠিক তার নামের মতোই, তাকে দেখলে যে কোনও পুরুষেরই গাছের ছায়া বা দীঘির গভীর জলের কথা মনে পড়তে পারে। বনশ্রী নিজেও জানে তার চেহারায় তাপ নেই, তীক্ষ্ণতা নেই, আছে স্নিগ্ধ লাবণ্য। তাকে কেউ মা বলে ডাকলে ভারী ভাল লাগে তার।

সবার আগে বলতে হয় তার চুলের ঐশ্বর্যের কথা। কালো নদীর মতো স্রোত নেমে এসেছে। তাতে সামান্য ঢেউ-ঢেউ। এলো করলে আস্ত একটা কুলো দিয়েও ঢাকা যায় না। তার গায়ের রং যেন কালো চুলেরই ছায়া। একবার এক পাত্রপক্ষ তাকে দেখতে এসে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল—এ তো কালো! অহংকারী বনশ্রী লজ্জায় নতমুখী হয়েছিল। বলতে ইচ্ছে হয়েছিল—আপনি ভুল করছেন। আপনার চোখ নেই। বলেনি বটে, কিন্তু বনশ্রী মনে মনে ঠিক জানে যারা দেখতে জানে তারা দেখবে, এ রঙের কালো ফর্সা হয় না। এ হল বনের গভীর ছায়া, এ হল দীঘির জলের গভীরতা। সে দেখেছে, পুরুষ মানুষ যখন তার দিকে তাকায় তখন ওদের তেমন কাম ভাব জাগে না, কিন্তু বুক জুড়ে একটা পুরনো তেষ্টা জেগে ওঠে। খুব বেশি পুরুষ যে তাকে দেখে তা নয়, কিন্তু যারা দেখে তাদের চোখ স্বপ্নের চোখ হয়ে যায়। এ সব কি তার কল্পনা? ভুল ভাবা? ভাবতে ভাবতে সারা দিন শতবার আয়নায় মুখ দেখে বনশ্রী। কেমন মুখ? একটু লম্বাটে গড়ন, গালের ডৌলটি লাউয়ের ঢলের মতো। ঘন জোড়া ভ্রূ। এই একটু খুঁত তার, জোড়া বাঁধা ভ্রূ নাকি ভাল নয়। কিন্তু তার নীচে চোখ দুটির দিকে তাকাও। এমন মায়াভরা চোখ দ্যাখেনি কেউ। অন্য সব কিছুকে তুচ্ছ করে দেয় সীমানা ছাড়ানো তার দুই চোখ। চোখের মণি যেন

দুধ-পুকুরে এক গ্রহণ-লাগা চাঁদের ছায়া। নাক চাপা বলে দুঃখ নেই বনশ্রীর। তবে ছোট বেলায় একবার বোলপুর রেলস্টেশনে একটা লোক তার নাকছাবি ছিঁড়ে নিয়েছিল নাক থেকে। সেই ক্ষতের দাগ আজও আছে। তার ঠোঁট শীতকালেও কখনও ফাটে না। সব সময়ে টই-টুম্বুর হয়ে আছে পাকা ফলের মতো। লম্বা নয় বনশ্রী, কিন্তু ছোট মাপের মধ্যে তার শরীর স্বাস্থ্য ঢলঢলে। বনশ্রী নিজের রূপে মুগ্ধ বটে, কিন্তু কখনও শরীর বসিয়ে রেখে গতরখাস হওয়ার চেষ্টা করে না। রোদে-জলে সে গাঁয়ের পর গাঁ হেঁটে গ্রাম-সেবিকার কাজ করেছে। হরেক রকম ত্রাণকাজে ঘুরে বেড়িয়েছে শহরে গঞ্জে। কলেজে ইউনিয়ন করার সময় উদয়াস্ত খেটেছে নাওয়া খাওয়া ভুলে।

সে জীবনটা চুকেবুকে গেছে বনশ্রীর। এখন তাকে ঘরেই থাকতে হয়। বরং বলা চলে, ঘরে বসে তাকে অপেক্ষা করতে হয় বিয়ের জন্য। মাঝে মধ্যে পাত্রপক্ষ আসছেও। কেউ কেউ পছন্দও করছে। কিন্তু বড্ড খুঁই তাদের। মিল হতে গিয়েও ফসকে যাচ্ছে নানা গেরোয়। একটা বিয়ে সব ঠিকঠাক, শোনা গেল পাত্র দুম করে আর একজনকে রেজিস্ট্রি করেছে। আর একজন এসেছিল তুকারাম রাঠোর। তারা নাকি তিন পুরুষ ধরে কলকাতায়, বাঙালিদের সঙ্গে বিয়ে শাদি। কিন্তু বাবা বললেন, রাঠোরটা কিছু কঠোর হয়ে যাচ্ছে। আমার নরম মেয়েটার সইবে না। খুব হাসি হয়েছিল সেই নিয়ে। বনশ্রীর বিয়ে নিয়ে কখনও মজার, কখনও দুঃখের, কখনও হতাশার নানা ঘটনা ঘটছে। বাবা সত্যব্রত এক সময়ে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে কিছুদিন ছাত্র ছিলেন। রবি ঠাকুরকে দেখেছেন। মাঝে মধ্যে তীর্থযাত্রার মতো সপরিবারে শান্তিনিকেতনে যান। তাঁর ইচ্ছে, বনশ্রীর বিয়ে হোক এমন ছেলের সঙ্গে যে শিল্প বোঝে।

ইচ্ছে করলে বনশ্রী কাউকে ভালবেসে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু বনশ্রী এই একটা ব্যাপার কখনও মনে মনে পছন্দ করেনি। ছেলে-ছোকরাদের ভারী দায়িত্বজ্ঞানহীন, ছটফটে আর অবিশ্বাসী মনে হয় তার। সে পছন্দ করে একটু বয়স্ক লোক। অন্তত দশ বছরের বড়, বেশ ধীরস্থির বিবেচক, দায়িত্ববান। খুব পরিশ্রমী আর বিশ্বস্ত পুরুষ হবে সে। গভীর মায়া থাকবে সংসারে, চরিত্রবান হবে, ইতি-উতি তাকাবে না, ছোঁক ছোঁক করবে না। তা ছাড়া বনশ্রী ভাবে, একটা লোকই তাকে পছন্দ করে নিয়ে যাবে, সেটা যেন বড় একপেশে ব্যাপার। সে চায়, পাত্রের গোটা পরিবার তাকে পছন্দ করুক, তারিফ করুক, সবাই মিলে সাদরে গ্রহণ করুক তাকে। সেই ধরনের সম্মান আলাদা। হোটেল রেস্টুরেন্ট ঘুরে, ফাঁকা কথায় পরস্পরকে ভুলিয়ে, নিতান্ত লোভে কামুকতায় জৈবিক ইচ্ছেয় বিয়ে সে কোনওদিন চায়নি। তাই কখনও কারও সঙ্গে প্রেম হয়নি তার, যদিও বহুজন পেয়ে বসতে চেষ্টা করেছে। কত চিঠি আসত তখন। কত ইশারা ইঙ্গিত ছিল চারপাশে। নোংরামিই বা কম কী দেখেছে বনশ্রী। পথেঘাটে সুযোগ বুঝে ইতর পুরুষেরা অশ্লীল নানা মুদ্রা দেখানোর চেষ্টাও করেছে কতবার।

বনশ্রীকে তাই আজও অপেক্ষা করতে হচ্ছে। নিজের স্নিগ্ধ ছায়া নিয়ে বসে আছে সে। এক দিন সেই পরম মানুষটি বহুদূর থেকে হাক্লান্ত হেঁটে এসে ঠিক বসবে ছায়ায়। তাকে জুড়িয়ে দেবে বনশ্রী।

বিনা কাজে আজও দুপুরে এসেছিল রেবন্তদা—তার জামাইবাবু। যদি বনশ্রী বুকে হাত দিয়ে বলে যে রেবন্ত লোকটাকে সে দু চোখে দেখতে পারে না তা হলে মিছে কথা বলা হবে। লম্বাটে গড়নের ভাবুক ও অন্যমনস্ক রেবন্তকে প্রথম থেকেই তার ভাল লেগেছিল। দিদি শ্যামশ্রী দেখতে খারাপ নয়, বনার মতোই। তবে তার বুদ্ধি বড় কম। অল্পে রেগে যায়, সামান্য কথা নিয়ে তুলকালাম বাঁধায়। ওদের সংসারে শান্তি নেই। শ্যামশ্রীও খুব ঠ্যাঁটা মেয়ে, রেবন্তদা যা পছন্দ করে না ঠিক সেইটা জোর করে করবে। বিয়ের পর যেটা নিয়ে ওদের সবচেয়ে বেশি অবনিবনা হয়েছিল সেটা হল চরকা। আদর্শগত দিক দিয়ে রেবন্ত চরকার বিরুদ্ধে।

অথচ মা সবিতাশ্রীর প্রভাবে তারা তিন বোনই চরকা কাটতে শিখেছে। সবিতাশ্রীর বাবা কট্টর গান্ধীবাদী ছিলেন এবং এখনও আছেন। সরল ঋজু চেহারার মানুষ, ছাগলের দুধই তাঁর প্রধান পথ্য। খুব ভোরে উঠে চরকা কাটতে বসেন। বাড়ির প্রত্যেককেই দিনের কোনও না কোনও সময়ে কিছুক্ষণ চরকা কাটতেই হবে, তাঁর অনুশাসনে। গান্ধীজির আদর্শ অনুযায়ী নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাউকে কাউকে হরিজনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার আগ্রহ ছিল তাঁর। গান্ধীজি একবার নাকি সি আর দাশকেও বলেছিলেন, তোমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে অন্তত একজনকে হরিজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ো। সবিতাশ্রীর

বাবার সেই আগ্রহ অবশ্য কাজে পরিণত হয়নি। এ নিয়ে সত্যব্রত নানা তর্ক করেছেন। এখনও স্ত্রীকে বলেন—তোমাদের গান্ধীজি পরম রামভক্ত ছিলেন। অথচ শম্বুক বর্ণাশ্রম ভেঙেছিল বলে স্বয়ং রামচন্দ্র তাকে চরম দণ্ড দেন। তা হলে বর্ণাশ্রমের সমর্থক রামচন্দ্রের ভক্ত হয়ে গান্ধীজি বর্ণাশ্রম ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন কেন? সবিতাশ্রী এর সঠিক জবাব দিতে পারেন না, বলেন—সে আমলের কথা আলাদা। সমাজ কত পাল্টে গেছে। সত্যব্রত বলেন— বাইরেটা পাল্টায় বটে কিন্তু তা বলে মানুষের রক্ত তো নীল হয়ে যায়নি। ভিতরটা পাল্টায় না। রবীন্দ্র-ভক্ত সত্যব্রত হিন্দুই বটে, ব্রাহ্ম নন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সংস্পর্শে তিনি কিছুটা বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন একদা। কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুরের পরম গান্ধীভক্তি দেখে এবং সবিতাশ্রীকেও যে একদা হরিজনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল তা জেনে তিনি কঠোর বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী হয়ে পড়লেন। শ্বশুরের সঙ্গে ঘোর তর্ক জুড়তেন। এমনকী রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের বক্তব্যকেও প্রকাশ্যে নস্যাৎ করতে লাগলেন। এখন আর স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করেন না বটে তবে মাঝে মাঝে ফুট কাটেন—ওগো শুনছ, এই দ্যাখো খবরের কাগজে লিখেছে পশ্চিমবাংলার একজন পরম গান্ধীবাদী নেতা খুব মাংস খেতে ভালবাসেন। সবিতাশ্রী অবাক হয়ে বলেন—তাতে কী? সত্যব্রত খুব হেসে বলেন, স্বয়ং গান্ধী বলতেন আমি লাঠি ভেঙে ফেলব তবু সাপকে মারব না। তা ওরকম গোঁয়ার অহিংস মানুষের চ্যালাবা মাংস খাচ্ছে, এটা একটু কেমন কেমন লাগে না!

সে সব দিন পার হয়ে গেছে! এখন গোটা ব্যাপারটাই পরিহাসের বিষয়। বিয়ের সময় সবিতাশ্রীকে তাঁর বাবা একটি চরকা উপহার দেন যথারীতি। সবিতাশ্রী আগে অভ্যাসবশে রোজ চরকা কাটতেন। ছেলেমেয়ে হলে তাদেরও শেখালেন। শ্যামশ্রী, বনশ্রী, চিরশ্রী এবং শুভশ্রী চমৎকার চরকা কাটতে শিখল। কিন্তু অনুশাসন বজায় রাখার জন্য কোনও গান্ধীবাদী তো এ সংসারে নেই। তাই চরকার অভ্যাস ক্রমে শ্লথ হয়ে এল। এখন সংসারে নানা কাজ আর সম্পর্কে জড়িত সবিতাশ্রী কেবল গান্ধীজির জন্মদিনে কিছুক্ষণ চরকা কাটেন। ছেলেমেয়েরা আর চরকা ছোঁয়ও না। কিন্তু শ্যামশ্রীর বিয়ের সময় দাদু লোক মাবফত উপহার বলে একটি চরকা পাঠিয়ে দিলেন। বিয়ের আসরে সেই চরকা দেখে প্রথম হাসাহাসি তারপর কিছু গুঞ্জন উঠল। বোকা কিন্তু জেদি শ্যামশ্রী সেইটেই অপমান বলে ধরে নেয়। অপমানের প্রতিশোধ নিতে সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে রোজ চরকা কাটে। রেবন্তর সঙ্গেও তার সেই নিয়েই গণ্ডগোলের সূত্রপাত।

কিন্তু বনশ্রী জানে, চরকা থেকে ঝগড়াটা জন্মায়নি। দু-চার দিনেই চরকাটা হয় শ্যামশ্রী ভুলে যেত, নয়তো রেবন্ত দেখেও দেখত না। চরকাটা কারণ নয়, উপলক্ষ মাত্র। ব্যক্তিত্ববান পুরুষরা জেদি মেয়ে পছন্দ করে না, জেদি মেয়েরা পছন্দ করে না পুরুষের খবরদারি। এ হল স্বভাবের অমিল।

কিন্তু এ ছাড়াও একটা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু সেই কারণের কথা ভাবতে বনশ্রী ভয় পায়। বড় ভয় পায়। বছর দেড়েক আগে শ্যামশ্রীর যখন বিয়ে হয় তখন বনশ্রীও বিয়ের যুগ্যি যুবতী। তখন সে বেশ ভাল করে পুরুষের দৃষ্টি অনুবাদ করতে পারে। সেই বিয়ের ছ মাসের মধ্যেই সে তার নতুন জামাইবাবুর চোখে অন্য আলো দেখতে পায়। সেই থেকে ভয়।

বাইরে তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কোথায় কোনও বৈলক্ষণ্য নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে রেবন্ত তাকে এক-আধ পলক নিবিড় বিহ্বল চোখে দেখে। ঘুরে ঘুরে তাকেই দেখতে আসে না কি? যেমন আজও এসেছিল? এক দিন দুপুরে বনশ্রী ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুমের মধ্যেই অস্বস্তি হতে থাকে তার। কেমন অস্বস্তি তা বলতে পারবে না, তবে কেমন যেন তার ভিতর থেকেই কেউ তাকে জেগে উঠবার ইশারা দিচ্ছিল বার বার। বেশ চমকে জেগে উঠেছিল সে। আর জেগেই দেখল তার পায়ের দিকে খাটে রেবন্ত বসে আছে। মুখে সামান্য হাসি, চোখে অপরাধীর দৃষ্টি। না, রেবন্ত কোনওদিন তার গায়ে হাত দেয়নি, কখনও খারাপ ইঙ্গিত করেনি। তবে ওই বসে থাকাটা একটু কেমন যেন। যুবতী মেয়ের ঘুমের শরীর পুরুষ দেখবেই বা কেন? বনশ্রী জাগতেই রেবন্ত বলল—বসে বসে তোমার পা দেখছিলাম। বনশ্রী তো লজ্জায় মরে যায়। ছি ছি, পায়ের ডিম পর্যন্ত শাড়ি উঠে আছে। ধড়মড়িয়ে বসে সে ঢাকাঢুকি দিল। তখন রেবন্ত বলল—বনা, লজ্জা পেয়ো না, কিন্তু এমন সুন্দর পায়ের গঠন কোনও মেয়ের দেখিনি। এ খুব ভাগ্যবতীর লক্ষণ।

সেই থেকে কেমন খটকা।

জামাইদের ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ি আসাটাও তো খুব স্বাভাবিক নয়। এখান থেকে রেবন্তর গাঁ কাছেই। শ্যামপুর। কিন্তু কাছে বলেই যে আসবে তারও তো মানে নেই। এমনিতেই গাঁয়ের জামাইদের পায়াভারী। ন মাসে ছ মাসে পায়ে ধরে যেচে আনতে হয়। স্বভাব অনুযায়ী রেবন্তর আরও পায়াভারী হওয়ার কথা । সে খুব আত্মসচেতন, রাগি, খুঁতখুঁতে। তবে আসে কেন?

আজ দুপুরের দিকে এল। রুক্ষ চেহারা, দাড়ি কামায়নি, চোখের দৃষ্টিও এলোমেলো। কথাবার্তাও কিছু অসংলগ্ন ছিল । বাইরে থেকে ডাকছিল—চিরু, এই চিরু।

চিরশ্রী তখন বাড়িতে ছিল না, স্কুলে ছিল।

—বাইরে থেকে কে ডাকে দ্যাখ তো। জামাইয়ের গলা নয়? সবিতাশ্রী বনাকে ডেকে বলেন।

বাইরে থেকে ডাকার কিছু নেই। রেবন্ত অনায়াসে ঘরে দোরে ঢোকে। বনা গিয়ে দেখে বারান্দায় কাঁঠাল কাঠের চৌকিতে চুপ করে বসে আছে। একটু আগে পাড়ার বিশু, বাবুয়া আর কটা পাড়ার ছেলে মিলে টোয়েন্টি নাইন খেলছিল। তাস তখনও পড়ে আছে চিত উপুড় হয়ে। রেবন্ত একদৃষ্টে সেই তাসের দিকে চেয়ে। বারান্দায় ঠেস দেওয়া তার সাইকেল।

বনা যথেষ্ট অবাক ভাব দেখিয়ে বলল—ওমা। জামাইবাবু! বাইরে বসে কেন?

রেবন্ত খুব কাতর দুর্বল এক দৃষ্টিতে চাইল বনার দিকে। বলল—আমি এক্ষুনি চলে যাব।

কথাটার মানেই হয় না। চলে যাবে তো এলে কেন? তবু বনা বলে—যাবেন তো, তাড়া কী? মা ডাকছে চলুন। চা বসাই গিয়ে।

রেবন্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—আমার সঙ্গে লোক আছে।

বনা কথাটা বুঝল না, বলল—তাতে কী? লোকদের ডেকে আনুন না, সবাই বসবেন, চা করে দিচ্ছি।

রেবন্ত মাথা নেড়ে বলল—তা হয় না। কাজ আছে। জরুরি কাজ।

বনা অবশ্য কোনও লোককে দেখতে পায়নি। রাস্তার লোককে বাড়ি থেকে দেখার উপায়ও নেই। সামনে অফুরন্ত বাগান, খানিকটা খেত। মেহেদির উঁচু বেড়ার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে নিম আম জাম তেঁতুল জামরুল গাছের নিবিড় প্রতিরোধ। তার ওপর এবার অড়হর চাষ হয়েছে বড় জায়গা জুড়ে। সেই ঢ্যাঙা গাছের মাথা দেড় মানুষ পর্যন্ত উঁচু হয়ে সব আড়াল করেছে।

বনা বলল—মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে সকাল থেকে কিছু খাননি। চারটি মুড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছি, ডাল তরকারি দিয়ে খেয়ে তারপর রাজ্য জয়ে যাবেন খন।

রেবন্ত হাঁ করে বনার দিকে চেয়ে থেকে বলল—আমাকে কি খুব শুকনো দেখাচ্ছে? বনা ফাঁপরে পড়ে যায়। শুকনো দেখাচ্ছে বললে জামাইবাবুর যদি মন খারাপ হয়ে যায়? রোগা বলে রেবন্তর কিছু মন খারাপের ব্যাপার আছে। প্রায়ই জিজ্ঞাসা—আমার স্বাস্থ্যটা আগের চেয়ে ভাল হয়নি? বনা তাই দোনো-মোনো করে বলে—রোদে এসেছেন তো তাই।

নিজের গালে হাত বুলিয়ে অন্য মনে কিছুক্ষণ বসে থেকে রেবন্ত বলে—আজ দাড়িটাও কামানো হয়নি।

গাঁয়ের কোনও লোকই রোজ দাড়ি কামায় না। এমনকী বড় ভঞ্জবাবু পর্যন্ত নির্বাচনী সভায় তিন দিনের খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি নিয়ে বক্তৃতা করছেন—এ দৃশ্য বনশ্রী দেখেছে। তবে রেবন্ত শ্বশুরবাড়ি আসার সময় দাড়ি কামিয়ে আসবেই। বেশির ভাগ দিনই বোধ হয় বাজারের সেলুন থেকে কাজ সেরে আসে, গালে ভেজা সাবানের দাগ লেগে থাকে।

বনা বলল—এখন আপনি আমাদের পুরনো জামাই, শ্বশুরবাড়ি আসতে বেশি নিয়ম কানুনের দরকার হয় না। উঠুন তো, ভিতরে চলুন। সঙ্গের লোকের কি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? ডেকে আনুনগে তাদের।

রেবন্ত মাথা নেড়ে বলে—ওরা আসবে না।

কথাটা বনার ভাল লাগল না। রেবন্ত যে আজকাল কিছু আজেবাজে লোকের সঙ্গে মেশে তা শ্যামশ্রীই বলে গেছে। বাবাও একদিন দেখেছেন, জামাই পটলের সঙ্গে বাগনান স্টেশনে বসে আছে। দৃশ্যটা ভাল ঠেকেনি তাঁর চোখে। পটলটা মহা বদমাশ।

সুন্দর চেহারার ভাবুক রেবন্ত কেন বদ লোকের সঙ্গে মেশে তা আকাশ পাতাল ভেবেও কূল করতে পারে না বনশ্রী। শুধু মনটা খারাপ হয়ে যায়।

রেবন্ত বনশ্রীর চোখে চোখ রেখে বলল—আমি যদি আর কখনও না আসি বনা?

বনশ্রী চমকে উঠে বলে—ও কী কথা?

রেবন্ত ম্লান হেসে বলে—অনেক কিছু ঘটতে পারে তো?

বনশ্রীর বুক কাঁপছিল। বলল—কী হয়েছে আপনার বলুন তো! দিদি কিছু বলেছে?

—সে কথা নয়। বলে রেবন্ত তার সাইকেলটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

এ সময়ে সবিতাশ্রী পরিষ্কার কাপড় পরে ঘোমটা অল্প টেনে শান্ত পায়ে দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়ে বলেন—রোদে এসেছ, স্নান করে দুটি খেয়ে যাও।

রেবন্ত অবশ্য রাজি হয়নি। বলল—না, আমার কাজ আছে।

বনশ্রী চা করে দিল। সেটা খেয়েই সাইকেলে চলে গেল রেবন্ত। বনশ্রী মাকে বলল—দিদির সঙ্গে আবার বোধ হয় বেঁধেছে।

গান্ধীবাদী শিক্ষার দরুন সবিতাশ্রীব ধৈর্য খুব বেশি। সহজে রাগ উত্তেজনা হয় না, সব ব্যাপারেই কিছু অহিংস নীতির সমাধান ভেবে বের করতে চেষ্টা করেন। বললেন—জামাইকে দোষ দিই না, শ্যামা বড় জেদি।

বনশ্রী বলল—জামাইবাবুর আজকের চেহারাটা কিন্তু ভাল নয় মা। খুব একটা কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছে। তুমি বরং দিদির কাছে কাউকে পাঠিয়ে খবর নাও।

বিকেলের আগেই শুভ সাইকেলে দিদির বাড়ি থেকে ঘুরে এসে বলল—দিদি বলেছে জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া হয়নি। তবে কদিন ধরে নাকি জামাইবাবু রাতটুকু ছাড়া বাড়িতে থাকে না, খেতেও যায় না। বাড়ির কেউ কিছু জানে না, কাউকে বলে না কোথায় যায়। দিদি জিজ্ঞেস করে জবাব পায়নি।

সত্যব্রত এ সব খবর জানেন না। কিন্তু বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে হাতমুখ ধুতে উঠোনের কোণে পাতা পিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে পায়ে পা ঘষতে ঘষতে সবিতাশ্রীকে বললেন—আজ ইস্কুলের কাজে দুপুরে বাগনান গিয়েছিলাম। ফেরার পথে শ্যামার বাড়ি যাই। সেখানে শুনলাম অমিতার সব ঘটনা নাকি রেবন্ত জানতে পেরেছে। শ্যামার সঙ্গে তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি। বলেছে নাকি আগে জানলে এ বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করত না।

অমিতা সবিতাশ্রীর ছোট বোন। খুবই তেজি মেয়ে এবং সমাজকর্মী। কুমারী বয়সে একবার সে সন্তানসম্ভবা হয়। এ নিয়ে হইচই খুব একটা হতে দেননি সবিতাশ্রীর বাবা। শান্তভাবেই তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন, সন্তানটির বাবা কে এবং তার সঙ্গে অমিতার বিয়ে সম্ভব কি না। অমিতা সন্তানের বাবার নাম বলেনি, তবে এ কথা বলে যে বিয়ে সম্ভব নয়। সবিতাশ্রীর বাবা গগনবাবু আর কোনও চাপাচাপি করেননি। যথারীতি অমিতার সন্তান জন্মায়। গগনবাবু সেই উপলক্ষে পাড়ায় মিষ্টি বিলোন। অমিতা কিছুদিন পরেই বাবার আশ্রয় ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে চাকরি করতে থাকে। এখন সম্পর্কও রাখে না। ঘটনাটা বহুদিনের পুরনো। লোকে ভুলেও গেছে। অমিতা নামে যে কেউ আছে এ নিতান্ত তার আপনজন ছাড়া আর কারও মনেও পড়ে না।

সবিতাশ্রী চিন্তিত মুখে বললেন—কার কাছ থেকে শুনল?

সত্যব্রত ঠোঁট উল্টে বিরক্তির সঙ্গে বলেন—কে জানে! শ্যামাটা তো বোকার হদ্দ। কোনও সময়ে বলে ফেলেছে হয়তো। তবে জামাই অমিতার কাণ্ডকারখানা শুনে বিগড়োয়নি। সে নাকি শ্যামাকে বলেছে, ও সব আমি অত মানি না, কিন্তু তোমার দাদু লোককে মিষ্টি খাওয়াল কেন? এটা কি আনন্দের ঘটনা? আসলে তোমাদের গুষ্টিই পাগল আর চরিত্রহীন।

সেই বিকেলের দিককার ঘটনা। বনশ্রী বা ভাইবোনরা কেউ মা-বাবার কথার মাঝখানে কথা তোলে না। এই সৎশিক্ষা সবিতাই দিয়েছেন। কিন্তু কথা না বলেও সে শীতের মরা বিকেলের ফ্যাকাশে আলোয় নিজের বাবার মুখে একটা গভীর থমথমে রাগ আর বিরক্তি দেখেছিল। ঘরে যেতে যেতে বাবা বারান্দায় ভাঁজ করা বস্তায় জোরে পায়ের পাতা ঘষটাতে ঘষটাতে খুব আক্রোশে, কিন্তু চাপা গলায় বললেন—কোনও পরিবারের অতীতটা যদি ভাল না হয় তবে এ সব ঝঞ্ঝাট তো হবারই কথা। জামাইকে দুষি

কেন? আমাদেরও কি ভাল লাগে?

সত্যব্রতরও গভীর হতাশা রয়েছে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে তিনি কলকাতার আর্ট স্কুলে এসে পাশ করে শিল্পী হওয়ার চেষ্টায় লেগে যান। একটা স্কুলে ড্রইং শেখাতেন সামান্য বেতনে। বড় কষ্ট গেছে। রং তুলি ক্যানভাসের খরচ তো কম নয়। তার ওপর আছে মাউন্টিং আর একজিবিশন করার খরচ। বেশ কয়েক বছর কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন তিনি। কিন্তু শিল্পের লাইনে তিনি দাঁড়াতে পারলেন না। বহু টাকা গুনোগার দিয়ে অন্তত গোটা পাঁচেক একক প্রদর্শনী করেছিলেন, গ্রুপ একজিবিশনেও ছবি দিয়েছেন। তেমন কোনও প্রশংসা জোটেনি, ছবি বিক্রিও হয়নি তেমন। শিল্পসন্ধানী সাহেবদের পিছনে হ্যাংলার মতো ঘুরেছেন, শিল্প সমালোচকদের খাতির করে বেড়িয়েছেন। মদটদও তখন ধরেছিলেন ঠাটের জন্য । সব পণ্ডশ্রম। পরে জ্ঞানচক্ষু খুললে ভঞ্জদের স্কুলে ড্রইং মাস্টারের চাকরি নিয়ে চলে আসেন। বলতে কী, এখানেই তাঁর ভাগ্য খুলেছে। বুড়ো ভঞ্জ শীতলবাবু খুব স্নেহ করতেন। এই সব জমিজমা একরকম তাঁর দান বলেই ধরতে হবে। জলের দরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। চাষের জমিও পেলেন শস্তায় এবং ধারে। শীতলবাবু মরে গেলেও ছেলেরা সত্যব্রতকে শ্রদ্ধা করে। ভঞ্জদের বাড়ির অনেকেই তাঁর ছাত্র। সত্যব্রত এখন ড্রইং মাস্টার নন, হেডমাস্টার।

বনশ্রী বাবার দুঃখটা খুব টের পায়। বাইরে এক ধরনের অভাব ঘুচলেও এ লোকটার বুক খাঁ খাঁ করে। ব্যর্থতা কুরে কুরে খায়। তবে সত্যব্রতর আঁকার ব্যর্থতা থাকলেও নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা শিল্পবোধ আর সুরুচি ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন। ছেলে শুভশ্রীকে একটু আধটু আঁকতেও শেখান আজকাল। কিন্তু শিল্পের অভ্যাস তাঁকে যত ছেড়ে গেছে ততই তিনি নিজের ওপর আর পারিপার্শ্বিকের ওপর মনে মনে খেপে গেছেন। মুখে প্রকাশ করেন না, কিন্তু মুখের গভীর রেখা ও দৃষ্টিতে তা মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়।

দিনটা আজ ভাল গেল না। শ্যামশ্রী আর রেবন্তর দাম্পত্যজীবনের কথা শুনে, দেখে বনশ্রীর নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে একরকম ভয় হয়।

এইসব ঘটনায় মনটা উদাস হয়ে গেল। আর আজই যেন তার মন খারাপ করে দিতে মেঘ করল আকাশে। এমনিতেই শীতের বিকেল বড় বিষণ্ণ। তার ওপর মেঘ আর মন-খারাপ।

সন্ধের পর সত্যব্রত বেরোলেন। চিরশ্রী আর শুভশ্রী উঠোনের অন্যপ্রান্তে, পড়ার ঘরে। স্বভাব-গম্ভীর সবিতাশ্রী তার হরেক রকম ঘরের কাজে আনমনা। ফলে বনশ্রী একা। কিছুক্ষণ রেডিয়ো শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু মেঘলা আকাশ আর বিদ্যুৎ চমকানির জন্য রেডিয়োতে বড্ড কড় কড় আওয়াজ হতে থাকায় বন্ধ করে দিল। বই পড়তে মন বসল না। জানালায় দাঁড়িয়ে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে। কিন্তু বড্ড কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়া, তাতে বৃষ্টির মিশেল। বড় মাঠে একটা বাজ পড়ল বোধ হয়।

জানালার পাল্লা বন্ধ করতে না করতেই বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল। ছোট ছোট ঢিল পড়ার মতো শব্দ হচ্ছে দক্ষিণের ঘরের টিনের চালে। পুকুরের জলে জল পড়ার শব্দ একরকম, গাছপালায় বৃষ্টির শব্দ অন্যরকম।

মন-খারাপ নিয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে হঠাৎ বনশ্রী টের পায়, বাইরের বারান্দায় কাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

—কে?

বাইরে থেকে চেঁচিয়ে জবাব আসে—ভয় নেই, আমি কুঞ্জ, ঘরের লোক।

কুঞ্জ সকলেরই ঘরের লোক। লোকে তাকে নিজেদের ঘরের ভাবুক বা না ভাবুক কুঞ্জ নিজেকে সবার ঘরের লোক বলে মনে করে। এই ব্যাপারে তার লজ্জা সংকোচ নেই। কেউ মরলে, বিপদে পড়লে, আপনি এসে হাজির হয়। নিজেই দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে কাজ উদ্ধার করে দেয়। কুঞ্জকে লোকে ভোট হয়তো এককাট্টা হয়ে দেয় না, কারণ গাঁয়ের রাজনীতি অত সরল নয়। কিন্তু তাকে পছন্দ করে সবাই। সে কারও বাড়িতে গেলে কেউ বিরক্ত হয় না।

শ্যামশ্রীর বিয়েটা ঘটিয়েছিল কুঞ্জই। রেবন্ত তার খুব বন্ধু ছিল । এখন শোনা যায়, কুঞ্জর সঙ্গে রেবন্তর নাকি দায়ে-কুডুলে।

কুঞ্জকে কথাটা একটু বলতে হবে ভেবে বনশ্রী দরজা খুলে সপাট বাতাসের ধাক্কা খায়। দুটো দরজা ফটাং করে ছিটকে গিয়ে কাঁপতে থাকে। বাইরের গভীর দুর্যোগের চেহারাটা এতক্ষণে টের পায় বনশ্রী।

—কুঞ্জদা, ঘরে আসুন। চেঁচিয়ে বনশ্রী ডাকে।

বাইরে ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে দুটো ছায়ামূর্তিকে বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল। দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে।

ডাক শুনে কুঞ্জ উঠে এসে বলে—ভিতরে আজ আর যাব না। জলটা ধরলেই রওনা হয়ে পড়ব।

—জমে যাবেন ঠাণ্ডায়, নিউমোনিয়া হবে।

কুঞ্জ হেসে বলে—আমাদের ও সব হয় না। বারো মাস বাইরে বাইরে কাটে।

—আসুন, কথা আছে।

কুঞ্জ বলে—চা খাওয়াও যদি তবে আসি। সঙ্গে কলকাতার এক বন্ধু আছে কিন্তু।

—আহা, তাতে কী। আমরা কি পর্দানশীন? নিয়ে আসুন। ইস, বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজে গেছেন একেবারে! ডাকেননি কেন?

—গেরস্তকে বিব্রত করার দরকার কী?

—আসুন তো!

কুঞ্জ গিয়ে তার বন্ধুকে ডেকে আনে। দবজা নিজেই ঠেলে বন্ধ করে। বলে, ওঃ, যা ভেজাটাই ভিজেছি। ঘরের মধ্যে ভারী ওম তো! বুঝলি রাজু, এ বলতে গেলে আমাদের আত্মীয়ের বাড়ি।

বনশ্রী কুঞ্জর বন্ধুকে ইলেকট্রিকের আলোয় কয়েক পলক দেখে। একটু শুষ্ক চেহারা, চোখের দৃষ্টি একটু বেশি তীব্র, চোখদুটো লালও। গাল ভাঙা, লম্বাটে মুখ। তবে লোকটার মুখে চোখে একটা কঠোরতার পলেস্তারা আছে। খুব শক্ত লোক।

কুঞ্জ বলে—এ হল রাজু, আমার কলেজেব বন্ধু, দুজনে একসঙ্গে ইউনিয়ন করতাম।

গাঁ গঞ্জে পুরুষ ছেলের সঙ্গে যুবতী মেয়েদের এরকমভাবে পরিচয় করানো হয় না সাধারণত। তবে বনশ্রীদের বাড়ির নিয়ম অন্যরকম। বনশ্রী নিজেও ছেলেদের সঙ্গে কম মেশেনি। এখন অবশ্য কেমন একটু সংকোচ এসে গেছে। বনশ্রী মৃদুস্বরে বলল—বসুন, খুব ভিজে গেছেন, শুকনো কাপড় দিই কুঞ্জদা?

—আরে না। তেমন ভিজিনি। চা খাওয়াও, তাতেই গা গরম হয়ে যাবে।

রাজু বনশ্রীর দিকে একবারের বেশি তাকায়নি, কথাও বলেনি। এ ঘরে একটা পাটিতে ঢাকা চৌকি আর কয়েকটা কাঠের ভারী চেয়ার আছে। কুঞ্জ চৌকিতে বসল, রাজু চেয়ারে। কুঞ্জ নিঃসংকোচে, রাজু ভারী জড়সড় হয়ে।

কুঞ্জ বলল—কী কথা আছে বলছিলে?

—আগে চা আনি।

ছাতা মাথায় উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘর পর্যন্ত যেতেই বনশ্রী বৃষ্টি আর হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

উনুনের সামনে বসা সবিতাশ্রী ঠাণ্ডা কঠিন মুখটা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন—কে এসেছে?

—কুঞ্জদা। ওকে কি জামাইবাবুর কথাটা বলব মা?

সবিতাশ্রী সামান্য সময় নিয়ে বললেন—দরকার কী? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে বাইরের লোকের না যাওয়াই ভাল।

সবিতাশ্রীর মতই এ বাড়িতে আদেশ। এত বড় হয়েছে বনশ্রী, এখনও মার মুখের কথার বিরুদ্ধে যেতে সাহস পায় না। তারা কোনও ভাইবোনই পায় না।

সবিতাশ্রীকে কিছু বলতে হল না, বড় উনুনের ওপর রান্নার কড়াইয়ের পাশে চায়ের কেটলি বসিয়ে দিলেন। বললেন—তুমি যাও, কুসুমকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কজন?

—দুজন।

—মুড়ি দিও চায়ের সঙ্গে।

কিন্তু মুড়িটুড়ি ছুঁলও না কেউ। বনশ্রী দ্বিতীয়বার ঘরে আসার পর রাজু তার দিকে বারকয়েক তাকাল। তারপর প্রথম যে কথাটা বলল তা কিছু অদ্ভুত।

—একটু আগে আমাদের খুব ফাঁড়া গেছে। তিনটে লোক বড় মাঠে কুঞ্জকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল। হাসিমুখে ঠাণ্ডা গলায় বলল রাজু।

বনশ্রী অবাক হয়ে বলে—সেকী!

কুঞ্জ মাঝখানে পড়ে বলে—আহাঃ, ও সব কিছু নয়। রাজু, তোর আক্কেলটা কী রে?

বনশ্রী একটু বিরক্ত হয়ে বলে—লুকোচ্ছেন কেন কুঞ্জদা? এ অঞ্চলের ব্যাপার যখন আমাদেরও জানা দরকার। তিনটে লোক কারা?

—অন্ধকারে দেখেছি নাকি? হবে কেউ। কুঞ্জ উদাসী ভাব করে বলে।

কিন্তু বনশ্রীর ধারণা হয়, কুঞ্জ একেবারে না দেখেছে এমন নয়। হাতে টর্চ আছে, অন্তত এক ঝলক হলেও দেখা সম্ভব। তা ছাড়া কুঞ্জ না চেনে হেন লোক এখানে নেই। অন্ধকারেও ঠিক ঠাহর পাবে।

বনশ্রী বলে—মারতে পারেনি তা হলে?

কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে—রাজু থাকায় বেঁচে গেছি। ওকে দেখে ওরা ভড়কে যায়। তিনজনকে আশা করেনি তো। ভেবেছিল রোজকাব মতো আমি আর রবি ফিরব।

—রবি কোথায়? বনশ্রী জিজ্ঞেস করে।

—রবির ওপরই প্রথম হামলা করে। সে টর্চ ফেলে দৌড়।

—আপনার লাগে-টাগেনি তো!

—না।

চা খেতে বৃষ্টির জোর কিছু মিয়োলো। বনশ্রী দুটো লেডিজ ছাতা এনে দিয়ে বলল—আমার আর চিরুরটা দিয়ে দিচ্ছি। আর ভিজবেন না।

কুঞ্জ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—কী কথা বললে না তো!

—আজ থাক।

—থাকল না হয়। রেবন্ত আর শ্যামার কথা বলবে না তো?

বনশ্রী চুপ করে থাকে। কী বুঝল কুঞ্জ কে জানে, তবে কথা বাড়াল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—চ, রাজু।

দুজনে চলে গেলে বনশ্রী ভাবতে বসে।

৪

অন্ধকার উঠোন ছপ ছপ করছে জলে। বৃষ্টির জোর কমে গিয়ে এখন ঝিরিঝিরি পড়ছে। এই গুঁড়ো বৃষ্টি সহজে থামে না। সেই সঙ্গে পাথুরে ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইছে থেকে থেকে, দমকা দিয়ে। শবীরের হাজারটা রন্ধ্রপথ দিয়ে হাড়পাঁজরে ঢুকে কাঁপ ধরাচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাজু আর কুঞ্জ ঘরে এসে বসেছে। এ ঘরটা বাইরের দিকে, ভিতর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এটায় কুঞ্জ থাকে। ভিতর বাড়িতে তাদের সংসারটা বেশ বড়সড়। রাজু সঠিক জানে না, কুঞ্জরা ক ভাইবোন। আন্দাজ পাঁচ-ছ জন হবে। নিজের বাড়ির সঙ্গে কুঞ্জর সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। খায়, ঘুমোয় এই পর্যন্ত।

গামছায় ঘষে ঘষে পায়ের জল মুছল কুঞ্জ চৌকিতে বসে। বলল—রবির বাড়িতে একটু খোঁজ নিতে হবে।

রাজু বিরক্ত হয়ে বলে—রাত বাজে ন'টা। তার ওপব এই ওয়েদার।

—আরে দূর। এ আবার আমাদের রাত নাকি? তুই শুয়ে পড়। আমি একটু জিরিয়ে নিয়ে বেরোব। বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাব, তোকে উঠে দরজা খুলতে হবে না।

একটি অল্পবয়সি বউ একটু আগে এসে ঘুরঘুর করে গেছে এ ঘরে। বিছানাটা টানটান করল, আলনাটা খামোকা গোছাল। ঘোমটা ছিল একটু, তবু ঢলঢলে মুখখানা দেখতে পেয়েছিল রাজু। দুখানা মস্ত চোখে কেমন একরকমের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি। রাজুর মনটা বার বার রাডার যন্ত্রে কী একটা অস্ফুট তরঙ্গ টের পেয়েছিল তখন। সেই বউটাই এখন পিরিচে পান সুপারি দিয়ে গেল ঘরে। আজকাল রাজু যেন

অনেক কিছু টের পায়। অনেক অদ্ভুত গন্ধ, স্পর্শ, তরঙ্গ। যেগুলো স্বাভাবিক মানুষ পায় না।

কুঞ্জ অন্য দিকে চেয়ে ছিল। বউটা চলে যেতেই বলল—ও হল কেষ্টর বউ। বাগনানের এক মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে। বিয়েটা দিতে অনেক ঝামেলা গেছে।

—কেষ্ট কে?

কুঞ্জ উদাস স্বরে বলে—আমার মেজো ভাই। দেখেছিস, মনে নেই হয়তো। অল্প বয়সেই নেশা-ফেশা করে খুব খলিফা বনে গিয়েছিল। তার ওপর এই মেয়েটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে। উদ্যোগী হয়ে আমিই বিয়েটা দিই। কিন্তু বাড়িতে সেই থেকে মহা অশান্তি। বউটাকে দিনরাত কথা শোনাচ্ছে, উঠতে বসতে বাপান্ত করছে।

—কেন?

—এরকমই হয়। বিয়ের নামে ছেলে বেচে মোটা টাকা আসে যে। এই কেসটায় তো সেটা হয়নি। বললে বিশ্বাস করবি না, কেষ্ট পর্যন্ত সেই কারণে আমার ওপর চটা। বলে কুঞ্জ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর খুব অন্যমনস্ক ভাবে বলে—এরপর আর বিয়ের ঘটকালিটা করবই না ভাবছি। কয়েকটা অভিজ্ঞতা তো হল। সত্যবাবুর বাড়িতে যে মেয়েটাকে দেখলি তার বড় বোন শ্যামার বিয়ে আমিই দিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানেও খুব গণ্ডগোল বেঁধে গেছে। আমার কপালটাই খারাপ।

রাজুর এ সব ভ্যাজর ভ্যাজর কথা ভাল লাগছিল না। সটান বিছানায় শুয়ে গায়ে মস্ত লেপটা টেনে নিয়ে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে চোখ বুজল। বুজতেই বনশ্রীর ঢলঢলে মুখখানা দেখতে পেল চোখের সামনে। কেমন স্নিগ্ধতায় ভরে গেল ভিতরটা। বড় সুন্দর মেয়ে। ও যদি আমার বউ হত।

অবশ্য এটা কোনও নতুন ভাবনা নয়। সুন্দর মেয়ে দেখলেই মনে হয়—ও যদি আমার বউ হত।

কাঠের চেয়ারে একটু কচমচ শব্দ হয়। কুঞ্জ উঠেছে, টের পায় রাজু। ওর হচ্ছে বুনো মোষের স্বভাব। যা গোঁ ধরবে তা করবেই। রবির খোঁজ কাল সকালেও নেওয়া যেত।

চোখ বুজেই রাজু বলে—কুঞ্জ, একটা কথা বলব?

—বল।

—যারা মাঠের মধ্যে রবিকে ধরেছিল তাদের কাউকে তুই চিনিস না?

কুঞ্জ একটু সময়ের ফাঁক দিয়ে বলে—কী করে চিনব? দেখতেই পেলাম না ভাল করে।

—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, তুই চেপে যাচ্ছিস।

—না রে। তবে রবি কাউকে দেখে থাকতে পারে। ওর হাতে টর্চ ছিল। যদি দেখে থাকে তবে বিপদে পড়বে। লোকগুলো ভাল নয়।

রাজু শ্বাস ফেলে বলে—রবি দেখেছে, তুইও দেখেছিস। ভাল করে না দেখলেও আবছা দেখেছিস ঠিকই। কিন্তু পলিটিকস করে করে তোর মনটা এখন খুব প্যাঁচালো হয়ে গেছে। তাই চেপে যাচ্ছিস।

কুঞ্জ নরম স্বরে বলল—সিওর না হয়ে কোনও মত দেওয়া ঠিক নয় রে। তাই জোর দিয়ে কিছু বলতে পারব না।

—তুই যে বেরোচ্ছিস, ওরা যদি ধারে কাছে ওঁৎ পেতে থেকে থাকে, তা হলে?

—এই বৃষ্টি বাদলায় শেয়ালটাও বাইরে নেই, ওরা তো মানুষ। বলে কুঞ্জ একটু হাসে।

রাজু আর কিছু বলল না। শুয়ে থেকে চোখ বুজেই টের পায় কুঞ্জ বেরোল, বাইরে শিকল টেনে তালা দিল। কেষ্টর বউয়ের চোখে ওরকম মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি কেন তা ভাবতে থাকে রাজু। বউটা কি কেষ্টকে ভালবাসে না? অন্য কাউকে বাসে?

লেপের ওম পেয়েও ঘুমটা ঘনিয়ে এল না রাজুর। ভিতরটা বড় অস্থির। বুকের মধ্যে ধমাস ধমাস করে মিলিটারির বুটজুতোর মতো তার হৃৎপিণ্ড শব্দ করছে।

চারদিকে ঘনঘোর বৃষ্টির বেড়াজাল। অবিরল বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। মেঘ ডেকে উঠছে দূরে বাঘের মতো। হাওয়া দাপিয়ে পড়ছে গাছপালায় জানালায় দরজায়। কেমন একা করে দেয় তাকে এই দুর্যোগ। আর যখনই একা মনে হয় নিজেকে তখনই সে সেই কালো আকাশ আর নীলাভ উজ্জ্বল রথটির কথা ভাবে। মনে পড়ে মৃত্যু।

রাজু উঠে বসে। ভেজা জামাটা একটা পেরেকে ব্রাকেটে ঝুলছে। উঠে গিয়ে পকেট থেকে সিগারেট

আর দেশলাই বের করে আনে। কিন্তু সিগারেট ধরাতে পারে না। দেশলাইটা জলে ভিজে মিইয়ে গেছে। এ ঘরে লণ্ঠনের ব্যবস্থা নেই। কাপড়কলের পাওয়ার হাউস থেকে বিজলি আসে বলে তেঁতুলতলায় প্রায় সকলের ঘরেই বিজলি বাতি। সন্ধেবেলা আলো টিমিয়ে জ্বলে, রাত হলে আলোর তেজ বাড়ে।

রাজু সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই হাতে করে বসে রইল চুপচাপ। আর বসে থেকে সিগারেট ধরানোর কথা ভুলে গেল। ভিতর বাড়ি থেকে একটা চেঁচামেচির শব্দ আসছে। উল্টোপাল্টা হাওয়া আর বৃষ্টিতে প্রথমটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। তারপর চেঁচানিটা চৌদুনে উঠে গেল। সেই সঙ্গে মারের শব্দ। মেয়েগলার আর্ত চিৎকার। তারপর অনেক মেয়েপুরুষের গলায় চেঁচামেচি—ছেড়ে দে। আর মারিস না। ও নিতাই, ধর না বউটাকে! কেষ্ট, এই কেষ্ট, কী হচ্ছেটা কী? ইত্যাদি। রাজু একটু চমকে গেলেও খুব যেন অবাক হল না। তার মাথায় এখন একটা রাডার যন্ত্র কাজ করে। সে বুঝতে পারে, এরকমই হওয়ার কথা। সম্পর্কের মধ্যে মৃদু বিষ মিশেছে ওদের।

মারের এই সব শব্দ যেন রাজুর ভিতরে বোমার মতো ফেটে পড়ছিল। তার চার পাশের পৃথিবী আজকাল তাকে এইভাবেই আক্রমণ করে। মারধোর, চেঁচামেচি, গালমন্দ তাকে অসম্ভব অস্থির করে তোলে। এমনকী সে আজকাল দুর্ঘটনার খবর পর্যন্ত পড়তে পারে না, খুনখারাপির সংবাদ এড়িয়ে যায়, মৃত্যুর খবর সইতে পারে না। অথচ তার চারপাশে অবিরল এইসবই ঘটছে।

রাজু উঠে সন্তর্পণে ভিতর বাড়ির দিকের দরজাটা খুলে অল্প ফাঁক করে। হাওয়ার চাপে দরজাটা তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। পাল্লা ঠেসে ধরে রাখতে বেশ জোর খাটাতে হয় তাকে। পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখে, উঠোনের ডান পাশে কিছু তফাতে এক ঘরের বারান্দায় কিছু চাকর-বাকর শ্রেণীর লোক লণ্ঠন ঘিরে উবু হয়ে বসে খাচ্ছে। সেই ঘরের বারান্দায় কিছু মেয়েপুরুষ দাঁড়িয়ে দরজা ধাকাচ্ছে। একজন মোটা লোক চেঁচিয়ে বলে—মেরে ফেলবি নাকি রে হারামজাদা? ফাঁসিতে ঝুলবি যে! গলাটা ছেড়ে দে বলছি এখনও।

হাওয়া ভেদ করেও বন্ধ ঘর থেকে একটি মেয়ের অবরুদ্ধ গলার কোঁকানি আসছিল। হাঁফ ধরা, দম বন্ধ আর সাঙ্ঘাতিক শ্বাসকষ্ট থেকে মাঝে মাঝে ছাড়া পেয়ে গলার স্বরটা গোঙায়। একজন পুরুষের গলা প্রচণ্ড চাপা আক্রোশে বলছে—বল ঢ্যামনা! বাঁচতে চাস তো স্বীকার কর।

বারান্দার লোকগুলো উবু হয়ে বসে নির্বিকারে খেতেই থাকে। তাদের মাঝখানে লণ্ঠনটার আলো দাপিয়ে উঠে নিভে যেতে চায়। একজন একটা র‍্যাপার দিয়ে লণ্ঠনকে হাওয়া থেকে আড়াল করল। মস্ত একটা ছায়া পড়ল উঠোনে। হয়তো বারান্দার বিজলি আলো ফিউজ হয়ে গেছে, কিংবা হয়তো চাকর-বাকর খাচ্ছে বলে বিজলি আলো জ্বালানো হয়নি। কে জানে রহস্য?

আঁচলে মাথা ঢেকে একটা মেয়ে উঠোন থেকে এ বারান্দায় উঠে এসেছে। ও বাবান্দার লণ্ঠনের আলো আড়াল করে সে সামনে এসে দাঁড়াতেই রাজু চমকে ওঠে এবং মেয়েটার মুখোমুখি পড়ে যায়।

মেয়েটা দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে চাপা তীব্র স্বরে ডাকে—বড়দা!

রাজু দরজা ছেড়ে দিতেই পাল্লা দুটো ছিটকে খোলে। মেয়েটা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রাজুকে দেখেই একটু আড়ালে সরে বলে—বড়দা নেই?

—একটু বেরিয়েছে।

রাজু মেয়েটাকে চেনে। কুঞ্জর তিনটে আইবুড়ো বোনের একটি। কখনও কথা-টথা বলেনি আগে।

মেয়েটা বিপন্ন গলায় বলে—কোথায় গেছে বলে যায়নি?

—রবির বাড়ি। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে রাজু বলেই ফেলল—ও ঘরে কী হচ্ছে বলো তো?

মেয়েটির বয়স বেশি নয়, বছর পনেরো-ষোলো হবে। দেখতে কালো, রোগা, দাঁত উঁচু। আড়াল থেকেই জবাব দেয়—মেজদা খেপে গেছে।

—কেন?

মেয়েটা জবাব দেয় না। রাজু বিরক্ত হয়ে একটু ধমকের স্বরে বলে—তুমি ভিতরে এসো তো! ব্যাপারটা খুলে বলো।

মেয়েটা বোধ হয় ঘাবড়ে গিয়েই ঘরে এসে দাঁড়ায়। গায়ে আধভেজা শাড়ি আর খদ্দরের নকশা-চাদর। শীতে জড়সড়। মাথা সামান্য নিচু করে ভয়ের গলায় বলে—দোষটা বউদিরই। বাপের বাড়িতে খবর দিয়েছিল নিয়ে যাওয়ার জন্য। আজ বিকেলে ভাই এসেছিল নিয়ে যেতে। এ বাড়ির কাউকে আগে জানায়নি পর্যন্ত। খবর পেয়ে মেজদা রেগে গেছে।

রাজু ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে রাগে গরম হচ্ছিল। কঠিন গলায় বলে—কেষ্ট কি মদ খেয়ে এসেছে?

—সে তো রোজ খেয়ে আসে।

—বউটাকে তো খুনও করে ফেলতে পারে। তোমরা কী করছ?

—সেই জন্যই তো বড়দাকে খুঁজছি। কেউ ঘরে ঢুকতে পারছে না যে।

—রোজ মারে?

মেয়েটা একটু থতমতভাবে চেয়ে মাথাটা এক ধারে নেড়ে বলে—মারে, তবে রোজ নয়। আজ বড্ড খেপে গেছে। কী যে করছে, মাথার ঠিক নেই।

মাথার ঠিক নেই।

মাথার ঠিক নেই রাজুরও। মাথার মধ্যে একটা আগুনের গোলা ঘুরছে। কথার ওজন না রেখে সে গাঁক করে উঠে বলে—কেষ্টকে গিয়ে বলো, এক্ষুনি যদি বাঁদরামি বন্ধ না করে তবে আমি ওর প্রত্যেকটা দাঁত ভেঙে দেব। তারপর পুলিশে চালান করব। যাও বলো গিয়ে। বোলো, আমার নাম রাজীব ব্যানার্জি।

মেয়েটা কোনও জবাব দিল না। কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বুঝতে কষ্ট হয় না যে এ সব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু রাজুর ভিতর থেকে একটা পুরনো রাজু ফুঁসছে, আঁচড়ে কামড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভিতরের সেই ছটফটানিতে সে বসে বসে কাঁপে। তারপর শান্ত অবসাদ নিয়ে বসে থাকে। ও ঘরের সামনের বারান্দায় কেউ নেই এখন। অন্ধকার দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর একটু চিকন রেখা দেখা যাচ্ছে মাত্র।

ঠাণ্ডায় কান কনকন করছিল রাজুর। ভেজা বাতাসে ঘরটা স্যাঁতস্যাঁত করছে। ঘরের বিজলি আলো এখন টিমটিম করে জ্বলছে। খোলা দরজার সামনে বসে সে কেষ্টব ঘবের দিকে ভয়ঙ্কর চোখে চেয়ে ছিল।

হুড়কো খোলার শব্দ হল। তারপর ও ঘরেব দবজা খুলে একটা লোক বেরিয়ে এল। কেষ্টই হবে। বারান্দা থেকেই খুব মেজাজি গলায় ডাকল—টুসি! এই টুসি!

কোত্থেকে 'যাই মেজদা' সাড়া দিল টুসি। কেষ্ট ফের ঘরে ঢুকে পড়ে। একটু বাদে রাজু দেখে সেই কালো রোগা কিশোরী মেয়েটা দৌড় পায়ে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

একটু বাদে দরজাটা খুলে টুসি কেষ্টর বউকে ধরে ধরে বারান্দায় আনে। বউটা টুসির কাঁধে মাথা রেখে এলিয়ে রয়েছে। বারান্দার ধারে টুসি তাকে উবু করে বসায়। একটা ঘটি থেকে জল দেয় চোখে মুখে। ঘরের ভিতরে আলোয় সিগারেটের ধোঁয়া উড়ছে দেখতে পায় রাজু।

হঠাৎ তার দমকা রাগটা আবার ঘূর্ণি ঝড়ের মতো উঠে আসে ভিতর তোলপাড় করে। পুরনো রাজু তার পাঁজরায় ধাক্কা মেরে বলে—ওঠো। ওই শুয়োরের বাচ্চার দাঁত কটা ভেঙে দাও।

এই রকমই রাগ ছিল রাজুর। গোখরোর মতো ছোবল তুলত সে। রাজু কত লোককে যে মেরেছে তার হিসেব নেই। মার খেয়েছেও বিস্তর। কিন্তু যেখানে প্রতিবাদ করা উচিত সেখানে কোনওদিন সে চুপ করে থাকেনি। একশো জন বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও নয়।

কিন্তু আজকাল এ কেমন ধারা হয়ে গেছে রাজু? একটা স্বপ্ন কি মানুষকে শেষ করে দিতে পারে এত নিঃশেষে? বসে বসেই নিজের রাগের হলকায় পুড়ে যাচ্ছে সে, কিন্তু কিছুতেই উঠোনের দূরত্বটুকু পেরিয়ে গিয়ে ওই হারামজাদার চুলের মুঠি ধরে বের করে আনতে পারছে না। একদিকে ভিতরে যেমন রাগ ফোঁস ফোঁস করছে, অন্যদিকে তেমনি বুকের মধ্যে এক ভয়ের পাতাল কুয়ো।

বউটি মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তেমনি টুসির ওপর ভর রেখে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

রাজু উঠে এসে বিছানায় আধশোয়া হয়ে গলা পর্যন্ত লেপ টেনে নেয়। চোখ বুজে ঠাণ্ডার ছোবল

খেতে থাকে চুপ করে।

হঠাৎ চোখ চেয়েই রাজু কুঞ্জর বোনকে দেখতে পায়। একটা পেতলের জলের জগ আর গেলাস রাখছে টেবিলের ওপর। রাজুকে তাকাতে দেখে কুণ্ঠিত স্বরে বলল—আর কিছু লাগবে আপনার?

রাজু উঠে বসে বলে—একটা দেশলাই দিতে পার?

—দিচ্ছি। বলে মেয়েটা চলে যায়। রাজু টের পায়, মেয়েটা এ ঘরের বারান্দার কোনা থেকে কেষ্টর ঘরের বারান্দার কোনায় লাফিয়ে চলে গেল। দরজায় শেকল নেড়ে কেষ্টর কাছে দেশলাই চাইল।

একটু বাদে দেশলাই হাতে এসে বলে—এই যে।

মেয়েটার সামনে রাজুর লজ্জা করছে। হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা নিয়ে বলে—আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম তখন। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলাটা কে সহ্য করতে পারে বলো!

টুসি রাজুর দিকে অকপটে চেয়ে থাকে। চোখের দৃষ্টি খুব স্বাভাবিক নয়। কেমন যেন গভীর আতঙ্কের ছাপ আছে। একটু চেয়ে থেকে বলল—বউদির কিন্তু খুব লেগেছে। কেমন এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে বার বার। কথা বলতে পারছে না। চোখ উল্টে আছে। দাঁত লেগে যাচ্ছে। আর...

বলে টুসি দ্বিধা করে একটু।

রাজুর শরীরে লোম দাঁড়িয়ে যেতে থাকে। ভয়ে, রাগে। বলে—আর কী?

—খুব স্রাব হচ্ছে। পোয়াতি ছিল। কী জানি কী হবে!

—ডাক্তার নেই আশেপাশে?

মেয়েটা ভয়-খাওয়া গলায় বলে—রাধু যাচ্ছিল ডাকতে। মেজদা তাকে বলেছে ডাক্তার ডাকলে খুন করে ফেলবে। বড়দা কোথায় যে গেল! বড়দা ছাড়া এখন কেউ কিছু করতে পারবে না।

এই বলতে বলতে টুসি চোখের জল ফস করে আঁচলে চেপে ধরে।

আজকাল একটা অক্ষম মন নিয়ে চলে রাজু। বর্ষার জলকাদায় খাপুব খুপুর করে যেমন কষ্টে চলতে হয়, রাজুর বেঁচে থাকা এবং কাজ কর্তব্য করাটাও তেমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব কাজেই তার ভয়, সব সিদ্ধান্তেই তার নানারকম দ্বিধা।

তবু কষ্টে সে নিজের মনটাকে ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়ে। বলে—একটা ছাতা দাও, আর রাধুকে ডেকে দাও।

ধরা গলায় টুসি বলে—আপনি যাবেন?

—যেতেই হবে। নইলে বউটা মরে যাবে যে!

টুসি একটু ভরসা পেয়ে বলে—ঝড়-বাদলায় আপনার যেয়ে দরকার নেই। রাধু ডেকে আনতে পারবে। আপনি শুধু মেজদাকে একটু সামলাবেন। আপনি বড়দার বন্ধু তো, তার ওপর কলকাতার লোক। আপনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কিছু বলতে সাহস পাবে না।

রেগে গেলে রাজু সেই পুরনো রাজু। ভয়ডর থাকে না, দ্বিধা থাকে না।

রাজু উঠে দাঁড়িয়ে বলে—রাধুকে দৌড়ে যেতে বলো। আমি কেষ্টর ঘরে যাচ্ছি। দড়িতে কুঞ্জর একটা খদ্দরের চাদর ঝুলছিল। সেটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে উঠোন পেরিয়ে গিয়ে কেষ্টর দরজায় ধাক্কা মেরে বলল—এই কেষ্ট। দরজাটা খোলো তো।

কেষ্ট দরজা খুলে বেকুবের মতো চেয়ে থাকে। বেশ আঁটসাট গড়নের লম্বাটে চেহারা। ভুরভুর করে কাঁচা দেশি মদের গন্ধ ছাড়ছে। গায়ে এই শীতেও কেবল একটা হাতওলা গেঞ্জি।

রাজু ধমক দিয়ে বলে—কী হয়েছে?

অবাক কেষ্ট গলা ঝেড়ে বলে—সাবির শরীরটা খারাপ হয়েছে। রক্ত যাচ্ছে।

ওকে এক্ষুনি একটা চড় কষাতে ইচ্ছে করে রাজুর। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে, কেষ্ট তাকে দেখে ভয় পেয়েছে। এ ব্যাপারটা বেশ ভাল লাগে রাজুর। তাকে যে কেউ ভয় পাচ্ছে এটা ভেবে তার আত্মবিশ্বাস এসে যায়। গম্ভীর গলায় সে বলে—তার জন্য কী ব্যবস্থা করেছ এতক্ষণ? কাউকে ডাকনি কেন?

কেষ্ট সামনের বড় বড় শুকনো দাঁতগুলোয় জিভ বুলিয়ে বলে—কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি একবার ভিতরে এসে দেখুন না, খুব সিরিয়াস কেস কি না।

ভিতর থেকে গভীর যন্ত্রণার একটা গোঙানির শব্দ হয় এ সময়ে। রাজুর শরীর কেঁপে ওঠে। একটু আগেই বউটা পান দিয়ে এল ঘরে। আর এখন মরতে চলেছে বুঝি। সে এ সব যন্ত্রণার দৃশ্য সহ্য করতে পারে না আজকাল। রক্তের রং দেখলে তার হাত পা মাথা অবশ হয়ে যায়। সে মাথা নেড়ে বলে—না, না। তুমি বরং লোকজন ডেকে আনো।

কেষ্টর রগচটা ভাব মরে গিয়ে এখন সত্যিকারের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। মদের নেশা কেটে গেছে একেবারে। বলল—যাচ্ছি। আপনি একটু দাঁড়ান এখানে, টুসি এক্ষুনি আসবে।

এই বলে কেষ্ট উঠোনে নেমে অন্ধকারে কোথায় তাড়াতাড়ি নিমেষে মিলিয়ে যায়। ওর ভাবসাব রাজুর ভাল লাগল না। তার মনে হল, কেষ্ট এই যে গেল, আর সহজে ফিরবে না। কেষ্টর যাওয়ার ভঙ্গি দেখেই রাজুর ভিতরের রাডার যন্ত্রে ব্যাপারটা ধরতে পারে রাজু। কেষ্ট বোধ হয় ধরেই নিয়েছে যে সাবি বাঁচবে না। থানাপুলিশ হবে। তাই পিটটান দিল।

৫

হাউর বাতাসে ছাতার শিক ছটকে উল্টে গেছে, হাঁটুভর কাদা আর ঝড়-বাদলা ঠেলে শেয়ালের মতো ভিজতে ভিজতে রবির বাড়ি পৌঁছয় কুঞ্জ। ভেজা শরীরে বাতাস লেগে শীতে মুরগির ছানার মতো কাঁপছে।

ডাকাডাকিতে খোড়ো চালের মেটে ঘর থেকে জানালার ঝাঁপ ঠেলে সতর্ক চোখে কুঞ্জকে আগে দেখে নেয় রবি। দরজা খুলতেই কুঞ্জ দেখল রবির হাতে একটা মস্ত দা। কুঞ্জ জামাকাপড়ের জল যথাসাধ্য নিংড়ে ঘরে ঢুকতেই রবি দড়াম করে দোর দিয়ে বাঠাম লাগাল। শুকনো মুখে আর চোখের চাউনিতে কুঞ্জকে ভাল করে আর একবার দেখে নিয়ে দা'টা কুলুঙ্গিতে খাড়া করে রেখে এসে বলল—ভাবলাম বুঝি তোমার পেটি আর গাদা আলাদা করেছে শালারা।

শীতে সিঁটিয়ে গেছে কুঞ্জ। দাঁতে দাঁতে ঠকাঠক শব্দ। চাদর নিংড়ে মাথা গা মুছতে মুছতে বলে—চিনতে পেরেছিস?

রবি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—টের পেলে খুন করবে। তুমি বলেই বলছি। শালা লাফ দিয়ে সামনে পড়ে আমার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নামিয়ে ফেলল, হাতে অ্যাই বড় গজ। মুখটা কম্ফর্টারে ঢাকা। খুব একটা ঘড়ঘড়ে শ্বাসের শব্দ হচ্ছিল। আমি তো সব সময়ে তোমার পেছু পেছু যাই, তাই মনে হয় আমাকে তুমি ভেবে ভুল করেছিল। গজ যেই তুলেছে, অমনি পিছন থেকে আর এক শালা বলল—ওটা কুঞ্জ নয়, রবি। দুটো গাঁট্টা দিয়ে ছেড়ে দে, খুব পালাবে। তখন ছাড়ল। পেটে দুটো হাটুর গুঁতো দিয়ে বলল—রা করলে খুন হয়ে যাবি। ছাড়া পেয়ে পোঁ-পোঁ দৌড়ে পালিয়ে এসেছি। পালাতে পালাতেই ঠিক পেলুম, এ হল পটল। পিছনের দুজন কে ঠাহর পাইনি। একজন লম্বা।

কুঞ্জর গা থেকে জল গড়িয়ে ঘরে থকথকে কাদা হয়ে গেল। একদিকে বাঁশের মাচানে চ্যাটাই আর গুচ্ছের ময়লা কাঁথার বিছানা। অন্য ধারে একটা মস্ত ছাগল চটের জামা পরে একরাশ নাদির মধ্যে বসে এই রাতেও কী চিবোচ্ছে। ঘরময় ভরভরে ছাগলের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। কুঞ্জ রবির দিকে স্থির চোখে চেয়ে সবটা শুনে মৃদু স্বরে বলল—যা দেখেছিস দেখেছিস। ক্লাবে কিছু জানাসনি তো!

—যখন দৌড়ুচ্ছি তখন ক্লাবের সামনে একজন জিজ্ঞেস করছিল কী হয়েছে, কেন দৌড়ুচ্ছি। কিন্তু তখন এত হাঁফ ধরেছে যে মুখে কথা এলই না। তোমাকে কী করল?

—কী করবে! কিছু করেনি।

—তুমি মরে ভূত হয়ে আসনি তো কুঞ্জদা! ইস, ভিজে ঢোল হয়েছ। আমার ক্যাঁথা কম্বল গায়ে দিয়ে বোসো। ছাতাটা দাও, সুতো দিয়ে শিকগুলো বেঁধে দিই।

রবির ঘরে ছাগলের গন্ধের মধ্যে ময়লা কাঁথা আর তুলোর কম্বল গায়ে চাপিয়ে অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থাকে কুঞ্জ। বস্তা থেকে সুতলি খুলে রবি খুব যত্নে ছাতার ডাঁটির সঙ্গে শিকের ডগাগুলো বেঁধে দিচ্ছিল, যাতে বাতাসে ফের উল্টে না যায়। বলল—ক্লাবে খবর দেবে না? তোমার গায়ে ফের হাত পড়েছে শুনলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে, রক্তগঙ্গা বইবে।

কুঞ্জ জবাব দিল না। চোখ বুজে সে একটা লম্বা লোকের কথা ভাবছিল। রবির টর্চটা কেতরে পড়েছিল মাঠে। আলোটা টেরছা হয়ে ওপর দিকে উঠেছে। সেই আলোতে ক্ষণেকের জন্য একটা ফর্সা মুখ ঝলসে উঠেছিল। রেবন্ত।

কুঞ্জ ছাতাটা নিয়ে উঠে পড়ে বলল—কাউকে কিছু বলিস না। বিপদে পড়ে যাবি। যা করার আমিই করব।

রবি অবাক হয়ে বলল—তুমি একা কী করবে? ও হল খুনে পটলা। ভাল চাও তো ক্লাবে খবর দাও।

সুস্থির চোখে রবির দিকে চেয়ে কুঞ্জ বলে—কাউকে না। কাকপক্ষীতেও জানবে না। বুঝেছিস?

রবি তবু মাথা নেড়ে বলে—পাবলিসিটি হবে না বলছ? তুমিই তো বলো, এরকম সব হামলা-টামলা হলে লোকের পপুলারিটি বাড়ে, ভোট পাওয়া যায়! এমন একখানা জ্বলজ্যান্ত কাণ্ড চেপে যাবে?

কুঞ্জর এত দুঃখেও হাসি হাসে। রবি যে রবি, সেও আজকাল পলিটিক্সের শেয়াল হয়ে উঠল। কথাটা মিথ্যেও নয়। যেবার বুকে সড়কি খেল সেবার হু-হু করে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। তখন ভোট হলে কুঞ্জ জিতে যেত। কিন্তু কুঞ্জ জানে, এটা ভোটের মামলা নয়। সে যদি মরে তা হলে এখন হয়তো এ চত্বরে অনেকেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। রবির দিকে চেয়ে সে ঠাণ্ডা গলায় বলে—অনেক ব্যাপার আছে রে। তুই সব বুঝবি না।

দরজা খুলে দিয়ে রবি বলল—সাবধানে যেয়ো। তারপর একটু লজ্জার স্বরে বলে—বুঝলে কুঞ্জদা, সবসময়ে মনে হয় আমি তোমার জন্য জান দিতে পারি, কিন্তু আজ বিপদে পড়ে প্রাণটা কেন যেন পালাই-পালাই করে উঠেছিল। তুমি হয়তো ভাবছ, রবিটা নেমকহারাম। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি...

আবার জলঝড় ঝাঁপিড়ে পড়ে কুঞ্জর ওপর। তোল্লাই বাতাস এসে হ্যাঁচকা টান মারে খোলা ছাতায়। খুব ভাল করে শিক বেঁধে দিয়েছে রবি। সহজে ওলটাবে না। বাতাসের মুখে ছররার মতো ছিটকে আসছে জলের ফোঁটা। কুঞ্জ প্রাণপণে ছাতার আড়াল রাখতে চেষ্টা করে। কাদায় পা রাখা দায়, একবার পা ফেললে দু-তিন কিলো কাদা পায়ে আটকে উঠে আসে। ভুসভাস নরম মাটিতে গেঁথে যাচ্ছে পা। বাতাস টালাচ্ছে। শীতের কম্প উঠে পেট বুক কাঁপিয়ে তুলছে। কুঞ্জ কোনওক্রমে শুধু এগিয়ে যাওয়াটা বজায় রাখতে থাকে। আর মনের মধ্যে বার বার বীজমন্ত্রের মতো পপুলারিটি শব্দটা এসে হানা দেয়।

এর আগেও কুঞ্জর ওপর বহু হামলা হয়ে গেছে। দুবার মরতে মরতে বেঁচেছে। কিন্তু তাতে দমে যায়নি কুঞ্জ। তখন শত্রুপক্ষ তাকে মর্যাদা দিতে, প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবত, যত জখম হয়েছে তত লোকের কাছে সে হয়ে উঠেছে গুরুতর মানুষ। লোকে তো আর যাকে তাকে খুন করতে চায় না। কুঞ্জ খুব বিচক্ষণের মতোই সেইসব হামলার ঘটনাকে ভাঙিয়ে নিয়েছিল রাজনীতির খুচরো লোভে। কিন্তু সে জানে, আজকের মামলা তা নয়। ধারে কাছে কোনও নির্বাচন নেই, কোনও তেমন রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেনি। আজ তার কপালে ছিল উটকো মৃত্যু। এই মৃত্যু তাকে মহৎ করত না। লোকের গোপন বেনামি জমি ধরে দেওয়ার বিপজ্জনক কাজে নেমেই সে টের পেয়েছিল, এ হল জাতসাপের লেজ দিয়ে কান চুলকোনো। কিংবা যখন হাবুর ঝোপড়ায় মদো মাতাল বদমাশদের আড্ডা ভাঙতে গিয়েছিল তখনই সে কি জেনেশুনে বিষ করেনি পান? কাজেই মরার ব্যাপারে তার তেমন চিন্তা নেই। কিন্তু বার বার আজ পপুলারিটি কথাটা তার বুকে হাতুড়ি মারে। কেন যেন মনে হচ্ছে, তার পপুলারিটির শক্ত ডাঙা জমি বড় ক্ষয় হয়ে গেছে। টর্চের আলোয় রেবন্তর মুখ-দেখে চমকে যায়। কিন্তু রেবন্ত তাকে খুন করতে চায় বলে সে তত চমকায়নি। তাকে খুন করতে চাইতেও পারে রেবন্ত। তার কারণ আছে। কিন্তু খুন করলেও রেবন্ত তাকে ঘেন্না করবে না, কুঞ্জর এমন একটা ধারণা ছিল, তাই রেবন্তকে দেখে সে যত না চমকেছে তার চেয়ে ঢের বেশি অবাক হয়েছে রেবন্তর মুখে একটা খাঁটি নির্ভেজাল তীব্র ঘেন্নার ভাব দেখে।

পিচ রাস্তা পেয়ে কুঞ্জ একটু হাঁফ ছাড়ল। তেঁতুলতলা যুব সঙ্ঘের পাকা বারান্দায় উঠে ছাতাটা মুড়ে নিয়ে সে দরজায় ধাক্কা দেয়। এত রাতেও কয়েকজন বসে তাস খেলছে। কুঞ্জকে দেখে হাঁ করে চেয়ে থাকে সবাই।

গোটা তেঁতুলতলাই কুঞ্জর মামাবাড়ি। জ্ঞাতিগুষ্টি মিলে তারা সংখ্যায় বড় কম নয়। তাস খেলুড়েদের মধ্যেও কুঞ্জর এক মামা, দুই মাসতুতো ভাই রয়েছে।

সন্তুমামা বলল—এই দুর্যোগে ব্যাপার কী রে? কোনও হাঙ্গামা নাকি?
কুঞ্জ মাথা নাড়ল।
—তা হলে?
তা হলে কী তা কুঞ্জও তো জানে না। সে শুধু আজ সন্দেহভরে জানতে চায় তার বিশ্বস্ত ঘাঁটিগুলো এখনও তার দখলে, আছে কি না। বোঝা বড় শক্ত। এই ক্লাবখানা তার নিজের হাতে গড়া। রাজ্যের ছেলে-ছোকরা জুটিয়ে জবরদস্ত ক্লাবখানা জমিয়ে দিয়েছিল কুঞ্জ। পিছনের ঘরে লাঠি, সড়কি, দু-একখানা খাঁটি তরোয়াল এখনও মজুত। কুঞ্জর বিপদ শুনলে এখনও হয়তো গোটা ক্লাব ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। গতবার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে কুঞ্জ তার এক মাসতুতো দাদার কাছে হারতে হারতে কোনওক্রমে দশ ভোটে জিতেছিল। এই কথাটা এখন বড় খোঁচাচ্ছে তাকে। পায়ের নীচে মাটি এখনও আছে বটে, কিন্তু চোখের আড়ালে পাতালের অন্ধ গহ্বর নিঃশব্দে মাটি খসিয়ে নিচ্ছে না তো? কুঞ্জর বিপদ শুনলে এক দল রুখে দাঁড়াবে ঠিক, কুঞ্জ নির্বাচনে দাঁড়ালে এক দঙ্গল তার হয়ে খাটবে ঠিক, তবু আর একটা দল নিস্পৃহ থেকেই যাবে।
মাসতুতো ভাইদের মধ্যে একজন নলিনী। সে বলল—খুব ভিজেছ কুঞ্জদা, তোমার না বুকের অসুখ! বইয়ের আলমারির ওপর আমার বর্ষাতিটা মেলে দেওয়া আছে, নিয়ে যাও।
কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে—না রে, কিছু হবে না।
নলিনী আর কিছু বলে না। তাস বাটা হতে থাকে। বহুকাল বাদে কুঞ্জর যেন একটু অভিমান হয়। বর্ষাতিটা নিলুম না, তা আর একটু সাধতে পারলি না নলিনী?
কুঞ্জ বেরিয়ে আসে। তার আর একটা ঘাঁটি ছিল ফুটুনিমামার দোকান। জেলেপাড়ার ষাট সত্তর ঘর রায়ত ফুটুনিমামার ভারী বশংবদ। একসময়ে পড়াশোনা ছেড়ে রাজনীতিতে নামার দরুন কুঞ্জকে তার বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়েছিল। তখন ফুটুনিমামা কুঞ্জকে আশ্রয় দেয়। বাড়ি গিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বলে এসেছিল, আপনি না রাখেন ত্যাজ্যপুত্র করুন, কুঞ্জকে আমি পুষ্যি নেব। নির্বাচনে ফুটুনিমামা তার রায়তদের কুঞ্জর পক্ষে কাজে নামিয়ে দিয়েছিল।
মোড়ের মাথায় ফুটুনিমামার দোকানে ঝাঁপ ঠেলে বহুদিন বাদে কুঞ্জ হানা দিল। মামা উরুর ওপর লম্বা খাতা রেখে হিসেব করছে। খোল, ভুসি, হাঁসমুরগির খাবার আর মশলাপাতির ঝাঁঝালো গন্ধটা বহুকাল ভুলে গিয়েছিল কুঞ্জ। আজকাল আসা হয় না। গন্ধটা পেয়ে একটা হারানো বয়স কুঞ্জর কাছে ফিরে এল বুঝি।
মামা মুখ তুলে দেখে বলল—কী খবর রে? বলেই ফের হিসেবে ডুব দেয়।
কুঞ্জ ঠাণ্ডা হচ্ছে। খুব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। পাথর হয়ে যাচ্ছে। মামা আবার মুখ তুলে বলে—দুর্যোগে বেরিয়েছিস, ঠাণ্ডা লাগাবি যে! তারপর খবর-টবর কী?
কুঞ্জ বলে—ভাল।
—ভাল বলছিস? ফুটুনিমামা তাকিয়ে একটু হাসে। কিন্তু তাকানোর মধ্যে দৃষ্টি নেই, হাসির মধ্যে অনেক ভেজাল। একসময়ে খুব বাবুগিরি করত বলে নামই হয়ে গিয়েছিল ফুটুনি। এখন বাবুগিরি নেই। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে, কাছা খুলে রোজগার করছে মামা। কোথায় যায় মানুষের দিন?
ফুটুনিমামা ভ্রূ কুঁচকে বোধ হয় একটা উড়ন্ত মশার দিকে চেয়ে থেকে বলে—তা হলে খবর-টবর সব ভাল?
ঝুরঝুরে মাটির ওপর দিয়ে কুঞ্জ হাঁটছে। যে কোনও একটা পদক্ষেপেই সে দেখতে পাবে সামনেই ধস। তবু কতখানি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা হিসেব নিকেশ থাকা ভাল।
পপুলারিটি শব্দটা রবারের বলের মতো মাথার মধ্যে ধাপাচ্ছে কে!
অন্য দিন সময় হয় না কুঞ্জর। এই দুর্যোগে আজ হঠাৎ সময় হল। বহুদিন বাদে ঝড়বাদল ঠেলে সে মেজদাদুর বাড়ির বারান্দায় উঠে এল। মেজদাদু হলেন এখন ভঞ্জদের সবচেয়ে বড় শরিক। কয়েক কোটি টাকা বোধ হয় তাঁর রোলিং ক্যাপিটাল। দেখে কিচ্ছু বোঝা যায় না। সাদাসিধে, গেঁয়ো। আশির কাছাকাছি বয়স। মস্ত ঘরে কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। গায়ে তুষের চাদর, পায়ে মোজা, মাথায় বাঁদুরে টুপি। একদৃষ্টে চেয়ে দেখলেন। বললেন—এত রাতে এলে? খুব দরকার নাকি? কারও

কিছু হয়নি তো?

—না।

মেজদাদু শ্বাস ছেড়ে বললেন—সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি। আমি মরলে তোমাদের অশৌচও হয় না জানি। মাতুল বংশ, তায় জ্ঞাতি। কিন্তু আমার ভাবনা তেমনধারা নয়। আমি ভাবি, তেঁতুলতলায় সব আমার মানুষ। কখন কে মরে, কে পড়ে। ভারী দুশ্চিন্তা।

—অনেকদিন দেখা করিনি, তাই এলাম।

কথাটা যেন বিশ্বাস হল না মেজদাদুর। সন্দেহের চোখে কুঞ্জর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কারও কোনও বিপদ হয়নি, ঠিক বলছ? ভয়ের কিছু নেই তো!

—না মেজদাদু।

—তুমি ভাল আছ তো? বাড়ির সবাই? তোমার মাকে বহুকাল দেখি না। আজকাল সবাইকে দেখতে ইচ্ছে করে।

—বলব।

মেজদাদু খানিক চুপ থেকে বলেন—বুদ্ধি পরামর্শ নিতে আমার কাছে কোনওদিন এলে না কুঞ্জ! এলে কি আমি তোমাকে কুপরামর্শ দিতুম! আমি তোমার কতখানি ভাল চেয়েছিলাম তা জানলে না।

কুঞ্জ খুব নিবিড় চোখে মেজদাদুকে দেখছিল। আগে দেখা হলে মেজদাদুর মুখে যে একটা খুশির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ত তা আজ আর কই? সে বুঝতে পারে, সুর কেটে যাচ্ছে। কোথায় লয়ে-তালে গোলমাল।

কুঞ্জকে জেতানোর জন্য সেবার মেজদাদু নিজের নমিনেশশন উইথড্র করে নিয়ে বলেছিলেন—লোকে কুঞ্জকেই চায়। আমাদের খামোখা দাঁড়ানো। কথাটা বলেছিলেন হাসিমুখে, আত্মগৌরবের সঙ্গে। সেবার সড়কি খেয়ে কুঞ্জর জখমটা দাঁড়িয়েছিল মারাত্মক। ডাক্তার কলকাতায় পাঠাতে চেয়েছিল। মেজদাদু রুখে দাঁড়িয়ে বললেন—কলকাতার হাসপাতাল! কেন, কুঞ্জ কি ভাগাড়ের মড়া। কলকাতার হাসপাতালে আজকাল মানুষের চিকিৎসা হয় নাকি? ভঞ্জদের লোকবল, অর্থবল সবটুকু ঢেলে দিয়ে মেজদাদু কুঞ্জকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন। আর তার জন্যই তেঁতুলতলার ছোট হাসপাতালে হাজারো যন্ত্রপাতি আমদানি হল, ভাল একজন ডাক্তার এল চাকরি পেয়ে, এল এক্স-রে ইউনিট। কুঞ্জ যে খুব একটা কৃতজ্ঞ বোধ করেছে, তা নয়। সে তখন ভাবত, তাকে বাঁচানোর জন্য লোকে তো এ সব করবেই। সে যে নেতা।

আজ মেজদাদুর সামনে তাই একটু লজ্জা বোধ করে কুঞ্জ। মেজদাদুর জন্য তার যা করা উচিত ছিল তা তো করা হয়নি। অকৃতজ্ঞতার পাপ তাকে কিছুটা ছুঁয়ে আছে আজও।

কুঞ্জ মাথা নিচু করে বলে—আপনি আর আগের মতো ডাক খোঁজ করেন না তো দাদু! কোনও অপরাধ করিনি তো?

ভঞ্জবাবু ভারী অবাক হয়ে শশব্যস্তে বললেন—এ সব কী বলছ? অপরাধ আবার কী? বুড়ো বয়সে বাইরের ব্যাপারে বেশি যাই না। তুমিও ব্যস্ত মানুষ। তবে খোঁজখবর সবই পাই। তোমার হচ্ছে পাবলিক লাইফ, আমরা তো নিজের ধান্দা নিয়ে পড়ে আছি। এই বলে মেজদাদু খানিক কী যেন ভেবে আস্তে করে বলেন—তবে তোমার চেহারায় আগে যেমন একটা তেজ দেখতুম এখন আর সেটা দেখি না।

—আমি কি কোনও ভুল করছি? কোনও অন্যায় পথে চলছি? কুঞ্জ গলায় চাপা ব্যাকুলতা ফোটে। টর্চের আলোয় দেখা রেবন্তর মুখটায় বড় ঘেন্না ফুটে ছিল যে! ঠোঁট বাঁকানো, চোখে আগুন, দাঁতে দাঁতে বজ্র-আঁটুনি। হিংসে নয়, সংকোচ বা দ্বিধাও নেই। যেন মাজরা-পোকা নিকেশ করতে এসেছিল।

মেজদাদু এবার একটু ব্যস্ত হয়ে বলেন—ভেজা শরীরে এই হিমে কতক্ষণ থাকবে? তোমার শরীর ভাল নয়।

কুঞ্জ সংবিৎ ফিরে পায়। আজ সে কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে তা হঠাৎ টের পেয়ে ভারী লজ্জা করে তার। কোনওদিন কোনও মানুষের কাছে ঠিক এভাবে নিজের সম্পর্কে জানতে চায়নি কুঞ্জ। সে বরাবর নিজের সম্পর্কে গভীর বিশ্বাসী। নিজেকে অভ্রান্ত ভাবাই কুঞ্জর স্বভাব।

সংবিৎ ফিরে পেয়েই কুঞ্জ গুটিয়ে গেল। গম্ভীর মুখখানায় হাসি এল না, তাই না হেসেই বলল—

যাই মেজদাদু।

—এসো গিয়ে। মাঝে মাঝে এলে ভাল লাগে। বাড়িতে তোমার কেউ যত্ন করে না নাকি? তেমন শুকিয়ে গেছ। তোমার মাকে দেখলে বলব তো।

কুঞ্জ আবার জলঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে আসে। বাতাসের মুখে ধেয়ে আসে খরশান বৃষ্টির অস্ত্রশস্ত্র। গেঁথে ফেলে তাকে বার বার। বৃষ্টির মিছিল চলে তার পিছনে পিছনে, ধিক্কার দেয়—ছিয়া, ছিয়া, ছিয়া...

পিচ রাস্তায় এক নিয়নবাতির তলায় ছোট ভাই রাধানাথের সঙ্গে দেখা। ছাতার নীচে গুঁড়ি মেরে যাচ্ছিল। কুঞ্জকে দেখে ভয়ার্ত মুখ তুলে বলল—বউদির বড্ড অসুখ, ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।

—কী অসুখ?

—মেজদা মেরেছে। রক্ত যাচ্ছে খুব।

কুঞ্জ সামান্য কেঁপে ওঠে। হয়তো ভেজা শরীরে হঠাৎ বাতাস লাগল, কিংবা হয়তো অন্য কিছু। ভাবতে চাইল না কুঞ্জ। ভাবতে নেই।

খুব অনেক রাতে মেঘ কেটে আকাশে সামান্য জ্যোৎস্না ফুটেছে। বাতাস থেমেছে। রুগির ঘরখানা নিরিবিলি হয়েছে এতক্ষণে। টুসি জেগে ছিল এতক্ষণ। আর পারল না। এক ধারে মাদুর পেতে তুলোর কম্বল মুড়ি দিয়ে নেতিয়ে পড়েছে অঢেল ঘুমে।

কুঞ্জ একা হল। সাবিত্রীর অবশ্য সাড় নেই। রক্ত বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ। কয়েকবারই অজ্ঞান হয়েছে, আবার জ্ঞান ফিরেছে, ফের দাঁতে দাঁত লেগে চোখ উল্টে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করেছে। মেঝে ভেসে গিয়েছিল রক্তে। কুঞ্জ তখন ঘরে আসেনি। ভাসুর তো। সব ধোয়া মোছা হওয়ার পর, ভিড় পাতলা হয়ে গেলে এসে একটু দূরে চেয়ার পেতে বসে থেকেছে। এ ঘরে এভাবে বসে থাকা তার উচিত নয়। খারাপ দেখায়। তবু তার উপায়ও নেই। রাঙাকাকি আর মা থাকতে চেয়েছিল, কুঞ্জ একরকম জোর করে তাদের শুতে পাঠিয়েছে। কেবল টুসি। ডাক্তার বলে গেছে—ভয় নেই। কিন্তু কুঞ্জর ভয় অন্য জায়গায়। সে নিঃশব্দে চেয়ে থেকেছে সাড়হীন সাবিত্রীর দিকে। টের পেয়েছে ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে ভিজে তার ডান বুকে জল জমছে। বাঁ বুকে ভয়।

টুসির শ্বাসের শব্দ মন দিয়ে শুনল কুঞ্জ। ঘুমন্ত শ্বাসের শব্দ চিনতে পেরে নিশ্চিন্ত হল একটু। আস্তে নিঃশব্দে উঠে এল বিছানার কাছে। ডাকল না, তবে বিছানার এক পাশে বসল খুব সাবধানে।

অনেক, অনেকক্ষণ বসে রইল। ঘরে একটা মৃদু নীল ঘুম-আলোর ডুম জ্বালানো। তাতে আলো হয় না। কেবল দৃশ্যগুলো জলে-ডোবা আবছায়া মতো দেখা যায়। সেই আলোয় যুবতী সাবিত্রীকে বুড়ি-ধুড়ির মতো দেখায়। দেখতে ভাল লাগে না। অনিচ্ছে হয়। চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে জাগে।

গভীর রাতের এক নিস্তব্ধ মুহূর্তে যখন সাবিত্রীর বিছানায় সসঙ্কোচে বসে অন্যমনস্ক কুঞ্জ পপুলারিটির কথাই ভাবছিল তখন হঠাৎ খুব বড় করে চোখ মেলল সাবিত্রী। মাঝরাতে হঠাৎ সেই তাকানো চোখের দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে কুঞ্জ। তারপর মুখ এগিয়ে খুব নরম স্বরে জিজ্ঞেস করে—এখন কেমন আছ?

সাবিত্রী জবাব দিল না। বড় বড় চোখে নিষ্প্রাণ প্রতিমা যেমন চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ সেইরকম চেয়ে রইল। তারপর খুব ক্ষীণ, নাকিস্বরে বলল—ও কোথায়?

কুঞ্জ গম্ভীর হয়ে বলল—পালিয়েছে।

সাবিত্রী চারদিকে চাইল। টুসিকে দেখল, কুঞ্জর দিকে চেয়ে চোখের ইঙ্গিত করে বলল—টুসি?

—ঘুমোচ্ছে।

সাবিত্রী গভীর শ্বাস ছেড়ে বলে—আর সবাই?

—ধারে কাছে কেউ নেই।

শুনে সাবিত্রী সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ফুঁপিয়ে উঠে বলে—আপনাকে কতবার বলেছি, ও আমাকে সন্দেহ করে। কিছু টের পেয়েছে।

—আজ কী বলল?

সাবিত্রী কুঞ্জর দিক থেকে অন্যধারে পাশ ফেরে। বলে—ও জানে।

কুঞ্জর ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায় হঠাৎ। বুক জুড়ে একটা বেলুন ফেঁপে ফুলে উঠে তার দম চেপে ধরে।

কুঞ্জ আস্তে করে বলে—টের পাওয়ার কথা নয়।

সাবিত্রী মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। চোখে জল। একটু ক্ষুব্ধ গলায় বলে—কী করে জানলেন, টের পাওয়ার কথা নয়? আপনি কি কখনও আমাদের গোপন সম্পর্কের কথা জানতে চেয়েছেন? গত চার মাস ও আমাকে ছোঁয়নি।

বজ্রপাতের মতো আবার সেই পপুলারিটি কথাটা মাথার মধ্যে ফেটে পড়ে কুঞ্জর। তার মন অভ্যাসবশে হিসেব করে নেয়, যদি কেষ্ট সন্দেহ করে থাকে, তবে সেটা চাউর করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। হাবুর ঝোপড়ায় মদের মুখে স্যাঙাতদের কাছে বলবে না কি আর? বউ আর দাদাকে জড়িয়ে তামসিক আনন্দ পাবে। যদি কথাটা ছড়ায় তবে কুঞ্জর অনেকখানি চলে যাবে। রেবন্তও কি জানে?

বড় ছটফট করে ওঠে কুঞ্জ। বলে—ছোঁয়নি?

সাবিত্রী চেয়েই ছিল। ধীর স্বরে বলল—কখনও-সখনও চাইত। আমার ইচ্ছে হত না। ঝগড়া করতুম। তখন রাগ করে গুটিয়ে যেত।

সাবিত্রীর এই বোকামিতে হাঁ হয়ে রইল কুঞ্জ। বোকা, জেদি মেয়েটা। খুব হতাশ গলায় কুঞ্জ বলল—তা হলে আর ওর দোষ কী? যদি কথাটা আমাকে আগে বলতে তবে তোমাকে পরামর্শ দিতুম অন্তত এক-আধবার ওকে অ্যালাউ করতে। দোষটা কেটে থাকত।

সাবিত্রী জেদি গলায় বলে—আমার ইচ্ছে হত না। ঘেন্না পেতাম।

কুঞ্জ কাহিল গলায় বলে—কিন্তু ধরা পড়ে গেলে যে!

সাবিত্রী মুখ ফিরিয়ে নেয় লজ্জায়। ক্ষীণ স্বরে বলে—গেলাম তো! কিন্তু সব দোষ কি আমার? আপনার কিছু করার ছিল না?

সাবিত্রীর ওপর এই মুহূর্তে ভারী একটা ঘেন্নার মতো ভাব হল কুঞ্জর। দোষ তোমার নয় তো কার? বিয়ে হয়ে আসার পর থেকেই কেন তুমি আর সবাইকে ছেড়ে সুযোগ পেলেই হাঁ করে দেখতে আমাকে? বাড়ির লোক আমাকে যত্ন করে না বলে কেন অনুযোগ তুলতে সবার কাছে? কেন আমার স্নানের সময় পুকুরঘাটে গেছ? আমার ঘরে গিয়ে সোহাগ করে বিছানা টান করত, আলনা আর টেবিল গোছাত কে? কেষ্টকে মদ ছাড়ানোর চেষ্টা করনি, রাতে ও না ফিরলে তেমন গা করনি কখনও। সেসব কেন? যদি স্বামী হিসেবে কেষ্টকে তোমার পছন্দ নয়, তবে বিয়ের আগে নটঘটি করেছিলে কেন? ঠিক কথা, দোষ আমারও। কী করব, আমার যে সেচহীন শুকনো জীবনের চাষ। একটা বয়সের পর পুরুষ চোত মাসের খরার জমি হয়ে যায় জান না? মেয়েমানুষ হল জলভরা কালো মেঘের মতো। আমার সেই মেঘ কেটে গেছে কবে! তনু বিয়ে করে চলে গেল। শুকনো ড্যাঙা জমি পড়েছিলুম। ছিলুম তো ছিলুম। কে তোমাকে মেঘ হয়ে আসতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? চনমন করতে, উচাটন হতে, সম্পর্কের বাঁধন খসিয়ে ফেলতে চাইতে। তোমার চোখমুখ দেখেই জলের মতো বোঝা যেত। আর যত সেটা বুঝতে পারলুম তত আমারও চৈত্রের জমি মেঘ দেখে ফুঁসে উঠল। সেটা দোষ বটে, কিন্তু বিবেচনা করলে, বিশ্লেষণ করলে, তলিয়ে দেখলে দেখতে পাবে মেঘের ছায়া পড়েছিল বলেই খরার জমি উন্মন হয়েছিল। শরীর জিনিসটা সম্পর্ক মানতে চায় না, সমাজ মানতে চায় না, আগে পরে কী হবে ভাবতে চায় না। বোবা, কালা, অন্ধ, অবিবেচক। যখন জাগে তখন মাতালের মতো জাগে, লণ্ডভণ্ড করে দিতে চায় সব। হাবুর ঝোপড়ায় একরাতিয়াকে নিয়ে পড়ে থাকত কেষ্ট। তুমি এ ঘরে একা। আমি ও ঘরে একা। মেঘ ডাকত, খরার মাটিও অপেক্ষা করত। তারপর এক ঘোর নিশুত রাতে ছোট্ট করে শেকল নড়ল দরজায়।...আমি যেন জানতুম, অবিকল এইভাবেই একদিন নিশুত রাতে শিকল নড়বে। আমি এত নিশ্চিতভাবে জানতুম যে শেকল কে নাড়ল তা জিজ্ঞেসও করিনি। উঠে কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিলুম। মনে কোরো না যে ভেসে গিয়েছিলুম, ডুবে গিয়েছিলুম, সুখে ভরে উঠলাম। মোটেই তা নয়। শরীর নিভলে বড় ঘেন্না হয়েছিল নিজের ওপর। সমাজ, সংসার, সম্পর্ক সব বজ্রাঘাতের মতো মাথায় পড়তে লাগল এসে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলুম, তুমি ভারী সুখী হয়েছে, তৃপ্তি শান্তি আনন্দে ঝলমল করছে মুখ। বলেছিলে, যে মানুষ মস্ত বড় তাকে সব দেওয়া যায়। দোষ হয় না। বলনি?

কুঞ্জ শুকনো মুখে বলল—কেষ্ট জানে বলছ! কিন্তু লোকটা যে আমিই তা ঠিক পেল কী করে?

সাবিত্রী গভীর বেদনার শব্দ করল একটু। আস্তে করে বলল—বড্ড কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ ব্যথা।

সাদা ঠাণ্ডা একটা হাত বাড়িয়ে কুঞ্জর হাতখানা ধরল সাবিত্রী। ভারী দুর্বল হাতের সেই ধরাটা যেন শালিখ পাখির পায়ের আঁকড়ের মতো। কুঞ্জর গা সামান্য ঘিনঘিন করে। অশুচি লাগে। ঘরের কোণে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে রক্তমাখা কাপড়চোপড়, ন্যাকড়া। ঘরের আঁশটে গন্ধটা যেন আরও ঘুলিয়ে ওঠে হঠাৎ। টুসি গভীর ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করে কী বলে ওঠে। কুঞ্জ হাত ছাড়িয়ে নেয়।

সাবিত্রী ক্লান্ত আধবোজা চোখে কুঞ্জর দিকে চেয়ে বলে—আপনার কথা আমিই বলেছি।

—তুমি! কুঞ্জ ভারী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

—রোজ জানতে চাইত, আপনিই কি-না। পেটে ছেলে এল, অথচ ওর নয়। তবে কার, তা হিসেব করে দেখত । স্বীকার করানোর জন্য মারত। কাল বলে ফেললাম।

—তুমি কি পাগল?

সাবিত্রীর ক্ষীণ স্বরে যেন একটু জোয়ার লাগে—পাগল কেন হব? আমার তো সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে। ভাবতে কত সুখ হয়! গায়ে কাঁটা দেয়। মনে হয়, আপনার মতো মানুষ, এত বড় একটা মানুষ, যার এত নামডাক সে কি-না আমাকে এত স্নেহ করে! আমার এত আনন্দ হয়, সবাইকে বলতে ইচ্ছে করে। কাল মাঝরাতে যখন ও আমাকে গলা টিপে ধরেছিল তখন চোখে চোখ রেখে একটুও ভয় না খেয়ে বলেছিলাম। একটুও ভয় করেনি। বলে এত সুখ হল, গায়ে কাঁটা দিল আনন্দে। ও যখন মারছিল তখন একটুও লাগছিল না। আমি তখনও হাসছিলুম।

আস্তে আস্তে আড়ষ্ট হয়ে যায় কুঞ্জ। ভিতরে একটা কাঁপুনি শুরু হয়। এ যে বদ্ধ বেহেড হয়ে গেছে। এখন যে এ আর কোনও হায়া লজ্জা মানছে না! মাথাটা টলে যায় কুঞ্জর। বিছানার ওপর হাতের ভর রেখে ঝুঁকে সাবিত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, যেন ভূত দেখছে। বলে—কী করলে বলো তো! ছিঃ ছিঃ!

—আমি ভয় পাই না। আমার লজ্জা নেই। এত মারল, কত কষ্ট পেলাম দেখুন তবু এখনও মনে হচ্ছে বলে দিয়ে বেশ করেছি।

কুঞ্জ কুঁকড়ে বসে হাঁটুতে থুঁতনি রেখে ক্ষীণ গলায় বলে—শুনে কেষ্ট কী করল?

—খুব অবাক হল। সন্দেহ করত বটে কিন্তু আপনার মতো মানুষ এ কাজ করতে পারে তা যেন ওর বিশ্বাস হত না। তাই কথাটা শুনে কেমনধারা ভ্যাবলা হয়ে গেল। মারল আমাকে, কিন্তু কেমন পাগলাটে হয়ে গেল মুখ, মারতে মারতেই কেঁদে ফেলল। তারপর দরজা খুলে পালিয়ে গেল দৌড়ে। ফিরল আজ সন্ধেবেলায়। আবার ধরল আমাকে, বলল, দাদাকে মিথ্যে করে জড়াচ্ছ। দাদা নয়, অন্য কেউ। কে সত্যি করে বলো। আমি তেমনি চোখে চোখ রেখে বললাম। বলল, আমাদের দুজনকেই খুন করবে। আগে কোনওদিন পেটে মারেনি, আজ মারল । বলতে বলতে মুখ বালিশে চেপে ফুঁপিয়ে ওঠে সাবিত্রী।

কুঞ্জ অসাড় হয়ে বসে থাকে। পপুলারিটি কথাটা খামচে ধরে মাথা। এক নাগাড়ে অনেক কথা বলে ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সাবিত্রী। থর থর করে কাঁপছিল, ঠোঁট সাদা। লেপ টেনে মুড়ি দিয়ে গভীর ব্যথা-বেদনার শব্দ করে বলল—আমার শরীর বড্ড খারাপ লাগছে। ভীষণ শীত আর কাঁপুনি।

কুঞ্জ টুসিকে ডেকে তোলে। রাঙাকাকি আর মাকে ডেকে আনে।

৬

এতদিনে তবে কি বুড়ো হল পটল? চোখে ছানি আসছে নাকি? একটু আলো লাগলেই চোখ বড় ঝলসে যায় যে আজকাল? নইলে কি রবিকে কুঞ্জ বলে ভুল করত? টর্চের আলোটা এমন বিশাল গোলপানা চক্করের মতো ঝলসে উঠেছিল যে ধাঁধা লেগে গেল। সে ভুলটাও শুধরে নিতে পারত। কিন্তু একটা ফাঁকা আওয়াজে, একটা উটকো লোকের হাঁকাড় শুনে মাথাটা কেন যে ঘেবড়ে গেল আজ। হাবুর ঘরে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে অফুরন্ত হাঁফের টান ভোগ করতে করতে এইসব কথা ভাবে পটল। শ্লেষ্মার পর শ্লেষ্মা উঠে আসছে কাশির সঙ্গে। হরি ডাক্তার মরে গিয়ে অবধি এই শ্লেষ্মার আর চিকিৎসা হল না।

বুকের মধ্যে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে শ্বাসের কষ্ট। এরপর কি মরবে পটল? ঝাড়গ্রামে মামাশ্বশুর সস্তায় একটা কলাবাগান বেচে দিচ্ছে। পটলের বড় ইচ্ছে, বাগানটা কেনে। মরবার আগে ছেলেপুলে সহ বউ বাসন্তীকে ঝাড়গ্রামে বসিয়ে যেতে প্যরলে একটা কাজের কাজ হয়। বাসন্তীর ব্যবসার মাথা আছে, কলা বেচে ঠিক সংসার চালিয়ে নেবে। আজ কুঞ্জকে খুন করতে পারলে রেবন্তবাবু বাগান কেনার টাকা দেবে, কথা ছিল। খুন পটলের কাছে নতুন জিনিস তো নয়। পলিটিক্সয়ালাদের হয়ে, জোত-মালিকের হয়ে, হরেক কারবারির হয়ে নানান রকম মানুষ মেরেছে সে। সেজন্য বড় একটা আফশোসও নেই তার। মশা মাছি, পাঁঠা ছাগল মারলে যদি পাপ না হয় তবে মানুষ মারলেও হয় না। আর যদি পাপ হয়ই হবে পাঁঠা-ছাগল মারলে যতটা হয় তার বেশি হয় না। এ তত্ত্ব পটল অনেক ভেবে ঠিক পেয়েছে। কিন্তু এখন তার সন্দেহ হয়, সত্যিকারের বুড়ো হল নাকি সে? ছানি আসছে চোখে? মাথাটা কাজের সময় ঠিক থাকছে না কেন? এমন হলে লাশটা ফেলতে পারবে না পটল, আর যদি না ফেলতে পারে তবে ঝাড়গ্রামের কলাবাগানটা যে হাতছাড়া হয়ে যাবে! রেবন্তবাবু দায়ে দফায় অনেক দেখেছে তাকে; তার এই কাজটুকু করে যে দিতেই হয় পটলকে! ভাবছে আর কাশছে পটল। হাবুর দেওয়া বড় মাটির ভাঁড়টা ভরে উঠল শ্লেষ্মায়। বড় শ্বাসের কষ্ট।

চ্যাটাইয়ের অন্যধারে বসে কালিদাস তাড়ি টানছিল খুব। মাথাটা টলমলে হয়ে এসেছে। মিটি-মিটি হাসছে আর পটলের দিকে চাইছে। বিড়বিড় করে বলছে—হোমিওর কী গুণ বাবা! নিজের চোখে দেখলুম তো! কুঞ্জ ওই অত দূরে থাকতে পকেট থেকে শিশি বের করে ওষুধ খেল, আর সেই ওষুধের গুণে একশো হাত দূরে পটলার চোখে ধাঁধা লেগে গেল! শুধু তাই? হোমিওর গুণেই না কুঞ্জ আগেভাগে জানতে পেরেছিল যে আজ সে খুন হবে! তাই না এক বকরাক্ষসকে জুটিয়ে এনেছিল সঙ্গে। কী চেঁচাল বাবা মুশকো লোকটা! কাঁচা খেয়ে ফেলত ধরতে পারলে। পটল যে পটল সেও ভয় খেয়ে পালায় না হলে? রেবন্তবাবুও ঘাবড়ে গেছে খুব। এই জল ঝড়ের মধ্যেই লেজ গুটিয়ে পালাল।

নারকোল বাগানের বাইরে আসতেই ধারালো বৃষ্টি ছেঁকে ধরল রেবন্তকে। পাথুবে ঠাণ্ডা জল। দমফাটা হুমো বাতাস খোলা মাঠের মধ্যে তাকে এলোমেলো ঘাড়ধাক্কা দিতে থাকে। দেয়ালের মতো নিরেট অন্ধকার চারদিকে, এক লহমায় ভিজে গেল রেবন্ত। গায়ের সোয়েটার, জামা গেঞ্জি ফুঁড়ে জল ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে। বৃষ্টি বাতাস আর মাঠে জমা জল ঠেলে জোরে হাঁটা যায় না। তবু প্রাণপণে হাঁটে রেবন্ত। শীতে ঠকঠক করে কাঁপে সে। দুটো কানে বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা। ঝোড়ো বাতাস হাড়-পাঁজরায় ঢুকে প্রাণটুকু শুষে নিচ্ছে। তবু সে পিছন ফিরে একবার দেখে নিল, ছায়া দুটো পিছু নিয়েছে কিনা, ওই দুজনের কাছ থেকে এখন তাকে যতদূর সম্ভব তফাত হতে হবে।

শরীর অবশ করে গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা আর কাঁপুনি ধরে গেল। কানের যন্ত্রণাটা মাথাময় ভোমরার ডাক ডাকতে থাকে, চিন্তার শক্তি পর্যন্ত থাকে না। এই অবস্থায় কীভাবে সে শ্যামপুর পৌঁছল সেটা সে নিজেও ভাল বলতে পারবে না।

আবছা মনে পড়ে, বাজারে তেজেনের দোকান থেকে নিজের সাইকেলটা নেওয়ার সময় তেজেন বলেছিল, পাগল নাকি? এ ভাবে যেতে পারে মানুষ! থেকে যাও।

রেবন্ত কথাটা কানে নেয়নি, অন্ধকারে বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে সে প্রবল বেগে সাইকেল চালিয়েছিল। কয়েকবার সাইকেল হড়কে পড়ে গেল। চাকার রিমে টাল খেয়েছে। চালানোর সময় ফর্কের সঙ্গে টায়ার ঘষা খাচ্ছিল খ্যাস খ্যাস করে। জোরে চলতে চাইছিল না। তবু পৌঁছেও গেল রেবন্ত।

শ্যামশ্রীর সামনে কোনওদিন কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করে না, আজও করল না। যখন উত্তরের দালানের বারান্দায় সাইকেলটা হিঁচড়ে তুলল তখন তার শরীর আপনা থেকেই টলে পড়ে যাচ্ছিল মেঝেয়। স্রেফ মনের জোরে খাড়া রইল সে। গামছায় শরীর মুছল, জামাকাপড় পালটাল। মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে চোখ আর নাক দিয়ে অবিরল জল ঝরছে। প্রবল হাঁচি দিল কয়েকটা।

শ্যামশ্রী মুখে কিছু বলছিল না বটে, কিন্তু দরজা খুলবার পর থেকেই একদৃষ্টে লক্ষ করছিল তাকে। ছাড়া জামাকাপড়গুলোর জল নিংড়ে দড়িতে মেলে দিয়ে এল শ্যামশ্রী। নীরবে শুকনো জামাকাপড় সোয়েটার এগিয়ে দিল। রেবন্তর গা আর জামা-কাপড় থেকে জল ঝরে মেঝেয় গড়িয়ে যাচ্ছিল, নিজে

হাতে চট নিয়ে-এসে তা চাপাও দিল শ্যামশ্রী। অস্ফুট স্বরে একবার বলল—ছাদের ঘরে এখন যেয়ো না, ঠাণ্ডা, কিছুক্ষণ এখানেই শুয়ে থাকো লেপ গায়ে দিয়ে।

মাসখানেকের বেশি হল, নীচের শোওয়ার ঘরে শ্যামশ্রীর সঙ্গে শোয় না রেবন্ত। ছাদে একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে শোয়। শ্যামশ্রীর সঙ্গে শরীরের সম্পর্কও তার নেই বেশ কিছুদিন। কথাবার্তাও প্রায় হয়ই না।

রেবন্ত শ্যামশ্রীর কথার জবাব দিল না, কিন্তু ওর খাটের নরম বিছানায় গিয়ে বসল। ভাঁজ করা লেপটাও টেনে নিয়ে যথাসাধ্য মুড়ি দিল গায়ে। মাথা আর কান জুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা। সহ্য করতে লাগল চোখ বুজে।

শ্যামশ্রী হয়তো বুঝতে পারল রেবন্তর অবস্থা ভাল নয়। নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। একটু বাদে একটা বড় কাচের গ্লাস ভর্তি আদা-চা নিয়ে এল, সঙ্গে মুড়ি, আলুভাজা আর লঙ্কা।

গরম চা পেটে যাওয়ার পর আচ্ছন্নভাবটা কিছু কাটে। কিন্তু স্বাভাবিক বোধ করে না রেবন্ত। ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর অস্থিরতা।

নকশাল আমলে এ অঞ্চলে খুনখারাবি হতে পারেনি। পাঁচটা-সাতটা গাঁ জুড়ে তৈরি হয়েছিল প্রতিরোধ বাহিনী। এ সব কাজে সবচেয়ে বেশি জান লড়িয়েছিল কুঞ্জই। সে ছিল অস্ত্রহীন সেনাপতি। প্রাণের দায়ে পুলিশ কুঞ্জকে সাহায্য করেছে। তখন কুঞ্জর ছায়া হয়ে ফিরত রেবন্ত। রাত জেগে সাইকেলে ঘুরে গাঁয়ের পর গাঁ চৌকি দিত দুজনে। কুঞ্জ বুকের দোষ বলে নিজে সাইকেল চালাত না। তাকে সামনের রডে বসিয়ে নিয়ে চালাত রেবন্ত। সাইকেলেই দুজনের রাজ্যের কথা হত। হৃদয়ের কত গভীর কথা সে সব! স্বর্গরাজ্য তৈরি করার কত অবাস্তব স্বপ্ন! কুঞ্জ কখনও নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে চাইত না। অসম্ভব চাপা ছিল। কিন্তু একদিন মাঝরাতে জ্যোৎস্নায় খাডুবেড়ের মোড় থেকে বেলপুকুর ফিরবার পথে সাইকেলের রডে বসে দুর্বল মুহূর্তে কেঠো স্বভাবের কুঞ্জও বলে ফেলেছিল তনুর কথা। রাজুর বোন তনু। আর কাউকে কখনও বলেনি কুঞ্জ, বিশ্বাস করে শুধু তাকেই বলেছিল।

সেই বিশ্বাসটা আর অবশ্য নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর তারা দুজনে গিয়েছিল যশোর অবধি। তাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তখন ছিল প্রবলতম, কিন্তু সেইটেই আবার ছিল বিচ্ছেদেরও পূর্বাভাস। যশোরযাত্রাই ছিল তাদের বন্ধুত্বেরও শেষ যাত্রা। মুক্তিযুদ্ধের পরই ইলেকশন। কংগ্রেসের হয়ে নমিনেশন পাওয়ার আশায় কুঞ্জ লড়ে গেল নানুর সঙ্গে। পারল না। পারার কথাই নয়। কুঞ্জ এ অঞ্চলের জন্য অনেক করেছে বটে, কিন্তু তার মানে তো এ নয় যে বিধানসভায় দাঁড়ানোর ক্ষমতাও তার এসে গেছে। সেই প্রথম রেবন্ত চটেছিল কুঞ্জর ওপর। বোকার মতোই কুঞ্জ দাঁড়াল নির্দল হয়ে। রেবন্ত খাটতে লাগল নানুর জন্য। পাঁচ-সাতটা গাঁয়ে কুঞ্জর প্রভাব বেশি, নানু পাত্তা পাবে না। কিন্তু তখন নানু হারলে দলের বেইজ্জত। নিছক জোর ছাড়া গতি ছিল না। এমনিতেই হয়তো নানু জিতত, তবু সন্দেহের অবকাশ না রাখতে রেবন্তরা বুথ দখল করল ভোটের দিন ভোরবেলায়। তখন থেকেই গোলমালের সূত্রপাত। কুঞ্জর পোলিং এজেন্ট বেলপুকুর কলেজে মার খায়। যারা মেরেছিল তাদের মধ্যে রেবন্ত ছিল। তখন রেবন্ত দরকার হলে কুঞ্জকেও মারতে পারত।

সে যাত্রা কুঞ্জ জেতেনি। ইলেকশনের পর আবার ভাবসাব হয়ে গিয়েছিল কুঞ্জর সঙ্গে রেবন্তর। তবে কুঞ্জ আর দলে ফেরেনি। অন্য দলে ভিড়েছে। কিন্তু আজও ঝিমিয়ে যায়নি। সব সময় কিছু না কিছু করছে। দল পাকাচ্ছে, চাঁদা তুলছে, বক্তৃতা দিচ্ছে, সাহায্য বা ত্রাণের কাজ করছে।

শ্যামপুরে রেবন্তদের পরিবারের প্রতাপ খুব। নামে বেনামে তাদের বিস্তর জমি, চালের কল, বাগনানে তাদের মস্ত কাপড়ের দোকান। রেবন্তকে কাজ-কর্ম করতে হয় না। বি এসসি পাশ করে সে বহুদিন শুয়ে বসে আর পলিটিক্স করে কাটাচ্ছিল। তাঁতপুরে একটা ইস্কুলে অঙ্কের মাস্টারি করত। অলস মাথায় শয়তানের বাসা। রোজ বিকেলের দিকে একটু নেশা করার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল। বেলপুকুর বাজারের পিছনে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা ভিতর দিকে নির্জন জায়গায় হাবুর ঝোপড়া হল নেশার আস্তানা।

কিছু বদমাশ লোক হাবুর বউয়ের নামই দিয়েছিল একরাতিয়া। আসল নাম একরত্তি। মা-বাপের আদর করে রাখা সেই নাম একরত্তি এখন বদমাশদের মুখে একরাতিয়া। অর্থাৎ এক রাতের

মেয়েমানুষ। একরাতিয়া দেখতে এমন কিছু নয়। স্বাস্থ্যটা ভাল। ছেলেপুলে নেই। কিছুটা হাবুর লোভানিতে, কিছুটা একঘেয়েমি কাটাতে রেবন্ত সেই ফাঁদে পা দেয়।

একদিন রাত্রে যখন রেবন্ত ঝোপড়ার ভিতরের খুপরিতে একরাতিয়ার সঙ্গে ছিল তখন ঝাঁপ ঠেলে টর্চ হাতে আচমকা ঢুকল কুঞ্জ। তার পিছনে জনা পাঁচ-সাত ছেলে-ছোকরা সমাজরক্ষী। কুঞ্জ অবশ্য টর্চটা পট করে নিবিয়ে ঝাপটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়েছিল। বলেছিল, পালিয়ে যা সামনের ঘর দিয়ে। আর কখনও আসিস না।

রেবন্ত পালিয়েছিল। তারপর লোকলজ্জার ভয়ে সিঁটিয়ে থেকে ছিল কয়েকদিন। সামাজিক নোংরামি বন্ধ করতে কুঞ্জ তখন নানা জায়গায় হানা দিচ্ছে দলবল নিয়ে। যত অকাজের কাজ। কয়েকদিন বাদে একদিন শ্যামপুরে এসে রেবন্তর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বলল—সত্যবাবুর বড় মেয়েটি ভাল। তোদের স্বঘর।

রেবন্ত চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না লজ্জায়। কিন্তু মনে মনে বুঝতে পেরেছিল এটা ব্ল্যাকমেল। প্রথমটায় রাজি হয়নি। কিন্তু কুঞ্জব উসকানিতে তার বাবা মা আর কাকারা বিয়ের জন্য পিছনে লাগল। পারিবারিক চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা তাকে করতে হয়।

বিয়েটা পুরুষের জীবনের কী সাংঘাতিক গুরুতর ব্যাপার তা আগে জানত না রেবন্ত। বিয়ের পর হাড়ে হাড়ে জানল। বিয়ের আসরে দানসামগ্রীর মধ্যে একটা চরকা দেখে বরযাত্রীরা কিছু ঠাট্টা রসিকতা করেছিল। সে তেমন কিছু নয়। কিন্তু কন্যা সম্প্রদানের সময় রেবন্ত টের পেল তার করতলে শ্যামশ্রীর হাত শক্ত, ঘোমটার মধ্যে মুখখানা গোঁজ। বিদ্রোহের সেই শুরু। রেবন্তকে শ্যামশ্রী বহুভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে কালচারের দিক দিয়ে তার যোগ্য বর রেবন্ত নয়। এ কথা আরও নানা জনেও কানাঘুঁষো করে। একদিন এক বকারাজ খুড়শ্বশুর কলকাতা থেকে এসে সব দেখেশুনে মুখের ওপরেই তাকে বলেছিল—সত্যদা কলকাতায় থাকলে এ বিয়ের কথা ভাবতেই পারত না। গাঁ-ঘরে কি শ্যামাকে মানায়?

আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে গেল রেবন্তও। শ্যামশ্রী দেখতে খারাপ নয়। সত্যিকারের ঢলঢলে চেহাবা। মস্ত মস্ত গভীর চোখ। ভারী নরম তার চলাফেরা, কথাবার্তা, কিন্তু ওই নরম চেহারার ভিতরকার স্বভাবটি অহংকারী, জেদি, নিষ্ঠুর। বিয়ের পর থেকেই এক ঘরের মধ্যে তারা দুজন জন্মশত্রুর মতো এ ওকে আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজত। এখন আক্রমণ নেই। নিরুত্তাপ বিরাগ রয়েছে।

এ বাড়ির কারও সঙ্গেই শ্যামশ্রীর তেমন বনিবনা নেই, তবে সে এত গম্ভীর এবং ব্যক্তিত্বময়ী যে কেউ তাকে বড় একটা ঘাঁটাতে সাহসও করে না। উঁচু গলায় শ্যামশ্রী বড় একটা কথা বলে না। তার তেজ রাগ সব ঠাণ্ডা ধরনের। সকালে উঠে সে রোজ চরকা কাটে, গান্ধীর বাণী পড়ে। এগুলো ওব সত্যিকারের ব্যাপার, না কি বিদ্রোহের প্রকাশ তা জানে না রেবন্ত। সে নিজে কিছু রাজনীতি করেছে বটে তবে কোনও আদর্শই তার ভিতরে গভীর হয়ে বসেনি। তার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্কই নেই। নিজের চারপাশেও সে বরাবর তার নিজের মতো লোকজনকেই দেখেছে। তাদের কারওরই কোনও নেতার প্রতি অবিচল ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসও নেই। তাই শ্যামশ্রীকে দেখে তার অসহ্য লাগে। গান্ধী কেন চরকা কাটতেন বা গান্ধী কী বলে গেছেন তা কখনও অনুসন্ধান করে দেখেনি রেবন্ত। সে শুধু জানে গান্ধী অহিংসবাদী ছিলেন, অসহযোগ আর ভারত ছাড়ো আন্দোলন করেছিলেন, লোককে চরকা কাটতে বলতেন, এর বেশি জানার আগ্রহ রেবন্তর নেই। উপরন্তু এখন শ্যামশ্রীর জন্যই গান্ধীকে সে মনেপ্রাণে অপছন্দ করতে শুরু করেছে।

বিয়ের পর শ্যামশ্রীকে সে পায়নি বটে, কিন্তু পেয়েছে বনাকে। যতবার সে বনাকে দেখে ততবার মনে হয়, এই বনা তো আমার জন্যই জন্মেছিল। বনশ্রীর কথা মনে পড়লেই তার ভিতরকার অন্ধকার আলো হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর, মনপ্রাণ জেগে ওঠে। একাগ্র হয়ে ওঠে সে।

বড় গোপন কথা। কোনওদিন বনশ্রীকে সে কিছু বুঝতে দেয়নি, কখনও লঙ্ঘন করেনি সম্পর্কের নিয়ম। শুধু তার মন জানে। যা অন্তরে গোপন করা যায় তাই বেড়ে ওঠে। যত দিন যাচ্ছে তত তার মন ভরে ওঠে বনশ্রীতে। কখনও পাগল পাগল লাগে। অসহায় আবেগে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনশ্রীকে চিন্তা করে। মনে মনে জিয়ন্ত করে তোলে তাকে। তারপর ভালবাসার কথা বলে পাগলের মতো।

এই অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আবার সে যাওয়া শুরু করেছিল হাবুর ঝোপড়ায়। একরাতিয়ার সঙ্গে আবার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এখন আর সে লোক-লজ্জার ভয়ও পায় না। ভারী বেপরোয়া লাগে নিজেকে। শ্যামশ্রী তার জীবনটা নষ্ট করেছে, এবং বনশ্রীকে সে হয়তো কোনওদিনই পাবে না। তবে আর ভয় কীসের, ভাবনাই বা কী? কুঞ্জর সমাজরক্ষী দল স্বাভাবিক নিয়মেই ভেঙে গেছে। এখন আর কেউ হামলা করে না। হাবুর ঝোপড়ায় মাইফেল জমেছে খুব। এমনকী কুঞ্জর নিজের ভাই কেষ্টও এখন হাবুর ঝোপড়ায় বোজকার খদ্দের।

বনশ্রীর কথা আর কেউ না জানুক, একদিন জেনে গেল কুঞ্জ। মাতাল অবস্থায় তাকে সেদিন তুলে এনেছিল কুঞ্জ। রিকশায় তাকে পাশে নিয়ে বসে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিল রাতের বেলায়। এ সব করাই তো কুঞ্জর কাজ। মহৎ হওয়ার বড় নেশা ওর। আর সেই দিন রিকশায় ফাঁকা রাস্তায় কুঞ্জকে বহু দিন পরে একা পেয়ে রেবন্ত সামলাতে পারেনি নিজেকে। শ্যামশ্রীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল কুঞ্জ, সেই আক্রোশ শীতের সাপের মতো ঘুমিয়ে থাকে তার মনের মধ্যে। কুঞ্জকে পেয়ে ফুঁসে উঠল। দুর্বল হাতে কুঞ্জর জামার গলা চেপে ধরে সে বলল—কেন আমার সর্বনাশ করলি হারামি? কে তোকে দালালি করতে বলেছিল?

বার বার এই প্রশ্ন করে যাচ্ছিল সে। পারলে সেদিনই খুন করত কুঞ্জকে। কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় কুঞ্জ তাকে নানা উপদেশ দিচ্ছিল। ভাল হতে বলছিল, যেমন সবাই বলে। কুঞ্জকে রিকশা থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল রেবন্ত বার বাব। বলেছিল—কে তোকে শ্যামার সঙ্গে বিয়ে দিতে বলেছিল? আমি তো বনাকে ভালবাসি, আমি বনাকে ভালবাসি। শ্যামশ্রীকে খুন করে আমি বনশ্রীকে বিয়ে করব।

মাতাল অবস্থায় কী বলেছিল তা মনে ছিল না রেবন্তর। কিন্তু পরদিন সকালে কুঞ্জই এল। নিরালায় ডেকে নিয়ে গিয়ে থমথমে মুখে বলল—বনশ্রীর সঙ্গে তোর কোনও খারাপ সম্পর্ক নেই তো?

আতঙ্কে সাদা হয়ে গিয়েছিল রেবন্ত। ঘোলাটে স্মৃতি ভেদ করে গত রাত্রির কথা কিছু মনে পড়েছিল তার। সে হাবুর ঝোপড়ায় গিয়ে মদ খায় বা একবাতিয়ার সঙ্গে শোয়—এ কথা লোকে জানলেও সে আর পরোয়া করে না। কিন্তু বনশ্রীর কথা সে কোনও পাখি-পতঙ্গের কাছেও প্রকাশ করতে পারবে না যে। কী কববে ভেবে না পেয়ে রেবন্তর মাথা গুলিয়ে গেল। ঝুপ করে কুঞ্জর দুহাত ধরে বলল—না, না। দোহাই, বিশ্বাস কর।

কুঞ্জ বিশ্বাস করেনি। অত বোকা সে নয়। কিন্তু মুখে বলেওনি কিছু। শুধু কেমনধারা শুকনো হেসেছিল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—বনশ্রী বড় ভাল মেয়ে। নষ্ট করিস না।

তারপর থেকে কুঞ্জ এখন প্রাণপণে বনশ্রীর জন্য ভাল ভাল সম্বন্ধ জোগাড় করছে। বিয়ে হয়েও যেত এতদিনে। কিন্তু বড় মেয়ের বিয়েটা সুখের হয়নি বলে বনশ্রীর মা বাবা চট করে কোনও জায়গায় মত দিতে দ্বিধা করছেন। এবার একটু ভাল করে দেখেশুনে বিয়ে দেবেন ওঁরা।

রেবন্ত জানে, কুঞ্জ কখনও বনশ্রী সম্পর্কে তার মনের কথা কাউকে জানাবে না। মরে গেলেও না। সে স্বভাব কুঞ্জর নয়। কিন্তু রেবন্তর তবু বুকে জ্বলুনিটা যায় না। কুঞ্জ তো জানে। জেনে গেছে। পৃথিবীর একটা লোক তো জানল!

ইদানীং কুঞ্জর আর এক কাজ হয়েছে। কে তার মাথায় ঢুকিয়েছে বে-আইনি জমি ধরতে হবে। সেই থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে পাগলের মতো ঘোরে সে। বাগনান হাওড়া আর কলকাতার কাছারিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দলিল দস্তাবেজের খোঁজখবর নেয়, নকল বের করে। বি ডি ও থেকে শুরু করে মহকুমা হাকিম, ল্যান্ড সেটেলমেন্ট থেকে থানা—কোথায় কোথায় না হন্যে হয়ে হানা দিচ্ছে সে? যে ব্যাপারে হাত দেয় তাতেই ওর রোখ চাপে। আগুপিছু ভাবে না।

জমির স্বত্ব মানুষের কাছে কী সাংঘাতিক তা যে জানে না কুঞ্জ এমন নয়। সরকার বাড়তি জমি ছাড়তে বললেই লোকে ছাড়ে কখনও? তবে তো সরকার একদিন এও বলতে পারে, বাড়তি ছেলেপুলে বিলিয়ে দাও।

কুঞ্জ বিপদটা বুঝেও বোঝেনি। এই জমি উদ্ধারের জন্য সে আর একবার খুন হতে হতে বেঁচে যায় বরাত জোরে। তবু বোঝেনি। রেবন্ত জানে গোটা এলাকা জুড়ে এখন সযত্নে একটি স্টেজ তৈরি হয়ে রয়েছে, যে স্টেজে কুঞ্জর জীবনের শেষ দৃশ্যটার অভিনয় হবে। আজ বেঁচে গেল বটে, কিন্তু রোজ কি

বাঁচবে? তার দিন ঘনিয়ে এল। তার জন্য টাকা খাটছে, পাকা মাথার লোক রয়েছে পিছনে। এও ঠিক হয়ে আছে, কুঞ্জ মরলে পুলিশ তদন্ত করবে পলিটিক্যাল লাইন ধরে। যে কোনও দলের ঘাড়ে দোষটা চাপানো হবে। দল থেকে প্রতিবাদ উঠবে। হই-চই হবে কিছুদিন। তারপর থিতিয়ে পড়বে। কুঞ্জ মরবেই। রেবন্ত, পটল বা কালিদাসের হাতে যদি নাও মরে তবু কারও না কারও হাতে মরতেই হবে। নানা জায়গায় লোক লাগানো আছে। শুধু ইশারার অপেক্ষা। কিন্তু সেজন্য কুঞ্জকে খুন করতে চায়নি রেবন্ত। কুঞ্জ যাই করুক ওকে সত্যিকারের ঘেন্না করতে পারেনি সে কোনওদিন। ঘেন্না না হলে, খুনে রাগ না উঠলে কি মারা যায়? সেই অভাবটুকু এতদিন ছিল। আজ আর নেই। আপন মনে রেবন্ত একটু হাসে। কুঞ্জ, তোর সঙ্গে আর পাঁচজনের তফাত রইল না। তুই আর আমার চেয়ে মহৎ নোস। সাবিত্রীর কথা আমি জানি।

বাইরে একটা দমকা হাওয়া দিল। বারান্দার দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা সাইকেলটা ঘড়াং করে পড়ে গেল। একটা চাকা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। উৎকর্ণ হয়ে শোনে রেবন্ত। খুবই দামি সাইকেল। বিয়ের পাওয়া জিনিস। কিন্তু উঠল না সে। কানের যন্ত্রণায় অস্থির রেবন্ত লেপমুড়ি দিয়ে বোম হয়ে বসেই রইল। শ্যামশ্রী ঘরে নেই, কিন্তু চারদিকে তারই জিনিসপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বিয়ের সময় শ্যামশ্রীদের বাড়ি থেকে অনেক জিনিস আদায় করা হয়েছিল। এ ঘরে খাট, বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল এমনকী পাপোষটা পর্যন্ত ওদের দেওয়া। ভেবে হঠাৎ গা ঘিনঘিনিয়ে ওঠে রেবন্তর। লেপটা ফেলে। উঠে পড়ে বিছানা থেকে। আজকাল শ্বশুরবাড়ির জিনিসগুলোতে পর্যন্ত সে ঘেন্না পায়। সেই ঘেন্নায় এ ঘরে থাকার পাটই তুলে দিয়েছে।

ছাদের ঘরে যাবে বলে রেবন্ত বাইরের বারান্দার দিকে দরজাটা খুলতে যাচ্ছিল এমন সময় দেখল শ্যামশ্রী ভিতরে দরদালানের দিককার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। একদৃষ্টে দেখছে তাকে।

রেবন্ত যথাসম্ভব তেতো গলায় বলে—আমি যাচ্ছি। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

শীতল কঠিন একরকম গলায় শ্যামশ্রী জিজ্ঞেস করে—তুমি আজ দুপুরে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে?

রেবন্ত শ্যামশ্রীর চোখ থেকে চট করে চোখ সরিয়ে নেয়। বলে—হ্যাঁ।

—পুরুষদের শ্বশুরবাড়িতে বেশি যাওয়া ঠিক নয়।

শুনে রেবন্ত জ্বলে ওঠে। দাঁতে দাঁত পিষে মুখ ঘুরিয়ে বলে—কেন, কোনও অসুবিধে হয়েছে নাকি?

শ্যামশ্রী বড় বড় চোখে অনুত্তেজিত স্বরে বলে—হয়। শুভ এসেছিল তোমার আমার ঝগড়া হয়েছে কিনা তা জানতে। আমি চাই না, আমার বাপের বাড়ির লোকেরা কোনও কিছু সন্দেহ করুক। তোমার হাবভাব দেখে ওরা আজ নাকি ভেবেছে যে তুমি বাড়ি থেকে ঝগড়া করে গেছ।

মনে মনে বড় অসহায় হয়ে পড়ে রেবন্ত। শ্বশুরবাড়ি! শ্বশুরবাড়ি বলে সে সেখানে যায় নাকি? সে তো যায় বনার কাছে। না গিয়ে সে থাকবে কেমন করে? তার জীবনের একমাত্র খোলা জানালা, একমাত্র ডানায় ভর দেওয়া মুক্তি ওই বনা। বনার কাছে সে যাবে না? মুখে সে শুধু বলল—ও।

শ্যামশ্রী মৃদুস্বরে বলল—আর যেয়ো না। আমার ছোট ভাইবোনেরাও এখন বুঝতে শিখছে। তারা টের পায়।

শিউরে উঠে রেবন্ত কূট সন্দেহে বলে—কী টের পায়?

শ্যামশ্রী তেমনি বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলে—আমাদের সম্পর্কটা।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রেবন্ত, শ্যামশ্রীর এই কথায় সহজ হল। বলল—টের পেলেও কিছু যায় আসে না।

—তোমার যায় আসে না জানি। কিন্তু তোমার মতো গায়ের চামড়া তো সকলের পুরু নয়। আমার যায় আসে। জামাই হয়ে শ্বশুরবাড়িতে ঘন ঘন যাবেই বা কেন? তোমার লজ্জা হয় না? এ সব কথা খুবই শান্ত স্বরে আস্তে আস্তে বলল শ্যামশ্রী। যেন বিশ্লেষণ করছে, বোঝাচ্ছে, জানতে চাইছে। শিক্ষয়িত্রীর মতো ভঙ্গিতে।

অনেক দিনের গভীর আক্রোশ জমে জমে তাল পাকিয়ে আছে রেবন্তর ভিতরে। বনার প্রতি গোপন ভালবাসা, কুঞ্জর প্রতি আক্রোশ, শ্যামশ্রীর প্রতি ঘৃণা। সে একদম স্বাভাবিক নেই। কান মাথা জুড়ে তীব্র

যন্ত্রণা ফেটে পড়ছে। বাইরে চলমান হাওয়ায় সাইকেলের চাকাটা ঘুরে যাচ্ছে অবিরল। ফ্রি হুইলের কির কির শব্দ আসছে।

শ্যামশ্রীর দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনতে শুনতে ভিতরে আক্রোশের পিণ্ডটা বোমার মতো ফাটল। তার ভেতরে একটা রাগে উন্মাদ পাগল চেঁচাল—প্রতিশোধ নাও, প্রত্যাঘাত করো।

দাঁতে দাঁত ঘষল রেবন্ত। সন্ধেবেলা কুঞ্জকে খুন করতে গিয়ে পারেনি, এখন সেই আক্রোশটা তার সমস্ত শরীরকে জাগিয়ে তোলে। ভিতরের পাগলটা চেঁচায়—লণ্ডভণ্ড করে দাও ওকে। শেষ করে দাও।

শ্যামশ্রী ঘরের মাঝখানটায় ভাল মানুষের মতো অবাক চোখে চেয়ে দেখছিল রেবন্তকে। রেবন্ত আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। মারবে? মারুক। শ্যামশ্রী মারকে ভয় খায় না। গান্ধীজিও কি মার খাননি? শ্যামশ্রী এক পাও নড়ল না।

রেবন্ত সামনে এসে দু হাতে খামচে ধরল তার কাঁধ। তীব্র গরম শ্বাস মুখে ফেলে বলল—তুমি আমাকে শেখাবে?

বলে একটা ঝাঁকুনি দিল শরীরে। শ্যামশ্রী শরীর শক্ত করে বলল—দরকার হলে শেখাব। চোখ রাঙিও না, আমি তোমাকে ভয় পাই না।

—পাও না? এক অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে অবাক গলায় বলে রেবন্ত। ভিতরের পাগলটা চেঁচায়—ছিঁড়ে নাও পোশাক। মারো। ধর্ষণ করো। শেষ করো।

শ্যামশ্রীর আঁচল খসে পড়েছিল। বড় বড় চোখে ভয়হীন ঘৃণায় সে দেখে রেবন্তকে। রেবন্তও দেখে ওই নরম চেহারার অহংকারী জেদি মেয়েটাকে।

কয়েক পলক তারা এরকম রইল। তারপরই রেবন্ত হঠাৎ শ্যামশ্রীর সবুজ উলের ব্লাউজের বড় বড় বোতামগুলো হিংস্র আঙুলে খুলে ফেলতে লাগল।

প্রাণপণে বাধা দিল শ্যামশ্রী। দুহাতে ঠেকাচ্ছে রেবন্তর হাত, বলছে—কী করছ! ছাড়ো, ছাড়ো।

প্রবল ঘৃণা, আক্রোশ আর ভীষণ খুন করার ইচ্ছেয় পাগল রেবন্ত একটা চড় কষাল শ্যামশ্রীর গালে। চাপা গলায় বলল—চুপ। খুন করে ফেলব।

শ্যামশ্রী কী করবে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার সব আবরণ খসিয়ে ফেলে রেবন্ত। প্রায় হিঁচড়ে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে ফেলে বিছানায়। চুলের মুঠি চেপে ধরে শুইয়ে দেয়। তারপর কামড়ে ধরে ঠোঁট। দাঁতে চিবিয়ে রক্তাক্ত করে দিতে থাকে। দাঁত বসায় গাল, স্তনে, গলায়। প্রবল ব্যথায় গোঙাতে থাকে শ্যামশ্রী। চেঁচায় না। দরদালানের দরজা এখনও খোলা। চেঁচালে কেউ এসে পড়বে। তাই ভয়ে, আতঙ্কে, লজ্জায় যতদূর সম্ভব নীরবে সহ্য করার চেষ্টা করে।

রেবন্ত নয়, যেন ন্যাংটো এক পাগল হামলে পড়ে তার ওপর। সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে থাকে। শ্যামশ্রী বুঝতে পারে, রেবন্তর শরীরের ভিতর থেকে যে কাঁপুনি উঠে এসে তাকেও কাঁপাচ্ছে তা ঠিক দেহমিলনের উত্তেজনা নয়, প্রেম নয়। বহুদিনের পুঞ্জীভূত রাগ প্রতিশোধ নিচ্ছে মাত্র। এ হল ধর্ষণ, বলাৎকার।

শান্ত, সংযত, পাথরের মতো শক্ত শ্যামশ্রীকে প্রবল হাতে পায়ে দাঁতে থেঁতলে নিষ্পেষিত করে, নিংড়ে নিতে থাকে রেবন্ত। একদম ছোটলোক বর্বরের মতো হতে পেরে সে তীব্র আনন্দ পায়। এই শাস্তি বহু দিন হল পাওনা হয়েছে শ্যামশ্রীর। দাঁতে দাঁত চেপে আছে শ্যামশ্রী, চোখ উর্ধ্বমুখী, শরীর দিয়ে খানিকক্ষণ প্রতিরোধ করেছিল, এখন ছেড়ে দিয়েছে সব। ওর মুখে গরম শ্বাস ফেলে চাপা গলায় রেবন্ত মাঝে মাঝে হুংকার দেয়—চুপ! খুন! খুন করে ফেলব। একবার অস্ফুট স্বরে শ্যামশ্রী বলেছিল—তাই করো। এর চেয়ে সেটা ভাল। রেবন্ত তক্ষুনি কনুই দিয়ে নির্মমভাবে চেপে ধরেছে ওর মুখ।

দরদালানের দরজা হাট করে খোলা। বাইরের বারান্দায় প্রবল বাতাসে কিরকির করে ঘুরে যাচ্ছে সাইকেলের চাকা।

শ্যামশ্রীকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে যখন উঠে বসল রেবন্ত তখন অবসাদে সে টলছে। তবু কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এসেছে তার। উঠে গিয়ে দরদালানের খোলা দরজা বন্ধ করে খিল দিল। বিছানার দিকে চেয়ে

সে দেখল, শ্যামশ্রী তার শরীর ঢাকা দেয়নি। উপুড় হয়ে পড়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফোঁপাচ্ছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় অমানুষিক গলায় গোঙানির শব্দ করছে।

এক মুহূর্তের জন্য যেন কী করবে ভেবে পেল না রেবন্ত। কাউকে ডাকবে? পরমুহূর্তেই মনটা কঠিন হয়ে গেল তার। এইটেই তো সে চেয়েছিল। ঠিক এইভাবে বর্বরের মতো ওকে ধ্বংস করতে।

রেবন্ত বাইরের বারান্দার দরজা খুলল। মুখ ফিরিয়ে হিংস্র গলায় বলল—আমি যাচ্ছি। দরজাটা দিয়ে দাও।

বলতে বলতেই সে লক্ষ করে বিছানার গোলাপি ঢাকনায় রক্তের ফোঁটা পড়েছে অনেক। শ্যামশ্রীর মুখের ওপর এলো চুলের ঝাপটা এসে পড়েছে। গভীর যন্ত্রণায় গুমরে মুখটা ফেরাতেই দেখা গেল তার রক্তাক্ত ঠোঁটে, গালে গভীর ক্ষত। স্থির চোখে আরও একটু চেয়ে থেকে রেবন্ত ওর বুকে আর কাঁধে তার নিজের দাঁতের কামড়ে ফুলে ওঠা চাকা চাকা দাগও দেখতে পায়।

রেবন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারল না। তার মনে হল, সে চলে গেলেও শ্যামশ্রী উঠবে না। ঢাকবে না নিজেকে। ঠিক ওইভাবেই পড়ে থাকবে, যাতে বাড়ির লোক এসে তাকে দেখতে পায়। যদি দেখতে পায় তবে রেবন্তর কীর্তির কথাটা চাউর হয়ে যাবে। শ্যামশ্রীর গায়ের সমস্ত ক্ষতচিহ্ন সাক্ষ্য দেবে তার বর্বরতার। শ্যামশ্রী ঠিক তাই চাইবে।

খাটের কাছে গিয়ে রেবন্ত লেপটা টেনে শ্যামশ্রীর শরীরটা ঢেকে দিল। স্থির দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল একটু, তারপর বলল—আমি যাচ্ছি।

জবাব নেই। শুধু গুমরে ওঠার শব্দ হয়। কান্নার একটা ঝলক তরঙ্গের মতো বয়ে যায় শ্যামশ্রীর ওপর দিয়ে। কিন্তু সেই কান্নাও বড় অস্ফুট। বলতে কী শ্যামশ্রীকে কাঁদতে প্রায় কখনওই দেখেনি রেবন্ত। যত যাই হোক, শান্ত ও কঠিন শ্যামশ্রী কখনওই কাঁদে না। তাই নিজেকে একটু বোকা বোকা লাগে রেবন্তর। তার ভিতরের গরমটা কমে গেছে। অস্বাভাবিক রাগটা আর নেই। মাথা আর কানের যন্ত্রণার সঙ্গে গভীর একটা ক্লান্তি টের পাচ্ছে সে। এক একবার মনে হচ্ছে, এ কাজটা ভাল হল না।

কিন্তু শ্যামশ্রী আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। কান্নায় ভেসে গেল না সে। কিছুক্ষণ পড়ে থেকে দাঁতে দাঁত চেপে ধীরে ধীরে উঠে বসল। চুলগুলো সরিয়ে দিল মুখ থেকে। মস্ত মস্ত চোখে গভীর ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখল একবার রেবন্তকে। ঠোঁটের রক্ত ঘন হয়ে থকথক করছে, ফুলে ঝুলে পড়েছে ঠোঁট। গালের দু জায়গায় কামড়ের দাগ ঘিরে লালচে বেগনি কালশিটে। চেনা মুখটা অচেনা আর ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে।

আস্তে উঠে দাঁড়ায় শ্যামশ্রী। ধীরে ধীরে পোশাক পরে। রেবন্তর দিকে তাকায় না।

রেবন্ত বাইরের দরজার কাছে গিয়ে ছিটকিনির দিকে হাত বাড়িয়ে আবার বলল—যাচ্ছি।

শ্যামশ্রী মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তারপর ওই বীভৎস ফোলা, প্রচণ্ড ব্যথার ঠোঁটেও একটু হাসল। সে হাসিতে বিষ মেশানো। উত্তেজনাহীন, অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলল—তবু যদি মুরোদ থাকত মেয়েমানুষকে ঠাণ্ডা করার! যদি সেই ক্ষমতাটুকুও দেখাতে পারতে!

রেবন্ত তার পাগলা রাগের চোখে চেয়ে থাকে শ্যামশ্রীর দিকে। শ্যামশ্রী তার বড় ঠাণ্ডা চোখে চাউনিটা ফেরত দিয়ে বলে—কত বীরত্ব তোমার!

রেবন্ত দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। আর একটুক্ষণ এ ঘরে থাকলে সে শ্যামশ্রীর গলা টিপে ধরবে হয়তো।

সাইকেলের চাকাটা কির কির করে ঘুরে যাচ্ছে। রেবন্ত সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ছাদের ঘরে উঠে যায়। পিছনে মৃদু শব্দে শ্যামশ্রীর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

৭

এই যে এত সব বানিয়েছে মানুষ, বাড়িঘর আসবাবপত্তর, আর ওই যে গাছপালা, প্রকৃতির জগৎ, এ সব একটা বেড়ালের চোখে কেমন দেখায়? সে তো বোঝে না কেন এই ঘর বারান্দা, খাট, গদি, কাঠের চেয়ার। সে জানেও না এ সবের দাম বা উপযোগ। তবু সে তো দেখে। কেমন দেখে? কী বোধ

করে সে? সে কি অনুভব করে আকাশের নীল, সূর্যের আলো? সে কি লজ্জা পায় মহিলার নগ্নতা দেখে?

রাজু নিবিষ্টমনে পায়ের কাছের বেড়ালটার মাথায় পায়ের চেটো ধীরে ধীরে বুলিয়ে দেয়। মনে মনে প্রশ্ন করে—কেমন রে তুই? তোর চোখ, মন, বুদ্ধি দিয়ে দেখলে কেমন দেখাবে জগৎটাকে? সে কি খুব অন্যরকম? যদি তোর চোখ দিয়ে দেখি তবে কি এই বাড়িঘর হয়ে যাবে পাগলাটে হাস্যকর এক নকশার মতো? অর্থহীন কিছু ধাঁধা? আকাশের নীল রং দেখা যাবে না? জ্যোৎস্না যে সুন্দর তা বুঝতেও পারব না নাকি?

তবে সে কেমন হবে? ভাবতে ভাবতে খুব নিবিড় হয়ে এল রাজুর চিন্তাশক্তি। অল্প অল্প করে সে নিজের ভিতরে একটা বেড়ালের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল। বেড়ালের কার্যকারণ জ্ঞান নেই। সে জানে না, বীজ থেকে গাছ হয়। সে জানে না ঘরবাড়ি তৈরি করে মানুষের শ্রম ও বুদ্ধি, সে বোঝে না যুক্তির বিচারে সৌন্দর্যের সার্থকতা। তার জগৎ কেবল গন্ধ, শব্দ ও জৈব বোধ দ্বারা আচ্ছন্ন। অসীম অজ্ঞানতা তার। সুতরাং বেড়ালের চোখে গোটা জগৎকে দেখতে হলে সব বোধ বুদ্ধি ও যুক্তির বিচার ভুলতে হবে। প্রাণপণে রাজু সেই চেষ্টাই করতে থাকে।

ঝোড়ো হাওয়ার মুখে মুখে কখন উড়ে গেছে মেঘ! মাঝরাতে ভাঙা ভুতুড়ে এক চাঁদের কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্নায় চারদিকে গহীন প্রেতরাজ্য জেগে ওঠে। সঞ্চিত জল ঝরে পড়ছে টুপ টাপ টিনের চাল থেকে, গাছের পাতা থেকে। কী শব্দহীনতার শব্দ। উঠোন জুড়ে টলটলে জলের গাঙ।

মেঘ কেটে এক মরুণে ঠাণ্ডা পড়ল চারদিকে। এত শীত যে শরীর পাথর হয়ে যায়। কান-মুখ কম্বলে ঢেকে বারান্দার চেয়ারে বসে পাথর হয়েই থাকে রাজু। এখন বাতাসের শব্দ নেই, মানুষের শব্দ নেই। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সে পা দিয়ে বেড়ালটাকে ছুঁয়ে খুব ধীরে ধীরে বেড়ালের চেতনার মধ্যে ডুবে যেতে থাকে।

ক্ষয়া চাঁদটার দিকে চেয়ে সে ভাবে—বেড়ালের চোখে চাঁদের কোনও অর্থ নেই, নাম নেই, বস্তুজ্ঞান নেই। তা হলে কেমন? চাঁদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে রাজু। ক্রমে ক্রমে বোধ বুদ্ধি, যুক্তি বিচার ও বস্তুজ্ঞান ডুবে যেতে থাকে। হঠাৎ চমকে সে দেখে, আকাশটা এক্সরে প্লেটের মতো স্বচ্ছ, কালো। তার একধারে লাল, রাগি, আগুনের মতো আকারহীন চাঁদ। গ্রহ নক্ষত্র সবই লম্বাটে, আগুনের মতো। চারদিকে ভুসো ছাইরঙা অন্ধকার। কিন্তু তাতে পরিষ্কার বেড়ালের চোখে সে দেখতে পায় লালচে গাছ, লালচে পাতা। অনেক পোকামাকড়ও নজরে আসে তার এই অন্ধকারে।

বুদ্ধিকে আরও ত্যাগ করতে থাকে রাজু। ছেড়ে দিতে থাকে মানুষের বস্তুজ্ঞান। বেড়ালের আত্মীয় হতে থাকে। শুধু চৈতন্যটুকু জেগে থাকে তার। শুধু অনুভব। অনেকক্ষণ চোখ বুজে মনকে স্থির রাখে সে। অনেকক্ষণ। গভীরভাবে ভাবতে থাকে—আমি বেড়াল। আমি বেড়াল। আমি বেড়াল।

ভাবতে ভাবতে ভাবতে হঠাৎই মানুষের বোধবুদ্ধি নিভে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, সে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাণী। তার গোষ্ঠী নেই, সমাজ নেই, রাষ্ট্র নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। চারদিকে যে রং ও রূপের ঐশ্বর্যময় জগৎ ছিল তা মুছে গেছে। তার নাকে আসে বিচিত্র সব গন্ধ যা কোনওদিন মানুষ হিসেবে সে টের পায়নি। তার সজাগ কানে এসে পৌঁছোয় অদ্ভুত সব দূর ও কাছের আওয়াজ। সামনে মস্ত গাছের মগডালে ঘুমের মধ্যে একটা পাখি একটু নড়ল বুঝি, সেই শব্দও তার কানে আসে। কোনও স্মৃতি নেই, শুধু মস্তিষ্কের কিছু নির্দেশ কাজ করে তার মধ্যে। কোনও চিন্তা নেই, শুধু ক্ষুধা ভয় ও প্রীতি মুহূর্তের অনিশ্চয়তার বোধ আছে মাত্র। অবাক হয়ে সে দেখে, চারদিকে সব কিছুই আমূল বদলে গেছে। ভারী গোলমেলে সব নকশা, নানা আকার ও আকৃতি, অদ্ভুত সব রং। লাল, গাঢ় লাল, ফিকে লাল, কালো, আবছা কালো, বেগুনি। নাকের কাছে দিপ দিপ করে একটা পোকা জ্বলে আর নেভে। পোকাটাকে খুবই স্পষ্ট দেখতে পায় সে। তার মুখ চোখ পাখনার গতি কিছুই নজর এড়ায় না। একদৃষ্টে চেয়ে সে একটা থাবা দেয়। পোকাটা ওপরে উঠে যায়। নিস্পৃহ লাগে তার। সামনে একটা সমতল, তারপর নিচু, তারপর আবার সমতল। ওদিকে একটা দরজা খুলে যায়। লম্বাটে এক প্রাণী বেরিয়ে এসে দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলে। তার কানে গমগম করে শব্দটা। তবে সে বোঝে, এ শব্দে তাকে ডাকা হচ্ছে না। সে জানে, অদ্ভুত একটা শব্দ আছে, যে শব্দ হলেই তাকে কাছে যেতে হবে। সে খাবার পাবে, বা

কোলের ওম আর আদর।

রাজু চেয়ে থেকে বুঁদ হয়ে যায়। বেড়ালের চোখে আশ্চর্য এক পৃথিবী দেখতে থাকে। এ যেন দুরূহতম ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকলা। একদিকে চৌকো কিউবিক সব আকৃতি। অন্যদিকে গলে পড়ছে জ্যাবড়া রং। রঙের সঙ্গে আলোর মিশেল। খুব কাছের সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পায় সে। একটা পিঁপড়ে হাঁটছে তার থাবার ওপর। কেঁচো বাইছে খুঁটির গায়ে। কিন্তু কেঁচো বা পিঁপড়ে বলে সে চিনতে পারে না এদের। শুধু জানে, কিছু জিনিস চলে, কিছু স্থির থাকে। রাজু অবাক হয়ে দেখে আর দেখে। সে আর মানুষ নেই, বেড়াল হয়ে গেছে।

খুব কাছ থেকে কে যেন তাকে ডাকছে অনেকক্ষণ, সেই ডাক তার বোধের ভিতরে কোনও ঢেউ তোলে না। তারপর আস্তে আস্তে এক গভীর জলের পুকুর থেকে সে ভেসে ওঠে। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। কিছু বুঝতে পারে না।

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলে—ঘুমিয়ে পড়েছিলি? ভিতরে গিয়ে শুয়ে থাক না। বসে আছিস কেন?

রাজু কথা বলল না। চেয়ে রইল শুধু। তার বেড়ালের বোধ এখনও সবটা কাটেনি।

কুঞ্জর হাতে একটা অচেনা জিনিস। একটু চেয়ে অবশ্য রাজু চিনতে পারে জিনিসটা। হটওয়াটার ব্যাগ।

কুঞ্জ রবারের ব্যাগটা টেনেটুনে দেখছিল। বলল—এটা একটু দ্যাখ তো, চলবে কিনা, বহুকাল পড়ে ছিল ঘরে।

রাজু ব্যাগটা হাতে নিল। বারান্দার আলো জ্বেলেছে কুঞ্জ। রাজু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল—রবার গলে গেছে। গরম জল ভরলেই ভুস করে ফুটো হয়ে যাবে।

—তা হলে অন্য কারও বাড়ি থেকে আনাতে হবে।

কুঞ্জর মুখ কেমন যেন সাদা, চোখে মড়ার মতো দৃষ্টি। মানুষের জগৎ বুদ্ধিতে ফিরে এসে রাজু এখন মাথা ঝাঁকিয়ে বেড়ালের বোধ সবটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল—কেষ্টর বউ কেমন আছে?

কুঞ্জ মৃদু স্বরে বলে—ভাল। টুসিকে সঙ্গে নিয়ে কুঞ্জ কোন বাড়ি থেকে গরম জলের ব্যাগ আনতে যাচ্ছে। রাজু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলে—চল তা হলে তোদের সঙ্গে খানিকটা ঘুরেই আসি।

খানিক পরে কুঞ্জ আর টুসির পিছু পিছু টর্চ আর ভুতুড়ে জ্যোৎস্নার আলোয় জল, এঁটেল কাদা আর গর্তে ভর্তি রাস্তা পেরিয়ে ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটছিল রাজু, তখনও তার মনের মধ্যে নানারকম অস্বাভাবিকতা। কোথায় যাচ্ছে তা বার বার ভুলে যাচ্ছিল সে। কেবলই মনে হচ্ছিল, সামনের দুটো ছায়ামূর্তি কেউ নয়। ওরা এক্ষুনি এগিয়ে যাবে, দূরে চলে গিয়ে হারিয়ে যাবে। তখন একা রাজুকে টেনে নেবে উদ্ভিদের জগৎ। টেনে ধরবে গভীর মাটি। রাজুর গতি হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো। এক জায়গায় সে গাছ হয়ে ডালপালায় বাতাস আর রোদ মাখবে সারা দিন, সারা জীবন।

রাতের আর বেশি বাকি নেই। ধোঁয়াটে কুয়াশা ও জ্যোৎস্নায় মাখা অন্ধকারে রাজু কেবলই পিছিয়ে পড়ছে। একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক উঠে আসে বুকে। ডাকে—কুঞ্জ।

সামনে কুঞ্জ টর্চের মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়। মাঝখানে টুসি। কুঞ্জ বলে—আয়। বড় পিছিয়ে পড়েছিস। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?

রাজু নিজের সব অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি নিপুণভাবে চাপা দিতে চেষ্টা করে আজকাল। বলে, বড্ড পিছল। আমার অভ্যেস নেই তো।

টুসি মায়াভরা গলায় বলে—ইস। আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে রাজুদা। এলেন কেন?

আগে অনেকবার কুঞ্জদের বাড়ি এসেছে রাজু। কোনওদিনই টুসি বা কুঞ্জর অন্য বোনদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। ওরা বড় বাইরের পুরুষের সামনে আসে না। এবার কেষ্টর বউ যমে মানুষে টানাটানির মধ্যে পড়ায় টুসির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। এইভাবেই ভাব হয়, ঘটনার ভিতর দিয়ে, ঘটনায় জড়িত হয়ে, অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে নিতে।

রাজুও প্রাণপণে তাই চায়। পৃথিবীর কোনও-না-কোনও ঘটনার সঙ্গে একের পর এক জড়িয়ে পড়তে। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে সামাজিক হয়ে উঠতে, দায়িত্বশীল হয়ে পড়তে। কিন্তু পারছে না। মনে মনে সে কেবলই ফিরে আসছে ভীষণ ব্যক্তিগত চিন্তায়, সমস্যায়। সে টুসিকে

বলে—এলাম। ভালই লাগছে তো।

প্রাণপণে ওদের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটে রাজু। টুসি সামনে থেকে বলে—রাস্তায় পা দেবেন না। পিছল। ঘাসে পা রেখে আসুন।

কুঞ্জ সামনে থেকে মাঝে মাঝেই টর্চ ঘুরিয়ে ফেলে। বলে—এই তো এসে গেছি।

ফটকে ঢুকে অনেকখানি বাগান পার হয় তারা। তারপর অন্ধকার এক বাড়ির দাওয়ায় ওঠে।

এই তো সেই সুন্দর মেয়েটার বাড়ি। নাঃ? কী যেন নাম মেয়েটার। বনশ্রী। হ্যাঁ, বনশ্রীই।

রাজুর বুক ধক ধক করে ওঠে। প্রেম নয়। এত সহজে আর আজকাল প্রেম হয় না। রাজু জীবনে বহু মেয়ের সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে। তবু যে বুক ধ্বক করে ওঠে তার কারণ অন্য। সে ভাবে—আহা, ওই মেয়েটা যদি আমার বউ হত! ভাবে, তার কারণ আজকাল তার খুব বিয়ের ইচ্ছে হয়। প্রেম বা কাম বা গেরস্থালির জন্য নয়। সে চায়, সারা রাত তার একজন সঙ্গী থাক। তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সদাসতর্ক একজোড়া চোখ তাকে নজরে রাখুক। তার কথা ভাবে এমন এক ঘনিষ্ঠ হৃদয় বড় চায় সে।

টুসি দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে থাকে—মাসি! ও মাসি। এই বনাদিদি। চিরু। এই চিরু।

বনশ্রীর ঘুমই সব চাইতে পাতলা। বরাবর এক ডাকে ঘুম ভাঙে তার।

আজও ভাঙল। টুসির গলার স্বর না? এমনিতে বনশ্রীর ভয়টয় খুব কম। তবু মাঝ রাতে চেনা স্বর শুনেই সাড়া দিতে নেই বা দরজাও খুলতে হয় না। তাই একটু অপেক্ষা করে বনশ্রী।

পাশের ঘর থেকে সবিতাশ্রী পরিষ্কার গলায় বলে ওঠেন—কে রে? কী হয়েছে?

বাইরে থেকে টুসি বলে—মাসিমা, আপনাদের গরম জলের ব্যাগটা নিতে এসেছি। বউদির খুব অসুখ।

—দাঁড়া। দিচ্ছি। বলে সবিতাশ্রী উঠতে যাচ্ছিলেন বোধ হয়।

বনশ্রী লেপ সরিয়ে উঠে পড়ে। বলে—মা, তুমি উঠো না। আমিই উঠেছি।

—বউটার কী হয়েছে জিজ্ঞেস করিস তো। সবিতাশ্রী উদ্বেগের গলায় বললেন।

বাইরের ঘরে এসে বনশ্রী দরজা খোলে এবং একটু সংকুচিত হয়ে পড়ে। টুসির পিছনে কুঞ্জ দাঁড়ানো আর তার পিছনে বারান্দার বাইরে উঠোনের মলিন জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজু।

কপাটের আড়ালে ঘরে এসে বনশ্রী বলে—সাবির কী হয়েছে?

টুসি কলকলিয়ে মিথ্যে কথা বলল, আর বোলো না, পিছল উঠোনে পড়ে গিয়ে খুব লেগেছে।

—সর্বনাশ। বনশ্রী একটু শিউরে ওঠে, তারপর চাপা গলায় বলে—পোয়াতি ছিল যে।

—সেই তো। রক্ষে হল না বোধ হয়।

—দাঁড়া, ব্যাগ এনে দিচ্ছি।

দ্রুতপদে বনশ্রী মায়ের ঘরে ঢোকে। দেয়ালে পুরনো ন্যাকড়ায় বাঁধা ব্যাগটা যথাস্থানে ঝুলছে। এ বাড়িতে সব জিনিস নিখুঁত গোছানো। জায়গার জিনিস সব সময়ে ঠিক জায়গায় পাবে। রবারের ব্যাগটা রাখাও হয়েছে ভারী যত্নে। জল ঝরিয়ে শুকনো করে, ফুঁ দিয়ে একটু হাওয়া ভরে ফুলিয়ে ছিপি এঁটে।

বনশ্রী সেটা এনে টুসির হাতে দিয়ে বলে—কী হবে তা হলে?

—কী করে বলি?

—আমি যাব?

—এত রাতে আর তোমার যেয়ে দরকার নেই। সকালে যেয়ো। যা হওয়ার তো হয়েই গেছে।

—সাবি বাঁচবে তো, ও কুঞ্জদা?

কুঞ্জ চুপচাপ ছিল এতক্ষণ, এবার এক পা এগিয়ে এসে বলল—বেঁচে যাবে।

বনশ্রী কুঞ্জর দিকে চেয়ে বলে—চিকিৎসা আপনি করছেন না তো?

কুঞ্জ ম্লান হেসে বলে—না না। আমার ওষুধে ওরা কেউ বিশ্বাস করে না।

টুসি তাড়া দিয়ে বলে—চলো বড়দা।

ওরা চলে যাওয়ার পরও খানিকক্ষণ বনশ্রী দরজা বন্ধ করল না। দু হাতে দুই পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে মেঘ ভেঙে সামান্য জ্যোৎস্না ফুটেছে। অল্প কুয়াশা। প্রচণ্ড শীত। বনশ্রীর বেশ লাগছিল

চেয়ে থাকতে। এমনিতে দেখার কিছু নেই। সেই রোজকার দেখা একই বাগান, গাছপালা। তবু রঙের একটা অদল বদল, দু-একটা চৌকস তুলির টানে চেনা ছবিটা কত গভীর হয়ে গেছে। রাজু ওদের সঙ্গে এসেছিল কেন তা কিছুতেই ভেবে পায় না বনশ্রী। কেনই বা ওর মন খারাপ!

ঝরঝরে রোদ মাথায় করে ভোর হল। বনশ্রীর দিন শুরু হয় খুব ভোরে। বিছানাপাটি তুলে ঘরদোর গুছিয়ে সে যখন একটু অবসর পেয়ে ভোর দেখতে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল তখনও সে অন্যমনস্ক। সিঁড়ির ধাপে পা রেখে দাওয়ায় বসে সে নিজের একরাশ খোলা চুলের জট ছাড়ায় আঙুলে। আর ভাবে।

বাইরের ঘরে জনা দশ-বারো ছাত্রকে বসিয়ে পড়াচ্ছেন সত্যব্রত। পড়ানোর শব্দ ভাল লাগছিল না বনশ্রীর। খানিকক্ষণ বসে সে উঠে পড়ল। বাগানের ভিতরে বেড়াতে বেড়াতে চলে গেল অনেকটা। নির্জনে একা একা থাকতে ইচ্ছে করছে আজ। অলস লাগছে।

সাইকেলের শব্দে বনশ্রী ফিরে দেখে, ঝকঝকে মুগার পাটভাঙা পাঞ্জাবি, ধোয়া শাল আর ধবধবে সাদা ধুতি পরা রেবন্ত সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে ফটক দিয়ে সোঁ করে ঢুকে পড়ল। এত সকালেও গালের দাড়ি কামানো। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু মুখখানা গম্ভীর।

দেখে একটু আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল বনশ্রী। রেবন্ত অনেকটা এগিয়ে গেছে ভিতরবাগে।

পিছন থেকে বনশ্রী হঠাৎ ডাকল—রেবন্তদা!

সেই ডাকে সাইকেলটা দুটো মস্ত টাল খেল। যেন পড়ে যাবে। পড়ল না অবশ্য। রেবন্ত লম্বা পা বাড়িয়ে ঠেক দিয়ে ফিরে দেখল তাকে।

বনশ্রী হেসে বলল—এত সকালে?

সাইকেলটা হাঁটিয়ে নিয়ে রেবন্ত আস্তে আস্তে কাছে আসে। মুখে হাসির একটা চেষ্টা আছে, কিন্তু আসলে ওর মনে যে হাসি নেই তা দেখলেই বোঝা যায়।

হালকা হওয়ার জন্যই বনশ্রী বলল—একেবারে জামাইবাবু সেজে এসেছেন যে! ওমা। কী সুন্দর দেখাচ্ছে।

ফর্সা রেবন্তর মুখটা লাল হল একটু। গলা সামান্য ভাঙা, একটু কাশি আছে সঙ্গে। সেই গলাতে বলল—আমি একটা কথা জানতে এসেছি বনা।

কথার ধরনটা খুব ভাল লাগল না বনশ্রীর। একটু যেন ছাইচাপা আগুনের মতো রাগ ধিকিধিকি করছে ভিতরে। বনশ্রী মুখে হাসি টেনে বলল—কী কথা বলুন তো।

—শ্যামা আমাকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করে কেন?

বনা তার মস্ত এলোচুলের ঝাপটার আড়াল থেকে বড় বড় চোখে চেয়ে বলল—আবার ঝগড়া করেছেন আপনারা?

—কী করব? ও যে আমাকে কথায় কথায় অপমান করে। বনা, তোমরা সবাই ভারী অহংকারী।

বনশ্রী শ্বাস ফেলে বলে—হবে হয়তো। আপনি নিজেও খুব কম অহঙ্কারী নাকি মশাই? কাল দুপুরে এসে কেমন ব্যবহারটা করে গেলেন মনে আছে?

জামগাছের নীচে রেবন্ত সাইকেলের ওপর ভর রেখে আধখানা ভেঙে দাঁড়িয়ে। মাথায় কপাল ঢাকা মধু রংয়ের একরাশ ঘন চুলের ঘুরলি ফণা ধরে আছে। দুধ-সাদা শাল, ঝকমকে মুগা আর ফর্সা রঙের ওপর ঝরে পড়ছে অজস্র আলো আর ছায়ার টুকরো। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে ওকে। যেন এই ভোরের আলো থেকে রূপ ধরে এল। কয়েক পলকের রূপমুগ্ধতায় বনশ্রী সম্পর্ক ভুলে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে রেবন্ত যদি বলে—চলো বনা, দুজনে পালিয়ে যাই, তবে বনশ্রী একবস্ত্রে বেরিয়ে যেতে পারে।

মনের ওপর একটু ছায়া ফেলে পাপ-চিন্তাটা সরে যায়। তবু একটু শিহরন থেকে গেল, গা কাঁটা দিয়ে রইল একটু বনশ্রীর। সে কোনওদিন কাউকে ভালবাসেনি, এখনও বাসে না। তবু এ কী?

চাপা অভিমানে টলমল করছে রেবন্তর মুখ। বলল—আমি এ বাড়িতে আসি বলে তোমরা কিছু মনে করো না তো বনা?

বনশ্রী অবাক হয়ে বলে—ওমা! কী মনে করব?

রেবন্ত অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—তবে শ্যামা আমাকে এখানে আসতে বারণ করল কেন?

বনশ্রী মুখ নামিয়ে বলল—দিদিই বা কেন বারণ করবে?

রেবন্তর চোখমুখ আস্তে আস্তে অন্য একরকম হয়ে যায়। ভিতরে কী একটা তীব্র বেদনা বোধ চেপে রাখছে অতি কষ্টে। চোখমুখ ফেটে পড়ছে রুদ্ধ আবেগে। নাকের ডগা লাল, ঠোঁট কাঁপছে। স্খলিত গলায় বলল—আমি কি না এসে থাকতে পারব? বনা, একদিন তোমাকে একটা ভারী গোপন কথা বলার আছে।

বিহ্বল বনশ্রী উন্মুখ চোখে চেয়ে গাঢ় স্বরে বলে—বলবেন।

৮

এন সি সি-র সিনিয়র ক্যাডেট হিসেবে সে যে রাইফেল ব্যবহার করত সেরকম নয়, অথবা সম্বলপুরে শিকার করতে গিয়ে যে থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালিয়েছে সেরকমও নয়, রাজুর হাতের এ রাইফেলটা প্রচণ্ড ভারী, আকারে বিশাল। ব্যারেলটা কামানের মতো মোটা। একটা ডবল ডেকার বাসের দোতলার একদম সামনের সিটে বসে আছে সে, হাতের ভারী রাইফেলের নল সামনের খোলা জানালা দিয়ে বাড়ানো। বাসের দোতলাটা একদম ফাঁকা। সামনে নীচে কলকাতার প্রচণ্ড ভিড়ের রাস্তা। বাসটা হরদম চলছে, স্টপ দিচ্ছে না। রাজু ঝাঁকুনিতে টাল্লা খেয়ে যাচ্ছে, রাইফেলের নল জানালার ওপর ঘর-ঘর করে গড়িয়ে যাচ্ছে তাতে। কিন্তু এরকম হলে চলবে না। রাজু শক্ত হতে চেষ্টা করে। সামনেই জানালা থেকে সাপের লেজের মতো একটা দড়ি দেখতে পায় এবং তাতে একটা টান দেয় সে। নীচে ড্রাইভারের কেবিনে টং করে একটা শব্দ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাসটার গতি কমে আসে।

রাজু রাইফেলটা টিপ করার চেষ্টা করে। তারপর ভাবে—টিপ করার দরকার নেই। এত লোক চারদিকে, গুলি চালালে কেউ না কেউ মরবেই। আর এ কথা কে না জানে যে, সব মানুষই তার শত্রু।

ভাবতে ভাবতে ট্রিগার টেপে রাজু। রাইফেলের কুঁদো ঘোড়ার পিছনের পায়ের মতো লাথি দেয় তাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে বোতলের টাইট ছিপি আচমকা খোলার মতো দম করে শব্দ হয়। রাজু দেখতে পায়, রাস্তায় একটা লম্বা লোক সটান শুয়ে আছে।

টং টং। দুবার দড়ি টানে রাজু। বাস আবার বেটাল হয়ে প্রচণ্ড জোরে ছোটে। রাজু আবার দড়ি টেনে বাসের গতি কমায় এবং খুব লক্ষ্য স্থির করে একটা বেঁটে লোককে মারে। পরের বার মারে একটা মস্তান গোছের ছোকরাকে। গা গরম হচ্ছে তার। টুকটাক এরকম লোক মারতে তার মন্দ লাগছে না। ভিয়েতনামের জঙ্গলে মার্কিন স্নাইপাররা এইভাবেই গাছের ডাল থেকে, ঝোপঝাড় থেকে লুকিয়ে একটা-দুটো করে ভিয়েতকং গেরিলা মারত।

কিন্তু একটা ভারী মুশকিল হল। আগে লক্ষ করেনি রাজু, রাইফেলের নলের মুখটা ফানেলের মতো ছড়ানো। এত বড় মুখ যে, পুরনো আমলের গ্রামোফোনের চোঙের মতো মনে হয়। আর আশ্চর্য এই, সেই চোঙ থেকে লাউডস্পিকারের বিকট শব্দে হিন্দি গান বাজছে। দম মারো দম। কান ঝালাপালা। মাথা গরম হয়ে গেল রাজুর। রাইফেলের ওপরে একটা ঘোড়া টেনে দিল সে। এবার রাইফেলটা হয়ে গেল অটোমেটিক। রাজু ট্রিগার টিপতেই মুষলধারে নল দিয়ে টিরিটিরি টিরিটিরি শব্দে ছুটতে থাকে বুলেট। সেই সঙ্গে পরিত্রাহি গানও বেজে যায়। তুমসে মুহব্বত...প্যার...হাম তুম...এই সব শব্দ গুলিবিদ্ধ হয়েও তার কানে আসে। আর সে দেখে সামনেই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। রাস্তার একধার দিয়ে বয়ে চলেছে চমৎকার একটা কৃত্রিম খাল, তাতে হাঁসগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। আর একদিকে মাইল মাইল বাগান চলেছে। কিছু অস্বাভাবিক লাগে না তার। সে ঠিকই চিনতে পারে, এটাই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। রাস্তার ওপর হাজার হাজার মানুষ লুটিয়ে পড়ছে গুলি খেয়ে। রক্ত, রক্ত আর লাশ। আর, দম মারো দম।

দৃশ্যটা পাল্টে যায়। সে দেখতে পায়, কলকাতার ঠিক মাঝখানে একটা ভীষণ উঁচু কনট্রোল

টাওয়ারে সে বসে আছে। ঘরটা চক্রাকার, চারদিক স্বচ্ছ কাচে ঘেরা। চারদিকে নিচু জটিল সব যন্ত্রপাতি। সুইচ বোর্ডের সামনে কানে হেডফোন লাগানো গোমড়ামুখো কয়েকজন লোক বসে আছে। বাইরে ঝকঝকে রোদে বহু নীচে দেখা যাচ্ছে শহর। কী সুন্দর শহর! কলকাতা যে অবিকল নিউ ইয়র্কের মতো তা এত ওপর থেকে না দেখলে বোঝাই যেত না। আশি-নব্বুই তলা সব বাড়ি, হাজার হাজার, অফুরন্ত। বহু দূরে আকাশের গায়ে অতিকায় তিমি মাছের পাঁজরের মতো হাওড়া ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। ব্রিজের মাথা এত উঁচু যে তাতে মেঘ এসে ঠেকে আছে একটু। হাওড়া ব্রিজ যে এতটাই উঁচু তা তার জানা ছিল না, কিন্তু অবাকও হল না সে। এত বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে মনুমেন্টটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না সে। বহু খুঁজে দেখতে পেল মনুমেন্টটা খুবই কাছে টাওয়ারের পায়ের নীচে পড়ে আছে। গড়ের মাঠ দেখা যাচ্ছে ডানদিকে যেদিকটায় শেয়ালদা স্টেশন। উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর মধ্যে কয়েকটা একটু হেলে আছে। এত সুন্দর শহর, অথচ মাঝখানটায় একটা কাদাগোলা জলের পুকুর। পুকুরের চারধারে কচু বন, মাটির পাড়। রোদে কয়েকটা লোক আর মেয়েমানুষ গায়ে মাটি মেখে হাপুস হুপুস স্নান করছে পুকুরে। পাশে মস্ত বটগাছ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যস্মৃতিতে এই পুকুরটার কথাই বলেছিলেন বটে। আজও পুকুরটাকে বুজিয়ে ফেলা হয়নি দেখে ভারী রাগ হল রাজুর। এত সুন্দর শহরের মাঝখানে ওই নোংরা পুকুর কি মানায়? হেডফোনওয়ালা একজন বলে উঠল—নাউ, ইটস অলমোস্ট দি টাইম। এ কথায় রাজুর চৈতন্য হয়। তাই তো! এ শহরটার আয়ু তো মাত্র আর কয়েক মিনিট। কথা আছে, বেলা বারোটা পাঁচ মিনিটে কলকাতায় হাইড্রোজেন বোমা ফেলা হবে। রাজু ঝুঁকে দেখে, পুকুরে স্নানরত লোকজন ছাড়া শহরটা একদম ফাঁকা। রাস্তাঘাট থম থম করছে। নিঃশব্দে প্রহর গুনছে শহর। পশ্চিম দিকে নীল আকাশে ছোট্ট বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে একটা উড়োজাহাজকে। রুপালি মশার মতো। চোখের পলকে মশাটা মাছির মতো বড় হয়ে উঠল। মাছিটা আরও কাছে আসতেই হয়ে গেল ফড়িংয়ের মতো বড়। তীরের মতো চলে আসছে, পিছনে দুটো টানা ধোঁয়ার লাইন। হেডফোনওয়ালা একটা লোক মাইক্রোফোনে জিরো আওয়ার গুনতে শুরু করে। টেন...নাইন...এইট... সেভেন... সিক্স... ফাইভ... ফোর... থ্রি... টু—উড়োজাহাজ একটা ঝড়ের বাতাস তুলে পলকে মিলিয়ে যায় দিগন্তে। আর হঠাৎ বাঁ দিকে সামান্য একটু ঝলকানি দেখা দেয়। রাজু তাকিয়ে ভাবে, এই নাকি হাইড্রোজেন বোম, ধুস! কিন্তু না। হেডফোনওয়ালা একজন বলে ওঠে—পিছনে তাকান। তাকায় রাজু, আর আতঙ্কে বরফের মতো জমে যায়। পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত এক অতিকায় মহাবৃক্ষের মতো জমাট কালো ধোঁয়া। দিরি দিরি করে সেই ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আরও আরও বিশাল করাল চেহারা নিচ্ছে। একটু গরম লাগছিল বটে রাজুর, কিন্তু একটা লোক একটা টেলিভিশন স্ক্রিনের দিকে চেয়ে বলল—অল ভেপোরাইজড। রাজু ঘুরে দেখে শহরের বাড়ি-ঘর সব ছিটকে আকাশে উঠে কাছে বা দূরে ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে। বাষ্পীভূত অবস্থা কি একেই বলে? শুধু হাওড়া ব্রিজ এখনও আকাশ ছুঁয়ে খাড়া রয়েছে, তার ডগায় এখনও লেগে আছে ছবির মতো স্থির একটু মেঘ। একজন হেডফোনওয়ালা বলে উঠল—আমাদের টাওয়ারের সাপোর্টটা উড়ে গেছে। আমরা এখন শূন্যে, ইন অরবিট। রাজু হাইড্রোজেন বোমার ক্রিয়াকাণ্ড আগে কখনও দেখেনি। এখন খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে কিছু খারাপ লাগছে না। একদিকে ছত্রাকের মতো অতিকায় ধোঁয়ার মিশমিশে কালো মেঘ। সেই মেঘের কোলে কলকাতার সব উড়ন্ত ঘর-বাড়ি। তাদের এই কনট্রোল টাওয়ারের কেবিনটাও নাকি উড়ছে। সে অবশ্য তেমন কিছু টের পাচ্ছে না। কিন্তু সে পরিষ্কার দেখতে পেল, কলকাতার মধ্যিখানে সেই আদ্যিকালের নোংরা পুকুরটার কিছুই হয়নি। তার চারদিকে এখনও সেই কচু বন, মাটির পাড়, একধারে মস্ত বট। মেয়েপুরুষরা এখনও কাদাগোলা জলে ঝুপ ঝাপ স্নান করছে। তারা শুধু এক-আধবার অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর নির্বিকারভাবে স্নান করে যেতে লাগল।

ভীষণ বান আসছে! ভীষণ ঢেউ! কে যে চেঁচাচ্ছিল তা বুঝল না রাজু। কিন্তু বুকের ভিতরে একটা ভয় জলস্তম্ভের মতো খাড়া হয়ে উঠছিল। রেডিয়োতে খুব শান্ত কঠিন গলায় একজন ঘোষক বলে ওঠে: সামুদ্রিক যে ঢেউ কলকাতার দিকে আসছে তার উচ্চতা দেড় শো থেকে দুশো ফুট হতে পারে। রাজু একটা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। যতদূর সে জানে, এ বাড়িটা তাদেরই। দোতলার ব্যালকনির নীচেই একটা নর্দমা। সে দেখে নর্দমার জল হঠাৎ উপচে পড়ে রাস্তা ভাসিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

শুনতে পেল, তাদের কলঘরে এই অসময়ে কল দিয়ে অবিরল জল পড়ছে। বারান্দায় রাখা আধ বালতি জল হঠাৎ ফুলে উঠল, বালতি উপচে বইতে লাগল শানের ওপর। এ কি জলের বিদ্রোহ? এই সব দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ তুলেই সে একই সঙ্গে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। দিগন্তে ও কি মেঘ? আকাশের গায়ে এ প্রান্ত ও প্রান্ত জুড়ে ফ্যাকাশে রঙের ওটা কী তা হলে? ভাবতে হল না। হঠাৎ সে জলের গম্ভীর শব্দ শুনতে পেল। লক্ষ লক্ষ জলপ্রপাতের শব্দ এক করলে যেমনটা শোনায় ঠিক তেমন গম্ভীর গভীর ভয়াল। নীচের রাস্তা থেকে একটা বুড়ো লোক হঠাৎ মুখ তুলে বলল—আগেই বলেছিলুম এ সব জায়গা সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠেছে। যাকে বলে চরজমি। অনেকদিন পই পই করে বলে আসছি এখানে শহর-টহর কোরো না। যার জিনিস একদিন সে-ই নেবে। এখন হল তো। হুঁঃ! বলে বুড়ো লোকটা রাগ করে রাস্তার জল ভেঙে চলতে লাগল। রাজু দেখল, কয়েক পলকের মধ্যেই নালা থেকে গড়ানে জল রাস্তায় হাঁটু অবধি হয়ে গেছে। দিগন্তে সেই জলের পর্দা ক্রমে আরও উঁচু হয়েছে। চলন্ত পাহাড়ের মতো আসছে। কলঘরে জলের শব্দ চৌদুনে উঠে গেল। কলের মুখ সেই তোড়ে ছিটকে মেঝেয় পড়ে লাফাতে লাফাতে চলে এল বারান্দায়। রাজু নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল সেটা। কলঘরে হোসপাইপের মতো জল ঘর ভাসিয়ে বারান্দায় চলে আসছে। বারান্দার বালতিটায় জলের মাতন লেগেছে। টলে টলে, নাচতে নাচতে উপচে পড়ছে তো পড়ছেই। বুড়ো লোকটা কি ঠিক বলেছে? সমুদ্র তার হারানো জমি উদ্ধার করতে আসছে নাকি? কিংবা পৃথিবীর সব জলই বিদ্রোহ করেছে সৃষ্টির প্রথম যুগের মতো পৃথিবী আবার জলময় করবে বলে? এ কি জলের বিদ্রোহ? এই কি বিপ্লব? ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক রাজু আচমকা চেয়ে দেখে সব পশ্চাৎভূমি মুছে তার হাতের নাগালেই চলে এল জলের প্রকাণ্ড দেয়াল। এই তো হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। শব্দ হচ্ছে ল—ল—ল—ল। কী প্রচণ্ড গম্ভীর গভীর শব্দ! মাটি কাঁপছে, বাতাস কাঁপছে। সামনে নিচু একটা ঢেউ ডিগবাজি খেয়ে রোলারের মতো গড়িয়ে আসছে। তার চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে মানুষের যত নির্মাণ আর প্রতিরোধ। সেই রোলারের পিছনেই মহামহিম অতিকায় জলের দেয়াল। ঘোলা মেটে এবড়ো-খেবড়ো অন্ধ হৃদয়হীন ও নির্বিকার। রাজু শক্ত হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। সে ভাবল, এবার বরং আত্মহত্যা করি, এ রকম ভয় সহ্য করা যায় না। ভাবতে ভাবতে সে লাফিয়ে উঠল রেলিঙে। ঝাঁপও দিল, কিন্তু নীচে পড়তে পারল না। তার আগেই জলের ঢেউ লুফে নিল তাকে। কোলে নিয়ে তাকে দোল দিল জল। তারপর আস্তে আস্তে তরঙ্গ থেকে তরঙ্গের মাথায় মাথায় তুলে দিতে থাকল। রাজু ওলট পালট খেতে থাকে। টের পায়, ক্রমে ক্রমে সে জলের মাথায় চড়ে এক অসম্ভব উচ্চতায় চলে যাচ্ছে। এত! এত জল! এই কি মহাপ্লাবন? তীব্র ঘূর্ণির সঙ্গে পাক খেয়ে ছুটে যেতে যেতে হঠাৎ রাজু হাতে পেয়ে গেল একটা কার্নিশ। উঠে পড়ল। দেখে, একটা ছোটমোটো ছাদে জনা কুড়ি কাকভেজা লোক বসে আছে। তাদের মধ্যে একজন বলল—খিচুড়ি হচ্ছে, চিন্তা নেই। রাজুর কথাটা ভাল লাগল। মনে হল, পৃথিবীতে কয়েকটা ভাল লোক আছে এখনও। চারদিকে চেয়ে দেখল, জল ছুটছে নক্ষত্রের বেগে। যেন একটা প্রকাণ্ড জলপ্রপাত শুয়ে পড়েছে হঠাৎ। চারদিকে কিছুই প্রায় নেই। বহু বহু দূরে এক-আধটা বাড়ির ছাদ দেখা যায়। তাতে পিঁপড়ের মতো মানুষ। যে লোকটা খিচুড়ির খবর দিয়েছিল সে এবার বলল—কিন্তু গুনতিতে মেয়েমানুষ বড় কম পড়ে গেল। জল তো কমবেই একদিন, ড্যাঙা জমিও দেখা দেবে। কিন্তু তখন দুনিয়া আবার মানুষে ভরে দিতে অনেক বছর লেগে যাবে। মেয়েমানুষ ছাড়া সে এলেম কারই বা আছে!

পাশ ফিরতেই চটকা ভেঙে রাজু তাকায়, জানালা দিয়ে সাদা ধপধপে একটা রোদের চৌখুপি এসে পড়েছে মেঝে আর খাট জুড়ে। চোখ চেয়েও সে স্পষ্টই সেই জলের শব্দ পাচ্ছিল, সেই উড়ন্ত টাওয়ার আর কলকাতার পথে পথে রক্ত আর লাশ দেখতে পাচ্ছিল স্পষ্ট। এত সত্য, এত স্পষ্ট, এত নিখুঁত কী করে স্বপ্ন হবে? লেপের ভিতরে সে নিজের গায়ে হাত দিয়ে ভেজা ভাব আছে কিনা দেখে। ধাতস্থ হতে অনেক সময় লাগে তার। কোথায় সে আছে তা খুব আস্তে আস্তে মনে পড়ে।

হাতঘড়িতে প্রায় সাড়ে নটা। ভারী লজ্জা করতে থাকে রাজুর। অন্যের বাড়িতে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো! কে জানে কী মনে করবে এরা!

কুঞ্জর বিছানায় থাকার কথা নয়, নেইও। ঘর ফাঁকা। দোর ভেজানো। রাজু খুব স্মার্টভাবে তড়াক করে উঠে পড়ে। যতদূর সম্ভব নিজেকে চারদিকের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে

করতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বাইরে কটকটে রোদের উঠোন, গাছপালা ঘেরা ঘরোয়া বাগান, কুয়ো, কিছু বিষয়কর্মে রত মানুষ। রাজু চারদিকে চেয়ে সবকিছু চিনে নিতে থাকে। হ্যাঁ, এই তো রোদ, মানুষ, গাছপালা। এই তো সব চেনা!

আজকাল প্রতিদিন রাজুকে এই লড়াইটা করতে হচ্ছে। এক কল্পনার থাবা তাকে কেড়ে নেয় মাঝে মাঝে। আবার ছেড়ে দেয় বাস্তবতার মধ্যে। রাজু ভেবে পায় না, সে কি পাগল?

এই নিয়ে তিনবার বনশ্রীর সঙ্গে দেখা হল রাজুর, বেরিয়েই সকালে প্রথম যে মানুষের মুখ দেখল সে বনশ্রী। কেষ্টর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে টুসির সঙ্গে কথা বলছে। গায়ে শান্তিনিকেতনি খদ্দরের চাদর। এত সুন্দর নকশা কদাচিৎ দেখা যায়, মেয়েটার মাথার খোঁপাটা মস্ত বড়। ঘুম থেকে ওঠার পর এই সকালের দিকটায় মুখখানা আরও একটু বেশি লাবণ্য মাখানো, রাজু হাঁ করে দেখছিল। সে মোটেই মুগ্ধ হয়ে যায়নি, প্রেমে পড়েনি, কিন্তু গুলি, হাইড্রোজেন বোমা আর মহাপ্লাবনের পর এই অসম্ভব শান্ত ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথমেই একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ দেখতে বেশ লাগছিল তার। যেন কিছুতেই ঠিক বুঝতে পারছিল না এটা স্বপ্ন, না ওটা।

—রাজুদা, উঠেছেন! বলে টুসি হঠাৎ তর তর করে স্রোতের মতো ধেয়ে এল—দাঁড়ান, মাজন এনে দিচ্ছি। বারান্দার কোণে বালতিতে জল রাখা আছে। বলতে বলতে চড়াই পাখির মতো উড়ে গেল যেন ফুড়ুৎ করে।

এ বারান্দা থেকে ও বারান্দা, মাঝখানে একটু উঠোনের ফাঁকা শূন্যতা। সেই শূন্যতা ভরাট করে বনশ্রী একবার তাকায় রাজুর দিকে। চোখের চাউনির মধ্যে কী দেখল রাজু কে জানে! তার ভিতরে কে যেন ফিস ফিস করে বলে ওঠে, এ মেয়েটা প্রেমে পড়েছে। পাপের ছায়া স্পর্শ করেছে ওকে।

বনশ্রী আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিল। কেমন যেন বিভোর ভাবভঙ্গি ওর। যেন নিজের ভিতরে কিছু প্রত্যক্ষ করছে নিবিড়ভাবে। কূট চোখে চেয়ে দেখে রাজু। বনশ্রী উঠোনে নেমে ধীরে ধীরে গায়ে রোদ মেখে, মাথা নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে চলে গেল।

টুসি একটা সাদা মাজনের শিশি এনে বারান্দায় রেখে আবার উড়ে যেতে যেতে বলে গেল, চা আনছি।

সকালের দৈহিক কাজকর্ম বড় ক্লান্তিকর রাজুর কাছে। মুখ ধোও, কলঘরে যাও, ছোট বাইরে-বড় বাইরে সারো।

ধীরে ধীরে প্রবল অনিচ্ছের সঙ্গে সবই সেরে নেয় রাজু। এর মধ্যেই টুসির অনর্গল কথা শুনে নিতে থাকে। কেষ্ট কাল রাত থেকে হাওয়া, বউদির পেটে রাজপুত্রের মতো ছেলে ছিল, নষ্ট হয়ে গেছে। রাজুদা নাকি আজই চলে যাবেন? সে হবে না।

বাইরের দিকে আলাদা একটা ঘরে কুঞ্জর ডিসপেনসারি। আজ রোদ হাওয়ার দিনে একাই বেরিয়ে পড়বে বলে রাজু ঘরের বার হয়ে ডিসপেনসারির দরজায় একটু দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে অনেকগুলো কাঠের বেঞ্চে বিস্তর ছেলেছোকরা গুলতানি করছে। কয়েকজন বিমর্ষ চেহারার রুগীকেও দেখতে পাওয়া যায়। মাঝখানে একটা চেয়ারে কুঞ্জ বসা, সামনের টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাগজের পুরিয়ায় গুনে গুনে বড়ি ফেলছে। একবার চোখ তুলে রাজুকে দেখে স্মিত হাসি হেসে বলে—উঠেছিস? আয়, বোস এসে।

রাজু বলে—আমি একটু ঘুরে আসছি।

কুঞ্জ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। চলে যেতে গিয়েও রাজু মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। আর চেয়ে থাকতে থাকতেই রাজু হঠাৎ কেমন ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেল। কুঞ্জ যখন তাকাল তখন রাজু কেন একটা মড়ার মুখের মতো ছাঁপ দেখল ওর মুখে? কেন দেখল, ওর চোখের মণি ঊর্ধ্বমুখী এবং স্থির? কেন ওর সাদা ঠাণ্ডা ঠোঁট? পাঁশুটে দাঁত? কেন মনে হল, কুঞ্জর গায়ের চামড়ার নীচে জমাট রক্তের আড়ষ্টতা?

কুঞ্জ কি মরে যাবে? আজ কিংবা কাল?

রাজু ডিসপেনসারির বারান্দা থেকে নেমে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকে। দুর্যোগের পর আজ

চারদিকে এক পুকুর রোদ টলটল করছে। টেরিলিনের মতো মসৃণ নীল আকাশ, চারদিকে গাঢ় সবুজ গাছপালার গহীন রাজ্য। রাজু কিছু ভাল করে দেখছিল না। আজ তার কি কোনও অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল কিংবা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়? নাকি এ সব তার আবোল-তাবোল ভাবনা মাত্র?

সামনে আড়াআড়ি পথ পড়ে আছে। রাস্তায় পা দিয়ে রাজু অনেকক্ষণ ঠিক করতে পারল না, কোনদিকে যাবে। ডানদিকের পথটায় ভারী সুন্দর গাছের ছায়া পড়ে আছে। লোকজন নেই। শুধু একটা একলা কুকুর ল্যাং ল্যাং করে হেঁটে চলে যাচ্ছে। রাজু সেই দিকে হাঁটতে থাকে।

ফাঁকা রাস্তায় রাজু একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছিল। গন্ধটা ভাল না মন্দ তা সে বুঝতে পারছিল না। তবে চারদিক থেকে অজস্র অদ্ভুত সব গন্ধ ভেসে আসছে। তার মধ্যে এই গন্ধটাই তাকে টানছে। বাতাস শুঁকতে শুঁকতে রাজু এগোতে থাকে। অনির্দিষ্টভাবে বেড়াবে বলে বেরিয়ে এসেছে সে, কিন্তু এখন সে স্পষ্ট টের পাচ্ছিল, তার এই গন্ধটা অনুসরণ করে যাওয়া উচিত। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যেতে হবে তাকে।

মাঝে মাঝে উত্তরের শুকনো ঠাণ্ডা বাতাসে গন্ধটা হারিয়ে যায়। থমকে দাঁড়ায় রাজু। চারদিকে চেয়ে প্রবলভাবে শ্বাস টানে। আকুলি ব্যাকুলি করে ওঠে বুক। গন্ধটা হারিয়ে গেল না তো! না, আবার পায়। রাস্তা ছেড়ে ঘাস জমিতে নেমে গাছপালার মধ্যে গন্ধটা খুঁজতে হয় তাকে। সুড়ি পথ ধরে সে তর তর করে এগোতে থাকে। গত রাত্রির জল-কাদায় থকথকে পথটাকে সে গ্রাহ্য করে না। এগোতে হবে। কোথাও পৌঁছোতে হবে।

একটা বাঁশঝাড়ের কোণে ভারী নিস্তব্ধ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পথ ঠিক করতে চেষ্টা করছিল রাজু। সে সময়ে হঠাৎ টের পেল, কাল রাতের মতো আজও সে অন্য এক চোখে পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছে। যেন পিছন দিকে তার লেজ নড়ে উঠল হঠাৎ। কান দুটো খাড়া হল। বুঝতে পারল, সে অবিকল কুকুরের চোখে চেয়ে আছে। রোদ, আলো, হাওয়া কোনওটারই আর কোনও অর্থ নেই তার কাছে। তার আছে এক গন্ধের জগৎ। অনেক বিচিত্র শব্দও পায় সে। বহু অদ্ভুত পোকামাকড় দেখে চারদিকে। মাথার মধ্যে কোনও চিন্তা নেই। আছে শুধু এক গন্ধের নিশানা। শুধু জানে, যেতে হবে। কিন্তু যেদিকেই যাক সেদিকেই পথে পথে বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দেখা হবে বলে টের পায় সে। খুবই সতর্কতা দরকার। বহু বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পায় সে। আলো অন্ধকারের কোনও অর্থ নেই তার কাছে। শুধু জানে কখনও সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কখনও আবছা। চারদিকে এখন সেই স্পষ্টতা। এটা খেলার সময়। সে টের পায় তার কোনও আপনজন নেই। জন্ম বা মৃত্যুর কোনও চিন্তা নেই। অভাববোধ নেই। সে জানে, খুঁজলে খাবার পাওয়া যাবে। দেহের প্রয়োজনে আর একটা দেহ জুটে যাবে ঠিক।

রাজু এগোতে থাকে। গন্ধের রেখাটা মাটির সমান্তরাল এক অদৃশ্য সুতোর মতো চলেছে। কোনও অসুবিধে হয় না। মাঝে মাঝে এক-আধবার ঘুরে পিছনটা দেখে নেয় সে। থমকে দাঁড়িয়ে শব্দ শোনে। কে ডাকল ঘেউ! জবাব দিতে ইচ্ছে হল তার। কিন্তু দিল না। এখন এগোতে হবে।

সুড়ি পথটা একটু আগেই আর একটা পথে মিশে গেছে। সেখানে গন্ধের সুতো তাকে টেনে নেয় একটা মস্ত ঘেরা বাগানের দিকে। বাগানের ফটকের ভিতরে ঢুকে পড়ে রাজু। গন্ধটা এখানে খুব গাঢ়, ঘন, পুঞ্জীভূত।

গাছপালার ভিতরে একটা নির্জন কোণে ফাঁকা সবুজ একটা মাঠের মতো জায়গা। সেখানে চুপ করে নিঝুম হয়ে বসে আছে মেয়েটি। তোলা হাঁটুতে মুখ, ডান হাতে আনমনে ঘাস ছিঁড়ছে। চেয়ে আছে, কিন্তু বাইরের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। দেখছে নিজের ভিতরের নানা দৃশ্য।

গন্ধটা এইখানে মূর্তি ধরে আছে। উন্মুখ রাজু সামনে দাঁড়ায়। তার ছায়া পড়ে মেয়েটির সামনে।

বনশ্রী চমকায় না। ধীরে মুখ তুলে তাকায়। অনেকক্ষণ লাগে তার পৃথিবীতে ফিরে আসতে।

রাজুরও অনেকক্ষণ লাগে কুকুর থেকে মানুষের অনুভূতি ও বোধে জেগে উঠতে।

তারপর দুজনেই দুজনের দিকে ক্ষণকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বনশ্রী ধীরে উঠে দাঁড়ায়, মৃদু স্বরে বলে—আপনি!

যে গন্ধের রেখা ধরে সে এসেছে তার উৎস যে বনশ্রী তা তো রাজু জানত না। কেন সেই গন্ধ তাকে টেনে এনেছে এখানে তাও জানা নেই। কিন্তু মনের মধ্যে জল-বুদবুদের মতো অস্পষ্ট কথা ভেসে

উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। একে কি কিছু বলার আছে রাজুর?

এক বিচারহীন অনুভূতির জগৎ থেকে বুদ্ধির জগতে জেগে উঠেছে রাজু। শহুরে অভিজ্ঞতা আর বোধ-বুদ্ধি খেলে যাচ্ছে মাথায়। চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে সামান্য হেসে সে বলে—আপনাদের বাগানটা বেশ। বেড়াতে বেরিয়ে বাগানটা দেখে বড় লোভ হল, তাই ঢুকে পড়েছি।

বনশ্রী হেসে বলে—বাগানটা এমন কী সুন্দর! এখন আর গাছ-টাছ লাগানো হয় না। এমনি পড়ে থাকে। কত জঙ্গল হয়েছে।

রাজু মাথা নেড়ে বলে—সাজানো বাগান আমার ভাল লাগে না।

সাজানো বাগানের কথায় কী ভেবে মুখ নিচু করে একটু হাসে বনশ্রী। রাজু স্পষ্ট দেখল, বনশ্রীর মুখ থেকে মিষ্টি হাসিটুকু ঝরে পড়ল ঘাসের সবুজে, ফুলের পরাগের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়িয়ে গেল বাতাসে, ওর গা থেকে একটা শ্যামল আলো গিয়ে রোদের সঙ্গে মিশে নরম করে দিল আলোর প্রখরতা। ভারী স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারপাশ। দীর্ঘকাল ধরে কলকাতার নামি কাগজে ইংরিজি আর বাংলায় বুঝে না-বুঝে রাজু আর্ট রিভিউ লিখে আসছে। ছবির চোখ আছে বলেই আবহে ছড়িয়ে যাওয়া হাসিটাকে বুঝতে পারে রাজু। চারদিকে নিবিড় গাছপালার গাঢ় সবুজ, রুপোলি রোদ আর অনেকখানি প্রসারিত ফাঁকা জমির ওপর স্নিগ্ধ শ্যাম মেয়েটির এই ছবি যদি আঁকতে চায় কেউ তবে তাকে খুব বড় দার্শনিক হতে হবে। একটা সবুজ বাগান, কালো মেয়ে বা ফর্সা রোদ এঁকে দিতে পারে যে কোনও ছেঁদো পেইন্টার। গভীর অনুভূতি ছাড়া কী করে টের পাওয়া যাবে এখানে এখন বাতাসের গায়ে রোদের কুঁড়ো ছড়িয়ে রয়েছে? ঘাস থেকে এই যে গাঢ় সবুজ আভা উঠে এসে সবুজে ছুপিয়ে দিল বনশ্রীকে, কে দেখবে তা?

কী করে সাধারণ চোখে বোঝা যাবে, মেয়েটির অনেকখানি গলে মিশে আছে চারপাশের সঙ্গে? কে বুঝবে, পিছনে মস্ত ফাঁকা অনেকখানি ওই যে পটভূমি তা কেন্দ্রাভিগ গতিতে ছুটে আসছে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে? তারা বলছে—সরে যেয়ো না, চলে যেয়ো না! তুমি না থাকলে মূল খিলানের অভাবে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে পটভূমি। সব অন্যরকম হয়ে যাবে।

বনশ্রী মুখ তুলে বলল—কাল সারা রাত আপনাদের ঘুম হয়নি, না? টুসি বলছিল।

টুসি কে মনে পড়ল না রাজুর। কাল রাতে সে কি ঘুমোয়নি? হবেও বা। যা মনে এল তাই বলে দিল রাজু—রাতটা কেটে গেছে কোনওক্রমে। অন্ধকারেই যত গণ্ডগোল। দিনটা কত ফর্সা আর স্পষ্ট।

বনশ্রী মায়াভরা মুখে বলল—বেড়াতে এসে কষ্ট পেলেন। আসবেন আমাদের বাড়িতে? আসুন না, চা খেয়ে যাবেন।

সকালে যখন মেয়েটিকে দেখেছিল তখনও রাজুর মনের মধ্যে একটা কালো বেড়াল হেঁটে গিয়েছিল। এখনও গেল। মেয়েটির মুখের উজ্জ্বলতায় মিশে আছে একটু পাপ। চালচিত্রের মতো ঘিরে আছে। পেখম মেলেছে ময়ূরের মতো। এই উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নয়। দূর থেকে কে যেন আয়নার আলো ফেলার মতো বনশ্রীর মুখে অনবরত প্রক্ষেপ করে যাচ্ছে নিজেকে। কোথায় যেন জ্বালা ধরেছে বনশ্রীর। গেঁয়ো মেয়ে, খুব বেশি ভাববার মতো মাথা নয়। তবু সাজানো বাগানের কথা শুনে হেসেছিল কেন? ও কি এখন একটা সাজানো বাগান ছেয়ে ফেলতে চায় ভয়ঙ্কর বন্যতা দিয়ে? ভাঙতে চায় কারও সাজানো সংসার?

রাজু বনশ্রীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে—চলুন।

৯

উঠতে গিয়ে মাথাটা পাক মারল একটা। টেবিলটায় ভর দিয়ে সামলে নিল কুঞ্জ। শ্বাস কিছু ভারী লাগছে। বুকে অস্পষ্ট ব্যথা।

সাবিত্রীর বাবা এসেছে। ভিতর বাড়িতে একবার যাওয়া উচিত। কিন্তু বড় দ্বিধা আসছে। দিনের আলো, চেনা মানুষজন, কথাবার্তা কিছুই সহ্য হচ্ছে না তার। একটা অন্ধকার ঘরে একা যদি বসে থাকতে পারত কিংবা যদি চলে যেতে পারত অনেক দূরে।

ডিসপেনসারির দরজায় তালা দিয়ে কুঞ্জ খুব ধীর পায়ে যেন হাঁটুভর জল ঠেলে ভিতর বাড়িতে আসে। মুখ তুলে কোনও দিকে চায় না।

সাবিত্রীর ঘরে অনেকের ভিড়। শিয়রের কাছে একটা চেয়ারে সাবিত্রীর বাবা বসে আছে। তাকে ঘিরে মেয়েমানুষেরা একসঙ্গে কথা বলছে সবাই। কুঞ্জ ঘরে ঢুকে সবার পিছনে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ কোনওদিকে চাইতে পারে না। কিন্তু যখন তাকাল তখন যেদিকে, যার দিকে তাকাবে না বলে ঠিক করেছিল তার মুখের ওপর সোজা গিয়ে পড়ল চোখ।

অত ভিড়ের মধ্যেও ফাঁক ফোঁকর দিয়ে সাবিত্রীর অপলক চোখ তার দিকেই চেয়ে আছে। ঠোঁট সাদা, মুখ ফ্যাকাশে, বসা চোখের কোলে দুই বাটি অন্ধকার টলটল করছে। তবু সবটুকু প্রাণশক্তি দিয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে সাবিত্রী। লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, অপরাধবোধ নেই, ধরা পড়বার ভয়ও নেই একরত্তি। কুঞ্জর কাছ থেকে ও কোনও আশ্বাস চায়নি, বিপদ থেকে বাঁচাতে বলেনি, কোনও নালিশ নেই ওর। কুঞ্জর কেমন যেন মনে হয়, সাবিত্রী মানুষকে কুঞ্জর সাথে তার সম্পর্কের কথা বলে দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। ওকে বোধহয় ঠেকানোও যাবে না। ও কেমন? বেহেড? মেয়েমানুষের কীই বা জানে কুঞ্জ! ওরা যখন বেহেড হয় তখন বুঝি এরকমই হয়। কই, তনু কোনওদিন কারও জন্য হয়নি তো। বরং নাড়ি টিপে, বুকের স্পন্দন শুনে, রক্তচাপ পরীক্ষা করে ডাক্তাররা যেমন রুগীকে যাচাই করে তেমনি আবেগহীন ঠাণ্ডা মাথায় তনু তার প্রেমিকদের যাচাই করেছে। মেয়েমানুষ সম্পর্কে ভুল ধারণাটা কুঞ্জর মনে গেঁথে দিয়েছিল সে-ই। ধারণাটা ভাঙল। যদি বেঁচে থাকে কুঞ্জ তবে আরও কত ধারণা ভাঙবে, আরও কত শিখবে সে।

সাবিত্রীর স্থির তাকিয়ে থাকা দেখে কুঞ্জ চমকায় না। কেবল তার ভিতরটা নিভে যায়। ঠাণ্ডা এক আড়ষ্টতা শরীরে আস্তে আস্তে নেমে আসে। ভালবাসা কত বিপজ্জনক হয়!

কুঞ্জ দাঁড়ায় না। বেরিয়ে আসে। পিছন থেকে এসে তার সঙ্গ ধরে সাবিত্রীর বাবা। একটু গা শিরশির করে ওঠে কুঞ্জর। ভয়-ভয় করে। বেহেড সাবিত্রী কিছু বলেনি তো! মুখে চোখে তেমন উদ্বেগ নেই, একটু চিন্তার ভ্রূ কোঁচকানো রয়েছে কেবল। বার-বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল—নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ওর মার হার্টের ব্যামো, দেখবে কে? যেমন আছে থাক, বরং তুমিই দেখো।

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলে—কদিন ঘুরে এলে পারত।

বলতে গিয়ে সে টের পায়, কখন গলাটা যেন ধরে গেছে।

সাবিত্রীর বাবা মাথা নেড়ে বলে—বাড়িতে ওকে দেখবার কেউ তো নেই। এখানে তোমাদের বড় পরিবার, দেখার লোক আছে। আমার সবচেয়ে বড় ভরসা অবশ্য তুমি।

কুঞ্জ মুখ নিচু করে থাকে, বলে—এখন কিছুদিন বাইরে গেলে ওর মনটা ভাল হবে। শরীরটা—

সাবিত্রীর বাবা ঝাঁকি দিয়ে বলে—এ অবস্থায়? পাগল হয়েছ? ওর মার চিকিৎসা করাতেই আমি ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছি। ঘন ঘন ই সি জি, ওষুধ; সাবি নিজেও তো যাওয়ার কথায় তেমন গা করল না। বলল, এখানে তাকে দেখার লোক আছে।

কুঞ্জর আর কী বলার থাকতে পারে? চুপ করে রইল। সাবিত্রী যাচ্ছে না। তার মানে, সাবিত্রী রইল।

বার-বাড়িতে রওনা হওয়ার মুখে একটু দাঁড়িয়ে সাবিত্রীর বাবা বলে—কেষ্টকে আজ সকালেই বাগনান স্টেশনে দেখা গেছে জান বোধ হয়?

কেষ্টর নাম কানে আসতেই বুকটা হঠাৎ ক্ষণেকের জন্য পাথর হয়ে যায়। কথা বলতে গলাটা কেঁপে গেল—না তো।

—আমার দুজন ছাত্র দেখেছে। বলছিল। বোধহয় ট্রেন ধরে কলকাতা কি আর কোথাও পালাল। খবরটা সময়মতো পেলে ধরতাম গিয়ে।

পালিয়েছে! কেষ্ট পালিয়েছে। তা হলে কেষ্টর সঙ্গে এখন মুখোমুখি হতে হবে না তাকে! কুঞ্জর মনটায় একটা ভরসার বাতাস দোল দেয়। যদি পালিয়ে থাকে তবে এখনও খুব বেশি লোককে বলে যেতে পারেনি কেষ্ট। খুব বেশি দুর্বল করে দিয়ে যায়নি কুঞ্জর ভিত। পরমুহূর্তেই কুঞ্জর মনের মধ্যে লুকোনো কাঁটা খচ করে বেঁধে। কেষ্ট নয়, কেষ্টর চেয়ে ঢের বেশি বিপজ্জনক সাবিত্রী।

বাগনানের স্কুলমাস্টার বিদায় নিলে কুঞ্জ খুব আস্তে আস্তে একদিকে হাঁটতে থাকে। আর গভীর

চিন্তায় ডুবে যায়।

এই যে এইখানে মস্ত পিপুল গাছ, বহুকাল আগে ছেলেবেলায় এই গাছের তলায় একটা সাদা খরগোশ ধরেছিল কুঞ্জ। খরগোশটা তেমন ছুটতে পারছিল না, একটু যেন খুঁড়িয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে থিরিক থিরিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দামাল কুঞ্জ তাড়া করে করে ধরে সোজা বুকের মধ্যে জামার তলায় চালান করে দিল। আঙুলে কুটুস করে কামড়ে দিয়েছিল খরগোশটা। আজও খুঁজলে ডানহাতের কড়ে আঙুলে স্পষ্ট দাগটা দেখা যাবে হয়তো। কামড় খেয়েও ছাড়েনি। বুকের মধ্যে কী নরম হয়ে লেগে ছিল খরগোশ। নরম হাড়, তুলতুলে শরীর, চিকন সাদা লোম, চুনি পাথরের মতো লাল চোখে বোতামের ফাঁক দিয়ে দেখছিল কুঞ্জকে। চেয়ে কুঞ্জ মুগ্ধ হয়ে গেল। মনে হল—এ আমার। দিন দুই তাদের বাড়িতে ছিল খরগোশটা। রজনীগন্ধা ফুল খেতে ভালবাসত খুব, কাঠের বাক্সে ঘুমোত। তারপর খবর হল ভঞ্জবাড়ির খরগোশ পালিয়েছে। লোকে খুঁজছে। কুঞ্জর মা খবর পাঠিয়ে দিতে বড় বাড়ির চাকর এসে নিয়ে গেল একদিন। খুব কেঁদেছিল কুঞ্জ। গভীর দুঃখের ভিতর দিয়ে বুঝতে শিখেছিল, এ পৃথিবীতে কিছু জিনিস তার, কিছু জিনিস তার নয়।

এই দিকটা ভারী নির্জন। ভাঁট জঙ্গলের আড়াল। পিপুলের ছায়ায় ভেজা মাটিতে বসে সামনে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে উদাস মাঠখানার দিকে চেয়ে থাকে কুঞ্জ। কী জানি কেন, আজ সেই খরগোশটার কথা তার বড় মনে পড়ছে। কিছু জিনিস তার, কিছু জিনিস তার নয়—এ কথা ভঞ্জদের খরগোশের কাছে শিখেছিল কুঞ্জ। যখন রাত্রিবেলা সব সম্পর্কের বাঁধন ছিড়ে নিশি-পাওয়া সাবিত্রী আসত তার কাছে তখন সে কি জানত না, এ হল কেষ্টর বউ? তার নয়?

একটা নোংরা কাদামাখা রোগা ডেঁয়ো পিপড়ে তার গোড়ালি বেয়ে উঠে আসছে। পায়ের লোমের ভিতর দিয়ে বাইছে সুড়সুড় করে। হঠাৎ ঘেন্নায় রি-রি করে ওঠে কুঞ্জর গা। পিপড়েটা ঝেড়ে ফেলে সে ওঠে, দাঁড়ায়। সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমোয়নি কুঞ্জ, তার ওপর রাতে অত ভিজে ঠাণ্ডা বসেছে বুকে। হঠাৎ দাঁড়ালে, হাঁটতে গেলে টলমল করছে মাথা। ডান বুকে একটা ব্যথা থানা গেড়ে বসে আছে কখন থেকে। গায়ে কিছু জ্বরও থাকতে পারে।

কিন্তু শরীরের এই সব অস্বস্তি ভাল করে টেরই পাচ্ছিল না কুঞ্জ। এঁটেল কাদায় পিছল আলের রাস্তায় ভাঙা জমি আর কখনও আগাছা ভেদ করে হাঁটছে সে। এই পষ্টাপষ্টি আলোয় যতদূর দেখা যায়, এই তেঁতুলতলা বেলপুকুর শ্যামপুর জুড়ে গোটা চত্বরকে সে শিশু বয়স থেকে জেনে এসেছে নিজের জায়গা বলে। এইখানেই তার জন্ম, বেড়ে ওঠা। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ চেনাচেনি। কিন্তু এখন তার কেবলই মনে হয়, এ সব তার নিজের নয়। এ বড় দূরের দেশ। এখানে বিদেশি মানুষের বাস। এ তো তার নয়।

মাথার মধ্যে বিকারের মতো অসংলগ্ন সব চিন্তা ভিড় করে কথা কইছে। একবার যেন সে তনুকে ডেকে বলল—তোমার জন্যেই তো। কোনওদিন বুঝতে দাওনি যে, তুমি আমার নও। যখন পরের জিনিস হয়ে গেলে তখনও মনে হত, তুমি আমার, অন্যের কাছে গচ্ছিত রয়েছ। ভাবতুম একদিন খুব বড় হব, নাম ডাক ফেলে দেব চারদিকে, সেদিন বুঝবে তুমি কাকে ছেড়ে কার ঘর করছ। বুঝলে তনু, আমাদের শিশুবয়স কখনও কাটে না। কোনটা আমার, কোনটা নয় তা চিনতে এখনও বড় ভুল হয়ে যায়।

নিচু একটা জমিতে জল জমে আছে এখনও। কুঞ্জ জলে নামবার মুখে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় জলে। সামান্য বাতাসে জল নড়ছে, তার ছায়াটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। এক দুই পাঁচ সাত টুকরো হয়ে যাচ্ছে কুঞ্জ। এই হচ্ছে মানুষের ঠিক প্রতিবিম্ব। কোনও মানুষই তো একটা মানুষ নয়, এক এক অবস্থায় পড়ে সে হয়ে যায় এক এক মানুষ। আর বেশি দিন নয়, কেষ্ট ফিরবে, বেহেড সাবিত্রী বিকারের ঘোরে প্রলাপের মতো গোপন কথা বিলিয়ে দেবে বাতাসে। তেঁতুলতলা, বেলপুকুর, শ্যামপুর হয়ে বাগনান পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে কথা। লোকে জানবে জননেতা কুঞ্জনাথ আসলে কেমন মানুষ।

জলের মাঠ পার হয়ে কুঞ্জ ঢালু জমি বেয়ে উঠতে থাকে। সামনেই অনেক কটা নারকোল গাছের জড়ামড়ি। তার ভিতরে সাদা উঠোন। দুটো মাটির ঘর।

ভূতগ্রস্তের মতো কুঞ্জ এগোতে থাকে। উঠোনে পা দেওয়ার মুখে একবার ফিরে তাকায়। অনেক দূর

অবধি ঢলে পড়েছে গভীর নীল দ্যুতিময় আকাশ। কী বিশাল ছড়ানো সবুজ। কুঞ্জ তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। মনে মনে কেষ্টকে ডেকে বলে—এ সব কিছু নয় রে। সময় কাটতে দে। একশো বছর পর দেখবি আজকের কোনও ঘটনার চিহ্নই নেই পৃথিবীতে। কেউ মনে করে রাখেনি। সময় এসে পলিমাটির আস্তরণ ফেলে যাবে। কুঞ্জ আর সাবিত্রীর কেচ্ছা নিয়ে যেটুকু হইচই উঠবে, পৃথিবীর মস্ত মস্ত ঘটনার তলায় কোথায় চাপা পড়ে যাবে তা। মানুষ কি অত মনে রাখে!

প্রায় মাইল তিনেক এক নাগাড়ে হেঁটে এসে কুঞ্জ উঠোনের মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সাদা রোদে কাঁথা মাদুর শুকোচ্ছে, একটা কালো চেহারার বাচ্চা বসে খেলছে আপনমনে। কাক ডাকছে। উত্তরের হাওয়া বইছে গাছপালায়।

কুঞ্জ ডাকল—পটল। এই পটল।

প্রথমে অনেকক্ষণ কেউ সাড়া দিল না। বাচ্চাটা হাঁ করে বোধহীন চোখে চেয়ে রইল। কুঞ্জ আস্তে আস্তে উঠোনের মধ্যে এগিয়ে যায়। দাওয়ায় ওঠে। ডাকে—পটল।

নোংরা কম্বল মুড়ি দিয়ে বিশাল চেহারার পটল আচমকা দরজা জুড়ে দেখা দেয়। গলায় কর্ফটার, মাথা কান ঢেকে একটা লাল কাপড়ের টুকরো জড়ানো! ক্রূর চোখ, মুখে হাসি নেই। ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকে ঘড়ঘড়ে গলায় বলে—কী বলছ?

—কথা আছে। কুঞ্জ চোখে চোখে বলে—বাইরে আসবি?

—আমার শরীর ভাল নয়। হাঁফের টান উঠেছে, পড়ে আছি। পটল এক পা ঘরের মধ্যে পিছিয়ে যায়—যা বলবার এইখানে বলো।

কুঞ্জ ঠাণ্ডা গলায় বলে—আমার সঙ্গে লোক নেই রে। ভয় খাস না।

পটল একটু ঝেঁকে উঠে বলে—ভয় খাওয়ার কথা উঠছে কেন বলো তো?

কুঞ্জ খুব ক্লান্ত গলায় বলে—অস্তরটা নিয়ে বেরিয়ে আয়। মাঠবাগে চল, যে জায়গায় তোর খুশি। আজ কেউ ঠেকাবে না। মারবি পটল?

পটল তেরিয়া হয়ে বলে—তোমার মাথাটা খারাপ হল নাকি? ঝুটমুট এসে ঝামেলা করছ? বাড়ি যাও তো বাবু, আমার শরীর ভাল নয় বলছি।

দাঁতে দাঁত চেপে কুঞ্জ গিয়ে চৌকাঠে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, ভ্যাপসা গন্ধ। পটল পিছিয়ে অন্ধকারে সেঁধোয়। কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলে—আমি কখনও মিছে বলেছি রে? বিশ্বাস কর, সঙ্গে লোক নেই, লুকোনো ছুরিছোরা নেই। মারলে একটা শব্দও করব না। শুধু দুটো কথা জিজ্ঞেস করব। বাইরে আয়।

পটল বাইরে আসে। দাওয়ায় উবু হয়ে বসে অনেকক্ষণ কাশে, গয়ের তোলে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলে—কী হয়েছে বাবু তোমার, বলো তো?

কুঞ্জ পাথরের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলে—রেবন্ত আমাকে মারতে চায় কেন বলবি?

পটল ভারী অবাক হয়ে তাকায়। তারপর ময়লা ছ্যাতলা পড়া দাঁত বের করে হেসে বলে—বলছ কী গো! তোমায় রেবন্তবাবু মারতে চাইবে কেন? মাথাটাই বিগড়েছে। বাড়ি যাও তো বাবু।

—তুই টাকার জন্য সব করতে পারিস জানি। তোর কথা ধরি না। কিন্তু রেবন্ত কেন চায় তার ঠিক কারণটা বলবি?

—ঝুটমুট আমাকে ধরছ বাবু। আমি মরি নিজের জ্বালায়।

—ঝাড়গ্রামের কলাবাগানটা কি কিনে ফেলেছিস পটল?

পটল এ কথায় বিন্দুমাত্র চমকায় না। কলাবাগান কেনার জন্য সে বহুকাল ধরে চেষ্টা করছে। কথাটা সবাই জানে। পটল ঝিম ধরে চোখ বুজে থেকে শুধু ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল, বলল—টাকা কই?

—কেন, রেবন্ত দেবে না?

পটল একটা ঝোড়ো শ্বাস ছেড়ে বলে—পটলকে সবাই দেওয়ার জন্য বসে আছে! রেবন্তবাবু দেবে কেন বলো তো? বলে পটল মিটমিটে ক্রূর চোখে কুঞ্জর দিকে চেয়ে থাকে।

কুঞ্জর মাথায় এখনও সঠিক যুক্তি বুদ্ধি ফিরে আসেনি। কেমন ধোঁয়াটে অসংলগ্ন চিন্তা। বলল—হাবুর ঝোপড়ায় কেষ্ট তোদের সঙ্গে রোজ বসে?

পটল একটু চুপ করে থেকে দুঃখের সঙ্গে বলল—তার আর আমরা কী করব বলো। বসে।

—কিছু বলে না?

—কী বলবে?

—বলে না যে—বড় ঠিক সময়ে কুঞ্জর মুখে বন্ধন পড়ে গেল। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—আমার নিন্দে করে না?

—তুমি আজ ভারী উল্টোপাল্টা বকছ বাবু। পটল বিরক্তি প্রকাশ করে মুড়ি দিয়ে বসে। উঠোনের দিকে চেয়ে বলে—নিন্দে করার কী আছে, তুমি কি মন্দ লোক?

কুঞ্জ সামান্য হেসে বলে—তবে কি ভাল? তুই কী বলিস?

পটল আবার হাসল। বলল—লোক ভাল, তবে ডাক্তার ভাল নও। বাপের এলেমদারিটা পাওনি। হরিবাবুর দু ফোঁটা ওষুধে ছ মাস খাড়া থাকতাম। হরিবাবা গিয়ে অবধি রোগটার চিকিৎসে হল না আর। ভাল করে ভেবে চিন্তে একটা ওষুধ দিয়ো দিকি।

কুঞ্জ চেয়ে ছিল। পটল তার কাছে ওষুধ চাইছে। হঠাৎ খুব ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গিয়ে কুঞ্জর বুকটা অনেক হালকা লাগল। এতক্ষণ যে জ্বরটা তার মাথায় বিকারের ঘোর তৈরি করেছিল তা হঠাৎ ছেড়ে গেল বুঝি।

পটলের বউ বাসন্তী কতক কাঁথা কাপড় কেচে নিয়ে এল পুকুরঘাট থেকে। উঠোনে ঢুকে কুঞ্জকে দেখে একটু অবাক। জড়সড়ো হয়ে বলে—ভাল আছেন তো বাবু?

জেলে পাড়ার মেয়ে বাসন্তীকে চেনে কুঞ্জ। এর আগে আরও দুবার বিয়ে বসেছিল। কুঞ্জ যতদূর জানে, ওর দু নম্বর স্বামীকে শিবগঞ্জের হাটে পটলই খুন করেছিল।

বাসন্তীর পিছনে গোটা তিন-চার ছেলে মেয়ে। কুঞ্জ স্থির চোখে চেয়ে দেখে। তিন পক্ষের ছেলেপুলে নিয়েই পটলের ঘর করছে বাসন্তী। গোটা সমাজটা যদি এরকম হত তো আজ বেঁচে যেত কুঞ্জ।

পটল ধীর স্বরে বলল—বাড়ি যাও বাবু।

কুঞ্জ ওঠে। বাইরে এসে উদাস পায়ে ফের তিন মাইল পথ ভেঙে ফিরতে থাকে।

দক্ষিণে শিয়র। শিয়রে খোলা জানালা দিয়ে রোদ হাওয়ার লুটোপুটি। বেলাভর জামগাছে কোকিল ডেকেছে। সেই জানালা দিয়ে বাতাসের শব্দের মতো মৃদুস্বরে ডাক এল—সাবিত্রী।

জেগে ঘুমিয়েছিল সাবিত্রী, অথবা ঘুমিয়ে জেগে। হয়তো ঘুমের ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার। বার বার ঢুলে পড়ছে ঘুমে, জেগে উঠছে। কখন ঘুম কখন জেগে ওঠা তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না সে। জেগে যার কথা চিন্তা করছে, ঘুমের মধ্যে সে-ই হয়ে যাচ্ছে স্বপ্ন। কাকে ভাবছে? আপনমনে মৃদু হাসে সাবিত্রী। কুঞ্জ ছাড়া কখনও আর কারু কথা তার মনেই আসে না যে। সম্পর্কের কথা তোমরা কেউ বোলো না, বোলো না। বলি, রাধা মেনেছিল? বঙ্কিমের উপন্যাসে শৈবলিনীর বর তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—প্রতাপ কি তোমার জার? শিউরে উঠে শৈবলিনী বলেছিল—না, আমরা একবৃন্তে দুটি ফুল। সাবিত্রীকে কেউ যদি প্রশ্ন করে, কুঞ্জ কি তোমার প্রেমিক? সাবিত্রী ভেবে পায় না কী বলবে। সে কখনও কুঞ্জকে আপনি থেকে তুমি বলেনি। শরীরের গাঢ়তম ভালবাসার সময়েও নয়। প্রেমিক নয়, তবে? কী দেখে মজলে সাবিত্রী? ও যে রোগাটে, কালো, ফুসফুসে জখম, ঘাড় শক্ত। কী এমন ও। তার সাবিত্রী কী জানে? কুঞ্জ সুন্দর কিনা তা তো কখনও ভেবেও দেখেনি সাবিত্রী। তবে? আছে, তোমরা জানো না, আছে। ও কি যে সে? বাগনানের জনসভায় সেই প্রায়-কিশোরী বয়সে সাবিত্রী দেখেছিল কুঞ্জকে। কালো, রোগা এক মানুষ হ্যাজাকের আলোয় দাঁড়িয়ে মুঠি তুলে বক্তৃতা দিচ্ছে। সেই অদ্ভুত গম্ভীর, বিষাদময়, তীব্র ও গভীর স্বর যেন দিকদিগন্তে আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল। কারও মনে নেই, কুঞ্জরও না, স্কুলের এক পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রেসিডেন্ট কুঞ্জর হাত থেকে প্রাইজ নিয়েছিল সাবিত্রী। তখন কুঞ্জ দাড়ি কামায় না। অল্প নরম দাড়িতে আচ্ছন্ন শান্ত মুখ, টানা কোমল দুটি চোখে বৈরাগ্যের চাহনি। কতই বয়স তখন কুঞ্জর। তবু সেই বয়সেই সে এ অঞ্চলের প্রধান নেতা। প্রাইজ নিতে আঙুলে আঙুল ছুঁয়েছিল বুঝি। সাবিত্রীর সেই শিহরন আজও রয়ে গেছে। ও কি আমার প্রেমিক? না তো। প্রেমিক

বললে যে ভারী ছোট হয়ে যায় ও। তার চেয়ে ঢের বেশি যে। ও কি আমার প্রভু দেবতা? ও সব ভারী বড় বড় কথা। ওতে ওকে মানায় না যে। তবে কী সাবিত্রী? তবে ও তোমার কে? সাবিত্রী মৃদু হাসি হেসে বালিশের কানে কানে বলে—ও আমার।

ঘুমিয়ে ছিল কি সাবিত্রী? নাকি জেগে ছিল? ডাক শুনে সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে মৃদু ঝংকারে। কিন্তু চমকায়নি সাবিত্রী, তার সমস্ত শরীর ওর ডাকে এমনিভাবেই সাড়া দেয়। স্বপ্নোত্থিতের মতো সাবিত্রী মাথাটা তুলে বলে—বলুন।

জানালার ওপাশটা দেখা যায় না। ওপাশে রয়েছে ভাট ঘেঁটুর জঙ্গল, খেতের মাচান। জানালা দিয়ে কিছু গাছপালা, আকাশের নীল চোখে পড়ে।

মৃদু বাতাসের মতো স্বর বলে—আমার সব নষ্ট হয়ে গেল। আমরা এ সব কী করলাম?

বিমুগ্ধা সাবিত্রী মৃদু একটু হাসে। বালিশে কনুইয়ের ভর রেখে করতলে গাল পেতে বলে—আপনি কেন নষ্ট হবেন? পুরুষদের তো দোষ লাগে না।

—কে বলল দোষ লাগে না? জানাজানি হয়ে যাবে সাবিত্রী। তখন আমার যেটুকু ছিল তাও নষ্ট হয়ে যাবে।

সামান্য একটু ভাবে সাবিত্রী। তারপর বলে—আপনি তো সকলের মতো সাধারণ মানুষ নন। আলোর গায়ে কি ছায়া পড়ে?

—ও সব বই-পড়া কথা। তোমার নিজের বিপদের কথাও কি কখনও ভাব না সাবিত্রী?

সাবিত্রী আপনমনে অদ্ভুত একটু হেসে বলে—পোয়াতির পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে গেল, আর কী বিপদ হবে?

বাইরে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে। মৃদু স্বরে বলে—আমি মবে গেলে সব মিটিয়ে নিয়ো সাবিত্রী। কাউকে আমার কথা বোকার মতো বলতে যেয়ো না। আমি তোমার ভাল চাই।

সাবিত্রী উৎকর্ণ হয়। সচকিত হয়। কষ্টে উঠে বসবাব চেষ্টা করতে করতে বলে—ও কথা কেন বলছেন? মরবেন কেন? মরা কি আপনাকে মানায়? শুনুন, আমি না হয় আর কখনও কাউকে বলব না।

কিন্তু জানালার ওপাশে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই, টের পেল সাবিত্রী। নিমীলিত চোখে সে ধীরে ধীরে বালিশে মাথা রাখল। প্রথমে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল চোখের কোল বেয়ে। তারপর আবার কান্না। আমি যে মরার কথাও ভাবতে পারি না। মরলে ভালবাসব কী করে? ভালবাসা-নিদানে, পালিয়ে যাওয়া বিধান বঁধু পেলে কোনখানে?

১০

ভিতরের বারান্দায় কাঠের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে কোলে খাতা রেখে রাজু পেনসিলে দ্রুত হাতে চিরশ্রীর স্কেচ আঁকছে। তাকে ঘিরে ছোট একটা ভিড়।

এ পর্যন্ত গোটা সাতেক স্কেচ এঁকে দিয়েছে রাজু। বনশ্রীর, সবিতাশ্রীর, সত্যব্রতর, শুভশ্রীর, আর কিছু পাড়া-পড়শির। তার আগে ভরাট গলায় শুনিয়েছে রবীন্দ্রসংগীত। ফাঁকে ফাঁকে পলিটিক্স আর আর্ট নিয়ে দেদার কথা বলেছে। হাত দেখেছে সকলের। খেয়েছে অন্তত চার কাপ চা, ওমলেট, চালকুমড়োর পুর ভাজা। অবশেষে সবিতাশ্রী বলেছেন—আজ আর দুপুরে কুঞ্জদের বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। যা অঘটন ঘটল ওদের বাড়িতে। খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, এবেলা তুমি এ বাড়িতে খাবে।

এ কথা শুনে রাজু হঠাৎ মুখ তুলে বনশ্রীর দিকে চেয়ে ফেলল। তারপর প্রাণপণে মনে করতে চেষ্টা করল, কোন বইতে সে যেন ঠিক এইভাবে প্রেম হওয়ার কথা পড়েছিল। শরৎচন্দ্র? হবে। কিন্তু একসময়ে এরকম ভাবেই প্রেম হত।

তবে রাজু নেমন্তন্নটা নিয়ে নিল।

সবিতাশ্রী একটু দেরিতে হলেন, কিন্তু সত্যব্রত মুগ্ধ হয়েছেন অনেকক্ষণ আগেই। এ ছোকরা একে বিখ্যাত আর্ট ক্রিটিক তার ওপর কলকাতার ছেলে। শ্যামশ্রীর বিয়ের পর সত্যব্রত মনে মনে স্থির করে রেখেছেন আর কোনও মেয়ের বিয়ে গাঁয়ের ছেলের সঙ্গে দেবেন না। কলকাতায় দেবেন। সেই ছেলেই

বুঝি আজ হেঁটে এল ঘরে। কী ভাল ছেলে। কী চোখা আর চালাক। কত খবর রাখে। তার ওপর সান্যাল, বারেন্দ্র, স্বঘর। এত যোগাযোগ একসঙ্গে হয় কী করে, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকে? সবিতাশ্রী রান্নাঘরে গেলে তাঁর পিছু পিছু সত্যব্রতও গেলেন। নিচু স্বরে কথা বলতে লাগলেন দুজনে।

সেই ফাঁকে রাজু মুখ তুলে বনশ্রীকে বলল—এভাবেও হয়।

বনশ্রী সিঁড়ির ধাপে বসে ছিল। চোখে সম্মোহিত দৃষ্টি। এর আগে সে কোনওদিন প্রেমে পড়েনি। আজ একদিনে দুবার পড়ল কি? সে বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল—কী?

রাজু ফের স্কেচ করতে করতে বলে—কোথায় যেন পড়েছিলাম। আগে এইভাবে হত। প্রথম যাতায়াত, তারপর খাওয়া-দাওয়া, তারপর—থেমে চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে রাজু ফের বলে—এ ভাবেও হয়।

স্কেচটা শেষ করে পাতাটা ছিঁড়ে চিরশ্রীর হাতে দিল রাজু। কিশোরী মেয়েটির লাবণ্যে ঢলঢল মুখ আলোয় আলো হয়ে গেল নিজের অবিকল ছবি দেখে।

পরের পাতায় রাজু দুটো নিখুঁত বৃত্ত আঁকল পাশাপাশি। তারপর মৃদু একটু হাসল। বনশ্রী একটু ঝুঁকে এল দেখতে। বলল—এটা কী?

—বলুন তো কী?

বনশ্রী তার বিশাল চুলের বোঝা সমেত মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে নেড়ে বলে—জানি না তো কী আছে আপনার মনে।

রাজু দুটো বৃত্তকে ভরে দিল স্পোক দিয়ে, আঁকল মাডগার্ড, হ্যান্ডেল, সিট।

বনশ্রী ভ্রূ তুলে বলে—ওমা। একটা সাইকেল!

একটা সাইকেল। অনেকক্ষণ ধরে সাইকেলটাকে টের পাচ্ছে রাজু। খুব দুরে নয়। একটা সাইকেল গাছপালার আড়াল দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরছে, ঘুরছে, ঘুরছে। ঝরে পড়া শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কখনও উঁচু নিচু খানা-খন্দে ঝাঁকুনি খেতে খেতে; অপথ কুপথ দিয়ে চলেছে অবিরাম। উৎকর্ণ হয়ে সাইকেলের শব্দ শোনে রাজু। মনের পর্দায় আবছা দেখতে পায় সাইকেলের ছায়া। চোরের মতো, ভয় দ্বিধা লজ্জায় জড়ানো তার গতি। কিন্তু ঘুরছে। অনেকক্ষণ ধরে এ বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে চলেছে। একবার, দুবার, তিনবার করে অসংখ্যবার। এক-একবার যেন আবর্তন পথ থেকে সরে যাবে বলে সাইকেলের মুখ ফেরাতে চাইল অন্যদিকে। পারল না। কেন্দ্রাভিগ এক আকর্ষণ টেনে রাখল তাকে।

রাজু সাইকেলের ছবিটা শেষ করে বলে—একটা সাইকেল হলে বহু দূর ঘুরে আসা যেত। একটা সাইকেল কত কাজে লাগে।

বনশ্রী খুব হেসে বলে—সাইকেল চাই বললেই তো হয়। আমাদের বাড়িতে দু-দুটো সাইকেল।

রাজু সে কথার জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভ্রূ কোঁচকানো, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আপন মনে বলে—অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছে সাইকেলটা।

বনশ্রী সামান্য অবাক হয়ে বলে—কে ঘুরছে? কার সাইকেল?

—আছে। বলে উঠোনে নেমে পড়ে রাজু। একটা সাইকেলের ছায়া, মাটিতে চাকা গড়িয়ে যাওয়ার একটা অস্পষ্ট শব্দকে লক্ষ্য করে এগোতে থাকে।

বাড়ির পিছন দিকে মস্ত খড়ের টাল, ধানের গোলা। সবজির খেত। কপিকল লাগানো একটা কুয়ো থেকে কালো একটা মেয়েছেলে জল তুলছিল, অবাক হয়ে দেখল একটু। খেত ডিঙিয়ে রাজু এগোতে থাকে। অনেকটা জমি পার হয়। সামনে কোমর সমান উঁচু ঘাসের মতো এক ধরনের জঙ্গল।

পিছনে তিরতিরে পায়ে বনশ্রী এগিয়ে আসতে আসতে ডাকে—শুনুন, শুনুন, কোথায় চললেন? ও দিকে পথ নেই যে।

মানুষের ভাষা রাজু বুঝতে পারে না আর। হিলহিলে সরীসৃপের মতো পিচ্ছল গতিতে এগিয়ে যায় সে। চোখে বহু দূরবর্তী এক সাইকেলের ছায়া, কানে মৃদু সাইকেলের শব্দ। ঘাসজঙ্গল মুহূর্তে পার হয়ে যায় সে। সামনে শ্যাওলা ধরা ইটের দেওয়াল। খুব উঁচু নয়। বুকে ভর রেখে রাজু দেয়ালের ওপর ওঠে। উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা শোনে।

বনশ্রী ঘাসজঙ্গল ভেদ করে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ডাকছে—শুনুন, ও মশাই, পড়ে যাবেন যে। কী করছেন বলুন তো?

মাতালের মতো টলতে টলতে সাইকেলটা আসছে। বড় ধীর গতি। ডান দিক থেকে মোড় ফিরে একটা কাঁচা নর্দমা পার হল ঝকাং করে। খানিকটা উঁচু জমি বেয়ে উঠে এল কষ্টে। সাইকেলটার গা ধুলোয় ধুলোটে, পিছনের টায়ারে হাওয়া নেই, তেলহীন ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠছে যন্ত্রপাতির।

একদৃষ্টে সাইকেলটা দেখল রাজু। এত ক্লান্ত সাইকেল সে আগে কখনও দেখেনি। সামনে সাদা ধুলোর পথের ওপর পড়ে আছে চাকার অসংখ্যবার পরিক্রমার ছাপ।

রাজু বিড়বিড় করে বলে—এ ভাবেও হয়।

ভেবে দেখলে কাজটা খুব সহজ নয়। গলায় ফাঁস আটকে টেনে ধরলে মরতে শ্যামশ্রীর দু মিনিট লাগবে। তারপর সিলিং-এর আংটায় ঝুলিয়ে তলায় একটা টুল কাত করে ফেলে রাখলে হুবহু আত্মহত্যার মতো দেখাবে। কিন্তু সন্দেহের ঊর্ধ্বে কি তবু থাকতে পারবে রেবন্ত? পুলিশ খোঁজ করবে আত্মহত্যা কবুলের চিঠি। আর, আত্মহত্যা করার সময়ে কেউ ঘরের দরজা খুলে রেখে মরে না তো, রেবন্ত বাইরে থেকে কী করে ভিতরে দরজায় খিল দেবে?

একটা হয়, যখন পুকুরে যাবে তখন জঙ্গুলে পথটায় যদি মাথায় ইট মেরে অজ্ঞান করে দেওয়া যায়। বাদবাকি রাস্তাটুকু টেনে নিয়ে জলে ফেলে দিলেই হল। পরিষ্কার অ্যাকসিডেন্টের মামলা। অবশ্য শ্যামা সাঁতার জানে, সুতরাং পুলিশের সন্দেহ থেকেই যাবে। মাথার চোটটাই বা গোপন করবে কীভাবে? আর লোকের চোখে পড়ার ভয়ও থেকে যাচ্ছে না? পুকুরঘাট তো বাথরুম নয়।

যদি শ্যামাকে নিয়ে পাহাড়ে বেড়াতে যায় রেবন্ত? খুব উঁচু পাহাড় হবে, খাড়াই। একদম ধারে চলে যাবে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে। শেষ সময়টায় একটু চমকে দিতে হবে ওকে। সতর্কতা হারিয়ে ফেলবে তখন। সামান্য একটু ধাক্কা মাত্র। একটু সাবধান হতে হবে রেবন্তকে, শেষ সময়ে না পড়বার মুহূর্তে তাকে আঁকড়ে ধরে। যে ভাবে মারলে কাজটা অনেকখানি বিপদমুক্ত। খোঁজ খবর কি আর হবে না? রেবন্ত তো হোটেলে নিজের আসল নাম-ঠিকানা লেখাবে না। খোঁজ করে হয়রান হবে পুলিশ।

খবরের কাগজে পড়েছে রেবন্ত, দীঘার সমুদ্রের ধারে কটেজে কয়েকটাই খুন হয়েছে। মেয়েটার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুরুষটা লোপাট। দীঘা খুব দূরেও নয়। যাবে? কিন্তু পুলিশ নয় তার খোঁজ নাই পেল, বাড়ির লোক কিছু জানতে চাইবে না? শ্যামশ্রীর বাড়ি থেকে জিজ্ঞেস করবে না—শ্যামাকে কোথায় রেখে এলে রেবন্ত? একটা ক্ষীণ উপায় আছে অবশ্য। রেবন্ত রটিয়ে দেবে, শ্যামা আর একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। খুব অবিশ্বাস্য হবে না। ওদের রক্তে চরিত্রহীনতার বদ রক্ত কি নেই? কেন, সেই মাসি, যে বিয়ের আগে ছেলে প্রসব করেছিল?

কিন্তু যত দিক ভেবে দেখে রেবন্ত, কোনও দিকই নিরাপদ মনে হয় না। সন্দেহ থেকে যাবে, বিপদ থেকে যাবে।

কিছু করতেই হবে যে রেবন্তকে! এতদিন বনশ্রী সম্পর্কে তার কিছু অনিশ্চয়তা ছিল। আজ সকালে অঝোর আলোয় স্বচ্ছ জলের মধ্যে রঙিন মাছের মতো সে দেখেছে বনশ্রীর হৃদয়। এতটুকু সন্দেহ নেই আর। বনশ্রীর এই দুর্বলতাটুকু কতদিন থাকবে তার কোনও ঠিক তো নেই। তাই দেরি করতে পারবে না রেবন্ত।

পটলকে বলবে? ভাবতে ভাবতে ব্রেক কষে রেবন্ত। সাইকেল থেমে টলে পড়ে যেতে চায়। পায়ে মাটিতে ঠেকা দিয়ে রেবন্ত একটু ভেবে মাথা নাড়ে। মেয়েছেলে মারতে চাইবে না পটল। নিজের বউকে ও বড় ভালবাসে। তবে ঝাড়গ্রামের কলাবাগানটা কেনার বড় ইচ্ছে ওর। রাজি হতেও পারে।

প্যাডেলে আবার ঠেলা মারে রেবন্ত। গত রাত্রির জল রোদের প্রচণ্ড তাতে টেনে গিয়ে এখন ধুলো উড়ছে। থেমে গেছে রেবন্ত। মুগার পাঞ্জাবি, সাদা শাল, কাঁচি ধুতির আর সেই জেল্লা নেই। তার মুখ শুকিয়ে চড়চড় করছে এখন। তবে চলেও যেতে পারে না সে। আর একবার বনশ্রীর গভীর দৃষ্টি দেখবে না? আর একবার শিউরে দেবে না ওকে? কী করে চলে যাবে সে? কত সহজেই ওদের বাড়িতে

এতদিন হুটহাট এসে ঢুকে গেছে রেবন্ত, কিন্তু আজ সকালের দুর্বলতাটুকুর পর আর কিছুতেই ফটক পেরোতে পারছে না। এক টান-সুতোয় বাঁধা সে সম্মোহিতের মতো পাক খেয়ে যাচ্ছে কেবল। কখন কোন কাঁটায় লেগে পিছনের চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেছে, উঁচুনিচু পথহীন জমি, আগাছা, খানাখন্দ দুরমুশ করে চলেছে অবিরাম সাইকেল। বড় ক্লান্ত হয়েছে শরীর। প্রতিবারই মনে হয়, এবার চলে যাব, আর ফিরব না।

চলে গিয়েওছিল রেবন্ত। তেজেনের দোকান অবধি। আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরে যাওয়ার মুখে মন ডাক দিল—আর একবার দেখে যাই। এরকম কয়েকবারই চলে গিয়ে ফিরে এসেছে রেবন্ত। ঘুরছে আর ঘুরছে। বাগানের অত ভিতরে গভীরে কেন বাড়ি করলে তোমরা বনা? কেন এত দুর্লভ হলে?

ভ্রূ কুঁচকে আনমনে শ্যামার কথা মাঝে মাঝেই ভেবে দেখে সে। না মেরেও হয়। যদি বনশ্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাই? থাক না শ্যামা বেঁচে বর্তে!

সব দিক ভেবে দেখছে রেবন্ত। পালানোও বড় মুখের কথা নয়। চাকরির প্রশ্ন, আশ্রয়ের প্রশ্ন, টাকার প্রশ্ন নেই? ভাবতে হবে। অনেক ভাবতে হবে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।

কাঁচা নর্দমার ওপর প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সাইকেলের চাকা গেল। নিচু দেয়ালের ওপর দিয়ে বার বার ভিতরবাগে চেয়ে দেখেছে রেবন্ত। শুধু গাছপালা, দূরে একটা কপিকলের মাথা, বাড়ির ছাদ। আর কিছু দেখা যায় না।

উল্টো সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখে সে। যদি শ্যামা না-ই মরে, যদি পালানোও ঘটে না-ই ওঠে, তবে একদিন নির্জনে বনশ্রীকে সম্মোহিত করবে রেবন্ত। হয়তো বাধা দেবে বনশ্রী। সব বাধা কি মানতে হয়? শরীরে শরীর ডুবিয়ে দেবে জোর করে। তখন সুখ। এতদিন এত সহজে এ সব কথা ভাবতে পারেনি সে। কাঁটা হয়ে ছিল কুঞ্জ। ঘাড় শক্ত, রোগা গড়নের তেরিয়া কুঞ্জ। নীতিবাগীশ, অসহ্য রকমের সৎ ও বিপজ্জনক রকমের সমাজ সংস্কারক।

হেসে ওঠে রেবন্ত। বেলুন চুপসে গেল রে কুঞ্জ? শেষে ভাদ্দরবউ? হাঃ হাঃ! হাসতে হাসতে বুঝি চোখে জল এসে যায় তার। শেষে কেষ্টর বউ? বেড়ে! বাঃ! এই তো চাই। জুজুর মতো তোকে ভয় খেতুম যে রে! অ্যাঁ, ভাবতুম যা-ই করি কুঞ্জ ঠিক টের পাবে। কুঞ্জর হাজারটা কান, হাজারো চোখ। ঠিক এসে পথ আগলে দাঁড়াবে। গুপ্ত কথা টেনে বের করবে পেট থেকে। শেষে ভাদ্দর-বউ কুঞ্জ? অ্যাঁ!

রেবন্ত মাথা নাড়ে। বড় কষ্টে প্রাণপণে প্যাডেল মেরে একটা উঁচু জমিতে ঠেলে তোলে হাওয়াহীন সাইকেল। কপালের ঘাম মুছবে বলে রুমালের জন্য পকেটে হাত দেয়। তারপরই ভীষণ চমকে যায় সে। সামনের পথের ওপর লাফিয়ে নামল, ও কে? রাজু না?

সাইকেলের হ্যান্ডেল টালমাটাল হয়ে যায়। প্রাণপণে সামনের চাকা সোজা রাখে রেবন্ত। খুব জোরে প্যাডেল মারতে থাকে। সাইকেল ধীরে ধীরে এগোয়।

রেবন্ত শক্ত করে মাথা নামিয়ে রাখে, যাতে চোখে চোখ না পড়ে যায়। হয়তো রাজুর তাকে মনে নেই, হয়তো চিনতে পারবে না। রেবন্তও চেনা দেবে না।

তবু বুক কাঁপতে থাকে তার। কাল রাতে অন্ধকারেও তাকে দেখেছিল নাকি রাজু? চিনেছিল? এ পথে ও ফাঁদ পেতে বসে ছিল না তো! দাঙ্গাবাজ ছেলে রাজু। হামলা করবে না তো?

কিন্তু রাজু কিছুই করে না। সাইকেল ওর খুব কাছ ঘেঁষে পেরিয়ে যায়। রেবন্ত মাথা তোলে না। কিন্তু খুব জোরে প্রাণপণে চালাতে থাকে তার সাইকেল। কিন্তু হাওয়াহীন চাকা এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে ক্লান্ত শরীরে তেমন টানতে পারে না। ভারী ধীরে চাকা ঘুরছে।

পিছু ফিরে চোর-চোখে চায় রেবন্ত। আবার চমকে যায়। রাজু আসছে একটু লম্বা পায়ে, তার দিকে স্থির চোখ রেখে হেঁটে আসছে রাজু। মন্থর সাইকেলের সঙ্গে সমান গতিবেগ বজায় রেখে।

প্রাণপণ চেষ্টা করে রেবন্ত। সিট থেকে উঠে শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে চেপে ধরে প্যাডেল। নির্মম পায়ের লাথিতে দাঁতে দাঁত চেপে সাইকেলটাকে নির্যাতন করে। কিন্তু নিঃশেষ আয়ুর মতো সাইকেলের গতি ক্রমে আরও কমে আসতে থাকে। রাজু এগিয়ে আসছে। খুব জোরে নয়। প্রায় স্বাভাবিক হাঁটার গতিতে। কিন্তু রেবন্তর সাইকেল যেন আজ এক কোমর জলের মধ্যে নেমেছে। এগোয় না, পালাতে চায় না, ধরে দেবে বলে কেবলই পেছিয়ে পড়ে।

রাজু আসছে। রেবন্ত রাস্তায় উঠে মাঠের দিকে সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পিচ রাস্তা ধরলে অনেকখানি পথ। অত পথ পেরোতে পারবে না। কোনাকুনি মাঠ পেরোলে খালের সাঁকো পেরিয়ে বাজারে উঠলেই সাইকেল সারাইয়ের দোকান।

রেবন্ত পিছনে তাকায়। রাজু স্থির চোখে চেয়ে সোজা চলে আসছে। আসছেই। যদি ধরতে চায় তবু একটু জোরে পা চালালেই ধরতে পারে। তা করছে না রাজু। সে সমান একটা দূরত্ব বজায় রেখেছে। কিন্তু আসছে।

বহুকাল এমন শরীরে কাঁটা দেয়নি রেবন্তর। মাঠের গড়ানে জমিতে সাইকেল ছেড়ে দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে নামতে নামতে তার মনে হল, এই নির্জন মাঠে রাজুর মুখোমুখি হওয়া কি ঠিক হবে?

আবার তাকায় রেবন্ত। একই গতিতে রাজু আসছে। তার পিছু পিছু। মাঠের ঢালু বেয়ে ওই নামল। এখনও একটু দূরে। তবে অনেকটা কমে আসছে দূরত্ব।

মাঠের মধ্যে উল্টোপাল্টা হাওয়ায় সাইকেল টাল খায়। বেঁকে যায় হাতল। এগোয় বটে, কিন্তু বড্ড পিছনের টান। কোত্থেকে এল রাজু? কী করে টের পেল সে ওই পথ দিয়ে সাইকেলে আসবে?

রেবন্ত পিছনে আর একবার চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। জোরে চালাতে চেষ্টা করে লাভ নেই। রাজু ঠিক তার পিছনে এসে গেছে। ডান হাতখানা বাড়িয়ে আলতো করে ছুঁয়ে আছে ক্যারিয়ার।

রেবন্ত ব্রেক চেপে ধরে। নামে। বলে—রাজুবাবু, কেমন আছেন?

রাজু অবাক হয়ে তার দিকে চায়। অনেকক্ষণ ধরে দেখে তাকে। বলে—আরে! রেবন্তবাবু না?

—চিনতে পারছিলেন না? কাঠ-হাসি হেসে রেবন্ত বলে।

—না তো! আপনাকে লক্ষ করিনি। আমি শুধু সাইকেলটা দেখছিলাম।

— সাইকেল! বলে বুঝতে না পেরে রেবন্ত রাজুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ কোন শহুরে চালাকি বাবা!

মায়া ভরে সাইকেলের সিটে হাত রেখে রাজু বলে—সাইকেলের মতো জিনিস হয় না। একটা সাইকেল থাকলে কত দূর চলে যাওয়া যায়!

বড্ড ঘেমে যাচ্ছে রেবন্ত। কিছুতেই বুঝতে পারছে না, বিপদটা কোন দিক দিয়ে আসবে। সাইকেলের প্রসঙ্গটা একদম ভাল লাগছে না তার। রুমালে ঘাড় গলা মোছে রেবন্ত। ভাববার সময় নেয়। রাজু তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। রেবন্ত অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয় চট করে। বলে—এই সাইকেলটাই নিয়ে ঘুরে আসতে পারতেন, কিন্তু এটার পিছনের চাকাটায় হাওয়া নেই যে।

ভারী খুশি হয়ে রাজু বলে—তা হোক, তা হোক। আফটার অল সাইকেল তো!

কথাগুলো যত বুঝতে না পারে ততই মনে এক আতঙ্ক জেগে ওঠে রেবন্তর। রাজু পাগল নয়। ক্ষুরের মতো ওর বুদ্ধির ধার। ওর মুখোমুখি হলেই একটা ঝাঁজ টের পাওয়া যায়। কেমন গুটিয়ে যেতে, লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে জাগে। রেবন্ত তাই বলল—রেখে দিন তা হলে সাইকেলটা। পরে কুঞ্জর বাড়ি থেকে নিয়ে যাব।

রাজু কোনও কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদের কথা বলল না। এক ঝটকায় রেবন্তর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল সাইকেলটা। ঘুরিয়ে নিয়ে মহানন্দে উঠে বসল সিটে।

রেবন্ত মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কয়েক পলক দেখে দৃশ্যটা। কোনও মানে হয় না। রাজু হাওয়াহীন চাকার সাইকেলে মাতালের মতো টলতে টলতে ওই দূরে চলে যাচ্ছে।

রেবন্ত বাজারের দিকে হাঁটতে থাকে। মাথার মধ্যে একটা অস্পষ্ট দুশ্চিন্তা খামচে ধরেছে হঠাৎ। কোনও মানে হয় না।

১১

শ্যাওলা-ধরা পিছন দেয়ালের একটা খাঁজে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর রেখে উঠে বনশ্রী অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখল। ধূলিধূসর সাইকেলে হা-ক্লান্ত রেবন্ত আর তার পিছু পিছু রাজু। একটা আতা গাছ তার উচ্ছল সবুজ পাতা নিয়ে ঝেঁপে পড়েছে সামনে। তার আড়ালে চলে গেল ওরা।

এত অবাক বনশ্রী যে, ডাকতেও পারল না। রেবন্ত এই অবেলায় বাড়ির পিছনের ছাড়া জমিতে কী করছিল? কেনই বা রাজু বলছিল সাইকেলের কথা?

বনশ্রী পাঁচিল থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ফটকের দিকে যেতে থাকে। একটা কিছু হবে, একটা কিছু ঘটবে, তার মন বলছে।

ফটকের বাইরে এসে একই দৃশ্য দেখতে পায়। একটু দূরে খুব ধীরে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে রেবন্ত। পিছনে রাজু। রেবন্ত মাঝে মাঝে ফিরে দেখছে রাজুকে।

এত দূর থেকে ডাকলে রাজু শুনতে পাবে না। বনশ্রী তাই দ্রুত পায়ে এগোতে থাকে। তাড়াহুড়োয় চটি পায়ে দিয়ে আসেনি, কাঁকর ফুটছে, ব্যথা লাগছে বড্ড। তবু বনশ্রী হাঁটতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে বড় মাঠের ধারে শিমুল গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। মাঠের মাঝখানে সাইকেলের দুদিকে দুজন দাঁড়িয়ে। কী কথা হচ্ছে ওদের? মারামারি হবে না তো! ভাবসাব বড় ভাল লাগে না বনশ্রীর। বুকটা কেঁপে ওঠে।

মাঠে নামতে ঢালুতে পা বাড়িয়েছিল বনশ্রী, হঠাৎ দেখল রাজু সাইকেলটা কেড়ে নিয়েছে রেবন্তর কাছ থেকে। বহু দূরে মাঠের মধ্যে একা বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে রেবন্ত। রাজু টলমল করে বাচ্চা ছেলের মতো চালিয়ে আসছে সাইকেল। মুখে উপচে পড়ছে হাসি। একটু চেয়ে থেকে রেবন্ত মুখ ফিরিয়ে হাঁটা দিল। ক্রমে মিলিয়ে গেল অজস্র ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে। ব্যাপারটা মাথামুণ্ড কিছুই বুঝল না বনশ্রী।

রেবন্ত চলে গেলে বনশ্রী তরতর করে নেমে আসে খোলা মাঠের মধ্যে। রাজু এখনও অনেকটা দূরে। হাত তুলে বনশ্রী ডাকে—এই যে শুনুন, শুনছেন? এই যে!

রাজু টলমলে সাইকেলে আসতে আসতে খোলা মাঠের মধ্যে হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে গিয়ে চক্কর খায়। আবার এগিয়ে আসে। কী ভেবে আবার উল্টোবাগে ঘুরে দূরে চলে যেতে থাকে।

আচ্ছা পাগলা! বনশ্রী ডান হাতখানা তুলে ব্যাকুল হয়ে ডাকে—শুনুন, শুনুন, ও মশাই, শুনছেন? স্নান করবেন না? খিদে পায় না আপনার?

রাজু আবার ঘুরে গেল অন্য দিকে। বনশ্রী আবছা শুনতে পায় সাইকেলে বসে রাজু গান গাইছে—ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...

বড্ড বাঁধন-ছেঁড়া, বড্ড অবাধ্য লোক তো! বনশ্রী দাঁতে দাঁত চাপে। রাগে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে লঘু পায়ে ছুটে যায় সে। কোথায় পালাবে লোকটা? পালাতে দেবে কেন বনশ্রী?

ধীর সাইকেলে কিছু দূর চলে গিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে আসতে থাকে রাজু। যেন জীবনে প্রথম সাইকেল শিখছে।

বনশ্রীর মুখ লাল। ঘামে ভেজা, চুলের ঝাপটা এসে পড়েছে কপালে। সাইকেলের পাশাপাশি ছুটতে ছুটতে বলে—এটা কী হচ্ছে শুনি!

রাজু বনশ্রীর মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হাসে। হঠাৎ হ্যান্ডেল ছেড়ে দুহাত তুলে চেঁচায়—ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...

বনশ্রী হ্যান্ডেল ঠেলে ধরে। সাইকেলটা কাত হয়ে পড়ে। রাজু ফের টেনে তোলে সাইকেল। গম্ভীর মুখে বলে—এটা নিয়ম নয়।

বনশ্রী হাসে—আমি নিয়ম মানি না।

কাতর স্বরে রাজু বলে—সবাই দুয়ো দেবে যে!

অবাক বনশ্রী বলে—কীসের জন্য দুয়ো দেবে?

রাজু মাথা নেড়ে বলে—সাইকেল থামাতে নেই! অবিরাম চলবে। অবিরাম। ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...

বনশ্রী বাধা দিতে ভুলে যায়। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রাজু হাওয়াহীন চাকার ধীরগতি সাইকেলে উঠে ভারী কষ্টে প্যাডেল ঠেলতে থাকে।

মাটির নীচে প্যাচপ্যাচে জল, কাদামাখা ঘাস, পিছল জমি হাওয়াহীন চাকাটাকে টেনে ধরে বার বার। গভীর চাকার দাগ বসে যেতে থাকে মাটিতে। সাইকেল ধীরে ধীরে চক্কর দেয়।

বনশ্রীর গা শিউরে ওঠে হঠাৎ। সে দেখে, রাজুর সাইকেল তাকে মাঝখানে রেখে বার বার ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে।

নিজের রোগলক্ষণ খুব ভাল চেনে কুঞ্জ। বুকে ধীরে ধীরে জল জমছে। জ্বর বাড়ছে। অপঘাতের জন্য তাকে হয়তো অপেক্ষা করতে হবে না। শুধু নিজেকে একটু ঠেলে দিতে হবে মৃত্যুর গড়ানে ঢালুর ওপর দিয়ে। যখন গড়িয়ে যাবে তখন কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা না করলেই হল। আজ দুপুরে খুব ঠাণ্ডা হিম পুকুরের জলে অনেকক্ষণ ডুব দিয়ে স্নান করবে সে। পেট পুরে খাবে ভাত, ডাল, অম্বল। হুহুহু করে জ্বর বেড়ে পড়বে বিকেলের দিকে। ভাবতে ভাবতে কুঞ্জ একটু করে হাসে, আর শুকনো ঠোঁট চিরে রক্ত গড়িয়ে নামে।

তেল মেপে পয়সা গুনে নিয়ে তেজেন ফিরে এলে চৌকিতে উবু হয়ে বসে বলে—মাতালের কথা কে ধরছে বলো! কত আগড়ম বাগড়ম বলে! বাজারের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে তোমাকে আর ওর বউকে নিয়ে অত যে খারাপ খারাপ কথা চেঁচিয়ে বলল তা কে বিশ্বাস করছে? তারপর আমার দোকানেই তো সব এল ভিড় করে। হাসাহাসি কাণ্ড।

—কাল কি পরশু রাতে ঘটনাটা আমাকে বলিসনি কেন তেজেন? সারা বাজার জানল, কিন্তু আমার কানে কেউ তুলল না।

তেজেন খুব সান্ত্বনার স্বরে বলে—ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামিয়েছে নাকি? রোজই কোনও না কোনও মাতালের মাতলামি শুনছে সবাই। গুরুত্বই দেয়নি কেউ। আর তোমাকে ও সব কথা বলতে লজ্জা না? বলে কেউ? আজ তুমি জিজ্ঞেস করলে বলে বললাম। তুমি ভেবো না, ও সব কেউ মনেও রাখেনি, বিশ্বাস তো দূরের কথা।

কুঞ্জ আস্তে করে বলে—মানুষ ঘেঁটে বড় হলাম রে তেজেন। মানুষের নাড়ি আমি চিনি। ভাল কথা ঢাক বাজিয়ে বললেও মনে রাখে না, মন্দ কথা ফিসফিসিয়ে বললেও মনে গেঁথে রাখে। সবাই না হোক, কিছু লোক কি ভাববে না, হতেও পারে কুঞ্জ এরকম।

—দূর দূর। পাগল ছাড়া কে ভাববে অমন কথা? তোমাকে নিয়ে ও সব ভাবা যায়, বলো? কুঞ্জনাথ নামটার মানেই দাঁড়িয়ে গেছে ভদ্রলোক।

কুঞ্জ মাথা নাড়ে। সে জানে। চোখ জ্বালা করে জল আসে তার। মরতেই হবে, তাকে মরতেই হবে। মহৎ এক মৃত্যুর বড় সাধ ছিল কুঞ্জর। হাজার জন জয়ধ্বনি দিতে দিতে নিয়ে যাবে তাকে শ্মশানে। দলের ফ্ল্যাগে ঢাকা থাকবে তার মৃতদেহ। চন্দন কাঠের চিতায় পুড়বে সে। কত মানুষ চোখের জল ফেলবে। রেডিয়োতে বলবে, খবরের কাগজে বেরোবে, জায়গায় জায়গায় শোকসভা হবে। এখন আর তা আশা করে না কুঞ্জ। না, মৃত্যুটা তেমন মহৎ হবে না তার। তবু মৃত্যু তো হবে। সেটা ভেবে বুক থেকে শ্বাস হয়ে একটা ভার নেমে যায়।

তেজেনের দোকান থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকটায় একটু চেয়ে থাকে কুঞ্জ। জমজমাট বাজার। দর্জিঘর, শুকনো নারকোলের ডাঁই নিয়ে বসে আছে ব্যাপারিরা, শীতের সবজির দোকানে দোকানে থলি হাতে লোক। খুব ফটফটে রোদে সব স্পষ্ট পরিষ্কার। তবু এর ভিতরে ভিতরে উইপোকার সুড়ঙ্গের মতো অন্ধকারের নালী ঘা ছড়িয়ে রয়েছে। বাজার ইউনিয়নের সেক্রেটারি কুঞ্জনাথ তাকিয়ে থেকে বুকভাঙা আর একটা শ্বাস ফেলল। সেই শ্বাস বলে উঠল—ওরা জানে।

জীবনে এই প্রথম মুখ নিচু করে হাঁটে কুঞ্জ। তার শক্ত ঘাড় ব্যথিত হয়ে ওঠে। তবু কুঁজো হয়ে নিজের পায়ের কাছে মাটিতে মিশে যেতে যেতে সে হাঁটতে থাকে।

মাথায় নীল রঙের ক্র্যাশ হেলমেট, চোখে মস্ত গগলস পরা মামাতো ভাই নিশীথ তার নতুন কেনা স্কুটারে বোঁ-চক্কর দিয়ে এসে খবর দিল—মেলা ঘর পড়ে গেছে। অযোধ্যা, অনন্তপুর, নারকেলদা থেকে বহু লোক বউ-বাচ্চা নিয়ে এসে বাজারে থানা গেড়েছে। যাবে না কুঞ্জদা? মাতব্বররা সব

তোমার জন্য হাঁ করে বসে আছে যে।

বাইরের ঝড়ে কতটা ভাঙচুর হয়েছে তা ভাল করে দেখতে পায় না কুঞ্জ। সে সারাক্ষণ দেখছে তার ভিতরে মূল সুদ্ধ উপড়ে পড়েছে গাছ, উড়ে গেছে ঘরের চাল। ডিসপেনসারির বারান্দায় বিবশভাবে বসে নিজের ভাঙচুর দেখছিল কুঞ্জ।

—চল। বলে উঠতে গিয়ে কুঞ্জর মাথাটা আবার টাল্লা খায়। ডান বুকের ভিতরে একটা রবারের বল ভেসে উঠছে, ফের নেমে যাচ্ছে বার বার। রোগলক্ষণ চেনে কুঞ্জ। স্কুটারের পিছনে বসে বাজারের দিকে যেতে যেতে বার বার ঝিমুনি আসছিল তার। মনে হচ্ছিল, একটা ঢালুর মুখে গড়িয়ে যাচ্ছে সে।

মেলা কাদা মাখা, জলে ভেজা বিপর্যস্ত মানুষ, বাজারের পুব ধারে নিজেদের রোদে শুকিয়ে নিচ্ছে। শুকোচ্ছে ন্যাংটো আধ ন্যাংটো বাচ্চারা, কাঁথাকানি, মাদুর, চাটাই, পরনের কাপড়, শুকোচ্ছে মেয়েদের তেলহীন মাথার কটাসে রঙের চুল। তেজেনের দোকানঘরে পঞ্চায়েতের মাতব্বররা উদ্বিগ্ন মুখে বসে। কুঞ্জকে দেখে তারা শ্বাস ছাড়ে—ওই কুঞ্জ এসে গেছে! ক্লাবের ছেলেরা জড়ো হয়েছে বিস্তর, কিন্তু মাতব্বরদের তারা বড় একটা গ্রাহ্য করে না। কী করতে হবে, কার হুকুমে কে চলবে তা নিয়ে কোনও মীমাংসাও হচ্ছিল না।

কুঞ্জ আর নিজের শরীরটাকে টের পেল না অনেকক্ষণ। বাজারে তোলা তুলতে বেরিয়ে পড়ল ছেলেছোকরাদের নিয়ে। একদল গেল নারকেলদা, আর একদল গেল পুবপাড়া, অযোধ্যা, তেঁতুলতলা মুষ্টিভিক্ষা জোগাড় করতে।

বাজারের চালাঘর প্রায় সব কটাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। তারই বাঁশ খুঁটি দিয়ে মস্ত উনুনে শ দেড়েক লোকের আন্দাজ খিচুড়ি চাপাতে বেলা হয়ে গেল বেশ।

মহীনের দর্জিঘরের সামনে আতা গাছের ছায়ায় একটা টুল পেতে বসে কুঞ্জ খুব কষ্টে দম নেয়। পোড়া কাঠের ধোঁয়া আর তেল-মশলা ছাড়া খিচুড়ির ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। অনেক বেলা হবে বটে তবু লোকগুলো খেতে পাবে—এই ভেবে কুঞ্জ এক রকম তৃপ্তি পাচ্ছিল। পপুলারিটির কথাটা ক্ষণে ক্ষণে আজও হানা দিচ্ছে বুকের দরজায়। এই তো ডোল আদায় করতে গিয়ে ঘুরে দেখল, সে গিয়ে দাঁড়ালে মানুষ এখনও না করতে পারে না। কারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ কখনও করে না সে, কারও আঁতে ঘা দিয়ে বা অহংকারে আঘাত করে কথা বলে না, কাউকেই কখনও খামোখা চটিয়ে দেয় না, তোয়াজে সোহাগে সেবা দিয়ে সে মানুষকে অনেকটাই অর্জন করে রেখেছে। তাই আজও কারও কাছে গিয়ে হাত পাততে তার বাধে না। পাতলে পায়ও সে অঢেল। আর এই করে করেই সে কুঞ্জ, এক এবং অদ্বিতীয় কুঞ্জ। হয়তো এখনও তার সবটুকু শেষ হয়ে যায়নি।

ভাবতে ভাবতে দর্জিঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটু চোখ বুজেছিল কুঞ্জ। অমনি যেন কোত্থেকে কেষ্ট এসে সামনে দাঁড়াল। লাল চোখ, উলো-ঝুলো চুল, বিকট মুখ। বলল— তা বটে। তুমি হলে এ তল্লাটের মস্ত মাতব্বর কুঞ্জনাথ। তবে কী জানো বড় মানুষের দিকেই সকলের চোখ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। নজর রাখে, লোকটা দড়ির ওপর ঠিক মতো হাঁটতে পারছে কি-না। নাকি টাল খাচ্ছে, পড়ো-পড়ো হচ্ছে, কিংবা পড়েই গেল নাকি। উঁচুতে উঠলে তাই সবসময়ে পড়ার ভয়। আমাদের মতো মদো মাতাল বদমাশ যত যাই করি লোকে তেমন মাথা ঘামায় না? কিন্তু তুমি হলে কুঞ্জনাথ, তুমি পড়লে লোকে ছাড়বে কেন? বড় মানুষ পড়লে লোকের ভারী আনন্দ হয়। বড় মানুষের গায়ে থুথু দেওয়ার আনন্দ, বড় মানুষের গায়ে লাথি দেওয়ার আনন্দ।

একটা বিলি-ব্যবস্থা হয়েছে দেখে নিশ্চিন্ত মনে মাতব্বররা যে যার রওনা দিচ্ছে। নেত্য সাঁপুই এসে কুঞ্জর কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে বলল—পোয়াতি বউটা তোমার জন্যই প্রাণে বেঁচে গেল এ যাত্রা! গোপাল ডাক্তারও বলছিল, কুঞ্জ না থাকলে কেষ্টর বউয়ের হয়ে গিয়েছিল।

মড়ার চোখে কুঞ্জ তাকায়। শুকনো ঠোঁটে একটু হাসবার চেষ্টা করতে গিয়ে রক্তের নোনতা স্বাদ ঠেকে জিভে। সবাই জানে, নেত্য সাঁপুইয়ের পোষা ভূত আছে। এ তল্লাটের লোকের যত গুহ্য আর গুপ্ত কথা, যত কেলেঙ্কারি আছে তার সব খবর এনে দেয় নেত্যকে। নেত্য বাতাস শুঁকে টের পায় কোথায় মানুষের পচন ধরেছে, নিশুত রাতে কার ঘরে কে যায়, কোথায় ইধার কা মাল উধার হয়।

কুঞ্জ চোখ নামিয়ে নেয়।

নেত্য আফশোসের গলায় বলে—বাড়ি যাও। কাল সারাটা রাত জেগে কাটিয়েছ।

কুঞ্জ ওঠে। নেত্য সঙ্গ ধরে আসতে আসতে বলে—বউটা রক্ষে পেল সেইটেই এখন মস্ত সান্ত্বনা। তুমি বুক দিয়ে না পড়লে বাঁচত না। গলাটা খাটো করে নেত্য হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—কাল সাঁঝবেলায় বড় মাঠে নাকি কারা হামলা করেছিল তোমার ওপর। বলনি তো?

কুঞ্জ উদাস স্বরে বলে—ও কিছু নয়। চোর-টোর হবে, আমাদের দেখে পালিয়ে যায়।

—কেষ্টর কোনও খোঁজ পেলে?

—খোঁজ করিনি।

নেত্য খুব রাগ দেখিয়ে বলে—খোঁজ নেওয়া উচিতও নয়। পাষণ্ড একেবারে। মুখেরও লাগাম নেই।

শীতটা হঠাৎ ভারী চেপে ধরে কুঞ্জকে। নেত্যর শেষ কথাটায় একটু ইঙ্গিত আছে না? মুখের লাগাম নেই—কথাটার মানে কী?

নেত্য সাঁপুইয়ের মুখের দিকে আর তাকাল না কুঞ্জ, বাঁ ধারে ঢালুতে নেমে যেতে যেতে বলল—চলি নেত্যদা, শরীরটা ভাল নেই।

নেত্য চেঁচিয়ে বলে—এসো গিয়ে।

খালপোলে উঠতে গিয়ে এতক্ষণ বাদে কুঞ্জ আবার তার শরীরটাকে টের পায়। গা ভরে জ্বর আসছে। বুকের ব্যথা চৌদুনে উঠে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। শ্বাসকষ্ট চেপে ধরছে কণ্ঠা। দুপুরের সাদা রোদকে হলুদ দেখাচ্ছে চোখে। পুরো রাস্তাটা হেঁটে পার হওয়া যাবে না। কুঞ্জ সাঁকোর ধারে দুর্বল মাথা চেপে উবু হয়ে বসে পড়ে। সুযোগ পেয়ে কেষ্ট যেন সামনে এসে দাঁড়ায়, দাঁত কেলিয়ে হাসে, বলে—মানুষ পচলে তার গন্ধ বেরোবে না? তোমাকে যে পচায় ধরেছে তা আপনি ছড়িয়ে পড়বে। ও কি ঠেকানো যায়? আমার মুখের কথা বলে লোকে হয়তো প্রথমটায় তেমন বিশ্বাস করবে না, ভাববে কুঞ্জনাথ কি কখনও এ রকম হতে পারে? কিন্তু ধীরে ধীরে পচা গন্ধ ছড়াবে ঠিকই।

সাবিত্রীকে বলে এসেছিল কুঞ্জ, মরবে। মৃত্যুর একটা গহীন গড়ানে ঢালু উপত্যকা এখন তার সুমুখেই। যদি এখন নিজেকে একটু ঠেলে দেয় কুঞ্জ, যদি কোনও কিছু আঁকড়ে না ধরে তবে গড়াতে গড়াতে ঝম করে পড়ে যাবে নীচে, যেখানে মায়ের মতো কোল পেতে আছে শমন। নিজের রোগলক্ষণ চেনে সে। ডান বুকে জল জমছে। ব্যথা জ্বর। আজ ফিরে গিয়ে পুকুরে হিম ঠাণ্ডা জলে খুব ডুবে ডুবে স্নান করবে কুঞ্জ। ভাত খাবে। রাতে শিয়রের জানালা খোলা রেখে শোবে। নিজেকে একটু ঠেলে দেওয়া মাত্র।

মুখ তুলে সে তনুকে দেখতে পায় মনের মধ্যে। ভারী জলজ্যান্ত দেখতে পায়। বলে, তনু, একদিন তুমিও তো জানতে পারবে কুঞ্জদাকে যা ভাবতে তা সে নয়।

তনু করুণ মায়াভরা চোখে চেয়ে বলে, আমি তো তোমাকে কখনও ভুলিনি কুঞ্জদা। ঘর-সংসারের মধ্যে জড়িয়ে থাকি তবু এক মুহূর্ত আমার মন তোমাকে ছাড়া নয়। তবে তুমি কী করে ভুললে আমাকে? অন্য মেয়ে, পরের বউ—তাকে কী করে চাইলে?

কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে, সাবিত্রীকে তো আমার মন চায়নি তনু, শরীর চেয়েছিল। আমার শরীর এঁটো হয়েছে, মন নয়। ঠিক তোমার যেমন।

খালধারে মজন্তালির বাড়ি। কুঞ্জকে দেখে বেরিয়ে এল—কী গো, বসে পড়লে যে। শরীর ভাল তো?

কুঞ্জ মাথা নাড়ে—ভালই।

বলে উঠে দাঁড়ায়। মাথা টলমল করছে। দুপুরের রোদে কাঁচা হলুদের রং দেখছে সে। আর চারদিকটা কেমন যেন থিয়েটারের সিনসিনারির মতো অবাস্তব। কুঞ্জ হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, সে যেন কল্পনার রঙে ডোবানো অদ্ভুত এক স্বপ্নের মতো জায়গায় ঢুকে যাচ্ছে। চারদিকটা গভীরভাবে অবাস্তব, অপ্রাকৃত পরীর রাজ্য যেন। ঝিম ঝিম নেশার ঘোরের মতো জ্বর উঠছে তার। ফিরে যাবে নাকি? রিকশা ধরে নিতে পারবে বাজার থেকে কিংবা নিদেন কারও সাইকেলে সওয়ার হতে পারবে।

. একটু দাঁড়ায় কুঞ্জ। তারপর ভাবে, নিজেকে সেই গহীন খাদটার দিকে একটু একটু করে ঠেলে দেওয়াই ভাল। সে ফেরে না। বড় মাঠের দিকে এগোতে থাকে।

মস্ত বাঁশবন সামনে। সামনের মেঠোপথে কাঁচা হলুদ রোদে ঝলকানি তুলে কে যেন বাঁশবনের মধ্যে ঢুকে গেল কুঞ্জকে দেখে। চোখের ভুল নয় তো! এক ঝলক দেখা, তবু চেহারাটা কি চেনে না কুঞ্জ? বড় শ্বাসের কষ্ট বুকে। কুঞ্জ একবার বুকটা হাতের চেটোয় চেপে ধরে। বড় করে শ্বাস নেয়। চারদিকে এক অদ্ভুত রঙিন আলোয় অবাস্তব দৃশ্য দেখতে পায় সে। কানে ঝিমঝিম করে ঝিঁঝির ডাক বেজে যাচ্ছে। তবু বাঁশবনের অন্ধকারে ঝরা পাতার ওপর সাবধানী পা ফেলার আওয়াজ ঠিকই শুনতে পায় সে।

মেঠো পথ ছেড়ে কুঞ্জ বাঁশবনের ছায়ায় ঢুকে যায়। সামনে পথ বলে কিছু নেই। রোগা রোগা অজস্র ফ্যাঁকড়া বের করে বাঁশবন পথ আটকায়। কুঞ্জ গুঁড়ি মেরে ঢোকে ভিতরে। ভিতরে চিকড়ি-মিকড়ি আলো-ছায়া। পায়ের নীচে গতকালের বৃষ্টির জল, পচা পাতা। একটা লম্বাটে ছায়া নিচু হয়ে সরে যাচ্ছে পুব দিকে।

—রেবন্ত! চাপা স্বরে ডাকে কুঞ্জ।

ছায়াটা দাঁড়ায়।

কাতর স্বরে কুঞ্জ বলে—দাঁড়া রেবন্ত। চলে যাস না।

বাঁশবনে বাতাসের শব্দ হয় হু হু করে। পচাটে কটু গন্ধ উঠছে।

রেবন্ত গম্ভীর গলায় বলে—কী বলবি?

ধীরে ধীরে বাঁশ গাছের অজস্র কুটিকাটি ডালপালা সরিয়ে এগোয় কুঞ্জ। গালে মুখে চোখে খোঁচা খায়। তার চাদর ধুতি আটকে যায় বার বার। বলে—আমি মরলে কি ভাল হয় রেবন্ত?

রেবন্ত চুপ করে থাকে। তারপর বলে—তার আমি কী বলব?

কুঞ্জ প্রাণপণে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে ছায়াটার দিকে এগোয়। বলে—তুই বড় নষ্ট হয়ে গেছিস রেবন্ত। আমিও। আমরা মরলে কেমন হয়?

রেবন্ত চুপ করে থাকে। প্রায় হাত পনেরো তফাতে রেবন্তকে প্রায় স্পষ্ট দেখতে পায় কুঞ্জ। গায়ে শাল, মুগার পাঞ্জাবি, ধুতি। এলোমেলো চুল। বড় সুন্দর দেখতে।

কুঞ্জ বলে—দাঁড়া রেবন্ত। পালাস না।

রেবন্ত খুব অবহেলাভরে বলে—পালাব কেন? তোর ভয়ে?

কুঞ্জ হাসে। বলে—আজ আর আমাকে ভয় পাস না রেবন্ত?

—না।

—আগে পেতিস না?

—কোনওদিনই তোকে ভয় পেতাম না।

কুঞ্জ গর্জন করে ওঠে—পেতিস না? সত্যি করে বল পেতিস না? তোর সব জানি রেবন্ত। সত্যি করে বল!

খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল কুঞ্জ। রেবন্ত মুখ ঘুরিয়ে লম্বা পায়ে একটা ফাঁকা জমি পেরিয়ে আর একটা ঝোপের আড়ালে চলে যায়। বলে—ওইসব ভেবেই আনন্দে থাক। তবে জেনে রাখিস তোকে কেউ ভয় পায় না। ভয় পাওয়ার মতো কী আছে তোর?

কিছু নেই। কুঞ্জ জানে, আর কিছু নেই। থমকে দাঁড়ায় সে। সামনেই যেন কেষ্ট একটা লম্বা বাঁশ বেয়ে নেমে এসে তাকে হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কাঁচকলা দেখায়। বলে—তুমি তো আর দাদা নও। তুমি হচ্ছ আমার বউয়ের নাগু। লোকে জানবে তুমি আর কিছু পেল্লাদ নও, আমরা পাঁচজন যেমন দোষে-গুণে তুমিও তেমনি।

—দাঁড়া রেবন্ত। শোন!

রেবন্ত দাঁড়ায়।

কুঞ্জ বাঁশবনের মাঝখানটায় ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছে। ভারী নির্জনতা। খাড়া রোদ পড়েছে মুখে। ঝোপের আড়ালে রেবন্ত ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে। বলে—বল।

কুঞ্জ ক্লান্ত স্বরে বলে—অমি যদি মরি তা হলে তো দোষ কাটবে! তখনও কি আমার বদনাম করবি রেবন্ত?

রেবন্ত জবাব দেয় না।

কুঞ্জ আর এগোয় না। উবু হয়ে বসে নিজের টলমলে মাথাটা দু-হাতে ধরে থেকে বলে—আমি একটু ভালভাবে মরতে চাই। দিবি মরতে সেভাবে? একটু সম্মান নিয়ে, একটু ভালবাসা নিয়ে। সাবিত্রীর কথা রটাস না রেবন্ত। পটলকে বলিস আমি সন্ধের পর বড় মাঠে আসব। তৈরি থাকে যেন।

রেবন্ত জবাব দেয় না। বাঁশবনের ছায়ায় ছায়ায় তার লম্বা শরীরটা ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে। ঝরা পাতার ওপর পায়ের শব্দ হয় অস্পষ্ট।

১২

খাওয়ার পর ভিতরের বারান্দায় সাইকেলটা কাত করে ফেলে চাকার ফুটো সারাতে বসেছে রাজু। হাতের কাছে বড় কাঁচি, রবারের টুকরো, সলিউশনের টিউব, রবার ঘষে পাতলা করার জন্য ঝামা, হাওয়া ভরার পাম্প। অভ্যেস নেই বলে কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে না। শুভশ্রী করুণাপরবশ হয়ে এসে বলেছিল—দিন না রাজুদা, আমি সারিয়ে দিচ্ছি। রোজ সারাচ্ছি, আমার অভ্যেস আছে।

রাজু রাজি হয়নি—না, তুমি বরং দূরে বসে ডিরেকশন দাও।

বাইরের কোনও ছেলে বহুকাল ভিতরবাড়িতে ঢুকে এমন আপনজনের মতো ব্যবহার করেনি। সবিতাশ্রীর মুখে তাই মৃদু একটু স্মিত ভাব। বললেন—আমার জামাই বড় বাবু মানুষ। বিয়ের সময় এই দামি সাইকেল যৌতুক দিয়েছিলুম। বেশি দিনের কথা তো নয়, দ্যাখো কেমন দশা করেছে! একটু কিছু গোলমাল হলেই দোকানে দিয়ে আসে। গান্ধীজি চাইতেন নিজেদের কাজ নিজেরা করতে যেন আমরা লজ্জা না পাই। এই যে তুমি কলকাতার বড় ঘরের ছেলে, কেমন বসে বসে সাইকেল সারাচ্ছ—এই ছবিটাই কী সুন্দর!

রাজু মৃদু হাসে শুধু।

সত্যবাবু তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে দৃশ্যটা দেখছেন অনেকক্ষণ ধরে। সবিতাশ্রী তাঁকে জলের জগ দিয়ে আসতে গেলে তিনি আনন্দের স্বরে বললেন—ছোকরার রোখ দেখেছ! এ জীবনে যে আরও কত উন্নতি করবে! কুঞ্জকে আজ বিকেলেই বলব, বনার সঙ্গে জোড় মেলাতেই হবে।

মা বাবার মনের ভাব টের পেতে খুব বেশি দেরি হয়নি বনশ্রীর। তাই আর রাজুর সামনে আসেনি লজ্জায়। ঘরে শুয়ে সে একটা খোলা বইয়ের পাতায় চোখ রেখে আছে। কতবার যে পড়ল পাতাটা। একটা অক্ষরেরও মানে বুঝল না।

রবিবারের দুপুর। শুভশ্রী ক্লাবে গেল ক্রিকেট খেলতে। বাবা শুলেন। মা বসলেন সেলাই নিয়ে। রাজুর অদূরে শুধু ডগমগ চোখে চেয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিল চিরশ্রী। সে মুগ্ধ, সম্মোহিত। অবশেষে সেও গঙ্গা-যমুনা খেলতে যায়।

দ্বিধা জড়ানো পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে বনশ্রী। বলে—হল?

রাজু মুখ তোলে। একটু হাসে। মাথা নাড়ে।—না।

—কী অদ্ভুত মানুষ। ওই সাইকেলটা না হলেই চলছিল না? বাড়িতে দু-দুটো সাইকেল ছিল যে?

রাজু মৃদু হেসে বলে—এই সাইকেলটার কাছ থেকে আমার অনেক কিছু জেনে নেওয়ার আছে।

বনশ্রী হেসে ফেলে। বলে—মাথায় পোকা।

রাজু গম্ভীর মুখে চায়। ফের মুখ নিচু করে ঝামা দিয়ে রবার ঘষে পাতলা করতে করতে বলে—এই সাইকেলটারও কিছু বলবার আছে। শুনতে জানা চাই। সব জিনিসের মধ্যেই ঘটনা প্রবাহ, চেতনা আর চিন্তার কিছু ছাপ থেকে যায়। নইলে গ্রামোফোনের নিষ্প্রাণ রেকর্ড কি গান ধরে রাখতে পারত?

বনশ্রী তর্ক করল না। কেনই বা করবে? সে এ রকম কথা জন্মে শোনেনি। এ সব কথার প্রতিবাদ করারও কিছু নেই তো! শুনতে বেশ লাগে। হতেও তো পারে!

বলল—আমাকে শেখাবেন?

রাজু রবারে সলিউশন লাগিয়ে টিউবের ফুটোয় চেপে ধরে বলে—কী?

—কী ভাবে সাইকেলের কথা বোঝা যায়।

রাজু ঘাড় কাত করে বলে—শেখাব।

টিউবের ফুটো বন্ধ হয়ে গেল অবশেষে। রাজু সাইকেল দাঁড় করিয়ে হাওয়া ভরে। ক্রমে টনটনে হয়ে ওঠে চাকা। বড় উঠোনটায় সাইকেলটাকে একটা চক্কর দিয়ে এনে বারান্দায় পা ঠেকিয়ে দাঁড় করায় রাজু। বলে—চমৎকার।

জড়ো করা হাঁটুতে থুঁতনি রেখে চেয়ে স্মিত হ.সে বনশ্রী। বলে—সাইকেল কী বলল?

রাজু হাসে একটু—সাইকেল বলল, রাজু, আজ সকালেও আমি রেবন্তর ছিলুম, এখন তোমার।

বনশ্রী চোখ বড় করে বলে—আপনার মানে? জামাইবাবুকে সাইকেল ফেরত দেবেন না নাকি আপনি?

রাজু মৃদুস্বরে বলে—কথাটা তো আমার নয়। সাইকেলের। সাইকেল হয়তো ভুল বলছে, কিন্তু বলছে।

—আর কী বলছে?

রাজু দীর্ঘশ্বাস ফেলে—সব কিছু কি সহজে বোঝা যায়? আরও অনেক কিছু বলার আছে এর। ধীরে ধীরে বলবে।

রাজু আবার ধীর গতিতে সাইকেল ছাড়ে। উঠোনে চক্কর দিতে থাকে আস্তে আস্তে।

বনশ্রী জিজ্ঞেস করে—কী বলছে?

রাজু ভ্রূ কুঁচকে বলে—ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি জানতে চাই ভরদুপুরে এই সাইকেলটা কেন আপনাদের বাড়ির চারদিকে চক্কর মারছিল।

বনশ্রীর মুখে ধীরে একটা ছায়া নামে। সে মৃদুস্বরে বলে—আমি জানি না।

রাজু মৃদু হাসে—আপনার কাছে জানতে চায়ওনি কেউ। সাইকেলই বলবে।

বনশ্রী হঠাৎ তার বিশাল চোখে চেয়ে বলে—ওটা অলক্ষুণে সাইকেল। আপনি ওতে আর চড়বেন না। নামুন শিগগির। নেমে আসুন!

আত্মবিস্মৃত বনশ্রী বারান্দার প্রান্তে এগিয়ে আসে। সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রেখে ঝুঁকে বলে—আর কিছুতেই না। সাইকেলের কথা বুঝবার দরকার নেই আমাদের।

রাজু চেয়ে দেখে, সকালে যে লোকটা আয়নার আলো ফেলার মতো করে নিজেকে দূর থেকে বনশ্রীর মুখে প্রক্ষেপ করছিল বার বার সে লোকটার দম ফুরিয়েছে। রূপমুগ্ধ সেই অন্যমনস্কতা কেটে গেছে বনশ্রীর।

রাজু সাইকেল থেকে নামে। একটু ভেবে বলে—আমারও তাই মনে হয়। সাইকেলের কাছ থেকে আর কিছু না জানলেও আমাদের চলে যাবে।

বেলা ঢলে পড়ছে। গাছগাছালির রূপময় ছায়া উঠোনে নকশা ফেলে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। দূরে কুয়োয় বালতি ফেলার শব্দ হল ছপ। একটা কোকিল শিউরে উঠল নিজের ডাকে।

সাবিত্রী পাশ ফিরল। বড্ড যন্ত্রণা। আবার ও-পাশ ফিরল। বড্ড যন্ত্রণা।

ডাকল—টুসি। ও টুসি।

কেউ সাড়া দিল না।

বড় অভিমান হল, বড় একা লাগল সাবিত্রীর। শিয়রের জানালায় রোদ মরে এল। মহানিমের গাছে কুলকুল করে পাখি ডাকছে হাজারে-বিজারে।

সাবিত্রী শিয়রের জানালার দিকে তাকায়। ও পাশে কেউ নেই, জানে। তবু খুব কষ্টে উঠে বসে সাবিত্রী। জানালার দিকে চেয়ে বলে—আপনার জন্য বড্ড কষ্ট হচ্ছে। কোথায় আপনি?

বলে কান পেতে থাকে সাবিত্রী। পায়ের দিকের জানালা দিয়ে হু হু করে উত্তুরে বাতাস এসে দক্ষিণের জানালা দিয়ে বয়ে যায়।

সাবিত্রী বলে—এরা কেবল ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখছে আমাকে। আবার হয়তো এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। কোথায় আপনি?

কেউ নেই।

সাবিত্রীর চোখ ভরে জল আসে। বড় অভিমান। বলে—নিজেকে কখনও খারাপ ভাববেন না। লোকে বলবে লম্পট, চরিত্রহীন! লোকে কত বলে। ওরা তো জানে না। দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি নিজে কখনও নিজেকে ভাববেন না।

উত্তর থেকে বাতাস দক্ষিণে বয়ে যায়। বড় ঠাণ্ডা হিম বাতাস। একটা জোলো অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে। আকাশে একটা-দুটো তারা ফোটে।

সাবিত্রী ঘুমিয়ে পড়ার আগে চোখের জল মোছে। শিয়রের জানালার দিকে চেয়ে বলে—মরে গিয়ে আমাদের কারও লাভ নেই। আছে, বলুন? রবার ঘষে ঘষে পেনসিলের দাগ তুলতুম ইস্কুলে। দাগগুলো না হয় বাদবাকি জীবন ধরে তুলে ফেলব দু-জনায়। বলছি তিন সত্যি, আর রক্ত-মাংসের মানুষের মধ্যে নামিয়ে দেখব না আপনাকে। দূরে থাকবেন, কিন্তু বলুন বেঁচে থাকবেন।

সাবিত্রী উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে থাকে জানালার দিকে। কেউ জবাব দেয় না। শুধু পাখিদের শব্দ গাঢ় হয়। বাতাস নদীর স্রোতের মতো শব্দ তুলে গাছগাছালির ভিতর দিয়ে বয়ে যায়।

অবসন্ন মাথাটা বালিশে ফেলে সাবিত্রী। আবার একটা ঘুমের ঢল নেমে আসছে।

সাবিত্রী চোখ বোজে। নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। চোখের কোলে জল শুকিয়ে শুকনো নদীর খাতের চিহ্ন আঁকা হয়।

কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও বুকে হেঁটে ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড মাঠখানা পার হয় কুঞ্জ। কাঁচা হলুদ রঙের রোদ রক্তের মতো লাল হয়েছিল, তারপর গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেছে চরাচর। আকাশে হাজারো লণ্ঠন জ্বলে ওঠে। কুঞ্জ দেখে, এক মস্ত সমুদ্রের ধারে বিশাল জাহাজঘাটায় আলো জ্বলছে। সে ওইখানে যাবে।

জ্বরের ঘোর গাঢ় মদের নেশার মতো শরীর ভরে দিল। বার বার টলে পড়ে যায় কুঞ্জ। দাঁড়াতে গেলেই মাথা টলে যায়। তাই হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। আবার ওঠে। ভেজা মাটির ওপর কুয়াশার মেঘ ভেসে আছে। ক্রমে কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে দিগ্‌বিদিক। পরীর জগৎ মুছে যায়। চারদিকে কালো স্লেটে আঁকা এক ভুতুড়ে জায়গার ছবি।

রেবন্তকে কথা দিয়েছিল, সন্ধেবেলায় এই মাঠে থাকবে। কথা রাখল কুঞ্জ। ঠিক যেইখানে রবির টর্চ পড়েছিল কাল সেইখানে এসে দাঁড়াল সে। বলল—পটল, বড় দেরি হল রে! গায়ে জ্বর নিয়ে বাঁশ বনের মধ্যে পড়ে রইলুম যে অনেকক্ষণ। বেলা ঠাহর পাইনি। যখন চাইলুম তখন বেলা ফুরিয়েছে। তবু দ্যাখ, কথা রেখেছি। এই তো আমি। দ্যাখ, এই তো আমি। কাজ সেরে ফ্যাল এই বেলা। আর দেরি নয়। কোথায় কোন বাধা হয়, বিঘ্ন আসে।

শুধু বাতাস বইল। চারদিকে লম্বা লম্বা ভূতের ছায়া। আকাশে লণ্ঠন নাড়ে কালপুরুষ। সমুদ্রে অনেক জাহাজ ভেসে যাচ্ছে।

—পটল!

কেউ সাড়া দেয় না।

অনেক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কুঞ্জ। বড় হতাশ হয়।

—আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবি বাপ! একটা কোপের তো মামলা। এ তো নাটক নভেলের ভ্যানতারা নয় রে! কত জখম আমার শরীরে। টিকটিক করে বেঁচে আছি। তোর হাতও পরিষ্কার। এক কোপে কাজ হয়ে যাবে। আয় রে, তাড়াতাড়ি আয়।

কেউ আসে না। আকাশে লণ্ঠন নড়ে। সমুদ্রে জাহাজ ভেসে পড়ছে একের পর এক। কয়েকটা বাদুড় উড়ে যায় পাগলাটে ডানায়।

বিশাল ভারী মালগাড়ি টানতে যেমন হাফসে যায় পুরনো বুড়ো ইঞ্জিন, তেমনি বড় কষ্টে নিজেকে টেনে এগোয় কুঞ্জ। কোথাও পৌঁছোতে চায় না সে। শুধু একটা গড়ানে মস্ত খাদের দিকে নিয়ে যাবে সে নিজেকে। একটু ঠেলে দেবে শুধু। নীচে গভীর সবুজ উপত্যকা কোল পেতে আছে মায়ের মতো। আজ রাতে শিয়রের জানালা খোলা রেখে শোবে সে, কাল ভোরে পুকুরের হিম জলে ডুবে ডুবে স্নান

করবে অনেকক্ষণ। নিজের রোগলক্ষণ সে চেনে।

হিমে ভিজে যাচ্ছে চাদর। মাথায় ঠাণ্ডা বসে যাচ্ছে। বুকের ডানধারে রবারের বলটা মস্ত হয়ে ফুলে উঠেছে এখন। বাঘের মতো থাবা দিচ্ছে ব্যথা।

কুঞ্জ বসে। হামাগুড়ি দেয়। উঠে আবার কয়েক পা করে হাঁটে। কত ভূতের ছায়া চারদিকে। আকাশে লাল নীল লণ্ঠন দোলে। কত জাহাজ আলো জ্বেলে চলেছে গাঢ় অন্ধকার সমুদ্রে!

শিরীষ গাছের বিশাল ঘন ছায়া পার হতে গিয়ে একটু দাঁড়ায় কুঞ্জ। খুব ভাল ঠাহর পায় না জায়গাটা। এই কি তেঁতুলতলা? ওই কি পিচ রাস্তা? ওইসব আলো কি ভঞ্জদের বাড়ির?

চারদিকে চায় কুঞ্জ। কত জোনাকি পোকা শেয়ালের চোখের মতো দেখছে তাকে। এইখানে ছেলেবেলায় একটা খরগোশ ধরেছিল না সে? সেই খরগোশ শিখিয়েছিল কিছু জিনিস তার, কিছু তার নয়। বড় ভুল শিক্ষা। আসলে আজ কুঞ্জ শিখেছে, এখানে এই প্রবাসে কিছু তার নয়। পরের ধনে জমিদারি। পরের ঘরে বাস। এই তো কুঞ্জর ঝাটি পাটি গুটিয়ে গেল। যে শরীরটা দেখে কুঞ্জ বলে চিনত লোকে তাও সাপের খোলসের মতো ছেড়ে ফেলার সময় হল। সামনেই গড়ানে ঢাল। মৃত্যুর উপত্যকা কোল পেতে আছে।

গাছের গায়ে ভর রেখে দম নেয় কুঞ্জ। শ্বাসকষ্ট গলায় ফাঁসের মতো এঁটে বসছে ক্রমে।

গাছের ভর ছেড়ে কুঞ্জ টলতে টলতে এগোয়।

ডিসপেনসারির সামনে উপুড় হয়ে থেমে আছে একটা গোরুর গাড়ি। অন্ধকারে দুটো গোরু বড় শ্বাস ফেলে ঘাস খাচ্ছে। একটা ধোঁয়ায় কালি লণ্ঠন জ্বলছে ডিসপেনসারির বারান্দায়। সবই আবছা দেখে কুঞ্জ। কিন্তু দেখতে পায় একটা লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয়া। একটা বউ তার মাথার কাছে বসে আছে।

কুঞ্জর কানে ঝিঁঝি ডেকে যাচ্ছে। পৃথিবীর সব শব্দই বড় ক্ষীণ মনে হয়। তবু সে শোয়ানো লোকটার ঘড়ঘড়ে শ্বাস আর ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক ঘঙরঘঙ কাশির শব্দ শুনতে পায়।

আলোর চৌহদ্দিতে পা দেওয়ার আগেই বউটি উঠে দু পা এগিয়ে এসে আর্তস্বরে ডাকল, বাবু!

কুঞ্জর ঘোলাটে মাথার মধ্যে চিৎকারটা ঢোকে। ঢুকে কিছু কুয়াশা কাটিয়ে দেয় যেন। লোকের সামনে কোনওদিন দুর্বলতা প্রকাশ করে না সে। সে যে কুঞ্জনাথ।

প্রাণপণে নিজেকে খাড়া রেখে গলার ভাঙা স্বর যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে করতে বলে—কে?

—আমি বাসন্তী।

—কে বাসন্তী?

—পটলের বউ। পটল যে যায়! কখন থেকে এসে বসে আছি। গোপাল ডাক্তার জবাব দিয়েছে। বলেছে হাসপাতালে যেতে। সেখেনে নিচ্ছে না।

কুঞ্জ চেয়ে থাকে। কিছুই বুঝতে পারে না অনেকক্ষণ।

বাসন্তী বলে—ও বলছে, হরিবাবুর ভিটেয় নিয়ে চলো। যদি তাঁর আত্মা ভর করে তবে বাঁচব।

টলমল করছিল হাত, পা, মাথা। তবু নিজেকে সোজা রাখতে পারল কুঞ্জ। ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে গলায় বলল—কী চাস?

—ওষুধ দাও। আর কী চাইব? পটল বলছে তোমার ওপর হরিবাবা মাঝে মাঝে ভর করে।

কুঞ্জ ডিসপেনসারির বারান্দায় উঠে আসে।

ধোঁয়াটে লণ্ঠনের একটুখানি আলোয় ভাল দেখা যায় না। তবু অন্ধকার থেকে যখন আলোর দিকে মুখ ফেরাল পটল তখন সেই মুখ দেখে বুকটা মোচড় দেয় কুঞ্জর। দুখানা লাল টুকটুকে চোখ; এত লাল যে মনে হয় কেউ গেলে দিয়েছে চোখের মণি। মুখ ফুলে ঢোল হয়ে আছে। মুখের নাল আর শ্লেষ্মায় মাখামাখি ঠোঁট। কম্বলে কর্ম্ফটারে জড়ানো বুক থেকে ঘড় ঘড় শব্দ। হাঁ করে প্রাণপণে বাতাস টানার চেষ্টা করছে দমফোট বুকে। কথা ফুটছে না। তবু অতি কষ্টে বলল—হরিবাবার ছেলে তুমি...সে মড়া বাঁচাত...পারবে না?...ভর হোক...তোমার ওপর ভর হোক...

কুঞ্জ ডিসপেনসারির দরজা খোলে। বাতি জ্বালে। বাসন্তীকে বলে—ভিতরে এনে শুইয়ে দে বেঞ্চিতে।

গোরুর গাড়ির গারোয়ান আর বাসন্তী ধরে ধরে আনে পটলকে। কুঞ্জ আর তাকায় না পটলের দিকে। তাকাতে নেই। মানুষের মন তো! হিংসে আসে, বিদ্বেষ আসে, সংকীর্ণতা আসে। বেড়া হয়ে পড়ে, গণ্ডি হয়ে পড়ে। কোনওদিন কাউকে শত্রু ভাবে না কুঞ্জ। আজই বা ভাবতে গিয়ে নিজেকে ছোট করবে কেন? সে যদি মরে তো মাথা উঁচু করে মরবে একদিন।

আলমারি খুলে হরেক ওষুধের নাম গুন গুন করতে থাকে সে। প্রতিটি লক্ষণ মিলিয়ে আস্তে আস্তে তার বাবা এইভাবে গুন গুন করতেন। ধীরে ধীরে ওষুধের সংখ্যা কমে আসত। তারপর ঠিক একটা অমোঘ শিশির গায়ে হাত পড়ত তাঁর।

চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না কুঞ্জ। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধে নেই। কোন তাকে কোন শিশির পর কোন শিশি আছে তা তার মুখস্ত। একটু দোনো-মোনো করতে করতে একটা শিশির গায়ে হাত রাখে সে।

পটল ওষুধটা খাওয়ার আগে মাথায় ঠেকাল।

ঘণ্টাখানেকের ওপর বসে রইল পটল। তারপর আর একটা ডোজ দিল কুঞ্জ। শিশিটা বাসন্তীর হাতে দিয়ে বলে—নিয়ে যা। মাঝরাতে একবার খাওয়াস।

যাওয়ার সময় পটল কারও ওপর ভর দিল না। নিজে হেঁটে গেল। দরজার কাছ থেকে ফিরে চাইল একবার। অস্পষ্ট স্বরে বলল—হরিবাবা আজ নিজে এসেছিলেন। স্পষ্ট টের পেলুম।

চেয়ারে নেতিয়ে ঝুম হয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকে কুঞ্জ। বড় শীত। খোলা দরজা দিয়ে হুড় হুড় করে ঠাণ্ডার ধারালো হাওয়া আসে। কুঞ্জ চোখ বুজেও টের পায়, সামনেই সেই গড়ানে উপত্যকা, কী সবুজ! কী গভীর!

বহুকাল বাদে বাবা যেন ডিসপেনসারিতে এলেন আবার। কুঞ্জর পিছনে অস্ফুট গুন গুন স্বরে ওষুধের নাম বলতে বলতে আলমারি হাতড়াচ্ছেন। বাবা? নাকি রাজু? একবার মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জকে দেখলেন, খুব হেলাফেলার গলায় জিজ্ঞেস করলেন—তুই মরতে চাস কেন কুঞ্জ?

—না মরে কী হবে?

—জীবনটা কি তোর?

—তবে কার?

—যদি জানতিস কত করে একটা মানুষ জন্মায়, কত কষ্ট, কত খেসারত, কত রহস্য থেকে যায় পিছনে! তুই কি তোর জীবনের মালিক? মানুষের একটা স্রোত, একটা ধারায় তুই একজন। কত কষ্ট হয় গাছের একটা ফল ধরাতে জানিস?

—সব জানি, সব জানি। আর কিছু জানার নেই!

—তুই যে বড় ভালবাসতে জানতিস কুঞ্জ!

কুঞ্জ ধীরে ধীরে মুখ ফেরাতে চেষ্টা করে। ডানদিকে ফেরাতে পারে না, শক্ত ঘাড়। তাই অল্প শরীর ঘুরিয়ে তাকায়। ঘোলা চোখে কিছুই স্পষ্ট দেখতে পায় না সে। এখনও চারদিকে অবাস্তব, অপ্রাকৃত, ভুতুড়ে জগৎ। কী প্রকাণ্ড উঁচু দেখায় ওষুধের আলমারিগুলোকে। আলোটাকে মনে হয় গাঢ় হলুদগোলা জলের মতো অস্বচ্ছ। খুব অস্পষ্ট এক ছায়ার মতো মানুষকে দেখতে পায় সে। ছায়াও নয়, যেন কেউ ঘরের শূন্যতায় নিজের একটা ছাপ ফেলে রেখে চলে গেছে। ও কি বাবা? নাকি রাজু?

কুঞ্জ বলে—তুই কি রাজু? রাজু, ভোর রাতে ঘুমের মধ্যে কত ভয়ের শব্দ, যন্ত্রণার শব্দ করেছিস! কত কথা বলেছিস! তোর কীসের দুঃখ তা তো জানি না রাজু, তবে মনে হয়, কলকাতা শহর তোকে অল্প অল্প করে বিস্কুটের মতো ভেঙে ভেঙে খেয়ে নিচ্ছে। টের পাস না? তোকে যেমন খাচ্ছে শহর, আমাকেও তেমনি—

ছায়ামূর্তি গাঢ় শ্বাস ফেলে বলে—সব শহরই মানুষ খায়। সাপের মতো বাঁকানো দাঁত, একবার ধরলে আর ছাড়তে পারে না। যদি জোর করে ছিনিয়ে আনিস তবে সাপের মুখের ব্যাঙ যেমন বাঁচে না শহর থেকে ছিনিয়ে আনা মানুষও তেমনি বাঁচে না। কলকাতা একদিন আমাকে খাবে। কিন্তু তুই যে বড়

ভালবাসতে জানতিস কুঞ্জ।

—আমাকেও ভালবাসাই খেয়ে নিচ্ছে। তুমি কি বাবা? নাকি তুই রাজু? শোনো বাবা, আমি যে কুঞ্জনাথ। কুঞ্জনাথের কি কলঙ্ক মানায়!

রাজু নয়, যেন বাবা অলক্ষ্যে জবাব দেয়—কিন্তু তুই যে একশো বছরের কথা বলেছিলি। মনে নেই? একশো বছর পরের কথা ভেবে দ্যাখ, কেউ মনে রাখেনি এ সব। কে কুঞ্জনাথ আর কীই বা তার কলঙ্ক।

কে লোকটা তা বুঝতে পারে না কুঞ্জ। হয়তো বাবা, হয়তো রাজু। তার কাছে এখন জীবিত বা মৃত দুই জগৎই সমান। বাবা না রাজু তা বুঝতে পারল না কুঞ্জ। অস্পষ্ট লোকটার দিকে চেয়ে বলল—বড় কষ্ট যে।

—তুই যে বড় ভালবাসতে জানতিস কুঞ্জ। কত ভালবাসা তোর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে—আমি বাঁচব না, বড় জ্বর, বুকে ব্যথা, ডান ফুসফুসে জল জমছে হু হু করে।

বাবা বলে—দূর বোকা, ওঠ না। ডান দিকের আলমারির দু নম্বর তাকে খুঁজে দ্যাখ।

গড়ানে ঢালের মুখে কুঞ্জ থামে। নিজেকে ঠেলে দেওয়ার আগে একবার দেখে নেয় চারদিক। গহীন খাদ। সবুজ উপত্যকা কোল পেতে আছে। টলতে টলতে সে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায়।

কুঞ্জ ডানদিকের আলমারির পাল্লা খুলে হাত বাড়ায়। ওষুধের নাম গুন গুন করতে থাকে আপনমনে।

নীলু হাজরার হত্যারহস্য
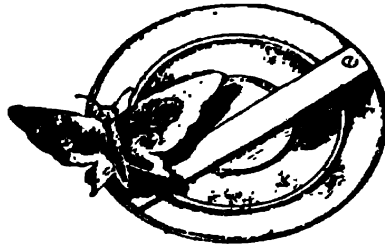
নির্জন এক নদী সারাদিন এলোচুলে পা ছড়িয়ে বসে মৃত্যুর করুণ গান গায়। চারদিকে নিস্তব্ধ এক উপত্যকা, দু-ধারে কালো পাহাড়ের দেয়াল উঠে গেছে আকাশে। এই বিরলে শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের মতো হু-হু বাতাস বয়ে যায়। অজস্র সাদা ছোট বড় নুড়ি পাথর চারদিকে অনড় হয়ে পড়ে আছে। খুব সাদা, নীরব, হিম, অসাড় সব পাথরের মাঝখান দিয়ে সেই নদী—উৎস নেই, মোহনা নেই। সারাদিন এখানে শুধু তার করুণ গান, মৃদু বিলাপের মতো। কিছু নেই, কেউ নেই। শুধু হাড়ের মতো সাদা পাথর পড়ে থাকে নিথর হয়ে। উপত্যকা জুড়ে এক মৃত্যুর সম্মোহন। এলোচুলে পা ছড়িয়ে বসে নদী অবিরল গান গেয়ে যায়।

আনমনা আঙুল থেকে আস্ত সিগারেটটা পড়ে গিয়েছিল ফুটপাথে। সিগারেটের আজকাল বড্ড দাম। তার ওপর এটা বেশ দামি ব্র্যান্ডের সিগারেট। শখ করে কিনে ফেলেছে বৈশম্পায়ন। আনমনেই বৈশম্পায়ন সেটা কুড়োতে নিচু হয়েছিল। শর্মিষ্ঠা দশ পা পেছনে, ছেলের বায়না মেটাতে ফুটপাথের দোকান থেকে মোজা বা গেঞ্জি কিনছে, আর অনবরত মৃদুস্বরে ধমকাচ্ছে ছেলেকে। দশ পা এগিয়ে এসেছে বৈশম্পায়ন। দশ পায়ের বিচ্ছিন্নতা। সিগারেটটা কুড়োতে হাত বাড়িয়েও সে ফিস ফিস করে বলল, ইট উইল নট বি এ ওয়াইজ থিং টু ডু মাইডিয়ার।

কুড়োনো হল না। নতুন একটা যে ধরাবে তাও হল না। এরিয়ালে এসে লাগল সেই মৃত্যু-নদীর গান। সাদা নিথর হিম পাথর সব মনে পড়ে গেল।

ডুমকি এখন অনেক দূরে। কারশিয়াং-এ। ডুমকির জন্য বড় হু-হু করে ওঠে বুক। মানুষ তো পাখি নয় যে, উড়ে যাবে। ডুমকির সঙ্গে এই অনেকটা অসহায় দূরত্ব এই মুহূর্তে ভীষণ টের পায় বৈশম্পায়ন।

দশ পায়ের দূরত্বে শর্মিষ্ঠা এখনও কী যে কিনছে। কই এসো, বলে তাকে এখন একবার তাগাদা দেওয়া যায়। কিন্তু সেরকম কোনও ইচ্ছেই হল না বৈশম্পায়নের। থাক, কিনুক। ছেলে বুবুম একবার ফিরে দেখল বাবাকে। তারপর ঝুঁকে পড়ল দোকানের জিনিসপত্রের ওপর।

বৈশম্পায়নের পকেটে গোদরেজের চাবি। পকেটে হাত পুরে চাবির রিংটা মুঠো করে ধরে থাকে সে কিছুক্ষণ। তার ফ্ল্যাট মোটামুটি নিরাপদ। প্যান্টের চোরা পকেটে বোনাসের দেড় হাজার টাকা। চাবির রিং ধরার ছলে সে দেড় হাজার টাকার ফোলা অংশটাকেও স্পর্শ করে আছে। কিন্তু এরিয়ালে নির্ভুল গানের তরঙ্গ ভেসে আসছে। হারিয়ে যাচ্ছে গোদরেজের চাবির নিরাপত্তা, টাকার মূল্য। বৈশম্পায়ন আর একটা সিগারেট বের করে।

সিগারেটটা ধরানো হল না কিছুতেই। আকাশ এখন কেমন? ছেঁড়া মেঘের তুলো গড়িয়ে যাচ্ছে নীল বেডকভারে। এখনও বৃষ্টির স্যাঁতা ভাব উবে যায়নি ফুটপাথের শান থেকে। শরৎ সবচেয়ে প্রিয় ঋতু বৈশম্পায়নের। তার প্রিয় হল টাকা, প্রিয় ডুমকি আর বুবুম। প্রিয় হোক বা না হোক অবিচ্ছেদ্য হল ওই শর্মিষ্ঠা। তার আরও কিছু প্রিয় আছে, তবে সবসময়ে একরকম নয়। তার প্রিয় রং সাদা। প্রিয় রাগ হংসধ্বনি। প্রিয় অভ্যাস বসে থাকা বা ঘুম। এই শরতের প্রিয় রোদে বউ আর ছেলেকে নিয়ে পুজোর বাজার করতে বেরিয়ে তার আগাগোড়া ভারী ভাল লাগছিল। কিন্তু হঠাৎ...

শর্মিষ্ঠা দোকান থেকে জর্দা পান মুখে দিয়ে তবে এল। হাতের জালের ব্যাগে দুটো ছোট প্যাকেট। আস্তে আস্তে প্যাকেট বাড়বে। জালের ব্যাগ উপচে পড়বে। আজ তারা বাইরেই কোথাও খেয়ে নেবে। সারাদিনের প্রোগ্রাম।

কিন্তু এখন বৈশম্পায়নের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। চোখের দৃষ্টি একটু অবিন্যস্ত, অস্থির। সে বলল, বাড়ি যাবে?

শর্মিষ্ঠা অবাক হয়ে বলল, বাড়ি যাব ? এখনও তো কেনাকাটা শুরুই হল না ! বলতে বলতেই সে বৈশম্পায়নকে ভাল করে লক্ষ করে এবং গলার স্বর পাল্টে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে ? শরীর খারাপ লাগছে নাকি ?

ভরা প্যাকেট ঢোকাতে গিয়ে সিগারেটটা দুমড়ে ফেলল বৈশম্পায়ন। চিন্তিত মুখে বলল, খারাপ লাগছে।

তা হলে চলো। ট্যাকসি ডাকি।

ডাকো। বলে বুবুমের হাত ধরে বৈশম্পায়ন। পরক্ষণেই মনে হয়, ব্যাপারটা অত্যধিক নাটুকে হয়ে যাচ্ছে। তার শরীর তেমন খারাপ নয় যে, বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকতে হবে। কিন্তু বাসায় ফিরলে অন্তত শর্মিষ্ঠার কাছে মুখ রাখতে তাকে অসুস্থতার থিয়েটার করতেই হবে। তা পারবে না বৈশম্পায়ন। বড় অস্থির লাগছে তার, ভয়ানক অস্থিরতা দেখা দেবে।

শর্মিষ্ঠা ট্যাকসি ডাকতে ফুটপাথের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৈশম্পায়ন বলল, শোনো।

কিছু বলছ ?

কেয়াতলা চলো। মাধবদের বাসায় একটু বসি। হয়তো সেরে যাবে।

শরীর কেমন লাগছে বলো তো !

অস্থির। বোধহয় পেটে গ্যাস-ট্যাস হয়েছে।

শর্মিষ্ঠা জানে, আজকাল স্ট্রোকের কোনও বয়স নেই, এবং মানুষ যখন তখন মরে যায়। দু চোখে ঘনীভূত সংশয় আর ভয় নিয়ে সে স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, বরং কোনও ডাক্তারের চেম্বারে চলো। দেখিয়ে নিয়ে যাই।

বুবুম মুখে আঙুল পুরে উর্ধ্বমুখে বাবাকে দেখছিল। বাবাকে হাতের নাগালে পেলেই বায়না কবা তার স্বভাব। কিন্তু এখন সেও কিছু টের পেয়ে গেছে। তিন বছরের বুদ্ধি আজকাল কিছু কম পাকে না। সে চুপ করে চেয়ে ছিল।

বৈশম্পায়ন বলল, ডাক্তার দেখানোর মতো কিছু নয়। একটু রেস্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শর্মিষ্ঠার সন্দেহ গেল না। তবে সে আপত্তিও করল না।

গড়িয়াহাটা থেকে সামান্য হাঁটতেই কেয়াতলার মোড়। মাধবদের বাসা মোড়ের কাছেই।

দরজা খুলল মাধবদের বাচ্চা ঝি। বাসায় আর কেউ নেই।

শর্মিষ্ঠা এই অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। সে বলল, ওরা তো ফিরবে। আমরা বরং একটু বসি।

ঝি শর্মিষ্ঠা এবং বৈশম্পায়নকে চেনে। মৃদু হেসে বলল, বসুন না।

বাইরের ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা নেই। তবে ডবল সোফা রয়েছে। বৈশম্পায়ন লম্বা মানুষ। শর্মিষ্ঠা একটু চিন্তিত হয়ে বলে, তুমি বেডরুমেই চলো। শোবে।

বৈশম্পায়ন মাথা নেড়ে বলে, আর না। পাখা খুলে দাও। একটু বসলেই ঠিক হয়ে যাবে।

জল খাবে ?

খাব।

শর্মিষ্ঠা নিজেই ডাইনিং স্পেস থেকে ফ্রিজের জল নিয়ে এল। বলল, আস্তে আস্তে খেয়ো। ভীষণ ঠাণ্ডা।

বৈশম্পায়নের ফ্রিজ নেই। কিনবে কিনবে করছে। খুব সাবধানে সে একটু একটু করে অল্প জল খেল। শরীরটা যে কোথায় খারাপ, কেন খারাপ তা ভেবে দেখতে লাগল সে।

বুবুমকে হিসি করাতে বাথরুমে নিয়ে গিয়েছিল শর্মিষ্ঠা। ফিরে এসে বলল, এদের সবকিছুই এত ঝকঝকে পরিষ্কার ! বাথরুমটায় শুয়ে থাকা যায়।

বৈশম্পায়ন এসব কথা নতুন শুনছে না। মাধব আর তার বউ ভালই থাকে। গুছিয়ে থাকে। সাজিয়ে থাকে। কিন্তু এই থাকা না-থাকার কোনও অর্থ আজ সে খুঁজে পাচ্ছে না। সোফায় ঘাড় হেলিয়ে সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে চোখ বুজে সে পাখার বাতাস শুষে নিচ্ছিল। সেইভাবেই রইল।

শর্মিষ্ঠা তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দুধের বোতল আর সন্দেশের বাক্স বের করে ছেলেকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। সারাদিনই তাকে অক্লান্ত চেষ্টা করে যেতে হয়। ছেলে খেতে চায় না। প্রথমে কাকুতি মিনতি "বুবুম লক্ষ্মী সোনা ! এই একটুখানি...আচ্ছা সেই ছড়াটা বলছি, হাট্টিমা টিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তা হলে সেইটে বলি...চলে মস মস মস মস বাঁ ডান মস মস সবচেয়ে ভাল পা গাড়ি, উঃ...সেই সকালে কখন একটু দুধ খেয়েছে, এত বেলা হল, কিচ্ছুটি নয় ! খাও বলছি। খাও। দাঁড়া তো...দেব ? দেব পিঠে একটা দুম করে ?"

এসবই মুখস্থ বৈশম্পায়নের ! এরপর মৃদু একটা থাপ্পড় এবং বুবুমের কান্না। সে চোখ না খুলেই বলল, আমার শরীর ভাল লাগছে না। একটু চুপ করো।

শর্মিষ্ঠা আর শব্দ করল না। কিন্তু তার এই নীরবতা রাগে ভরা তাও বৈশম্পায়ন জানে। শর্মিষ্ঠা ছেলেকে নিয়ে খাবার ঘরে চলে গেল।

বৈশম্পায়ন চোখ খুলল এবং প্যাকেট থেকে দোমড়ানো সিগারেটটা বের করে সযত্নে সোজা ধরিয়ে ফেলল।

চার বেডরুমের এই ফ্ল্যাটটা মাধব কিনেছে বছর দশেক আগে। তখন ফ্ল্যাটের দাম দু লাখের কাছাকাছিই হবে বোধহয়। বাইরের ঘরটা দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত বুক কেস দিয়ে সাজানো। কিছু পেতল আর পোড়ামাটির বাছাই কাজ রয়েছে। দেয়ালে কয়েকটা তেলের ছবি, কিছু ওরিজিন্যাল প্রিন্ট। মেঝেয় একটা সত্যিকারের উলেন কারপেট। খুব বড় নয়, তবে বসার জায়গাটুকু ঢাকা দিয়েছে। কার্পেটটির বাইরে ছিট ছিট লাল-কালো-সাদা মোজাইক করা মেঝে আয়নার মতো ঝকঝকে। মাধব আর ঝিনুকের ছেলেপুলে নেই।

"আমাকে পুষ্যি নে না" বলে ঠাট্টা করেছে একসময়ে বৈশম্পায়ন। কখনও আর একটু ফাজিল হয়েছে "তোর কর্ম নয়, ঝিনুককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস।" কিন্তু এখন আর কিছু বলা যায় না। ওদের আর হবে না তা বোঝা গেছে। তাই আর ঠাট্টা চলে না।

বৈশম্পায়ন খুব বড় একটা শ্বাস ফেলল। গোদরেজের তিন চারটে চাবির গোছা পকেটে থাকায় ফুটছিল। গোছাটা বের করে শর্মিষ্ঠার ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে রাখল সে।

আবার চোখ বুজল। তার কি শরীর খারাপ ? তার কি মন খারাপ?

খাবার ঘর থেকে বুবুমের অল্পস্বল্প কান্না আসছে। শর্মিষ্ঠা বেশ জোর গলায় ধমক মারল দুটো। বৈশম্পায়ন গ্লাসটা তুলে আবার একটু জল খায়। এখন আর জলটা তেমন ঠাণ্ডা নয়।

মাধবের সঙ্গে আগে যত ভাব ভালবাসা ছিল আজ আর তা নেই। এই পরিচ্ছন্ন ঘরে বসে থেকে বৈশম্পায়ন দূরত্বটা টের পায়। কবে কখন যে আস্তে আস্তে তারা দূরে সরে গেছে তা টেরও পাওয়া যায়নি । কিন্তু আজকাল মানুষের জীবন যাপনের প্রণালীটাই এমন হয়ে গেছে যে, কেউ আর নিকট হয় না কেবলই দূরে সরে যায়।

বৈশম্পায়ন জলের গ্লাসটা নাড়ে। জল ঘুরপাক খায় গ্লাসের মধ্যে। ঠাণ্ডা ভাবটা আরও কমে গেছে। আরও একটু জল খায় বৈশম্পায়ন।

মাধবের বাসায় আসতে তবু ইচ্ছে করে কেন তার ? সে রহস্যটা জানে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ঝিনুকও কি জানে ?

বৈশম্পায়ন নিঃশব্দে ওঠে। পর্দা সরালেই ওদের সুন্দর শোওয়ার ঘরটি। বারো বাই চোদ্দো ফুট হবে। চার দেয়ালে চার রকম মোলায়েম রং। দুটো সিংগল খাট। মাঝখানে এক চিলতে কার্পেট। ছোট একটা ক্যাবিনেটের ওপর ফুলের ভাস। তাতে টাটকা রজনীগন্ধাও। ক্যাবিনেটের ওপর স্টিলের ফ্রেমে বাঁধানো স্বামী-স্ত্রীর ফটো। বাঁ ধারে ঝিনুক। কী সুন্দর ! ঝিনুকের একটা ফটো বৈশম্পায়নের কাছেও আছে। কেউ তা জানে না। স্বয়ং ঝিনুকও নয়। সেই ফটোগ্রাফ আমৃত্যু গোপন থেকে যাবে বৈশম্পায়নের কাছে। যেদিন টের পাবে মৃত্যু আসছে, সেদিন ফটোটা নষ্ট করে দিয়ে যাবে সে।

দরজার বাঁ ধারে একটা চমৎকার শো-কেস। তার ওপর গাররেডের রেকর্ড চেঞ্জার। তার পাশে নীলুর ছবি। মাধবের কিশোর ভাই। খুন হয়ে গেছে।

নীলুর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ঝিনুককে বহুক্ষণ ধরে দেখে নেয় বৈশম্পায়ন। এই এক মুখ। দেখতে দেখতে মৃত্যু ভুল হয়ে যায়, জীবনের তুচ্ছতাগুলির কথা মনে পড়ে না, দুঃখবোধ থাকে না। বুক ভরে ওঠে আনন্দে।

সে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে, এ কি কাম ? এ কি পাপ ? এ কি বিশ্বাসঘাতকতা ?

মাধবের যখন বিয়ে হয় তখন বৈশম্পায়ন ডবলিউ বি সি এস পাশ করে বাঁকুড়া জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি করছে। আজও সেই চাকরি করে যেতে পারলে ভাল হত। ঝিনুকের সঙ্গে ফিরে দেখা হত না।

কিন্তু এ কেবল ইচ্ছাযুক্ত চিন্তা। দেখা হতই। দেখা না হলে হত কী করে ? আরও কয়েকটা জেলা মহকুমা ঘুরে প্রোমোশন পেয়ে এই কলকাতাতেই আসতে হত তাকে। তার আগেই অবশ্য সে এল। আলিপুরদুয়ার কোর্টে গণধোলাইয়ের পর কিছুদিন হাসপাতালে কাটিয়ে ভাঙা হাত আর জখমে শক্ত হয়ে ওঠা ঘাড় নিয়ে সে কলকাতায় চলে এল পাকাপাকি। একটা ব্যাঙ্কে বরাতজোরে চাকরি জুটে গেল। এ সবই নিয়তিনির্দিষ্ট, আগে থেকে ছক বাঁধা।

শর্মিষ্ঠা এসে বলল, শরীর কেমন লাগছে ?

ভাল। অনেকটা ভাল।

আর একটু বসবে ?

বসলে ভাল হয়। ওরা কি ফিরবে ?

ঝি তো বলছে ফিরবে।

একটু বসি। ওরা ফিরলে উঠব।

বুবুমের ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম পাড়িয়ে দাও।

আজ আর পুজোর বাজার হবে না মনে হচ্ছে।

তুমি একা গিয়ে কিনে আনো না।

এতে একটু সতেজ হয়ে শর্মিষ্ঠা বলে, যাব ? বুবুমকে কে দেখবে ?

দেখার কী? আমি বসে থাকব, ও ঘুমোবে।

দোনোমোনো করে শর্মিষ্ঠা বলে, তোমার মায়ের কাপড় যদি তোমার পছন্দমতো কিনতে না পারি ?

পারবে।

ঠকে আসলে বকবে না ?

মেয়েরা একটু তো ঠকেই। আজ কিছু বলব না। যাও।

কার জন্য কী যেন ?

জয়ের জন্য একটা ভাল প্যান্টের পিস আর শার্টের কাপড়।

প্রতিবারই জয়কে দিচ্ছ। এখন তো চাকরি করে।

ও চাকরিতে কী হয় ! এনো। সংসারে যখন থাকি না তখন তার কমপেনসেশনও কিছু দিতে হয়।

সংসারের সঙ্গে আজকাল কেউ থাকে না। ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখো।

ওঃ শর্মিষ্ঠা !

টাকা দাও।

কত লাগবে ?

হাজার খানেক দিয়ে রাখো।

বুবুমকে ঘুম পাড়িয়ে যাও। বলে চোরা পকেট থেকে টাকা বের করে বৈশম্পায়ন।

শর্মিষ্ঠা ব্যাগে টাকা রেখে ছেলের কাছে যেতে গিয়ে ফিরে বলে, চা খাবে ?

ওরা ফিরুক।

ওদের সঙ্গে তোমার কী ? ঝি করে দেবে।

তা হলে করতে বলো।

শর্মিষ্ঠা চলে গেলে বৈশম্পায়ন চোখ বোজে। সাদা হিম নুড়ি-পাথর ছড়ানো উপত্যকায় বয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর নদী। কী অদ্ভুত গান!

শর্মিষ্ঠা চলে যাওয়ার পর বেডরুমের পাশের লিভিং রুমে ফোনটা বাজল।

উঠে গিয়ে ধরে বৈশম্পায়ন।

মাধব আছে ?

না।

আপনি কে ?

আমি ওর এক বন্ধু!

আমি মাধবের বন্ধু। আপনি কে বলুন তো। নামটা কী ?

আমি বৈশম্পায়ন।

যাঃ বাব্বা! না মশাই হল না, আমরা কমন ফ্রেন্ড নই।

এরকম হতেই পারে। বৈশম্পায়ন খুব ভদ্র গলায় বলে।

ওর সঙ্গে কি আপনার দেখা হবে ?

হতে পারে। আমি ওর জন্যই বসে আছি।

একটু কাইন্ডলি বলবেন কাল সকালে ওর বন্ধু মদন আসছে! ও চিনবে। মদন এম পি।

মদনকে আমিও চিনি।

যা বাব্বা! তবু আমি আপনাকে চিনতে পারছি না কেন ?

ফোনের ভিতর দিয়েই ওপাশ থেকে একটু মদের গন্ধ পায় বৈশম্পায়ন।

॥ ২ ॥

শিয়ালদা মেন স্টেশনের ছ নম্বর প্ল্যাটফর্মে গেটের বাইরে ফরসা মতো একটা লোক খুব মাতব্বরি চালে প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছিল। টিকিট নেওয়ার কালো কোট দুজন থাকা সত্ত্বেও ভিড়ের ঠেলায় যাত্রীরা বেরিয়ে আসছে বেনোজলের মতো, কে কাকে টিকিট দেয়! এই লোকটা সেই ছিটকে আসা যাত্রীদের দু চারজনের দিকে হাত বাড়িয়ে টুকটাক টিকিট নিয়ে পকেটে ভরছে।

দার্জিলিং মেল লেটে আসছে। অনেকক্ষণ বাইরের চাতালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করল জয়। তার প্রথমে তেমন কিছু মনে হয়নি। ভেবেছিল কালো কোট খুলে রেলের টিকিটবাবুই টিকিট নিচ্ছে। খানিকক্ষণ দেখে-টেখে সন্দেহ হল, করাপশন।

জয়ের বড় জামাইবাবু বলেছিলেন, অন্যায় দেখলেই ফরম্যালি হলেও একটা প্রতিবাদ সবসময়ই করে রেখো। কাজ হোক বা না হোক বড় জামাইবাবু সর্বদাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে থাকেন। তাতে যে বড় জামাইবাবুর খুব ভাল হয়েছে তা নয়। বরং প্রোমোশন হয়নি, মেয়েরা যে যার ইচ্ছে মতো বিয়ে করেছে, তিন ছেলেই আগাপাশতলা দুর্নীতিগ্রস্ত, বড়দির সঙ্গেও বড় জামাইবাবুর বনিবনা নেই। তবু জয় বড় জামাইবাবুর এই একটা কথা মেনে চলার চেষ্টা করে।

দু দুটো লোকাল ট্রেনের পর প্ল্যাটফর্ম এখন ফাঁকা। করাপটেড লোকটা সাত নম্বরের বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করছে।

ও মশাই শুনুন। জয় লোকটাকে ডাকে।

লোকটা নিমীলিত চোখে চায়। চোখ দুখানা বড় বড়, ডাগর, মুখও ভদ্রলোকের মতো, রং ফরসা তবে গায়ের জামাপ্যান্ট ময়লা। লোকটা ঠোঁট থেকে একটা মাছিকে উড়িয়ে বলল, কিছু বলছেন ?

আপনি কি টিকিট কালেক্টর ?

আজ্ঞে না।

তবে প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছেন যে!

লোকটা একথায় সুড়ুক করে কাছে সরে আসে, তখুনি এই সাত সকালেও লোকটার মুখ থেকে

ভক করে মদের গন্ধ পায় জয়। লোকটা গলাটা ছোট করে বলে, চুরি ছিনতাই করি না। টিকিটে চার আনা করে হয়। খারাপ কিছু করছি দাদা ? মনে কিছু করলেন ?

জয় কঠিন হওয়ার চেষ্টা করেও পারে না। সে ভারতবর্ষের একটি বড় পার্টির দক্ষিণ কলকাতার একজন মেম্বার। সে দুর্নীতি রুখতে অনেক কিছুই করতে পারে বলে তার ধারণা। যদিও এই রাজ্যে তার দলের কোমরের জোর তেমন নেই, তবু তামাম দেশে তো তার দলই এখন খেলছে। এই লোকটাকে ইচ্ছে করলেই সে ধরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একটু মায়া হল। বয়সও বেশি নয়। ত্রিশের নীচেই।

জয় বলল, মদ খেয়েছেন ?

একটু। সেও কাল রাতে। কিছু মনে করলেন দাদা ?

আপনি কাজটা ঠিক করছেন না।

আজ্ঞে না। তবে কিনা পেটের দায়ে করতে হয়। কত লোকে আরও কত খারাপ কাজ করে। চারদিকে করাপশন অ্যান্ড করাপশন।

চার নম্বরে আর একটা লোকাল ঢুকতেই লোকটা সুট করে গেটের বাইরে গিয়ে গোলকিপারের মতো পজিশন নিয়ে নিল।

লোকটাকে ধরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা জয় দমন করল। করাপশন কোথায় নয় ? এই যে প্ল্যাটফর্মে ছানাপোনা নিয়ে কুঁদো কুঁদো সব মেয়েছেলে শুয়ে থাকে রাত্রিবেলা সেটাও বে-আইনি। আবার সকালে চাতাল ধোয়ার সময় ভিস্তিওলা যখন ওই ঘুমন্ত মেয়ে আর শিশুর গায়ে নির্বিকারে জল ছিটিয়ে উঠিয়ে দিতে লাগল তখন সেটাকেও খুব ন্যায় মনে হয়নি তার। মুশকিল হল, কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তার কোনও বাঁধাবাঁধি ধারণা সে আজও করে উঠতে পারেনি। গোটা দেশটায় কী যে সব ঘটছে।

দলের কিছু ছেলে-ছোকরা মদনদাকে রিসিভ করতে এসেছে। তাদের সঙ্গে জয় ভেড়েনি। মদনদার সঙ্গে তো তার ভিড়ের সম্পর্ক নয়। বহুকাল আগে হালতু থেকে পালবাজার অবধি মদনদা তাকে সাইকেলের রডে বসিয়ে ডবল ক্যারি করেছিল। আর, তার সেজদির সঙ্গে মদনদাব একটা সম্পর্ক তো ছিলই। সুতরাং জয়ের দাবি অন্যরকম। এম পি হয়েও মদনদা তার সঙ্গে ফাঁট দেখায় না কখনও। অবশ্য মদনদার ফাঁট বলতেও কিছু নেই।

লাউডস্পিকারে বার বার বলছে, ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক থাকার দরুন দার্জিলিং মেল আসতে পারছে না। সোয়া সাতটায় আসার কথা, এখন বাজছে নটা। দাঁড়িয়ে আর পায়চারি করে করে জয়ের হাঁটু দুটো ধরে গেছে। বাড়ি থেকে বেরোতে দেরি হল বলে কিছু খেয়েও আসেনি। স্টেশনের খচ্চরের পেচ্ছাপের চেয়েও খারাপ এক কাপ চা খেয়েছে ত্রিশ পয়সায়। তার মধ্যে পনেরো পয়সাই ফেলা গেছে। ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক বা খচ্চরের ইয়ের মতো চা, এই সবকিছুর মধ্যেই এই দেশটার পচনশীলতা লক্ষ করা যায়। কিছুই ঠিকমতো চলছে না, কিছুই ঠিকমতো হচ্ছে না। একজন এম পি সহ দার্জিলিং মেল আটকে আছে ডানকুনিতে, ভাবা যায় ?

টেকো হরি গোঁসাই এতক্ষণ প্ল্যাটফর্মে টানা মারছিল। অধৈর্য হয়ে এবার বেরিয়ে এসে জয়কে বলল, গাড়ি এত লেট ! এরপর তো আমার অফিস কামাই হয়ে যাবে !

জয়ের মেজাজ খারাপ ছিল। একটু তেরিয়া হয়ে বলল, দেরির কথা রাখো। বারোটার আগে কোনও দিন দফতরে গেছ ?

হরি গোঁসাইকে রসিক মানুষ বলে সবাই জানে। ফিচেল হেসে বলে, তা বারোটার সময়েও তো যেতে হবে নাকি ? এখানেই ন'টা বাজল।

দেরি হয়ে থাকলে চলে যাও।

সে না হয় গেলাম। কিন্তু তা হলে বিশুকে মেডিকেলে ভর্তি করার কী হবে ?

করাপশন ! করাপশন ! মদনদাকে এই লোকগুলোই খারাপ করে ফেলবে। ভারী বিরক্ত হয় জয়। স্টেশনে যে ক'টা লোক এসেছে সব ক'টা ফেরেব্বাজ, মতলববাজ। মুখে জয় বিরক্তির রেশটা ধরে রেখেই বলল, ও কথা তো মদনদা মালদায় যাওয়ার আগেই হয়ে গেছে।

দূর পাগল। এম পিদের মন হচ্ছে পদ্মপাতার মতো। কিছু থাকে না, গড়িয়ে পড়ে যায়। বার বার মনে করিয়ে দিতে হয়।

ফের বললে চটে যাবে।

চটলেও ভাল। তাতে মনে দাগ থেকে যাবে। চ' চা খেয়ে আসি। ডানকুনি থেকে গাড়ি ছাড়লে চল্লিশ মিনিট লাগবে। সময় আছে।

স্টেশনের চা ? ও বাব্বা !

না, বাইরে থেকে খাব। চল, হ্যারিসন রোডে ঢুকে একটা ভাল দোকান আছে।

লাউডস্পিকারে গমগমে গলা বলে উঠল, ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক থাকার দরুন...

দুজনে বেরিয়ে আসে।

হরিদা !

উঁ।

একটু আগে একটা লোককে ধরেছিলাম। প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছে। চার আনায় বেচবে। সারাদিন একটাই টিকিট কতবার যে হাতবদল হবে।

ও তো বহু পুরনো ব্যাপার।

লোকটাকে পুলিশে দিলে কেমন হত ?

তোর মাথা খারাপ ? ওদের সব সাঁট আছে। ধরিয়ে যদিও বা দিলি গ্যাং এসে মেরে পাট করে দিয়ে যাবে। যা কিছু হচ্ছে হোক, চোখ বুজে থাকবি।

জয় কথাটা মেনে নিতে পারে না। বলে, এরকম করে করেই তো আমরা দেশটার—

সর্বনাশ করছি। জয়ের কথাটা টেনে শেষ করে হরি গোঁসাই হাসে, উঠতি বয়সে ওরকম হয়।

বৃষ্টির জলে রাস্তায় থিকথিকে কাদা। তার ওপর খোঁড়াখুঁড়ির দরুন হাঁটা-চলাই দায়। হ্যারিসন রোডের চায়ের দোকানটায় পৌঁছতে গর্দিশ কিছু কম গেল না।

দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। মিনিট পাঁচ সাত দাঁড়িয়ে থেকে যদি বা বসার জায়গা পেল অতি কষ্টে, কিন্তু চা-ওয়ালা ছোকরারা পাত্তাই দেয় না। হরি গোঁসাই দুজনকে চায়ের কথা বলতে গেল, তারা অর্ধেক শুনেই অন্য কাজে ছুটে চলে গেল।

কিছু লোক আছে বুঝলে হরিদা, যাদের দেখলেই সবাই খাতির করতে থাকে। মদনদার কথাই ধরো, গঁড়ে বাজারে যেবার সত্যবাবুকে বাইরের দোকানিরা পেটাল, মদনদা গিয়ে দাঁড়াতেই সব জল।

পারসোনালিটি, বুঝলি !

সেই কথাই তো বলছি। আমরা রেশন অফিসে গেলে কেউ পাত্তা দেবে, বলো ? মদনদাকে দেখেছি, খুব কড়াকড়ি তখন, গিয়ে দু দিনে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের অফিস থেকে মেজদাদের রেশন কার্ড বের করে দিল। আগে থেকে কেউ চেনাজানাও ছিল না, কিন্তু গিয়ে এমন খাতির করে নিল যে, সবাই কিছু করতে পারলে যেন বর্তে যায়।

ও হল অন্য ধাত। বিশুটাকে মেডিকেলে ভর্তি করাতে যদি কেউ পারে তো মদনদা।

এবার কেন যে খুব উদার গলায় জয় বলে, হয়ে যাবে। ভেবো না। তবে কথাটা ঠিক, আজকাল মদনদা খুব ভুলে যায়।

এম পি-দের ঠেলা তো জানিস না। সকাল থেকে মাছি পড়ে। ক'টা মনে রাখবে ?

জয় দূরের দিকে চেয়ে ভারী ভালবাসার গলায় বলল, কিন্তু আগে মদনদার সব মনে থাকত। এমন সব কথা মনে থাকত যা ভাবলে অবাক হতে হয়।

হরি গোঁসাই খপ করে এক চা-ওলা ছোকরার কব্জি চেপে ধরে বলল, আমাদের যে গাড়ির তাড়া, দু কাপ চা টপ করে দেবে ভাই ?

তাড়া তো সবার। ছোকরা হেসে বলে, শুধু চা ?

শুধু চা। একটু দুধ চিনি বেশি করে—

তা অত কথা শোনার সময় ছোকরার নেই, হাত ছাড়িয়ে চলে গেল।

জয় বলে, নীলু হাজরার খুনের কেসটা মনে আছে ? মদনদা সাক্ষী দিয়েছিল। খুনের সময় নীলুর জামার রংটা পর্যন্ত হুবহু বলে দিয়েছিল। মদনদার সাক্ষীতেই তো নব হাটির চৌদ্দ বছর মেয়াদ হল।

মুখটা চোখা করে হরি গোঁসাই বলে, খুনটা কিন্তু নব করেনি।

তবে কে করেছে ? তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ঝুঁকে বসল জয়।

হরি গোঁসাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ভাল মানুষের মতো বলে, সে-সব কথা যাকগে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। তারপর আরও এক পর্দা গলাটা নামিয়ে নিজেকেই নিজে যেন বলল, এখন বিশুটা মেডিকেলে চান্স পেলেই হয়।

চা এসে যায়। বেশ ভাল চা।

নোনতা বিস্কুট খাবি ? হরি গোঁসাই জিজ্ঞেস করে।

আনমনে চায়ে চুমুক দিয়ে জয় বলে, না। তুমি খাও।

দার্জিলিং মেল আট নম্বরে ঢুকল ঠিক পৌনে দশটায়। এর মধ্যে আরও কিছু লোক জুটে গেছে মদনদাকে রিসিভ করতে। জনা দুই রিপোর্টার, দু-চারজন মহাজন, আরও কিছু ছেলেছোকরা ক্যাডার।

শুধু একটা মাঝারি মাপের ভি আই পি স্যুটকেস হাতে, পায়জামা পাঞ্জাবি পরা মদনদা ফার্স্ট ক্লাশ একটা কামরার দরজাতেই বিরক্তমুখে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন থামতেই নেমে পড়ল। ভিড়ের প্রথম হুড়োহুড়িটা কাটানোর জন্য একটু সরে দাঁড়াল। লোকগুলো গিয়ে মাছির মতো ছেঁকে ধরেছে মদনদাকে। কে যেন একটা মালা পর্যন্ত পরিয়ে দিল।

দিক। ওসব বাইরের মাখামাখিই তো আর আসল নয়। মদনদার সঙ্গে সত্যিকারে ঘনিষ্ঠতা তো জয়ের। এক সাইকেলে তাকে ডবল ক্যারি করেছিল মদনদা। তারই সেজদির সঙ্গে ভাব ছিল। আর কারও সঙ্গে তো অত গভীর সম্পর্ক নয়। মদনদার বয়স পঁয়ত্রিশ হবে হয়তো টেনেমেনে। এখনও বেশ টান ফরসা টনটনে চেহারা। দেখলেই সম্ভ্রম জাগে।

ট্রেন লেট ছিল বলে ব্যস্ত এম পি মানুষটার সময়ে টান পড়েছে। ভিড় কাটিয়ে জোর কদমে এগুচ্ছে। ওই হরি গোঁসাইয়ের ছেলেটা দড়াম করে পায়ের ওপর পড়ে প্রণাম ঠুকল ! দেখো কাণ্ড ! আর একটু হলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যেত লোকটা।

কিন্তু মদনদা পড়ল না। মদনদারা পড়ে না অত সহজে। এমনকী অসন্তুষ্টও হল না। লোক নিয়ে কারবার, লোকের ওপর বিরক্ত হলে চলবে কেন।

জয় দেখল, সে পিছনে পড়ে থাকছে। মদনদা তাকে দেখতে পায়নি ! গা ঘষাঘষি সে পছন্দ করে না বটে, কিন্তু জানান দেওয়ার জন্য একবার বেশ জোর গলায় ডাকল, মদনদা !

মদনদা পিছু ফিরে দেখে একটু হাসল।

দেখেছে ! যাক, নিশ্চিন্তি। জয়ের সকালটা সার্থক।

॥ ৩ ॥

খবরের কাগজ নিয়ে পায়খানায় যাওয়াটা মোটেই ভাল চোখে দেখে না মণীশ। কিন্তু সংকোচবশে শালা মদনকে কথাটা বলতেও পারে না। মণীশরা চিরকাল এঁটোকাঁটা, শুদ্ধাচার, বাথরুমে যাওয়ার অবশ্য পালনীয় নিয়ম কানুন মেনে এসেছে। তার বাসার সবাই মানে।

খবরের কাগজটার জন্য অস্বস্তি বোধ করছিল মণীশ। সকালের দিকে অফিসের তাড়ায় ভাল করে পড়া হয় না, তাই বিকেলে এসে পড়ে। আজ আর খবরের কাগজটা পড়া যাবে না। এম পি শালাকে কিছু বলাও যায় না।

মণীশ খেতে বসেছে। একটু দেরিতেই অফিসে যাচ্ছে আজ। ডালের মুখে একটু আলু ভেজে দেবে বলে চিরু তাকে আস্তে খেতে বলেছে। আস্তেই খাচ্ছে সে, কিন্তু ভাজাটা সময়মতো পাবে বলে মনে হচ্ছে না। মদনকে যারা স্টেশনে রিসিভ করতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে আট-দশজন

সঙ্গেই এসেছে। বাইরের ঘরে জোর গলা পাওয়া যাচ্ছে। চা না দেওয়াটা অভদ্রতা, তার ওপর এরা কেউই খুব এলেবেলে লোক নয়। চিরু এখন আলুভাজার কড়াই নামিয়ে চায়ের জল বসিয়েছে। সময় লাগবে।

আস্তে আস্তে খেয়েও মণীশের পাতের ডালভাত শেষ হয়ে এল। রান্নাঘর আর বাথরুমের মাঝামাঝি ছোট্ট এক চিলতে একটু ঢাকা জায়গায় অতিকষ্টে তিন ফুট একটা টেবিল আর দুটি চেয়ার পেতে তাদের খাওয়ার জায়গা। ডানদিকে একটা জানালা। জানালার পাশে গলি। সেদিক থেকে সূর্যালোকহীন স্যাঁতস্যাঁতে গলির সোঁদা গন্ধ আসে। জানালা দিয়ে সিনারি বলতে দেখা যায় শুধু পাশের বাড়ির দেয়াল এবং রেন পাইপ। ইদানীং রেইন পাইপ ঘেঁষে একটা অশ্বত্থের চারা বেরিয়েছে। ভারী সবুজ, ভারী সতেজ। রোজ ওই সবুজটুকুর দিকে চেয়ে ভাত খায় মণীশ। আজ দেখছিল বড় বড় তিনটে পাতার আড়ালে আর একটা কচি পাতা উঠেছে।

আর একটু বোসো, হয়ে এল। চিরু শোয়ার ঘরে তোলা কাপ প্লেট আনতে যাওয়ার পথে বলে গেল।

মণীশ শেষ গ্রাসটার দিকে চেয়ে রইল। চিরু আবার ভাত দেবে জোর করে, কিন্তু আজ আর তার খেতে ইচ্ছে করছে না।

কাপ প্লেটের পাঁজা নিয়ে চিরু যখন ফের রান্নাঘরে ঢুকছে তখন মণীশ বলল, শোনো, আমার পেট ভরে গেছে। দেরিও হয়ে যাচ্ছে।

সামনের জিনিসটা না খেয়ে চলে যাবে ? বোসো না। হয়ে গেছে তো।

কেন ঝামেলায় জড়াচ্ছ ? থাক না, রাতেও তো খেতে পারব।

শুধু তো ডাল ভাত খেলে !

হোক না, ডালে ঝিঙে আর লাউ দিয়েছিলে যে। শুধু ডাল ভাতের দোষ কেটে গেছে।

এ কথায় চিরু একটু হাসল। রুক্ষ চুল, না-সাজা চেহারায় চিরুকে এই ক্লান্তিতে ভরা হাসি দিয়ে চেনা যায়। কুড়ি বছর ধরে মণীশের সব দুঃখের ভাব বহন করছে। এই দু-ঘরের বাসার বাইরের পৃথিবীকে খুব একটা দেখেনি। ভাই এম পি হওয়ার পর একবার দিন দশেকের জন্য ছেলেমেয়ে নিয়ে দিল্লি গিয়েছিল। ব্যস।

রান্নাঘরে কাপ প্লেট ধুতে ধুতে চিরু বলে, বাসন্তীকে কখন বিস্কুট আনতে পাঠিয়েছি এখনও এল না।

আসবে। বলে শেষ গ্রাসটা মুখে দিয়ে মণীশ জল খেল।

আসবে তো। চা যে ঠাণ্ডা হবে ততক্ষণে। সরকারদের বাড়ির থেকে নাকি ভাঙানি দিচ্ছে। আজকাল কাজে একদম মন নেই। চলে গেলে কী যে করব। চিরুর গলায় অসহায়তা ফোটে বটে, কিন্তু রাগ বা বিদ্বেষ নেই।

বাসন্তী গেলেও লোক পাওয়া যাবে।

চিরু চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলে, এ চা-পাতাটার কত দাম গো ?

মদন আসবে বলে কাল একটু ভাল চা এনেছে মণীশ। বলল, ত্রিশ টাকা।

ভীষণ দাম।

পাঁচ বছর আগেও এই কোয়ালিটির চা ষোলো টাকায় কিনেছি।

দাম নিলেও গন্ধটা বেশ।

লোকজনের সামনে বাইরের ঘর দিয়ে খাবার আনাটা অভদ্রতা বলে চিরু বাসন্তীকে শিখিয়েছে, গলির জানালা দিয়ে খাবারের ঠোঙা গলিয়ে দিতে। মণীশ জলের গ্লাস রেখে যখন উঠতে যাচ্ছে তখন জানালা দিয়ে ঠোঙাসুদ্ধ কচি হাত ঢোকাল বাসন্তী, মামাবাবু, ধরো।

মণীশ বাঁ হাতে বিস্কুটের ঠোঙাটা নেয়। বলে, এসে গেছে।

চিরু বলে, আজ কি ফিরতে দেরি হবে ?

না। রোজ যেমন ফিরি। কেন ?

ভাবছিলাম, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলে একবার দমদমে কণাকে গিয়ে খবর দিয়ে

আসতে পারবে কিনা।

কেন বলো তো! হঠাৎ কণাকে কেন?

মদনকে ওর সব কথা এসে বলুক। যদি মদন কিছু করতে পারে।

একজন এম পি কী কী পারে তা খুব ভাল করে জানা নেই মণীশের। তবে হয়তো অনেক কিছুই পারে। হুট করে কিছু না বলে সে একটু ভাবল, ভেবে বলল, এ তো অত্যন্ত পারসোনাল প্রবলেম চিরু। মদন কী করবে?

আর কিছু না পারুক, সুভাষকে ভয় দেখাতে তো পারবে। কণা গত রবিবারে এসেও কত কান্নাকাটি করে গেল। বোম্বেতে বদলি হয়ে সেই যে চার মাস আগে গেছে সুভাষ, এখনও একবারটিও আসেনি। মাত্র তিনখানা চিঠি দিয়েছে। টাকা পাঠাচ্ছে খুব সামান্য। তার মানে তো বুঝতেই পারছ। ওখানে আবার কোনও মেয়েকে জুটিয়ে নিয়ে ফুর্তি করছে।

মণীশ একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলে, সুভাষ চিকিৎসার বাইরে। কারও কারও রক্তই ওরকম খারাপ। মদন ইন্টারফিয়ার করলে যদি আরও ক্ষেপে ওঠে তবে কণার ওপর টর্চার করবে।

টর্চার কি এখনই কম করছে? কণার জন্য আমাদের কিছু করাও তো দরকার। মদনকে বলি, তারপর ও যা ভাল বুঝবে, করবে।

ঠিক আছে।

তা হলে যাবে?

যাব।

গিয়ে বেশি দেরি কোরো না।

দমদম থেকে এই মনোহরপুকুর আসতে একটু সময় তো লাগবেই। চিন্তা কোরো না।

বাথরুম থেকে মদনের কাশির শব্দ আসছে। সঙ্গে জলের শব্দ। এবার বেরোবে। কিন্তু আজকের খবরের কাগজটা আর ভাল করে পড়া হবে না মণীশের।

মণীশ যখন পোশাক পরছে তখন মদন এসে ঘরে ঢুকল। কাঁধে তোয়ালে। হাতে জলের ছোপ লাগা খবরের কাগজ। পায়খানার কাপড়ও ছাড়েনি বোধহয়। ব্যস্ত এম পি, এসব ছোটখাটো ব্যাপারে নষ্ট করার মতো সময় নেই।

জামাইবাবু কি অফিসে বেরোচ্ছেন?

আর কী করি বলো?

আমার অনারে আজ অফিসটা কামাই দিতে পারতেন।

কামাই দিলেও লাভ নেই। তোমাকে পাব কোথায়? এক্ষুনি বাইরের ঘরের ভক্তরা তোমাকে দখল করে নেবে। তারপর প্রেস কনফারেনস আছে, রাইটার্স আছে, আরও কত কী!

মদনের চেহারাটা ভালই। লম্বা, একহারা, ফরসার দিকেই রং। মুখশ্রীতে একটু বেপরোয়াভাব আছে। একটু চাপা নিষ্ঠুরতাও। মদনের ভয়ডয় বরাবরই কম। কোনও ব্যাপারেই লজ্জা সংকোচের বালাই নেই। অবিশ্রাম কাজ করে যেতে পারে, সহজে ক্লান্ত হয় না। কাজ করতে করতে এযাবৎ বিয়ে করে উঠতে পারেনি। গায়ে একটা গুরু পাঞ্জাবি চড়াতে চড়াতে বলল, বাইরে হালদারের গাড়ি আছে। বলে দিচ্ছি, আপনাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

প্রস্তাবটি লোভনীয়। এখন এই দেরিতে বেরিয়েও বাসে উঠতে দারুণ কষ্ট হবে মণীশের। তবু সে মাথা নেড়ে বলে, ওবলিগেশনে যাবে কেন? আমাকে তো রোজই অফিসে যেতে হবে। রোজ তো হালদারের গাড়ি পাব না। তা ছাড়া অফিসের লোক গাড়ি দেখলে বলবে, এম পি শালার খুঁটির জোরে গাড়ি দাবড়াচ্ছি।

আপনাকে আর মানুষ করা গেল না।

চিরু চায়ের ট্রে হাতেই ঘরে ঢুকে বলে, মদন, তুই এখন কিছু খাবি না?

মদন ভ্রূ কুঁচকে বলে, বাইরের ঘরে চা দিচ্ছিস নাকি?

চিরু লজ্জা পেয়ে বলে, দিই একটু।

ডিসগাস্টিং। সারাদিন লোক এলে সারাদিনই চা দিবি নাকি? ওসব ভদ্রতা খবরদার করতে যাবি

না। ওদের দরকারেই ওরা আসে, আতিথেয়তার কিছু নেই।
তুই চুপ কর তো। আমার মোটেই কষ্ট হয়নি।
কষ্টের কথা নয়। ফতুর হয়ে যাবি।
তোকে এখন খাবার দেব তো।
না, একটু বাদে ভাত খেয়ে বেরোব।
চিরু চলে যেতে মদন চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে বলে, খাঁদু বুঁচি সব কই ?
ইস্কুলে। মণীশ বলে, সারা সকাল তোমার জন্য হাঁ করে পথ চেয়েছিল। ট্রেন লেট বলে আর থাকতে পারল না।
ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক থাকায় আটকে গেল গাড়ি। সকালে একটা ইমপরট্যান্ট এনগেজমেন্ট ছিল, রাখা গেল না।
মদন চারদিকে চেয়ে বলে, এ ঘরটায় কী করে যে এতকাল আছেন আপনারা। একে একতলা, তাতে ছোট ঘরে গাদা জিনিসপত্র। এতদিনে একটা বাড়ি করার মতো টাকা আপনার হয়েছে জামাইবাবু।
সতীনের ছেলেকে সবাই মোটা দেখে। টাকা হত, যদি বাখা যেত।
মদন মাথা নেড়ে বলে, আপনার কিছু হবে না জামাইবাবু।
যা বলেছ।
তবু আপনি ভীষণ হ্যাপি।
আবার সেই সতীনপো-এর বৃত্তান্ত ! পরের সুখই সকলের চোখে পড়ে।
চুল আঁচড়ে মদন ঘাড়ে গলায় একটু পাউডার দিল। বলল, আর কিছু না করুন, এবার একটা টেলিফোন লাগান। নইলে আমার ভাবী অসুবিধে।
ঠিক আছে, অ্যাপ্লাই করব।
আপনাকে কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই কববখন।

॥ ৪ ॥

ভুলে যাওয়ার এক অতুলনীয় ক্ষমতা আছে মদনের। আবার মনে রাখার ক্ষমতাও তার তুলনাবহিত। দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশে সে জীবনের ফালতু ঘটনা, মানুষ বা কথাকে ভুলে যেতে পারে। যা তার প্রয়োজন তা প্রখরভাবে মনে রাখে।
ফিটফাট হয়ে যখন সে বাইরের ঘরে ঢুকল তখন সকালের অনেক ঘটনাই ভুলে গেছে। আবার বেশ কিছু ঘটনা তার মনেও আছে।
মনে রাখার মধ্যে আছে দুজন সাংবাদিক। আগাগোড়া দুই রিপোর্টার তার সঙ্গে লেগে আছে।
ঘরে ঢুকেই সে বলল, শচী, বলো খবর কী ?
শচী লম্বা কালো রোগা এবং ধূর্ত। চারদিকে মিটমিটে চোখে চেয়ে নিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলে, খবর তো আপনার কাছে দাদা।
ঘরের কথাবার্তা থেমে গেছে। সকলে এম পি-র দিকে তাকিয়ে। প্রাইম মিনিস্টার পর্যন্ত এঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেন।
মদন চারদিকের মনোযোগটাকে খুব উপভোগ করে। দরজার কাছে রোগা ও অল্পবয়সী জয় তার চা এখনও শেষ করতে পারেনি । এবার এক চুমুকে শেষ আধপেয়ালা মেরে দিল।
মদন বলল, গত জুলাইয়ে মনসুন সেশনে আমি পার্লামেন্টে একটা বিলের ওপর খুব গুরুতর একটা প্রশ্ন তুলি। দিল্লি, এলাহাবাদ, বোম্বের কাগজে সেটা ফার্স্ট পেজে ফ্ল্যাশ করে। তোমাদের কাগজে তার সামান্য উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। কেন শচী ! বাঙালি এম পি বলেই কি তোমাদের এরকম মনোভাব ?
শচী জিব কেটে বলে, ছি ছি। কে না জানে, আমরা বাঙালি লিডারদের সবচেয়ে বেশি কভারেজ

দিই।

আমাকে দাওনি। কভারেজ আমি চাইও না। দি ইসু ওয়াজ ইমপরট্যান্ট। সেটা অন্তত কভার করা উচিত ছিল।

এজেন্সি আমাদের খবর দেয়নি তা হলে।

নিশ্চয়ই দিয়েছিল। পি টি আই, ইউ এন আই সকলে কভার করেছে। দেয়নি আমাদের দিল্লির করেসপন্ডেন্ট। আই হেট হিজ গাটস। তবে সনাতন মুখার্জিকে আমি চিনি। ওয়ান ডে উই উইল হ্যাভ এ শো-ডাউন।

সনাতনদার হয়তো দোষ নেই! খবরটা নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন, নিউজ ডেসকে বাদ হয়ে গেছে।

তাই বা কেন হবে? নিউজ ডেসক কি ঘাস খায়? খবরের ইমপরট্যান্স বোঝে না?

আমি জেনে আপনাকে বলব মদনদা।

মদন দেখেছে, কনফ্রনটেশন দিয়ে দিন শুরু করলে তার দিনটা ভালই যায়। এইজন্য সে সকালের দিকে একটা ঝগড়া বা চেঁচামেচি বাঁধিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। আজ শচীকে ধমকে তার বউনি বোধহয় ভালই হল।

ভোটের সময় মদনের পক্ষে পাণ্ডা ছিল শ্রীমন্ত। এতক্ষণ বাইরের রাস্তায় সিগারেট খাচ্ছিল দু-তিনজনে মিলে। মদন বাইরের ঘরে এসেছে টের পেয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরে একধারে একটা গদিআঁটা বড় সোফা, দুটো ছোট সোফা, কয়েকটা অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমেব পলিথিনের চেয়ার। সবটাতেই ঠাসাঠাসি ভিড়।

শ্রীমন্ত এসে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে কানে কানে বলে, হালদারের সঙ্গে একটু কথা বলে যাবেন। সবার হয়ে গেলে। প্রাইভেট।

শ্রীমন্তের কথা মানতেই হয় মদনকে। শ্রীমন্ত তার ডান হাত। মদন নিচু গলায় বলে, ফালতু লোক কিছু কাটিয়ে দে।

হরিদা তার ছেলেকে মেডিকেলে ভর্তি করানোর কথা বলতে এসেছে। কাল আসতে বলে দিই?

দে।

আর জয়?

ও কী চায়?

কিছু বলেনি। তবে কিছু চায় নিশ্চয়ই।

কাটিয়ে দে।

তা হলে ওদের নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। দুপুরে কি প্রেস ক্লাবে আসতে হবে?

আসিস।

শ্রীমন্ত ওঠে। পেটানো বিশাল চওড়া তার শরীর। একবার তাকালেই তার পেশা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। সে গিয়ে দরজার ভিড়টাকে প্রায় কোলে নিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

একটা চেনামুখের দিকে চেয়ে মদন হাসে, কী খবর?

আধবুড়ো সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোকটি কিছু তটস্থ হয়ে বলেন, রেল বোর্ডে আমার কেসটার কথা তুলবেন বলেছিলেন।

কাগজপত্র কিছু দিয়েছিলেন আমাকে?

দিয়েছিলাম। গত জানুয়ারিতে।

ওঃ, তা হলে হারিয়ে ফেলেছি। মাঝখানে ফিলিপিনস মালয়েশিয়া সব যেতে হয়েছিল ডেলিগেশনে। ফিরে এসে দেখি, ফাইলে অনেক কাগজপত্র নেই।

তা হলে?

একটা চিঠি করে দিয়ে দেবেন আমার কাছে। দেখব।

কথাটা ভাল করে শেষ করার আগেই বাঁ ধারের বুক কেসের কাছে দাঁড়ানো এক মহিলা বললেন, বাবা, আমার কথাটা একটু শুনে নেবে? বাড়িতে ছোট বাচ্চা রেখে এসেছি। দূরও অনেক, সেই বোড়াল।

বলুন।
আমি মণ্টু হাটির মা।
ও। মণ্টু কে যেন ?
আমার ছেলে। ওই বড়। মেজো নব।
নব ?
নীলু হাজরার খুনের দায়ে যে ছেলে জেল খাটছে।
মদন একটু নড়ে বসে, ও, তা কী চাই আপনার ? নবর জন্য তো আর কিছু করার নেই।
তার বউ বাচ্চা সব আমার ঘাড়ে। মণ্টু এক পয়সাও দেয় না। নব জেলে। আমি কী করে চালাই ?
আর্নিং মেম্বার কেউ নেই ?
না। নবর বউ একটা সেলাই স্কুলে কাজ করে। কিছু পায়। তাতে হয় না।
আমাকে কী করতে বলেন ?
নবর অফিসে যদি ওর বউয়ের একটা চাকরি হয়।
কোন অফিস ?
বেহালায়। সি সি পি কারখানা। বউ অনেক ধরাধরি করেছে, হয়নি।
কী বলে ওরা ?
খুনের বউকে চাকরিতে নেবে না।
সি সি পি না কী বললেন ?
সি সি পিই হবে বোধহয়। তাই তো শুনি।
আচ্ছা, বাইরে শ্রীমন্ত আছে। ওকে ডেকে ডায়েরিতে নামটা লিখিয়ে যান। দেখব।
দেখো বাবা।
একটা কথা বলব মাসিমা ? নীলু হাজরা ছিল আমার এক বন্ধুর ছোট ভাই। আমরা সবাই ভালবাসতাম তাকে। ভারী ভাল ছেলে ছিল।
নব হাটির বিধবা মায়ের চেহারাটা খুব নিরীহ ধরনের নয়। বয়স হলেও ডাকসাইটে স্বভাবের ছাপ আছে। কথাবার্তায় কোনও জড়তা নেই, ভয়ডর নেই। যে কোনও জায়গা থেকে কাজ আদায় করে আনার ক্ষমতা রাখে কিন্তু মদনের এই শেষ কথাটায় বুড়ি একটু কেমনধারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সন্দিহান চোখে মদনের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তা হলে কি ওর বউয়ের জন্য একটু বলবে না বাবা ?
মদন হাসল, খুন তো করেছে নব, ওর বউ তো নয়। বলব। তবে আমি দিল্লি হলে যতটা পারতাম এখানে ততটা তো পারি না। তবু বলে দেখব। কারখানার মালিক কে জানেন ?
কানোয়ার না কী যেন।
এই যে লম্বা চওড়া ছেলেটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওই শ্রীমন্ত। রাস্তায় আছে, একটু খুঁজে নিয়ে তার কাছে সব লিখিয়ে দিয়ে যান। আপনার বউমার নামও।
আচ্ছা।
প্রেস ক্লাব থেকে দুপুরে একটা ফোন করল মদন।
মাধব ?
আরে মদনা ? কোত্থেকে ?
মালদার ইনটিরিয়ারে বান দেখতে গিয়েছিলাম।
দেখলি ?
দেখলাম। মেলা জল।
ফি বছরই অক্রুর সংবাদ। এখানে জল, সেখানে জল, মরছে ভাসছে গৃহহারা হচ্ছে। তোরা করছিস কী ?
দিল্লিতে বসে মোচ তাওড়াচ্ছি। কী করার আছে ? ভেসে যাক, সব ভেসে যাক।

দে ভাসিয়ে তবে শালা, দে ভাসিয়ে। কোথায় উঠেছিস ?
আবার কোথায় উঠব। মনোহরপুকুর।
দিদির হাত ছাড়িয়ে আমার গাড্ডায় চলে আয়। কদিন আছিস ?
পুজোটা থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। হচ্ছে না। দিল্লি থেকে ডেকে পাঠিয়েছে, আবার এক ডেলিগেশনে অস্ট্রেলিয়া যেতে হবে।
ভ্যানতারা রাখ। তোর ডেলিগেশনও চিনি, তোর অস্ট্রেলিয়াও চিনি। কদিন আছিস তাই বল।
আমি নেই রে। পরশুদিন চলে যাচ্ছি।
তা হলে আজ চলে আয়।
পাগল ! আজ দিদি ত্রিশ টাকা কিলোর চিংড়ি আনিয়েছে।
তা হলে কাল ?
দেখি। ঝিনুক কেমন আছে ?
ঝিনুক ঠিক ঝিনুকের মতো আছে। ক্যাপটিভ ইন হার ওন শেল।
আমি বাবা তোদের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমগুলো একদম বুঝি না। মানুষের খাওয়া পরার সমস্যা আছে, আধিব্যাধি আছে, দুঃখ টুঃখও আছে, তবে তোদের সব সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার।
তোর সব কিছু বোঝার দরকার কী ? তুই যেমন দেশ কি নেতা মদনকুমার হয়ে আছিস তাই থাক না।
মদন খুব হো হো করে হেসে বলে, ইয়েস, মদন ইজ দেশ কি ন্যাতা। মদনাকে খুব সমঝে চলবি, বুঝলি !
আর সমঝাতে হবে না বাবা। ন্যাতাদের খুব ভক্তি মান্যি করি। ভাত কাপড় না দিক, কিলটাও আবার না বসায়।
বটেই তো। মদন গম্ভীর হয়ে বলে। তারপর গলাটা এক পর্দা নামিয়ে বলে, আরে শোন। নব হাটির মা এসেছিল আজ। ছেলের বউয়ের জন্য চাকরি চায়।
ওপাশ থেকে মাধবের সাড়াশব্দ কিছুক্ষণ পাওয়া গেল না। বেশ একটু ফাঁক দিয়ে আস্তে করে বলল, ছেলের বউয়ের জন্য চাকরি চায় ? নবর বউ সেই গৌরী না ?
হ্যাঁ। মদন একটা চাপা শ্বাস ছেড়ে বলে, খুব টেঁটিয়া বুড়ি। নব জেলে যাওয়ায় ওর বউ বাচ্চা নিয়ে নাকি বুড়ি বিপদে পড়েছে।
মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যা পারিস করিস। ওদের দোষ কী ?
পাগল নাকি ? অনেক ব্যাপার আছে।
কী ব্যাপার ?
পলিটিকস করতে গেলে সব দিক বিবেচনা করে ডিসিশন নিতে হয়।
তুই কি নবর বউকে চাকরি দেওয়ার মধ্যে পলিটিক্যাল গেইন খুঁজছিস নাকি ?
আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু প্লে ইট সেফ, দেখতে হবে মতলবখানা কী। আমাকে ফাঁসাতে চায় কি না।
ধুস শালা। খেতে পাচ্ছে না, তাই তোকে মাতব্বর ধরেছে। এর মধ্যে অন্য মতলবের প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে ?
পাবলিকের মন সবসময়েই ভারী সরল। আমাদের বুদ্ধি একটু প্যাঁচালো।
এই যে একটু আগে বললি মানুষের মনের ঘোঁরপ্যাঁচ বুঝিস না !
একেবারেই যে বুঝি না তা নয়। একটু একটু বুঝি, তবে তোর বা ঝিনুকের কথা আলাদা, তোদের তো কোনও বাস্তব সমস্যা নেই। তোরা কুঁথে কুঁথে সমস্যা তৈরি করছিস।
আমাদের ঘোরতর একটা বাস্তব সমস্যা রয়েছে। আমাদের কোনও বাচ্চা নেই !
আঃ হ্যাঃ, সে তো আমারও নেই।
তোর নেই কে বলল ?
তা হলে আছে বলছিস ?

থাকতেই পারে। লেজিটিমেট না তো ইললেজিটিমেট, বিয়ে তো করলি না স্রেফ ভয়ে। পাছে বউ এসে পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার তৈরি করায় বাগড়া দেয়।

বিয়ের বয়স যায়নি ব্রাদার। নাউ আই অ্যাম এ মোর এলিজিবল ব্যাচেলর।

ধুস শালা। এম পি একটা পাত্তর নাকি ? আজ আছে, কাল নেই।

কেন, লোকের মুখে শুনিসনি, পাঁচ বছর এম পি থাকতে পারলে সাত পুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে চলে যায়।

তা বটে। তা হলে কাল তোকে এক্সপেকট করছি!

দেখা যাক।

দেখা যাক নয়। আমি আর ঝিনুক কাল বাসায় থাকব তোর জন্য।

খুব চেষ্টা করব, না পারলে ফোন করব, তোর বাসার ফোন ঠিক আছে তো ?

কপালজোরে আছে। গত মাসেও পনেরো দিন বিকল ছিল, কালও যে থাকবে না তা বলা যায় না।

জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলোর কথাই আমাদের ভাবা উচিত।

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তোর মতো গাড়লরা গদিতে বসলে কী করে মানুষ উজ্জ্বল দিক নিয়ে ভাববে ?

খুব হেসে মদন বলল, আচ্ছা, আজ এ পর্যন্ত।

বলে ফোন রেখে দেয়।

॥ ৫ ॥

বাবা আধো অন্ধকার সন্ধ্যায় ঘরের মধ্যে বসে আছেন। মুখটা অস্পষ্ট, গায়ে একটা সাদা হাফশার্ট, পরনে খাকি রংয়ের প্যান্ট। টেবিলে কনুই, হাতের তেলোয় থুতনির ভর। একটু কুঁজো হয়ে চুপ করে চেয়ে আছেন। ভারী নির্জন চারদিক। শুধু পাখিরা ডাকাডাকি করছিল খুব। আর ঝিঁঝি। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিল ঝিনুক। সে তখন ছোট, বছর দশেকের মেয়ে। দৃশ্যটা আজও সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে মনে আছে।

বরাবরই বাবা চুপচাপ মানুষ! কঠিন, কর্তব্যপরায়ণ, কম কথার মানুষ। চেহারাটা লম্বা, মজবুত হাড়ের চওড়া কাঠামো, কালো, কর্কশ মুখশ্রী। তবু বাবার তুল্য পুরুষ ঝিনুক কখনও দেখেনি।

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে বাবার কাছে যেতে খুব ইচ্ছে হয়েছিল তার। কিন্তু সে স্পষ্টই দেখল, বাবা সেই ঘরে ঠিক বসে নেই। শুধু শরীরটা পড়ে আছে, আসল বাবা অনেক দূরে কোথাও বেড়াতে চলে গেছে বুঝি।

ঝিনুক আস্তে আস্তে সাহস করে এগিয়ে গেল কাছে।

বাবা, তোমার কী হয়েছে ?

বাবা আস্তে হাতখানা বাড়িয়ে ঝিনুকের চুলগুলো এলো করে দিল, হাঁটুর কাছে বুক চেপে ঊর্ধ্বমুখে ঝিনুক বাবার অস্পষ্ট মুখ দেখছিল। ভারী দুঃখী মুখ।

বাবা, তোমার মন খারাপ ?

না তো। এই একটু ভাবছি।

কী ভাবছ ?

তোমাদের কথা।

কেন বাবা ?

এমনি। আমি মাঝে মাঝে তোমাদের কথা ভাবি।

ব্যস, এর বেশি আর কথা হয়নি, তবু কত গভীর কত স্পষ্টভাবে দৃশ্যটা তার কালের চিহ্ন এঁকে রেখেছে আজও মনের মধ্যে!

তুমি বড্ড বেশি বাবা-বাবা করো ঝিনুক, বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই একটু অনুযোগের সুরে

কথাটা বলেছিল মাধব। তেমন কিছু নয় তবু তৎক্ষণাৎ নতুন স্বামীকে মনে মনে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল সে। কোনও জবাব দেয়নি, ঝগড়া করেনি।

ঝিনুক ভাবে, আমার বাবার মতো যে তোমরা কেউ নও।

পুরুষরা ঝিনুককে কী চোখে দেখে তা সে জানে। পথে ঘাটে যেসব পুরুষ তার দিকে তাকায় তাদের কাছে সে স্রেফ গোলাপি মাংস। মাধবের কাছে সে ভারী একঘেয়ে, বিরক্তিকর, খিটখিটে মেয়েমানুষ। তার যদি ছেলে থাকত তবে সব অন্যরকম হত, পুরুষমানুষের প্রতি এত ঘেন্না থাকত না।

ঘেন্না ? না, তাই বা বলে কী করে ? পুরুষমানুষকে ঘেন্না পেলে সে কি বাবাকে অত ভালবাসতে পারত ?

বাবার কথা ভেবে আজ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ঝিনুকের।

উদাসিনী ঝিনুক তার বটুয়াটা দোলাতে দোলাতে ভারী আনমনে হাঁটছিল, একজনের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা, হয়তো এক্ষুনি, হয়তো একশো বছর পর। কিন্তু হবে, সে মানুষ কেমন হবে তার একটা ভাসা ভাসা ধারণা আছে তার, স্পষ্ট কিছু জানে না। তবে এটুকু জানে, তার অনেকখানিই থাকবে এক প্রদোষের অন্ধকারের মতো রহস্যে ঢাকা। খানিকটা চেনা যাবে, অনেকখানি থাকবে অচেনা।

গড়িয়াহাটা ব্রিজের একদম মাঝখানে অনেকটা উঁচুতে উঠে ঝিনুক একটু ধীর হল। এপাশ ওপাশ দিগন্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখল। কত দূর ! কত দূর ! পৃথিবীর অন্ত নেই। দুরন্ত বাতাস এসে লাগছে নাকে মুখে। উজ্জ্বল আলো, নীল আকাশ। মানুষ পাছে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা-টত্যা কিছু করে সেই ভয়েই বোধহয় ব্রিজের মাঝ বরাবর দুধারের রেলিং-এর সঙ্গে মস্ত উঁচু জালের বেড়া। জালের ধারে দাঁড়িয়ে একটু দেখতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু রাস্তার লোকজন তাকাবে, ভাববে। ঝিনুক দাঁড়াল না। কিন্তু খুব ধীর পায়ে ঢালু বেয়ে নামতে লাগল। নীচে একটা নদী থাকলে এই ব্রিজটা আরও কত ভাল লাগত। ঢালুর মুখেই তার মনে পড়ল, মোগলসরাই ! মোগলসরাই ! সে এক অদ্ভুত ভাল জায়গা। সেইখানে থাকার সময় মাঝে মাঝে জিপ জোগাড় করে তারা পুরো পরিবার বোঝাই হয়ে যেত বারাণসী। মাঝপথে মস্ত ব্রিজ, নীচে গঙ্গা। বাবা সেখানে জিপ দাঁড় করাবেই। আর তখন ওই বয়সে ঝিনুক সেই ব্রিজ থেকে গঙ্গার প্রবহমানতার দিকে চেয়ে মূক হয়ে যেত ভয়ে বিস্ময়ে। শক্ত করে বাবার হাত ধরে থাকত সে। নইলে যে ভীষণভাবে গঙ্গা টানত তাকে। কেবলই মনে হত, অনিচ্ছে সত্ত্বেও হয়তো সে লাফিয়ে পড়বে। আজও উঁচু জায়গা থেকে নীচে জল দেখলে হাত পা কেমন সুলসুল করে তার। সম্মোহিত হয়ে যায়। মনে হয় জল তাকে ডাকে। জল কি প্রেমিক !

আপনমনে একটু হেসে ফেলে ঝিনুক। কী অদ্ভুত সে ! জল কি প্রেমিক ? একথাটা মাথায় এল কী করে ? মনটা বড় উড়ে উড়ে থাকে আজকাল, কোথাও বসতে চায় না। বড্ড বেশি কবিতা পড়ছে বলে নাকি ?

ব্রিজ থেকে নেমে ডান ধারে পঞ্চাননতলায় একটু ভিতর দিকে শুক্তির বাসা। অনেক ঘাটের জল খেয়ে কয়েক মাস হল এক কাঁড়ি টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে একতলার ছোট একটা বাসা নিয়েছে। বোন কাছাকাছি আসায় ঝিনুক প্রায়ই একবার ঢুঁ মেরে যায়। বয়সে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট শুক্তি জমাট সংসারী। দুটি ছেলের মা। অজস্র সমস্যায় কণ্টকিত। সবসময়েই মুখে একটা ভ্যাবাচ্যাকা ভয় পাওয়া ভাব।

ঝিনুক ঘরে ঢুকতেই শুক্তি বলে উঠল, উঃ দিদি রে, ঝি-এর অভাবে মরে গেলাম। দে না একটা ভাল দেখে ঝি। আজও আমাদেরটা কামাই করেছে। এঁটো বাসন ডাঁই হয়ে পড়ে আছে, অ্যাতো বাসি জামা কাপড় জমে আছে, ঘর মোছা হয়নি, কী যে করি।

ডানার ভর ছেড়ে ঝিনুক মাটিতে নামল। জাগল। চারদিকে চেয়ে দেখে বলল, একটুও টিপটপ থাকতে পারছিস না। কী যে করে রেখেছিস ঘরখানা।

ছেলে দুটো যে হাড় বজ্জাত। সারাদিন গোছাচ্ছি, সারাদিন লণ্ডভণ্ড করছে।

ঝিনুক সামনের ঘরে সোফা কাম বেডের বিছানায় বসে হাঁফ ছেড়ে বলল, ঠিক আছে, আমি গিয়ে পুনমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজকের মতো ঘরদোর সেরে দিয়ে যাক।

ও বাবা! চোখ বড় করে শুক্তি বলে, পুনমকে দিয়ে কী হবে। ও মুসলমান যে!

ঝিনুক আর একটু জেগে ওঠে। তাই তো, মনে ছিল না। মানুষের কতরকম সমস্যা থাকে, যা তার নেই। ঝিনুকের একটু চা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু শুক্তির অবস্থা দেখে আর খেতে চাইল না। উঠতে উঠতে বলল, আচ্ছা, দেখব।

শুক্তি বাইরের ঘরেই বঁটি পেতে আলুর খোসা ছাড়াতে বসেছে। গলা একটু নামিয়ে বলল, এ বাসাও ছাড়তে হবে। পিছন দিকে রেল লাইনের আশে পাশে গুণ্ডা বদমাস ওয়াগন ব্রেকারদের আড্ডা। কালও একটা ছেলেকে তাড়া করে ওই ভিতর দিকে নিয়ে গেল। মেরেই ফেলেছে বোধ হয়, আর কী বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি গালাগাল, শোনা যায় না।

ঝিনুক চোখ বড় করে চেয়ে থাকে। পৃথিবীতে এসব-ও ঘটে! কত কী ঘটে! মানুষ কতরকম ভাবে বেঁচে আছে। সে নিজে অবশ্য এতসব টেরও পায় না। বালিগঞ্জের অত্যন্ত নির্জন সুন্দর পাড়ায় চমৎকার ফ্ল্যাটে থাকে সে। নিজস্ব ফ্ল্যাট, কোনও দিন ছাড়তে হবে না। তার কাজের লোকের অভাব কদাচিৎ হয়, কারণ সে প্রচুর টাকা মাইনে দিতে পারে। তবে কি শুক্তির চেয়ে সে সুখী?

শুক্তির দিকে একটু চেয়ে থেকে নিজের সঙ্গে মেলাল সে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। এভাবে মেলানো যায় না। সুখ দুঃখের তুলনা কিছুতেই হয় না কখনও। শুক্তির বাসায় পা দিলেই তার এক ধরনের কষ্ট হয়, হাঁফ ধরে যায়। সে নিজে নিঃসন্তান আর শুক্তি দু'টি ছেলের মা বলে তার কখনও হিংসে হয় না। শুক্তির ছেলে দুটোকে সে খুব ভালবাসে। মাঝে মাঝে তার শুধু মনে হয়, একটা ছেলে থাকলে বেশ হত।

ঝিনুক অনেকটা জেগেছে। একটু ভেবেচিন্তে বলে, এবার তোরা একটা ফ্ল্যাট কিনে নে না।

টাকা কই? ফ্ল্যাটের যা দাম! এই তো দেখ, দেড় ঘরের ফ্ল্যাটের জন্য মাসে থোক চারশো টাকার মতো বেরিয়ে যাচ্ছে। হাতে কী থাকে বল! আমাদের ওসব হবে টবে না। চিরকাল ভাড়া বাড়িতেই পচে মরব।

বাদবাকি সময় অনেক কথা হল, কিন্তু ঝিনুক তখন মাটি ছেড়ে উড়েছে আবার, ভারী আনমনা।

শুধু উঠবার মুখে শুক্তি বলল, একটা খবর শুনেছিস দিদি?

কী রে?

নীলুকে যে খুন করেছিল, সেই নব গুণ্ডা নাকি জেল থেকে পালিয়েছে।

ঝিনুক খুব আনমনে বলে, তাই নাকি? বলেই হঠাৎ চমকে উঠল সে। নীলু! নীলুকে কে খুন করেছে?

তোর ভগ্নীপতি কোথা থেকে শুনে এসে কাল রাতে বলল।

ঝিনুকের ভারী মুশকিল। শত চেষ্টাতেও সে মনটাকে কোনও একটা জায়গায় রাখতে পারে না। কত কথা শোনে, ভুলে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে নব গুণ্ডার কথাও সে ভুলেই গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু হঠাৎ রুমঝুম নুপুর বাজিয়ে শরতের কিশোরী বৃষ্টি এল। দু মিনিট। একটা সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াল ঝিনুক। আর তখনই ওই সাদা রোদে মাখামাখি এক অপরূপ রুপালি বৃষ্টির দিকে চেয়ে থেকে মনে পড়ল তার। নব হাটি। নব হাটি কী অদ্ভুত নাম। লোকটা জেল থেকে ছাড়া পেল কেন? না, ছাড়া পায়নি তো! পালিয়েছে। তাই তো বলছিল শুক্তি! রুপোলি বৃষ্টির নাচ দেখে কেন কথাটা মনে হল? একটা সম্পর্ক আছে নিশ্চয়ই! কিন্তু নবর কথা নয়, বার বার নীলু এসে হানা দিচ্ছে মনের মধ্যে, যেন এক পাগলা বাতাস। ঝিনুকের ভিতরে উড়ে যাচ্ছে কাগজের টুকরো, উড়ছে পর্দা, ভেঙে পড়ছে কাচের শার্সি। ওলট পালট। ওলট পালট।

বৃষ্টি থামল। মেঘভাঙা রোদ অজস্র গয়নার মতো পড়ে আছে চারপাশে। গলির মুখে এসে একটা রিকশা নিল ঝিনুক। নইলে চটি থেকে কাদা ছিটকে দামি শিফনের শাড়িটায় দাগ ধরাবে।

বাড়িতে ফিরে ঝিনুক বাইরের ঘরে পাখাটা চালিয়ে একটু বসে। এ তার বহুদিনের অভ্যাস।

সেন্টার টেবিলের নীচের থাকে একটা দামি সিগারেটের খালি প্যাকেট।

ঝিনুক ভ্রূ কোঁচকায়। মনে পড়ে না। কার প্যাকেট ? কে ফেলে গেল ? মাধব তো এ সিগারেট খায় না !

নিচু হয়ে প্যাকেটটা তুলে নেয় ঝিনুক। দু হাতে ধরে চেয়ে থাকে যত্নে। কোনও মানে হয় না। মনে পড়বে না।

কিন্তু চোখ তুলতেই মনে পড়ল। ঠিক এই সোফায় বসে কাল দুপুরে অনেক সিগারেট খেয়েছিল বৈশম্পায়ন। কী অদ্ভুত ওর সেই বসে থাকা ! ওর বউ শর্মিষ্ঠা গেছে পুজোর বাজার করতে ! ওর ছোট ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। আর ও বাইরের ঘরে অদ্ভুত মুখ করে বসে আছে।

ঝিনুক সব জানে। সব জানে। বৈশম্পায়ন কেন আসে ফিরে ফিরে। ঈশ্বর !

বার বার উঠি উঠি করছিল বৈশম্পায়ন। বাইরে গিয়ে ঘড়ি দেখছিল শর্মিষ্ঠা ফিরছে কি না। আসলে তো তা নয়। এই একা বাড়িতে ঝিনুকের মুখোমুখি বসে থাকা তার কাছে অস্বস্তিকর। বড় অস্বস্তিকর।

মনে মনে ভারী হাসে ঝিনুক। অত যদি লজ্জা তবে ফটো তুলেছিলে কেন ?

ব্যাপারটা আর কেউ জানে না। এমনকী বৈশম্পায়নও জানে না যে, ঝিনুক জানে। বৈশম্পায়নের কাছে কথাটা কখনও বলেনি সে। স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে যেমন প্রথম পরিচয় এবং তারপর কিছু ঘনিষ্ঠতা হয় তার বেশি কিছুই করেনি ঝিনুক। কিন্তু তার এই একটা ঘটনার স্মৃতি আছে। বৈশম্পায়নকে এই তার প্রথম দেখা নয়, বৈশম্পায়নেরও নয় ঝিনুককে প্রথম দেখা।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে থাকতে বলাই সিংহী লেন ধরে আমহার্স্ট স্ট্রিট পেরিয়ে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তে যেত ঝিনুক। আর তখন ডান দিকে আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে রামমোহন রায় হোস্টেল থেকে কয়েকটা ছেলে রোজ লক্ষ করত তাকে।

ঝিনুক শুধু একজনকেই লক্ষ করেছে। অনুগত, বিশ্বাসী ভক্তের মতো, দোতলার এক জানালায় তার কামাই ছিল না কখনও। তবে সে মাঝে মাঝে নেমে আসত, পিছু নিত। বহু দূর ঘুরে উল্টো দিক দিয়ে এসে মুখোমুখি হত। তবে সাহসের অভাবে কখনও কথা বলেনি। সেই নীরব ভালবাসা কিশোরী ঝিনুকের সর্বাঙ্গে বকুলের মতো ঝরেছে তখন। এক বছর গড়িয়ে যাওয়ার মুখে একদিন ঝিনুক দোতলায় ছেলেটিকে খুঁজে পেল না। একটু অবাক হয়েছিল সে। ছেলেটা গেল কোথায় ?

ছেলেটা আসলে কোথাও যায়নি, শুধু জায়গা বদল করেছিল। নীচের তলায় হোস্টেলের কমনরুমে টুকটাক টেবিল টেনিসের আওয়াজ পেয়েছে ঝিনুক। সেই কমনরুমের খোলা জানালায় চোখের কাছে ক্যামেরা তুলে তাক করে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা। ঝিনুক তাকাতেই শাটার টিপল। তারপর খুব ভয়-পাওয়া ক্ষীণ গলায় বলল, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আর দেখা হবে না।

ঝিনুক জবাব দেয়নি। আজকালকার ছেলেমেয়ে হলে কবে লটরপটর করে ফেলত। কিন্তু তারা পারেনি। শুধু একটু মনখারাপ হয়েছিল ঝিনুকের। আর দেখা হবে না ?

অবশ্য না হলেই বা কী ? উঠতি বয়সের সুন্দরী ঝিনুক তার পরেও কত পুরুষের দৃষ্টিতে স্নান করেছে।

কিন্তু বৈশম্পায়ন ঠিক বলেনি। দেখা তো হল। কেউ কাউকে চেনা দিল না। কিন্তু চিনতে পারল ঠিকই। ঘটনাটা মনেই থাকত না ঝিনুকের, যদি সেদিন বৈশম্পায়ন ছবি না তুলত। বড় জানতে ইচ্ছে করে, সেই ছবিটা আজও বৈশম্পায়নের কাছে আছে কি না।

সিগারেটের প্যাকেটটা ঝিনুক আরও কিছুক্ষণ দেখল চেয়ে। তারপর উঠে গিয়ে ট্র্যাশ বিন-এ ফেলে দিয়ে আসবার সময় শুনল, ফোন বাজছে।

ঝিনি ?

হ্যাঁ।

একটা খবর আছে।

কী খবর ?

মদনা এসেছে।

মদনাটা আবার কে ?
আরে মদনা, আমাদের মদনা। এম পি।
তাতে কী হল ?
না বলছিলাম, ওকে কাল খেতে বললে কেমন হয়।
সে তুমি বুঝবে। আমি কী বলব ?
না, না, মানে বাড়িতে তেমন কোনও ঝামেলা কোরো না। ভাবছিলাম, চীনে রেস্টুরেন্টের খাবার নিয়ে যাব।
ভয়টা তো খাবার নিয়ে নয়।
ও হো হো, তুমি যা পাজি হয়েছ না ! আচ্ছা, এবার খুব ছোট একটা বোতল খোলা হবে।
সে তুমি খোলো গিয়ে। কাল আমি শুক্তির বাসায় গিয়ে বসে থাকব বিকেলে।
আরে, কী যে মুশকিল। এবার ঝামেলা হবে না, ঠিক দেখো। আরে, আমাদেরও তো বয়স হচ্ছে। আগের মতো বেহদ্দ ছেলেমানুষ আছি নাকি ?
তোমার ফ্ল্যাট, তাতে তুমি যা খুশি করবে। আমার কী ? আমি থাকব না।
এই কি প্রেম ঝিনি ?
সেটাও তুমি বুঝে দ্যাখো।
এটা প্রেম নয়।
আমি তো প্রেম চাই না।
তা বটে। তুমি সত্যিই প্রেম চাও না। মাধবের একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তা হলে ড্রাই হোক ?
সে তোমার খুশি।
বিয়ারে আপত্তি নেই তো ! ওটা তো মদের ক্যাটাগোরিতে পড়ে না।
ওসব আমি জানি না। মদনার গলা জড়িয়ে ধরে তুমি বদনা বদনা খাও। আমি সং সেজে বসে থাকতে পারব না।
না হয় তুমিও একটু খাবে। স্বাদটা জেনে রাখা ভাল।
আমার স্বাদের দরকার নেই।
আচ্ছা তা হলে ড্রাই। এক্সট্রিমলি ড্রাই। ও কে ?
কী একটা জরুরি কথা বলা দরকার যেন মাধবকে। কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ বলা দরকার। ভীষণ দরকার।
শোনো, একটু ধরে থাকো। জরুরি কথা আছে।
মনে পড়ছে না ?
না। তবে পড়বে।
ধরে আছি। তুমি বরং কথাটা মনে করার চেষ্টা না করে বাথরুমে গিয়ে চোখ-মুখে জল দাও। গুনগুন করে একটু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাও। মনটাকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখো। তা হলে হঠাৎ মনে পড়বে।
আঃ, একটু চুপ করো না ! এক্ষুনি মনে পড়বে।
চুপ করছি। কিন্তু তুমি একটু অন্য কথা ভাবো না ঝিনি ! মনে করো আমরা সেই উশ্রী নদীর ধারে দাঁড়িয়ে হাঁ করে পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছি। তুমি উঠতে ভয় পেয়েছিলে বলে ওঠা হল না। মনে পড়ে ?
মোটেই ভয় পাইনি। এক সাধু আমাদের উঠতে বারণ করেছিল।
ওই হল। সাধু ভয় দেখিয়েছিল, আর তুমি ভয় পেয়েছিলে।
সাধু ভয় দেখায়নি। সাবধান করেছিল।
এবার মনে পড়েছে ?
কী ?

জরুরি কথাটা ?

না, কিন্তু মনে পড়বে।

মনে করার চেষ্টা কোরো না। খবরদার। বরং আমাদের সেই বীভৎস মধুচন্দ্রিমার কথাটা মনে করো। নিছক বাঙালি বলে কিছু ছেলে সেবার সমুদ্রের ধারে আমাদের কী রকম হেকেল করেছিল। নতুন বউয়ের সামনে আমি একটু রুস্তম হতে গিয়ে কী রকম...

আঃ, চুপ করো না। ওসব কথা বলে আরও সব গুলিয়ে দিচ্ছ আমার। দাঁড়াও আসছি।

এই বলে ক্র্যাডলের পাশে রিসিভার রেখে দ্রুত পায়ে শোওয়ার ঘরে ঢোকে ঝিনুক। খুব ভাল সুগন্ধ মাখলে তার মন স্বচ্ছ হয়ে যায়। নিউ মার্কেট থেকে কেনা দুর্দান্ত একটা জার্মান সেন্ট আছে। ক্যাবিনেট খুলে বুকে সেইটে দুবার স্প্রে করে ঝিনুক। সম্মোহনের মতো গন্ধ। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

শিশি জায়গা মতো রেখে উঠে আসতে গিয়ে নীলুর ছবিটা চোখে পড়ল। ভাগ্যিস !

ফোন তুলে ঝিনুক বলে, নীলুকে যে খুন করেছিল তাকে মনে আছে ?

একটু চুপ করে থেকে মাধব যখন কথা বলল ফের, তখন সে অন্য মানুষ। এতটুকু রস-রসিকতা নেই গলায়। ধীর স্বরে বলল, আছে। কেন ?

তার নামটা কী ?

নব হাটি।

সেই নব জেল থেকে পালিয়েছে।

এবার এতক্ষণ চুপ করে থাকে মাধব যে, ঝিনুকের একবার সন্দেহ হয় ওপারে কেউ নেই।

শুনছ ?

শুনছি। তোমাকে কে বলল ?

শুক্তি।

শুক্তি জানল কী করে ?

ওকে বলেছে বিনায়ক।

বিনায়ক কার কাছে খবর পেল ?

অত শত জিজ্ঞেস করিনি। তবে মনে হল, খবরটা জরুরি। তোমাকে জানানো দরকার।

খবরটা খুবই জরুরি। ভীষণ জরুরি । তোমাকে ধন্যবাদ ঝিনি।

॥ ৬ ॥

কাল থেকে শুয়ে বসে সময় কাটাচ্ছে বৈশম্পায়ন। ডাক্তার বলেছে, রেস্ট নিন। কিন্তু মনে অস্থিরতা থাকলে কী করে মানুষ বিশ্রাম করবে কে জানে।

কালীঝোরার ডাকবাংলো থেকে সেই কবে তিস্তার উপত্যকা দেখেছিল বৈশম্পায়ন! সেই উপত্যকা আর নদী কী করে আস্তে আস্তে হয়ে গেল মৃত্যুর উপত্যকা, মৃত্যু নদী! এত সুন্দর একটি নিসর্গ দৃশ্যকে মৃত্যুর রং মাখিয়েছে কে ? সে নিজেই কি ? নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে বৈশম্পায়ন।

আলিপুরদুয়ার কোর্টে সে বেশ মনের সুখে রাজত্ব করছিল। বাঁশবনে শেয়াল রাজা, বখেরা বাঁধল মানুষের ভাল করতে গিয়েই। বছুরে বন্যার পর সেবার গাঁ গঞ্জে যখন ভীষণ অসুখ বিসুখ দেখা দিল তখন সরকারি ডাক্তারদের অনেক বলে কয়েও সে গ্রামে যেতে রাজি করাতে পারেনি। নতুন চাকরিতে তখন উৎসাহ আর উদ্দীপনায় সে টগবগ করছে। একটা সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই সে ডাক্তারদের গ্রেফতারের আদেশ দিয়েছিল। প্রথম রাউন্ডে জিতেই গিয়েছিল সে। ডাক্তাররা গ্রেফতার হল, জামিন পেল, তাদের বিরুদ্ধে কেস তৈরি করতে লাগল পুলিশ। কিন্তু এই ঘটনায় হুলস্থূল পড়ে গেল কলকাতায়। কাগজে খবর বেরোল। প্রতিক্রিয়াটা হল বিশাল রকমের। আলিপুরদুয়ারের ডাক্তাররা এই ঘটনার প্রতিবাদে রুগি দেখা বন্ধ করে দিল। সে এক বিশাল

হই-চই। পুরো ব্যাপারটাই তার হাতের বাইরে চলে গেল, যখন একটি বড় রাজনৈতিক দল লেগে গেল পিছনে। রোজই তার অফিসে আর বাড়িতে মিছিল আসতে লাগল। গদি ছাড়ো, গো ব্যাক ইত্যাদি ধ্বনি দিত তারা। দু দফায় আটচল্লিশ ঘণ্টা করে ঘেরাও থাকল সে। চিতু নামে একটা ছোকরা প্রায়দিনই মিছিলে বক্তৃতা দিতে উঠে যা খুশি বলত তার উদ্দেশে। তখন বৈশম্পায়নের পাশে পুলিশ নেই, প্রশাসন নেই, একটা লোকও তার পক্ষে নয়। কলকাতা থেকে বড় অফিসার তদন্তে এসে খুব সন্তোষ দেখালেন না বৈশম্পায়নের প্রতি। বৈশম্পায়ন একবার তার নিরাপত্তার কথা তুলেছিল। অফিসার বললেন, পুলিশ প্রোটেকশন তো আছে।

এ অবস্থায় পুলিশ কী করবে? ওরা কো-অপারেট করছে না।

তা হলে কলকাতা চলে যান। ছুটি নিন।

তে-এঁটে, গেঁতো বৈশম্পায়ন তবু ছিল। তখন ডুমকি হবে, তাই শর্মিষ্ঠা ছিল কলকাতায় বাপের বাড়িতে। হঠাৎ টেলিগ্রাম গিয়ে হাজির, শর্মিষ্ঠা সিরিয়াস। কাম শার্প।

বৈশম্পায়ন টেলিগ্রাম পেয়ে পাগলের মতো কলকাতায় রওনা হচ্ছিল। বাধা পেল ঘেরাওয়ে।

চিতু মধ্যমণি। বৈশম্পায়ন টেলিগ্রামটা তাকে দেখিয়ে মিনতি করল, বড্ড বিপদ আমার। এ সময়টায় যদি কনসিডার করেন।

চিতু মৃদু হেসে বলল, এটা পুরো ফলস টেলিগ্রাম। চালাকি করবেন না। এসব কায়দা অনেক পুরনো।

তখন শর্মিষ্ঠা ছিল ভীষণ প্রিয়, অকল্পনীয় আপন। সেই শর্মিষ্ঠা বাঁচে কি মরে ঠিক নেই, আর কতগুলো ইঁদুর তাকে আটকে রাখবে? বৈশম্পায়ন মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। লাফিয়ে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরেছিল চিতুর, তোকে আজ খুন করে ফেলব শুয়োরের বাচ্চা...

হাসপাতালে যখন সংজ্ঞাহীনতা থেকে আধো-চেতনায় ফিরে আসছিল বৈশম্পায়ন তখনই সে জীবনে প্রথম শুনেছিল মৃত্যু-নদীর গান। চারদিকে হিম সাদা অনড় পাথর, নির্জন উপত্যকা আর উৎস ও মোহনাহীন এক নদী। সেই থেকে নদী সঙ্গে আছে। দপ করে চেতনা জুড়ে জেগে ওঠে। তখন সংসারের সব কিছুই অর্থ হারিয়ে ফেলে।

চিতু মিথ্যে বলেনি। টেলিগ্রামটা ফল্‌স্‌ই ছিল বটে। সে যখন আলিপুরদুয়ারের হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, তখন কলকাতার এক নারসিং হোমে নিরাপদে শর্মিষ্ঠা আট পাউন্ডের স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে প্রসব করেছে। ডুমকির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এল বৈশম্পায়নের জীবনে পরিবর্তন। ডুমকি লক্ষ্মীমন্ত ছেলে।

রাতে দুটো কামপোজ খেয়েছিল বৈশম্পায়ন। তবু যে খুব ভাল ঘুম হয়েছে এমন নয়। শরীরে গভীর ক্লান্তি, মনে হাজার বছরের স্মৃতির ভার। ডাক্তার বলেছে, ওভারওয়ার্ক, টেনশন, প্রেসার একটু কম।

কিন্তু আসলে তা তো নয়।

শর্মিষ্ঠা আজও বেরোচ্ছে পুজোর বাজার করতে। কাল একা একা তেমন সুবিধে করতে পারেনি। বুবুম থাকবে বাচ্চা ঝি সাবিত্রীর কাছে। বৈশম্পায়নও একটু একা হতে চাইছে। জীবনে একার জন্য একটু সময় করে নেওয়া যে কত প্রয়োজন।

শোওয়ার ঘরে কাপড় বদলাতে এসে শর্মিষ্ঠা বলে, আজ আর একদম সিগারেট খাবে না।

হুঁ। বালিশে মুখ ঢুকিয়ে রেখে বৈশম্পায়ন জবাব দেয়।

হুঁ নয়, একদম খাবে না।

আচ্ছা।

আমার যদি দেরি হয় তবে সাবিত্রী তোমাকে খেতে দেবে। খেয়ে নিয়ো।

আচ্ছা।

শর্মিষ্ঠা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মুখের প্রসাধন সেরে নিল। এবার শাড়ি পরবে। স্টিলের আলমারির দরজা ঘড়াম করে খুলে শাড়ি বাছতে বাছতে বলল, ঝিনুক একটু অন্যরকম। আমাদের মতো নয়। না?

বৈশম্পায়ন জবাব দেয় না।

কাল অতক্ষণ ওদের বাড়িতে বসে থাকলাম ও কিন্তু একদম পাত্তা দিতে চাইছিল না ! অথচ এক একদিন দেখলে এমন করে যেন হারানিধি ফিরে পেয়েছে !

বৈশম্পায়ন এবারও জবাব দেয় না।

শর্মিষ্ঠা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ওদের সম্পর্ক কেমন গো ?

কাদের ?

ঝিনুক আর মাধববাবুর ?

খুব ভাল। দুজন দুজনকে চোখে হারায়।

শর্মিষ্ঠা মাথা নেড়ে বলে, আমার মনে হয় না।

নাই বা হল, তাতে ওদের কিছু যায় আসে না।

তুমি তো সব ভাল দেখো। আমার মনে হয় ওদের সম্পর্কটা খুব কোল্ড।

তুমি জানো না।

ওরা স্বামী স্ত্রী আলাদা খাটে শোয়। জানো ?

জানি ! ওটাই আজকালকার ফ্যাশন।

একসঙ্গে না শুলে আবার স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা কী ? আমি তা কিছুতেই পারব না।

একসঙ্গে শোওয়াটাই কি ভালবাসা ?

তা নয়। তবে ভালবাসা থাকলে আলাদা শোওয়ার কথা ভাবাই যায় না।

তোমার সব অদ্ভুত যুক্তি। বৈশম্পায়ন একটু হাসে, খাট আলাদা বলেই কি মনও আলাদা ?

শর্মিষ্ঠা রেগে গিয়ে বলে, তোমরা পুরুষরা কিছু বোঝো না। কেবল তত্ত্ব দিয়ে সব জিনিসকে বিচার করো। মানুষ তো থিয়োরি নয়। তার অনেক ব্যাপার আছে। আমি কাল পুনমের সঙ্গে কথা বলেও বুঝলাম, ওদের সম্পর্ক তেমন ভাল নয়।

গোয়েন্দাগিরি করছিলে ?

একে গোয়েন্দাগিরি বলে না। ওদের ফ্ল্যাটটা অত সুন্দর, অত সাজানো, ওদের অত টাকা, দেখলে মনে হয় ভাগ্য যেন ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু বেশি ভাল তো ভাল নয়। তাই ভাবছিলাম কোথাও একটু গোলমাল আছেই।

তাই ঝিয়ের কাছে খোঁজ নিচ্ছিলে ?

খোঁজ আবার কী ? কথা বলছিলাম। বলতে বলতে অনেক কথা ফাঁস হয়ে গেল।

কী কথা ফাঁস হল ?

মাধববাবু নাকি আজকাল খুব মদ খায়।

বরাবরই খেত।

আজকাল বেশি খায়।

না, বরং ঝিনুকের শাসনে আজকাল কমিয়েছে।

তুমি জানো না।

আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি।

শর্মিষ্ঠা আপস করে বলল, আচ্ছা সে না হয় মানলাম। কিন্তু ঝিনুক নাকি একদম বাসায় থাকতে চায় না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

তাতে কী ?

বোঝো না কেন ? অত সুন্দর ফ্ল্যাটেও ওর মন বসে না কেন এটা তো ভাববে ?

ও বরাবরই উড়নচণ্ডী।

আচ্ছা বাবা। তুমি যে ঝিনুকের পক্ষ নেবে তা জানতাম। যা ড্যাব ড্যাব করে দেখছিলে ওকে।

বৈশম্পায়ন একটা ধমক দেয়, বাজে বোকো না। কাল আমার যা শরীরের অবস্থা ছিল তাতে মেরিলিন মনরোর দিকেও তাকানোর মেজাজ ছিল না।

শর্মিষ্ঠা সাবিত্রীকে কাজ-টাজ বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একা হয়ে বৈশম্পায়ন উঠল। স্টিলের আলমারির মাথায় একটা অব্যবহৃত অ্যাটাচি কেস আছে তার। সব সময়ে চাবি দেওয়া থাকে। সেইটে নামিয়ে খুলল বৈশম্পায়ন। একটা পুরনো মনিব্যাগের খোপ থেকে সোয়া দুই ইঞ্চি বর্গ মাপের ফটোটা বের করে।

ঝিনুক! কী সুন্দর!

যে ভইগল্যান্ডার ক্যামেরায় ছবিটা তোলা সেটাও বহুকাল আগে চুরি হয়ে গেছে। ঝিনুক পরস্ত্রী।

ছবিটা তবু কত জীবন্ত! সাদা ফ্রক পরা ঝিনুক ডান হাতটা তুলে কোমরের বেল্টটা ঠিক করছে। বাঁ ধারে ঝুলছে বইয়ের ব্যাগ। বব করা চুলে রিবন বাঁধা। পিছনে লাহা বাড়ির দেয়ালে ইটের খাঁজে খাঁজে সকালের রোদ আর ছায়ার চৌখুপি। একটা অশ্বত্থ চারা। এই তো যেন গত কালকের কথা।

মেজদা!

একটু চমকে বৈশম্পায়ন তাকিয়ে দেখে, ঘরের দরজায় জয়। ভারী লজ্জা পেয়ে ছবিটা বালিশের নীচে লুকিয়ে ফেলতে গিয়ে আরও ধরা পড়ে যায় সে। জয় অবাক হয়ে তাকিয়ে তার সবটুকু অপকর্ম লক্ষ করল। তবে কোনও প্রশ্ন করল না।

কী খবর? আজ অফিসে যাসনি?

তুমিও তো যাওনি।

আমার শরীরটা ভাল নেই।

পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা জয় ঘরে ঢুকে একটা মোড়ায় বসে বলে, কাল মদনদা এসেছে।

জানি।

কাল থেকে মদনদার সঙ্গে ঘুরছি। ওঃ, কত মিটিং, কত কনফারেন্স, আর কী সব লোক! জয়ের চোখে একটা সম্মোহিত ভাব!

জয় যে মদনের একজন চামচা তা বৈশম্পায়ন জানে এবং মোটেই ভাল চোখে দেখে না। একটু বিরক্ত হয়েই বলে, ওর পিছনে ঘুরছিস কেন?

মদনদাই বলল, জয় আমার সঙ্গে একটু থাক!

তাই থাকলি? তোর কাজকর্ম নেই?

কাজকর্ম আবার কী? অফিস তো? তা সেই অফিসের চাকরিও তো মদনদাই করে দিয়েছে। ও চাকরি যাবে না। মদনদার সঙ্গে ঘুরলে খুব তাড়াতাড়ি ফিল্ড ক্রিয়েট হয়।

বৈশম্পায়ন একটু অবাক হয়ে বলে, কীসের ফিল্ড?

পলিটিক্যাল ফিল্ড! গতকাল স্টেট সেক্রেটারির সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা হল। ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের পার্টি আবার বেশ শক্ত হয়ে উঠছে। অবশ্য অপোজিশনও আছে। নিত্য ঘোষ মদনদার লিডারশিপ মানতে চাইছে না।

জয় হয়তো ভবিষ্যতে এম পি বা মিনিস্টার হতে চায়। ভেবে বৈশম্পায়ন একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভাইদের মধ্যে এই জয়টাই সবচেয়ে গবেট। মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমন নয়। তবু ওই হয়তো একদিন মন্ত্রীটন্ত্রী হয়ে বসবে। কিছুই অসম্ভব নয়। বৈশম্পায়ন কিছু বলার খুঁজে না পেয়ে গম্ভীর মুখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, ভাল।

তোমাকে বলতে এলাম, মদনদা তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে চেয়েছে।

কেন?

বলল, কী দরকার আছে। বহুকাল দেখা হয় না। আজ বিকেলে কেয়াতলায় মাধবদার বাড়িতে রাত্রে তোমার খাওয়ার নেমন্তন্ন। ওখানে মদনদাও আসবে।

মাধবের বাড়িতে! বলে আবার ভ্রূ কোঁচকায় বৈশম্পায়ন। কিন্তু তার বুকের মধ্যে ধক ধক করে ধাক্কা লাগে। ঝিনুক! কী সুন্দর!

একটা খবর শুনেছ মেজদা?

কী খবর ?

নব হাটি জেল থেকে পালিয়েছে !

সামান্য চমকে উঠে বৈশম্পায়ন বলে, সেই ডেঞ্জারাস ছেলেটা না ? যে নীলুকে খুন করেছিল ?

হ্যাঁ, একসময় মদনদার হয়ে খুব খাটত। পরে বিট্রে করে।

কী করে পালাল ?

জেলখানার লোকদের হাত করেছিল বোধ হয়। মামলার সময় কোর্টেই বলেছিল, জেল থেকে বেরিয়ে প্রত্যেককে দেখে নেবে।

কাকে দেখে নেবে ?

যারা ওকে খুনের মামলায় ফাঁসিয়েছে। বলে জয় একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়ে বলে, কেউ কেউ বলে বটে যে, নব খুনটা করেনি। তবে আমি জানি, করেছিল।

তুই কী করে জানলি ?

মদনদা বলেছে।

মামলার সময় তুই কোর্টে যেতিস ?

রোজ। সব সওয়াল জবাব মনে আছে।

নব দোষ কবুল করেছিল ?

না। বার বার শুধু বলত, দোস্তকে দোস্ত কখনও খুন করতে পারে ? নীলু আমার জিগির দোস্ত ছিল।

বৈশম্পায়ন মুখ বিকৃত করে বলে, এ খুনটা না করলেও নব আরও বহু খুন করেছে। সে সবের জন্য ওর সাত বার ফাঁসি হওয়া উচিত।

জয় মাথা নেড়ে বলে, সে ঠিক কথা। কিন্তু নীলুর কেসটায় ওর খুব প্রেস্টিজে লেগেছিল। ও জজকে বলেছিল, আমার হাতে অনেক লাশ পড়েছে। সে সব কেসে আমাকে জেল দিন, ফাঁসি দিন, কোই বাত নেহি। কিন্তু নীলুর কেসে আমাকে ঝোলাবেন না। আমি আমার দোস্তকে খুন করিনি।

এখন নব জেল থেকে বেরিয়ে কি শোধ তুলবে নাকি ?

জয়ের মুখটা একটু বিবর্ণ দেখায়। তবে গলায় জোর এনে বলে, অতটা কি করবে ? কে জানে ! তবে নব ক্ষেপে গেলে অনেক কিছু করতে পারে। আজ সকালে খবরটা শোনার পর থেকে মদনদাও একটু ভাবনায় পড়েছে। আর মজা দেখো, গতকালই নবর মা এসেছিল নবর বউয়ের জন্য মদনদার কাছে চাকরি চাইতে।

মদন কি চাকরি দেবে ?

মদনদা তো কাউকে না বলে না। চেষ্টা করবে বলে বুড়িকে কাটিয়ে দিয়েছে। পরে আমাকে বলেছে, নবর বউকে চাকরি দিলে পলিটিক্যাল রি-অ্যাকশন খারাপ হবে। কিন্তু আজ সকালে খবরটা পাওয়ার পর মদনদা ডিসিশন চেনজ করেছে।

চাকরি দেবে ?

চেষ্টা করবে ?

রাতারাতি মত পাল্টে ফেলল ?

পাল্টানোই ভাল। নব বেরিয়েছে। কখন কী করে বসে ঠিক নেই। জানের পরোয়া নেই তো।

মদন তা হলে ভয় পেয়েছে ?

না না। মদনদা অত ডরায় না। কত খুন জখম পার হয়ে এসেছে।

বৈশম্পায়ন মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তখন তো এম পি ছিল না।

জয় কথাটার অর্থ ধরতে পারল না। বলল, তা ছাড়া মদনদার নাগাল পাওয়া কি সোজা ? শ্রীমন্তদা আছে, আমরা আছি, ভি আই পি বলে কথা ! চাইলেই পুলিশ এসে যাবে। দুদিন বাদেই যাচ্ছে দিল্লি হয়ে অস্ট্রেলিয়া। নব মদনদাকে পাবে কোথায় ?

বৈশম্পায়ন চিন্তিত মুখে বলে, শুধু মদনই তো নয়, আরও অনেকের ওপর নবর রাগ আছে।

সবচেয়ে বেশি রাগ মাধবদার ওপর। মাধবদার চোখের সামনেই তো খুনটা হয়। নিজের ভাইয়ের ব্যাপারে তো মাধবদা মিথ্যে সাক্ষী দেবে না!

বৈশম্পায়ন মাধব আর নীলুর সম্পর্কটা জানে। কিন্তু সে কিছু বলল না। ব্যাপারটা মাধবও চাপা রাখতে চায়। বাইরের কেউ তেমন জানে না। বৈশম্পায়ন জিজ্ঞেস করে, মামলায় তুইও ছিলি না?

না। আমি কোর্টে যেতাম।

নব তোকে চিনে রাখেনি তো?

জয় হাসে, নব আমাকে এমনিতেই চেনে। তবে নীলু হাজরার ব্যাপারে নয়।

তবু সাবধানে থাকিস।

আমার কোনও ভয় নেই। আজ উঠি। তুমি কিন্তু বিকেল-বিকেল মাধবদার বাড়ি চলে যেয়ো।

জয় চলে গেলে বৈশম্পায়ন কিছুক্ষণ নব হাটি, মাধব আর মদনের কথা ভাববার চেষ্টা করল। কিন্তু বাঁধ ভাঙা ঢেউয়ের মতো এল একটাই চিন্তা, আজ আবার ঝিনুকের সঙ্গে দেখা হবে।

॥ ৭ ॥

একজন এম পির উচিত খুব ভোরবেলা উঠে সূর্যোদয় দেখা। একজন এম পির উচিত কিছুক্ষণ পাখির গান শোনা। একজন এম পির উচিত ভোরবেলা কিছুক্ষণ নিরুদ্বেগ চিত্তে বেড়ানো। গুনগুন করে একটু গানও তার করা উচিত। আর উচিত দিনের মধ্যে কিছুটা সময় একা একা থাকা এবং সেই সময় যতটা সম্ভব রেখে ঢেকে একটু আত্ম-বিশ্লেষণ করা। একজন এম পির পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে কিছুক্ষণ তার ভুলে যাওয়া উচিত যে, সে একজন এম পি। যদি সে তা পারে তবে একজন এম পির উচিত সুযোগ পেলেই বাচ্চাদের মুখ ভেঙানো।

মদন সাধারণত সকালে উঠতে পারে না। অনেক রাত জেগে কিছু লেখাপড়া করা তার স্বভাব। বস্তুত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একমাত্র রাত বারোটার পর ছাড়া সে এসব করার সময় পায় না। ফলে ভোরবেলা উঠতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায় খুব।

আজ ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। ঘুম ভেঙেই মদন একেবারে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। রোজ ঘুম ভাঙার দেড় দুই মিনিটের মধ্যেই তার মনে পড়ে যায় যে, সে একজন এম পি। আজ তা পড়ল না। দিদির বাইরের ঘরের জানালা দিয়ে ভোরের একটু বাতাস আসছিল। কাছে পিঠে রুগ্‌ণ কিছু গাছপালা এখনও আছে। বাতাসে তারই নির্ভুল গন্ধ। রাতে কোনও সময়ে একটু বৃষ্টিও হয়ে গিয়ে থাকবে। ভেজা ভাবটা বাতাসে এখনও রয়ে গেছে। ফলে ভোরবেলাটি খুবই চমৎকার মনে হচ্ছিল মদনের।

সে উঠে টক করে বেসিনে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা মারল কিছুক্ষণ। চোখ কট করে উঠল জ্বালায়। এখনও শরীরে যথেষ্ট ঘুম দরকার। পায়ের দিকে সোফার ওপর কালকের ছেড়ে রাখা ধুতি আর পাঞ্জাবি অভ্যস্ত হাতে এক মিনিটে পরে নেয় মদন। সময় নেই। এই ভোরবেলাটা বৃথা যেতে দেওয়া যায় না।

দিদি, বলে একটা ডাক দিতেই চিরু সাড়া দেয়, কী রে? বেরোচ্ছিস নাকি?

পার্ক থেকে আসছি একটু ঘুরে। দরজাটা দিয়ে দাও। বলেই আর দাঁড়ায় না মদন। বেরিয়ে হন হন করে কালীঘাট পার্কের দিকে হাঁটতে থাকে।

আকাশে বাদলার মেঘ কেটে যাচ্ছে। ওই শুকতারা। মদন একটু চেয়ে দেখল। এবার দেরিতে বড় বেশি বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরে আর পুবে। ভেসে যাচ্ছে, সব ভেসে যাচ্ছে। প্রতিবারই ভাসে এবং তার জন্য কেউ কিছু করে না।

আমি একজন এম পি, এ কথাটা এতক্ষণে মনে পড়ল মদনের। নির্জন রাস্তায় সে একটু শব্দ করেই বলে ওঠে, দ্যাখ শালা মদনাকে দ্যাখ। শালা নাকি এম পি! হোঃ হোঃ।

সতীশ মুখার্জি রোডের পুরনো মসজিদের হাতায় গাছে গাছে পাখি ডাকছে। ডাকে রে পাখি, না ছাড়ে বাসা...খনার বচন না? বাকিটা মনে নেই মদনের। তবে ওইটুকু মনে আছে, ডাকে রে পাখি,

না ছাড়ে বাসা।

হ্যাঁ বৃষ্টি। খুব বৃষ্টি হচ্ছে এবার। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমি কী করতে পারি ? মদনা তো ভগবান নয় বাপ, একজন বুরবক এম পি মাত্র। হ্যাঁ, মানছি এম পিরা অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু তা বলে বানভাসি দেশে ডাঙাজমি বের করার মতো এলেম তার নেই। তবে মদনা ফিল করে বাপ। ফিল করে। পাখিরা খুব ডাকছে। মদন একবার পুরনো মসজিদটার দিকে তাকিয়ে বলে, দেখে নে শালারা এক আস্ত এম পিকে। তোরা হতভাগারা জামাকাপড় পরতে শিখলি না, পার্লামেন্ট বানাতে পারলি না, হোল লাইফ কেবল কিচমিচ !

মদন গুনগুন করে উ হু হু, উ হু হু করে গাইতে লাগল। তার গলায় সুর নেই। তার জন্য পরোয়াও করে না সে। উ হু হু, উ হু হু করেই যেতে থাকে।

ডান দিকে পার্ক। ঢুকতে গিয়ে মদন একটু দাঁড়ায়। শালারা গাছগুলো কেটেছে। বাচ্চাদের জন্য দোলনা ছিল, স্লিপ ছিল, সেগুলো লোপাট করেছে। ঘাসজমিতে টাক ফেলেছে। খানিক জায়গা কেটে নিয়ে রঙ্গশালা বানিয়েছে। কারও কিছু করার নেই। ভেসে যাক, সব ভেসে যাক।

মদন পার্কে ঢুকে পড়ে। ভোর ভোর হয়ে এসেছে। পার্কে কিছু ভুতুড়ে চেহারার আবছা লোক মর্নিং ওয়াক সেরে নিচ্ছে। মদন তাদের কক্ষপথে নিজেকে ভিড়িয়ে দেয়। উ হু হু গানটাও চলতে থাকে। এই ভোরবেলা পার্কে বেড়াতে তার বেশ আনন্দ হচ্ছে। হ্যাঁ, খুব আনন্দ হচ্ছে। দারুণ আনন্দ। নিজেকে এম পি বলে একেবারেই মনে হচ্ছে না তার।

কিন্তু মনে না পড়ে উপায় আছে ? ব্যাটারা পড়িয়ে ছাড়ে। ক্যাংলা চেহাবাব টেকো একটা লোক গাদি খেলার মতো পথ আটকে একগাল হেসে বলল, দাদা মর্নিং ওয়াক-এ বেরিয়েছেন বুঝি ?

মদন চিনল। তবে নামটা মনে পড়ল না। বলল, এই একটু। তা কী খবর ?

আমাকে চিনতে পারছেন তো ! আমি হরি গোঁসাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। কী খবর ?

আজ্ঞে কালকে স্টেশনে যে সেই কথাটা বলেছিলাম, মনে আছে ?

কোন কথাটা ?

আমার বিশুকে যদি একটু মেডিকেলে চান্স করে দেন।

মদন টেকো হরি গোঁসাইয়ের মাথার ওপর দিয়ে উদাস চোখে পুবের আকাশের দিকে চেয়ে বলে, কী সুন্দর দেখেছেন ?

ব্যস্ত হয়ে হরি গোঁসাই বলে, আজ্ঞে কোনটার কথা বলছেন ?

এই ভোরবেলাটা ?

আজ্ঞে তা আর বলতে ! খুব সুন্দর।

এই ভোরবেলায় আপনার মনটা উদাস হয়ে যায় না ?

খুব যায়। খুব যায়। আমাদের ওদিকটা তো প্রায় গ্রামের মতোই। সেখানে যা একখানা করে ভোর হয় না রোজ, কী বলব দাদা ! মনটাকে একদম বৈরাগী বানিয়ে ছেড়ে দেয়। ফার্স্ট বাস ধরে আসতে আসতে আজও খুব উদাস লাগছিল।

মদন বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে, তবু দেখুন বিশুরা আমাদের পিসু ছাড়ে না। উদাস হওয়ার স্কোপ থাকলেও কেউ আমরা উদাস হচ্ছি না, বৈরাগীও না।

হরি গোঁসাই মাথা চুলকে বলে, পিসু কথাটা ঠিক বুঝলাম না দাদা। পিসু পোকা না কি ?

না, না। পিসু মানে পিছু। বিশুর সঙ্গে মিলে যায় বলে পিসু কথাটা বেরিয়ে গেল।

হরি গোঁসাই চিমটিটা ধরল না। গদগদ হয়ে বলল, আপনার পিসু ছাড়লে আমাদের চলবে কেন ? আমরা হচ্ছি একেবারে আনরিকগনাইজড জনসাধারণ। আমার কথাই ধরুন না। সারা জীবনে একজন মাত্র ভি আই পি-র কাছে কিছুটা ঘেঁষতে পেরেছি। সেই ভি আই পি হলেন আপনি। আত্মীয় স্বজনের কাছে বড় মুখ করে আপনার কথা কত বলি। অফিসেও একটু আধটু খাতির পাই।

এই পার্কে আমাকে ধরলেন কী করে ?

বাসায় গিয়েছিলাম। দিদি বলল, পার্কে এসেছেন।
মদন ধৈর্যশীল লোকটার মুখের দিকে চেয়ে ভোরের স্বচ্ছ হয়ে আসা আলোয় জনসাধারণকেই দেখতে পায়। এই সেই জনসাধারণ যাদের নিয়ে তার বহু কালের কারবার। এই সেই বিশুর বাবা যাদের পিছু পিছু একদিন সে ঘুরেছে, আর যারা এখন তার পিছু পিছু ঘোরে।
মদন একটা শ্বাস ফেলে বলে, শ্রীমন্তর কাছে একটা ডায়েরি আছে। তাতে—
তাতে লেখানো হয়ে গেছে। হেঁ হেঁ।
ঠিক আছে, দেখব'খন।
দেখবেন। সারা জীবন বড় দুঃখে কষ্টে কেটেছে। বিশুটা যদি ডাক্তার হয় তবে শেষ জীবনটা—
মদন হাসে। বাপদের ছেলেপুলে নিয়ে কত আশাই থাকে! গম্ভীর হয়ে বলে, ও আশা না করাই ভাল।
হরি গোঁসাই হঠাৎ নিভে গেল। মদন উদাস ভাবে চারদিকে চেয়ে হাঁটছে। পিছনে হরি গোঁসাই বলে, সে কথাটা অবশ্য ঠিক।
মদন প্রসঙ্গটা ভুলে গেছে। ভাল মানুষের মতো বলে, কোন কথাটা?
ধন্য আশা কুহকিনী।
ওঃ। হ্যাঁ—
আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ! মদন হরি গোঁসাইকে ভুলে গিয়ে উদাস পায়ে হাঁটতে থাকে। এখন আর খুব একটা আনন্দ হচ্ছে না তার। তবে ভালই লাগছে।
পিছন থেকে হরি গোঁসাই গলা খাঁকারি দিয়ে জানান দিল যে, সে আছে।
দাদার সঙ্গে যে আজ বড় শ্রীমন্ত নেই!
পাখিরা অনেকক্ষণ বাসা ছেড়েছে। এখন ঝোপে ঝাড়ে চিড়িক মিড়িক করে ঘুরছে তারা। সূর্য মসজিদ ছাড়িয়ে উঠে পড়ল প্রায়। কলকাতার সব ম্লান কুশ্রীতা প্রকট হল। দেখতে দেখতে মদন আনমনে জিজ্ঞেস করে, কে শ্রীমন্ত?
আপনার বডিগার্ডের কথা বলছিলাম। দিনকাল তো ভাল না। কালকের খবর শুনেছেন তো?
কীসের খবর? মদনের গলায় এখনও অন্যমনস্কতা।
নব হাটি জেল থেকে পালিয়েছে?
মদন এবার সচেতন হয়। কিন্তু ইচ্ছে করেই অন্যমনস্কতার মুখোশটা পরে থেকে বলে, কে নব হাটি?
দাদা সব ভুলে গেছেন। নব হাটি মানে যে লোকটা নীলুকে খুন করল। আর যার মা এসেছিল কাল আপনার কাছে ছেলের বউয়ের জন্য চাকরি চাইতে।
ওঃ! হ্যাঁ।
এ সময়টায় শ্রীমন্তকে একটু কাছে কাছে রাখবেন। নব লোক ভাল নয়। অবিশ্যি—
মদন উদাস গলায় জিজ্ঞেস করে, অবিশ্যি—
অবিশ্যি নবর এখন আর সেই তেজ নেই নিশ্চয়ই। পুলিশের তাড়া খেয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হচ্ছে। এখন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা অবস্থা। তবু...
তবু?
তবু সাবধান থাকা ভাল। আমি কি আর একটুক্ষণ সঙ্গে থাকব দাদা?
নব যদি এসময়ে আসে তবে ঠেকাতে পারবেন?
টেকো হরি গোঁসাই অপ্রতিভ হেসে বলে, আজ্ঞে আমি ওসব লাইনের লোক তো নই। তবে চেঁচাতে পারব। খুব চেঁচাব—
পারবেন? তবে একটু চেঁচিয়ে শোনান তো! দেখি কেমন পারেন।
লজ্জা পেয়ে হরি গোঁসাই বলে, দাদা কী যে বলেন!
তা হলে কী করে বুঝব যে, চেঁচাতে পারেন?
হরি গোঁসাই মাথা নিচু করে লজ্জার গলায় বলে, পারি কিন্তু।

দেখি কেমন পারেন। চেঁচান, খুব জোরে চেঁচিয়ে বলুন, নব আসছে! ওই নব আসছে! খুন, খুন, খুন করে ফেললে! চেঁচান, চেঁচান। বলে মদন এক পা পিছিয়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে উৎসাহ দিতে লাগল হরি গোঁসাইকে।

হরি গোঁসাই বলল, তা হলে বিশুর মেডিকেলে ভর্তি ব্যাপারটা হবে তো।

হবে, হবে। ওর বাপ হবে। নইলে কি আর বিশু আমার পিসু ছাড়বে? এখন চেঁচান দেখি।

হরি গোঁসাই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। চোখ বুজে মাথায় আর বুকে বার কয়েক হাত ঠেকিয়ে কোনও দেব-দেবীকে প্রণাম করে নিল। তারপর বুক ভরে দম নিয়ে হঠাৎ আকাশ-ফাটানো গলায় চেঁচাতে লাগল, নব আসছে! ওই নব আসছে! খুন, খুন করে ফেললে—এ—এ—এ—এ—এ—

মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কাক ডাকতে লাগল, পাখিরা ঝোপ ছেড়ে প্রাণভয়ে উড়ল, প্রাতঃভ্রমণকারীরা সটাসট দৌড়ে গিয়ে রেলিং টপকাতে লাগল, সামনের এক বাড়িতে দড়াম করে জানালা বন্ধ হয়ে গেল। হরি গোঁসাইয়ের যে এত আওয়াজ তা দেখলে বোঝাই যায় না।

মদন অবাক হয়ে বলল, বাঃ। আপনার গলা তো অ্যাসেট।

বিনীত হাসি হেসে হরি গোঁসাই বলে, আজ্ঞে খুব জোর আওয়াজ হয়। একবার ভিড়ের ট্রেনে শুধু চেঁচিয়ে জায়গা করে নিয়েছিলাম।

হুঁ। মদন গম্ভীর হয়ে বলে।

আর কি চেঁচাতে হবে দাদা?

মদন মাথা নেড়ে বলে, না। এখন তাড়াতাড়ি সরে পড়া দরকার। যা চেঁচিয়েছেন।

আমি তা হলে আসি?

আসুন। একটু পা চালিয়েই আসুন গিয়ে।

বিশুর তা হলে?

পিসু পিসু থাকবে। বলে মদনও একটু পা চালিয়েই পার্ক থেকে বেরিয়ে আসে। কারণ, প্রথম ভয়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছে ব্যাপারটা কী তা দেখতে। মদনকে একজন জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে দাদা? খুন নাকি? মদন এমনভাবে মাথা নাড়ল যাতে 'হ্যাঁ'ও হয়, 'না'ও হয়।

একটু বাদে যখন সে জামাইবাবুর মুখোমুখি বসে চা খাচ্ছিল তখন আর তার মুখে উদাসীনতা ছিল না। জামাইবাবু মণীশ অখণ্ড মনোযোগে খবরের কাগজ পড়ছে।

জামাইবাবু।

বলো ব্রাদার।

আপনার চেয়ে খবরের কাগজটা দেখা আমার বেশি দরকার। এবার ছাড়ুন।

তুমি তো এখন পায়খানায় যাবে।

তা গেলেই বা। খবরের কাগজ নিয়ে যাব।

যেয়ো। তার আগে যতটা পারি দেখে দিচ্ছি। তোমার ওটা ভারী ব্যাড হ্যাবিট।

কোনটা? খবরের কাগজ পড়াটা?

না, এই খবরের কাগজ নিয়ে পায়খানায় যাওয়াটা।

ব্যাড হ্যাবিট কেন হবে? আমি বরাবর যাই। খবরের কাগজ না হলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।

দো ইউ আর অ্যান এম পি এবং তোমার সময়ও কম, তবু বলি এটা খুবই ব্যাড হ্যাবিট।

তা হোক। এবার ছাড়ুন।

ছাড়ছি। চা-টা খাও না।

চা ফিনিশ।

তবে চিরু না হয় আর এক কাপ করে দিক। ও চিরু! শুনেছ!

কী অত মন দিয়ে পড়ছেন?

পড়ার কিছু নেই ব্রাদার। সব ছাতামাথায় ভর্তি কাগজ। সেই ছাতামাথাই দেখছি।
আমার প্রেস কনফারেনসটা দিয়েছে ?
দিয়েছে একটুখানি। পাঁচের পাতার তলার দিকে।
হেডিং কী করেছে ?
মালদহের অবস্থা ভয়াবহ। তারপর কোলন দিয়ে তোমার নাম।
দূর ! পলিটিক্যাল ব্যাপারগুলো দেয়নি তা হলে। আপনি যে কেন এত কিপটে !
কেন বলো তো ! ত্রিশ টাকা কিলোর চা খাওয়াচ্ছি।
লোকে আরও দামি চা আমাকে খাওয়ায়। চায়ের খোঁটা দেবেন না। বলছি, মোটে একটা খবরের কাগজ রাখেন কেন ?
একটাই পড়ার সময় পাই না।
তা ছাড়া সেই একটাও আবার বাংলা। বাংলা কাগজে খবর কম থাকে জানেন না ?
তোমার দিদিও একটু পড়ে যে। ও তো ইংরিজি বোঝে না।
এবার থেকে দুটো করে রাখবেন। ইংরিজিটার দাম আমি প্রতি মাসে মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেব।
এম পি-দের প্রতিশ্রুতির দাম নেই, সবাই জানে। রিসক নেওয়াটা কি ঠিক হবে ?
চিরু চা নিয়ে এসে মণীশের দিকে চেয়ে বলে, বড় গলায় চায়ের হুকুম দেওয়ার দরকার ছিল না। আমি তো চা করছিলামই।
মণীশ এক গাল হেসে বলে, তা জানতাম। তবু শালার কাছে নিজেকে উদার প্রমাণ করার জন্যই ওটুকু করতে হল।
মদন মুখ গম্ভীর করে বলে, এই বয়সে আর কি নতুন করে আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা পালটাতে পারবেন ? আমি যে প্রথম থেকে জানি আপনি ক্রনিক মাইজার।
অথচ দেখো পাড়াপ্রতিবেশীরা সবাই আলোচনা করে, মণীশবাবু টাকা জমাতে জানেন না। কেবল খরচ করেন, কাছা খুলে খরচ করেন।
আপনার পাড়াপ্রতিবেশীরা স্বপ্ন দেখে। এবার খবরের কাগজটা ছাড়ুন।
বড্ড জ্বালাচ্ছ হে। যাও না, বাইরের ঘরে সেই কাকভোরে এসে সব বসে আছে, গিয়ে তাদের সঙ্গে দুটো কথা বলে এসো না। ততক্ষণে...
ওরা বসে থাকার জন্যই এসেছে। তাড়া নেই।
তোমরা লিডাররা বাপু বড্ড গেরামভারী।
আমি গেরামভারী।
নয়তো কী ? লোকেরা বশংবদ হয়ে বসে থাকে, আর তোমরা পায়খানায় বসে খবরের কাগজ পড়ো।
লিডারদের নিয়মই তাই।
এই নাও ব্রাদার ! বলে মণীশ খবরের কাগজটা ভাঁজ করে এগিয়ে দেয়। যতক্ষণ না দিচ্ছি ততক্ষণ শান্তিতে চাটুকু খেতে পারব না।
মদন খবরের কাগজটা খুলতে খুলতে বলে, জামাইবাবু।
উঁ।
আমি যদি মরে যাই তা হলে কী হবে বলুন তো ?
কেউ বিধবা হবে না।
আর কী হবে ?
আমার টেলিফোনটাও হবে না।
আঃ, কী হবে না তা জিজ্ঞেস করিনি। কী হবে তাই জানতে চাইছি।
আসলে তুমি মরবে না।
কী করে বুঝলেন ?

তোমারই বা মরার কথা মনে হচ্ছে কেন ? কোনওকালে তো এসব বলোনি ! আমরা জানি তুমি হচ্ছ পজিটিভ লোক। এম পি-রা এমনিতেই একটু বেশিরকম আশাবাদী হয়। আজ হঠাৎ তোমার হল কী ?

মদন খবরের কাগজটা খুলতে খুলতে মৃদু হেসে বলে, মৃত্যুর একটা রোমান্টিক দিক আছে, তাই আজকাল মাঝে মাঝে ভাবি মরলে কেমন হয় ?

কিছু হয় না হে। মণীশ মাথা নাড়ে, মরার মধ্যে রোমান্টিক কিছু নেই, মহৎ কিছু নেই। একেবারে মোটা দাগের ক্যাবলা একটা ব্যাপার। আমাদের দেশে গবা পাগলা বলে একটা লোক ছিল। সে গাইত, মনু রে, বাপের খবর রাখলা না, হ্যায় যে মইরা ভ্যাটকাইয়া রইছে পাছায় পড়ছে জোছনা।

অশ্লীল ! অশ্লীল !

মোটেই নয়। মণীশ মাথা নাড়ে, একদম অশ্লীল নয়। পাছায় জোছনা পড়ার ব্যাপারটা বরং খুবই করুণ। মরা-টরার কথা হলেই আমার গানটা মনে পড়ে।

আপনি যা একখানা জিনিস না জামাইবাবু !

মণীশ উঠতে উঠতে বলে, তুমি পেপার দেখো, আমি বরং ততক্ষণে বাথরুমের দখল নিই গে। তুমি পত্রিকা হাতে ঢুকলে তো পাক্কা দেড় ঘণ্টা।

মণীশ বাথরুমে গেলে কিছুক্ষণ একা বসে আপন মনে ফুড়ুক ফুড়ুক করে হাসল মদন। দিনটা আজ ভালই যাবে। সকালে একটা চেঁচামেচি শুনেছে। বউনিটা ভালই বলতে হবে। তারপর এই জোছনার ব্যাপারটা। দুপুরে আজ রাইটার্সে দুজন মিনিস্টারের সঙ্গে মিটিং আছে। তখন যদি কথাটা মনে পড়ে যায় তা হলে ঠিক ফুড়ুক করে হেসে ফেলবে সে। বিকেলে আছে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। তখনও কি মনে পড়বে ?

পত্রিকায় কয়েদি পালানোর কোনও খবর নেই। বাংলা কাগজে এমনিতেই খবর কম থাকে, তার ওপর এসব খবরের এমনিতেই তেমন গুরুত্ব নেই। তবে যারা নবকে জানে তারাই বুঝবে খবরটা কতখানি গুরুতর।

বাইরের ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে ভিতরের বারান্দায় উঁকি দিল শ্রীমন্ত, দাদা, আপনার বন্ধু এসেছে।

আমি জগবন্ধু। কে এসেছে ? নামটা কী ?

মাধব হাজরা। ওই যে গোল পার্কের কাছে—

আর বলতে হবে না। মাধব দুনিয়ায় একটাই হয়। আসতে বল।

মাধব বোধহয় বাইরের ঘরে ফিতে বাঁধা জুতো খুলতে খানিক সময় নিল। তারপর ভিতরের বারান্দায় আসতেই তার মুখে উদ্‌ভ্রান্তিটা প্রথম লক্ষ করে মদন।

তবু মদন সব সময়ে নিজে খোশ থাকতে এবং অন্যকে খোশ রাখতে চেষ্টা করে। হালকা গলায় বলল, মুর্গা পেয়েছিস ?

কীসের মুর্গা ?

তোর বাসায় আজ রাতে একটা আস্ত এম পির নেমন্তন্ন যে।

ওঃ ! আচ্ছা, মুর্গি হবে। কিন্তু খবর শুনেছিস ?

খবর শোনাই আমার কাজ। নব হ্যাটি পালিয়েছে, এই খবর তো ? তা অত ঘাবড়ানোর কী আছে ? বোস।

মণীশের পরিত্যক্ত চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে মাধব। তারপর হাঁফ ধরা গলায় বলে, এটা ইয়ার্কির ব্যাপার নয়।

এ কথায় সকালের হাসি খুশি ভাবটা মদনের মুখ থেকে মুছে গেল বটে, কিন্তু তার মুখে কোনও ভয় বা ভাবনা ফুটল না। মুখটা আস্তে আস্তে গম্ভীর ও নিষ্ঠুর হয়ে গেল। সে শুধু বলল, হুঁ।

মাধবের চেহারাখানা সুন্দর। দারুণ ফরসা, জোড়া ভ্রূ, খুব লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান। সুন্দর ছেলেদের সুন্দর বউ জোটে না, সুন্দর মেয়েদের জোটে না সুন্দর বর। মাধবের বউ ঝিনুক কিন্তু সুন্দর।

দুজনই সুন্দর, দুজনের সংসার সুন্দর, ফ্ল্যাট সুন্দর। কিন্তু তবুও কোথায় যে ওদের খিঁচ তা আজও মদন বুঝতে পারল না।

মাধবের চেহারায় আজ তেমন জলুস নেই। সকালে দাড়ি কামায়নি, লম্বা চুলগুলো পাট করা নেই, মুখে বেশ উত্তেজিত ভাব, উৎকণ্ঠা। ডান হাতের মধ্যমায় গোমেদের আংটিটা বার বার ব্যস্ত আঙুলে ঘোরাচ্ছে। বলল, ইউ মাস্ট ডু সামথিং।

মদন ধীরে সুস্থে কাগজের শেষ পাতাটা উল্টে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, চা খাবি ?

চা ! যেন প্রস্তাবটায় কিছু অস্বাভাবিকতা আছে এমনভাবে বিস্ময় প্রকাশ করল মাধব। তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে বলল, হ্যাঁ খাব। দিদি কই ?

ঘরে। ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি করে দিচ্ছে। মাধব কিছুক্ষণ চুপ করে বসে একবার আংটি ঘোরায়, একবার চুলে আঙুল চালায়। হঠাৎ একটু ঝুঁকে বলল, পেপারে কিছু দিয়েছে ?

মদন চোখ তুলে বলে, কী দেবে ?

নবর ব্যাপারটা ?

মদন মাথা নেড়ে পত্রিকাটা ভাঁজ করে রেখে দিয়ে বলে, একজন তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদির পালানোর খবর তেমন কিছু গুরুতর নয়।

মাধব পিছন দিকে হেলে বসে কয়েক পলক চোখ বুজে থাকে। তারপর বলে, তা বটে। বাট ইট ইজ এ সিরিয়াস নিউজ ফর আস।

মদন মৃদু স্বরে বলে, আস নয়, বল মি। তুইই ভয় খেয়েছিস, আমি নয়।

মাধব চোখ খুলে মদনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলে, তোকে কি নব স্পেয়ার করবে ?

মদন মৃদু হেসে বলে, তার চেয়ে বরং জিজ্ঞেস করা ভাল, হোয়েদার আই উইল স্পেয়ার হিম।

মাধবের স্বাভাবিক চোখা চালাক ভাবটা আজ ছুটি নিয়েছে। তবু সে বলল, আমি তোর মতো হিরো নই। অ্যান্টিহিরো।

মদনের মুখে কথা ফুটল না। কিন্তু চাপা নিষ্ঠুরতাটা জ্বলজ্বল করতে লাগল। মাধব জানে, মদনের মধ্যে একটা কিছু আছে। কিন্তু সেটা কী তা এত বছরেও বুঝতে পারল না। ছেলেবেলায় আসানসোলে কলিয়ারির এলাকায় তারা এক সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। লোকে বলত মদনমাধব। এত গলাগলি ছিল, তবু মদনের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত একস্ট্রা ফাউ জিনিসটার জোরেই না ব্যাটা এম পি। আর সেই ফাউ জিনিসটা যা মাধবের নেই, সেটা এখন মদনের মুখে চোখে ঢেউ দিচ্ছে।

মাধব তার খড়খড়ে দাড়িওলা গাল চুলকোল। তারপর একটু মিয়োনো গলায় বলল, তুই কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নব জেল ভেঙে পালাল, এর মধ্যে একটু অদ্ভুত যোগাযোগ আছে না ? ব্যাপারটা ভেবে দেখেছিস ?

মদন মাথা নাড়ে, না। অত ভাববার সময় নেই। ভেবে লাভও নেই। গোটা দুই মুর্গা কিনে নিয়ে বাড়ি যা। ঝিনুককে ভাল করে রাঁধতে বলিস।

ঝিনুক গত বছর পাঁচেক রান্নাবান্না করেনি।

বলিস কী ?

ঝিনুক না রাঁধলেও আমরা না খেয়ে থাকি না। রান্নার লোক আছে, চিন্তা নেই।

তবে মুর্গা কিনে বাড়ি যা। একটু বেশি করে রান্না করতে বলিস। আমি তোদের না জানিয়েই বৈশম্পায়নকেও নেমন্তন্ন করে দিয়েছি।

বৈশম্পায়ন ! বলে একটু হাসে মাধব, কিন্তু কোনও মন্তব্য করে না।

মদন অবশ্য তীক্ষ্ণ চোখে হাসিটা দেখল। বলল, হাসলি কেন ? এনিথিং রং ?

না, নাথিং রং !

ওকে নেমন্তন্ন করায় তোরা অসুবিধেয় পড়বি না তো !

মাধব মাথা নেড়ে বলে, অসুবিধে তো তোকে নিয়ে। ঝিনুক বলে দিয়েছে ড্রিংক করলে বাড়ি থাকবে না।

হোঃ হোঃ করে হাসে মদন। তারপর গলা নামিয়ে বলে, ড্রিংক কি বাদ যাচ্ছে নাকি ?

না। তবে ছোট করে হবে।

ঝিনুক বাড়ি থাকবে ?

মাধব এবার খুব অদ্ভুত ধরনের একটা হাসি হেসে বলে, বোধ হয় থাকবে। বৈশম্পায়ন আসছে জানলে থাকবেই মনে হয়।

তীক্ষ্ণধার চোখে মাধবের মুখটা দেখে নিচ্ছিল মদন। ঝুঁকে আস্তে করে বলল, ইজ দেয়ার এনি অ্যাফেয়ার ?

সিরিয়াস কিছু নয়। দুজনেই দুজনের প্রতি একটু সফট। ব্যাপারটা আমি খুব এনজয় করি।

মদন হতাশার গলায় বলে, তোরা একেবারে হোপলেস। বউ অন্যের সঙ্গে প্রেম করলেও সেটা তোরা এনজয় করিস কী করে ?

আস্তে মদনা, আস্তে। মাধব গলা আর এক পর্দা নামিয়ে বলে, দুনিয়াটাই তো রঙ্গশালা। কে কার বউ ? কে কার প্রেমিকা ? আমি পজেসিভ নেচারের লোক নই। আমি শুধু দেখি, শেষযৌবনা এক মহিলা মধ্যবয়স্ক একজনের প্রেমে পড়ে কেমন বয়ঃসন্ধির ছুকরি হয়ে যাচ্ছে। ঘ্যাম নাটক মাইরি।

সেই নাটকে তোর ভূমিকা কী ? পর্দা টানা ?

না। আমার ভূমিকা ছিল ভিলেনের। কিন্তু আমি মাইরি ফিলজফার হয়ে গেছি। তবে রেফারির মতো নজরও রাখছি। বাড়াবাড়ি দেখলেই ফাউল বা অফসাইড বলে চেঁচিয়ে বাঁশি বাজাব।

এই সময়ে শোওয়ার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে চিরু আসে। মাধবের দিকে চেয়ে বলে, বন্ধু এসেছে বলে তোর টিকি দেখা গেল। নইলে দিদি মরল কি বাঁচল সে খবরও তো নিস না।

মাধব এক গাল হেসে বলে, তোমার মরার কী ? দিব্যি গায়ে গতরে হয়েছ।

মোটা হয়েছি বলছিস ?

মোটা নয়, মোটা নয়। পরিপূর্ণ হয়েছ।

ফাজিল। চা খাবি ?

মদন একটু ধমক দিয়ে বলে, আরে তুই দুনিয়াসুদ্ধু লোককে চা খাওয়াতে গিয়ে যে পতিদেবতাটিকে ভাত খাইয়ে অফিসে পাঠাতে পারবি না।

না। না খেয়ে যাবে না, ডাল ভাত নেমে গেছে। সেই ভোর রাতে তুই যখন বেরোলি তখনই উঠে সব সেরে ফেলেছি।

মাধব একটা শ্বাস ফেলে বলে, তা হলে চিরুদি, গরিব ভাইকে একটু চা খাওয়াও।

তুই গরিব ? কেয়াতলায় ফ্ল্যাট কিনেছিস, তুই যদি গরিব তো আমরা কী ?

তোমরা সবাই শুধু আমার ফ্ল্যাটটাই দেখলে! আর আমি যে দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছি।

তুই আবার শুকোলি কোথায় ? চিরু অবাক হয়ে বলে, বেশ তো চেহারাটা দেখাচ্ছে। একটু এলোমেলো অবশ্য। রাতে ঘুমোসনি নাকি ?

না, সে সব নয়। মাঞ্জা দেওয়ার সময় পাইনি।

ঝিনুক কেমন ? বেশি মোটা হয়ে যায়নি তো ?

না, না। রেগুলার যোগাসন করে, কম খায়, সারাদিন শরীরের যত্ন করে, কাজকর্ম নেই, মোটা হবে কেন ? ভাল আছে।

বউয়ের কথা উঠলেই তোরা অমন বেঁকিয়ে কথা বলিস কেন বল তো ? বউগুলো কি মানুষ নয় নাকি ?

বেঁকিয়ে বললাম কোথায় ? মাধব অবাক হওয়ার ভান করে।

ওই যে বললি, সারাদিন শরীরের যত্ন করে, কাজ করে না, আরও সব কী যেন!

তোমার মনটাই বাঁকা। একজন মহিলা নিজের শরীরের যত্ন নেয় এটা তো প্রশংসার কথাই। তুমি যে নাও না, তার জন্য আড়ালে আমরা তোমার নিন্দে করি।

চিরু হেসে ফেলে বলে, ইয়ারবাজ। বোস, চা করে আনি।

হ্যাঁ, যাও। রান্নাঘর ছাড়া তোমাকে কোথাও মানায় না।

সেটা তোর জামাইবাবুও খুব ভাল বুঝেছে।

এতক্ষণ মদন একটাও কথা বলেনি। কোনও কথা তার কানেও যায়নি। নিজের নখগুলোর দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবছিল।

মণীশ বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল, যাও ব্রাদার খবরের কাগজ নিয়ে আধবেলার জন্য ঢুকে পড়ো।

কোঁচকানো ভ্রূ সটান হল, একটু হেসে মদন বলে, অত সময় যদি হাতে থাকত জামাইবাবু! এক্ষুনি রাইটার্সে যেতে হবে।

মণীশ মাধবকে দেখে খুশি হয়ে বলে, এই যে ব্রাদার! মদন না এলে মাধবের দেখা পাওয়া যায় না, আমাদের হয়েছে বিপদ। তোমার ফোন নম্বরটা চিরুকে দিয়ে যেয়ো তো।

যাব, কিন্তু আপনি জন্মেও ফোন করবেন না, জানি।

আহা, কখন কী দরকার হয় তার কি ঠিক আছে? তবে পয়সা দিয়ে করতে একটু গায়ে লাগে আজকাল। ফোনের চার্জ যা বেড়েছে!

কেন, অফিস থেকে করবেন!

মণীশ ম্লান একটু হাসে, অফিস থেকে! অফিস থেকে প্রাইভেট ফোন করতে একটু কিন্তু কিন্তু লাগে।

মদন মাথা নেড়ে মাধবকে বলে, জামাইবাবু একটা হোপলেস কেস, বুঝলি মাধব? হি ইজ হেলপলেসলি অনেস্ট। এ রোগের চিকিৎসা নেই।

মাধব হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলল, জামাইবাবুর অনেস্টি সম্পর্কে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা যে শুচিবায়ু হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

মণীশ খুব দুর্বলভাবে একটু হাসে।

॥ ৮ ॥

তুই ভয় পেয়েছিস? মদন জিজ্ঞেস করে।

শ্রীমন্তর মুখ করুণ গম্ভীর। কোনও বিপদ বা ঝামেলা পাকালে শ্রীমন্তর মুখ ওইরকম হয়ে যায়। তাকাতে ভয় করে। সে মদনের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বলে, না। তবে কেয়ারফুল থাকা ভাল।

মদন আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল। বলল, তা থাক। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

শ্রীমন্ত মুখে কিছু বলল না। তবে মনে মনে বোধহয় মদনকে একটা খিস্তি দিল। তার কারণ নব জেল থেকে বেরিয়েও মদনের নাগাল পাবে না। তার আগেই চিড়িয়া ভেগে যাবে দিল্লি। তারপর বিদেশে। কলকাতার ঘূণচক্করে নবর পাল্লা টানতে পড়ে থাকবে শ্রীমন্ত আর তার শাগরেদরা। কাজটা খুব সহজ নয়। যারা নবকে চেনে তারাই জানে।

কথা হচ্ছিল একটা অ্যামবাসাডার গাড়িতে বসে। সকালবেলা। গাড়ি যাদবপুর পেরিয়ে বাঘাযতীনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। সেই বোড়াল।

দিল্লিতে আমার জন্য একটা চেষ্টা করবে বলেছিলে মদনদা।

হবে। মদন অন্যমনস্ক ভাবে বলে, এখানেও তো বেশ আছিস!

একে থাকা বলো! ভদ্রলোকের মতো থাকতে গেলে কলকাতায় কিছু হবে না। দিল্লিতে একটা ব্যবস্থা করে দাও।

কী করবি?

যা হোক। একটা দোকান, না হয় বাস বা ট্যাক্সির পারমিট।

ওখানে পারবি না। শক্ত কাজ। তবু যদি যেতে চাস তো চেষ্টা করব।

করো।

তুই একটু ভয় খেয়েছিস শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত জানে, মদনদা এই যে দিল্লি যাবে, গিয়েই ভুলে মেরে দেবে তার কথা। ভি আই পি-রা সব একরকম। মদনের ওপর নানা কারণেই একটু চটে আছে সে। লোকটা কথা দিয়ে কথা রাখে না। তার ওপর ভয়ের খোঁটা দেওয়া হচ্ছে। শ্রীমন্ত ঠাণ্ডা গলাতেই পাল্‌টি দিল, ভয় একটু তুমিও খেয়েছ মদনদা। নইলে এই সাত সকালে জরুরি কাজ ফেলে বোড়াল রওনা হতে না।

মদন হাসে। একটুও অপ্রতিভ বোধ করে না। বলে, কাল নবর মাকে কথা দিয়েছিলাম। কানোয়ারকে সকালে ফোন করতেই রাজি হয়ে গেল। খবরটা দিয়ে আসা কি খারাপ?

খারাপ বলছি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, নবর মাকে তুমি কাটিয়ে দেওয়ার জন্য ওকথা বলেছ।

মদন একটু চুপ করে থেকে বলে, শত হলেও এক সময়ে নব আমার জন্য অনেক করেছে।

শ্রীমন্ত কথা বাড়াল না। কিছুদিন যাবৎ মদনদার সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছে না এটা সে নিজেই টের পাচ্ছে। মদনদাও কি আর টের পাচ্ছে না?

মদন একটা সিনেমা হলের হোর্ডিং দেখল ঘাড় ঘুরিয়ে। মুখ ফিরিয়ে বলল, এ কথাটা যেন চাপা থাকে।

নবর বউয়ের চাকরি তো? ও নিয়ে ভেবো না।

দিল্লি সত্যিই যেতে চাস?

চাই। কলকাতায় কী হবে বলো। হুজ্জতি করা আমার রক্তে নেই। ওসব মেলা হয়েছে। এইবার সেটল করতে চাই।

তুই বি কম পাশ না?

টুকে মুকে। ওসব বিদ্যে ধোরো না। ধ্যাড়াব!

না, তোকে দিয়ে চাকরি হবে না সে আমি জানি!

চাকরিটাও রক্তে নেই কিনা। আমার বাপ পুরুত ছিল। মেলা যজমান। আমিও নাকি অনেকের কুলগুরু। রাস্তাঘাটে মাঝে মাঝে বেশ বুড়ো বয়স্ক মানুষও দুম করে পেন্নাম ঠুকে দেয়। কতক বাড়ি আছে যেখানে গেলে আমার জামাই আদর।

মদন হাসে, লাইনটা তো ভালই।

হ্যাঁ, ভাল না হলে আমার বাবা চিরকাল ও কাজ করবে কেন? চাকরি আমাদের বংশে কম লোকই করেছে।

নিষ্ঠাবান বামুনের ছেলে হয়ে তুই খুনখারাপি করিস কী করে?

মাইরি মদনদা, ঠুকো না। খুনখারাপি আমার সয় না। একটু হাঁকডাকের লোক ছিলাম বটে বরাবর। কিন্তু এতটা হয়ে যাব ভাবিনি।

মদন শ্রীমন্তর হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বলে, তুই একটু নরম আছিস।

আছি মদনদা। স্বীকার করছি।

নবর মতো তুই কেঠো মানুষ নোস।

তাও নই।

নবর সঙ্গে যদি পাল্লা টানতে হয়, পারবি?

শ্রীমন্ত একগাল হাসে, পারব। তাতে আটকাবে না। তবে আমি ওর মতো নীচে নামতে পারি না। তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ তো?

পারছি। আমার লোক নিয়েই কারবার। তোর মুশকিল হল, তুই যে ভদ্রলোক তা ভুলতে পারিস না। আর, কিছু লোক যে তোকে দেখলে প্রণাম করে সেটাও তোকে কাছা ধরে টানে মাঝে মাঝে।

শ্রীমন্ত হাসল। বলল সবই তো বোঝো দাদা।

আমি তোরটা বুঝি। কিন্তু তুই আমারটা বুঝিস না।

কেন বলছ ওকথা?

এই যে বললি, ভয় পেয়েছি বলেই নাকি আমি নবর বউয়ের চাকরি করে দিচ্ছি।

ওটা একটা ফালতু কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মদন চুপ করে রইল। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে শ্রীমন্তরও বুকটা একটু গুড় গুড় করে ওঠে। তার গায়ে জোর আছে, পকেটে লোডেড রিভলভার আছে, সাহসও আছে, তবু সে জানে মদনদার মতো লোক তার মতো হাজারজনাকে নাচিয়ে বেড়াতে পারে। বে-খেয়ালে বেচাল বলে ফেলেছে।

শ্রীমন্ত একটু চুপ করে থেকে বলল, মদনদা, রেগে আছ মাইরি ?

মদন জবাব দিল না। ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

বোড়ালে বড় রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে মদন নামল। শ্রীমন্ত নামতে যাচ্ছিল, মদন হাত তুলে বলে, না। তুই থাক।

শ্রীমন্ত অবাক হয়ে বলল, একা যাবে ?

একাই যেতে হবে।

তোমার কাছে আর্মস নেই !

তাতে কী ? আমি কোনওকালে আর্মস নিয়ে চলি না। ভয় নেই, আর্মস ছাড়াও আমার অন্য কিছু আছে সেটা তুই বুঝবি না।

কাজটা ঠিক করছ না মদনদা। নব এখন ফ্রি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে একবার টুঁ দেবেই।

দূর বোকা ! নব তোর চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে। ও জানে, পুলিশ ওর বাড়ির চারদিকে জাল পেতে আছে।

তা অবশ্য ঠিক। শ্রীমন্ত মাথা চুলকায়। একটু কেমন লাগে শ্রীমন্তর। মদনদা তাকে সঙ্গে নিচ্ছে না। মদনদা গম্ভীর। কোথাও একটা তাল কেটে যাচ্ছে।

ভয় নেই। বলে মদন একটা ভাঙাচোরা মেটে রাস্তা ধরে এগোতে থাকে।

এদিকে অনেক নিবিড় গাছপালা, পুকুর, ফাঁকা জমি। 'একেবারেই হদ্দ গ্রাম। বেশির ভাগ নিম্নমধ্যবিত্তদের বাস বলে বাড়িঘরগুলোর তেমন বাহার নেই। ম্যাড়ম্যাড়ে, শ্রীহীন। মদনের খুব খারাপ লাগছিল না। সে একবার ঘড়ি দেখল। প্রায় এগারোটা। বেলা একটায় রাইটার্সে মিটিং। সময় আছে। তবু সে একটু পা চালিয়ে হাঁটে।

আধ মাইলের মতো হেঁটে একটা শ্রীহীন, ভারী গরিব চেহারার চালাঘরের সামনে উঠোনে পা দেয় মদন। নব টাকা কামাই করেছিল মন্দ নয়, কিন্তু ঘর সংসারের পিছনে কিছুই ঢালেনি। কেবল অন্য সব ফূর্তিতে উড়িয়ে দিয়েছে। এই কাঠা তিনেক জমিও ওকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়নি। ঝোপজঙ্গলে ভরা এই তিন কাঠা এক মুসলমানকে ভোগা দিয়ে দখল করেছিল সে। সেই জমি আর চালা ঘরটাই এখন নবর আত্মীয়দের একমাত্র আশ্রয়।

মদন উঠোনে পা দিয়ে একবার ফিরে চাইল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা ঘাড়েগর্দানে চেহারার লোক তাকে দেখছে। গায়ে হাফ-হাতা নীল রঙা একটা শার্ট, পরনে ময়লা ধুতি। সাদা পোশাকের পুলিশকে চিনতে এক লহমাও লাগে না মদনের। সে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। তারপর অনুচ্চ স্বরে ডাকে, গৌরী ! গৌরী !

এত ভদ্র গলায় বোধহয় বহুকাল কেউ গৌরীকে ডাকেনি। খোলা দরজায় গৌরী এসে অবাক চোখে তাকায়।

গৌরী ফর্সা নয়। তবে ভারী মিঠে মোলায়েম একটা শ্যামলা রং ছিল তার। ছিল অফুরন্ত স্বাস্থ্যের শরীর। ছিল অকূল দুখানা চোখ। মুখে উপচে পড়ত শ্রী।

এখন তার কিছুই প্রায় নেই। শরীর শুকিয়ে অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে। রং কালো হয়ে গেছে। এখনও শুধু চোখ দুখানা আছে। তাকালে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে আজও।

আমি মদনদা। চিনতে পারছ ?

গৌরীর শুকনো হাড্ডিসার মুখে একটু হাসি ফুটল। খুব অবিশ্বাসের হাসি। প্রথমটায় বুঝি কথা সরল না। তারপর মৃদু লাজুক স্বরে বলল, এলেন তা হলে। আসুন।

বেশিক্ষণ বসার সময় নেই।

গৌরী হারিয়ে গিয়েছিল, এই কথায় হঠাৎ যেন ঝলসে উঠল পুরনো গৌরী। বলল, একটু বসে না গেলে লোককে কী করে বিশ্বাস করাব যে, একজন এম পি আমাদের বাড়িতে এসেছিল ?

মদন মৃদু হেসে নামমাত্র দাওয়ায় উঠে চটি ছেড়ে রাখে। বলে, ঘরে নয়। এইখানেই একটা মাদুর-টাদুর পেতে দাও।

গৌরী বলে, না। এখানে আব্রু নেই। ঘরে আসুন। গরম লাগবে একটু তা আমি পাখার বাতাস দেব'খন।

অগত্যা মদন ঘরে ঢোকে। যেমনটি আশা করা যায়, ঘরটি ঠিক তেমনিই। বেড়ার গায়ে গুটি তিনেক ছোট জানলা বসানো। রোদে তাতা টিনের গরমে ভেপসে আছে ভিতরটা। দু ধারে দুটো সস্তা চৌকিতে অত্যন্ত নোংরা বিছানা। কয়েকটা ফুটপাথে কেনা র‍্যাকে রাজ্যের কৌটো-টৌটো রাখা। তবে একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো আছে, লক্ষ করে মদন।

তোমার শাশুড়ি কই ?

উনি একটা বিড়ির কারখানায় যান।

ছেলেমেয়ে ?

গৌরী একটা শ্বাস ফেলে বলে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে।

লেখাপড়া করে না ?

নাম লেখানো আছে ইস্কুলে। যায় বলে তো মনে হয় না।

তোমার কটি ?

দুজন। বড়টা ছেলে। ছোটটা মেয়ে।

গৌরীর হাত পাখাটা নড়বড়ে। মচাৎ মচাৎ শব্দ হচ্ছে। মদন বলল, থাকগে। পাখা রেখে দাও।

গৌরী রাখল না। বলল, কেমন আছেন ?

ভাল নেই গৌরী।

আপনি ভাল নেই ? তবে আমরা কোথায় যাব।

তোমার শাশুড়ি গতকাল আমার কাছে গিয়েছিল।

জানি। আমি বারণ করেছিলাম, শোনেনি।

বারণ করেছিলে কেন ?

গৌরী একটু উদাস হয়ে বলে, কী হবে গিয়ে ? আমার জীবনে তো আর ভাল কিছু হবে না।

মদন একটু চুপ করে থেকে বলে, তোমার চাকরিটা হয়ে গেছে।

কোথায় ?

নবর কারখানায়।

খবরটা শুনে গৌরী গা করল না। বলল, ও।

কারখানায় ওদের অফিসও আছে। সেই অফিসে।

গৌরী জবাব দিল না। হাতপাখার মচাৎ মচাৎ শব্দ হতে লাগল।

মদন একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, নবর কারখানায় কি তুমি চাকরি করতে চাও না ?

গৌরী মৃদু স্বরে বলে, এই প্রশ্নটাই আপনার আগে করা উচিত ছিল মদনদা।

মদন বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, কাল তোমার শাশুড়ি গিয়ে নবর কারখানায় তোমাকে একটা চাকরি দেওয়ার কথা বলল, তখনও ভেবে দেখিনি যে, তোমার কাছে চাকরিটা কতখানি অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াবে।

গৌরী একটা শ্বাস ফেলে বলল, যাক আপনার বুদ্ধি এখনও লোপ পায়নি দেখছি। একটু দেরিতে হলেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন।

মদন মাথা নেড়ে বলে, বুদ্ধির ধার কমেও যাচ্ছে। আগের চেয়ে মাথা এখন অনেক কম খেলে।

গৌরী একটু ক্লান্ত স্বরে বলে, নবর মাকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, ওর কারখানায় আমার কাজ করা বিপজ্জনক। ওর শত্রু অনেক। তার ওপর ওর উল্টো ইউনিয়ন এখন কারখানা

দখল করেছে। ওখানে চাকরি করা কি সম্ভব! কিন্তু নবর মা তা মানতে চায় না।
কী বলে?
অনেক কিছু বলে। সব তো আপনাকে বলা যায় না। এমনকী বেশ্যাগিরি করেও টাকা আনতে বলে। আর শুনবেন?
মদন একটু গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর বলে, বুড়ি তার উপযুক্ত কথাই বলে। তাতে উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই।
আমি উত্তেজিত হই না তো।
নবর সঙ্গে কি জেলখানায় মাঝে মাঝে দেখা করতে যাও?
না। ওর মা যায়। ছেলে মেয়েও কখনও সখনও যায়।
তুমি যাও না কেন?
কেন যাব?
মদন একটু হাসল, রাগটা কি নবর ওপর? না আমার ওপর?
আপনার ওপর রাগ করব! ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন!
ঠাট্টা করছ?
আপনি ঠাট্টা ইয়ার্কির অতীত হয়ে গেছেন মদনদা।
শোনো, তোমার জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করা খুব শক্ত হবে না। ট্রেড ইউনিয়ন তো কম করিনি। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে যাই, এখানে আর থেকো না।
গৌরী অবাক হয়ে বলে, থাকব না? কেন?
কারণ আছে! তোমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই?
গৌরী বিহ্বল মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। কোথায় যাব?
বাপের বাড়ি এখনও কি ম্যানেজ হয়নি?
না! কোনওকালে হবেও না।
তা হলে?
আমার যে কোনও জায়গা নেই, সে তো আপনি জানেন!
চিন্তিত মুখে মদন একটা হুঁ দিল। তারপর আরও খানিকক্ষণ ভেবে বলে, দূরে যেতে হলে পারবে?
কোথায়?
ধরো যদি দিল্লি যেতে হয়?
আমার জন্য আপনি এত ভাবছেন কেন? আমি বেশ আছি। এর চেয়ে বেশি বিপদ আর কী হবে?
একটু দ্বিধা করে মদন বলে, কাল নব জেল থেকে পালিয়েছে। জানো?
এতক্ষণ ভাঙা পাখার মচাৎ মচাৎ শব্দে কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল মদনের। এখন হঠাৎ পাখার শব্দটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিস্তব্ধতাটা খুব বড় করে শোনা গেল।
অবশ্য কয়েক সেকেন্ড বাদেই আবার পাখার মচাৎ মচাৎ শব্দ দ্বিগুণ জোরে হতে লাগল। গৌরী বলল, আপনি ঘরে ভীষণ ঘেমে যাচ্ছেন। দাওয়াটাতেও রোদ পড়েছে।
আমার জন্যে ভেবো না। আমি এক্ষুনি চলে যাব। হাতে অনেক কাজ।
সে তো জানি। এত বড় দেশের দণ্ড-মুণ্ডের একজন কর্তা তো আপনিও।
তোমার মুখে এসব কথা শুনতে ভাল লাগে না গৌরী।
কেন মদনদা? আমি কি আলাদা কিছু?
আলাদাই তো ছিলে। এখন কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছ। কেবল কি ঠেস দিয়ে কথা বলতে হয়?
আমার আজকাল স্বাভাবিক কথা আসতে চায় না। মনটা খুব সংকীর্ণ হয়ে গেছে বোধ হয়। হওয়ারই কথা।

না গৌরী, আমাকে দেখলেই তোমার প্রতিহিংসা জেগে ওঠে।

প্রতিহিংসা কেন হবে ? কী যে বলেন, বলে গৌরী হঠাৎ হাত পাখাটা থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে কী শুনল, তারপর বলল, নবর মা আসছে।

মদন মৃদু একটু হেসে বলে, বুড়ি খুব খাণ্ডার না ?

গৌরীও হাসে, নবর মা তো, একটু তেজি তো হবেই।

তোমার সঙ্গে খুব লাগে ?

গৌরী মাথা নাড়ে, লাগে, তবে একতরফা। আমি জবাব দিই না।

সে কী ! মদন অবাক হয়ে বলে, জবাব দাও না কেন ? এক সময়ে তো তুমি দারুণ ভাল ঝগড়াটি ছিলে ! যাকে তাকে ক্যাট ক্যাট করে কথা শোনাতে।

গৌরী অবসন্ন মুখে বলে, আপনি তো আমার দোষ ছাড়া গুণ কখনও দেখেননি।

হাত নেড়ে মদন বলে, ওসব কথা রাখো। আমি তোমাকে ভাল চিনি। কথা হচ্ছে শাশুড়ির সঙ্গে একটু ঝগড়া টগড়া করো না কেন ? তাতে তো সময়টাও ভাল কাটে।

কী যে বলেন মদনদা। গৌরী বিরক্ত মুখে জবাব দেয়।

কেন, ঝগড়া কি খারাপ ?

সে আপনিই জানেন। আমার ভাল লাগে না।

বুড়ির মুখ কেমন ? খুব খারাপ কথা বলে ?

গৌরী হেসে ফেলে। বলে, কেমন আবার ! আস্তাকুঁড়।

তা হলে তো তোফা।

আপনি আবার ঝগড়া-প্রিয় হলেন কবে থেকে ?

আহা, পার্লামেন্টে তো আমরা ঝগড়াই করি। দারুণ ঝগড়া। তবে সেখানে গালাগাল চলে না, পয়েন্টে পয়েন্টে ল্যাঙ্গালেঙ্গি হয়। আমার অবশ্য ওরকম বাবু-ঝগড়া ভাল লাগে না। বহুকাল বস্তিমার্কা ঝগড়া শুনিনি, একটু শোনাবে ?

গৌরী ভ্রূকুটি করে তেতো গলায় বলে, আমি কি বস্তির মেয়ে ?

আরে না। তুমি আবার ঘুরিয়ে ধরলে। আমি নবর মার কথা বলছিলাম। একটু খুঁচিয়ে দিলে একেবারে ভাগীরথীর উৎস খুলে যাবে। দাও না একটু খুঁচিয়ে।

গৌরী উদাস হয়ে বলে, আপনি খোঁচান গিয়ে। আমি নিত্যি শুনছি। ওই আসছে। উল্টোদিকের বাড়ির বউয়ের সঙ্গে কথা বলছিল এতক্ষণ। কথা থেমেছে।

বুড়িকে খবরটা দেবে নাকি ?

কোন খবর ?

নব যে পালিয়েছে।

উদাস মুখে গৌরী বলে, আপনিই দিন।

তুমি এত উদাস ভাব দেখাচ্ছ কেন বলো তো ! নবকে খুঁজতে পুলিশ সব দিকে ঘুরছে। এ বাড়িও তাদের নজরবন্দি। নবকে ধরার জন্য দরকার হলে গুলিও চলবে। আমার নিজের ধারণা, নব মরতেও পারে।

তার আমি কী করব ?

নব মরলে তুমি বিধবা হবে, জানো না ?

খুব জানি। তবে আমার বিধবা হওয়ার আর বাকি কী ? বিয়ের দিন থেকেই তো আমি বিধবা।

নবর ওপর তোমার খুব রাগ।

রাগের স্টেজ পার হয়ে গেছে। এখন শুধু ঘেন্না।

তুমি যা পষ্টাপষ্টি কথা বলো ! কিন্তু নবর সঙ্গে তো তোমাকে কেউ ঝোলায়নি। তুমি নিজেই ঝুলেছ।

গৌরী একটু থতমত খেয়ে বলে, আমি ঝুলব কেন ? আমি নবকে কোনওকালে চাইনি তো !

মদন গম্ভীর হয়ে বলে, আমি তখন লিডার ছিলাম না গৌরী। এ পাড়ায় সে পাড়ায় একটু আধটু

সোশ্যাল ওয়ার্ক করতাম। নবর মতো ফেরোসাস গুণ্ডা বা নীলুর মতো ভাল ওয়ার্কারকে তখন আমার খুব দরকার হত। যদিও আমরা তিনজন ছিলাম তিনরকম, কিন্তু কাজ করতাম এক সঙ্গে। আর একটি জায়গায় আমাদের মিল ছিল। আমরা তিনজনই তোমাকে পছন্দ করতাম।

গৌরীর মুখ সাদা দেখাচ্ছিল।

মদন একটু চোখের ইশারা করে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, বুড়ি কদ্দূর ? এল নাকি ?

গৌরী মাথা নেড়ে বলে, পুকুরে হাত-পা ধুতে গেছে। এক্ষুনি আসবে।

মদন বলে, হ্যাঁ, আমরা তিনজনই তোমাকে পছন্দ করতাম। তাই না ?

নীলুর কথা থাক। তবে আপনারা দুজন করতেন। মানছি।

কিন্তু তুমি নবকেই দেহ মন দিয়েছিলে, আমাদের পাত্তা দাওনি।

নবকে আমি মন দিইনি। খুব ক্ষীণ গলায় গৌরী বলল।

শুধু দেহ ?

সেটাও ও জোর করে নিত।

আর মনটা ? সেটা কাকে দিয়েছিলে ? আমাকে, না নীলুকে ?

তা জেনে কী হবে ? আপনি তো আগে কখনও জানতে চাননি।

তা ঠিক। তবে জানতে চাইতে হবে কেন বলো তো। মন দিলে তো এমনিতেই টের পাওয়ার কথা।

বহু মেয়েই আপনাকে মন দিয়েছিল, তাদের দিকে তাকানোর সময় আপনার ছিল না।

সময় ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে টেরও পেতাম না ভেবেছ ? শুধু তোমারটাই টের পাইনি কোনওদিন। তবে নীলু টের পেত কি না জানি না।

কান্নার আগে যেমন মুখ হয় গৌরীর মুখ এখন ঠিক সেইরকম। চোখ স্থির, লাল, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আবেগটাকে ঠেকাচ্ছে। পাখাটা রেখে ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় দরজায় নবর মা উঠে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে আবছায়াতেও বুড়ির নজর মদনকে চিনে ফেলেছে। চোখে ভারী অবাক ভাব। মুখখানা হাঁ করা।

মদন মৃদু একটু হেসে বলে, এই যে মাসি ! আপনার বউমার চাকরির একটা খবর আছে। তাই দিতে এলাম।

নিজে এলে ! কী ভাগ্যি ! আমি ভাবছিলাম, বড় মানুষ, বোধহয় গরিবের কথা ভুলেই গেছ।

বুড়ির গলাটা টনটনে। স্বাভাবিক স্বরটাও সাত বাড়িতে শোনা যায়।

মদন বলল, নব আমার সাকরেদ ছিল। তার জন্য এটুকু করা কিছু না।

তা ঠিক। নবর মা এক গাল হেসে বলে, তা কাল থেকেই কি যাবে বউমা ?

মদন মাথা নেড়ে বলে, না মাসি। চাকরি এখানে নয় দিল্লিতে।

দিল্লি ? ও বাবা, তা হলে এখানে কী হবে ?

এখানে আপনি তো রইলেন।

বুড়ি গলা জলে আঁকুপাকু খেতে থাকে। কথা ফোটে না মুখে। এই সময়ে বুড়ির পাশ কাটিয়ে গৌরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মদন চোখ টিপে বলে, চাকরি তো এখানেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নবর বউ করতে চাইছে না। বলে, নবর কারখানায় চাকরি করতে নাকি ঘেন্না করে।

বলল ? বুড়ির গলা সাত বাড়ি ছেড়ে সাতটা গাঁয়ে পৌঁছে যায়।

মদন উঠে পড়ে। ভাগীরথীর মুখ খুলে গেছে। এবার খেউড়ের বেনোজল নেমে আসবে। খুব ইচ্ছে ছিল মদনের, বসে থেকে শুনে যায়। কিন্তু ঘড়ি ঘোড়ার মতো দৌড়াচ্ছে। রাইটার্সে মিটিং। বিকেলে পার্টির জরুরি সভা।

মদন দাঁড়িয়ে বলল, আমি দিল্লি গিয়েই ব্যবস্থা করছি। নবর বউ যেন তাড়াতাড়ি চলে যায়। সম্ভব হলে আজই।

গিয়ে কোথায় উঠবে ?

সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চলি।

বলে মদন বেরিয়ে আসে। রাস্তায় পড়ে কয়েক কদম গিয়ে একটু দাঁড়ায়। ওই শোনা যাচ্ছে সারা এলাকা মাৎ করে নবর মায়ের গলা চৌদুনে পৌছল... গেছো মাগি··· অমুকভাতারি···তমুক ভাতারি···

মদন আর দাঁড়াল না। মৃদু একটু হেসে হাঁটতে লাগল। লাগ ভেলকি লাগ! নারদ নারদ!

॥ ৯ ॥

সময়ের একটু আগেই পৌঁছে গেল বৈশম্পায়ন। ভারী লজ্জা-লজ্জা করছিল তার। রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন, কিন্তু এখনও ভাল করে দিনের আলোটাও মরেনি।

কিন্তু না পৌঁছে উপায়ই বা কী ? কাল থেকে ঘরে শুয়ে শুয়ে শরীরে জড়তা এসে গেছে। আর মনটা পাগল-পাগল করছে কেয়াতলার এই বাড়িটার কথা ভেবে। উদ্দাম এক হাওয়া এসে পালে লাগছে বার বার। বন্দর ছাড়তে বলছে। ভেসে পড়ো। ভেসে পড়ো। সামনে অকূল দরিয়া। মৃত্যুশাসিত এই পৃথিবীতে মানুষেব সময় বড় কম। লাভালাভ, ভোগ-উপভোগ সব সেরে নাও বেলাবেলি।

আজও দরজা খুলল কিশোরী ঝি পুনম। বাইরের ঘর আজ আরও পরিপাটি সাজানো। চন্দনেব গন্ধওয়ালা ধূপকাঠি জ্বলছে। অন্তত চার ডজন রজনীগন্ধা। ঘরে কেউ নেই।

ইতস্তত করে বৈশম্পায়ন জিজ্ঞেস করে, মাধব আসেনি ?

না, মামাবাবুর তো অফিস।

এ কথায় আরও লজ্জা পায় বৈশম্পায়ন।

বড্ড বেশি আগে আগে চলে এসেছে। এখন কিছু করার নেই। সে সোফার এক কোণে বসে সিগারেট ধরাল। ভিতরে ভিতরে একটা কামনা শেয়ালের মতো ছোঁক ছোঁক করছে, উঁকি মারছে এদিক সেদিক।

কিন্তু এই নিরিবিলি ঘরটিতে বসে, ঠুলি পরানো আলোয় কিছুক্ষণ চারদিকের ভৌতিকতাকে অনুভব করতে করতেই দূর, বহু দূর থেকে মৃত্যু নদীর করুণ গান ভেসে এল। সাদা পাথর, বিশাল উপত্যকা, অন্তহীন নদী, অবিরল তার গান।

জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে গেল আঙুল থেকে। নিচু হয়ে তুলবার সময় সে দুর্দান্ত সুগন্ধটা পেল বাতাসে। এই সব সুবাস মাখে একজন। মাত্র একজনই। সে ঘরে এসেছে নিঃশব্দে। সিগারেটটা কুড়োতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় নিল বৈশম্পায়ন।

সামনে সোফায় ততক্ষণে মুখোমুখি স্থির হয়ে বসেছে ঝিনুক।

বৈশম্পায়ন মুখ তুলে বলল, কী খবর ?

ঝিনুকের পরনে বেরোনোর পোশাক। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে চটি, চোখে ভ্রূকুটি।

ঝিনুক মৃদু কিন্তু রাগের গলায় বলে, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।

বৈশম্পায়ন একটু অবাক হয়ে বলে, সে কী ? কেন ?

কেন তা আপনাদের বোঝা উচিত।

বৈশম্পায়ন ঝিনুকের অসহনীয় সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে মনে মনে ভীষণ হতাশা বোধ করে। এত রূপ যার সে কি কখনও সহজলভ্য হতে পারে ? বড় দূর, বড় দুর্লভ ঝিনুক।

সে বলল, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার জন্যেই নাকি ?

আপনার জন্য! ও মা, কী কথা বলে লোকটা! আপনার জন্য বাড়ি থেকে পালাব কেন ?

বৈশম্পায়ন আবার লজ্জা পেয়ে বলে, তা হলে ?

বাড়ি থেকে পালাচ্ছি আপনার বন্ধুর জন্য। কাউকে খেতে বললেই কি সঙ্গে একটা ককটেলেরও অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে ? এত বিরক্তিকর। দেখবেন আয়োজনটা ?

বলে ঝিনুক উঠে লিভিংরুমে চলে যায়। একটু বাদে দু হাতে গোটা চারেক বড় বোতল নিয়ে আসে। বলে, শুধু এতেই শেষ নয়। আরও ছটা বিয়ারের বোতলও আছে। ফ্রিজে সব ঠাণ্ডা হচ্ছে। কার না মাথা গরম হয় বলুন তো ?

বৈশম্পায়ন স্কচ দেখে এবং বিয়ারের কথা শুনে শুকনো জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, ঠিকই তো।

ঝিনুক ঝংকার দিয়ে বলে, আর ভাল মানুষ সাজতে হবে না। মদ দেখলেই আজকাল পুরুষগুলো এমন হ্যাংলামি করে। এতে আপনারা কী আনন্দ পান বলুন তো!

আনন্দ! ওঃ, না ঠিক আনন্দ নয় বটে।

ঝিনুক ভীষণ জোর ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, একটুও আনন্দ নেই। মদ খেয়ে ভুল বকে, আনবিকামিং বিহেভ করে, তারপর বমি আছে, হুল্লোড় আছে। কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো। তবু গুচ্ছের পয়সা খরচ করে সেই অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চাই!

সেই জন্যই আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন ?

ঝিনুক পুনমকে ডেকে বোতলগুলো আবার ফ্রিজে পাঠিয়ে দিয়ে বলল, বোতলের গা থেকে মেঝেয় জল পড়েছে, মুছে নিয়ে যা তো!

ঘর মুছে পুনম চলে যাওয়ার পর ঝিনুক বলল, আমার কথার একটুও দাম দেয় না। এম পি বন্ধু এসেছে তো কী হয়েছে ? তাই বলে বাড়িটাকে শুঁড়িখানা বানাতে হবে ? আর আজকালকার এম পি-রাই বা কীরকম ? যখন তখন তারা মদ খাবে কেন ?

মদের সপক্ষে কেউ বলার নেই দেখে বৈশম্পায়ন খানিক ভেবে এবং খানিক সাহস সঞ্চয় করে মৃদু করে বলল, ঠিক মদ খাওয়া নয়। স্টিমুল্যান্ট হিসেবে একটু খাওয়া তেমন খারাপ নয়। অনেক বড় বড় লিডারও খেতেন।

স্টিমুল্যান্ট! বলে ঝিনুক ব্যঙ্গের হাসি হাসল। বলল, তা হলে তো বলার কিছুই ছিল না। আমি আপনার বন্ধুকেও চিনি, মদনকেও চিনি। মদ পেলে এমন হামলে পড়বে যে, দেখলে মনে হয় এটা ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনও ইমপরট্যান্ট জিনিস নেই। হোটেল থেকে এক কাঁড়ি দামি খাবার নিয়ে আসবে, তার কিছুই শেষ পর্যন্ত খেতে পারবে না। বহুবার এরকম ঘটেছে।

তা হলে তো—বলে বৈশম্পায়ন সংশয় প্রকাশ করে।

সেই জন্যেই আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। মাতালদের আমি দু চোখে দেখতে পারি না।

সব কথা যে বৈশম্পায়ন শুনতে পাচ্ছে বা বুঝতে পারছে তা নয়। সে চেয়ে আছে, বুঝবার চেষ্টাও করছে, কিন্তু ঝিনুকের সৌন্দর্য থেকে একটা সম্মোহন ওর গায়ের সুগন্ধের মতোই বার বার উড়ে এসে আচ্ছন্ন করছে তাকে। ঝিনুক! কী সুন্দর!

বৈশম্পায়ন সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে রেখে বলল, আপনি যদি বেরিয়ে যান তা হলে আমারও খালি বাড়িতে বসে থাকার মানে হয় না।

এই বলে বৈশম্পায়ন উঠতে যাচ্ছিল, ঝিনুক ভারী নরম মায়াবি গলায় বলল, আপনি তো ওদের মতো একস্ট্রোভার্ট নন, তবে আপনি খান কেন বলুন তো! যারা সিরিয়াস মানুষ, যাদের মনের গভীরতা আছে তারা কেন এসব বাজে ফুর্তি করবে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

বৈশম্পায়ন অপরাধী মুখ করে লাজুক গলায় বলে, আমার মদে কোনও নেশা নেই, তবে প্রেজুডিসও নেই।

নেশা মাধবেরও নেই। কিন্তু কোনও অকেশন পেলেই মদের চৌবাচ্চায় লাফিয়ে পড়বে। আজকাল লোকে এত মদ খায় কেন তা আমি একদম বুঝতে পারি না।

বৈশম্পায়ন সম্মোহনের আর একটা ঘোর কাটাল। ঝিনুক! কী সুন্দর!

মৃত্যু-নদীর কলরোল কানে ভেসে আসছে। ফুরিয়ে যাচ্ছে আয়ু। জীবনে সময় বড় কম। বড় কম। তুমি কি জানো, ঝিনুক, কিশোরী বয়স থেকে আমি তোমার প্রেমিক।

বৈশম্পায়ন যে হাসিটা হাসল তাও সম্মোহিতের হাসি। বলল, কেন যে খায় তা আমিও জানি না। মদের দামও আজকাল ভীষণ, তবু তো খাচ্ছে।

ঝিনুক ভ্রূ কুঁচকে বলল, মদের দাম কি খুবই বেশি ?

খুব বেশি। প্রতি বছর বাজেটে ট্যাকস বসে আর দাম ওঠে।

ওই বোতলগুলোর দাম কত হবে জানেন ?

মাথা নেড়ে বৈশম্পায়ন বলে, আমার ঠিক আইডিয়া নেই। তবে পঞ্চাশ ষাট টাকা বা তারও বেশি।

চোখ কপালে তুলে ঝিনুক বলে, একেকটা বোতলের অত দাম ?

খুব কম করে ধরেও।

ইস্‌স ! বলে ঝিনুক তার চমৎকার হাতখানা ছোট কপালে রেখে গম্ভীর হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

মদ খুবই একসপেনসিভ নেশা। বৈশম্পায়ন মৃদুস্বরে বলে, আপনি কি জানতেন না ?

ঝিনুক ভ্রূকুটি করে বৈশম্পায়নের দিকে চেয়ে বলে, আমার মদের দাম জানার কথা নাকি ?

বৈশম্পায়ন ঢোঁক গিলে বলে, ঠিক তা মিন করিনি। তবে আজকাল সবাই সব খবর রাখে।

ঝিনুক বিরক্ত গলায় বলে, আমি সকলের মতো নই।

বৈশম্পায়নের ভিতর থেকে কে যেন সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরে, তা ঠিক। আপনি অন্যরকম।

ঝিনুক আবার ভ্রূকুটি করতে গিয়ে হেসে ফেলে বলে, আমি কীরকম বলুন তো ?

বৈশম্পায়নের ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই মরে যায়। আর একটা সম্মোহনের ঢেউ এসে আচ্ছন্ন করে তাকে। ঝিনুক ! কী সুন্দর ! তুমি যেখান দিয়ে হেঁটে যাও সেই পথে সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে থাকে। যেদিকে তাকাও, আলো হয়ে যায়। তোমার জন্যই সেতু বন্ধন। তোমাব জন্যই ট্রয়েব যুদ্ধ। তোমার জন্যই বেঁচে থাকা মরে যাওয়া। তুমি কীরকম তা কি বলে শেষ কবা যায় ? কথাব অত ক্ষমতা নেই ঝিনুক।

ঝিনুক এই অসহায় লোকটিকে রেহাই দিয়ে একটা শ্বাস ফেলে বলল, আমি ভীষণ খাবাপ, জানি।

না, না। বৈশম্পায়ন প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

ঝিনুক উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনার বন্ধুর ফিরতে দেবি হবে। অফিস থেকে বেরিয়ে কোন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যাবে খাবার আনতে। আপনি কি ততক্ষণ একা বসে থাকতে চান ?

না। বৈশম্পায়ন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বরং একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাবেন ?

বিশেষ কোথাও না।

ঝিনুক মৃদু একটু হাসে। বলে, তা হলে আমার সঙ্গে চলুন।

কোথায় ?

আমার বোন থাকে কাছেই, গোলপার্কের ওদিকটায়। ওর জন্য একটা ঝি ঠিক করেছি, বলে আসি।

বৈশম্পায়ন এত সৌভাগ্যের কল্পনা করেনি। একটু অবিশ্বাসী চোখে চেয়ে থেকে বলল, চলুন।

॥ ১০ ॥

গড়িয়া স্টেশনের খানিকটা আগেই চলন্ত ইলেকট্রিক ট্রেনের কামরা থেকে একটা লোক লাইনের ধারে লাফিয়ে নামল। কাজটা খুব সহজ নয়। ইলেকট্রিক ট্রেনের কামরায় নামবার সিঁড়ি নেই, পাটাতনও বেশ উঁচু আর লাইনের ধারে অতি সংকীর্ণ জায়গায় নুড়ি পাথর ছড়ানো, যমদূতের মতো গা-ঘেঁষা লোহার পোস্ট। কিন্তু লোকটা নামল অনায়াসে, যেন প্রতিদিন এইভাবে নামা তার অভ্যাস। কামরার কিছু লোক তাকে বহুক্ষণ লক্ষ করছিল, এখন তারা মুখ বের করে তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে দেখছে। কেউ অবশ্য কিছু বলল না। তার চেহারাটাই এমন যে, লোকে কিছু বলতে সাহস পায় না, কাছে এগোতে চায় না।

ট্রেনটা এগিয়ে গিয়ে থামল। কয়েকশো গজ দূরেই স্টেশন। স্পষ্ট বিকেলের আলোয় সব দেখা যাচ্ছে। বহু লোক। গিজগিজে ভিড়। সে এখন যতদূর সম্ভব ভিড় এড়াতে চায়।

নামবার সময় উপুড় হয়ে মাটিতে হাতের ভর দিয়েছিল সে। এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু হাতে ঘষাঘষি করে ধুলো ময়লা ঝেড়ে ফেলল।

চারিদিকে শরতের ভারী সুন্দর এক বিকেল। বাঁয়ে গড়িয়ার বাজারে বোধহয় আজ হাট বসেছে। খালে একমাথা ভর ভরন্ত জল। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। গাছপালা গভীর সবুজ। মেঠো গন্ধ। অবারিত মুক্ত মাঠঘাটে অগাধ বাতাস। গরম না, ঠাণ্ডাও না। লোকটা অবশ্য প্রকৃতির এই সাজগোজ লক্ষ করল না। তার সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখ চারদিকে ঝেঁটিয়ে পরিস্থিতিটা দেখে নিচ্ছিল। যা দেখল তাতে নিশ্চিন্ত হল সে। অবশ্য এই নিশ্চিন্ত অবস্থাটা বেশিক্ষণের জন্য নয়। বহু চোখ তাকে খুঁজছে। খুঁজে পেলে যে আবার ধরে জেলে পুরবে, তা নাও হতে পারে। বেকায়দা দেখলেই গুলি চালাবে। তার অবস্থাটা খুব সুখের নয়। সুখে সে কোনওকালে ছিলও না। একটা রাতও নিশ্চিন্তে ঘুমোয়নি বড় হওয়ার পর থেকে। কোনও পথেই সাবধান না হয়ে হাঁটেনি কখনও। খুব ঘনিষ্ঠ লোককেও আগাপাশতলা বিশ্বাস করেনি।

ইশারা ছিল অনেক আগেই থেকেই। দিন পনেরো আগে একজন পলিটিক্যাল আড়কাঠি জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করে যায়। বেশি ধানাই পানাই করেনি, সোজা বলেছে, আমাদের হয়ে কাজ করবে?

সে বরাবরই এ দলের বা সে দলের হয়ে কাজ করেছে। সুতরাং এ প্রশ্নের জবাব দিতে ভাবতে হয়নি, করব।

ব্যস, কথা ওইটুকুই। কিন্তু তার মধ্যেই ইশারাটা ছিল। পরশু বিকেলে একজন কয়েদির মারাত্মক পেট ব্যথা। তাকে পুলিশের গাড়িতে হাসপাতালে নেওয়ার সময় তার ডাক পড়ল স্ট্রেচার ধরতে। হাসপাতাল পর্যন্ত রুগির সঙ্গে ছিল সে। বেডে তুলে দিল। আর তারপরই দেখল, পালানোর জন্য কসরতের দরকার নেই। শুধু ইচ্ছে। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সে পেচ্ছাপখানা হয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। কয়েদির পোশাকটাই ছিল সবচেয়ে বেখাপ্পা জিনিস, কিন্তু কলকাতার লোক আজকাল এতরকম বিচিত্র পোশাক পরে যে, লোকে তেমন মাথা ঘামায় না।

লোকটার বুদ্ধি তেমন বেশি নয়, লোকটার মনে খুব একটা জটিলতা নেই, দুনিয়া সম্পর্কে তার ধারণা খুবই স্পষ্ট এবং মোটা দাগের। তার বেশির ভাগ অনুভূতিই শারীরিক। যেমন যৌনতা এবং ক্ষুধাবোধ। তবে শরীরের ব্যথা-বেদনার বোধ তার খুবই কম। তার মানসিক অনুভূতি এক আঙুলে গোনা যায়। কোনও ফালতু দুঃখ-টুঃখ আর তার নেই। শুধু আছে একটা প্রচণ্ড একরোখা আগুনে রাগ, আছে ভয়ঙ্কর রকমের টাকার লোভ, দুনিয়ায় প্রায় কারও প্রতিই তার কোনও গভীর ভালবাসা নেই, মানুষকে খুন করতে তার দুঃখ হয় না বটে, কিন্তু খুন করার পর সে বহুক্ষণ খুব অস্থির থাকে, তার একটা পশুসুলভ ভয়ও আছে, কিন্তু সেটা খুব কমই সে টের পায়। তবে একটা অনুভূতি তার প্রখর, সে আগে থেকেই বিপদের গন্ধ পায়।

পরশু রাতে কলকাতার ভিড়ে ছাড়া পেয়ে তার প্রথম জেগেছিল এক হিংস্র প্রচণ্ড কাম। সেই তাড়নায় তার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। আজকাল দুনিয়া খুব তাড়াতাড়ি পাল্টায়, দোস্তরা রং বদলে ফেলে, দল ভেঙে যায়। সে জেলখানায় থাকতে কী কী হয়ে গেছে তা না জানলে সে লাইনটা ধরতে পারবে না। লাইন ধরতে না পারলে বেরিয়েও লাভ নেই। খাবি খেয়ে মরতে হবে। তাই কোনও ঝুঁকি নেওয়া তার উচিত ছিল না। কিন্তু সেই কাম তাকে তাড়া করে আনল কসবা পর্যন্ত। নীতু বরাবর তার বাধ্য ছিল, বাঁধাও ছিল। সে নীলু হাজরার ফুঁকো খুনের মামলায় ঘানি টানতে যাওয়ার পর নীতু বিয়ে করেছে। বেশি দিন নয়, মাত্রই। নীতুকে নিয়ে মাঝে মাঝে থাকবে বলে সে রথতলার দিকে বস্তির যে ঘরটা ভাড়া নিয়ে রেখেছিল সেই ঘরেই সংসার পেতে বসেছে।

সেই সদ্য-পাতা সংসারে সে রাত নটায় হানা দিল।

কী রে নীতু। জমিয়ে নিয়েছিস?

যে নীতু তাকে দেখলে গলে পড়ত সে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। অদ্ভুত এক নাকিসুরে

বলে উঠল, তুমি পালিয়েছ ! অ্যাঁ !

কেন, তাতে তোর অসুবিধে হল ?

বিয়ের জল পড়ে নীতুর রুক্ষ চেহারাটা কিছু ফিরেছে। বেড়ার সঙ্গে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ও এইমাত্র ম্যাচিস কিনতে মোড়ে গেল, এক্ষুনি আসবে।

লোকটা কে ?

তুমি চিনবে না।

কী করে ?

আটা চাকি আছে।

তা তুই ভয় পাচ্ছিস কেন ? কিছু খেতে মেতে দিবি ?

নীতু রুটি সেঁকছিল জনতা স্টোভে। ঘরময় কেরোসিনের গন্ধ। এ কথায় একটু সহজ হয়ে বলল, দিচ্ছি। বোসো। এই পোশাকে এলে, লোকে দেখেনি ?

দেখেছে।

পুলিশও দেখেছে তা হলে।

দেখলে দেখেছে। ভয় পাচ্ছিস ?

নীতু একটু হাসল। একেবারে মডার হাসি। মৃদুস্বরে বলল, পুলিশ এলে তো মুশকিল।

তোর মুশকিল কী ? মুশকিল তো আমাব !

তোমার কথাই ভাবছি।

তোর লোকটার জামা প্যান্ট আছে কিছু ?

নীতু মুখ নিচু কবে বলল, আছে, তবে তোমাব গায়ে হবে না।

দেখি। বের কর।

নীতু খুব দ্বিধা আর অনিচ্ছের সঙ্গে ঘরের একধারে রাখা একটা সস্তা আলনা থেকে একটা প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট নিয়ে আসে। লোকটা দেখে, দিব্যি ফিট করবে তাকে। কোমরটা একটু ঢিলে হতে পারে, ঝুল একটু বা বেশি। তা হোক, এই অবস্থায় ওটুকু কিছু না।

জামা প্যান্ট পাশে রেখে লোকটা মাটি ওঠা ঠাণ্ডা মেঝের ওপর বসে বলল, দে।

নীতু খুব আস্তে ধীরে এবং অনিচ্ছের সঙ্গে একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় রুটি আর কুমড়োর তরকারি বেড়ে দিয়ে বলে, ডাল আছে।

কাঁচা লঙ্কা দে, আর পেঁয়াজ থাকে তো পেয়াঁজ। হাতটা কোনওরকমে গ্লাসের জলে একটু ধুয়ে সে দিকবিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রথম কয়েক গ্রাস খাওয়ার পরই সচেতন হল। দরজার দিকে মুখ করেই বসেছিল, কিন্তু পাতের দিকে নজর থাকায় খেয়াল করেনি। দরজা খুলে একটা লোক ভিতরে ঢুকতে গিয়ে থমকে চেয়ে আছে।

চোখ তুলে সে লঘু স্বরে বলে, এসো নটবর। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

লোকটার চেহারা দেখলেই মালুম হয়, একে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, ঘাড়টা একটু তুলে কামানো, রোগা, তামাটে রং, মুখটা ভালমানুষের মতো। খেটে খাওয়া লোকের মতো মজবুত চেহারা। বয়স চল্লিশের কিছু নীচে হবে। সে চোখ পাকিয়ে তাকালে পেচ্ছাপ করে দেবে। লোকটা তাকে একটুক্ষণ দেখেই বুঝে গেছে। ঘরে ঢুকে সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে বিছানায় গিয়ে বসল। নীতু টুঁ শব্দটি করল না।

কয়েক চোপাটে রুটি উড়িয়ে ভরপেট জল খেয়ে লোকটা উঠল। এবার আর একটা কাজ। নীতুকে চাই।

চাই বটে কিন্তু সমস্যা এই ফালতু লোকটাকে নিয়ে। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এ লোকটা ভিতু, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি ঘর থেকে একে বের করে দেওয়া যায় তবে বাইরে গিয়ে বস্তি আর পাড়ার লোক জুটিয়ে আনতে পারে। আর ঘরে থাকলে নীতুর অসুবিধে। শত হলেও এর সঙ্গেই তো সে ঘর করছে।

তবে এসব সমস্যা নিয়ে ফালতু মাথা ঘামাতেও সে রাজি নয়। এতকাল সে নীতুকে যেমন ইচ্ছে কাজে লাগিয়েছে। দু দিন চোখের আড়াল হয়েছিল, সেই ফাঁকে এই ট্রেচারি। সুতরাং নীতুর যদি কিছু অসুবিধে হয় তবে সেটা ওর পাওনা।

লোকটা তার হাফপ্যান্টে হাত মুছে বলল, তারপর কাপ্তান! কী খবর? নীতু তোমার দেখ-ভাল ঠিক মতো করছে তো?

লোকটা হাঁ করে চেয়েছিল। হাতে একটা বিড়ির বান্ডিল আর একটা দেশলাই তখনও ধরা। কথার জবাব দিতে গিয়ে দুবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, হ্যাঁ।

জেলখানার কামিজটা গা থেকে খুলে ফেলে সেইটে ঘুরিয়েই লোকটা একটু হাওয়া খেয়ে পরিস্থিতিটা ঠিক মতো বুঝে নিল। নীতু তাকে জানে, সুতরাং নীতু ঝামেলা করবে না। কিন্তু এই লোকটা করতে পারে। আর কিছু না হোক, ভয়ে চেঁচাতে পারে। এই ঘরটার সুবিধে যে, এটা কোনার ঘর। উত্তর দিকে আর ঘর নেই, উঠোন। কিন্তু দক্ষিণের ঘরে লোকজনের সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বস্তি জুড়েই নানারকম কথাবার্তা, চেঁচানি, চ্যাঁ ভ্যাঁ, চেঁচানোমাত্রই লোক জুটে যাবে।

লোকটা খুব ঠাণ্ডা গলায় নীতুর মানুষকে বলল, তুমি যাকে নিয়ে ঘর করছ সে আমার রাখা মেয়েমানুষ, তা জানো কাপ্তান?

লোকটা আবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, একটু আধটু শুনেছিলাম।

নীতু আসলে আমার মেয়েমানুষ। তুমি ফালতু লোক। তাই না?

লোকটা চোখ সরিয়ে নিয়ে ভয় খাওয়া গলায় বলে, আমি ঝামেলায় যেতে চাইনি। কিন্তু নীতু বলল—লোকটা থেমে যায়।

কী বলল? সে ধমক দেয়।

বলল আপনার অনেকদিনের মেয়াদ। ওকেও দেখাশোনার কেউ নেই। তাই—

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই কাপ্তান। আমার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এখন নীতুকে আমি ফেরত চাই। তুমি কী করবে?

আমি! বলে লোকটা অগাধ জলে পড়ে চারদিকে তাকাল।

এতক্ষণ নীতু কথা বলেনি। কিন্তু এইবার আটা মাখা হাত শব্দ করে ঝেড়ে বলল, নবদা, আমি ওকে বিয়ে করেছি। তুমি এখন ওসব কথা বোলো না।

তোরও বিয়ে হয় নীতু? ঘাটাপড়া মেয়েমানুষের বিয়ে? ওপরের ওই বাঁশ দেখছিস? ওর সঙ্গে তোর চুল বেঁধে ঝুলিয়ে রাখব। বলে সে নীতুর দিকে চেয়ে থাকে।

নীতু চোখ নামায় বটে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার ফোঁপানির শব্দ পাওয়া যায়।

নব নীতুর মানুষটার দিকে চেয়ে বলে, কী করবে কাপ্তান? যাবে? না থাকবে?

লোকটা নীতুর দিকে চেয়ে শুকনো মুখে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, নীতু ছাড়া কি আপনার চলবে না? আমরা অনেক ভেবেচিন্তে গুছিয়ে সংসার পেতেছিলাম।

ওসব বাত ছাড়ো। আজ রাতের মতো নীতুকে আমার চাই। তুমি বসে বসে দেখবে? না যাবে?

লোকটা জিব দিয়ে ঠোঁট চাটল। প্রাণের ভয় বড় ভয়। তবে তলানি সাহসটুকু উপুড় করে ঢেলে সে বলল, নীতুকে আমার খুব পছন্দ ছিল। ওকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে দাদা। বলতে বলতে তার চোখে টলটল করে জল ভরে এল।

নীতু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, তোমারও তো বউ আছে নবদা? গৌরীদিকে জিজ্ঞেস কোরো তো, পারে কিনা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে—

এ কথায় নব আর একটু গরম হল। চাপা হিংস্র গলায় বলল, মুখ ভেঙে দেব বেশি কথা বললে।

লোকটার সাহসের তলানি আরও কয়েক ফোঁটা অবশিষ্ট আছে দেখা গেল। সে বিড়ি আর দেশলাই বার বার এ হাত ও হাত করতে করতে বলল, নীতুকে কি আপনি বরাবরের জন্য চান দাদা? নাকি আজ রাতটা হলেই চলে?

লোকটা ব্যবসা জানে। নব কামিজটা দূরের আলনার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলে, অত সব ভেবে দেখিনি। এখন চাই, এটুকু বলতে পারি।

লোকটা শুকনো মুখে বলল, আমাদের একটা সিস্টেম না কী যেন বলে তাই তৈরি হয়ে গেছে তো! তাই বলছিলাম—

কী বলছিলে কাপ্তান?

বলছিলাম নীতুকে ছাড়া যদি আপনার না চলে তা হলে আজ রাতের মতো আমি বরং আমার এক পিসি আছে বাঘাযতীনে, তার কাছে গিয়ে থেকে আসি। কাল পরশু আমরা অন্য জায়গায় উঠে যাব।

এই সময় নীতু হঠাৎ ফুঁসে ওঠে, না, তুমি যাবে না! কিছুতেই যাবে না! বলে উঠতে যাচ্ছিল নীতু।

নব তখন মারল। বেশি জোরে নয়, ডান পা সামান্য তুলে মাজার একটু ওপরে। নীতু আবার বসে পড়ল। কিন্তু চেঁচাল না। প্রাণের ভয়।

লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে বলল, মারবেন না। আমি যাচ্ছি নীতু। কাল বেলাবেলি চলে আসব। ভেবো না।

নীতু বিহ্বল মুখে বসে শূন্য চোখে চেয়েছিল। লোকটার কথায় একটু নড়ল। তারপর ধীরে আটা মাখার কানা উঁচু কলাই করা বাটিটা সরিয়ে রাখল।

নব লোকটার দিকে চেয়ে বলে, বাইরে গিয়ে কোনওরকম গোলমাল করবে না তো।

লোকটা গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। আমি তেমন মানুষ নই। আর নীতু তো আপনার হাতেই রইল।

লোকটা নিঃশব্দে চলে গেলে নব গিয়ে দরজা দিল। তারপর এক ঝটকায় নীতুকে তুলে আনল বিছানায়।

তবে এরকম কাঠের মতো শক্ত, বিস্বাদ মেয়েমানুষ সে জীবনে ভোগ করেনি।

রাতে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আরও দুবার নীতুর গায়ে হাত তুলতে হয়েছিল নবকে। তবে খবর বিশেষ কিছু পেল না। হয় নীতু খবর চেপে যাচ্ছিল, নয়তো জানেই না।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ লোকটা আবার এল। মুখ শুকনো, চোখ লাল, বার বার ঢোঁক গিলছে। নীতু নবর জন্য স্টোভ জ্বেলে দ্বিতীয় দফা চা করছিল। শক্ত মুখে একবার তাকাল লোকটার দিকে। কিছু বলল না। লোকটাও না।

শুধু নব খুব আদর দেখিয়ে বলল, কী খবর কাপ্তান? সারা রাত নীতুব কথা ভেবে মেয়েমানুষের মতো কান্নাকাটি করেছ নাকি? তুমি সতী বটে হে?

লোকটা তার দিকে চাইল না। মাথা নিচু করে উবু হয়ে ঘরের মাঝখানটায় বসে রইল।

লোকটার ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামাল নব, লোকটার তোলা জলে স্নান করল, লোকটার পয়সায় কেনা চালের ভাত খেল, তারপর লোকটার জামা আর প্যান্ট পরে এবং লোকটার কাছ থেকেই গোটা ত্রিশেক টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নীতুটা অন্যের হয়ে গেছে। ওকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না ভেবে একটু গা জ্বালা করল তার। কিন্তু এসব গায়ে মাখার মতো সময় নেই। নীতু আর কাপ্তান আজই এ জায়গার পাট ওঠাবে ভেবে রওনা দেবার আগে বলে গেল, ঘরটা আমার নামে নেওয়া আছে হে কাপ্তান, বাড়িওলাকে আবার ছেড়ে দিয়ে যেয়ো না। একটা তালা লাগিয়ে মোড়ে মাস্তর দোকানে আমার নাম করে চাবিটা রেখে যেয়ো।

পালালেই যে মুক্তি পাওয়া যাবে না তা জানে নব। কিছুদিন আগে যে পলিটিকসওয়ালা দেখা করতে এসেছিল তার সঙ্গে পরশু দিনের ঘটনাটা দুইয়ে দুইয়ে চার হয়। সকলের নাকের ডগার ওপর দিয়ে সে খুনের আসামি নইলে বেরিয়ে এল কী করে? পিছনে একটা মতলব কাজ করছে। সেই মতলবটা বুঝতে লাইন ধরতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। একবার বেরিয়ে আসতে দিয়েছে বলেই যে পুলিশ জামাই-আদর করবে তা নয়। বিস্তর পুলিশ মতলবটার খবর জানে না।

দিনের বেলা লোকালয়ে তাই একটু গা ছম ছম করছিল নবর। তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে

সেই পলিটিকসওয়ালার সঙ্গে মোলাকাত করতে হবে। কিন্তু লাইনটা জানে না নব। লাইনটা জানতে সে দু-চার জায়গায় টুঁ দিল। খুব সুবিধে হল না। তবে বিকেলের দিকে বালিগঞ্জে এক পাঞ্জাবির দোকানে রুটি তড়কা খেতে খেতে ক্ষীণভাবে মনে পড়ল, ওই পলিটিকসওয়ালা যে পার্টির লোক সেই পার্টির একটা ছোকরাকে সে চেনে। নাম জয়দ্রথ। তার দাদা এক ব্যাঙ্কের অফিসার, তারও একটা শক্ত যেন কী নাম! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওই একই গ্রুপের লোক মদনদাও। আর কে না জানে মদন ফোর টুয়েন্টি তাকে পুরো ফলস কেসে ঘানি গাছে জুড়ে দিয়েছিল!

লাইন থেকে নেমে ডান হাতে পিচ রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে নবর গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল রাগে

জয়ের বাড়িটা খুঁজে বের করতে খুব সময় লাগল না নবর। জয় বাড়িতে নেই, তার মা বলল।

কখন আসবে জানেন?

কী জানি বাবা। এম পি মদন কলকাতায় এসেছে, তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে সারাদিন।

মদন এসেছে! নবর গায়ের রোঁয়া আর একবার দাঁড়াল। গা-জ্বালা করল তার।

দুনিয়ার রং এ-বেলা ও-বেলা পাল্টে যায়। যারা তার পালানোর পথ করে দিয়েছে তাদের রং পালটাবে। কিন্তু একসময়ে যার হয়ে সে খুনখারাপি মারদাঙ্গা করেছে, বিস্তর ঝামেলা থেকে তাকে নিজের জান দিয়ে বাঁচিয়েছে তার বেইমানির শোধ নেওয়ার মওকা আর পাবে না।

নব বড় রাস্তার কাছাকাছি একটা তেমাথায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

॥ ১১ ॥

প্রথম থেকেই মিটিংয়ে বেড়াল কুকুরের ডাক আর টেবিল চাপড়ানি চলছিল। কর্মী বৈঠকে এরকম মাঝে মাঝে হয়ও। কিন্তু আজকের মিটিংয়ের টেম্পো প্রথম থেকেই অ্যায়সা চড়ে ছিল যে, কারও কোনও কথা কেউ শুনতে পাচ্ছিল না। দলের রাজ্য কমিটির সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, ট্রেজারার থেকে শুরু করে জনা দশ-বারো নেতা পার্টি অফিসের বড় ঘরের মেঝেয় দেয়ালে ঠেস দিয়ে শতরঞ্চিতে অসহায়ভাবে বসা। তার মধ্যে মদনদাও। সবাই কথা বলার চেষ্টা করে করে হেদিয়ে পড়েছে। সেক্রেটারি বার তিন-চার চেষ্টা করেছিলেন, একবার একটা গোল করে পাকানো সিগারেটের প্যাকেট এসে তাঁর কপালে লাগল, সেই সঙ্গে চিৎকার, বসে পড়ো চাঁদু। সেক্রেটারি সেই যে বসে পড়েছেন আর ওঠেননি। ট্রেজারার একবার বাথরুমে যেতে চেয়েছিলেন, তিন-চারটে ষণ্ডা ছোকরা কাঁধ চেপে বসিয়ে দিল ওসব হবে না। গুরুপবাজির হিল্লে করে নাও আগে, তারপর হিসি টিসি।

জয় খুব ভিতরে সেঁধোতে পারেনি, দরজা দিয়ে ঢুকে প্রচণ্ড ভিড়ে দেয়ালে সেঁটে গেছে। পাশে হরি গোঁসাই, জয় ফিসফিস করে একবার বলল, বড় বড় নেতারা এভাবে হেকেল হচ্ছে, এ খুব অন্যায়।

হরি খিক করে হেসে বলে, চেপে যা। হচ্ছে হোক। একটু হওয়া দরকার।

মদনদা কোনও ইনিসিয়েটিভ নিচ্ছে না, দেখেছ?

চালাক লোক। পাবলিকের চোখে ইমেজ রাখছে।

কিন্তু মদনদা দাঁড়ালে সব সমাধান হয়ে যাবে।

হলে এতক্ষণে মদনদা দাঁড়াত রে। তা নয়। কালকের ক্লোজডোর মিটিংয়ে বসে নেতারা এককাট্টা হতে পারেনি।

বিমর্ষ মুখে জয় বলল, আজকাল নেতারা একদম এককাট্টা হতে পারছে না হরিদা। কী হবে বলো তো?

দল ভাঙবে। আবার কী? বাঁ কোণে নিত্য ঘোষ বসে আছে কেমন বেড়ালের মতো মুখ করে দেখছিস?

জয় একটা শ্বাস ফেলে বলল, দেখেছি। কিন্তু নিত্যদা আলাদা দল করতে চাইলেই কি হবে ? নিত্যদার যে সেই ইয়েটা—কী যেন বলে—সেইটে নেই।

কীয়েটা ?

ওই যে ! জয় সহজ ইংরিজি শব্দটা হাতড়াতে হাতড়াতে বলে, ওই যে ইনফ্লুয়েন্স না কী যেন !

তোর মাথা। এই মিটিংয়ে বারো আনাই নিত্য ঘোষের লোক।

সে বুঝেছি। কিন্তু কী করে হয় বলো তো হরিদা। নিত্যদা তিন বার অ্যাসেমব্লিতে দাঁড়িয়ে হেরে গেছে। ওকে কে পোঁছে ?

সবাই কি ভোটে জেতে ? জিতলেই যে তাকে সবাই পোঁছে এমনও নয়।

আমি বলছি হরিদা, একবার মদনদা যদি সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করে তা হলে—

কী বোঝাবে ?

এটা যে নিত্য ঘোষের চক্রান্ত সেই কথাটা।

বিপদ আছে রে।

কী বিপদ ?

তখন নিত্য ঘোষও উঠে দাঁড়িয়ে মদনদার আর একটা চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। ওরা কেউ কাউকে ঘাঁটাতে চাইছে না এখন। দল ভাগ হলে তখন কোমর বেঁধে লড়বে। এখন ক্যাডার কালেকশন।

মদনদার চক্রান্তের কথা নিত্য ঘোষ কী বলবে ? মদনদার আবার চক্রান্ত কী ? তুমি যে কী বলো হরিদা।

হরি গোঁসাই কী একটু বলার জন্য চুলবুল করেও সামলে গেল, বলার তো ট্যাকসো লাগে না। পাবলিকের সামনে একটা কিছু টক ঝাল বললেই পাবলিক খেয়ে নেয়। আর পলিটিকসওয়ালাদের কটা কথা সত্যি ? চক্রান্ত না থাকে তো বানিয়ে একটা বলে দেবে।

লোকে বিশ্বাস করবে না।

চেঁচামেচি বাড়ছিল। আগের দিকে খুব একটা ঠেলাঠেলি চলেছে। একটা ছোকরা কী একটা বলছিল চেঁচিয়ে, তিন-চারজন তাকে ধরে খুব ঝাঁকাচ্ছে। ধাক্কা মেরে মেরে ভিড় ঠেলে বের করে আনছে। হরি গোঁসাই আর জয় দুজনেই ছোকরাকে চিনল। মদনদার বডিগার্ড শ্রীমন্ত।

জয় উত্তেজিত হয়ে বলে, স্টেট আর সেন্ট্রাল লিডারদের সামনে কী হচ্ছে দেখো হরিদা !

কিছু করার নেই। দেখে যা। বলে হরি গোঁসাই জয়ের হাতে একটু চাপ দেয়।

এরপর কি পার্টি মিটিং-এও পুলিশ ডাকতে হবে নাকি ? প্রেস্টিজ বলে কিছু থাকল না।

গলা উঁচুতে তুলিস না। লোকে তাকাচ্ছে। চাপা গলায় হরি গোঁসাই বলে।

মদনদা তবু কিছু করছে না, দেখেছ ?

কী করবে ? এতগুলো অ্যান্টি লোক।

সবাই অ্যান্টি ? পার্টি ভাগ হলে মদনদা কোনদিকে থাকবে তা জানো ?

হরি গোঁসাই ঠোঁট উল্টে বলে, কে জানবে ? নিত্য ঘোষ ডিসিডেন্ট, একটু জানি। দিল্লির একটা ফ্যাকশন নিত্য ঘোষকে অ্যাপ্রুভ্যালও দিয়েছে। যে গ্রুপ স্ট্রং হবে মদনদা সেই দিকেই থাকবে মনে হয়।

জয় কথাটা শুনে খুশি হল না। একটু তেরিয়া হয়ে বলল, মদনদা কি সেই ধাঁচের লোক ? যেদিকে আগুন দেখবে সেদিকেই হাত সেঁকবে ?

দূর বোকা। উল্টো বুঝেছিস। বলতে চেয়েছিলাম, মদনদা যেদিকে জয়েন করবে সেদিকটাই আলটিমেটলি স্ট্রং হবে। চল বাইরে গিয়ে শ্রীমন্তকে ধরি। ব্যাপারটা একটু বোঝা যাবে।

জয়ের ইচ্ছে ছিল না। সে এই মিটিংয়ের শেষটা দেখতে চায়। কিন্তু সামনের দিকে হুড়োহুড়ি বাড়ছে। ঠেলাঠেলি চলছে ভীষণ। দেখা যাচ্ছে না ভাল, তবে বোঝা যাচ্ছে সামনে আর একটা মারপিট লেগেছে। মদনদার কিছু হবে না তো ?

হরি গোঁসাইয়ের পিছু-পিছু জয় বেরিয়ে আসে।

পার্টি অফিসের সামনে বারান্দা। বারান্দার নীচে একটু বাঁধানো জায়গা। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। বিস্তর চেনা অচেনা আধচেনা পার্টি ওয়ার্কার দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীমন্ত ভিড় ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই একটা জিপ। একটা লোক জিপের সামনের সিটের ওপর একটা খোলা ফার্স্ট এইড বকস থেকে তুলোয় কী একটা ওষুধ তুলে শ্রীমন্তর কব্জিতে লাগাচ্ছে।

শ্রীমন্ত ! কী ব্যাপার ? হরি গোঁসাই খুব সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করে।

শ্রীমন্ত একবার বাঘা-চোখে তাকায়। বাবারে, কী চোখ ! লাল, জ্বলজ্বলে আগুনে। শ্রীমন্ত বিগড়োলে খুব গড়বড়, সবাই জানে। হরি গোঁসাই দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার সাহস পেল না।

জিপের লোকটা শ্রীমন্তর হাতে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, একটা সিকুইল খেয়ে নিস। এখন বাড়ি গিয়ে বসে থাক। সন্ধের পর যাব।

জিপের লোকটাকে জয় আবছা চেনে। কালো, পেটানো চেহারা, মাথায় টাক, বছর চল্লিশেক বয়স। পরনে খুব ঝা চকচকে প্যান্ট আর দামি হাওয়াই শার্ট। শ্রীমন্তর হাতে ব্যান্ডেজ করে দেওয়ার পর সে একবার খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চাউনিতে জয় আর হরি গোঁসাইকেও দেখল।

শ্রীমন্ত রাগে ফুঁসছে। গলার শিরা ফুলে আছে, চোখে সেই ক্ষ্যাপা দৃষ্টি। বলল, মা কালীর দিব্যি বলছি নদুয়াদা, হেলার লাশ আমি নামাব। না হলে নাম পাল্টে রেখো।

নদুয়া নামের লোকটা সাপের মতো একটা হিস্‌স শব্দ করে গালের পানটা একটু চিবিয়ে নিয়ে বলল, রিঅরগানাইজেশন হচ্ছে। তখন দেখা যাবে। এখন বাড়ি যা।

শ্রীমন্ত একবার পার্টি অফিসের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকে।

পিছনে সঙ্গ ধরে হরি গোঁসাই। জয় এগোয় না। কয়েক পা সরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। নদুয়াকে সে চেনে। এর গোডাউন থেকে কয়েক বছর আগে বন্যার সময় মদনদা গম বের করেছিল। গমের মাপ নিয়ে খুব লেগেছিল মদনদার সঙ্গে। নদুয়া বলেছিল, রিলিফের জিনিস আর মাপব কী, ওরকম নিয়ম নেই। যে মাপ বলে দেব সেইটেই ঠিক মাপ। কিন্তু মদনদা ছাড়েনি। বলেছে সরকার যখন দাম দেবে তখন গুনে নেবেন না ? তখন চোখ বুজে থাকবেন ? শেষ পর্যন্ত দলের ছেলেরা গুদাম ঘেরাও করার ভয় দেখানোয় সব মাল মাপা হয়েছিল। বিস্তর কম ছিল ওজনে। এ সেই লোক। সম্পূর্ণ করাপটেড। তবে পলিটিক্যাল লাইন আছে, টাকা আছে, জিপ গাড়ি আছে, গুণ্ডা আছে। শিয়ালদার যে করাপটেড লোকটা যাত্রীদের কাছ থেকে ভড়কি দিয়ে টিকিট নিচ্ছিল তাকে ধমকানো যত সোজা একে ধমকানো তত সোজা নয়। লোকটা বুকে হাত রেখে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ রাখছে। জিপে ড্রাইভার বসা। প্রস্তুত। মনে হচ্ছে কাউকে তুলে নিয়েই হাওয়া হবে। কাকে তা অবশ্য জয় জানে না।

এত গোলমালে জয়ের মাথা ধরে গেছে ; মনটা বড় ভার। মাত্রই সে বিভিন্ন জায়গায় পার্টির বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেতে শুরু করেছে। হিঙ্গলগঞ্জে দলের সংগঠনে তাকে পাঠানোর কথা হচ্ছিল। দু-চার বছর পরেই সে অ্যাসেমব্লির টিকিট পেয়ে যেত। মদনদার মতো করেই নিজেকে তৈরি করছিল সে। আয়না দেখে দেখে বক্তৃতা দেওয়া এবং সেই সঙ্গে নানারকম একসপ্রেশন দেওয়া প্র্যাকটিস করছিল। গলার ওঠানামা, হাততালির জন্য ঠিক জায়গায় জুতসই আবেগকম্পিত ভাবালু কথা লাগিয়ে তুঙ্গে উঠে যাওয়া, এ সবই অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল তার। স্বয়ং ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি কবার পিঠ চাপড়ে বলেছেন, তুমি বেশ তৈরি হচ্ছ। কিন্তু হঠাৎ এ হল কী ? পার্টি যে ভাঙবে তা সে নিজে দু মাস আগেও কেন জানতে পারেনি ?

হরি গোঁসাই ফিরে এসে বলল, চল।

শ্রীমন্তদার সঙ্গে কথা হল ?

হল। চল, বলছি।

একটু এগিয়ে গিয়ে হরি গোঁসাই বলে, শ্রীমন্ত মদনদার কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

কেন ?

তা বলল না। শুধু বলল, অনেক ব্যাপার আছে।

কবে ছাড়ল ? কালও তো আঠা হয়ে লেগে ছিল সঙ্গে।

কবে ছাড়ল জেনে কী হবে ? আজকাল হকে নকে এ ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

জয় গম্ভীর মুখে একটু ভাবল। তারপর বলল, শ্রীমন্তদা ছাড়বে জানতাম।

কী করে জানলি ?

হাবভাব দেখে। কদিন আগে আমাকে একবার কথায় কথায় বলেছিল, মদনদার বেস ওয়ার্ক ভাল হচ্ছে না। স্টেট লিডাররা নাকি মদনদার ওপর খুশি নয়। তখনই সন্দেহ হয়েছিল, শ্রীমন্তদা গোপনে অন্য দিকে তাল দিচ্ছে। শ্রীমন্তকে যারা ম্যানহ্যান্ডেল করল তারা কারা জানো ? মদনদার লোক নয় কিন্তু।

না, মদনদার লোক হবে কেন ? হেলার নাম শুনলি না ? হেলা হচ্ছে নিত্য ঘোষের—

জানি জানি। ধৈর্য হারিয়ে জয় বলে, কিন্তু তাই বা হয় কী করে ? শ্রীমন্তদা মদনদাকে ছেড়ে দিলে আর একটা গ্রুপে তো তাকে ভিড়তে হবে ! সেই গ্রুপটা তো নিত্যদার। তা হলে নিত্যদার লোক ওকে মিটিং থেকে বের করে দেবে কেন ?

বুঝতে পারছি না। এখন বাড়ি চল।

গিয়ে ?

গিয়ে আবার কী ? এখন কেটে পড়াই ভাল।

মদনদা একা রইল যে। যদি কিছু হয় ?

কিছু হবে না।

আমাদের দেখা উচিত।

দেখে লাভ নেই। মদনদাকে দেখার লোক আছে। চল।

হরি গোঁসাইয়ের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জয় বলে, আমার মনে হয় কী জানো ? দলে ভাল লোক কেউ থাকবে না।

হরি গোঁসাই চিন্তিত মুখে বলে, তাই তো দেখছি। মদনদা যদি পাওয়ারে না থাকে তবে বিশুটাকে মেডিক্যালে দেওয়া হয়ে গেল। ওদিকে এই সময়ে নবটাও জেল থেকে বেরিয়েছে। কী যে হবে।

সারা পথ জয় সেই অতীতের সুদিনের কথা ভাবতে ভাবতে এল। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। তার মধ্যে রড ধরে তেড়াবেঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল, সেই কবে পালবাজার অবধি একটা সাইকেলে ডবলক্যারি করেছিল তাকে মদনদা। একটা মিটিং সেরে ফিরছিল তারা। রডে বসে মদনদার শ্বাস নিজের ঘাড়ে টের পেতে পেতে, আর এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে বার বার মনে হয়েছিল, মদনদা একদিন খুব ওপরে উঠবে ! সেজদিকে খুব পছন্দ ছিল মদনদার। সেজদিরও মদনদাকে। বাড়িতে এলেই সেজদির সঙ্গে ছাদে গিয়ে পুটর পুটর কথা বলত। জয় টের পেয়ে আনন্দে কণ্টকিত হয়েছে কতবার। মদনদা যদি সেজদিকে বিয়ে করে তো কী দারুণ হয় ! হয়নি কেন তা জানে না জয়। একদিন এক পলিটেকনিক পাশ সরকারি চাকরের সঙ্গে সেজদির বিয়ে হয়ে গেল। মদনদা তার বছর চারেক বাদে এম পি হয়।

বাস থেকে নেমে জয় আনমনে মোড়টা পেরিয়ে গলিতে ঢুকল। এ পাড়া দারুণ নির্জন। একধারে জলা, পুকুর জঙ্গল অন্য ধারে কিছু ছাড়া ছাড়া বাড়ি ঘর। তবে এরকম থাকবে না। নতুন প্ল্যানিং-এ চল্লিশ ফুট চওড়া রাস্তা হবে। জমজম করবে জায়গাটা।

ঝুপসি একটা গাছতলা থেকে সরু একটা শিস শোনা গেল। তারপর চাপা গলায় কে ডাকল, জয়দ্রথ !

কে ?

এদিকে শোন। ভয় নেই।

কে বলো তো ? জয় এগোতে সাহস পেল না। তবে দাঁড়াল।

আমি। বলে ছায়া থেকে রাস্তায় একটা লোক এগিয়ে আসে।

শরতের রোদ অল্প বেলাতেই মরে গেছে। চারদিকটা ঘোর ঘোর। বেশ ঠাহর করে চিনতে হয়। তবু এক নজরেই চিনল জয়।

নব ?

কসবায় পিলু নামে একটি নকশাল ছেলেকে খুন করেছিল নব। পিলুর কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে ইয়ার্কি ঠাট্টা করতে করতে, ঠোঁটে সেই সিগারেট নিয়েই আচমকা কোমর থেকে দোধার ছোরা টেনে এনে খুব স্নেহের সঙ্গে তলপেটটা ফাঁক করে দিল সাঁঝবেলায়। পিলু যখন মাটিতে পড়ে বুকফাটা চেঁচিয়ে উঠল তখন শান্তভাবে তার হাঁ মুখে হকিবুটসুদ্ধ পা চেপে ধরে সিগারেটে মৃদু মৃদু টান দিচ্ছিল নব। তারপর খুব হিসেব নিকেশ করে আর একবার ছোরা চালিয়ে পাঁজরার ফাঁক দিয়ে হৃৎপিণ্ডটা ফুঁড়ে দিল। তখনও সিগারেটটা জ্বলছে ঠোঁটে। পিলুরই দেওয়া সিগারেট। পিলু নিথর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ সিগারেটটা জ্বলছে নবর ঠোঁটে। ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখেছিল হাসিম, তার কাছ থেকে জয়ের শোনা। নবর ওই 'ভয় নেই' কথাটাকে জয় তাই বিশ্বাস করে না।

এখনও নবর ঠোঁটে একটা সিগারেট জ্বলছে। সেটা নামিয়ে নব আর এক হাতে জয়ের একখানা হাত ধবে বলল, আড়ালে আয়। কথা আছে।

জয় জানে ভয় পেয়ে লাভ নেই, সাহস দেখিয়েও লাভ নেই। নব যা ভেবে এসেছে তাই করবে। এক ধরনের খারাপ রক্ত নিয়ে নবর মতো লোক দুনিয়ায় জন্মায়। যেখানে থাকে সেই জায়গা জ্বালিয়ে দেয়, যাদের সঙ্গে কাজ কারবার করে তাদের সুখ শান্তি বলে কিছু থাকে না।

গাছতলার ছায়ার জয়কে টেনে এনে নব বলে, বোস। ঘাস একটু ভেজা আছে।

জয় চারদিকে চেয়ে বলে, এ জায়গায় পরশু দিনও কেউটে সাপ বেরিয়েছে। এই গাছটার ফাঁপা শেকড়ের মধ্যে আস্তানা।

নব কথাটা কানে না তুলে বলে, শোন, কদিন আগে একজন লোক জেলখানায় আমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিল। নাম বলেছিল গোপাল বিশ্বাস চিনিস ?

চিনি।

কোথায় থাকে ?

ঠিকানা জানি না। পার্টি অফিসে আসে।

ঠিকানা জোগাড় করে আজই তার সঙ্গে লাইন করতে হবে। চল।

বলে নব আবার জয়ের হাতটা ধরে।

জয় দোনোমোনো করে বলে, এখনই ?

এখনই। বলে নব একটু হাসে।

জয় বলল, চলো।

॥ ১২ ॥

মদন আপন মনে ফিক ফিক করে হাসছিল। ব্যাপারটা এমন মজার !

রাজ্য শাখার সেক্রেটারি মানুষটা ভাল। দলের কাজে মেতে থাকায় বিয়েটা পর্যন্ত করেননি। বিমর্ষ মুখে হলঘরের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে ছিলেন। মদনের দিকে তাকিয়ে খুব মৃদু স্বরে বললেন, হাসছ ? হাসো, খুব হাসো। আজ হাসারই দিন। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে মারধোর খেয়ে জেল খেটে চল্লিশ বছর ধরে যে স্যাক্রিফাইস করলাম তা কার জন্য ? ভেবে আমারও হাসিই আসার কথা, কিন্তু আসছে না কেন বলো তো ?

আপনার বয়স কত বলুন তো সুহৃদদা ? ষাট বাষট্টি হবে ?

পঁয়ষট্টি চলছে। কেন বলো তো ?

তা হলে এখনও বিয়ের বয়স আছে। এবার একটা বিয়ে করুন।

ইয়ার্কি করছ ? এটা কি ইয়ার্কির সময় ? ভারী হতাশা মাখানো মুখে সুহৃদ চৌধুরী বললেন।

বিয়ে না করলে কে আপনাকে দেখবে ?

যম দেখবে হে। আর কে দেখবে ? এই সব ছেলে ছোকরারা রাজনীতিতে ঢোকার পর থেকে যে ভূতের নৃত্য শুরু হয়েছে তা আর চোখে দেখা যায় না। শিশুপাল, সব শিশুপাল।

মদন হাসতেই থাকে, ফিক ফিক। সেক্রেটারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তাই ভাবছিলাম কার জন্য এই স্যাক্রিফাইস। বিয়াল্লিশে পুলিশ এমন মেরেছিল গোড়ালিতে, আজও একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। জেলে থেকেই গ্যাসট্রিক। বনগ্রামের যে বাড়িটা পার্টির নামে লিখে দিয়েছিলাম বিশ বছর আগে, বাজার যাচাই করে দেখেছি সেটার দাম এখন লাখখানেক টাকা।

মদন হাসছিল ফিক ফিক।

হলঘরে তুমুল কাণ্ড হয়েই যাচ্ছে। এক ছোকরা আর একটা ষণ্ডামার্কের কাঁধে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতার বাঁধানো ছবি নামিয়ে ঝপাৎ করে আছাড় মারল। কয়েকবারই জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো এসে নেতাদের শতরঞ্চিতে পড়েছে। প্রেসিডেন্ট তাঁর চটি দিয়ে সেগুলো নিভিয়েছেন। এবারও আর একটা জ্বলন্ত সিগারেট উড়ে এসে ট্রেজারারের কোঁচায় পড়ল। উনি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কোঁচাটা টেনে নিলেন, প্রেসিডেন্ট হাতে চটি নিয়েই বসে আছেন, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সিগারেটটার মুখ ভোঁতা করে দিলেন এক বাড়ি মেরে। ট্রেজারার বললেন, শতরঞ্চিটা বাহাত্তর টাকায় কেনা সেই বিশ বছর আগে। আর কি এ দামে পাওয়া যাবে প্রকাশদা?

প্রেসিডেন্ট প্রকাশ চাটুজ্জে গম্ভীব মুখে বললেন, সবই গেল, আর শতরঞ্চি! তোমার যে বাথরুম পেয়েছিল তার কী করলে?

ট্রেজারার ব্যথিত মুখে বললেন, কী করব? চেপে বসে আছি। পুরনো ডায়াবেটিসের রুগি, বেশিক্ষণ চেপে রাখাও যাবে না। এক সময়ে হয়ে যাবে আপনা থেকেই। শতরঞ্চিটা—

মদন মৃদু স্বরে বলে, ভেসে যাক, ভেসে যাক, বেগটা ছেড়ে দিন।

ট্রেজারার বেদনায় নীল হয়ে বলেন, কী যে বলো ঠিক নেই। এই শতরঞ্চিতে কত বড় বড় নেতা বসে গেছেন জানো? তার ওপর এটা ত্রিশ ফুট বাই ত্রিশ ফুট, আধ ইঞ্চি পুরু। একবার ধোয়া হয়েছিল, চড়া রোদেই শুকোতে লেগেছিল পনেরো ষোলো দিন।

দু গোছা রজনীগন্ধা রাখা ছিল মাঝখানে। দুটো ছেলে এসে পটাপট তুলে নিয়ে গেল। দেখা গেল অদূরেই তিন-চারজন রজনীগন্ধার ডাঁটি বাগিয়ে ধরে তলোয়ার খেলছে।

কী হচ্ছে বলুন তো মদনদা! একজন মফস্বলের এম এল এ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

বলতে না বলতেই ফুলশূন্য দুটো ডাঁটি তীরবেগে উড়ে এসে পড়ল নেতাদের মাঝখানে। প্রবীণ সদস্য যদুবাবু হাত দিয়ে মুখ আড়াল না করলে তাঁর চশমায় লাগত।

জমেছে। মদন আপন মনে বলে উঠল।

নেতাদের মধ্যে একমাত্র নিত্য ঘোষই একটু আলাদা হয়ে বসে আছে। কথা বলছে না। একটার পর একটা পান মুখে দিচ্ছে। পিকদানির অভাবে একটা অ্যাশট্রেতে পিক ফেলছিল এতক্ষণ। সেই অ্যাশট্রেটাও ভরে এল প্রায়।

মদন শূন্য ফুলদানি দুটোর একটা এগিয়ে দিয়ে বলে, নিত্যদা, এটাতে ফেলুন।

ট্রেজারার দেখতে পেয়ে হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, ওটা খাঁটি জয়পুরি জিনিস। বিশেষ অকেশনে বের করা হয়।

মদন ঠাণ্ডা গলায় বলে, কতক্ষণ থাকতে হবে তার ঠিক নেই। দেরি হলে নিত্যদার পানের পিক আপনার শতরঞ্চি ভাসাবে যে।

ট্রেজারার উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, কতক্ষণ থাকতে হবে মানে? মিটিং শেষ করে দিলেই চলে যাব।

মিটিং অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা বেরোতে পারছি না।

ওরা কি আমাদের আটকে রেখেছে?

আটকেই রেখেছে।

ঘেরাও নাকি?

অনেকটা তাই।

ট্রেজারার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, ঘেরাও করে লাভ কী? আমরা সাতদিন বসে ডিসিশনে আসতে পারব না।

এই সময়ে সারা ঘরের হুলস্থুল হঠাৎ একটু মিইয়ে গেল। কয়েকটা ছেলে বেশ সুসংগঠিত ভাবে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে। তাদের হাতে কয়েকটা কাগজ, মুখ চোখ সিরিয়াস!

সবার আগে যে ছেলেটি, তার চেহারা খুবই চোখা চালাক, সপ্রতিভ। সে কাছে এসে নেতাদের দিকে চেয়ে নরম গলায় বলে, আপনারা যাঁরা আমাদের পক্ষে নন তাঁরা দয়া করে দল থেকে পদত্যাগ করুন। যাঁরা পদত্যাগ করবেন তাঁদের আমরা আটকাতে চাই না। যাঁরা দলে থেকেও আলাদা ফ্যাকশন করতে চান আমরা তাঁদের কনফ্রনট করব। আমাদের কাছে টাইপ করা পদত্যাগপত্র আছে। কার চাই বলুন!

কেউ কিছু বলতে চায় না। ভাবছে। দিল্লিতে দলে ভাঙন দেখা দিয়েছে, সুতরাং এখানেও ভাঙবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ডামাডোলে কেউ আগে নিজের রং চেনাতে চায় না। অবশ্য নিজের রং যে কী তাও অনেকে বুঝতে পারছে না!

মদন হাত বাড়িয়ে বলল, আমাকে দাও একখানা।

আপনি পদত্যাগ করবেন মদনদা? ছেলেটা যেন ঠিক বিশ্বাস করছে না।

করব। কারণ আমার দারুণ খিদে পেয়েছে। দাও। বলে ছোকরার হাত থেকে কাগজ নিয়ে মদন তলায় সই করে ফেরত দিল। দেখাদেখি ট্রেজারার, প্রেসিডেন্ট, গেঁয়ো এম এল এ এবং আরও কয়েকজন হাত বাড়াল।

পাশের দরজা দিয়ে টুক করে বেরিয়ে পড়ে মদন। পদত্যাগ করেছে বলেই বোধহয় কেউ আটকায় না। পিছন দিকে একটা সরু গলি আছে, সেইটে খুঁজতে একটু সময় লাগে। তারপর বড় রাস্তা।

চারদিকে মরা আলোর ভারী নরম একটা বিকেল। খোলা হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস টানে মদন। বাইরে এসে সে এমনই মোহিত হয়ে পড়ে যে, লক্ষই করে না পার্টি অফিস থেকে একশো দেড়শো গজ দূরে একটা জিপ গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো কালো ষণ্ডামার্কা টেকো একটা লোক ক্রূর চোখে তাকে দেখছে। হালদারের যে গাড়িতে সে এসেছে তা পার্টি অফিসের উল্টোদিকে ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড় করানো। কিন্তু মদন গাড়িটার কাছে যাওয়ার কোনও চেষ্টাই করে না। পার্টি অফিসের সামনে এখন অগুন্তি লোক। ওদিকে গেলেই ঘিরে ফেলবে। মদন কালীঘাটের ট্রাম ধরতে এসপ্লানেডের দিকে হাঁটতে থাকে।

ফুটপাথে থিকথিক করছে হকার, বে-আইনি দোকানপাট, ফুটপাথের বাসিন্দাদের সংসার। ট্যানা-পড়া এক মেয়েছেলে কাঠের জ্বালে তরকারির খোসা দিয়ে রান্না চাপিয়েছে। গন্ধে গা গুলোয়। বাস মোটর গাড়ির চলন্ত চাকা থেকে দু তিন হাত দূরেই হামা টানছে তার কোলের বাচ্চা।

রিজাইন করেছেন শুনলাম! একদম কানের কাছে মুখ এনে প্রেমিকার মতো মোলায়েম করে কে যেন জিজ্ঞেস করে।

মদন চোখের কোনা দিয়ে শচীনকে একটু মেপে নিয়ে বলল, ওই একরকম বলতে পারো।

তা হলে আপনারাই নতুন দল করবেন?

ঠিক নেই।

শচী শেয়ালের মতো হাসল, কথা দিচ্ছি দাদা, কাল আপনার স্টেটমেন্ট আমাদের কাগজের ফ্রন্ট পেজে বেরোবে।

তোমাদের ফ্রন্ট পেজ কটা?

কী যে বলেন? শচী মাথা চুলকে হাসল, ফ্রন্ট পেজ একটাই, এবার আপনাকে আমরা বড় কভারেজ দেবই।

একটা সত্যি কথা বলবে শচী?

কী, বলুন দাদা!

তোমরা কার দলে?

আমাদের আবার দল কী?

মদন শান্ত স্বরেই বলে, কালকের কাগজে তোমরা আমার স্টেটমেন্ট ছাপবে ঠিকই, কিন্তু মাথার ওপর নিত্য ঘোষের বিবৃতি বসাবে। এ সবই আমি জানি। এখন নিত্য ঘোষের পালেই হাওয়া। তোমাদের দোষ নেই।

শচী এ নিয়ে কচলাল না। বলল, আপনাদের নতুন দলের কী নাম হবে ভেবেছেন ?

একটা কিছু হবে। অল ইন্ডিয়া বেসিসেই হবে। আমরা ডিসিশন নেওয়ার কে ?

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আপনি তো পার্টির অল ইন্ডিয়া লিডার। আমরা জানি হাই কমান্ডই আপনাকে হেস্তনেস্ত করতে দিল্লি থেকে এখানে পাঠিয়েছে। আমরা জানি আপনি মালদা মুর্শিদাবাদ বীরভূমের ক্যাডারদের সাপোর্ট পেয়ে গেছেন। ভিতরে ভিতরে দল ভাগ হতে শুরু হয়ে গেছে। দিল্লি থেকে আপনি নিশ্চয়ই কিছু শুনে এসেছেন।

ধর্মতলার মোড়ে অফিস ভাঙা ভিড়ে দাঁড়িয়ে মদন তার সিগারেটের প্যাকেট বের করল এবং শচীকে অফার না করেই নিজে একটা ধরাল। অভ্যাসবশে শচী হাত বাড়িয়েছিল। মাঝপথে হাতটা ফেরত নিয়ে বলল, আপনাদের ক্যাডাররাই কি মেজরিটি ?

জানি না।

শচী ভিড়ের মধ্যেই কানের কাছে মুখ এনে বলল, একটা কথা বলি দাদা। নিত্য ঘোষ যতই লাফাক, আপনি যেদিকে থাকবেন সেদিকেই পাল্লা ঝুঁকবে। আমরা আপনার দিকেই তাকিয়ে আছি।

কত কথাই যে জানো তোমরা ?

দেখে নেবেন। বলে দিলাম। বলে শচী আবার হাতটা বাড়ায়।

মদন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ওর হাতে দিয়ে দেয়। বলে, কত কায়দাই যে জানো শচী। কিন্তু এবার নিজের পয়সায় সিগারেটটা খেতে শেখো, তাতে খানিকটা সেলফ রেসপেকট আসবে।

কথাটা গায়ে না মেখে শচী বলে, আপনি যে ফোরফ্রন্টে চলে এসেছেন তা সবাই টের পাচ্ছে। নইলে আপনি আসার পর এই গণ্ডগোলটা হল কেন ? নিত্য ঘোষ যেটা করছে সেটা পাওয়ার পলিটিকস। কিন্তু আলটিমেটলি—

কার্জন পার্কের ট্রাম গুমটি ছাড়িয়ে, রাজভবনের গাছপালার ডগার ওপর দিয়ে, রঞ্জি স্টেডিয়ামের পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এসপ্লানেড ইস্টে আজও নিত্যকার মতো কারা ধরনা দিয়ে বসে আছে, সামনে পুলিশ ব্যারিকেড। একটা ফেরেব্বাজ কলমওয়ালা চোরাই কলম বেচার ভাবভঙ্গি করে কানের কাছে এসে বলে গেল; চাইনি-ই-জ।

মদন ভুলে গেল যে, সে এম পি বা পলিটিকসওয়ালা। হঠাৎ বলল, ফুচকা খাবে শচী ? ওই লেনিন স্ট্যাচুর নীচে একটা ফুচকাওয়ালাকে দেখা যাচ্ছে। চলো।

বলতে বলতেই শচীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে রাস্তা পেরোয় মদন।

একজন ভি আই পি হয়ে কী যে করেন মদনদা। হাত ছাড়িয়ে শচী হাসল, আর একটু হলে নীল রঙের অ্যামবাসাডারটার মুখে পড়ে যেতাম দুজনে।

পলিটিসিয়ান আর রিপোর্টাররা কখনও টাইমলি মরে না হে শচী। মরলে দেশটা সোনার দেশ হত। ওহে ফুচকাওলা, শুরু করো, শুরু করো। জলদি।

॥ ১৩ ॥

দক্ষিণগামী বাসের দোতলায় এক ছোকরা হঠাৎ বলে উঠল, এই যে দাদারা। এত তাড়াতাড়ি সব বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন ? শুনেছেন কি, কাল রাতে লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে ? বধূ শুয়ে ছিল পাশে, শিশুটিও ছিল, তবু মরিবার হল তার সাধ। অথচ দেখুন কবি গেয়ে গেছেন, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। আজ নিজের জীবনের একটা গল্প বলব বলে আপনাদের কাছে এসেছি। গল্প নয়, ঘটনা, বুঝলেন দাদা, বেঁচে থাকার কোনও পথ না পেয়ে আমরা দুই ভাই ব্যবসা করতে

গিয়েছিলাম। বাঙালি ব্যবসা করতে জানে না এই বদনাম ঘোচাতে দাদা, শ্যামবাজারের মোড়ে আমি আর আমার দাদা একটা দোকান ঘর ভাড়া নিতে গেলাম। পেয়েও গেলাম একটা। কিন্তু দাদা, বাড়িওলা পঞ্চাশ হাজার টাকা সেলামি চায়। সেই শুনে আমরা পালিয়ে আসি। কিন্তু বাঁচতে তো হবে! মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। তাই দাদা বাঁচার শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা দুই ভাই অল্প পুঁজি নিয়ে একটা ব্যবসা শুরু করলাম। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই করতে গিয়ে আমরা তৈরি করেছি একটি ধূপকাঠি। এই বাসে আমাকে প্রায়ই দেখতে পান আপনারা। রেগুলার অনেকেই এই ধূপ ব্যবহার করেছেন। যাঁরা করেছেন তাঁদের কাছে নতুন করে বলার কিছু নেই। যাঁরা জানেন না তাঁরা জেনে রাখুন, একটি স্টিক জ্বলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট, কাঠি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এক ঘণ্টা ঘরে তার গন্ধ ছড়িয়ে থাকে। আমার হাতে যে স্টিক জ্বলছে সেই একই স্টিক সব প্যাকেটে পাবেন। দোকানে বাজারে কিনতে যান, একটি প্যাকেটের দাম পড়বে পঁয়ত্রিশ পয়সা। কিন্তু বাসে কনশেসন রেটে এক প্যাকেট চার আনা, দু প্যাকেট আট আনা, চার প্যাকেট এক টাকা। এক টাকা! এক টাকা! এক টাকা।...

মদনের নাকের ডগায় চারটে প্যাকেট ধরে বার কয়েক নাড়ে ছোকরা ; এক টাকা! এক টাকা!

মদন অলস চোখে চেয়ে বলে, গল্পটা পাল্টাও। এ পর্যন্ত দশজনের মুখে শুনেছি একই গল্প।

ছোকরা প্যাকেটগুলো ঝট করে টেনে নিয়ে পরের সিটের এক যাত্রীর নাকের ডগায় ধরল, এক টাকা! এক টাকা!

মদনের পাশের লোকটা খিক খিক করে হেসে বলল, বেশ বলেছেন! এর পর লজেনসওয়ালা উঠেও একই গল্প ঝাড়বে। শুধু কি তাই। গুপিযন্ত্র নিয়ে এক বাচ্চা ছোকরা উঠে ধরবে, তোমার সঙ্গে দেখা হবে বাবুর বাগানে। রোজ ওই 'বাবুর বাগানে' কাঁহাতক শোনা যায় বলুন দেখি! কিছু বলাও যায় না, দেশে বেকার সমস্যা। ভাবি, দুটো করে খাচ্ছে খাক। নেতারা তো আর এদের জন্য কিছু করবে না...

তা ঠিক, তা ঠিক। মদন তাড়াতাড়ি বলল এবং পলিটিকস এড়াতে দু স্টপেজ আগে নেমে পড়ল। হাজরার কাছাকাছি একটা ওষুধের দোকান থেকে ফোন করল মাধবকে, একটু দেরি হবে রে!

সে বুঝতেই পারছি।

তুই একা একা স্কচ চালাচ্ছিস নাকি?

না মাইরি। একটা হেঁচকি তুলে মাধব বলে, ঝিনুক কেটে পড়েছে, জানিস!

চিরতরে নাকি?

বোঝা যাচ্ছে না। একেবারে আনপ্রেডিকটেবল মহিলা। সঙ্গে বৈশম্পায়ন।

বলিস কী?

দে আর হেড অ্যান্ড ইয়ারস ইন লাভ।

দুস শালা! তুই খাচ্ছিস।

একটুখানি। এই মোটে খুললাম।

কত নম্বর বোতল?

এক নম্বর মাইরি বিশ্বাস কর।

তোকে বিশ্বাসের কী? গিয়ে যদি দেখি সব ফাঁক করেছ তা হলে—

আরে না না। অনেক আছে। চলে আয়।

অনেক নেই রে মাধব, অনেক নেই। তুই অন্তত হাফ পাঁইট সাফ করেছিস।

অতটা হবে না। কী জানিস, ঝিনুকটা তো আজ পালিয়ে গেল, দুঃখে দুঃখে খানিকটা খেয়ে ফেললাম।

পালিয়ে গেছে আর ইউ শিওর?

তা ছাড়া আর কী হবে? সঙ্গে বৈশম্পায়ন। দুইয়ে দুইয়ে চার।

তা হলে দুঃখের কী? সেলিব্রেট কর।

তাই করছি আসলে। দুঃখ প্লাস সেলিব্রেশন। তবে বড় একা লাগছে। চলে আয়। আর কত দেরি করবি ?

স্নান করে জামা কাপড় পাল্টেই আসছি।

॥ ১৪ ॥

গড়িয়াহাটে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দুজনে সূর্যাস্ত দেখল।

আপনার কোনও ডাকনাম নেই ? ঝিনুক আস্তে করে জিজ্ঞেস করে।

বৈশম্পায়ন ফিসফিস করে বলে, আছে। মন্টু।

আমার এক ভাইয়ের নামও মন্টু। ভারী মিষ্টি নাম।

আপনার ভাল লাগলেই ভাল।

কিন্তু আপনি ভারী অদ্ভুত। ওর কোনও বন্ধুই আমাকে আপনি করে বলে না। শুধু আপনি বলেন। কেন বলুন তো!

বৈশম্পায়ন একটু লাল হয়ে বলে, এমনি।

না। আমার ওসব আপনি আজ্ঞে ভাল লাগে না। বলুন তুমি! বলুন শিগগির।

তু-তুমি।

শুধু তুমি বললেই হবে না। পুরো একটা বাক্য বলুন।

বলব ?

বলতেই তো বলছি।

ঝিনুক! তুমি কী সুন্দর!

বাঃ, বেশ বলেছেন! ঝিনুক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর আবেগ ভরা গলায় বলে, কতকাল আমাকে কেউ সুন্দর কথা বলেনি। আমি যে সুন্দর সে কথা মনে করিয়ে দেয়নি।

মাধব ? মাধবও নয় ?

মাধব! মাধব আমাকে একটুও ভালবাসে না। বউকে ভালবাসলে কেউ মদ খায় বলুন!

যুক্তিটা ঠিক বুঝতে পারে না বৈশম্পায়ন, তবে এ নিয়ে আর কথা বাড়াতেও সে আগ্রহ বোধ করে না। তার মুখ গরম, চোখ জ্বালা করছে, গা ঘামছে। অদ্ভুত এক ভালবাসাই এ সব ঘটাচ্ছে। সে ঢোঁক গিলে বলল, ঝিনুক, আমাদের তো খুব বেশি সময় নেই। একটা কথা বলে নেব ?

ঝিনুক খুব অবাক হয়ে ফিরে তাকায় বৈশম্পায়নের দিকে, সময় নেই! কীসের সময় নেই বলুন তো!

আয়ুর সময় যে কেটে যাচ্ছে ঝিনুক। যৌবন যায়, বয়স যায়, লগ্ন যায়।

আপনি যে কী সুন্দর কথা বলেন! আমিও ঠিক এসব কথাই ভাবি। আমরা বোধহয় খুব বেশিদিন বাঁচব না, না ? আমার তো এমনিতেই মাঝে মাঝে খুব মরে যেতে ইচ্ছে করে।

কেন ঝিনুক ?

কেবল মনে হয়, একদিন খুব বন্যা হয়ে আমরা সবাই ডুবে যাব। কিংবা কেউ আকাশ থেকে অ্যাটম বোমা ফেলবে। না হয় তো ওই যে কী একটা রোগ হচ্ছে বাঁকুড়ায়, এনকেফেলাইটিস না কী যেন, সেই রোগটা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়বে আর আমরা সবাই মাথায় রক্ত উঠে মরে যাব। এত ভয় নিয়ে বাঁচা যায়, বলুন তো! তার ওপর গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যেতে পারে, ভূমিকম্প হতে পারে, গুণ্ডা বদমাশ ডাকাত এসে ঘরে ঢুকে খুন করে যেতে পারে, বলুন!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৈশম্পায়ন বলে, তা ঠিক। তবে ওসব কিছু না হলেও এমনিতেই আমরা আস্তে আস্তে বয়স্ক বুড়ো হয়ে যাব ঝিনুক।

আপনার বয়স কত ?

বত্রিশ তেত্রিশ।

যা গম্ভীর হয়ে থাকেন, আপনাকে আরও বেশি দেখায়।

আমি আর মাধব এক বয়সী।

জানি জানি। আপনাকে আমি মোটেই বুড়ো বলিনি।

কিন্তু বুড়ো তো একদিন হব ঝিনুক। তুমি হবে, আমি হব, মাধব হবে। সময় বয়ে যাচ্ছে, টের পাচ্ছ না ?

আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি, বয়স নিয়ে আর ভয় দেখাতে হবে না।

তুমি কি ভয় পাও ঝিনুক !

বুড়ো হতে, মরতে কে না ভয় পায় বলুন ! কিন্তু কী একটা কথা বলতে চাইছিলেন যে ! হাবিজাবি কথায় সেটা হারিয়ে যাচ্ছে।

কথাটা হারিয়ে গেলেই হয়তো ভাল ছিল ঝিনুক। বলব ?

ঝিনুক মৃদু একটু লজ্জার পরাগে মাখা মুখটি মিষ্টি করে নামায়, তারপর মৃদুস্বরে বলে, বলুন না।

কিন্তু বলবে কী করে বৈশম্পায়ন ? খুব কাছ ঘেঁষে একটা পায়জামা পরা লোক কখন এসে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে তুলতে পাছা চুলকোচ্ছে। কিছু লোকের কাণ্ডজ্ঞানের এত অভাব !

বৈশম্পায়ন একটু বিরক্তির গলায় বলে, চলো আর কয়েক পা দূরে গিয়ে দাঁড়াই।

কয়েক পা হেঁটে তারা লোকটার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই যে একটা বাধা পড়ল এতেই মুডটা একদম নষ্ট হয়ে গেল বৈশম্পায়নের। সে অনেকক্ষণ রেলিং-এ ভর রেখে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল। অনেকদিন আগে ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডার দিয়ে শেষবারের মতো দেখা, বলাই সিংহী লেনে লাহা বাড়ির দেয়ালের পটভূমিতে স্কুলের ইউনিফর্ম পরা সেই মেয়েটিকে তো আর কখনও পৃথিবীতে দেখা যাবে না। কিছুতেই ফিরবে না বয়স। কিছুতেই উজানে যাবে না তো নদী ! নদী শুধু বয়ে যেতে জানে একমুখে। তার কলধ্বনিতে শুধু মৃত্যুর গান। তার ফাঁকা শূন্য উপত্যকায় সাদা আর নিশ্চল হিম পাথরেরা পড়ে থাকে।

খুব হাওয়া দিচ্ছিল আজ। বজবজের একটা ট্রেন প্রায় নিঃশব্দে পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল।

বৈশম্পায়ন বলল, ঝিনুক ?

উঁ !

কী ভাবছ ?

কত কী ! এইমাত্র ইচ্ছে করছিল ওই ট্রেনটায় উঠে অনেক দূর চলে যাই।

কিন্তু ট্রেনটা তো বেশি দূর যাবে না। মাত্র বজবজ পর্যন্ত।

বজবজ কি সমুদ্রের কাছে ?

না। গঙ্গার কাছে।

সমুদ্রের কাছে কোনও ট্রেন যায় না ?

যাবে না কেন ! অনেক ট্রেন যায়। তুমি কি সমুদ্র দেখোনি ?

বহুবার। শুধু পুরীতেই গেছি পাঁচবার ; ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ, বোম্বে, ঘরের কাছে দীঘা—

তবু যেতে ইচ্ছে করে ?

করে। কে যে আমার নাম ঝিনুক রেখেছিল ! আমার কেবলই মনে হয় সমুদ্রের কাছে আমার অনেক ঋণ !

তোমাকে ডাকে সমুদ্র, আর আমাকে ডাকে এক নদী।

তাই নাকি ?

তবে সে এক মৃত্যুর নদী। এক নির্জন উপত্যকা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। চারদিকে সাদা পাথর। আর কী যে করুণ সেই নদীর গান !

ঝিনুক ছলছলে চোখ তুলে বলে, সত্যি ?

বৈশম্পায়ন একটু থমকাল। ঝিনুক যেভাবে চেয়ে আছে তাতে মনে হয় সে বৈশম্পায়নের নদীটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। একজন প্রাপ্তবয়স্কা পরিণত-বুদ্ধির মহিলার পক্ষে যেটা খুব স্বাভাবিক নয় !

একটু থেমে বৈশম্পায়ন বলে, দুধারে খুব উঁচু উঁচু পাহাড়। ভীষণ সাদা, শূন্য এক উপত্যকা,

সেইখানে এলোচুল বিছিয়ে নদী সারাদিন গুনগুন করে গায়। সাদা সাদা ঠাণ্ডা পাথর ছড়িয়ে পড়ে আছে চারদিকে। অদ্ভুত না ঝিনুক ? শুনলে লোকে আমাকে পাগল ভাববে।

ঝিনুক মাথা নেড়ে বলে, মোটেই না।

বৈশম্পায়ন একটু হতাশ হয়। এত সহজে আর কেউ নদীটাকে মেনে নেবে এরকম আশা সে করেনি। সে বলল, তোমার অদ্ভুত লাগছে না ?

না তো! এরকম হতেই পারে।

বৈশম্পায়ন খুবই অবাক হয়ে বলে, হতে পারে ?

নীলু যখন মারা গেল তখন কিছুদিন আমারও মৃত্যুর হাওয়া লেগেছিল। বলে একটু আনমনা হয়ে গেল ঝিনুক। একটু চুপ করে থেকে গলাটা এক পর্দা নামিয়ে বলল, জানেন তো, নীলুকে আর আমাকে নিয়ে একটা বিচ্ছিরি কথা রটেছিল।

বৈশম্পায়ন একটু চমকে উঠে বলে, তাই নাকি ?

খুব বিচ্ছিরি। যতদূর নোংরা হতে হয়। সেটা রটিয়েছিল আমার এক দূর সম্পর্কের ননদ।

কী রটিয়েছিল ঝিনুক ?

ঝিনুক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, একজন ছেলের সঙ্গে একজন মেয়েকে জড়িয়ে যা রটানো যায়। অবশ্য নীলুর সঙ্গে আমার খুব বনত। বিয়ের পর নতুন নতুন শ্বশুরবাড়িতে কাউকেই তেমন ভাল লাগত না। একমাত্র নীলু, কী নরম, কী ভদ্র, কী বুদ্ধি! বেঁচে থাকলে নীলু সবাইকে ছাড়িয়ে যেত। এক এক সময়ে তো আমার মনে হত, নীলু একদিন দেশের প্রধানমন্ত্রীও হবে।

বৈশম্পায়ন মাথা নাড়ল, নীলু ছিল একসেপশনাল, আমি জানি।

তা হলেই বলুন! নীলুকে ভাল না বেসে পারা যায় ? কিন্তু ভালবাসা মানেই কি খারাপ কিছু ? আমি নীলুর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গেছি, ছবির একজিবিশন দেখেছি, সারা রাত ক্লাসিকাল গানের আসরে গান শুনেছি, এতে কি দোষ ? অথচ—এতদিন বাদেও অভিমানে একবার ঠোঁট দুটো ফুলে উঠল ঝিনুকের। একটু সামলে নিয়ে সে বলল, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকগুলো ভীষণ অদ্ভুত। আমাকে একদম সহ্য করতে পারত না, আমি সুন্দর বলে। আর নীলুকেও সহ্য করতে পারত না। কেন জানেন ? নীলু ভীষণ ব্রাইট বলে। ওদের ধারণা ছিল নীলু সম্পর্কে সবাই নাকি বাড়িয়ে বলে।

মাধব নীলুকে খুব ভালবাসত। বৈশম্পায়ন বলে।

বাসত কি না কে বলবে! আসলে নীলুর যেটুকু সম্পর্ক ছিল বাড়ির সঙ্গে তা আমার জন্যেই। নইলে নীলুর তখন অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা। ও আমাকে প্রায়ই বলত, পায়ে হেঁটে সারা ভারতবর্ষের গ্রামে গঞ্জে শহরে ঘুরে বেড়াবে। বলত, দেশের প্রবলেমগুলো ধরতে হবে বউদি, অনেক মানুষের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হবে, এই বুকের মধ্যে সব মানুষকে আমার টেনে নিতে ইচ্ছে করে।

বৈশম্পায়ন চুপ করে থাকে। প্রসঙ্গটা অস্বস্তিকর।

ঝিনুক রেলিং-এ আর একটু ঝুঁকে বলে, আমার শ্বশুরবাড়ির কাছেই নীলু খুন হল সন্ধেবেলায়। উঃ, সে কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! তরতাজা, ছটফটে, ভীষণরকমের জ্যান্ত নীলু মরে গেছে, ভাবা যায়! তিনদিন আমি একদম বোবা হয়ে ছিলাম। কথা বলতে গেলে মুখ দিয়ে কেবল বুবু শব্দ বেরোত। তারপর থেকেই একটা মৃত্যুর হাওয়া এল। ঘরে বসে থাকতাম, মনে হত বাইরে হঠাৎ একটা হাওয়া ছেড়েছে। আর সেই হাওয়া কী যেন বলতে চাইছে আমাকে। দৌড়ে যেতাম বাইরে। ছাদে বসে আছি, হঠাৎ মনে হল আমার চারদিকে যেন বাতাসটা ভারী হয়ে ঘুরছে, কিছু একটা ইঙ্গিত করছে। এক এক সময়ে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত, মনে হত, একটা হাওয়া এসে আমার দরজায় জানালায় ধাক্কা দিচ্ছে, ডাকছে, বউদি! বউদি!

এ কি ভৌতিক কিছু ঝিনুক ?

না, না, একদম তা নয়। আসলে আপনার ওই নদীর মতোই এও এক মৃত্যুর হাওয়া। বেঁচে থাকতে আর মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে অত ভালবাসত নীলু, অথচ সে-ই তো মরে গেল! তাই বোধহয় ওই হাওয়াটা এসে আমাকে বলতে চাইত, তোমরা কেন বেঁচে আছ ? তোমাদের বেঁচে

থাকার কী অধিকার ? যে পৃথিবীতে নীলু থাকতে পারল না, সেই পৃথিবীতে তোমরাই বা থাকবে কেন ? জানেন, সেই সময়ে আমার বেশ কয়েকবার সুইসাইড করতে ইচ্ছে হয়েছে।

বৈশম্পায়ন আস্তে জিজ্ঞেস করল, নীলু সম্পর্কে তুমি কি সবটুকু জানো ঝিনুক ?

ঝিনুক স্থির হয়ে সামনের নির্মীয়মাণ একটি ফ্ল্যাটবাড়ির কাঠামোর মধ্যে ঘনীভূত অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল, নীলুর সবটুকু কে-ই বা জানে ! তবে ও মরে যাওয়ার পর আমার যখন ওরকম মানসিক অবস্থা, তখন একদিন খুব বিরক্ত হয়ে মাধব বলেছিল, নীলু ওর ভাই নয়।

বৈশম্পায়ন একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল। ঝিনুক জানে।

ঝিনুক মাথা নুইয়ে বলে, জানলাম নীলু ওদের বাড়িতে সেই ছোট্টবেলায় এসেছিল। চাকরের কাজ করত। বাপের পদবি জানা ছিল না বলে মাধবদের পদবি নেয়। একটু বড় হওয়ার পর যখন দেখা গেল যে, সে অত্যন্ত মেধাবী আর বুদ্ধিমান তখন মাধবদের বাড়ির লোকেরা ওকে বাড়ির ছেলে হিসেবে পরিচয় দিত। পরে সে বাড়ির ছেলেই হয়ে ওঠে। মাধব আজও নীলুকে ভাই বলে মানে। এসব জানি মণ্টু।

॥ ১৫ ॥

দিদির বাসার সামনে ফুটপাথে গৌরী দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ, টিনের স্যুটকেসটা পাশে নামানো।

মদনকে দেখে দু পা এগিয়ে এসে ম্লান একটু হেসে বলল, দু ঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

ভিতরে গিয়েই তো বসতে পারতে।

ভিতরে অনেক লোক। জায়গা নেই। আমি আজই দিল্লি রওনা হচ্ছি।

গৌরীর আজ দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু মদন সে কথা জিজ্ঞেস করল না। গৌরী কেন পালাচ্ছে তা সে খানিকটা জানে। শুধু বলল, একা পারবে ?

পারব। গরিবরা সব পারে।

গিয়ে কোথায় উঠবে?

আমার এক দূর সম্পর্কের দিদি থাকে কলকাজীর কাছে। সেখানে উঠব।

বাচ্চারা ?

নিচ্ছি না। দিদির বাসায় কীরকম রিসেপশন পাব জানি না তো ! বাচ্চারা সঙ্গে থাকলে অসুবিধে।

মা ছাড়া ওদের অসুবিধে হবে না ?

ওরা মাকে থোড়াই কেয়ার করে।

তোমার কষ্ট হবে না ?

গৌরী একটু হাসল, মানুষ তো ! একটু হবে ! তবে সেটা সহ্য করা যাবে। ওসব সেন্টিমেন্ট নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমি এখন পালাতে চাই। পরে সুযোগ-সুবিধে বুঝে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে যাব।

চারদিকে আজকাল খুব বউ পালাচ্ছে। খুব দুশ্চিন্তার কথা। মদন ফিচেল হাসি হেসে বলে, আর নবর জন্য মন কেমন করবে না ? নব যদি বাড়ি ফিরে দেখে, তুমি নেই, তা হলে ?

গৌরী কেমন বিবশ হয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, কার জন্য এতকাল মন কেমন করেছে তা কি এম পি সাহেব জানেন ?

না। কার জন্য গৌরী ?

দিল্লিতে গিয়ে বলব।

নবর কাছে আর কখনও ফিরে আসবে না গৌরী ?

নব আমার কে ? ওর কাছে ফিরে আসব কেন ?

নব যদি ভাবে তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে গেছ ?

আমি কার সঙ্গে পালালাম তাতে ওর বড় বয়েই গেল।

তা ঠিক। তবে প্রেস্টিজের ব্যাপারও তো আছে। বউ পালালে কোন পুরুষ খুশি হয় ?

আমি তো চাকরি করতে যাচ্ছি। পালাচ্ছি কে বলল ?

তুমিই তো এইমাত্র বললে!

সে আপনার কাছে সত্যি কথাটা বললাম, ওর বাড়ির লোক অন্যরকম জানে।

মদন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে গেল।

গৌরী উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, কিচ্ছু জটিল হয়নি মদনদা। এটাই সবচেয়ে ভাল হয়েছে। আপনি চলে আসার পর আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম।

মদন ফিচিক করে হেসে বলে, বুড়ি তোমাকে খুব ধোঁয়াচ্ছিল।

আপনিই তো দুষ্টুমি করে লাগিয়ে দিয়ে এলেন। তবে ওসব শুনতে শুনতে আমার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ হঠাৎ সব অন্যরকম হয়ে গেল। পাষাণী অহল্যাকে জাগাতে রামচন্দ্র এলেন। আজ আপনি যেই গেলেন অমনি ভিতরে সব ঘুমন্ত বোধ জেগে উঠল। দুঃখ, অপমান, হতাশা, সেই সঙ্গে ভালভাবে বাঁচার ইচ্ছে। অন্ধকারে থেকে থেকে আলোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ আলো দেখে বুঝতে পারলাম, কী অন্ধকারেই না পড়ে আছি।

আমি কি তোমার আলো গৌরী ? আবার রামচন্দ্রও ?

গৌরী এই প্রকাশ্য ফুটপাথে, চারদিকে চলন্ত লোকজনের ভিড়েও কেমন বিহ্বল হয়ে গেল। আবেগে ঠোঁট কাঁপল, গলা রুদ্ধ হয়ে গেল। কোনওক্রমে বলল, আলো! আপনি ছাড়া আমার জীবনে আর কোনও আলো নেই।

এ কথায় খুব হোঃ হোঃ করে হাসতে ইচ্ছে করছিল মদনের। বদলে সে আচমকা গম্ভীর হয়ে গেল। মৃদুস্বরে বলল, তোমার জীবনে আর একটা আলো ছিল গৌরী। আমি জানি।

গৌরীর স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখ থেকে স্বপ্নের ক্রিমটুকু কে মুছে নিল। একটা ঢোঁক গিলল সে। মাটির দিকে চেয়ে বলল, আপনি কখনও অতীতকে ভোলেন না কেন এম পি সাহেব ?

মদন তেতো একটু হেসে বলে, ভুলতে পারি না গৌরী। আমার যে কেন সব মনে থাকে! আর তার জন্যই মাঝে মাঝে কষ্ট পাই।

গৌরী যখন মুখ তুলল তখন তার চোখ ছলছল করছে। একটু ধরা গলায় বলল, আপনি কি এখনও নীলুকে হিংসে করেন ? আমার জন্য ?

মদন গম্ভীর গলায় বলে, নীলুকে হিংসে করব কেন গৌরী ? নীলুর এমন কী ছিল যাকে হিংসে করা যায় ?

গৌরী মাথা নেড়ে বলল, আমিও তো তাই ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। নীলু কোনওদিন আমাকে ফিরেও দেখেনি। নীলুকে কেন আপনি হিংসে করবেন ?

মদন মাথা নেড়ে বলে, নীলুকে হিংসে করি না গৌরী, শুধু জীবনের সত্য দিকগুলির দিকে তোমার চোখ ফিরিয়ে দিতে চাই। তোমার জীবনের আলো ছিল নীলু। বিয়ে করার জন্য তাকে তুমি অনেক জ্বালিয়েছ। বিষ খাবে বলে ভয় দেখিয়েছ। নীলুর ওপর শোধ নিতেই কি তুমি নবর সঙ্গে ঝুলেছিলে ? নীলু অন্তত তাই বলত।

ওসব কথা থাক মদনদা। আজ থাক। নীলু তো বেঁচে নেই।

মদন একটু হাসল, আস্তে করে বলল, কিংবা হয়তো খুব বেশি বেঁচে আছে!

নীলুর জন্য আমাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে মদনদা, সে আমার আলো হবে কেন ?

মদন চুপ করে রইল। মুখটা গম্ভীর।

গৌরী হঠাৎ নিচু হয়ে তাকে একটা প্রণাম করে বলল, আমার গাড়ির সময় হয়ে গেছে। আমি আসি।

টিনের স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে গৌরী নিরাশ্রয় অসহায়ের মতো যখন রাস্তাটা পেরিয়ে গেল তখন মদনের ভারী কষ্ট হল গৌরীর জন্য।

এতক্ষণ এম পি ছিল না মদন, দিদির বাসার বাইরের ঘরে পা দিয়েই হল। কণা নামে একজন মহিলা বসে আছেন। স্বামী দুশ্চরিত্র। ঘ্যানর ঘ্যানর অনেক কথা শুনে যেতে হল তাকে। আশ্বাস দিল দিল্লি গিয়েই ব্যবস্থা করবে।

সারাক্ষণ ভারী ক্লান্ত লাগছে তার। স্কচের বোতল খুলে বসে আছে মাধব। গিয়ে এক্ষুনি ডুব দিতে হবে। সব ভুলে যেতে হবে, ভাসিয়ে দিতে হবে। সে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। তারপর জামা কাপড় পাল্টে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরল একটা।

সহদেব বিশ্বাস তার ওকালতির চেম্বারে চেয়ারে হাঁটু তুলে বসা, মাথায় টাক, মুখে ক্ষুরধার বিষয়বুদ্ধি। খুব পসারের সময়েই ওকালতি ছেড়ে দিয়েছে। এখন কালেভদ্রে উপরোধে বা পার্টির দরকারে কেস করে। তার চেয়ারের দুধারে কেঁদো বাঘের মতো দুই রুস্তম বসে আছে। তাদের গায়ের টি শার্ট ছিঁড়ে শরীরের মাসল ঠিকরে বেরোচ্ছে, মুগুরের মতো হাত, খোলা জামা দিয়ে বুকের ঘন লোম দেখা যাচ্ছে। দুজনেরই চোখ নবর দিকে স্থির। দুজনকেই চেনে নব। বেলেঘাটার বিখ্যাত মস্তান যমজ দুই ভাই কেলো আব বিশে। দিনকাল পাল্টে গেছে, এখন মস্তানরা লিডারদের দেখে, লিডাবরা দেখে মস্তানদের। কিন্তু ফালতু ব্যাপারে নবর মনোযোগ দেওয়ার সময় নেই। তিন জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে সে সহদেব বিশ্বাসের কাছে আসতে পেরেছে।

সহদেব মৃদু স্বরে কথা বলছিল। শোকতাপা মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো গলায়। নব অবশ্য সান্ত্বনা পাচ্ছে না। সহদেব বলল, এ সময়ে পলিটিক্যাল শেলটার দেওয়ার অনেক ঝুঁকি আছে হে নব। আজই পার্টির মিটিং-এ বিরাট ব্যাপার হয়ে গেছে। আজ হোক, কাল হোক, দল ভাঙছে। স্টেট সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, আরও অনেক লিডার রেজিগনেশন দিয়েছে। এখন আমরা রিস্ক নিতে চাই না।

রিস্ক কীসের ?

তুমি কনডেমনড খুনি। শেলটার দিলে হাজার রকমের প্রশ্ন উঠবে।

কিন্তু পুলিশ তা হলে আমাকে পালাতে দিল কেন ?

সহদেব বিচক্ষণ একটু হেসে বলে, কথাটা দুবার বললে, ওটা তোমার ভুল ধারণা। পুলিশ তোমাকে পালাতে দেয়নি। কোনও কারণে গার্ডরা অন্যমনস্ক ছিল। তুমি সেই সুযোগটাকেই মনে করছ গটআপ ব্যাপার।

নব কথা না বাড়িয়ে অধৈর্যভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, ঠিক আছে। কিন্তু এখন আমি কী করব ?

গা ঢাকা দিয়ে থাকো যদি পারো।

কত দিন ?

যতদিন না ভাঙচুরটা ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে।

নিত্যদার কাছে গেলে কিছু হবে ?

নিত্যদা খুব ব্যস্ত। আজ রাতেই বোধহয় উনি পার্টির সেক্রেটারি হচ্ছেন। মিটিং চলছে। তোমাকে সময় দিতে পারবেন না।

আমার সঙ্গে পার্টির যে লোক দেখা করেছিল জেলখানায় যে বলেছিল—

সহদেব সহজে ধৈর্য হারায় না। এখনও হারাল না, মৃদু হাসি হেসে বলে, সে কেন দেখা করেছে তা সে-ই জানে। দল থেকে তাকে পাঠানো হয়নি।

নব টেবিলে ভর রেখে ঠাণ্ডা গলায় বলে, আপনি তো জানেন পলিটিক্যাল শেলটার না পেলে পুলিশ আমাকে কুকুরের মতো খুঁজে বের করবেই। এ বাজারে পলিটিক্যাল পার্টি ছাড়া কেউ আমাকে কোনও প্রোটেকশন দিতে পারবে না। আপনি এও তো জানেন সহদেবদা, আমি মাগনা প্রোটেকশন চাইছি না। কোনও শালা কখনও আমার জন্য মাগনা কিছু করেওনি। প্রোটেকশন দিলে কাজ করে দেব, দরকার হলে লাইফের রিস্ক নিয়েই।

কেলো আর বিশে তাকাতাকি করে নেয়। তারপর আবার নবর দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকে।

সহদেব হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলে, সবই জানি। কিন্তু শেলটার বা প্রোটেকশন কোনওটাই

দেওয়া এখন সহজ নয়। আমাদের সময়টা খারাপ যাচ্ছে।

নব ধৈর্য হারাচ্ছিল। সে বেশিক্ষণ গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। বেশি কথা বলার দমও তার নেই। একটু গরম হয়ে বলে, নীলু হাজরার কেসটায় আমাকে ফাঁসানো হয়েছিল, আপনি জানেন ? নীলুকে আমি মারিনি।

কেলো আর বিশে আর একবার তাকাতাকি করে, চোখের কোণ দিয়ে সেটা লক্ষ করে নব।

সহদেব নির্বিকারভাবে জিজ্ঞেস করে, কে তোমাকে ফাঁসিয়েছিল ?

নাম বলে লাভ কী ? আপনারা তো জানেন।

সহদেব বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে, তাতেও আমাদের কিছু করার নেই।

নব একটু হেসে বলে, করার অনেক আছে, কিন্তু আপনারা করবেন না। ঠিক আছে, আমি আমার রাস্তা করে নেব।

বলে নব ওঠে। সহদেব নিজের হাতের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরা জয় তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে ক্লান্তি, চোখে ভয়। ইচ্ছে করলে সে নবর হাত এড়িয়ে এতক্ষণে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে এও জানে, পালিয়ে কোনও লাভ নেই। নব তাকে খুঁজে বের করবেই।

জয় বলল, কিছু হল ?

নব রক্তঝরা চোখে চেয়ে বলল, খানকির ছেলেরা ফোঁটা কেটে বোষ্টম সাজছে।

তোমার সঙ্গে জেলখানায় যে দেখা করেছিল তাকে তুমি ঠিক চেনো ?

আলবত। শালা কোথায় যে গায়েব হয়ে গেল !

দুজনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতেই পেছন থেকে কেলো বেরিয়ে এসে সোডার বোতল খোলার মতো শিসটানা গলায় ডাকল, নব।

নব ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো ঘুরে দাঁড়ায়।

কেলো পাহাড়ের মতো দরজায় দাঁড়ানো। কোমরে হাত, এরকম বিশাল চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, শোন।

নব সতর্কভাবে কাছে এগিয়ে যায়, কী বলছ ?

কথা আছে। বলে নবর একটা হাত শক্ত করে ধরে ভিতরে নিয়ে যায়।

ঘরে এখন সহদেব নেই। শুধু কেলো আর বিশে। বিশের হাতে খোলা ছ'ঘরা রিভলবার।

কেলো রুমাল দিয়ে টাকের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, একটা কাজ আছে। কিন্তু এর মধ্যে পার্টি নেই।

প্যাঁচ মেরো না। কেস করতে হবে তো ? বলো। কিন্তু তার আগে বলো, শেলটার দেবে কি না।

কেসটা কর। দেখা যাবে।

তোমাদের কথায় হবে না। আমাকে কোনও লিডারের সঙ্গে লাইন করে দাও।

লিডাররা এর মধ্যে নেই।

সহদেবদা নিজের মুখে বলুক তা হলে।

সহদেবদা বলবে না। আমরাই বলছি। রাজি থাকলে বল, না হয় তো কেটে পড়।

নব করাল চোখে দুই যমজ ভাইকে দেখে নিল। আপাতত তার কিছু করার নেই। তারা উভয়পক্ষই যে দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায় তাতে কেউ কাউকে ফালতু ভয় খেয়ে সময় বা শরীর নষ্ট করে না। কাটে কাটে পড়ে গেলে কে কার লাশ নামাবে তার কোনও ঠিক নেই। তবে নব একটু টাইট জায়গায় আছে বটে। সে বলল, ফালতু বাত ছাড়ো কেলোদা, কেস আমি করে দেব, সে তোমরা জানো। কিন্তু তারপর কী ?

কেলো নির্বিকারভাবে বলে, কেস হয়ে গেলে বাড়িতে গিয়ে বসে থাকবি।

বাড়িতে লালবাজারের খোঁচড়েরা নেই ?

অন্য জায়গায় তোর ঠেক আছে ?

আছে।

তা হলে সেইখানেই চলে যা। পরশু পার্টি অফিসে দুপুরের পর দেখা করিস।

কিছু মালকরি ছাড়ো কেলোদা।

কেলো একটু হাসল, তুই মালকড়ি ছাড়া নড়বি না তা জানি। বোস, ব্যাপারটা বুঝে নে। সঙ্গের ছোকরাটা কে ?

ফালতু।

কেলো একটু গম্ভীর মুখ করে মোটা আঙুল মুখে পুরে দাঁতের ফাঁক থেকে বোধহয় দুপুরের খাওয়া মাংসের আঁশ বের করে আনল। তারপর চোখ ছোট করে বলল, বিশে বলবে। শুনে নে।

॥ ১৬ ॥

অনেক দুঃখের কথা বলে কণা বিদায় নেওয়ার পর চিরু মণীশের কাছে এসে বলে, তোমার কি মনে হয়, মদন কিছু করতে পারবে কণার জন্য ?

মণীশ নিবিষ্টমনে সিনথেটিক আঠা দিয়ে একটা ভাঙা কাপ জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছিল ভিতরের বারান্দায়। বলল, একটা চরিত্রহীন মানুষকে চরিত্রবান করার সাধ্য তো আর ওর নেই। তবে ভয় দেখাতে পারে বটে। চাকরিরও ক্ষতি করতে পারে হয়তো।

তাতে কিছু হবে ?

ঠোঁট উল্টে মণীশ বলে, আমার মনে হয় না। তা ছাড়া মদনও যে কিছু করবেই এমন ভাবছ কেন ? হয়তো দিল্লি গিয়ে ভুলে যাবে। তেমন গা করছিল না।

একটু আনমনা ছিল, আমিও লক্ষ করেছি। ওদের পার্টিতে কী সব গোলমাল চলছে না ?

তা চলছে। কাপটা জোড়া দিয়ে দুহাতে জোরসে চেপে ধরল মণীশ, তারপর ওই অবস্থাতেই বলল, শালাবাবু আজ একটু তরল জিনিস চালিয়ে আসবে। মাধবের বাড়িতে নেমন্তন্ন যখন।

কত মাথার কাজ করতে হয়, কত ঝামেলা ওর। একটু খায় খাক। কখনও মাতলামি করে না তো। চিরু ভালমানুষি গলায় বলে।

মণীশ কাপটাকে প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করে। সিনথেটিক আঠার নিয়মে লেখা আছে, অ্যাপলাই ম্যাকসিমাম প্রেশার। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, আমি এক আধদিন খেয়ে এলে কী করবে ?

এসো না ! নতুন অভিজ্ঞতা হোক, আমিও মরার আগে নিজের চোখেই দেখে যাই। বলে চিরু চোখ পাকিয়ে তাকায়।

মণীশ মৃদু হেসে বলে, তোমার স্বামী না হয়ে যদি ভাই হতাম চিরু, অনেক অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যেত।

চাপটা একটু বেশি হয়ে যাওয়াতেই বোধহয়, কাপের ভাঙা টুকরো দুটো পিছলে খুলে গেল। মণীশ বলল, এঃ। আজকাল কিছুই সহজে জোড়া লাগতে চায় না কেন বলো তো ?

ওই ভাঙা কাপ জুড়ে আমার কোন শ্রাদ্ধে ভুজ্যি সাজাবে শুনি ?

আহা, কত সময় দাড়ি-টাড়ি কামানোর জল নিতেও তো লাগে। থাক না জিনিসটা। এই কাপের এখন চুয়ান্ন টাকা ডজন।

বলে মণীশ আবার আঠা লাগিয়ে ভাঙা টুকরো দুটো জুড়তে থাকে।

চিরু বলে, এ হল পেতনামি। দিন দিন তোমার নজর ভারী ছোট হচ্ছে।

দিন দিন দেশের অবস্থাও খারাপ হচ্ছে যে। তোমার এম পি ভাইও কথাটা স্বীকার করে। বাজারহাট তো কখনও করলে না মিস্টার, তাই টেরও পেলে না।

চিরু যেন একটু রাগ করেই রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। স্টোভে ভাত ফুটছে, সেইদিকে চেয়ে থাকে চুপচাপ। ছেলেমেয়েরা শোওয়ার ঘরে গুনগুন করে পড়ছে। শব্দটা শুনতে শুনতে কত কী ভাবতে থাকে।

কাপটা অধ্যবসায়ের বলে জুড়তে পেরে যায় মণীশ। বেসিনে আঠা লাগানো হাত ধুয়ে লুঙ্গিতে

মুছতে মুছতে খুব সাবধানে রান্নাঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে মৃদু স্বরে ডাকে, চিরু।

চিরু ঠাণ্ডা গলায় বলে, বলো।

একটা কথা বলব ?

শুনতে পাচ্ছি। বললেই হয়।

তুমি কি রাগ করেছ ?

রাগ করা কি আমার সাজে ?

রাগের তো সাজগোজ লাগে না মিস্টার।

তবু বাঁদীদের রাগ তো মানায় না।

সেই পুরনো শব্দ। নতুন কিছু ভেবে বার করতে পারো না ?

আমার অত মাথা নেই, জানোই তো ?

মণীশ চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে, শুধু ইয়ার্কি করে এই গাঢ় মেঘ কাটানো যাবে না। চিরুর সঙ্গে তার বোঝাপড়া চমৎকার তবু মাঝে মাঝে চিরুর একরকম গভীর অভিমান হয়। খুব সামান্য কারণেই হয়। সহজে ভাঙে না।

আবার যখন 'চিরু' বলে ডাকল মণীশ তখন তার গলার স্বর পাল্টে গেছে।

চিরু তবু তাকায় না। গোঁজ হয়ে স্টোভের দিকে চেয়ে থাকে।

মণীশ অত্যন্ত ঘন হয়ে ওঠা গভীর মৃদু স্বরে বলে, যা তোমাকে কখনও বলতে ইচ্ছে করে না আজ তার কয়েকটা কথা বলব ?

চিরুর মনোভাব বোঝা গেল না। কিন্তু সে জবাবও দিল না।

মণীশ মৃদু স্বরেই বলল, এত বয়স পর্যন্ত আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। না একটা বাড়িঘর, না স্থায়ী নিরাপত্তার কিছু, না কোনও শখ শৌখিনতার জিনিস। আশে পাশে সব বাড়িতেই যা যা আছে, তার কিছুই আমার নেই।

চিরু এবার বিস্ময়ভরে তাকিয়ে বলে, এসব কথা উঠছে কেন ?

উঠছে তোমার জন্য নয়। আমি আজকাল নিজেই ভেবে দেখি, অনেস্ট থাকার চেষ্টা করে আমি পাঁঠার মতো কাজ করলাম কি না। আমি আজ মরে গেলে কাল যে তোমাদের দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না।

চুপ করো।

মণীশ একটা বড় শ্বাস ফেলে বলে, এ রাগ বা অভিমান থেকে বলছি না চিরু। যা ফ্যাক্ট তাই বলছি। আমি এখন সত্যিই বুঝতে পারি না, এই সমাজের সঙ্গে পাল্লা টেনে চলাই উচিত ছিল কি না।

চিরু নরম হয়েছে। জলচৌকিতে বসে মণীশের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, তুমি অনেস্ট বলে আমি কখনও কিছু বলেছি ? না চেয়েছি ?

চাওনি। বলোনি। তবু মনে মনে তো মানুষের কত প্রত্যাশা থাকে। তেমন বেশি প্রত্যাশাও নয়। একটু জমি, ছোট বাড়ি, কিছু টাকা, কয়েকটা শৌখিন জিনিস।

চিরু অন্যমনস্ক হয়ে মৃদু স্বরে বলল, মাঝে মাঝে এসব নিয়েও ভাবি, কিন্তু তোমার ওপর রাগ করি না তাই বলে। এই যে কণা এসেছিল, আমার বাড়িঘর দেখেটেখে আজ বলল, তোর বর কাসটমসের অফিসার, অথচ তোর ঘরে একটাও ফরেন জিনিস নেই। ভারী আশ্চর্য। একটা রেডিয়ো না, টেপ রেকর্ডার না, বিদেশি শাড়ি, সেন্ট, ঘড়ি কিচ্ছু না। অথচ পাবলিক কত ফরেন জিনিস কিনছে চারদিকে।

শুনে তোমার মন কীরকম হল ?

একটু খারাপ লাগল। কথাটা তো মিথ্যে নয়।

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, মিথ্যে নয়। তাই ভাবি, অপদার্থতার আর এক নামই সততা কি না।

তা কেন হবে ? তবে মদনও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, জামাইবাবুর সততা আর শুচিবাইতে তফাত নেই। সৎ কেন থাকবে না ? তা বলে ভাঙা কাপ জোড়া লাগানোর মতো গরিবও তুমি

নও।
মণীশ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে হাসল, ও, ওই ব্যাপারটায় তুমি এত রেগে আছ ?
চিরু ছলছলে চোখ করে বলে, তোমাকে ওসব উঞ্ছবৃত্তি করতে দেখলে আমার এমন কষ্ট হয় !
আরে দূর ! কাপটা না হয় এক্ষুনি ছুড়ে ফেলে দিচ্ছি।
কাপটা তো বড় কথা নয়। মনটাকে ছুড়ে ফেলতে পারবে কি ?
মণীশ মলিন একটু হাসল। বলল, উঁচু দরের সাহিত্যের ডায়ালগ দিলে মিস্টার।
ইয়ার্কি কোরো না। আমি তোমাকে জব্দ করার জন্য কথাটা বলিনি। আজ আমার মনটা খারাপ।
বুঝেছি চিরু। মনটা আমারও ভাল নেই। কেবলই মনে হচ্ছে, সংসার আমার কাছে আরও কিছু চেয়েছিল। মুখ ফুটে চায়নি ঠিকই কিন্তু প্রত্যাশা নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আর সংসার যা চাইছে তা হয়তো আমার দেওয়াও উচিত। কিন্তু একটা ভ্রান্ত উচিত-অনুচিত সৎ-অসতের বোধ সব গোলমাল করে দেয়। বুঝি এর কোনও দাম নেই...
চিরুর আঁচল-চাপা অবরুদ্ধ কান্নার শব্দে থামে মণীশ। গলার কাছে তারও একটা কান্নার দলা ঠেকে আছে বহুদিন। কিন্তু সে তো পুরুষমানুষ ! তাই কাঁদল না। একটু হাসল মাত্র। কিন্তু ঠিক করোটির হাসির মতো লাবণ্যহীন দেখাল তার মুখশ্রী।
রান্নাঘরে চৌকাঠে দুই হাত রেখে সে ঝুঁকে পড়ল ভিতরে। চাপা গলায় বলল, বাচ্চারা শুনতে পাবে। কেঁদো না। কান্নার মতো কিছু তো হয়নি।
চিরু কান্না আর আক্রোশে চাপা গলায় ফেটে পড়ল, কথায় কথায় তুমি আজকাল মরার কথা বলো কেন ?
বলি আর কিছু করার নেই বলে চিরু। সৎ থাকার চেষ্টা এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, পরের পয়সায় একটা পান খেতে গেলেও দুবার ভেবে দেখি, এর মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না। অথচ এই নিরন্তর সৎ থেকে থেকেও আজকাল কেমন সততার মধ্যে কোনও শক্তি পাই না।
তোমাকে কেউ অসৎ হতে বলেছে ?
মণীশ মাথা নাড়ে, বলেনি, অন্তত তুমি কোনওদিন বলোনি। সে কথা নয়। আমি বলছিলাম সততা, সচ্চরিত্র এগুলোই তো মানুষের শক্তির উৎস। তবু আজকাল আমি সততা থেকে কোনও জোর পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয় ভুল করেছি। সৎ বলে সারাজীবন মানুষের ঠাট্টা বিদ্রূপ তো কম সহ্য করিনি। আগে গায়ে লাগত না। আজকাল লাগে।
সৎ থেকেও কেউ ভাল নেই ?
আছে নিশ্চয়ই। কে খুঁজে দেখেছে বলো ? আমার প্রশ্ন তাও নয়। আমি আজকাল সততা জিনিসটা কতদূর প্রয়োজন তাই নিয়ে ভাবি।
ইচ্ছে করলে মদন তোমাকে অনেক কিছু করে দিতে পারে। ওর অনেক ক্ষমতা। তোমাকে সততা বিসর্জন দিতে হবে না।
জানি চিরু। একজন এম পি যে অনেক কিছু পারে তা না বুঝবার মতো ছেলেমানুষ আমি নই। ভেবে দেখো, আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন ও একটুখানি ছেলে। আমাদের বিয়ের পর ওর পৈতে হল। সেই শ্বশুরমশাইয়ের অনুরোধে পৈতেয় ওকে গায়ত্রীমন্ত্র দিয়েছিলাম আমি। বলতে কী আমিই ওর আচার্য। এখন ও হয়তো গলায় পৈতেই রাখে না, কিন্তু ব্যাপারটা আমি ভুলি কী করে ? সেই মদন এখন এম পি, হাজারজনা এসে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে, সবই জানি। কিন্তু উমেদারদের দলে নিজের নামটা লেখাতে রুচিতে বাধে।
চিরুর কান্না থেমেছে। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে।
তারপর বলল, আমি তোমাকে আর কখনও কিছু বলব না। বাইরের ঘরে সোফার নীচে বাসন্তী ঘুমোচ্ছে। ওকে ডেকে দাও তো। একটু পোস্ত বেটে দেবে।
মণীশ নড়ল না। তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে বলল, আজ তোমার অভিমান ভাঙিয়ে মুখে হাসি ফোটাতে পারলাম না চিরু। বিবাহিত জীবনের এই প্রথম ফেইলিওর। আমাদের চোখের সামনে

মদন এক মস্ত প্রলোভনের মতো। কেবলই মনে হয়, হাতের মুঠোয় একজন ক্ষমতাবান এম পি, ইচ্ছে করলেই কত কাজ আদায় করে নিতে পারি। মনে হয় না চিরু ?

চিরু জবাব দিল না। হাতায় করে ভাত তুলে টিপে দেখল।

মণীশ বাইরের ঘরে এসে বাসন্তীকে ঠেলে তুলে দেয়।

জোড়া-দেওয়া কাপটা এখনও তার হাতে। বাতিটা নিভিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে সোফায়। পোষা বেড়ালের গায়ে লোকে যেমন হাত বোলায় তেমনি আদর করে সে কাপটার গায়ে হাত বোলাতে থাকে। একেবারে আস্ত কাপের মতো জোড়া মিলে গেছে। তবু ঠাহর করে আঙুল বোলালে জোড়ের জায়গাটা বোঝা যায়। খুব ঠাহর করলে, নইলে না।

সাবধানে মণীশ কাপটা সেন্টার টেবিলের ওপর রেখে দেয়।

অন্ধকারে বসে মণীশ ভাবল, আজ রাতে যদি আমি মরে যাই তা হলে কি সংসার ভেসে যাবে ? আমার বাচ্চারা কোনওদিন দাঁড়াবে না ? পরের দয়ায় বাঁচতে হবে সবাইকে ? যদি তাই হয় তা হলেই বা কী করতে পারে মণীশ ? চিরু বা বাচ্চারা তারই বউবাচ্চা বটে, কিন্তু যতদিন বেঁচে আছে ততদিন। তারপর এই প্রকৃতি, এই দেশ, এই রাষ্ট্রব্যবস্থা ও এই সমাজ থাকবে। কী হবে তা মণীশ জানে না, কী হবে তা স্থির করার মালিক সে তো নয়। তবে সে এটুকু বোঝে পৃথিবীতে কেউই অপরিহার্য নয়। তাকে ছাড়াও চলবে হয়তো, কিন্তু চলবে। কোনও শূন্যস্থান অপূরণ থাকে না।

মণীশ জানে, মদন হচ্ছে তার হাতের নাগালে এক আশ্চর্য প্রদীপ, যাতে ঘষা মারলেই এক বিশাল দেনেওয়ালা দৈত্য এসে হাজির হবে। কোনওদিনই প্রদীপটাকে ঘষবে না মণীশ। কিন্তু সংসার চাইছে, সে প্রদীপটাকে ঘষুক। একটু ঘষুক।

মণীশ অন্ধকার ঘরে বসে ভাবল, আজ রাতে যদি মরে যাই ?

ভেবে একা একা একটু হাসল মণীশ। সেই করোটির হাসির মতো লাবণ্যহীন এক হাসি। আজ রাতে তার খুব মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

॥ ১৭ ॥

মাধব দরজা খুলতেই মদন প্রথম প্রশ্ন করল, ঝিনুক ফিরেছে ?

মাধব আধো-মাতাল গলায় বলল, আয়, আয়। ঝিনুক ? না, ঝিনুক ফিরবে না। ঝিনুক কেন ফিরবে বল তো ?

মাধব ঘরে ঢুকে দেখে, সেন্টার টেবিলের ওপর একটা বোতল খালি পড়ে আছে, আর একটার সিকিভাগও উড়ে গেছে।

বোস। খা। বলে মাধব একটা গ্লাসে অনেকখানি হুইস্কি ঢেলে বরফের বার থেকে চিমটে দিয়ে তুলে বরফ মেশাল। বলল, দেখ, কী সুন্দর করে ঘর সাজিয়েছিল ঝিনুক। কত খুঁজে খুঁজে সব জিনিস কিনেছে, কত যত্নে সাজায়, ধোয় মোছে। কিন্তু তবু ঘর ভেঙে দেওয়া কী সোজা দেখলি ? এক মিনিটও লাগে না।

মদন গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে আঃ বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ঘর ভাঙা যে কত সোজা সে কি তুই আমাকে শেখাবি রে মাধব ? আমার চেয়ে ভাল তা আর কে জানে ? আজ আমি পার্টিতে রেজিগনেশন দিয়েছি, জানিস ?

দিলি ? অ্যাঁ।

দিলাম ! কেন দিতে হল জানিস ? আমার খুব খিদে পেয়েছিল বলে। বাচ্চা ছেলেরা ঘেরাও করেছিল, বেরোতে পারছিলাম না। ওরা বললে, রেজিগনেশন লেটারে সই করলে বেরোতে দেবে। আমি তাই দিয়ে দিলাম। অথচ এই পার্টির সঙ্গে কতকাল আছি। শূন্য গ্লাসটা নামিয়ে রেখে মদন বলে, দে।

অত তাড়াতাড়ি খাস না। হুইস্কি ইজ এ স্লো ড্রিংক।

সো আর অল ড্রিংকস। কিন্তু অত সব প্রোটোকল মানার মেজাজ নেই রে। দে।

আগের বারের বরফের টুকরোগুলো গলবার সময় পায়নি মদনের গ্লাসে। তার ওপরেই আবার হুইস্কি ঢেলে দিল মাধব। মদন উঁকি মেরে দেখল, সেন্টার টেবিলের নীচের থাকে আরও দুটো বোতল বরফের ট্রেতে শোয়ানো। দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিয়ে সে বলে, তুই তো বলেছিলি, ছোট করে হবে। কিন্তু এ যে দেখছি, পুরো শুঁড়িখানা খুলে বসেছিস।

ছোট করেই কথা ছিল। কিন্তু কথা কি রাখা যায়, বল ? কথা কি ছিল, এই বয়সে আমাকে একা ফেলে ঝিনি চলে যাবে ? বল, দুনিয়ায় কোনও কথা থাকে ?

মদন হাত বাড়িয়ে বলে, চিঠিটা দে।

মাধব একটু পিছন দিকে হেলে সভয়ে বলে, কীসের চিঠি ?

কেন, ঝিনুক কোনও চিঠি লিখে রেখে যায়নি ?

না তো ? চিঠি লিখবে কেন ? অ্যাঁ ! চিঠি লেখার কোনও মানে হয় ?

চিঠি লিখে রেখে যায়নি তো কী করে বুঝলি যে, ও পালিয়েছে ?

বোঝা যায়। দেখছিস না, ঘরদোর কেমন খাঁ খাঁ করছে। অবশ্য তুই ঠিক বুঝবি না। ঝিনির সঙ্গে থাকলে বুঝতিস। আমি তো ঘরে পা দিয়েই—

তোদের ঝিটাকে ডাক।

ঝি ? তাকে কেন ?

ডাক না।

ওঃ, জ্বালালি। পুনম। এই পুনম।

পুনম দৌড়ে আসে, মামাবাবু, ডাকছ ?

মদন জিজ্ঞেস করে, ঝিনুক কখন বেরিয়েছে ?

চারটে পাঁচটা হবে। তখনও রোদ ছিল।

কোথায় গেছে বলে যায়নি ?

জি। বোনের বাড়ি। কাছেই।

সঙ্গে কেউ ছিল ?

ওই এক মামাবাবু এসেছিল—কী যেন শক্ত নামটা—

বৈশম্পায়ন ?

জি। আর একটা নতুন কাজের মেয়েও ছিল।

কেন ?

বোনের বাড়ি মেয়েটাকে দেওয়ার কথা।

আচ্ছা, তুমি যাও। বলে মদন মাধবের দিকে চেয়ে বলে, একটি লাথি কষাব তোমাকে শালা।

মাধব মাথা নাড়ে, তুই বুঝবি না। ঝি, বোনের বাড়ি, সব ঠিক। কিন্তু তবে বাড়িটা এত খাঁ খাঁ করছে কেন ? তুই টের পাচ্ছিস না ?

খাঁ খাঁ নয়। বাড়িটা তোকে বলছে, খা খা আরও হুইস্কি খা।

দূর ! এ বাড়ির একটা অদ্ভুত বাতাবরণ আছে ! যাকে বলে অ্যাটমোসফিয়ার। আজ সেটা অ্যাবসেন্ট। ভীষণরকম ভাবে অ্যাবসেন্ট। আমি অনেক চেষ্টা করলাম খুঁজতে। অ্যাটমোসফিয়ারটা কিছুতেই রেসপন্ড করছে না। ইট ইজ নট হিয়ার।

মদন গ্লাস নামিয়ে বলল, দে।

এবারও তার প্রথমবারের বরফ গলার সময় পায়নি। মাধব চোখ বড় বড় করে বলে, এরকম টানতে কোথায় শিখলে গুরু ? আচ্ছা খা। আজ তোরও দুঃখের দিন। আজ থেকে তুইও তো আর এম পি নোস। শুধু মদনা।

চোখ ছোট করে চেয়ে মদন বলে, আমি মদনা সে কথা ঠিক, কিন্তু আমি আর এম পি নই এ কথা তোকে কে বলল ?

কেন, এই যে বললি রেজিগনেশন দিয়েছিস ?

রেজিগনেশন দিয়েছি পার্টি থেকে, কিন্তু তাতে আমার পার্লামেন্টের মেমবারশিপ যায় না। আই

অ্যাম স্টিল ভেরি মাচ অ্যান এম পি।

মাধব খুব অবাক হয়ে বলে, ইউ আর স্টিল অ্যান এম পি ? বাঃ বাঃ। হোঃ হোঃ, আফটার ইভন রেজিগনেশন ইউ স্টিল রিমেন এম পি ! বাহবা।

দূর গাড়ল। সংবিধানে আটকায় না।

মাধব উচ্চ স্বরে বলে, আলবত আটকায়। আলবত আটকায়। নিশ্চয় আটকায়।

কোথায় আটকায় ?

মাধব মিইয়ে গিয়ে বলে, কোথাও নিশ্চয়ই আটকায়। কিন্তু এক্ষুনি সেটা আমি ভেবে পাচ্ছি না। আফটার অল আমার বউ পালিয়ে গেছে, এখন আমার মাথার ঠিক নেই।

কোথাও আটকায় না। আই অ্যাম স্টিল অ্যান এম পি।

মাধব চোখ বুজে মাথা নাড়ে। বলে, তুই এখনও এম পি কী করে ? তা হলে এ ম্যান ক্যান বি ভেরি মাচ অ্যালাইভ আফটার হিজ ডেথ ! অ্যাঁ। এ ডেড ম্যান মে বি কলড অ্যান অ্যালাইভ ম্যান ! নাকি লজিকটা হচ্ছে না ?

তীক্ষ্ণ কূট চোখে চেয়ে ছিল মদন। বলল, দেয়ার ইজ সাম ট্রুথ ইন ইট।

তার মানে ?

মরার পরও কেউ কেউ বেঁচে থাকে। দে।

মাধব বোতলটা তুলে দেখে বলে, ফিনিশ ? অ্যাঁ। তুই অত ধড়াধবড় খাস না। আর একটা খুলছি, এবার সোডা মিশিয়ে খা।

মদন গ্লাসটা এগিয়ে দেয়।

মাধব নতুন বোতল খুলে হুইস্কি ঢেলে দিয়ে বলে, কী বলছিলি ? মড়া না জ্যান্ত, কী যেন !

বলছিলাম কেউ কেউ মরেও বেঁচে থাকে।

মাধব হঠাৎ সিঁটিয়ে গিয়ে বলে, যাঃ মাইরি। এমনিতেই আমার ভীষণ ভূতের ভয়। তার ওপর ঝিনি নেই !

মদন এবার সত্যিই খুব আস্তে খায়। ছোট করে একটিমাত্র চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে আর একটা সিগারেট ধরায় সে। তারপর বলে, তোর এত ভয় কবে থেকে মাধব ? আর কীসেরই বা ভয় !

ভূত। মেলা ভূত চারদিকে।

কার ভূত রে মাধব ?

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোফার পিছন দিকে মাথা রেখে পড়ে থাকে। চোখ বোজা, আস্তে আস্তে কখন, কীভাবে তার চোখের কোল ভরে যায় জলে। ঠোঁট একটু কাঁপে। একটা দীর্ঘশ্বাস অনেকক্ষণ ধরে ছাড়ে সে।

মাধব !

উঁ।

এটা তো শোকসভা নয় রে। কিছু বল। নইলে জমছে না।

মাধব বিড়বিড় করে বলে, তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছো আকীর্ণ করি মানুষের লাশে...

দূর শালা মাতাল !

মদনা, একটা কথা বলবি ? লিডার হতে গিয়ে তোকে মোট কটা খুন করাতে হয়েছে ?

এবার সত্যি লাথি খাবি। যা বাথরুমে গিয়ে পেচ্ছাপ করে ঘাড়ে মুখে ঠাণ্ডা জল দিয়ে আয়।

মাধব বেকুবের মতো অর্থহীন চোখে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, শোওয়ার ঘর থেকে নীলুর ছবিটা আমি সরিয়ে দিয়েছি।

মদন কিছু বলে না। কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ক্রূর চোখে চেয়ে থাকে।

মাধব রুমালে চোখ মুখে বলে, আফটার অল বাড়ির চাকরের ছবি শোওয়ার ঘরে টাঙিয়ে রাখার কোনও মানেই হয় না।

মদন গ্লাস তুলে ছোট চুমুক দেয়। চেয়ে থাকে স্থিরভাবে।

মাধব বলে, ঠিক করিনি ? বল ! আফটার অল হি ওয়াজ এ ডোমেস্টিক সারভেন্ট ! বাসন মাজত, ঘর ঝ্যাঁটাত, আমাদের পাত কুড়িয়ে খেত, আমাদের পুরনো জামা-কাপড় পরে বড় হয়েছিল। ঠিক করিনি ছবিটা সরিয়ে দিয়ে ? চুপ করে আছিস কেন ?

শুনছি। বলে যা।

নীলু যত যাই হোক, ছিল আসলে চাকর। এইটুকু—মাধব হাত দিয়ে একটা মাপ দেখিয়ে বলে—এইটুকু থাকতে এসেছিল। শীতকালে কুঁকড়ে শুয়ে থাকত পাপোশে। একদম পোষা কুকুরের মতো। এঁটোকাঁটা খেত। হি ওয়াজ এ সারভেন্ট ! সারভেন্ট !

চেঁচাচ্ছিস কেন ?

চেঁচাচ্ছি নাকি ? ও ! বলে মাধব চোখ বোজে। আবার চোখের কোল ভরে ওঠে জলে। ঠোঁট নড়ে। তারপর বলে, চাকরের আস্পদ্দা ! অ্যাঁ, চাকরের এত বড় আস্পদ্দা !

গ্লাস নামিয়ে রেখে মদন তেতো মুখে বিরক্তির সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া হুস করে ছাড়ে। কিছু বলে না।

মাধব চোখ বুজেই বলে, আস্পদ্দা নয় ! তুইই বল ! হি ওয়াজ ক্লাইমবিং আপ দি ট্রি অফ সাকসেস লাইক এ মাংকি। যেটায় হাত দেয় সেটাতেই ব্রিলিয়ান্ট। পাড়ার এঁদো স্কুল থেকে কেমন ফার্স্ট ডিভিশন পেল। মাইরি, ভগবান কেন এত ছপ্পড় ফুঁড়ে দিল ওকে বল তো ! ভরাট গলায় যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত ঠিক মনে হত হেমন্ত। আর কী সাহস ! কী ইন্টিগ্রিটি ! মদনা, কথা বলছিস না কেন ? আমি কিছু ভুল বলছি ?

মদন গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে বলল, আর একটা কথা এখনও বলিসনি !

কী বল তো !

নীলু ছিল ঝিনুকের প্রেমিক। ভুলে গেছিস ?

হাঃ হাঃ, তাই ভুলি রে পাগল ?

তোর বউ বড্ড অন্যের প্রেমে পড়ে যায় !

হাঃ হাঃ। যা বলেছিস ! ঝিনি ভীষণ প্রেমে পড়তে ভালবাসে। ভীষণ। তবে—হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মাধব বলে—ঝিনি কখনও তোর প্রেমে পড়ল না কেন বল তো ! ইউ ওয়্যার দি মোস্ট এলিজিবল পসিবল লাভার। কিন্তু তোর প্রেমে পড়ল না কেন ! অ্যাঁ !

ঝিনুক তো তোর প্রেমেও কখনও পড়েনি !

হাঃ হাঃ ! দি জোক অফ দি ইয়ার। কিন্তু কথা হল—কী বলছিলাম বল তো ! হ্যাঁ, একটা চাকরের কথা। অজ্ঞাতকুলশীল। নিজের পদবিটা পর্যন্ত ছিল না, আমাদের পদবি ধার নিয়ে তবে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পেরেছিল।

মদন গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে বলে, আজ তোকে নীলুতে পেয়েছে কেন বল তো !

মাধব আবার চোখে বোজে। তার অসাধারণ সুন্দর মুখশ্রী বার বার বিকৃত হয়ে যায় এক অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণায়। চোখের কোল ভরে ওঠে জলে। বলে, আজ নয়। সেই কবে থেকে নীলু আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। শোওয়ার ঘরে নীলুর ছবিটা টাঙিয়েছিল ঝিনি। আমি কতবার বলেছি ওটা সরিয়ে দিতে। দেয়নি। মাধব একবার চোখ চেয়ে চারদিক দেখে নেয়, তারপর আবার চোখ বুজে বলে, রাত্রিবেলায়—বুঝলি—রাত্রিবেলায় রোজ নীলু ফটোগ্রাফ থেকে বেরিয়ে আসে। বুঝলি ! দ্যাট সারভেন্ট কামস আউট ! বাট হি ডাজনট বিহেভ লাইক এ সারভেন্ট ! হাঃ হি বিহেভস লাইক এ-এ...

মদন ধীর ও দীর্ঘ এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে নিজেই বোতল থেকে ঢেলে নেয়।

মাধবের বোজা চোখ থেকে অবিরল জল ঝরছে। মাঝে মাঝে বিকট হেঁচকি তুলছে সে। ক্লান্ত মাথা সোফার কানায় রেখে দুর্দান্ত একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, কিন্তু চাকরটার আস্পদ্দা আমি বহুবার রেজিস্ট করার চেষ্টা করেছি। আমার দোষ ছিল না। আই ট্রায়েড মাই বেস্ট। ও যখন কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি তখন একবার আমি ওকে দিয়ে আমার তিন জোড়া জুতো পালিশ করিয়েছি, আন্ডারওয়্যার কাচিয়েছি, ইভন একদিন দুদিন বাসন পর্যন্ত মেজে দিতে বাধ্য করেছি। আমি ওকে

ভুলতে দিতাম না যে, আফটার অল ও চাকর, অজ্ঞাতকুলশীল অ্যান্ড এ ননএনটিটি।

কিন্তু পারিসনি।

মাধব মাথা নাড়ল, না। ও তো সব হাসি মুখেই মেনে নিত। কোনও ফলস ভ্যানিটি ছিল না। একদিন ও আমাকে বলেছিল, তোমাদের বাড়িতে চাকর খেটে আমার একটা উপকার হয়েছে কি জানো ? আমার অহং বোধটা বাড়তে পারেনি। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হল কমপ্লেক্স, চাকর খেটে আমার সেই কমপ্লেক্সগুলো কেটে গেছে।

মদনের একটুও নেশা হচ্ছে না। একটা তীক্ষ্ণধার অনুভূতি তাকে টান টান সচেতন রাখছে, নেশা ধরতে দিচ্ছে না। তবু হুইস্কির প্রতিক্রিয়া তো আছেই। তার সমস্ত শরীর অসহ্য গরম হয়ে উঠছে। জ্বালা করছে কান, নাক, চোখ, মুখ। সে উঠে পাখাটা পুরো বাড়িয়ে দিয়ে আসে।

মাধব তার হাতের সোডা মেশানো হুইস্কির গ্লাসে অনেকক্ষণ চুমুক দেয়নি। একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, অ্যান্ড দাস হি বিকেম ডেনজারাস। এক্সট্রিমলি ডেনজারাস ফর এনিবডিজ কমফোরট। ব্রিলিয়ান্ট বলে নয়, ব্রিলিয়ান্ট তো কত আছে।

তা হলে কেন ? মদন অনেকক্ষণ বাদে কথা বলল।

মাধব তাকায়। চোখ ঘোর লাল। দৃষ্টি অস্বচ্ছ। বলে, রাতে মাঝে মাঝে ফটোগ্রাফ থেকে বেরিয়ে এসে নীলু সেই কথাটাই বলে। তোমরা আমাকে ভয় পেতে কেন জানো ? আমার কোনও কমপ্লেক্স ছিল না বলে, অহং ছিল না বলে। তোমরা বুঝতে পেরেছিলে, আমি সহজেই মানুষকে জয় করতে পারি। বলে, তোমার বউকেও আমি কত সহজে জয় করে নিয়েছিলাম দেখোনি ! অথচ তোমার চেহারা কার্তিক ঠাকুরের মতো, আমার চেয়ে হাজার গুণ সুন্দর তুমি। তবু তোমার বউ কেন নীলুতে মজল ? কেন হদ্দমদ্দ মেয়েপুরুষ বালবাচ্চা সবাই নীলুতে মজত ? অ্যান্ড দাস নীলু ওয়াজ ইন দি মেকিং অফ এ লিডার। নীলু ওয়াজ এ ন্যাচারাল লিডার।

মদন মৃদু একটু হাসল। তারপর পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলে দিয়ে খোলা বুকে ফুঁ দিতে লাগল জোরে জোরে।

দুচোখে অঝোর জলের ধারার ভিতর দিয়ে চেয়ে ছিল মাধব। হাতের গ্লাসটা এতক্ষণে শেষ করে ঠক করে নামিয়ে রাখল সেন্টার টেবিলে। তারপর চাপা তীব্র গলায় বলল, অ্যান্ড ফব দ্যাট রিজন নীলু হ্যাড টু ডাই।

ঘরের থম ধরা বাতাসকে সামান্য শিউরে দিয়ে এই সময়ে কলিং বেল বেজে উঠল, টুং টাং টুং টাং টুং টাং...

খানিকক্ষণ স্থাণুর মতো বসে থেকে শব্দটা শোনে মাধব। তারপর অতি কষ্টে ওঠে। দরজা খোলার আগে সেফটি চেনটা আটকে নেয়। স্পাই হোল-এ চোখ রেখে দেখে জয়।

খুবই বিরক্ত হয় মাধব। দরজাটা ফাঁক করে বলে, কী চাই ?

মাধবদা, আমি জয়দ্রথ।

জানি। কী চাই ?

মদনা আছে ?

আছে। কেন বলো তো ? আমরা একটু বিজি আছি।

ভীষণ দরকার মাধবদা। কোশ্চেন অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ। আমাকে একটু ভিতরে আসতে দিন।

মাধব লক্ষ করে জয়ের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা।

মাধব চেনটা খুলে দিতেই দরজাটা হাট করে খুলে জয় চৌকাঠে দাঁড়ায়। উদ্‌ভ্রান্ত, ভয়ার্ত।

কী হয়েছে ? মাধব জিজ্ঞেস করে।

জয় শুধু বিড়বিড় করে বলে, মাধবদা ! মাধবদা !

পিছন থেকে একটা ধাক্কা খেয়ে জয় ছিটকে আসে ঘরের মধ্যে। দরজার চৌকাঠে নিঃশব্দে একটা লোক এসে দাঁড়ায়।

মাধব প্রথমটায় হাঁ করে চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ তার অনিয়ন্ত্রিত স্বরযন্ত্র থেকে দুর্বোধ্য একটা শব্দ বেরোয়, ই—ই-ই-ই—

আমি সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ি করব। সারাদিন সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকব। সঙ্গে কাউকে রাখব না। সারাদিন ঢেউ আর ঢেউ, আর ওই আকাশ পর্যন্ত জল। বিশাল, বিপুল। মানুষ এত ছোট, এত অসম্পূর্ণ যে আমার আর কিছুতেই সংসারে থাকতে ইচ্ছে করে না।

তোমার ফ্ল্যাটটা কত সুন্দর ঝিনুক! কী নিশ্চিন্ত তোমার জীবন! তবু ভাল লাগে না?

আপনি কিচ্ছু বোঝেন না। আমার জীবনে এক বিন্দু সুখ নেই। আমার ভালবাসার কেউ নেই যে! ঘড়িটা দেখুন তো, আমারটা বোধহয় বন্ধ হয়ে আছে!

সোয়া নটা ঝিনুক।

ইস, রাত হয়ে গেছে। এবার চলুন।

তোমাকে আজ কথাটা বলা হল না।

ঝিনুক ব্রিজের ঢাল বেয়ে নামতে নামতে বলে, কথাটা বললেই যদি ফুরিয়ে যায় তবে থাক না। আমিও আছি, আপনিও রইলেন।

বৈশম্পায়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ব্রিজের ওপর পাশাপাশি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও ঝিনুক যতটা দূরে ছিল ততটাই দূরে রয়ে গেল।

শোনো ঝিনুক। আমার মনে হয়, কোনও পুরুষকেই তুমি কখনও ভালবাসোনি।

ঝিনুক আচমকা এই কথায় একটু থমকে দাঁড়ায়। ফিরে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, এতক্ষণ ধরে স্টাডি করে এই বুঝি মনে হল?

ঠিক বলিনি?

পুরুষরা যে কেন এত ভালবাসা-ভালবাসা করে মরে! বলে ঝিনুক একটা কপট শ্বাস ছাড়ে। পুরুষ বলতেই তার মনে পড়ে পোড়-খাওয়া শক্তসমর্থ লড়িয়ে একজন মানুষকে। খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট তার পরনে। গম্ভীর, শান্ত, মুখে অনেক লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা গভীর হলকর্ষণের দাগ রেখে গেছে। আজও তার বাবাকে কোনও পুরুষই ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। জীবনে আর একজন দুঃখী ও লড়িয়ে মানুষকে দেখেছিল ঝিনুক। নীলু। তারও মুখে ছিল ওই নির্বিকার লড়াইয়ের ছাপ। সুখ চায়নি, দুঃখেও নারাজ ছিল না, যে কখনও ভালবাসা-ভালবাসা করে মরেনি।

কিন্তু বৈশম্পায়ন তাকে কিছু বলতে চায়। সে কি ভালবাসার কথা? ঝিনুককে ভালবাসার কথা যে অনেকেই বলেছে! আসলে ভালবাসেনি কেউ। বৈশম্পায়ন কথাটা বলে ফেললে আর ওকে ভাল লাগবে না ঝিনুকের। তাই সে গোলপার্ক ছাড়িয়ে কেয়াতলার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে, বাড়িতে গিয়ে এখন কী দেখব বলুন তো! দুই মাতাল ব্যোম হয়ে বসে আছে। মানুষ যে কেন মদ খায়!

বৈশম্পায়ন জ্বলে যাচ্ছ। জীবনে সময় বেশি নয়। মাঝে মাঝে মৃত্যু নদীর গান এসে লাগে এরিয়েলে। ঝিনুকের ফটোগ্রাফ পুরনো হয়ে এল। সময়ের ঢেউ এসে একদিন ঝিনুকের ওই সৌন্দর্য কেড়ে নিয়ে যাবে। সময় নেই। একদম সময় নেই।

এইখানে অভিজাত কেয়াতলার জনবিরল রাস্তা। অনেক কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার ঝুপসি ছায়া। কিছু মনোরম অন্ধকার। এইখানে একবার দুঃসাহসী হতে ইচ্ছে হল বৈশম্পায়নের। দু পা আগে হাঁটছে ঝিনুক। সেই অসহনীয় সুগন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে। কেন মাতলা ওই সুগন্ধ মাখো তবে? কেন সাজো? কেন 'তুমি' বলে ডাকতে বললে? কেন? জ্বলন্ত বৈশম্পায়ন জ্বরগ্রস্তের মতো আচমকা হাত বাড়াল। পরমুহূর্তে সুগন্ধী, নরম ও অসহনীয় সুন্দর ঝিনুককে টেনে আনল বুকের মধ্যে।

ঝুপসি ছায়ার নীচে, বহু দূরের অস্পষ্ট ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ঝিনুকের অবাক দুখানা চোখের দিকে মাত্র একপলক চেয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে সে। তারপরই কাণ্ডজ্ঞানহীন তার ঠোঁট নেমে যেতে থাকে ঝিনুকের ঠোঁটের দিকে।

কিন্তু কোটি কোটি মাইলের সেই দূরত্ব কী করে পেরোবে বৈশম্পায়ন ? ঝিনুক বাধা দেয়নি, চেঁচায়নি, শুধু চেয়ে ছিল। কিন্তু সেই অবাক চোখের ভিতর থেকে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ গর্জন করে ওঠে মহাসমুদ্র। বৈশম্পায়ন দেখে, করাল বিশাল আদিগন্ত এক সমুদ্রের পাকানো ঢেউ গড়িয়ে আসছে চরাচর গ্রাস করতে। বিপুল গর্জনে ফিরে যাচ্ছে আবার। ঢেউ উঠে যাচ্ছে আকাশে, নেমে যাচ্ছে পাতালে।

কোটি কোটি মাইলের দূরত্ব। কোটি কোটি মাইলের দূরত্ব। সে সেই দূরত্ব অতিক্রম করার চেষ্টা আর করে না।

ফিস ফিস করে বৈশম্পায়ন বলল, ইট উইল নট বি এ ওয়াইজ থিং টু ডু মাইডিয়ার।

ঝিনুক খুব আস্তে, প্রায় বিনা আয়াসে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। বলল, চলুন। খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে।

আবার দুপা এগিয়ে ঝিনুক। দুপা পিছনে বৈশম্পায়ন। আলোছায়াময় এক অপরূপ নির্জনতা দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে। দুজনেই চুপচাপ। বৈশম্পায়ন কোনওদিনই আর সেই ফটো তোলার কথা বলতে পারবে না ঝিনুককে। ঝিনুক কোনওদিনই আর পারবে না বৈশম্পায়নকে মনে করিয়ে দিতে।

ঠিক সময়ে বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে পেরেছিল মদন। এক পাটা কাঠের মজবুত দরজা, পেতলের হুড়কো। সহজে ভাঙবে না।

অসহ্য গরমে ভেপে আছে বাথরুম। অসহ্য গরমে ভেপে ঘেমে গলে যাচ্ছে মদন। নেশা হয়নি, কিন্তু তা বলে হুইস্কি তার কাজ করতেও ছাড়ে না তো।

বেসিনে উপুড় হয়ে গলায় আঙুল দিল মদন। হড় হড় করে টাটকা হুইস্কির স্রোত নেমে গেল নল বেয়ে। মদন শাওয়ারের চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে তলায় দাঁড়ায়। বুলেটের মতো এক ঝাঁক ঠাণ্ডা জল নেমে আসে। সম্পূর্ণ পোশাক পরা অবস্থায় মদন দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। তীব্র তীক্ষ্ণ জলকণার নির্দয় আক্রমণ সে সমস্ত শরীর দিয়ে শুষে নিতে থাকে।

দেয়ালে মস্ত একটা চওড়া আয়না মুখোমুখি। সেটার গায়ে অজস্র জলের ছিটে গিয়ে লেগে আছে। তবু অস্পষ্ট নিজের প্রতিবিম্ব তাতে দেখতে পাচ্ছে মদন। খুবই অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। লোকসভার এক মাননীয় সদস্য শাওয়ারের তলায় জামা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তার মুখটা হাঁ হয়ে আছে। কয়েকবারই চেষ্টা করে দেখল মদন, হাঁ মুখটা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা যাচ্ছে না। যতবার বন্ধ করে ততবার দুর্বল চোয়ালের খিল আলগা হয়ে মুখ হাঁ হয়ে যায়।

বসবার ঘরে চোয়াল নিয়ে একই সমস্যা দেখা দিয়েছে মাধবেরও। তবে সে যে হাঁ করে আছে তা সে বুঝতে পারছিল না। তাই সে হাঁ মুখ বন্ধ করার কোনও চেষ্টাও করেনি।

দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বিশ্বাসঘাতক জয় দাঁড়িয়ে। সন্দেহ নেই, ওরা বিশ্বাসঘাতকের বংশ। এক ভাই তার বউকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, আর এক ভাই ডেকে এনেছে তার নিয়তিকে।

নব পাপোশে তার চপ্পলজোড়া মুছে আসেনি। ধুলোটে চপ্পলের ছাপ পড়ল কার্পেটে। নব সোফার হাতলে একটা চপ্পলসুদ্ধ পা তুলে দিয়ে বলল, মাল খাচ্ছ ?

বলে নব হাত বাড়িয়ে একটা খালি বোতল তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, বাঃ ! ফরেন জিনিস ! বোতল কত করে নেয় বলো তো আজকাল।

মাধব হাতের পিঠ দিয়ে থুঁতনি ঘষতে গিয়ে টের পেল, তার মুখ হাঁ হয়ে আছে। নবর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে সে একটু কমিয়ে বলল, আশি টাকা।

নব অবশ্য মদের দাম জানতে আসেনি। বোতলটা আবার জায়গামতো রেখে সে বলল, আমাকে দেখে ওরকম চেঁচালে কেন বলো তো মাধবদা ! ভয় খেয়েছিলে ? আমাকে তোমার ভয় কেন বলো তো ? কোনওদিন তো তোমার সঙ্গে আমার কোনও খাড়াখাড়ি ছিল না।

তোর সঙ্গে আমার কোনও খাড়াখাড়ি নেই নব।

আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নব একটু হাসল, আগে ছিল না মাধবদা। কিন্তু এখন আছে।

তোর সঙ্গে খাড়াখাড়ি ! অ্যাঁ ! খুব হাসবার চেষ্টা করে মাধব। তোর সঙ্গে কীসের খাড়াখাড়ি রে ? কী যে বলিস।

মদনদা কোথায় বলো তো। লুকিয়েছে ?

মদন, ওঃ, তুই মদনকে খুঁজছিস ? মদন চলে গেছে ক-খ-ন।

মদনদার পাখা নেই মাধবদা। আর তোমার ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর দুসরা দরজাও নেই ।

তা হলে কোথায় ? বিশ্বাস না হয় খুঁজে দেখ।

খুঁজতে হবে না। বলে নব সোফা থেকে পা নামায় এবং মাধব সোফার হাতলে ওর চটির ছাপ দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলে। ঝিনুক থাকলে সোফায় দাগ দেখে এমন চেঁচাত।

নব সোফায় বসে বলল, আজ সারাদিন আরাম করে কোথাও বসিনি, জানো ?

বোস, বোস, ভাল করে বোস। একটু হুইস্কি খাবি ?

নব একটু হাসল, জেলখানায় আমাকে কী খাওয়াত জানো ?

মাধব ঢোঁক গিলল।

নব ক্রুর চোখে চেয়ে বলল, মাজাকি রাখো।

তোর সঙ্গে মাজাকি কী রে ? তুই আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু।

কে তোমার ভাইয়ের বন্ধু ?

কেন, তুই। তুই নীলুর বন্ধু না ?

তুমি সিধে কথার লোক নও মাধবদা। নীলু তোমার ভাই ছিল ? না চাকর ?

কী যে বলিস। সেই কবে ছেলেবেলায় ঘরের কাজ করত। কিন্তু আমরা ওকে কখনও চাকরের মতো ট্রিট করেছি, বল।

ফালতু বাত ছাড়ো মাধবদা। একটা সিধে কথা বলবে ? আরও তো মেলা লোক ছিল, তবু নীলুর কেসে আমাকে ফাঁসালে কেন ?

আমি কেন ফাঁসাব ? মার্ডারের সময় তুই ওর সঙ্গে ছিলি।

আলবাত ছিলাম। তাতে কী ? নীলু আমার দোস্ত ছিল, লিডার ছিল।

দুঃখের গলায় মাধব বলে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় নীলুকে বোধহয় তুই মারিসনি।

কথাটা গ্রাহ্য না করে নব ঠাণ্ডা গলায় বলে, আমি আর নীলু তোমাদের বাসার দিকে যাচ্ছিলাম। সন্ধেবেলা। বকুলতলার মোড় পার হওয়ার সময় বোম চার্জ হয়। কী হয়েছিল আমি জানি না, আমি ফেইন্ট হয়ে পড়ে যাই। এক ঘণ্টা আমার জ্ঞান ছিল না।

এখনও হাঁ করে আছে মাধব। হাতের পিঠে থুঁতনি ঘষতে গিয়ে টের পেল। সোফায় মুখোমুখি নব। বেঁটে খাটো মজবুত চেহারা, জেলের ভাতেও চেহারা ভেঙে যায়নি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ওর ঠাণ্ডা চোখ। তাকালেই গুড় গুড় করে বুক কাঁপে। মাধব বলল, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে নব, এখন কী করতে চাস তুই ? নীলুর জন্য আমাদের আর কী করার আছে বল।

যারা টিকিট কেটেছে তাদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। টিকিট না কাটলে নীলু ভি লিডার হত। আর শালা কে না জানে, লিডার হলে নীলু আর নীলু থাকত না। যেমন মদনদা নেই। যেমন কেউ নেই। অনেকক্ষণ ধরে তোমার শাওয়ারের জল পড়ে যাচ্ছে মাধবদা। বাথরুমে কে বলো তো ?

বাথরুমে জলের ধারার নীচে দাঁড়িয়ে মদনেরও মনে হচ্ছিল, কিছু একটা হারিয়ে গেছে। চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। একটা সময় ছিল যখন সে খালি হাতে যে কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারত। তার দিকে চেয়ে কেউ তাকে অমান্য করার সাহস পেত না কখনও।

আর একবার বমি করল মদন। হুইস্কির শেষ তলানিটুকুও তুলে দিল পেট থেকে। ঠাণ্ডা জলে এখন একটু শীত শীত করছে তার। তবু সে শাওয়ার বন্ধ করল না। মাথায় ডুগডুগি বাজিয়ে জল পড়ছে। জাগ্রত হচ্ছে বিবেক, আত্মসচেতনতা, প্রশ্ন, বিশ্লেষণ, একটু উল্টোপাল্টা হয়ে অবশ্য।

কিন্তু কী যে হারিয়ে গেছে তা খুব স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবে হারিয়েছে ঠিকই। নইলে এতক্ষণে সে দরজা খুলে নবর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারত।

বাথরুমের দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। কে যেন চাপা গলায় ডাকছে, মদনদা ! মদনদা !

মদন শাওয়ার বন্ধ করে দেয়, কে ?

আমি জয়।

ও। কী চাও ?

একবার বাইরে আসুন।

মদন মুখটা বিকৃত করে। তারপর বলে, আসছি।

স্নানের পর অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে মাথা। মদন বিশাল তোয়ালেটা টেনে নিয়ে মাথা আর গা মোছে। জামাকাপড় ভেজা, বাথরুমে বিকল্প কিছু পরারও নেই। মদন আবার মুখ বিকৃত করে।

তোয়ালে দিয়ে আয়নাটা মুছে সে নিজের মুখটা ভাল করে দেখে নেয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, নব পলিটিক্যাল প্রোটেকশন পেয়ে গেছে। না হলে জেল-পালানো কয়েদি প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুরে বেড়াত না, বা এত সহজে নাগাল পেত না মদনের। কারা নবকে প্রোটেকশন দিয়েছে তা আন্দাজ করাও শক্ত নয়। তবে স্বচ্ছ মাথায় মদন বুঝতে পারছে, নবর নিশ্চয়ই আরও কিছু চাওয়ার আছে। চাওয়াই তো মানুষের সবচেয়ে সহজ রন্ধ্র।

মদন তোয়ালে জড়িয়ে নেয় কোমরে। একটু ফ্যাট হচ্ছে পেটে, এই সংকটের সময়েও লক্ষ করল সে। কমাতে হবে।

বাথরুমের দরজা খুলে মদন বাইরে পা দেয়। কাজটা হয়তো ঠিক হল না। কিন্তু উপায়ও তো নেই।

ডাইনিং হলের পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বসবার ঘরে সোফায় বসে বিবর্ণ হাঁফাচ্ছে মাধব। ছাইয়ের মতো সাদা মুখ নিয়ে জয় দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। সিংগল সোফায় নব। বুকটা একটু কেঁপে উঠল মদনের। কিন্তু মুখে তার ছায়া পড়ল না। পার্লামেন্ট অ্যাড্রেস করা গম্ভীর গমগমে গলায় হাঁক দিল, পুনম ! কফি।

ডাইনিং হলের দেয়ালের একটা খাঁজে স্টিরিও সহ রেকর্ড প্লেয়ার। রেকর্ড একটা চাপানোও আছে। মদন শিস দিতে দিতে গিয়ে সেইটে চালু করল। কী গান বাজবে তা জানে না সে। ঘষটানো একটু আওয়াজের পর হঠাৎ দেবব্রতর গলা তাকে জিজ্ঞেস করল, পুরনো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়...। মদন রসিক আছে। দুহাতের ঝাপটায় লম্বা চুল থেকে জল ঝরাতে ঝরাতে সে এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায় সম্ভাব্য মৃত্যুর দিকেই। কিন্তু থমকায় না। অনেকদিন বাদে নবর সঙ্গে এই মুখোমুখি।

আঃ, বলে একটা আরামের আওয়াজ করে সোফায় বসে মদন। একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে নবর দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, খবর পেয়েছি।

নব কথা বলল না। ক্রূর কুটিল এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। (মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়...)

মদন সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, পার্টির সব খবর পেয়েছিস তো ?

কীসের খবর ? (আর মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়। আবার যদি দেখা তবে প্রাণের মাঝে আয়...)

নিত্য ঘোষ আলাদা দল করছে এখানে। তোকে প্রোটেকশন দিয়েছে, তাও জানি।

তুমি আমাকে ফাঁসিয়েছিলে, আর নিত্য ঘোষ আমাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে। তোমার আর আমার সম্পর্কটা এখন একটু অন্যরকম মদনদা।

মদন হাত তুলে একটা বিরক্তির ভঙ্গি করে নবকে চুপ করিয়ে দেয়। তারপর স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে নবর চোখে চোখ রেখে বলে, কাজ করতে চাস ? (আয় আর একটিবার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়...)

নব চেয়েই থাকে।

মৃদু হেসে মদন বলে, তোর বউকে চাকরি দিয়ে আজই দিল্লি পাঠিয়ে দিয়েছি। নইলে খামোকা পুলিশ গিয়ে মেয়েটার ওপর হুজ্জতি করত। তুইও যাবি ?

কোথায় ?

দিল্লি ?

রেকর্ড শেষ হয়ে স্টিরিওতে একটা ঘষটানির শব্দ বাজছে। বেজেই যাচ্ছে। আড়চোখে মদন লক্ষ করল কার কাছে আর্মস আছে বা নেই তা সে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পায়। নবর কাছে আছে। থাকারই কথা।

দিল্লি শব্দটা মদন আর নবর মাঝখানে লাট্টুর মতো ঘুরছে।

নবর একটা হাত জামার তলায়। কোথায় তা মদন আন্দাজে ধরে। কিন্তু ভাল করে তাকায় না।

দুজনের মাঝখানে ঘুরতে ঘুরতে 'দিল্লি' শব্দটার দম ফুরিয়ে গেল। কোমর নেতিয়ে সেটা ঢলে পড়ছে। নব শব্দটাকে ক্যাচ করবে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

বিরক্ত মুখে মদন তার গমগমে গলা আর একটু তুলে হাঁক দিল, পুনম। কফি। তারপর যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে নবর দিকে তাকায় সে। তুই কি বিশ্বাস করিস না আমি কল্পতরু ? আমি কামধেনু ? সারা ভারতবর্ষে কটা এম পি আছে খুঁজে দেখে আয়। সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে একজন আমি। আমি ঘুরিয়ে দিতে পারি তোর ভাগ্যের চাকা। মরা মানুষ জ্যান্ত করি রোজ। জ্যান্ত মানুষ মারি। আমি বললে নদী উজানে বয়, রাতের বেলা রোদ ওঠে। ক্যাচ কর নব, দিল্লি শব্দটা ক্যাচ কর। দিল্লিতে কুতুবমিনার আছে, দেখবি চল। দিল্লিতে আছে লালকেল্লা। আছে পার্লামেন্ট। আছে ইচ্ছাপূরণ। ক্যাচ কর নব।

ঘুরতে ঘুরতে দিল্লির লাট্টু যখন মাটি ছুঁই ছুঁই তখন নব হঠাৎ ক্যাচ করল, দিল্লিতে গিয়ে কী হবে ? খুব ঠাণ্ডা হিসেবি গলায় সে প্রশ্ন করে।

আর একটা সিগারেট ধরানোর সময় মদন ভাল করে লক্ষ করে, তার হাত কাঁপছে কি না। না, কাঁপছে না, এখনও সব ঠিক আছে। কেউ উঠে গিয়ে স্টিরিওটা বন্ধ করছে না। মদন—তোয়ালে পরা মদনই উঠে গিয়ে রেকর্ডটা পাল্টে দিয়ে এল। ভরাট একটা গলা গাইছে, সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুল না...বহোৎ আচ্ছা বহোৎ আচ্ছা বলে মনে মনে হাসল মদন।

সিগারেটে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে চিত হয়ে ওপরের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে মদন বলে, কী আর হবে ! এখানে থাকলেও কিছু হবে না। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসে মদন নবর দিকে তাকায়, আমি কখনও সঙ্গে আর্মস নিয়ে চলেছি, দেখেছিস ? (এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে যেন জাগে মনে ভুলো না...)

জামার তলায় নবর হাত একটু কঠিন হয়। ভ্রূর ছায়ায় তার চোখের মণি মারবেলের মতো স্থির।

মদন গলাটা বেস-এ নামিয়ে আনে। খুব আস্তের ওপর গলাটা রোল করিয়ে বলে, আমার আর্মস লাগে না। লাগে নাকি রে নব ? (সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো—আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো। আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমারি হাসির তুলনা...)

নব চুপ। কিন্তু এখনও কথাটা তোলা, দুলছে।

আর্মসের চেয়েও বেশি কিছু থাকলে আর্মসের দরকার পড়ে না। নিত্য ঘোষের কজন বডিগার্ড তা জানিস ?

ফালতু বাত ছাড়ো মদনদা। আমি জানতে চাই, নীলুকে কে মেরেছিল, আর কেন তোমরা আমাকে নীলুর কেসে ফাঁসিয়েছিলে ! ...(ভুলো না ভুলো না, ভুলো না...)

একটু ফ্যাকাশে মেরে গেল কি মুখটা, নিজের মুখ তো মানুষ এমনিতে দেখতে পায় না। মদন তাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। (এখন আমার বেলা নাহি আর..) গলাটাকে আর একটা পর্দায় বেঁধে উদাস আনমনা স্বরে বলে, দিল্লি থেকে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, এলিমিনেট নিত্য ঘোষ। বলে একটু ফাঁক দিয়ে মদন গলার স্বরটা একদম খাদে ফেলে দিয়ে বলে, দি জব ইজ ডান। যে সব ভূতপ্রেত আজ নিত্য ঘোষের হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছে কাল থেকে তারা ওর গলায় দাঁত বসাতে শুরু করবে।

দি জব ইজ পারফেক্টলি ডান।

জামার তলায় নবর হাত একটু কি শ্লথ ? কিন্তু সেদিকে সরাসরি তাকায় না মদন। পিছন দিকে হেলে আধবোজা স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে সে নিজের সিগারেটটাকে দেখে। স্বপ্নাচ্ছন্ন গলাতেই বলে, তোর প্রোটেকশন নেই। কিন্তু সেটা তুই এখনও জানিস না।

কিন্তু ওসব কথায় কান দেয় না নব। ঠাণ্ডা গলাতে জিজ্ঞেস করে, দোস্তকে কি দোস্ত খুন করে মদনদা ? বলো তুমি ! আমি কি আমার দোস্তকে মেরেছি ?

শুনতে হয় না, সব কথা শুনতে হয় না। মদনও এক পরিচ্ছন্ন অন্যমনস্কতায় কথাটাকে পাশ কাটিয়ে উদাস গলায় বলে, শ্রীমন্তও ঠিক এই ভুলটা করল। ভাবল মদনের দিন শেষ, এবার নিত্য ঘোষ আসছে। তোকেও কেউ কি তাই বুঝিয়েছে নাকি রে নব ?

তুমি আমার কথাটার জবাব দিচ্ছ না মদনদা ?

মদন স্টিরিওর স্বরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গুন গুন করে গেয়ে ওঠে, বাঁধিনু যে রাখি পরানে তোমার সে রাখি খুলো না...

পুনম কফির ট্রে নিঃশব্দে রেখে চলে যায়। মদন কফির ওপর ঝুঁকে পড়ে। এ সময়ে ড্রিংকসের মাঝখানে হঠাৎ কফির এই আকস্মিক আগমন ঘটার কথা নয় ! তবু ঘটিয়েছে মদন। ডাইভারসন, একটু ডাইভারসন দরকার। একটু ফাঁক, একটু শ্বাস ফেলার অবসর, একটু ঝটিতি চিন্তার অবকাশ।

কফি ? বলে মদন নবর দিকে ভ্রূ তুলে তাকায়।

কফি শব্দটা আবার লাট্টুর মতো ঘুরতে থাকে দুজনের মাঝখানে, ক্যাচ করবে কি নব ? (এখন আমার বেলা নাহি আর, বহিব একাকী বিরহের ভার...)

জামার তলা থেকে হাতটা বের করে আনে নব। হাতটা ফাঁকা। সেই হাতটাই কফির কাপের দিকে এগিয়ে আসে।

স্টিরিও থেকে ঘষটানির শব্দ আসছে আবার। বিকৃত মুখ করে মদন ওঠে। আর একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিয়ে আসে। আ-আ-আনন্দধারা বহিছে ভুবনে...

হাসলে নবকে ভালই দেখায়। নব হাসল। স্বরটা নিচু করে বলল, নীলুর কথাটা তুমি তুলতে চাও না, না মদনদা ?

ঠিন করে প্লেটের ওপর চামচ রাখে মদন। আঃ বলে একটা আরামের শ্বাস ছাড়ে। গুন গুন করে গায়কের সঙ্গে গায়, চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি, ক্ষুদ্র দুঃখ যত তুচ্ছ এ মানি...গাইতে গাইতে আড় চোখে নবকে এক পলক দেখে নেয়। দিল্লিতে কুতুবমিনার আছে। লালকেল্লা আছে। আছে প্রোটেকশন। কলকাতার পুলিশ নেই সেখানে। বাচ্চেলোক, দেখো দিল্লি, দিল্লি দেখো। ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ...

শূন্য কফির কাপটা নিঃশব্দে টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ায় নব, কথা দিচ্ছ মদনদা ?

দিচ্ছি।

তা হলে যাব দিল্লি ?

বিরক্তির ভঙ্গিতে হাত তুলে মদন গায়কের সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, আ-আ-আনন্দধারা বহিছে ভুবনে...

নব নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

ভিতরে গান তখনও চলছে, চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি-ই...

বাইরে কেয়াতলায় ছায়াচ্ছন্ন পথে আর একটা ছায়া হঠাৎ সবল হয়। সে দিল্লির স্বপ্ন দেখছে তখন।

লেকের কাছ বরাবর পিছন থেকে টাকমাথার মস্ত কালো চেহারাটা হঠাৎ খুব কাছে চলে আসে তার। হাতে নাঙ্গা রিভলভার। লোকটা জানে, নব হারামি বিট্রে করেছে। লোকটার নিশানা খুবই ভাল, তা ছাড়া এত কাছ থেকে নিশানা ভুল হওয়ারও নয়।

অনেক দূরে যখন গুলির শব্দ হয়, তখন মাধবের বসবার ঘরে গানের শব্দ হঠাৎ চৌদুনে উঠে যায়। আনন্দধারা চারদিকে গমগম করতে থাকে। স্টিরিওর শব্দটা বাড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখের

ঘাম মুছতে মুছতে ডাইনিং-এর পর্দার ফাঁক দিয়ে মদনের দিকে একবার তাকায় মাধব। একটু হাসে। ছেলেবেলা থেকেই সে জানে মদনের মধ্যে বাড়তি কিছু জিনিস দেওয়া আছে। সেটা ফাউ। সকলের থাকে না।

ঝিনুক যখন ঘরে ঢুকল তখন মদন মাধবের পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বসা। হাতে সোডা মেশানো পাতলা হুইস্কি। মাধব একটা ফ্রাই চিবোচ্ছে।

ঝিনি! বলে লাফিয়ে উঠল মাধব।

মদন চাপা গলায় ধমক দিল, মারব শালার পাছায় লাথ।

মাধব এক গাল হেসে বলল, দেখ মদন, দেখ! অ্যাটমসফিয়ারটা ফিরে এসেছে। আই অ্যাম ফিলিং ইট নাউ, ইট ইজ হিয়ার।

ঝিনুক ভ্রূ কুঁচকে বলল, আপনাদের ওসব গেলা হয়েছে তো। এবার দয়া করে খেতে বসুন।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে ছিল জয়। বৈশম্পায়ন এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, তোরও আসার কথা ছিল নাকি? সকালে বলিসনি তো।

জয় সম্মোহিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মদনের দিকে। একটু হেসে বলল, সে অনেক কথা।

মাধব ফ্রাইয়ের প্লেটটা মদনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, জয় আজ আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবে। বৈশম্পায়ন, ছোট করে একটা মেরে নে। স্কচ।

বৈশম্পায়ন জানে ঝিনুক কোটি কোটি মাইল দূরে। হয়তো নীহারিকার মতো দূরে। সে বসে একটা ক্লান্তির শ্বাস ছেড়ে বলে, ছোট নয়। বড় করে একটা দে।

ঝিনুক কথাটা শুনতে পেল না। কাপড় ছাড়তে শোওয়ার ঘরে ঢুকে সে দেয়ালে নীলুর ছবিটা দেখতে না পেয়ে অবাক। গেল কোথায় ছবিটা? নীলুর যে বেশি ছবি নেই! মাত্রই দু-তিনটে। চারদিকে হাতড়ে সে নীলুর ছবি খুঁজতে থাকে। কোথায় গেল ছবিটা? ছবি ছাড়া স্মৃতি ছাড়া নীলুর যে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বসবার ঘরে বৈশম্পায়ন গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক মেরে বলে, মদনা, কেমন আছিস?

মদন? মদনা যে মইরা ভ্যাটকাইয়া আছে, পাছায় পড়ছে জ্যোছনা। বলে ফিড়িক ফিড়িক হাসে মদন।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে জয় ওদের হাসি-ঠাট্টা শুনতে পাচ্ছে। খুব স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট করে কিছু শোনার মতো মানসিক অবস্থাও তার নয়। সে দেখছে একজন লিডারকে। লিডার হতে হয় তো এরকম! কী ঠাণ্ডা। কী সাহস। কী ব্যক্তিত্ব।

এই লোকটাই একদিন তাকে পালবাজার অবধি সাইকেলে ডবল ক্যারি করেছিল। এই মানুষের সঙ্গেই ছিল তার সেজদির গোপন প্রণয়। গর্বে তার বুক ভরে ওঠে।

ঘরজামাই

১
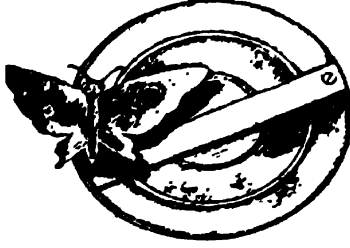
বাঁকা নদীতে তখন জল হত খুব। কুসুমপুরের ঘাটে নৌকো ভিড়ত। জষ্টিমাসে শ্বশুরবাড়িতে আসছিল বিষ্ণুপদ। কী ঠাঁটবাট। কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, তাতে সোনার বোতাম, পায়ে নিউকাট, ঘাড়ে পাকানো উড়ুনি। চোমড়ানো মোচ আর কোঁকড়া চুলের বাহার তো ছিলই। আরও ছিল, কটা রং আর পেল্লায় জোয়ান শরীর। নৌকো ঘাটে লাগল। তা কুসুমপুরের ঘাটকে ঘাট না বলে আঘাটা বলাই ভাল। খেয়া নৌকো ভিড়তে না ভিড়তেই যাত্রীরা ঝাপাঝপ জলে কাদায় নেমে পড়ে। বিষ্ণুপদ সেভাবে নামে কী করে। উঁচু পাড়ের ওপর স্বয়ং শ্বশুরমশাই ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে, পাশে তিন সম্বন্ধী, নতুন জামাইকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। বিষ্ণুপদ টলোমলো নৌকোয় বাঁ হাতে সাত সেরী একখানা রুই মাছ আর ডান হাতে ভারী স্যুটকেস নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে হেল-দোল করছে। তবে হ্যাঁ, বিষ্ণুপদ পুরুষমানুষই ছিল বটে। দেমাকও ছিল তেমনি। নৌকো থেকে জামাই নামছে, নৌকোর মাঝিই এগিয়ে এল ধরে নামাবে বলে। বিষ্ণুপদ বলল, কভি নেহি। আমি নিজেই নামব।

তা নামলও বিষ্ণুপদ। সাতসেরী মাছ আর স্যুটকেস সমেত বাঁ পা-টা কাদায় গেঁথে গিয়েছিল মাত্র, আর কিছু হয়নি। মাছ বা স্যুটকেসও হাত ছাড়া হয়নি, সেও কাদায় পড়ে কুমড়ো গড়াগড়ি যায়নি। তিন শালা দৌড়ে এসে কাদা থেকে বাঁ পা-খানা টেনে তুলল। জুতোখানা অবশ্য একটু খুঁজে বের করতে হয়েছিল।

সেই আসাটা খুব মনে আছে বিষ্ণুপদর, কারণ সেই আসাই আসা। একেবারে চূড়ান্ত আসা। শ্বশুরমশাই মাথায় ছাতা ধরলেন, দুই চাকর মাছ আর বাক্স ভাগাভাগি করে নিল। পাড়ার দু'চারজন মাতব্বরও জুটে গিয়েছিল সঙ্গে।

শ্বশুরমশাই কাকে যেন হাসি হাসি মুখে অহংকারের সঙ্গে বললেন, কেমন জামাই দেখছ?

আহা, যেন কার্তিক ঠাকুরটি। তোমার বরাত বেশ ভালই হরপ্রসন্ন।

গৌরবে বুকখানা যেন ঠেলে উঠল বিষ্ণুপদর।

বাড়িতে ঢুকতেই মেয়ে মহলে হুড়োহুড়ি, উলু, শাঁখ। সে এক এলাহি কাণ্ড। সদ্য পাঁঠা কাটা হয়েছে মস্ত উঠোনের একধারে। বাঁশে উল্টো করে ঝুলিয়ে তার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। আর এক ধারে অন্তত বিশ সেরী পাকা একখানা কাতলা মাছ বিশাল আঁশ বঁটিতে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কাটছে দু'জন মুনীশ। সারা বাড়িতে একটা উৎসবের কলরব। শুধুমাত্র একটি জামাইয়ের জন্য। পাড়ার বাচ্চারা সব ঝেঁটিয়ে এসেছে। বউরা সব দৌড়ে আসছে কাজকর্ম ফেলে।

কাছারিঘরে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়েছিল তাকে। নিচু একখানা চৌকির ওপর গদি, তাতে ধপধপে চাদর, তাকিয়া। গোলাপজল ছিটোনো হল গায়ে। দু'জন চাকর এসে বাতাস করতে লাগল। গাঁয়ের সজ্জন, মুরুব্বি সব দেখা করতে এল। সকলের চোখই সপ্রশংসিত।

সে একটা দিন গেছে। বর্ষার জল নামলে নদী আর সে জল বইতে পারে না, পাড় ভাসিয়ে দেয়। খেয়া বন্ধ হয়েছে অনেক দিন। কংক্রিটের ব্রিজ হয়ে অবধি এখন ভারী ভারী বাসের যাতায়াত। কুসুমপুর ঘেঁষেই পাকা সড়ক, তা ধরে নাকি হিল্লি-দিল্লি যাওয়া যায়।

ওই পাকা সড়ক থেকেই রিকশা করে পঁক পঁক করতে করতে বিষ্ণুপদর জামাই গোবিন্দ এল। একে কি আসা বলে। খবর নেই, বার্তা নেই, পাতলুনের ওপর হাওয়াই শার্ট চাপিয়ে চটি ফটফটিয়ে এসে দাঁত কেলিয়ে হাজির হলেই হল।

নতুন জামাই কত ভারভাত্তিক হবে, তা নয়। এ যেন এক ফচকে ছোঁড়া ফস্টিনস্টি করতে এসেছে। তা হচ্ছেও ফস্টিনস্টি। দাওয়ায় মামাতো শালিরা সব ঘিরে ধরেছে, হাহা হি হি হচ্ছে খুব। চারদিকে

গুরুজন, তোয়াক্কাই নেই। কিন্তু দুঃখ অন্য জায়গায়। জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ে মুক্তির ভাব হচ্ছে না, কিছু একটায় আটকাচ্ছে। মেয়েকে বিয়ের পর থেকেই ফেলে রেখেছে বাপের বাড়িতে। খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার।

কাঁঠাল গাছের ছায়ায় সাতকড়ি পুরনো কাঠ জুড়ে একখানা চৌকি বানাচ্ছে। গুষ্টি বাড়ছে, জিনিসও লাগছে। গাছের ছায়ায় একখানা মোড়া পেতে বসল বিষ্ণুপদ।

সাতকড়ির দাঁতে ধরা একখানা বিড়ি। তাতে অবশ্য আগুন নেই। বিড়িখানা দাঁতে ধরে রেখেই সাতকড়ি বলে, মেয়েখানা দিব্যি পার করেছ জামাইদা। এখন আমার কপালে কী আছে তাই ভাবছি। তিন তিনটে মেয়ে বিয়োলো বউ। সবই কপাল।

সাতকড়ির দুঃখটা বেশ করে অনুধাবন করে নেয় বিষ্ণুপদ। দোষটা যে কার তা এই বয়সেও সে ঠিক বুঝতে পারে বলে মনে হয় না। কিছু কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে তা শেষ অবধি বুঝ-সমঝের মধ্যেই আসে না। কপাল বললে ল্যাটা চুকে যায় বটে, কিন্তু তাতে মনটা কেমন সায় দেয় না।

সাতকড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কেমন কার্তিকের মতো জামাই।

বিষ্ণুপদর একটু আঁতে লাগে। সবাই কার্তিক হলে তো কার্তিকের গাদি লেগে যাবে। সে তাচ্ছিল্যভরে বলে, হুঁ, কার্তিক! না কেলে কার্তিক!

সাতকড়ি র‍্যাঁদা চালাতে চালাতে বলে, রং ধুয়ে কি জল খাবে জামাইদা? নাটাগড়ে তোমার জামাইয়ের মোটর গ্যারাজখানা দেখেছ? দিনরাত আট দশজন লোক খাটছে। বাপ আর চার ভাই মিলে মাস গেলে অন্তত পাঁচ ছ হাজার টাকা কামাচ্ছে। তার ওপর চাষ-বাস, মুদিখানা। এ যদি কার্তিক না হয় তা হলে কার্তিক আর কাকে বলে শুনি!

তা বলে অমন পাতলুন-পরা ফচকে জামাই আমার পছন্দ নয় বাপু। চেহারা দেখ, পোশাক দেখ, হাবভাব দেখ, জামাই বলে মনে হয়? একটু ভারভাত্তিক, গুরুগম্ভীর না হলে মানায়! আমরাও তো জামাই ছিলুম, না কি? সহবত কিছু কম দেখেছিস?

সাতকড়ি পুরনো লোক। হাতের কাজ থামিয়ে সে বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে বলে, পুরনো কথা তুললেই ফ্যাসাদ, বুঝলে জামাইদা? ওসব নিয়ে ভেবো না। মেয়ে খেয়ে-পরে সুখে থাকলেই হল।

বিষ্ণুপদ একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। তার জামাই গোবিন্দ একটু তেরিয়া গোছের লোক। নিতান্ত দায়ে না পড়লে পেন্নাম টেন্নাম করে না, বিশেষ পাত্তাও দেয় না শ্বশুরকে। কানাঘুঁষো শুনেছে, শ্বশুর ঘরজামাই ছিল বলে গোবিন্দ একটু নাক সিঁটকোয়। বিপদ হল নাটাগড় থেকে তার নিজের বাড়ি গ্যাঁড়াপোতা বিশেষ দূরে নয়, পাঁচ ছ মাইলের মধ্যে। আর গ্যাঁড়াপোতায় গোবিন্দর এক দিদির বিয়ে হয়েছে। যাতায়াতও আছে। জামাই একদিন ফস করে বলেও বসল, আপনার মা ঠাকরোন যে এখনও বেঁচে আছেন সে কথা জানেন তো!

বড্ডই স্পষ্ট খোঁচা। কথাটা ঠিক যে, নিজের বাড়ির পাট একরকম চুকিয়েই দিয়েছিল বিষ্ণুপদ, বাপ আর ভাইদের সঙ্গে সদ্ভাবও ছিল না। বিয়ের পর এ যাবৎ দু'চার বার গেছে বটে, কিন্তু সে না যাওয়ারই সামিল। গত দশ বারো বছরের মধ্যে আর ওমুখো হয়নি। কিন্তু তাতে দোষের কী হল সেইটেই বুঝে উঠতে পারে না বিষ্ণুপদ। সেই কারণেই কি জামাই তাকে অপছন্দ করে?

সাতকড়ি বিড়িটা খেয়ে বলে, আগে কত শেয়াল ডাকত সাঁঝবেলা থেকে, এখন একটারও ডাক শোনো?

বিষ্ণুপদ একটু অবাক হয়ে বলে, শেয়াল! হঠাৎ শেয়ালের কথা ওঠে কেন রে?

বলছিলুম, পুরনো দিনের কথা তুলে লাভ নেই। শেয়াল নেই, কুসুমপুরের ঘাট নেই, বাঁকা নদী মজে এল, পাকা পুল হল, শেতলা পুজোয় মাইক বাজা শুরু হল, ফি শনিবার বাজারে ভি ডি ও বসছে। এত সব হল, আর জামাই পাতলুন পরলেই কি কল্কি অবতার নেমে এল নাকি?

কিন্তু পুরনো দিনের কথা বিষ্ণুপদই বা ভোলে কী করে? গ্যাঁড়াপোতায় নিজের বাড়িতে তার কদর ছিল না। তিনটে ভাই আর তিনটে বোন নিয়ে সংসার। বাবার অবস্থা বেহাল ছিলই। তার ওপর বিষ্ণুপদ ছিল একটু পালোয়ান গোছের। ডন-বৈঠক, মুগুর ভাঁজা, ফুটবল, সাঁতার এইসব দিকে মন। অনেক সময় হয়, এক মায়ের পেটে জন্মেও সকলে সমান আদর পায় না। বিষ্ণুপদ ছিল হেলাফেলার ছেলে।

স্পষ্টই বুঝত এ বাড়িতে তার কদর নেই। কদর জিনিসটা সবাই চায়, নিতান্ত ন্যালাক্ষ্যাপারও কদরের লোভ থাকে। দু' বেলা দুটো ভাত আর মেলা গঞ্জনা জুটত। কাজ-টাজের চেষ্টা নেই, দুটো পয়সা ঘরে আনার মুরোদ নেই, বোনগুলো ধুমসো হয়ে উঠছে—সেদিকে তার খেয়াল নেই। নানা গঞ্জনায় জীবনটা ভারী তেতো হয়ে যাচ্ছিল। গ্যাঁড়াপোতার বটতলাই ছিল তখন সারা দিনমানের ঠেক। গাঁয়ের আরও কয়েকটা ছেলে এসে জুটত। পতিতোদ্ধারের জন্য মহাকালী ক্লাব খুলেছিল তারা। মড়া পোড়ানো থেকে বন্যাত্রাণ, কাঙালি ভোজন বারোয়ারি পুজো, মারপিট, যাত্রা থিয়েটার কথকতা সবই ছিল তাদের মহা মহা কাজ। বাইরে বাইরে বেশ কাটত। ঘরে এলেই মেঘলা, গুমোট, মুখভার, কথার খোঁচা, বাপান্ত। সেই সময় গ্যাঁড়াপোতার পাশেই কালীতলা গাঁয়ে এক শ্রাদ্ধবাসরেই তাকে দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেল ভাবী শ্বশুর হরপ্রসন্নর। টাকাওলা লোক। পাঁচ গাঁয়ের লোক এক ডাকে চেনে। চারটে ছেলের পর একটা মেয়ে। বাপের খুব আদরের। হরপ্রসন্ন তখন ঘরজামাই খুঁজছেন। শ্রাদ্ধবাড়িতেই ডেকে কাছে বসিয়ে মিষ্টি মিষ্টি করে সব হাঁড়ির খবর নিলেন। গরিব ঘরের ছেলেই খুঁজছিলেন, নইলে ঘরজামাই হতে রাজি হবে কেন? বিয়ের গন্ধে বিষ্ণুপদও চনমন করে উঠল। এতকাল ও কথাটা ভাববার সাহসটুকু অবধি হয়নি। বিয়ে যে তার কোনওকালে হবে এমনটি সে কারও মুখে শোনেওনি কোনও কালে। যেই কথাটা উঠল অমনি বিষ্ণুপদর ভেতরে তুফান বয়ে যেতে লাগল। পারলে আগাম এসে শ্বশুরবাড়িতে হামলে পড়ে। সেই বিয়ে নিয়েও কেচ্ছা কম হয়নি। প্রথমেই বাপ বেঁকে বসল। মাও নানা কথা কইতে শুরু করল। ঘরজামাই যখন নিতে চাইছে তখন মেয়ে নিশ্চয়ই খুঁতো। তা ছাড়া এ-বংশের কেউ কখনও ঘরজামাই থাকেনি, ওটা বড় লজ্জার ব্যাপার।

বিষ্ণুপদ দেখল তার সুমুখে ঘোর বিপদ। বিয়ে বুঝি কেঁচে যায়। চিরটা জীবন তা হলে গ্যাঁড়াপোতায় খুঁটোয় বাঁধা থেকে জীবনটা জলাঞ্জলি দিতে হবে। এ সুযোগ আর কি আসবে জীবনে? সে তার মাকে বোঝাল, ধরো, আমি তোমার আর একটা মেয়েই, তাকে বিয়ে দিয়ে বেড়াল-পার করছ। এর বেশি তো আর কিছু নয়।

ঘরজামাই থাকা মানে জানিস? শ্বশুরবাড়িতে মাথা উঁচু করে থাকতে পারবি ভেবেছিস? তারা তোকে দিয়ে চাকরের অধম খাটাবে। দিনরাত বউয়ের মন জুগিয়ে চলতে হবে। এ যে বংশের মুখে চুনকালি দেওয়া।

বাপের সঙ্গে কথা চলে না। তবে বাপ সবই শুনল, শুনে বলল, কুলাঙ্গার, বিয়ের বাই চাপলে মানুষ একেবারে গাধা হয়ে যায়।

তলিয়ে ভাবলে গাধার চেয়ে ভালই বা কী ছিল বিষ্ণুপদ? দু' বেলা দু' মুঠো খাওয়া আর অচ্ছেদ্দায় দেওয়া লজ্জা নিবারণের কাপড় জামা, এ ছাড়া আর কীসের আশা ছিল বাপ মায়ের কাছে। গাধা বলায় তাই দুঃখ হল না বিষ্ণুপদর। সে মাকে আড়ালে বলল, ধরো, তোমার একটা ছেলে বখেই গেছে বা মরেই গেছে। গাধা গোরু যাই হই আমার আখের আমাকে দেখতে দাও তোমরা। গলার দড়িটা খুলে দাও শুধু।

হরপ্রসন্ন—অর্থাৎ তার ভাবী শ্বশুর লোক মারফত খোঁজ নিচ্ছিল। বিষ্ণুপদর বাবা সেই লোকদের কড়া কড়া কথা শোনাতে লাগল। তা একদিন জোঁকের মুখে একেবারে এক খাবলা নুন পড়ে গেল। হরপ্রসন্নর এক অমায়িক ভাই দুর্গাপ্রসন্ন এসে বিষ্ণুপদর বাপকে কড়কড়ে হাজার টাকা গুনে দিয়ে বলল, বরপণ বাবদ আগাম পাঠিয়ে দিলেন দাদা। বিয়ের আসরে আরও হাজার।

হরপ্রসন্ন মানুষকে প্রসন্ন করতে পারতেন বটে। বাপের মুখে খিল পড়ল, মুখখানাও হাসি-হাসি হয়ে উঠল। মাও আর রা কাড়ে না। শুধু চোখের জল মুছে একদিন বলল, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কি মাকে মনে থাকবে রে বাপ? ওরা বড় মানুষ, টাকায় ভুলিয়ে দেবে।

কথাটা ভাঙল না বিষ্ণুপদ। ভাঙলে মা দুঃখ পাবে। সে আসলে ভুলতেই চায়। ভাবী শ্বশুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মাথাটা নুয়ে আসছিল বারবার।

বাবা আর এক ভাই গিয়ে পাত্রীও দেখে এসে বলল, দেখনসই কিন্তু নয়। তবে গাঁ-ঘরে চলে যাবে। এ বাড়িতে তো আর থাকতে আসবে না, আমি মত দিয়েই এসেছি।

পাত্রী কেমন তা বিষ্ণুপদ জানত না। কথাটা তার খেয়ালই হয়নি। লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি

পাওয়াটাই তখন বড় কথা। পাত্রী সুন্দরী না বান্দরী তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছুই ছিল না। গ্যাঁড়াপোতা ছেড়ে অন্য জায়গায় যাচ্ছে এই ঢের।

আর বিয়েটাও হল দেখার মতো। বাদ্যি বাজনা ঠাট ঠমক জাঁকজমকে পাত্রী চাপা পড়ে গেল কোথায়। শুভদৃষ্টির সময় এক ঝলক দেখে কিছু খারাপ লাগল না বিষ্ণুপদর। কম বয়সেব কিন্তু চটক আছে একটা। পাত্রী নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো অবস্থাও তখন তার নয়। তাকে নিয়েই তখন হই-চই। চারদিকের লোক জামাইয়ের চেহারা দেখে ধন্য ধন্য করছে। এতদিন পর জীবনে প্রথম একটা কাজের কাজ করেছে বলে আনন্দে দেমাকে বুঁদ হয়ে গেল বিষ্ণুপদ।

বিচক্ষণ হরপ্রসন্ন গোপনে নাকি বউ-ভাতের খরচাটাও জুগিয়েছিল। গ্যাঁড়াপোতায় সেই প্রথম ও শেষবার আসা বিষ্ণুপদর বউ পাপিয়ার। মোট বোধহয় দিন সাতেক ছিল। ওই সাতদিনে তাকে যথেষ্ট উত্যক্ত করেছিল বিষ্ণুপদর হিংসুটে বোনেরা। মাও খোঁচানো কথাবার্তা বলত। বড়লোকের মেয়ে বলে কথা। তার ওপর বাড়ির ছেলেকে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।

অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়িতে পাপিয়াকে রেখে গ্যাঁড়াপোতায় ফিরল বিষ্ণুপদ। তখন তিনটে মাস বড় জ্বালা যন্ত্রণায় কেটেছে। কেউ কথা শোনাতে ছাড়েনি। গঞ্জনা একেবারে মাত্রা ছাড়া হয়ে উঠেছিল। কথা ছিল জামাইষষ্ঠীতে পাকাপাকিভাবে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে বিষ্ণুপদ। সুতরাং বাড়ির লোক ওই তিনমাস সুদে আসলে উশুল করে নিল। বিষ্ণুপদ কারও কথার জবাব দিল না, ঝগড়া কাজিয়া করল না। তার সামনে সুখের ভবিষ্যৎ। কটা দিন একটু সয়ে নিল দাঁত চেপে। শ্বশুরবাড়িতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তোয়াজে আদরে একেবারে ভাসাভাসি কাণ্ড। চাইবার আগেই জিনিস এসে যায়। ডাইনে বাঁয়ে চাকরবাকব। লটারি জিতলেও ঠিক এরকমধারা হয় না।

তবে সব কিছুর মূলেই ছিলেন শ্বশুর হবপ্রসন্ন। কী চোখেই যে দেখেছিলেন বিষ্ণুপদকে। সব জায়গায় সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। কাজকারবার, চাষবাস. মামলা মোকদ্দমা, ধানকল-আটাচাকি, গাঁয়ের মোড়ল মুরুব্বি থেকে শুরু করে সরকারি আমলাদের সঙ্গেও ভাব-ভালবাসা ছিল তাঁর।

সম্বন্ধীরা কি আর ভাল চোখে দেখছিল এইসব বাড়াবাড়ি? চার সম্বন্ধীই বিয়ে কবে সংসারী। ছেলেপুলে আছে। ভবিষ্যৎ আছে। তারা কি বিপদেব গন্ধ পায়নি এর মধ্যে? খুবই পেয়েছিল এবং পেছন থেকে তাদেব বউদেবও উস্কানি ছিল, আরও উসকে দিচ্ছিল বউদের বাপের বাড়ির লোকজন।

বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুবতেই অশান্তি হচ্ছিল বেশ। কিন্তু হরপ্রসন্নব মাথায় গোবর ছিল না। তিনি আগেভাগেই জানতেন, এরকমধারা হবেই। মেয়ের নামে আলাদা বাড়ি, কিছু জমি আর একখানা কাঠচেরাইয়ের কল করে রেখেছিলেন। ছেলেদের ডেকে একদিন তিনি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়সম্পত্তির বাঁটোয়ারা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ বাবারা, কোনও অবিচার যদি করে থাকি তো এইবেলা বলে ফেল। তা হলে গাঁয়ের পাঁচটা লোক সালিশে বসুক এসে। আমার মনে হয় সেটা ভাল দেখাবে না।

ছেলেরা একটু গাঁইগুঁই করলেও শেষ অবধি মেনে নিল। তারা কিছু কম পায়নি।

হরপ্রসন্ন তাঁর বিশাল বাস্তুজমি পাঁচভাগ করে দেয়াল তুলে দিলেন। আগুপিছু এবং পাশাপাশি পাঁচখানা বাড়ি হল। নিজের নামে বড় বাড়িখানা শুধু রইল। বেঁচে থাকতেই সংসারের শান্তির জন্য ছেলেদের পৃথগন্ন করে দিলেন। শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে থেকে থেকেই সংসারের চোখ ফুটল বিষ্ণুপদর। বিষয়বুদ্ধি হল। কেনাবেচা, আদায়-উশুল লোক চরিত্র সব শিখল। শ্বশুরই ছিল তার গুরু। ফচকে নিতাই বলত, বাপু হে, তুমি দেখছি বিয়ে বসেছ তোমার শ্বশুরের সঙ্গেই।

তবে হ্যাঁ, সবটাই এমন সুখের বৃত্তান্ত নয়। তার বউ পাপিয়া বড় অশান্তি করেছে। কথায় কথায় কান্না, আবদার, রাগ। সে ঘরজামাই থাকুক এটা পাপিয়া একদম চাইত না। এমন কথাও বলত, তুমি তো আমার বাবার চাকর। বিষ্ণুপদ মধুর সঙ্গে এইসব ছোটখাটো হুল হজম করে গেছে। কারণ সত্যি কথাটা হল, বউকে নয়, শ্বশুরকে খুশি করতেই প্রাণপণ চেষ্টা করত বিষ্ণুপদ। সে বুঝত এই একটা লোকের কাছে তার কদর আছে।

প্রথম প্রথম যতটা খাতির-যত্ন ছিল তা কালধর্মে কমে গিয়েছিল। তা যাক, এক জায়গায় স্থায়ীভাবে থিতু হয়েছিল সে। সেইটেই বা কম কী? জমিজমা, চালু কারবার, দিব্যি বাড়ি, ছেলেপুলেও হতে লাগল। প্রথমটায় মেয়ে, তারপর দুই ছেলে।

সেই মেয়েরই জামাই ওই গোবিন্দ। শ্বশুর মরার পরই বিয়েটা হয়েছে। বড় সম্বন্ধী পরিতোষই এই বিয়ের প্রস্তাবটা নিয়ে আসে। পাল্টি ঘর, অপছন্দের কিছু ছিল না। বিয়ে হয়েও গেল। তবে জামাই কেমন যেন একটু ফণা-তোলা সাপের মতো। একটুতেই কেমন যেন রোখা-চোখা ভাব দেখায়।

তাকে ভাবিত দেখে সাতকড়ি এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বলল, তোমার বরাত হল সোনার ফ্রেমে বাঁধানো। নিজের বিয়ে যেমন বোমা ফাটিয়ে করলে, মেয়েটারও তেমনি।

পোলের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকান্ত ঝুঁকে নদী দেখছিল। ব্যাটারা পোলটা বানিয়েছে ভাল। দিব্যি তকতকে জায়গা। বর্ষাবাদল না থাকলে শুয়ে ঘুমোনো যায়। বসে ভাত খাওয়া যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে পোলের তলায় সেঁধিয়ে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকলেই হল। পোলটা হয়ে ইস্তক কৃষ্ণকান্ত এখানেই থানা গেড়েছে। বড় পছন্দের জায়গা। কত উঁচু! এখানে দাঁড়ালে কতদূর অবধি দেখা যায়, আর হাওয়া-বাতাসও খেলে।

সবাই জানে না, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত খবর রাখে, পোল বাঁধতে তিনটে নরবলি হয়েছিল, বাজঠাকুরকে পাঁচখানা পাঁঠা মানত করতে হয়েছিল। তাতেও হয়নি। রোজ ব্যাটারা থাম বানাত আর নিশুত রাতে হারুয়া-ভূত এসে থাম নড়িয়ে গোড়া আলগা করে রেখে যেত। শেষে বাতাসপুরের শ্মশান থেকে হাতে-পায়ে ধরে নকুড় তান্ত্রিককে এনে ভূত বশ করতে হয়েছিল।

কিন্তু এত করেও লাভটা হল লবডঙ্কা। পোল বানানো হল বলে বাঁকা নদী রাগ করে সেই যে শুকোনো শুরু করল, এখন তো লোপাট হওয়ার জোগাড়। শালারা নদীকে গয়না পরাতে গিয়েছিল। বেহদ্দ বেকুব না হলে মা মুক্তকেশীকে কেউ গয়না পরায়? বাঁকা নদীর জলে চান করলে আগে পুণ্যি হত। কৃষ্ণকান্ত রোজ নিশুত রাতে পোলের তলায় শুয়ে শুনতে পায়, হারুয়া-ভূত নদীর দু ধারে দুই ঠ্যাং ফাঁক করে রেখে ছ্যাড়ছ্যাড় করে নদীতে পেচ্ছাপ করছে। এখন খা শালারা ভূতের মুত।

কৃষ্ণকান্ত রেলিং থেকে ঝুঁকে নদী দেখছে আর আপনমনে হাসছে। নদীর যত বৃত্তান্ত তা তার মতো আর কেউ জানে না। নন্দবাবুর মেয়ে শেফালি পোল থেকে লাফিয়ে পড়ে ম'লো—এ বৃত্তান্ত সবাই জানে। বিষ্ণুপদর ছেলে জ্ঞানের সঙ্গে তার একটু ইয়ে ছিল। টের পেয়ে নন্দবাবু খুব ঠ্যাঙায়। অপমানে শেফালি এসে ঝাঁপ খেল। কিন্তু কেউ জানে না, বাঁকা নদী কিছুদিন হল খুব ডাকাডাকি করছিল শেফালিকে। পরীক্ষায় ফেল হয়ে বিশ্বেসদের ফটিকও ঝাঁপ খেল। সে কি এমনি এমনি? বাঁকা রোজ সব কচিকাঁচা ছেলেপুলেকে ডাকছে। একটি দুটি করে এসে ঝাঁপ খাবে আর মরবে।

তারপর যে কাণ্ডখানা হয় সেটাও কেউ টের পায় না। কৃষ্ণকান্ত পায়। মরা মেয়ে বা ছেলের জন্য মা-বাপেরা যখন কান্নাকাটি করছে তখন শেফালি দিব্যি বাঁকা নদীর বালিয়াড়িতে দাগ কেটে এক্কাদোক্কা খেলে আর ছুটোছুটি করে বেড়ায় মনের আনন্দে। ফটিকই বা কোন দুঃখে আছে? হারুয়াভূতের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে বটফল-নাটাফল পাড়ে আর খায়। ভরদুপুরে পোলের তলায় ছায়ায় শুয়ে শুয়ে আধবোজা চোখে সব দেখতে পায় কৃষ্ণকান্ত। মাঝে মাঝে হরপ্রসন্নবাবু এসে পোলটার দিকে চেয়ে খুব রাগারাগি করেন, এত জল ছিল নদীতে, সব গেল কোথায়? অ্যাঁ! গেল কোথায় অত জল? এই বলে ইয়া বড় বড় ঢ্যালা তুলে পোলের গায়ে ভটাভট ছুঁড়ে মারেন। ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা।

পোলটাকে ঘুরেফিরে সারাদিনই দেখে কৃষ্ণকান্ত। ঝাঁ ঝাঁ করে যখন বাস আর লরি পার হয় তখন শব্দটা যা ওঠে তাতে বুকটা ঝনঝন করতে থাকে। পোলের তলায় বসে থাকলে মনে হয়, এই বুঝি সব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। আবার যখন বাতাস বয় তখন পোলটার গায়ে বাতাসের ঘষটানির শব্দটা কেমন যেন বড় বড় শ্বাসের আওয়াজ তোলে।

রেলিংটা বেশ চওড়া। উঠে হাঁটাহাঁটি করা যায়। মজাও খুব। কৃষ্ণকান্ত উঠে পড়ল রেলিং-এর ওপর। তারপর হাঁটতে লাগল। বাঁ ধারে বাঁকা নদীর খাদ, ডানধারে পাকা রাস্তা। বেশ লাগছে তার।

পোলের মুখে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে চাকা বদলাচ্ছে। ক্লিনারটা চেঁচিয়ে বলে, এই শালা পাগল, পড়ে যাবি যে!

কৃষ্ণকান্ত খুব হাসে, পড়ব মানে! পড়লেই হল! এ হল আমার পোল। সেঁটে ধরে রাখে।

এদিককার লোকগুলো সুবিধের নয়। বড্ড লাথিঝাঁটার ঝোঁক এদের। যতদিন হরপ্রসন্ন বেঁচে ছিলেন ততদিন তেমন চিন্তা ছিল না কৃষ্ণকান্তর। চণ্ডীমণ্ডপে পড়ে থাকত। হরপ্রসন্ন মরার পর চণ্ডীমণ্ডপ গেল ঘরজামাই বিষ্ণুপদর ভাগে। সে ব্যাটা বজ্জাতের ধাড়ি। প্রথমটায় চোখ রাঙিয়ে, পরে মেরে ধরে তাড়াল। গিয়ে উঠেছিল হাটখোলার এক চালার নীচে। চৌকিদার শিবু এসে একদিন বলল, প্রতি রাতের জন্য চার আনা করে পয়সা লাগবে। তা সেখান থেকেও উঠতে হল। কিন্তু শালারা বুঝতে চায় না যে, মানুষের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা চাই। এই পোলটা হয়ে ইস্তক তার একখানা ঘরবাড়ি হয়েছে। পোলের তলায় ওপরে যেমন খুশি শোয়, বসে থাকে, ঘুরে বেড়ায়, কারও কিছু বলার নেই।

একটা বাস ঢুকছে কুসুমপুরে। জানলা দিয়ে লোকগুলো হাঁ করে তাকে দেখছে। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, গেল শালা মায়ের ভোগে।

না, অত সহজে যাচ্ছে না কৃষ্ণকান্ত। পোলের রেলিং ধরে সে রোজ হাঁটাহাঁটি করে। সে বুঝতে পারে, এ হল তার নিজের পোল। সরকার বাহাদুর তার জন্যই বেঁধে দিয়েছেন। এ হল তার তেতলা বাড়ি। পুব ধারের প্রান্তে এসে আবার ঘুরে পশ্চিমধারে এগোতে থাকে সে।

ছাতা মাথায় গুটিগুটি হেঁটে একটা লোক আসছিল। তাকে দেখে একটা লাফ মেরে পোলের শানের ওপর নামল কৃষ্ণকান্ত।

ঘরজামাই যে, একখানা বিড়ি ছাড়ো তো!

লোকটা দাঁড়াল। তার দিকে চাইল। তারপর বলল, পোলটা দিব্যি বাপের সম্পত্তি পেয়ে গেছিস দেখছি।

বাপের বাপ বড় বাপ। এ হল সরকার বাহাদুরের জিনিস। দেবে নাকি একখানা বিড়ি?

বিড়ি? তোর সাহস তো কম নয় দেখছি!

এতক্ষণ রেলিংয়ের ওপর খেলা দেখালুম যে! সারা দিনমান দেখাই। তবু কোনও শালা কিছু দেয় না, জানো?

কস্মিনকালে আমাকে বিড়ি সিগারেট পান খেতে দেখেছিস?

কৃষ্ণকান্ত একটু অবাক হয়ে বলে, বিড়ি খাও না? খাও না কেন বলো তো ঘরজামাই! বিড়ি তো খুব ভাল জিনিস।

ঘরজামাই! বলে খেঁকিয়ে ওঠে বিষ্ণুপদ, ঘরজামাইটা আবার কী রে? তোর তো দেখছি বেশ মুখ হয়েছে!

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীর হয়ে বলে, খারাপটা কী বললুম শুনি! তুমি হরপ্রসন্নবাবুর ঘরজামাই হয়ে এসেছিলে না এ গাঁয়ে?

তাতে তোর বাপের কী? বলে, ছাতাটা ফটাস করে বন্ধ করে বিষ্ণুপদ। লক্ষণটা ভাল নয়। ছাতাটা যেমন জুত করে ধরেছে, পেটাতে পারে।

না এই বলছিলুম আর কী। কৃষ্ণকান্ত দু পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, বিড়ি না দাও দশটা বিশটা পয়সাও তো দিতে পারো। সরকার বাহাদুর এত বড় পোলটা আমার জন্য বানিয়ে দিতে পারলেন, আর তোমরা এটুকু পারো না?

এঃ, সরকার বাহাদুর তোনার জন্য পোল বানিয়েছেন! তোর বাপের পোল!

কৃষ্ণকান্ত বুঝল, হবে না। সব সময়ে হয় না। মাঝে মাঝে আবার হয়েও যায়। লোকটাকে ছেড়ে কৃষ্ণকান্ত পোলের নীচে নেমে এসে ছায়ায় বসল। বেশ জুত করে বসল। মাথার ওপর ছাদ, চিন্তা কীসের?

একটা বিড়ি হলেও হত, কিন্তু না হলেও তেমন কষ্ট নেই। তার মাথায় হঠাৎ একটা কথা এল। আচ্ছা ঘরজামাই থাকলে কেমন হয়? ঘরজামাই থাকা তো খারাপ কিছু নয়। বিষ্ণুপদ কিছু খারাপ আছে কি? দিব্যি আছে। এতদিন কথাটা খেয়াল হয়নি তো তার! এদিককার লোকগুলোও যেন কেমনধারা, একবার ডেকে তো বলতে পারে, ওরে কেষ্টপাগলা, ঘরজামাই থাকবি? কেউ বলেওনি, তাই কৃষ্ণকান্তর খেয়াল হয়নি।

ঘরজামাই থাকার মেলা সুবিধে। কাপড়জামা জুতো ছাতা সব বিনি মাগনা পাওয়া যাবে। চারদিকে দেয়ালওলা ঘর হবে। দু বেলা দিব্যি খ্যাঁট। কাজকর্মও নেই। বগল বাজিয়ে মজাসে থেকে যাও। বিষ্ণুপদ যেমন আছে।

ইস, কথাটা আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল। কিন্তু আর দেরি করাটাও ঠিক নয়। এইবার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলা দরকার। কৃষ্ণকান্ত উঠে পড়ল।

রাস্তায় নামতেই কে যেন হাঁক মারল, ওরে কেষ্টা, বলি হন হন করে চললি কোথা?

দিল পিছু ডেকে। কৃষ্ণকান্ত ফিরে দেখে সাতকড়ি। লোকটা বড় ভাল নয়। একখানা জলচৌকি করে দিতে বলেছিল কৃষ্ণকান্ত, বহুদিন হল ঘোরাচ্ছে। জলচৌকি হলে কৃষ্ণকান্তের একটু সুবিধে হয়। পোলের তলায় উবু হয়ে বসে থেকে থেকে হাঁটু দুটোয় ব্যথা। জলচৌকি হলে দিব্যি গা ছেড়ে বসে আরাম করা যেত। তা সাতকড়ি কখনও না করেনি। শুধু বলে রেখেছে, বিশ্বাসবাবুদের বড় কাঁঠালগাছটা কাটা হলেই সেই কাঠ দিয়ে বানিয়ে দেবে। বিশ্বাসবাবুদের বড় কাঁঠালগাছটা প্রায়ই গিয়ে দেখে আসে কৃষ্ণকান্ত। বে-আক্কেলে গাছটা মরেও না, পড়েও না। এবারও রাজ্যের কাঁঠাল ফলেছে। তবে সে নজর রাখছে।

সাতকড়ি সঙ্গ ধরে বলে, বড় ব্যস্ত দেখছি যে!

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীর হয়ে বলে, কাজে যাচ্ছি।

এ গাঁয়ে দেখলাম, একমাত্র তুই-ই কাজের লোক। সারাক্ষণ কিছু না কিছু করছিস।

কৃষ্ণকান্তর হঠাৎ মনে পড়ল, সাতকড়ির তিনটে না চারটে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে। পাত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে কবে থেকে। কৃষ্ণকান্ত গলাটা একটু নামিয়ে বলল, সাতকড়িদাদা, আমাকে ঘরজামাই রাখবে?

সাতকড়ি একটু থমকাল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বলে, ঘরজামাই থাকতে চাস নাকি?

আজ ঠিক করে ফেললাম ঘরজামাই হয়েই থাকা ভাল। চারদিকে দেয়াল, মাথার ওপর ছাদ, দুবেলা খাওয়া, সকাল বিকেল চা। কী বলো! বিষ্ণুপদ কেমন আরামে আছে দেখছ তো।

সাতকড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর মতো জামাই পেলে কে না লুফে নেবে বল! আমিও নিতুম। তবে কি না আমরা হচ্ছি গরিব মানুষ। নিজেদেরই ঘরে ঠাঁই হয় না, তো জামাইকে রাখব কোথায় বল।

আমি বারান্দাতেও পড়ে থাকতে রাজি।

তুই তো রাজিই, কিন্তু জিনিসটা ভাল দেখায় না। শত হলেও জামাই বলে কথা, তার খাতিরই আলাদা। তার ওপর ধর আমাদের খাওয়াদাওয়াও তো শাক জুটলে অন্ন জোটে না। ঘরজামাই যদি থাকতে চাস তো তারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কে যেন বলছিল সেদিন, ঠিক মনে পড়ছে না, ভাল একটা পাত্র পেলে খবর দিতে। ঘরজামাই রাখবে।

কে বলো তো!

একটু বাড়ি-বাড়ি ঘুরে দেখ তো। যার দরকার সে ঠিকই বেরিয়ে এসে তোকে ধরবে।

মা কালীর দিব্যি কেটে বলছ তো!

ওরে হ্যাঁ রে হ্যাঁ। ফিরিওলারা যেমন হাঁক মেরে মেরে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে তেমনি হাঁক মেরে মেরে গাঁটা একটা চক্কর দিয়ে আয়। সবাইকে জানান দিতে হবে তো। একটু বেশ গলা ছেড়ে হাঁক মারবি, ঘরজামাই রাখবে গো-ও-ও। ঘর-জামা-আ-আ-ই। পারবি না?

কৃষ্ণকান্ত খুশি হয়ে বলল, এ আর শক্ত কি?

যা লেগে পড় কাজে। হিল্লে হয়ে যাবে।

তেমাথার মোড়ে সাতকড়ি ভিন্ন পথ ধরল।

কেউ যদি একটু ধরিয়ে দেয় তা হলে সব কাজই কৃষ্ণকান্ত ঠিকঠাক করতে পারে। ধরিয়ে দেওয়ার লোকই যে সব সময়ে পাওয়া যায় না, এইটেই কৃষ্ণকান্তর মুশকিল। এই যে সাতকড়িদাদা এ বেশ ভাল লোক। কী করতে হবে, কেমন করে করতে হবে তা ধরিয়ে দিল। এখন বাকিটা জলের মতো সোজা। হাঁক মারতে মারতে কৃষ্ণকান্ত পুবপাড়ায় ঢুকে পড়ল।

মল্লিকবাড়ির বউ মালতী উঠোন ঝেঁটিয়ে ধানের তুষ তুলে রাখছিল হাঁড়িতে, সেই প্রথম ফিরিওলার ডাকটা শুনতে পেল। কিন্তু কী হেঁকে যাচ্ছে তা বুঝতে না পেরে আগড় ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

ওরে ও কেষ্ট, কী বিক্রি করছিস? হাতে তো কিছু দেখছি না!

কেষ্ট রাস্তা থেকে নেমে এসে এক গাল হেসে বলল, ঘরজামাই রাখবে আমাকে?

মালতী হেসে গড়িয়ে পড়ল, ওরে সুবাসী, দৌড়ে আয়, ছুট্টে আয়। দেখসে পাগলা কী বলছে!

ছোট বউ সুবাসী এল, বাড়ির আরও মেয়েরা বেরিয়ে এল। হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল তাদের মধ্যে।

কৃষ্ণকান্ত বুঝল হবে না। বেশির ভাগ সময়েই হতে চায় না। মাঝে মাঝে হয়। কৃষ্ণকান্ত ফের পথে নেমে পড়ল।

গড়াইদের বাড়ির বুড়ো মদন গড়াই ক্ষেতের কাজ করছিল। হাতের দাখানা নেড়ে তেড়ে এল বেড়ার ধারে, ব্যাটা নতুন চালাকি ধরেছে! খুব বিয়ের শখ হয়েছে, হ্যাঁ!

কৃষ্ণকান্ত আরও একটু এগিয়ে গেল। এগোতে এগোতেই বুঝতে পারল সে বেশ একখানা কাণ্ডই বাঁধিয়েছে। কেউ হাসছে, কেউ তাড়া করছে, কেউ গাল দিচ্ছে। তবে হাসির দিকটাই বেশি। ছেলেপুলেরাও লেগেছে পাছুতে। দু' চারটে ঢিলও পড়ল গায়ে। নানা কথা কানে আসছে, পাগলা বলে কী রে...কে করবে লো, ঘরজামাই থাকবে...বসবি নাকি বে ওলো নিত্যকালী, পোলের নীচে থাকবি ঘর বেঁধে...মরণ...কে যেন ক্ষেপিয়েছে আজ পাগলাকে...এঃ, শালার আজ বড় রস উথলেছে দেখছি...

গোবিন্দ খেতে বসেছিল ভিতরের বারান্দায়। তাকে ঘিরে শালিরা। সামনে শাশুড়ি। কচি বউ ঘোমটা টেনে দরজায় দাঁড়ানো। থালা ঘিরে বাটি। ঠিক এই সময় পাগলার হাঁক শোনা গেল। ছোট ফ্রক পরা শালি পটলী ছুটে গিয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ফিরে এল, এ মা, কী অসভ্য! বলছে, ঘর-জামাই রাখবে গো ঘর-জামাই!

শাশুড়ির মুখখানা কালো হয়ে গেল, কে বলছে রে?

কে আবার! কেষ্টপাগল।

গোবিন্দ হাসি চাপতে গিয়ে এমন বিষম খেল যে খাওয়া বরবাদ হওয়ার জোগাড়। অন্য শালিরাও হাসছে। তাদের কারোও গায়ে লাগছে না। তারা সব মামাতো শালি।

গোবিন্দ চেয়ে দেখল, দরজায় তার বউটাও নেই। পালিয়েছে। বোধহয় লজ্জায়।

৩

হাতে কলমে না করলে চাষের মর্ম বোঝা কোনও শর্মার কর্ম নয়। চাষা যখন চষে তখন সে মাটির সঙ্গে কথা কয়, বলদের সঙ্গে কয়, লাঙলের সঙ্গে কয়, মেঘ-বাদল-রোদের সঙ্গে কয়, বাজঠাকুরের সঙ্গে কয়, সাপখোপের সঙ্গে কয়, নিজের কপালের সঙ্গে কয়, এমনকী ভগবানের সঙ্গেও কয়। এই সব কটা জিনিস মিলিয়ে তবে চাষ। কত তোতাই পাতাই করে, সোহাগ করে, মিতালি পাতিয়ে তবে এক একজনের সঙ্গে ভাবসাব হয়। তার চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে প্রাণ। মাটির ঢেলাটাও তার কাছে জ্যান্ত, লাঙলটা কাস্তেটা সবই জ্যান্ত। এরা সব সতীশের বন্ধু-বান্ধব। ছাঁচতলায়, উঠোনে যে সব গোখরো ঘুরে বেড়ায় তারাও বাস্তুর লক্ষ্মী—সতীশ তাদেরও বন্ধু মনে করে। সেদিন চাষের মাঠে এক কেউটে সুমুখে পড়ে কোমর অবধি ফণা তুলল। শানানো কাস্তে ছিল সতীশের হাতে, এক চোপাটে কেটে ফেলতে পারত। কিন্তু কাটেনি। শুধু বিড়বিড় করে বলেছিল, ধান কাটতে গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি বাপু, মাপ করে দাও। কেউটেটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফণা নামিয়ে চলে গেল। ঝড় বাদলার দিনে ভারী বাতাস আসে, চালাঘর উড়ে যেতে চায়, যায়ও। ছেলেপুলে বউ নিয়ে সতীশ জড়সড় হয়ে বসে থাকে শুধু। জানে ঝড় দুনিয়ার নিয়মে আসে, তারও বিষয়কর্ম আছে। ঘাসের মতো মাথা নুইয়ে থাকতে হয়, ঝড় কিছু করে না গরিবের ক্ষতি। মেঘের ওপর থেকে বাজঠাকুর যখন বজ্রের বল্লম ছুঁড়ে মারেন তখনও সতীশ নিশ্চিন্তে ক্ষেতে কাজ করে। জানে, মরার হলে কেউ কি ঠেকাতে পারবে?

প্রাণ, চারদিকে কেবল প্রাণের খেলা দেখতে পায় সতীশ। সবাই ভারী জ্যান্ত, ভারী বন্ধুর মতো।

আগে বাঁকা নদীতে জল ছিল খুব। উপচে পড়ত। আজকাল আর জল নেই। বালির ওপর বালি জমা হয়ে উঁচুতে উঠেছে নদীর খাত। একধার দিয়ে শুধু নালার মতো জল বয়ে যায়। যখন জল ছিল, তখন বাঁকা নদীর জল ছেঁচে ক্ষেত ভাসিয়েছে সতীশ। আজকাল একটু কষ্ট, বর্ষাবাদল না হলে ক্ষেত জল পায় না। নদীকেও কেমন মানুষ-মানুষ লাগে সতীশের। সেও যেন কিছু বলে, কিছু শোনে।

ভারী ঠাণ্ডা সুস্থির সতীশের জীবন। সকাল থেকে রাত অবধি তার খাটুনির শেষ নেই। ক্ষেতে চাষ, বলদ গোরু, কুকুর বেড়াল কাক সকলের যত্নআত্তি করা, ছেলেপুলে বউ সকলের পালনপোষণ আছে, গাছপালা আর পঞ্চভূত আছেন। সকলকেই সতীশ খুশি রাখতে চেষ্টা করে। কেউ জানে না, তার দুটো হেলে বলদ কখন হাসে কখন কাঁদে। তার গোরুটা কখন উদাস হয়ে যায়। তার কুকুর চারটে, তার তিনটে বেড়াল এদেরও কি ঠিক মতো কেউ বুঝতে পারে, সতীশ ছাড়া? বাতাসে যাঁরা ঘুরে বেড়ান, রাতবিরেতে যাদের দেখলে লোকে ভিরমি খায়, তাঁদেরও টের পায় সতীশ। গভীর রাতে মাঝে মাঝে সে যখন ঘুম ভেঙে উঠে মহাবিস্ময়ে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে তখন টের পায়, কারা যেন বাতাসের মধ্যে বাতাসের শরীর নিয়ে মিশে কাছাকাছি আসে। একটু গা শিরশির করে তার।

একদিন বেহান বেলায় ঘাড়ে ভারী লাঙ্গল আর দুটো বলদ নিয়ে মাঠে যাচ্ছে সতীশ। আলের ওপর মুখোমুখি একটা ফুটফুটে ছেলের সঙ্গে দেখা। পরনে হেঁটো ধুতি, খালি গা। কী যে সুন্দর তার মুখচোখ। সতীশ হাঁ করে দেখছিল। ছেলেটা তার কাছাকাছি এসে একগাল হেসে বলল, এই দেখ, আমি দাঁত মেজেছি। আমার হাতে দেখ একটুও ময়লা নেই। আমি আজ কোনও দুষ্টুমি করিনি।

এত সুন্দর করে বলল যে ওই সামান্য কথাতেই কেন যেন জল এল সতীশের চোখে। সে ধরা গলায় বলল, তোমার ভাল হবে বাবা, তুমি বড় ভাল ছেলে।

ছেলেটা খুশি হয়ে নদীর ধার দিয়ে কোথায় চলে গেল। সতীশ কাউকে কিছু বলেনি, বলতে নেই। মনে মনে সে জানে, সেদিনই সে ভগবানকে দেখেছে।

দুপুরবেলা দুটো তৃষ্ণার্ত বলদকে একটা মাটির গামলায় নুন মেশানো জল খাওয়াচ্ছিল সতীশ। উঠোনে একটা ছায়া এসে পড়ল।

সতীশ, আছিস নাকি রে?

মনিবকে দেখে সতীশ তটস্থ হল। বাঁকা নদীর পোল পেরিয়ে মনসাতলা দিয়ে টুকটুক করে ছাতাটি মাথায় দিয়ে উনি নিত্যই আসেন। আসেন, এসে চাষের সময় ক্ষেতের ধারে আলের ওপর বসে থাকেন। ধান ঝাড়া হলে দেখতে আসেন। ধান মাপবার সময় দেখতে আসেন। কী দেখেন তা সতীশ জানে। বিঘে প্রতি যা ন্যায্য পাওনা হয় তা সতীশ বরাবর তুলে দিয়ে আসে মনিবের গোলায়। খরা বা বান হলে কম বেশি হয়।

মেয়ে খেঁদি দৌড়ে গিয়ে একটা জলচৌকি এনে পেতে দিল দাওয়ায়। মুখের ঘামটি কোঁচায় মুছে মুনিব বসলেন। ফর্সা মুখখানা রোদের তাতে রাঙা হয়ে আছে। চুল আর গোঁফ কিছু পেকেছে, তবু মান্যিগন্যি করার মতোই চেহারা।

খেঁদির কাছে চেয়ে এক ঘটি জলের অর্ধেকটা খেয়ে নিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বেশ আছিস তোরা।

এ কথাটার মানে হয় না। শুনলে লজ্জা করে সতীশের। ভাল থাকা মন্দ থাকার সে কীই বা জানে। তবে মেখেজুখে আছে, মিলেমিশে আছে। চারদিকটার সঙ্গে তার ভারী ভাবসাব। মনে হয় পোকাটা মাকড়টা অবধি তাকে চেনে জানে।

সে মনিবের সামনে উঠোনে উবু হয়ে বসে বলে, দুটো ডাব পাড়ি?

ডাব! না রে, এ দুপুরে তোকে আর গাছে উঠতে হবে না।

কিছু নয় কর্তাবাবু। হনুমানের মতো উঠব আর নামব। যাওয়ার সময় কয়েকটা গন্ধরাজ লেবু নিয়ে যাবেন। এবার মেলা ফলেছে।

ডাবটা আস্তে আস্তে খেতে খেতে মনিব বললেন, সেই শ্বশুরমশাইয়ের আমল থেকে তোকে দেখে আসছি। একই রকম রয়ে গেলি। তুই বুড়ো হস না?

সতীশ মাথা চুলকে বলে, বয়স ভাঁটিয়ে গেছে অনেক দিন। সে কি আর আজকের কথা! বুড়োও

হচ্ছি নিশ্চয়ই, বয়স তো হলই।

সেইরকম পাকানো চেহারা, শক্তপোক্ত, সারাদিন রোদে জলে খাটিস, বয়স মানিস না, তোর রকমটা বুঝতে পারি না।

ওই আজ্ঞে একরকম। চাষাভুষোর শরীর তো।

ওরে, আমিও পালোয়ান কিছু কম ছিলুম না। দেখেছিস তো সেই চেহারা।

আজ্ঞে দেখিনি আবার! সব চোখের সামনে ভাসছে। যেদিন বিয়ে করতে এলেন নৌকো করে, পালকি ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। বুড়োকর্তার সে কী আহ্লাদ। কার্তিকের মতো জামাই হয়েছে।

আর লজ্জা দিস না। আজকাল নড়তে চড়তে হাঁফ ধরে যায়।

শরীর তো কিছু বেজুত দেখছি না আমি। অনেকটা সেইরকমই আছেন।

বিষ্ণুপদ উদাস চোখে মাঠঘাট পেরিয়ে কোন উধাওয়ের দিকে যেন চেয়ে থাকে। তারপর একটু ধরা-ধরা গলায় বলে, বিষয়-বিষয় করেই বোধহয় এরকম ধারা হল, কী বলিস!

গন্ধরাজ লেবু ক'টা কুয়োর জলে ধুয়ে এনে দাওয়ার ওপর রেখে সতীশ বলে, আপনার বিষয় না থাকলে আমার পেট চলত কী করে? আপনার জমিতে চাষ, আপনার ভুঁয়েই বাস।

বিষ্ণুপদ বড় বড় চোখে কেমন বিকল একরকম নজরে সতীশের মুখের দিকে চেয়ে বলে, ঠিক জানিস?

কীসের কথা বলছেন?

এ জমি যে আমার, এই চাষবাস যে আমার!

তা কে না জানে। হরপ্রসন্নবাবু আপনার নামে লিখে দেননি এসব?

কর্তাবাবুর আজ বড় বড় শ্বাস পড়ছে, লক্ষ করে সতীশ। মুখখানাও ভার। আজ বাবুর মনটা ভাল নেই। মন নিয়ে কারবার নেই সতীশের। তার মন বলে কি বস্তু নেই? থাকলেও ঠাহর পায় না। সকাল না হতেই কাজে নেমে পড়তে হয়। শরীর বেটে দিতে হয়, জান চুয়াতে হয়, তবে মাঠে মাঠে ফলন্ত মা লক্ষ্মীকে দেখা যায়। তখন শরীরে কেমন একখানা ফুরফুরে হাওয়া এসে লাগে।

বিষ্ণুপদ ডাবের খোলাটা সতীশের বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিয়ে ধুতির খুঁটে মুখ মুছে বলেন, লিখেই তো দিয়েছিলেন রে। তুই তো লেখাপড়া শিখিসনি, দলিলে কী লেখা থাকে তাও জানিস না।

সতীশ গম্ভীর মাথা নেড়ে বলে, তা অবশ্য জানি না। তবে এটা মনে হয় কোন জমিটা কার তা স্পষ্ট করে বলা থাকে দলিলে।

তাও থাকে। তবে আমরা হচ্ছি ভাড়াটে। আসল জমি হল সরকার বাহাদুরের। ভোগ দখল বিক্রি, বা বিলিব্যবস্থার অধিকার আছে মাত্র। সরকার ইচ্ছে করলেই কেড়ে নিতে পারে।

সতীশ মাথা নেড়ে বলে, সে কথাও ঠিক নয়। এই আলো বাতাস এসব তো সরকার বাহাদুরের নয়, নাকি?

আলো বাতাস! তা কী করে সরকারের হতে যাবে?

তা হলে জমিও নয়। দুনিয়াটা যার এসব হচ্ছে তারই জিনিস।

বিষ্ণুপদ সতীশের দিকে মায়াভরে চেয়ে থেকে বলে, তোর মধ্যে এই একটা জিনিস আছে। এটাই তোকে বুড়ো হতে দেয় না। এর জন্যই এই বয়সেও তোর গায়ে মোষের মতো জোর। তোর মতো নয়, তাহলেও শ্বশুরমশাইয়ের মধ্যেও এরকম একটা ব্যাপার ছিল।

তিনি ছিলেন আমার অন্নদাতা দেবতা। ওরকম মানুষ হয় না।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, তুই তো সবার মধ্যেই ভগবান দেখতে পাস। এ খুব ভাল। আমাকে শেখাবি কী করে সব কিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখতে হয়?

সতীশ লজ্জায় মুখ নিচু করে হাসে, কী যে বলেন তার ঠিক নেই। আমি শেখাব কি? মুখ্যু সুখ্যু মানুষ আমরা। ওসব আস্পর্ধার কথা শুনতে নেই। তবে এটা জানি, জমির মালিক যদি আপনি না হন তবে সরকার বাহাদুরও নয়। আপনার যা বন্দোবস্ত সরকার বাহাদুরেরও তাই।

বুঝেছি রে। আর বোঝাতে হবে না। তুই সবকিছুর মধ্যে ভগবান দেখিস, আর আমি দেখি বিষয়।

তাই দেখেন কর্তাবাবু, তাই ভাল করে দেখেন।

বিষ্ণুপদ একটু ম্লান হেসে বলে, দূর পাগল। বিষয়ের মধ্যে আছেটা কী? তাও যদি নিজের জোরে করতে পারতুম তো বলার মুখ থাকত। এ হল গিয়ে পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। শ্বশুরমশাই ঘর-জামাই করতে চাইল, তখন বড় গরিব ছিলুম তো, বাপের কাছে কলকে পেতুম না, তাই নেচে উঠেছিলুম। ভাবলুম না জানি চারখানা হাত গজাবে। এসে সাজানো সংসারে ঘটের মতো বসলুম। ফক্কিকারিটা যদি তখনও বুঝতে পারতুম রে। আজ যেন কোথায় একটা খোঁচা টের পাচ্ছি।

মানুষকে দুঃখ পেতে দেখলে সতীশের কেমন যেন জলে-পড়া অবস্থা হয়। সে একটু ব্যগ্র হয়ে বলে, তা এর মধ্যে খারাপটা কীসের দেখলেন? আমি তো কিছু খারাপ দেখছি না।

খারাপ নয়! পাঁচজন কি আর আমাকে ভাল বলে রে? আড়ালে রঙ্গ রসিকতা করে, আমি টের পাই। সম্বন্ধীরাও ভাল চোখে দেখে না। এমন কী বউ ছেলেপুলেরাও নয়। এই তো আজ জামাই এল, তার ভাবখানা যেন লাটসাহেবের মতো, শ্বশুর বলে যে কেউ একজন আছে তা গায়েই মাখতে চায় না।

সতীশ মাথা চুলকোয়। বাবুর সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে তা ঠিক ধরতে পারছে না সে। এই হল মুশকিল। নিজেকে বাবু-টাবুদের জায়গায় বসিয়ে তো আর ভাবতে পারে না। তার তো ওসব বড় বড় সমস্যা নেই। তবু সে বলল, জামাই তো দিব্যি আপনার। এই তো সেদিন বে হল। গাড়ি চেপে জামাই এল, কাছ থেকে বেশ করে দেখলুম।

বিষ্ণুপদ ঠাট্টা করে বলে, কী দেখলি? ভগবান নাকি?

সতীশ একটু লজ্জা পেয়ে বলে, কিছু খারাপ নয় তো।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, খারাপ কাউকে বলি কী করে? খারাপ আমার কপাল। ভাবছি এখানে তোর কাছাকাছি একখানা ঘর তুলে থাকব। আমাকে তুই একটু চাষের কাজ শেখাবি?

কী যে বলেন তার ঠিক নেই।

তোর সঙ্গে থেকে থেকে চাষবাস শিখব, বুড়ো বয়সকে ঠেকাতে শিখব, আর ভগবান দেখতে শিখব। শেখাবি?

আজ বাবুর কথাগুলো বড় উঁচু উঁচু দিয়ে চলে যাচ্ছে। সতীশ নাগাল পাচ্ছে না। কী বলতে হবে তাও মাথায় আসছে না তার।

ঠিক এই সময়ে তার বউ সুরবালা রান্নাঘর থেকে ঘোমটা ঢাকা অবস্থায় আধখানা বেরিয়ে এসে বলল, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। বাবুকে বলো এখানেই স্নান করে দুটি খেয়ে যেতে।

বিষ্ণুপদ গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে বলে, সে কথাটাও মন্দ নয়। খাওয়াবি নাকি রে সতীশ দুটি ভাত?

সতীশ এত অবাক হল যে বলার নয়। বাবু খাবেন! তার বাড়িতে? সে উত্তেজিত হয়ে বলে, কচুঘেঁচু কী রান্না হয়েছে কে জানে! এ কি আপনি মুখে দিতে পারবেন? কত ভাল খাওয়া-দাওয়া হয় আপনাদের।

রোজ তো নিজের মতোই খাই। আজ না হয় তোর মতোই খেয়ে দেখি। তেলটেল থাকলে দে। স্নানটা করে আসি।

এই যে দিই।

বলে সতীশ ছোটাছুটি শুরু করল। তেল এনে দিল। নিজেই গিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলল। একখানা নতুন গামছা কিনেছিল হাট থেকে। সেইটি বের করে দিল। বিষ্ণুপদ যে সত্যিই তার বাড়িতে খেতে বসবে এটা যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তার।

বিষ্ণুপদ সত্যিই স্নান করে এসে খেতে বসে গেল।

খেতে খেতে বলল, আমার মা এখনও বেঁচে আছে তা জানিস? গ্যাঁড়াপোতায় আমাদের বাড়ি। বহুকাল যাওয়া হয়নি। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে এমন মজে আছি যে—

সতীশ কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। মিনমিন করে বলল, মোটা চালের ভাত, গিলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে খুব।

ছেলেবেলায় এই মোটা চালের ভাতই জুটতে চাইত না। কষ্ট ছিল খুব, আর কষ্টে থাকলে মানুষ কত কী করে ফেলে। শ্বশুরমশাই এমন লোভানীতে ফেলে দিলেন যে সব ছেড়েছুড়ে একেবারে

পুষ্যিপুত্তুরটি হয়ে চলে এলুম। একটা বড় লাফ মেরে খানাখন্দ সব ডিঙিয়ে এলুম বটে, কিন্তু একবার ফিরে দেখা তো উচিত ছিল ভাইরা, বোনরা, আমার মা-বাবা তারা ডিঙোতে পারল কি না। উচিত ছিল না, বল?

সতীশ সুরবালার দিকে চেয়ে বলে, বাবুকে আর একটু ডাল দাও বরং। আর একটু চচ্চড়িও নিন। ঝাল হয়নি তো বাবু?

ঝালটাই তো ব্যঞ্জন ছিল রে। ভাত পাতে আর কীই বা জুটত! শুধু লঙ্কা। বোনগুলোর একটাও ভাল বিয়ে হয়নি শুনেছি। ভাইগুলোও বড় কেউকেটা হয়নি। বাবা দুঃখে কষ্টে গেছে। মাটা এখনও ধুকধুক করে বেঁচে আছে।

সতীশ উঁচু হয়ে বসে পাতে আঁকিবুকি কাটছে। তার হল চাষাড়ে খিদে। যখন খেতে বসে তখন অন্ন ব্যঞ্জনের স্বাদ পায় না, গোগ্রাসে শুধু গিলে যায়। চোখের পলকে পাত সাফ। আজ তার ভাত যেন উঠতেই চাইছে না। পাহাড়প্রমাণ পড়ে আছে পাতে।

আপনার পেট ভরল না বাবু।

বিষ্ণুপদ খুব ধীরে ধীরে উঠে পড়ল। আঁচিয়ে এসে বলল, এই দাওয়াতেই একটা মাদুর পেতে দে, একটু গড়িয়ে নিই। এখানে দিব্যি হাওয়া আছে।

সতীশের মেয়ে খেঁদি একটা পান সেজে এনে দিল। পান খায় না বিষ্ণুপদ। তার কোনও নেশা নেই, এক বিষয় সম্পত্তির নেশা ছাড়া। তবু আজ পানটা খেল।

আমাদের বালিশ বড় শক্ত কর্তাবাবু। তুলোর বড্ড দাম বলে পুরনো ন্যাকড়া-ট্যাকরা ভরে খোল সেলাই করে নিই। আপনার অসুবিধে হবে।

তুই অনেকক্ষণ ধরে কেবল ভদ্রতা করছিস। কাছে এসে বোস।

সতীশ বসল।

আধশোয়া হয়ে অনেকক্ষণ আবার সামনের মাঠঘাটেব দিকে চেয়ে চেয়ে পান চিবোয় বিষ্ণুপদ। তারপর বলে, মানুষ যে কী চায় সেটাই তো বুঝতে পারে না। তুই বুঝিস?

সতীশ ঘনঘন মাথা চুলকে বলে, ক্ষেতে কিছু লাল শাক হয়েছে। খেঁদি তুলে দেবে'খন। নিয়ে যাবেন। মা ঠাকরুণ লাল শাক বড় ভালবাসেন।

আমাকে একটা ঘর করে দিবি? ওই ক্ষেতের মাঝখানটায় হবে। চারদিকে ধানক্ষেত থাকবে, মাঠ ময়দান থাকবে, গাছপালা থাকবে। একা একা বেশ থাকব। দিবি?

এবারও ধান ভাল হবে না। ক্ষেতে জল না হলেই বড় মুশকিল। নদীটাও শুকোল।

বালিশে মাথা রেখে বিষ্ণুপদ চোখ বুজল। আপন মনে বলল, কত বয়েস হয়ে গেল রে।

৪

পাগলাটাকে আজ বেধড়ক পিটিয়েছে ছানু। একেবারে অমিতাভ বচ্চনের কায়দায়। সে একা নয়, তাদের শীতলা মাতা স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেরাও ছিল। তবে তারা বেশি মারেনি। ছানুরই রাগটা বেশি চড়ে গিয়েছিল। ঘর-জামাই রাখবে! ঘর-জামাই রাখবে বলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করলে কার না রাগ হয়। জামাইবাবু খেতে বসেছে সবে, এমন সময় কোথা থেকে পাগলাটা এসে হল্লা জুড়ে দিল। তার বাবা ঘর-জামাই ছিল বলে একটু চাপা কানাকানি হাসি মশকরা বরাবরই শুনে আসছে ছানু। আজকের বাড়াবাড়িটা তাই সহ্য হয়নি।

কিন্তু মারটা একটু বেশি হয়ে গেছে। নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল, একটা চোখ কালশিটে পড়ে বুজে গেছে, কাঁকালেও জোর লেগেছে। কোঁকাতে কোঁকাতে অজ্ঞান মতো হয়ে গিয়েছিল।

খাওয়া ফেলে গোবিন্দই এসে জাপটে ধরল তাকে, করছটা কী? মেরে ফেলবে নাকি?

ছানু তখনও রাগে ফুঁসছে, কত বড় সাহস দেখলেন! বাবাকে অপমান!

গোবিন্দ ঠাণ্ডা গলায় বলল, নিজেদের ঘাড়ে নিচ্ছ কেন? পাগলরা কত কিছু করে, তার কি কিছু ঠিক আছে? এঃ, এর যে খুব খারাপ অবস্থা!

ক্লাবের ছেলেরাই দৌড়ে জল নিয়ে এল। বহুক্ষণ জলের ঝাপটাতেও কাজ হল না।

গোবিন্দ গম্ভীর মুখ করে বলল, ভিক্ষে করে খায়, কখনও তাও জোটে না, ওর কি এত মার খাওয়ার মতো ক্ষমতা আছে শরীরে? দেখছ না কেমন হাড়-বের-করা চেহারা, দুর্বল।

ছানু একটু ভয় খেয়ে গিয়েছিল তখন। যদি মরে টরে যায় তা হলে কী হবে? সে একটু কাঁপা গলায় বলল, ওরকম না বললে কি মারতুম?

গোবিন্দ শালার দিকে কঠিন চোখে চেয়ে বলল, পাগল আর দুর্বল বলেই মারতে পেরেছ, নইলে কি পারতে?

গোবিন্দ গিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে কৃষ্ণকান্তের নাকে অনেকক্ষণ ধোঁয়া দিল। কাজ হল না তাতে।

পাগলটা বড্ড টানা মারছে শরীরটাতে। খিঁচুনির মতো।

এ গাঁয়ে ডাক্তার নেই? গিরীন না কে একজন ছিল না?

ক্লাবের একটা ছেলে বলে, হ্যাঁ, আমার কাকা। কাকা তো বেলপুকুর গেছে।

গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, রাস্তায় ফেলে রাখা ঠিক হবে না। তোমরা ধরো ওকে। দাওয়ায় তুলে শুইয়ে দাও। এ বোধহয় আজ খায়নি, পেটটা খোঁদল হয়ে আছে।

ক্লাবের ছেলেরা ধরাধরি করে, চণ্ডীমণ্ডপে তুলে শোয়াল কৃষ্ণকান্তকে। কে একটা পাখা নিয়ে এসে মাথায় বাতাস করতে লাগল।

ছানুকে ভিতর বাড়িতে নিয়ে গেল তার দিদি, এই তোকে মা ডাকছে।

পাপিয়া—অর্থাৎ ছানুর মা ছেলের দিকে চেয়ে বলে, খুন করেছিস নাকি পাগলটাকে?

তুমিই তো আমাকে ডেকে বললে পাগলটা কী সব অসভ্য কথা বলছে, গিয়ে দেখতে।

তা বলে অমন মারবি?

বেশি মারিনি। বেকায়দায় লেগে গেছে।

জামাই তোকে কী বলছিল? বকছিল নাকি?

জামাইবাবু মনে হয় রেগে গেছে।

এ কথায় তার দিদি আর মায়ের মুখ শুকোল।

পাপিয়া চোখের জল মুছে বলে, বিয়ের পর দু মাসও কাটেনি, এর মধ্যে জামাইকে কে যে ওষুধ করল কে জানে, বিষ নজরে দেখে আমাদের। মেয়েকে নেওয়ার নামটিও করে না। কেমন যেন রোখা-চোখা রাগ-রাগ ভাব। সাতবার খবর পাঠিয়ে আনিয়েছি, এ নিয়ে কথা বলব বলে। দিলি সব ভণ্ডুল করে। জামাই আরও রেগে রইল। এখন কী হবে?

কী হবে তার ছানু কী জানে? তবে গোবিন্দদা যে তাদের বিশেষ পছন্দ করে না এটা সে টের পায়। কিন্তু মাথা ঘামায় না। সংসারের সম্পর্ক টম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে তার ভাল লাগে না।

পাপিয়া চোখের জল মুছে বলে, সব অশান্তির মূলে ওই একটা লোক। লোভী, স্বার্থপর, অন্ধ। বিয়ের পরই আমি পই পই করে বলেছিলাম, ওগো, বাবার সম্পত্তি আঁকড়ে পড়ে থেকো না, নিজের পায়ে দাঁড়াও। চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। মতিচ্ছন্ন হলে কি কেউ ভাল কথা কানে নেয়? বাবার পিছনে পিছনে চাকরবাকরের মতো ঘুরত। গাঁয়ে কত হাসাহাসি হয়েছে তাই নিয়ে, গ্রাহ্যও করত না।

মেয়ে মুক্তি বলল, ওসব কথা থাক তো এখন। চণ্ডীমণ্ডপে ভীষণ ভিড় জমে গেছে। আমার ভয় করছে।

পাপিয়া আর একবার চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে কাঁদল। তারপর মুক্তিকে বলল, কিছু টাকা বার করে ক্লাবের ছেলেদের হাতে দে। নাটাগড়ের হাসপাতালে ওকে নিয়ে যাক। মরলে সেইখানেই মরুক, এখানে যেন না মরে।

মুক্তি চলে গেলে ছানুর দিকে চেয়ে পাপিয়া বলে, জামাই যখনই আসে অমনি ওরা এসে জোটে।

কারা মা?

তোর মামাতো দিদি আর বোনেরা। ওরাও মাথাটা খাচ্ছে। মুক্তির দিকে ফিরেও চায় না। শালিদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করে ফিরে যায়।

বিরক্ত হয়ে ছানু বললে, এখন একটা বিপদের সময় কেন যে জামাই নিয়ে পড়লে!

বিপদ তো তুই-ই বাঁধিয়েছিস মুখপোড়া। সংসারের কত রকম বিপদ আছে তা জানিস?

ছানু রাগে দুঃখে ঠোঁট কামড়ায়। বুকে বড্ড ভয়ও তার। মাথাটা কেমন করছে যেন। সে ক্যারাটে মারার কায়দায় একখানা লাথিও কষিয়েছিল পাঁজরে। সত্যিই মরে যাবে নাকি পাগলটা?

সে ঘুরে সদর দরজার কাছে এসে দূর থেকে ভিড়টা দেখতে পেল। তার দিদি মুক্তি গোবিন্দদার সঙ্গে কী যেন কথা বলছে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে। গোবিন্দদার মুখটা লাল টকটক করছে। খুব রাগের সঙ্গে কী যেন বলছে। মুক্তি বোধহয় কাঁদছে। বারবার আঁচল তুলছে চোখে।

মরে গেল নাকি?

আজ বাজারে একটা সিনেমা দেখানো হবে। শিবা। দারুণ ঝাড়পিটের ছবি। ফিল্‌মটা দেখবে বলে কতদিন ধরে শানিয়ে রেখেছিল ছানু। অবস্থা যা দেখছে তাতে ফিল্‌ম দেখা লাটে উঠল।

এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার। পাগলটার জন্য দরদ উথলে উঠবে মানুষের। অথচ লোকটা যে খেয়ে না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে রোজ মরতে মরতে বেঁচে ছিল তখন দরদটা ছিল কোথায়? যে কোনও দিন বাঁকা নদীর পোলের ওপর থেকেও তো পড়ে মরতে পারে। রোজ রেলিং-এর ওপর উঠে এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পায়চারি করে।

ভিড়ের ভিতর থেকে একটা চেঁচামেচি ক্রমে জোরালো হয়ে উঠছে, কে মেরেছে রে? বাপের জমিদারি পেয়েছে নাকি? যা তো বলাগড় থানায় গিয়ে একটা খবর দিয়ে আয় তো, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাক।

আর একজন খুব তেজের গলায় বলে, ঘর-জামাই রাখার কথায় বাবুদের খুব আঁতে লেগেছে বোধহয়। সাতে পাঁচে নেই পাগলটা, পোলের নীচে পড়ে থাকত। ইস, একেবারে খুনই করে ফেলেছে!

ধরে দে না ঘা কতক ছোঁড়াটাকে টেনে এনে। পালাল কোথায়?

ছানু কী করবে বুঝতে পারছে না। তার বীরত্বও উবে গেছে।

মাথাটা কেমন কেমন লাগছে।

গোবিন্দকে দেখতে পেল ছানু, ভিড় সরিয়ে চণ্ডীপণ্ডপে উঠে গেল। গোলমালটা একটু কম। সবাই খুব মন দিয়ে নিচু হয়ে কী যেন দেখছে। ভগবান! মরে যাচ্ছে নাকি? এবারকার মতো বাঁচিয়ে দাও ভগবান! জীবনে আর কারও গায়ে হাত তুলব না।

ছানু বিহ্বল হয়ে অবশ শরীরে শুয়ে পড়ল বারান্দায়।

কতক্ষণ শুয়ে আছে তার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখতে পেল তার দিদি মুক্তি এক গ্লাস গরম দুধ আঁচলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দ্রুত পায়ে।

চোখ মেলেছে! চোখ মেলেছে! চিৎকার উঠল একটা।

ভগবান! বলে ডেকে কেঁদে ফেলে ছানু। পাঁচ সিকে মানত করে ফেলে শীতলা মায়ের কাছে। একটা শোরগোল উঠল চণ্ডীমণ্ডপে।

কেষ্ট পাগলা উঠে বসেছে। দুধ খাওয়ানো হচ্ছে তাকে। একরকম জড়িয়ে ধরে আছে তাকে গোবিন্দ। দুধ খাওয়াচ্ছে।

মারমুখো ভিড়টাকে শেষ অবধি সামলে নিল গোবিন্দই। উঠে দাঁড়িয়ে জোরালো গলায় ধমকের সুরে বলল, যে যার বাড়ি যান। এখানে ভিড় করে লাভ নেই। কৃষ্ণকান্তর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। এখন হাওয়া-বাতাস খেলতে দিন।

ভিড়টা পাতলা হতে লাগল। শেষ অবধি রইল গোবিন্দ, মুক্তি আর ক্লাবের দুটো ছেলে, যারা ছানুর বন্ধু।

গোবিন্দ হাতছানি দিয়ে ডাকল ছানুকে। ছানু দুর্বল পায়ে গিয়ে দাঁড়াল চণ্ডীমণ্ডপের কাছটিতে। কখন একটা শতরঞ্চি পেতে বালিশে শোয়ানো হয়েছে কৃষ্ণকান্তকে। চোখ মিটমিট করছে। ঠোঁটে একটু ভ্যাবলাকান্ত হাসি। পাগল বলে কথা, সে কি আর মারধোর অপমানের কথা মনে রাখে। গোবিন্দ ছানুর দিকে চেয়ে বলে, কেসটা খুব খারাপ করে ফেলেছিলে।

ছানু শুকনো গলায় বলে, আর হবে না।

খুব ভয় পেয়েছ না।

ছানু চুপ করে থাকে।

আর ভয়ের কিছু নেই। কৃষ্ণকান্ত মনে হচ্ছে, টিঁকে যাবে। গাঁয়ের লোক বলাবলি করছিল, ও নাকি আগে এই চণ্ডীমণ্ডপেই থাকত।

মুক্তি বলে, হ্যাঁ থাকত। নোংরা করে রাখে বলে বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল।

তোমাদের চণ্ডীমণ্ডপ, তোমরা যা ভাল বুঝেছ করেছ। কিন্তু লোকে ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেনি। হরপ্রসন্নবাবু নিজেই থাকতে দিয়েছিলেন ওকে। একধারে পড়ে থাকত। কী এমন ক্ষতি হচ্ছিল তাতে?

তার দিদি মুক্তির সঙ্গে জামাইবাবু গোবিন্দর যে তেমন বনিবনা হচ্ছে না, এটা ছানুও জানে। তার দিদি বোধহয় এ কথার জবাবে একটা বাঁকা কথা বলে বসত। সম্পর্কটা এভাবেই খাট্টা হয়ে যায়। ছানু ছলছল চোখে বলল, না, ক্ষতি কীসের? আমি বাবাকে রাজি করিয়ে ওকে রেখে দেব।

দেখো চেষ্টা করে। হরপ্রসন্নবাবুর মায়াদয়ার শরীর ছিল। অনেকের আশ্রয়দাতা ছিলেন। লোকে সেকথা এখনও বলে। সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে এখন পোলের নীচে থাকে।

এতক্ষণ ছেলে দুটো কোনও কথা বলেনি। এবার তাদের একজন বলল, পোলের নীচেও তো দুপাশ খোলা। ঝড় জল হলে ভেজে।

প্রাণেশ বলল, রেলিঙের ওপর উঠে রোজ হাঁটে। কবে যে পড়ে মরবে।

গোবিন্দ একটু গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখে বলে, হরপ্রসন্নবাবুর বিষয়বুদ্ধিও ছিল, মহত্ত্বও ছিল। তার বিষয়বুদ্ধিটুকু শুধু নিলাম, মহত্ত্বটা নিলাম না'এটা ভাল নয়।

খোঁচাটা কাকে তা টের পেল ছানু। কান একটু গরম হল।

মুক্তি বলল, এভাবে বলছ কেন? দাদু দাদুর মতোই ছিল, তা বলে সবাই তার মতো হবে নাকি?

সেই কথাটাই তো বলছি। সবাই কি আর ওরকম হয়? অনেকে শাঁসালো শ্বশুর পেয়ে মা-বাপকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসে। যাকগে, একে একটু দেখো। আমার ফেরার বাসের সময় হয়েছে। আমি এবার উঠব।

মুক্তির মুখ রাগে অভিমানে ফেটে পড়ছে। গোবিন্দকে খবর দিয়ে না আনলে সেও আসতে চায় না। এলেও রাতে থাকে না। ছানু বোঝে, কোথায় একটা কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে। গোবিন্দদা বাবাকে একদম দেখতে পারে না। আর দিদি বাবাকে ভীষণ ভালবাসে। তাই কি ওদের ঝগড়া।

৫

হেগে মুতে ফেলে বলে ছেলেরা আর মাকে ঘরে থাকতে দেয় না। বারান্দায় হোগলার বেড়া তুলে ঘিরে দিয়েছে, সেই বেড়ারও ওপর নীচে ফাঁক। শীতের হাড়-কাঁপানো হাওয়া, বর্ষাবাদলা, ধুলো বালি, সাপ-ব্যাঙ সবই ঢোকে। দরজা বলে কিছু নেই। খাঁ খাঁ করছে একটা দিক। বেড়াল-কুকুর ঢুকে পড়ে অহরহ। শরীরে নানা রোগভোগ নিয়ে বুড়ি একখানা নড়বড়ে চৌকির ওপর পড়ে থাকে। এ একরকম ঘরের বার করে দেওয়া। একরকম বিদায় দিয়ে দেওয়া।

গ্যাঁড়াপোঁতায় দিদির বাড়িতে গেলে একবার করে যায় গোবিন্দ। বুড়ো মানুষদের ওপর তার এমনিতেই একটা টান আছে। পুরনো সব দিন যেন ঘিরে থাকে তাদের, কত গল্প শোনা যায়। তাদের কষ্ট গোবিন্দ ঠিক সইতে পারে না।

তার ওপর এ হচ্ছে সম্পর্কে তার দিদিশাশুড়ি। নাতজামাই এ গাঁয়ে আসে জেনে বুড়ি বড্ড কাকুতি মিনতি করে ধরেছিল গোবিন্দর দিদি দিমিকে। নাতজামাই এলে যেন একবারটি চোখের দেখা দেখতে পায়। তারপর গোবিন্দ প্রায়ই যায়। মানুষকে মানুষের এত অপমান করার অধিকার নেই। থাকতে পারে না। বুড়িকে তার ছেলেরা যেভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিচ্ছে এরকমটা কিন্তু কোনও বুড়ো মানুষেরই সঠিক পাওনা নয়। গোবিন্দর ইচ্ছে করে রাগে ফেটে পড়ে খুব অপমান করতে এদের।

এসে সে একখানা মোড়া পেতে কাছেই বসে থাকে। রসগোল্লা বা সন্দেশ নিয়ে আসে বুড়ির জন্য। বুড়ির নোংরা বিছানা বা কাপড় জামা, মুতের মেটে হাঁড়ি কিছুতেই সে ঘেন্না পায় না।

বুড়ি তার সাড়া পেলেই উঠে বসে। রোগা জীর্ণ চেহারা। রোগের যন্ত্রণায় চোখ মুখ বসে গেছে। তবু গোবিন্দ এলে ফোকলা মুখে খুব হাসে।

এসেছিস ভাই? তোকে দেখলে আমার প্রাণটা কেন ঠাণ্ডা হয় রে?

আপনার ঠাণ্ডা হয়, আর আপনার অবস্থা দেখলে যে আমার মাথা গরম হয়।

এরকমই তো হওয়ার কথা। সংসার বড় জঞ্জাল।

সংসার জঞ্জাল কেন হবে ঠাকুমা? সংসারকে জঞ্জাল বানালে তবেই তা জঞ্জাল হয়। আপনার ছেলেরা বড্ড অমানুষ।

বুড়ি ভয় খেয়ে বলে, ওরে, জোরে বলিসনি। শুনলে আমাকে খুব হেনস্থা করবে। একটু ওদের কথা বল, শুনি।

গোবিন্দ হাসে। ওদের কথা বলতে, বড় ছেলে আর তার সংসারের কথা। গোবিন্দ বলে, সে ছেলেও তো আপনাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে কেটে পড়েছে। বলি নাতি নাতনি কাউকে চোখে দেখেছেন?

বুড়ি থোঁতা মুখ করে বলে, কোত্থেকে দেখব বল। কে দেখাবে? তারা কি আর আসে? তবে ভাল থাকলেই ভাল।

ভাল থাকবে না কেন? দিব্যি ভাল আছে। আপনার ছেলে শ্বশুরের পয়সায় হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে।

তোর বউটা কেমন হল? ভাল? যত্ন আত্তি করে?

এখনও ভাল করে ঘরে আনিনি।

ওমা! তা কেন রে?

ইচ্ছে হয় না। মেয়েটা বড্ড মুখরা। একটু তেল মজিয়ে নি।

ত্যাগ দিবি না তো!

গোবিন্দ হাসে, বিয়ে করার ইচ্ছেই ছিল না আমার। বিয়ে করলেই নানারকম ভজঘট্ট পাকিয়ে ওঠে। আপনার নাতনিটিও সোজা নয়। বিয়ের রাতেই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল আলাদা বাসা করে থাকতে। সেই যে পিত্তি জ্বলে গেল, আর তা ঠাণ্ডা হল না।

তোর কিন্তু বড্ড রাগ ভাই। আমার নাতনিটাকে এনে একবার দেখাবি আমায়! তাকে দেখিনি তো কখনও। বড্ড দেখতে ইচ্ছে যায়। কবে মরে যাব, একবার মুখখানা দেখে রাখি। কেমন চেহারা রে? বাপের মতো মুখ পেয়েছে?

হ্যাঁ।

তা হলে দেখতে ভালই হবে। তোর পছন্দ তো?

চেহারা খারাপ নয়। আপনি তো তাদের কথা শুনতে চান, কিন্তু তারা কখনও আপনার কথা ভুলেও মুখে আনে না কেন ঠাকুমা? এটাই কি সংসারের নিয়ম?

বুড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, শুনেছি বিষ্টু নাকি এ বাড়িতে খুব কষ্টে ছিল বলে তার রাগ আছে। বিয়ে করে বিদেয় হওয়ার জন্য বড্ড অস্থির হয়েছিল। তা সে তার ছেলেপুলে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকলেই হল। এই বুড়ো বয়সে একটা কথাই কেবল মনে হয়, যে কটা দিন আছি যেন শোকতাপ পেতে না হয় আর। ওইটাই ভয়ের ব্যাপার, বুঝলি? ছেলেপুলে নাতি নাতনি যখন অনেকগুলো হয়ে যায় তখনই ভয় হয়, কোনটা পড়ল, কোনটা মরল। বড় জ্বালা।

বুঝেছি ঠাকুমা।

আর একটা হয়, সবাইকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। বিষ্টুর তো দুই ছেলেও আছে। তারা কেমন?

আর পাঁচটা ছেলের মতোই।

এই পোড়া চোখে তো আর দেখতে পাব না তাদের। তোর চোখ দিয়েই যেন দেখতে পাচ্ছি।

এত মায়া কেন বলুন তো ঠাকুমা। এত মায়া থাকলে যে শরীর ছাড়তে কষ্ট হবে।

বুড়ি একটু কেঁপে ওঠে, শরীর কি আর ছাড়তে চায় রে!

এত কষ্ট, তবু শরীর ধরে পড়ে আছি। পাপের মন তো, সহজে তাই মরতে দেয় না ভগবান। আরও অনেক ভোগাবে, তবে মারবে।

গোবিন্দ বসে বসে বুড়ির ঘরখানা দেখে। আদপে ঘরই নয়। একটা আব্রু মাত্র। রাতের বেলায়

ছেলেরা ঘরে দোর দিয়ে শোয়। বুড়ি বাইরে বেওয়ারিশ পড়ে থাকে। মানুষ যে কী করে এত হৃদয়হীন হয়!

শ্বশুরবাড়ি থেকে পর পর শাশুড়ির চিঠি এল। কুসুমপুর থেকে যারা নাটাগড়ে আসে তাদের হাত দিয়েই চিঠি পাঠায় শাশুড়ি। একটাই বয়ান। মেয়েকে কবে ঘরে নেবে গোবিন্দ। সংসারে মন দিতে আর ইচ্ছাই হয় না গোবিন্দর। সংসার বড় নিমকহারাম জায়গা। তার ওপর ওই বাপেরই তো মেয়ে, তার আর কতটুকু মায়া দয়া হবে? তার চেয়ে একাবোকা বেশ আছে সে। তার বাড়ির লোক বউ আনার জন্য খুব গঞ্জনা দেয়, বিশেষ করে মা। তবে সে মাথা পাতে না। গড়িমসি করে।

গত সপ্তাহেও গ্যাঁড়াপোতা গিয়ে বুড়িকে দেখে এসেছে গোবিন্দ। মনে হয়েছে, আর বেশিদিন নেই। বুড়ি বালিশের তলা থেকে একখানা তোবড়ানো সোনাব আংটি বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, তোর বউকে দিস।

এটা আবার কেন? এ আমি নেব না। আপনার শেষ সম্বল এসব।

চুপ চুপ! গলা তুলতে নেই। আমার যা ছিল সব ওরা নিয়ে নিয়েছে। এটা অতি কষ্টে লুকিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। সম্বল বলিসনি, এ আমার শত্রু। অভাবের সংসারে গয়না সব অনেক আগেই গাপ হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ গাছা চুড়ি, দুটো ঝুমকো দুল, দুটি মাকড়ি আর তিনটে আংটি ছিল। এইটেই শেষ আংটি। টের পেলেই নিয়ে নেবে। এটা মুক্তির জন্য আমি রেখেছি।

কে রেখেছে কে জানে। তবে বুড়ি যার জন্য রেখেছে তার কাছে যে এই আংটির কোনও দাম হবে না তা গোবিন্দ ভালই জানে। মুক্তি তার বাপের একমাত্র মেয়ে বলে গয়নাগাঁটি মেলাই পেয়েছে। হরপ্রসন্ন নাকি নাতনিকে খুব ভালবাসতেন, বিয়ের গয়না তিনিও কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন। মুক্তি এই তোবড়ানো আংটির আসল দাম বুঝতে চাইবে কি?

কিন্তু গোবিন্দ বোঝে, আংটিটা মাথায় ঠেকিয়ে কাগজে মুড়ে পকেটে রেখে সে বলল, এ আংটির দাম লাখ টাকা।

সে তোর কাছে ভাই। তুই যে সোনার মানুষ।

এত চট করে সার্টিফিকেট দিয়ে বসবেন না। এখনও কিন্তু আপনার নাতনিকে নিয়ে ঘর করা শুরু করিনি। সংসারে পড়লেই কে কেমন বোঝা যায়।

তোদের সংসার কি আমি দেখতে যাব রে? এই যে তুই আমার কাছে আসিস এইতেই তুই সোনার মানুষ। বুড়ো-বুড়িদের কাছে কেউ আসতে চায় না রে ভাই, সারাদিন দুটো কথা কওয়ার লোক পাই না। আজকাল আরও কী হয়েছে জানিস, শুনলে হাসবি। আজকাল রাত বিরেতে বড় ভয় পাই।

কীসের ভয় ঠাকুমা?

দাওয়ার উত্তর দিকে ওই লেবু গাছটা দেখছিস তো!

দেখছি।

ওদিকটায় বেড়া দেয়নি ওরা। নিশুতরাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পাই কারা যেন সব এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওখান থেকে দেখছে আমাকে।

কারা? চোর ছ্যাঁচড় নয় তো?

না রে ভাই। এ বাড়িতে চোর ছ্যাঁচড়েরও আসবার প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয় তোর দাদাশ্বশুর আসে, আমার এক ভাসুর, শাশুড়ি আরও সব কারা যেন। তারা কেউ জ্যান্ত মানুষ নয়।

তা হলে ভূত। বলে খুব হাসে গোবিন্দ।

বুড়ি হাসিটাকে গ্রাহ্য না করে বলে, তখন ভাই বড্ড ভয় করে। কত ডাকি ছেলেদের, বউদের, কেউ কোনও সাড়া দেয় না। হাতে পায়ে ধরে বলেছি, ওরে এদিকটাতে একটা বেড়া দিয়ে একটা ঝাঁপের দরজা করে দে। তাও কেউ গ্রাহ্য করে না।

ঠাকুমা, আমি যদি ভাল করে বেড়া দিয়ে ঘরখানা বেঁধে দিই তা হলে কী হয়?

কী জানি ভাই, তাতে বোধহয় আমার ছেলেদের আঁতে লাগবে। তোকে কিছু বলবে না, কিন্তু আমাকে দিনরাত ঝাঁপা ঝাঁপা করবে। কাজ কী তোর ওসব করতে যাওয়ায়? মাঝে মাঝে যে এসে দেখে যাস সেই আমার ঢের। এখন একটা মানুষ এসে দু'দণ্ড কাছে বসলে এত ভাল লাগে যে মনে হয়

আর কিছু চাই না। কেউ যে আসে না তাতেও দোষ দিই না কাউকে। হেগে মুতে ফেলছি, ঘরে নোংরা পড়ে থাকে, ঘেন্নায় আসে না। হ্যাঁ রে, তোরও ঘেন্না করে, তাই না?

গোবিন্দ মাথা নেড়ে হেসে বলে, আমার ওসব ঘেন্নাপিত্তির বালাই নেই। আমার এক কাকার পেটে ক্যানসার হয়েছিল। বাহ্যের দ্বার বন্ধ করে ডাক্তাররা পেটের বাঁ পাশে একটা কৌটো লাগিয়ে দিয়েছিল। তাইতে মল জমা হত, নিজে হাতে সেসব পরিষ্কার করেছি। রুগির সেবায় আমার খুব অভ্যাস আছে। আমাদের বাড়িতে কারও অসুখ বিসুখ হলে আমিই সব করি।

তবে কেন তুই সোনার ছেলে নোস বল তো? তোকে দেখেই যে বুকটা জুড়িয়ে যায় আমার।

রুগির সেবা তো নার্সরাও করে। তারাও কি সব সোনার মেয়ে। ওটা কথা নয়, আমার ঘেন্নার ধাতটাই নেই।

একটু কাছে আয়। তোর মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করি।

আশীর্বাদের কোনও দাম আছে কিনা গোবিন্দ জানে না। কিন্তু বুড়ির রোগা হালকা দুখানা হাত যখন তার একরাশ চুলওলা মাথায় থরথর করে কাঁপছিল তখন গোবিন্দর মনে হল, বুড়ির প্রাণটাই যেন হাত বেয়ে আঙুল থেকে চুঁইয়ে তাব ভেতরে ঢুকে আসতে চাইছে। আশীর্বাদের যদি কোনও অর্থ হয় তবে এর চেয়ে বেশি আর কী হবে?

সেই তোবড়ানো আংটিটা নিয়ে এসেছিল আজ গোবিন্দ। মুক্তি সেটা হাতে নিয়ে খুশি হল না, কিন্তু অবাক হল, এটা কীসের?

তোমার ঠাকুমা দিয়েছে। আশীর্বাদ।

হঠাৎ এটা দেওয়ার মানে কী?

মানে কিছু নেই। আশীর্বাদের যদি কিছু মানে থাকে তবে এরও মানে আছে।

মুক্তি আংটিটা খুব হেলাভরে একটা দেরাজে রেখে দিয়ে বলে, তুমি বুঝি এখন খুব যাও ও বাড়িতে?

না। মাঝে মাঝে যাই। তুমি বোধহয় কখনওই যাওনি।

সেটা তো আর আমার দোষ নয়। ও বাড়ির সঙ্গে বাবারই সম্পর্ক নেই।

গোবিন্দ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, সম্পর্ক যে কেন থাকে না সেটাই যে আমার মাথায় আসে না।

মুক্তি প্রসঙ্গটা এড়িয়ে অন্য কথায় চলে গেল।

রাগ গোবিন্দর সাধে হয় না। বুড়িটার লাঞ্ছনা আর অপমান যে একেবারেই অকারণ, কতগুলি নির্মম বেআক্কেলে মানুষের চূড়ান্ত স্বার্থপরতাই যে তার কারণ, এটা ভেবে তার মাথা আগুন হয়ে যায়।

তার শ্বশুর বিষ্ণুপদ বোধহয় গোবিন্দর নীরব রাগ আর ঘেন্না টের পায়, তাই গোবিন্দ এলেই একটু তফাত হয়, লুকোনোর চেষ্টা করে। এমন কী একসঙ্গে খেতে অবধি বসে না।

তার দুই শালি, অর্থাৎ মুক্তির ছোট মামার মেয়েরা বিকেলে আলুকাবলি করবে, খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল। নইলে আগেই চলে যেতে পারত গোবিন্দ। শালা ছানু পাগলটাকে মেরে বসায় যাওয়া হয়নি। গোলমালে আলুকাবলিও মুলতুবি রেখে গোবিন্দ রওনা হওয়ার জন্য চুল আঁচড়াতে যখন ঘরে এল তখন শাশুড়ি খুব কাঁচুমাচু মুখে ঘরের দরজায় এসে বললেন, উনি কিন্তু এখনও ফিরলেন না।

কে? কার কথা বলছেন?

তোমার শ্বশুর কখনও তো এত দেরি করেন না। আজ যে কী সব হচ্ছে।

গাঁয়েই কোথাও গেছেন-টেছেন হয়তো।

চারদিকে লোক পাঠিয়েছি। যেখানে যেখানে যান তার কোথাও নেই।

গোবিন্দ ঘড়ি দেখে নিল। বাস ধরবার জন্য মাত্র আধঘণ্টা সময় আছে। পা চালিয়ে হাঁটলে দশ মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায়। কাজেই খুব দেরি হয়ে যায়নি।

তুমি যাচ্ছ বাবা?

হ্যাঁ। শেষ বাস পাঁচটায়।

আজকাল তো কিছুতেই তোমাকে একটি দিনও আটকে রাখতে পারি না। মুক্তির কী করবে তা কি ভেবেছ? বিয়ের পর তো অনেক দিন হয়ে গেল?

বলেছি তো, আরও কিছুদিন আপনাদের কাছে থাক। তারপর ভেবে দেখব।

ব্যাপারটা তো ভাল দেখাচ্ছে না। পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে।

আপনার মেয়ের মন এখনও তৈরি হয়নি। আমাদের বেশ বড় পরিবার। মানিয়ে গুছিয়ে চলা খুব সহজ নয়। তাই মন তৈরি হোক।

পাপিয়া খুব সংকোচের সঙ্গে বলে, আসলে বড় আদরে মানুষ তো। অত কাজকর্মের মধ্যে গিয়ে পড়লে খেই হারিয়ে ফেলবে।

গোবিন্দ চিরুনিটা পকেটে গুঁজে রেখে বললে, তা বলে তো আমিও আর ঘর-জামাই থাকতে পারি না।

শাশুড়ি বিবর্ণ মুখে বলে, সে কথা কি বলেছি বাবা?

আপনার মেয়ে আমাকে আলাদা সংসার করার প্রস্তাব দিয়েছিল। সেটা কোনওদিনই সম্ভব না। আমরা মা-বাপকে আস্তাকুঁড়ে ফেলতে শিখিনি।

গোবিন্দর হঠাৎ খেয়াল হল, তার গলা কিন্তু সপ্তমে পৌঁছে গেছে। এবং ভেতরে ভেতরে রাগের একটা ঝড় পাকিয়ে উঠছে। সে লজ্জা পেয়ে হঠাৎ চুপ করল। গুম হয়ে গেল।

তারপর গলা কয়েক পর্দা নামিয়ে এনে বলল, আপনি আর আমাকে চিঠি লিখে আনানোর চেষ্টা করবেন না।

পাপিয়া কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর বলল, আলাদা থাকা কি ঘর-জামাই থাকা বাবা?

তার চেয়ে খুব বেশি ভালও নয়। আমার আর সময় নেই। আমি যাচ্ছি।

আমার মনটা ভাল নেই বাবা, কী বলতে হয়তো কী বলেছি। তোমার শ্বশুরকে কিন্তু ঘরজামাই থাকতে আমিই বারণ করতাম। লোভে পড়ে হল, তার প্রায়শ্চিত্ত এখনও করতে হচ্ছে।

কান্না একদম সইতে পারে না গোবিন্দ। কেউ কাঁদলেই—তা সে কপট কান্না হলেও সে কেমন দ্রব হয়ে পড়ে। পাপিয়া দরজার কপাট দুহাতে আঁকড়ে ধরে তাতে মুখ গুঁজে কাঁদছিল।

দ্রব হলেও গোবিন্দ কখনও গলেও যায় না। সে গম্ভীর নিচু গলায় বলে, আপনি কাঁদছেন কেন! কান্নাকাটি দিয়ে তো এ জট খোলা যাবে না।

পাপিয়া তার হেঁচকি মেশানো কান্নার মধ্যেই বলে, তোমরা কি ভাব ওই লোকটা খুব সুখে আছে? একমাত্র বাবা ছাড়া প্রত্যেকে ওকে দিন রাত অপমান অবহেলা করেছে। আমাদের কাছেও সম্মান পায় না। নিতান্ত বেহায়া আর লোভী বলে বিষয় আঁকড়ে পড়ে থাকে।

ওঁর কথা টেনে আনছেন কেন? আমি তো আপনার মেয়ের কথা বলছিলাম।

তুমি তো ওঁকে দু'চোখে দেখতে পারো না। ও সেটা টের পায় বলেই তোমার সামনে আসে না। বোধহয় তুমি আছ বলেই চৌপর দিন কোথায় গিয়ে না খেয়ে বসে আছে।

তা হলে তো আমার না আসাই ভাল।

আমার কপাল! যা বলি তার উল্টো অর্থ হয়। আমি বলতে চেয়েছিলাম শ্বশুরকে অপছন্দ করো বলেই মুক্তিকেও তুমি সহ্য করতে পারো না।

আমি ওভাবে ভাবিনি। আপনারা যা খুশি হয় ব্যাখ্যা করতে পারেন। তবে আমার মনে হয়, চোখের জলটা আমার ওপর না খাটিয়ে আপনার মেয়ের ওপর খাটালে অনেক বেশি কাজ হত।

চোখের জলের কথা বলছ বাবা? আমার চোখের জল ধরে রাখলে এতদিনে সমুদ্র হয়ে যেত। বাকি জীবনটা কাঁদতে কাঁদতেই যাবে। আমি বলি কী, তুমি মুক্তিকে জোর করে নিয়ে যাও।

জোর করে মানে? চুলের মুঠি ধরে নাকি?

দরকার হলে তাই করবে। নিয়ে গিয়ে বাসন মাজাও, কাপড় কাচাও, ঘর মোছাও, লাথি মারো, খুন করো, তবু ওকে নিয়ে যাও।

তার মানে আমরা ওসব করি নাকি? লাথি মারি? খুনও করি?

পাপিয়া অসহায়ের মতো বিহ্বল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে একরকম ছুটে পালিয়ে গেল।

একথা ঠিকই যে, গোবিন্দর একটা ক্ষ্যাপাটে রাগ আছে। সেই চরম রাগটা উঠলে তার ভেতরটা শুধু আগুন আর মাথায় মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ হতে থাকে। কিন্তু এই রাগটা আর কারও তত নয়, যতটা

ক্ষতি করে তার নিজের। সে তখন কোনও কাজ করতে পারে না, ঘুমোতে পারে না, খেতে পারে না। শুধু ভেতরকার নিরুদ্ধ রাগে কাঁপতে থাকে।

সত্যিই হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল তার। একরকম টলতে টলতে মাতালের মতো সে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর চণ্ডীমণ্ডপ ডাইনে রেখে সোজা বাসরাস্তার দিকে হাঁটা দিল।

বাবু! বলি ও জামাইবাবু!

গোবিন্দ দাঁড়াল, পাগলটা না? সে তাকাতেই হাতছানি দিয়ে ডাকল। এখন পাগলটার কাছে কেউ নেই। ফাঁকা চণ্ডীমণ্ডপে একা বসে আছে।

যাবে না যাবে-না করেও গোবিন্দ গেল তার কাছে, কী বলছ?

কৃষ্ণকান্ত এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করে, বন্দোবস্তটা কীরকম হল? এই চণ্ডীমণ্ডপটা কি আমাকে দিয়ে দিলেন ঘরজামাই?

গোবিন্দ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, সে পাত্র পাওনি।

তা হলে কী হবে এখন?

যতদিন পারো থাকবে। দুধটুধ খাওয়াতে পারে কয়েকদিন। গাঁয়ের থেকে চাপ দিলে থেকেও যেতে পারো।

কৃষ্ণকান্ত একটু বিরস মুখে বলে, পাকা কাজ হল না। বড্ড দোটানায় পড়ে গেলুম যে! আপনি তো ঘোড়েল লোক, একটা বুদ্ধি করতে পারেন না?

আমার তত বুদ্ধি নেই।

কৃষ্ণকান্তকে ভাবিত দেখাল। বলল, সুবিধের জায়গা নয়। মজা নেই। বড্ড ভ্যাতভ্যাত করছে।

তাই নাকি? তবে ইচ্ছেটা কী?

এখানে পোষাবে না। আমার বাঁকা নদীর পোলই ভাল। ঘরজামাই যদি চণ্ডীমণ্ডপটা লিখে দিতে তা হলে বেশ হত। এটা বেচে দিয়ে জিলিপি খেতুম।

গোবিন্দ একটু ম্লান হেসে বলে, চলি হে। আমার আর সময় নেই।

একটু দাঁড়ান বাবু। মাজায় বড় ব্যথা, একটু ধরে তুলবেন?

উঠে কোথায় যাবে?

একটু কষ্ট করে আমাকে পোলের কাছে পৌঁছে দিন। সরকার বাহাদুর আমার জন্যই পোলটা বানাল। আমিই দেখিশুনি কিনা।

তাই বুঝি?

খুব মজা হয় সারাদিন। কত রগড় দেখতে পাই।

বলতে বলতে নিজেই উঠে পড়ল কৃষ্ণকান্ত। একটু ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

গোবিন্দ পাঁচটা টাকা তার হাতে দিয়ে বললে, নাও, জিলিপি খেয়ো।

টাকাটা ছেঁড়া জামার পকেটে রেখে নেমে এল কৃষ্ণকান্ত, দূর শালা? এটা একটা বাজে জায়গা, শতরঞ্চি বালিশ কি আমাদের পোষায়? পোলের নীচে দিব্যি থাকি। বাবু, বিড়ি দেবেন একটা।

নেই রে।

বিড়ি ছাড়াও চলে কৃষ্ণকান্তর। বিড়ি পেলেও চলে। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে গোবিন্দর পিছু পিছু এগোতে লাগল। গোবিন্দ মাঝে মাঝে তার দিকে ফিরে চাইছে। রাগটা কমে যাচ্ছে তার।

৬

ও কি আমার গু বউমা?

আপনার নয় তো আবার কার? বাড়িটা যে নরক বানিয়ে ফেলেছেন! এখন কে এসব পরিষ্কার করে বলুন তো! হাঁটতে তো একটু আধটু পারেন, আর উঠোনটুকু পেরোলেই তো পায়খানা। শয়তানি বুদ্ধি থাকলে কে আর কষ্ট করতে যায়, তাই না?

বুড়ি খুব দুশ্চিন্তা মুখ নিয়ে বলে, এ তো মনে হয় বেড়ালটার কাণ্ড বউমা।

বেড়ালের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, আপনার ঘরে হাগতে এসেছে। লোক ডেকে পরিষ্কার করাতে পয়সা লাগে, বুঝলেন? ঘরভরা তো আর দাসি চাকর নেই। ছিঃ ছিঃ!

বুড়ি আজকাল বড় ভয় খায়। সারাটা দিন মনে শুধু ভয় আর ভয়। কখন বয়সের দোষে কোন অকাজটা করে ফেলে তার ঠিক কী? এরা কেউ ছাড়বার পাত্রপাত্রী তো নয়। বাক্যে একেবারে পুড়িয়ে দেয়।

বড় নাতনি নাচুনি এসে মাটির হাঁড়ির ভাঙা দুটো চারা আর এক খাবলা ছাই দরজার পাশে রেখে বলল, ও ঠাকমা, গুটা তুলে পিছনের কচুবনে ফেলে দিয়ে এসো।

বুড়ি নাতনির দিকে চেয়ে বলে, এই যে যাই।

উঠোনে দাঁড়িয়ে বড় বউ পুতুল পাড়া জানান দিয়ে চেঁচাচ্ছে, তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তবু কি নোলা বাবা। এটা দাও, সেটা দাও। গুচ্ছের খাবে আর ঘরদোর নোংরা করবে। সামলাতে যখন পারো না তখন খাওয়া কেন বাপু? কাল এই এককাঁড়ি কলমি শাক গিলল। তখনই বুঝেছিলুম ঠিক পেট ছাড়বে।

বুড়ি মন দিয়ে শুনছিল। গতকাল কলমি শাকই খেয়েছিল বটে। কিন্তু বুড়ির গলায় তত জোর নেই যে পাল্টা চেঁচিয়ে সবাইকে জানাবে, কলমি শাক ছাড়া আর কোনও পদই তাকে দেওয়া হয়নি।

নাচুনি চাপা গলায় বলে, তাড়াতাড়ি করো ঠাকমা, দেরি করলে আরও বকবে।

এই যে যাই।

মাথাটা আজ বশে নেই। কেমন যেন পাক খাচ্ছে। শরীর কিছুতেই খাড়া হতে চায় না। বুড়ি চৌকি থেকে নেমে নোংরাটার সামনে উবু হয়ে বসল। তারপর নাতনির দিকে চেয়ে বলে, এটা বেড়ালের কাণ্ড নয়, তুই-ই বল তো।

বেড়ালগুলোকে ঢুকতে দাও কেন?

ঢুকবে না কেন বাবা, কোন আগল দিয়ে আটকাব! এ যে খোলা ঘর।

বুড়ি নোংরাটা চেঁছে মাটির সরায় তুলল। কচুবনটা যে কত দূর বলে মনে হয়। খিল ধরা হাঁটু আর টলমলে মাথা নিয়ে অতদূর যাওয়া মানে যেন তেপান্তর পার হওয়া।

মেলা পাপ জমেছে বাবা। পাপের পাহাড়। সব ক্ষয় করে যেতে হবে তো...

উঠোন পেরিয়ে পুকুরের ধারে সেই কচুবন যেন এক অফুরান মরুভূমি। বয়সকালে বুড়ি এই উঠোনেই উদূখলে সর্ষে গুঁড়ো করত, ঢেঁকিঘরে পাড় দিত, পাঁজা পাঁজা বাসন মেজে নিয়ে আসত ঘাট থেকে। সেই শরীরই তো এইটে। সেই উঠোন। কিন্তু আজ আর বনিবনা নেই কারও। শরীরের সঙ্গে না, উঠোনের সঙ্গে না, কচুবনের সঙ্গে না।

ঢেঁকিঘর উঠে গেছে। উদূখল বিদেয় হয়েছে। ঘরবাড়িতে ধরেছে ক্ষয়। দুই বউয়ের তিন সংসার। তারা পালা করে পোষে। না পুষলে পাড়ায় নিন্দে হবে বলেই বোধহয় পোষে। নইলে গু-মুত, মরা ইঁদুর, আবর্জনার মতো তাকেও ফেলে দিত আস্তাকুঁড়ে।

বড় বউ মাঝে মাঝে মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে বলে, এখন তো রস মজে বষ্টুমি হয়েছেন, যখন বিয়ে হয়ে নতুন বউ এসেছিলুম তখন কম ঝাল ঝেড়েছেন? উঠতে খোঁটা, বসতে খোঁটা। আর কী মুখ বাবা, কী অন্তরটিপ্পনী। চোখের জলে বিছানা ভিজত আমার। সংসারে একতরফা কিছু হয় না, বুঝলেন। এখন দান উল্টে গেছে।

উঠোনটা পেরোতে পারল কী করে তা জামগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ভেবে পাচ্ছিল না বুড়ি। বুকটা এত ধড়াস ধড়াস কাঁপছে যে, এখনই না আবার মূর্ছা হয়। চোখে এই দিনের আলোতেও কেমন আঁধার ঘনিয়ে এল যে। কুঁজো হয়ে হাঁটার বড় কষ্ট। মাজার ব্যথায় কতকাল সোজা করতে পারেনি শরীরটাকে!

এমন হাঁফ ধরে গেছে যে জামতলার আগাছার মধ্যেই বুড়ি ধপ করে বসে পড়ে। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে চোখটা বোজে। হাতে মাটির চারায় নিঘিন্নে মল। তবে বুড়ি আর ঘেন্না পায় না। দিন রাত এসব নিয়ে মাখামাখি, ঘেন্না করবে কাকে?

আজকাল বেশিক্ষণ চোখ বুজে থাকলে একটা ভয় হয়, মরে গেলুম নাকি? ঘুমোনোর সময় মনে হয়, আর যদি না উঠি? মরার পর কেমন সব হবে তার চিন্তাও পেয়ে বসে বুড়িকে। যমদূতরা এসে তো

ধরবে সব গাজি গাজি করে। তারপর টানতে টানতে বৈতরণী পার করাবে। নিয়ে গিয়ে হাজির করবে যমরাজার সামনে। তখনই বুড়ি পড়বে বিপদে। কী জিজ্ঞেস করে না করে কে জানে বাবা। এ দিকে ছেলেরা যে শ্রাদ্ধশান্তিটাও ভাল করে করবে এমন ভরসা হয় না। শ্রাদ্ধশান্তি ঠিকমতো না হলে আত্মাটা বড্ড খাবি খাবে।

বুড়ি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছিল। খানিক অন্ধকার, খানিক আবছায়া, খানিক হিজিবিজি, ঝুলকালি, কী সব যেন চোখের সামনে। মাথায় আজকাল অবাক-অবাক সব চিন্তা আসে, ছবি আসে।

বুড়ি একটু বাদে চোখ খুলে চাইল। চোখের পাতাটা খুলতেও যেন কষ্ট, বাকি পথটা আর দাঁড়ানোর চেষ্টা করল না বুড়ি। হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে কচুবনের কাছে এসে নোংরাটা ফেলল।

কতকাল যে স্নান করে না খেয়াল নেই। আজকাল কেউ তো আর চান করিয়ে দেয় না। কুয়ো থেকে জল তুলে চান করবে তার সাধ্যি কী? সামনে পুকুরটা দেখে বড় লোভ হল, একটু ডুব দিয়ে নিলে হয় না?

কিন্তু পারবে কি? তালগাছের বাঁধানো ঘাটে, পা ঠিক রাখা মুশকিল। আর এ পুকুরের ধারেই ডুবজল। বুড়ি ভাবে, সাঁতার তো জানতুম, কিন্তু সে জানা কি আর কাজে দেবে? আজকাল বড় ভয় করে। সব কিছুকে বড় ভয় করে।

বুড়ি বসে আর একটু জিরোলো। গলাটা শুকিয়ে আছে তেষ্টায়। কিন্তু ফিরে তাকালেই আবার তেপান্তরের মাঠ মনে হয় উঠোনটাকে। কত দূরে সব সরে যাচ্ছে! ঘর, মানুষজন, ছেলেমেয়ে। বুড়ি চোখ বোজে। হাজারো স্বপ্নের বৃষ্টি মাথায় ঝরে পড়তে থাকে।

ও ঠাকমা, জঙ্গলে বসে কী করছ তখন থেকে? ও ঠাকমা...

এই একটা মাত্র নাতনি নাচুনিই তার যা একটু খোঁজখবর নেয়। কাছে বেশি আসে না, এলে মা বকবে। তবু একটু টান আছে, একটু মায়া।

বুড়ি কথা বলতে গিয়ে দেখল, গলায় কেন যেন স্বর নেই। কিছুতেই একটাও কথা গলায় তুলে আনতে পারল না বুড়ি।

ও ঠাকমা, অমন করছ কেন? ঘরে যাও।

বুড়ি চোখ বুজে ভাবল, মরে গেছি নাকি? ছেলেরা ঠিকমতো শ্রাদ্ধটা করবে তো! শ্রাদ্ধ করে বড় ছেলে। তা বুড়ির বড় ছেলে হল বিষ্টু। তাকে কি খবরটা ঠিকমতো দেবে এরা? মুখাগ্নি তো সে আর পেরে উঠবে না। অতটা রাস্তা, খবর পেয়ে আসতে আসতে মড়া বাসি হবে। নাঃ, বাঁচাটা যেমন ভাল ছিল না, মরাটাও তেমন ভাল হল না বুড়ির।

ও ঠাকমা?

কাকে ডাকছে ছুঁড়িটা? মরে পড়ে আছি এখানে, দেখতে পায় না নাকি? কানে ঝিঁঝি ডাকছে। হাত পা সব ঠাণ্ডা মেরে গেছে। বুকখানা যেন পাথর। আর মাথাটা অন্ধকার।

ও ঠাকমা! ঠাকমা গো! ওঠো না। বলে গায়ে ধাক্কা দেয় নাচুনি।

বুড়ি দেখল, না, এখনও মরেনি সে। ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল, একখানা কাঁকলাস হাত বাড়িয়ে মাটিতে ভর রাখল।

একটা শ্বাসও পড়ল ফোঁস করে।

ও ঠাকমা! তোমার কী হয়েছে?

বুড়ি নাতনির দিকে চেয়ে মুখখানা মায়া ভরে দেখল। কত কাছে, কিন্তু কত দূর! বলল, একটু ধন্দ লেগেছিল রে। এখন ঠিক আছি।

ধরে তুলব তোমায়?

ঘেন্না পাবি না তো!

বাঃ, তোমাকে আবার ঘেন্না কীসের? মা বকবে বলে, নইলে তোমার ঘর তো রোজ আমিই পরিষ্কার করতে পারি।

অত জুড়িয়ে-দেওয়া কথা বলিসনি রে, ওতে মায়া বাড়ে।

এখন আমাকে শক্ত করে ধরো তো! তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

নাচুনি ধরে ধরে ঘর অবধি নিয়ে এল। একটা ভেজা ন্যাতা এনে দিল ছুটে গিয়ে, ও ঠাকমা, গুয়ের জায়গাটা লেপে দাও। নইলে বকুনি খাবে।

দিই। বলে বুড়ি উবু হয়ে বসল। মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে। মুখাগ্নি কে করবে, শ্রাদ্ধটা হবে কি না, এ সব ভেবে বড্ড উচাটন লাগছে। বিষ্টু যদি সময়মতো খবর না পায়, তা হলে কী হবে? এদের মোটে গা নেই যে।

উঠোনের রোদে বাচ্চারা খেলছে। তারই মধ্যে কে একজন চটি ফটফটিয়ে উঠে এল দাওয়ায়। বুড়ির মেজো ছেলে কৃষ্ণপদ।

আজও ঘরে হেগে ফেলেছ শুনলাম।

বুড়ি সভয়ে চেয়ে থাকে ছেলের দিকে। এদের মুখচোখের চেহারা মোটেই ভাল নয়। কেমন যেন রাগ-রাগ ভাব। কখন যে বকাঝকা করবে তার কোনও ঠিক নেই।

না বাবা, সে একটা বেড়ালের কাণ্ড।

কৃষ্ণপদ মহা বিরক্ত গলায় বলে, এ বাড়িতে বাস করাই যে কঠিন করে তুললে। এরকম হলে তো মুশকিল দেখছি।

বুড়ির বুক গুড়গুড় করতে থাকে। কী বলবে তা ভেবে পায় না। কথার বড় ফের থাকে। কখন কোন কথাটায় লোকে দোষ ধরে তার কিছু ঠিক নেই।

এরকম চললে আর দাওয়ার কিন্তু জায়গা হবে না। গোয়ালঘরটা খালি পড়ে থাকে, ওটায় গোবর দিয়ে দেব'খন। ওটাতেই থেকো গিয়ে।

বুড়ি তেমনি চেয়ে থাকে। গোয়াল আর এর চেয়ে কি খারাপ হবে? বুড়ি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

কৃষ্ণপদ ঘরে গেল। বুড়ি বিছানায় উঠে একখানা কাঁথা টেনে গায়ে দিয়ে বসল। কখন শীত করে, কখন হাঁসফাঁস করে ভেতরটা তার কিছু ঠিক নেই। আজ কী দিয়ে ভাত দেবে এরা? মুখে বড্ড অরুচি কিন্তু পেটে খিদে থাকে। একটু লেবু হলে দুটি খাওয়া যেত।

বেড়ালটা ঘরে এসে একখানা ডন দিয়ে লাফিয়ে বিছানায় উঠল। রোজই ওঠে। তাড়ালেও যায় না। তা ওঠে উঠুক। একটা প্রাণ তো। কাছাকাছি আর একখানা বুকও ধুকধুক করছে জানলে কেমন যেন একটু ভরসা হয়।

বেড়ালটার দিকে চেয়ে বুড়ি বলে, আজ বড় জ্বালিয়েছিস মুখপুড়ি।

বেড়ালটা চোখ মিটমিট করে ফের কাঁথাখানির মধ্যে আরামে পুঁটুলি পাকিয়ে চোখ বুঝল। বড্ড মায়া।

নাতজামাই পাঁচটা টাকা প্রতিবারই হাতে গুঁজে দিয়ে যায়। বুড়ি সেই টাকাটা পরে আর খুঁজে পায় না কিছুতেই। বালিশের তলায় না, তোশকের তলায় না, চাদরের তলায় না, আঁচলে বাঁধা না। কাউকে জিজ্ঞেস করা মহাপাপ। জিজ্ঞেস করলেই বলবে, চুরি করেছি নাকি?

পরশু না কবে যেন এসেছিল নাতজামাই। টাকাটা সেই থেকে খুঁজছে বুড়ি। পাচ্ছে না। পাবে না, জানা কথা। টাকা দিয়ে কিছু করেও উঠতে পারবে না সে। তবে ঘাটখরচার অভাবে গরিবগুরবোরা যেমন মড়া না পুড়িয়ে মুখাগ্নি করে জলে ফেলে দেয় তার বেলাতেও যেন ছেলেরা অমনিধারা না করে তার জন্যই কেষ্ট আর হরির হাতে টাকাগুলো দেওয়ার ইচ্ছে ছিল বুড়ির। হল না। ঘাটখরচাটা পেলে আর মড়া নিয়ে হেলাফেলা করত না।

দুপুরবেলা বুড়ি ঘুমোচ্ছিল, নাচুনি এসে চাপা গলায় ডাকল, ঠাকমা! ও ঠাকমা!

কে রে!

তোমাকে গোয়ালঘরে পার করবে বলে গোয়াল পরিষ্কার হচ্ছে যে! রাখাল ছেলেটা ঝাঁটপাট দিচ্ছে।

বুড়ি নাতনির দিকে চায়, তোর কি তাতে কষ্ট হবে রে ভাই!

গোয়ালে তুমি একা থাকতে পারবে? ভয় করবে না?

যেখানে ফেলে রাখবে সেখানেই পড়ে থাকব মা। আর ক'দিনই বা। কিন্তু তোর কি মনে কষ্ট হবে

তাতে? বল না।

কষ্ট হবে না? গোয়ালঘর সেই কত দূরে! রান্নাঘরের পিছনে। ওখানে আমগাছটায় ভূত থাকে যে।

কত ভূত এ বাড়িতে। আমি রোজ দেখি।

বল কী গো!

ওই লেবুতলায়। রোজ নিশুতরাতে ভূত আসে। তোর দাদু, জ্যাঠাদাদু, আরও কত।

ওম্মা গো!

ভয় পাসনি। ভয়ের কী? যখন বুড়ো হবি তখন দেখবি, তুই ভূতের দলেরই হয়ে গেছিস।

গোয়ালঘরে কিন্তু কাঁকড়াবিছে আছে। আর মশা।

সে জানি। আমাকে কম হুল দিয়েছে বিছে? তখন একটা গোরু ছিল, রোজ পরিষ্কার করতে যেতুম তো।

বড় কাকার সঙ্গে বাবার খুব ঝগড়া হল দুপুরের খাওয়ার সময়। বাবা গোয়ালঘরের টিন আর খুঁটি বিক্রি করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল, তুমি থাকলে তো আর তা হবে না। তাই রেগে গেছে।

তাই বুঝি? কোন ভাবে যে রাখবে আমাকে তার ঠিক পাচ্ছে না। এ বাড়ি আমার শ্বশুরদের তিন চার পুরুষের ভিটে ছিল। এখনও নিশুত রাতে তারাই আসে। দেখে যায় আমার কেমন হেনস্থা হচ্ছে।

তোমার কান্না পাচ্ছে না ঠাকমা?

কান্না? না, আজকাল আর কেন কান্না আসে না বল তো! চোখে এক ফোঁটা জল নেই। শুধু কেবল সারাদিন ভয়-ভয় করে। কেবল ভয়। আগে তো কত কাঁদতুম! চোখে কত জল ছিল তখন। আজকাল পোড়া চোখে জলও নেই।

নাচুনি চলে যাওয়ার পর বুড়ি ভাবতে বসল, গোয়ালঘর কি এর চেয়ে কিছু খারাপ হবে? না বাবা, গোয়ালঘরই তো ভাল মনে হচ্ছে। অন্তত একটু চোখের আড়াল হয়ে তো থাকতে পারবে। বেড়াগুলো এতদিনে আর বুঝি আস্ত নেই। চালের টিনেও ফুটো ছিল। তা হোক বাবা, বাক্যের বিষ যদি তাতে কিছু কমে।

গোয়ালের কথা ভাবতে ভাবতেই বেলাটা গেল আজ।

নিশুত রাতে রোজই ঘুম ভাঙে। আজও বুড়ি উঠে বসল। মেটে হাঁড়িতে পেচ্ছাপ করতে বসে খোলা জায়গাটা দিয়ে চোখ গেল, লেবুতলাটার দিকে। বুকটা কেঁপে উঠল হঠাৎ। ভুল দেখছে নাকি? লেবুতলা থেকে একটা ছায়ামূর্তি যে উঠে এল বারান্দায়! এদিকেই আসছে।

বুড়ি বুঝল এবার ডাক এসে গেছে। ওই নিতে এসে গেছে তাকে।

বুড়ি কাঁপা গলায় বলে উঠল, খাবি বাবা যমদূত? খাবি আমায়? দাঁড়া বাবা, এরা সব কী করতে কী করবে তার ঠিক নেই। ও হরি, ও কেষ্ট, তোরা একটু বিষ্টুকে খবর পাঠাবি তো! মুখাগ্নি না হলে যে আত্মা বড় কষ্ট পায়। শ্রাদ্ধও তো সে ছাড়া কেউ করতে পারবে না। বলি ও হরি...

মা!

এ ডাক গত একশো বছরেও যেন শুনতে পায়নি বুড়ি। খানিক হাঁ করে থেকে বলে, ভুল হয়নি তো বাবা! মা বলে ডাকছ!

মা! আমি বিষ্টু।

আবার বোধহয় স্বপ্নই দেখছে। আজকাল হিজিবিজি কত কী দেখে।

কে বললি? সত্যিই বিষ্টু তো!

হ্যাঁ মা।

তোকে ওবা খবর পাঠিয়েছে নাকি? আমি তবে কখন মরলুম বল তো! অনেকক্ষণ মরেছি নাকি? মড়া বাসি হয়নি তো।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, তুমি মরোনি মা। বুড়ো বয়সে ওরকম ভীমরতি হয়।

একটা টর্চের ফোকাস মেরে চারদিকটা দেখে বিষ্ণুপদ বলল, তা হলে এইখানেই থাকতে হচ্ছে আজকাল!

বুড়ি একটু ধাতস্থ হল এইবার। কাঁপা গলায় বলে, ও বিষ্টু, হঠাৎ এই মাঝরাতে এলি কেন বাবা!

খারাপ খবর নেই তো।

না মা। বাসেই তো উঠলুম বিকেলের পর। নাটাগড়ে বাস বদলাতে হল। তার ওপর আবার সেই বাসের চাকা খারাপ হল মাঝরাস্তায়। এই এসে নামলুম।

ও বিষ্টু, কোথায় বসাব তোকে বাবা। এ সব হাগামোতা বিছানা, এখানে তো বসতে পারবি না বাবা। ওদের সব ডেকে তুলি?

না মা। তোমাকে তো ঘরের বার করেছে দেখছি। আমার সঙ্গেই কি আর ভাল ব্যবহার করবে? ওদের কাছে তো আসা নয়, তোমার কাছেই আসা। বিছানাতেই বেশ বসতে পারব।

প্রবৃত্তি হলে তাই বোস বাবা। বুড়ো বয়সে আর কিছু ধরে রাখতে পারি না। বাহ্যে-পেচ্ছাপ হয়ে যায় আপনা থেকেই। কত কথা শুনতে হয় সে জন্য। তা এবার ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। গোয়ালঘরে গিয়ে শান্তিতে থাকব।

এরপর গোয়ালঘরও আছে মা! তোমার ভোগান্তি দেখছি শেষ হয়নি!

টর্চখানা তোর মুখের দিকে একটু তুলে ধর তো! দেখি মুখখানা! কতকাল দেখিনি, ভাল করে মনেও পড়ে না।

এ মুখ কি দেখাতে আছে মা! কত পাপ করেছি।

খুব বুনো হয়ে গেছিস না কি বাবা? কী সুন্দর রাজপুত্তুরের মতো চেহারা ছিল তোর।

ও কথা আর বোলো না মা। শুনলে গা যেন রী-রী করে। শুনলুম, গোবিন্দ তোমার কাছে খুব আসেটাসে।

খুব আসে। সোনার চাঁদ ছেলে। বুক ভরা মায়াদয়া।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, হ্যাঁ মা, খুব ভাল।

বুড়ির একখানা কঙ্কালসার হাত বিষ্ণুপদর পিঠে মাকড়সার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিষ্ণুপদ দু হাতে মুখখানা ঢাকে।

ও বিষ্টু, কথা কইছিস না যে! আমার যে কথা শুনতে বড় ভাল লাগে। নিঃসাড়ে পড়ে থেকে কতবার মনে হয়, মরে গেছি বুঝি!

তোমার কাছটিতে যদি বাকি জীবনটা থাকি মা, তা হলে কেমন হয়?

বিশ্বাস হওয়ার মতো কথাই নয়। বুড়ি থরথর করে কেঁপে উঠে বলে, মানিক আমার! সোনা আমার। ভোলাচ্ছিস বুঝি! নইলে ঠিক আমি স্বপ্নই দেখছি।

বিষ্ণুপদ ফিসফিস করে বলে, বড় ইচ্ছে করে মা।

যখন ছোটটি ছিলি, যখন শুধু মায়ের ধন ছিলি, তখন মায়ের বুকেই জায়গা হয়ে যেত। এখন তো কত কী হয়েছিস বাছা। বউয়ের স্বামী, ছেলেপুলের বাবা, জামাইয়ের শ্বশুর। কেমনধারা সব হয়ে যায় বল তো!

বিষ্ণুপদ টর্চ জ্বেলে জ্বেলে ঘরখানা দেখে। কুসুমপুরে তার পাকা ঘরবাড়ি, খেতখামার, টাকা পয়সা। টর্চের আলোয় সে তার সব ঐশ্বর্যের অর্থহীনতা দেখতে পায় যে, একটা কুকুর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল। এদিকটায় বেড়া নেই, দরজার ঝাঁপ নেই। বিষ্ণুপদ টর্চটা নিবিয়ে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মা, তুমি শুয়ে পড়ো। আমি কাছটিতে বসে থাকি।

ঘুম কি আসে বাবা! কতবার ঘুম ভেঙে উঠে উঠে দেখি। ওই লেবুঝোপের দিকটায় নিশুতরাতে তোর বাবা আসে, জ্যাঠা আসে, আরও কারা সব আসে যেন। ও বিষ্টু, একটু মা বলে ডাক তো!

মা! মাগো! এবার শুয়ে একটু ঘুমোও।

তুই কী করবি? কিছু খাসনি তো! খিদে পায়নি?

না মা। বাস থেকে নেমে হোটেলে খেয়ে নিয়েছি নাটাগড়ে।

তুমি এবার ঘুমোও।

পালাবি না তো ঘুমোলে? ও বিষ্টু!

পালাব না।

আজ বড় ঘুম জড়িয়ে আসে কেন চোখে? বুড়ি ভাল করে বালিশে মাথা না রাখতেই রাজ্যের ঘুম নেমে আসে চোখে। শরীরটা মুড়ে একটুখানি হয়ে বুড়ি আজ ঘুমোয়। বুকটা ঠাণ্ডা লাগে বড়। বিষ্টু এসে গেছে। বুড়ির তবে মুখাগ্নি হবে, শ্রাদ্ধ হবে। যমরাজের কাছে গিয়ে আর হেনস্থা হতে হবে না।

বিষ্ণুপদ টর্চ জ্বেলে দেখতে পেল, তার মায়ের মুখে ব্যথা বেদনার অনেক আঁকিবুকি, গভীর সব রেখা। তবু ঠোঁটে একখানা কী সুন্দর ফোকলা হাসি ফুটে আছে।

জীবনপাত্র
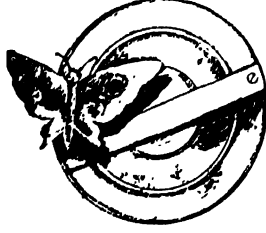
প্রভাসরঞ্জন

নরেনবাবু লোকটিকে আমার পছন্দ হচ্ছিল না। লোকটা জ্যোতিষবিদ্যা জানুক, আর না-ই জানুক তার মধ্যে বেশ একটা নিরীহ ভাব আছে। আর খুব একটা ব্যবসাবুদ্ধি নেই।

আমার কোষ্ঠীর ছকটা গত পনেরো বছর ধরে আমার মুখস্থ আছে। কেউ জ্যোতিষ জানে শুনলেই সট সট করে কাগজে ছকটা এঁকে সামনে এগিয়ে দিই। বহুলোক আমাকে বহু রকম কথা বলেছে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক সময়ে আমি আশার আলো দেখেছি, কখনও-বা-নিভে গেছি। দীর্ঘদিন পর আবার জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হয়ে আমি সামান্য কিছু উত্তেজনা বোধ করেছিলাম।

নরেনবাবু একটু আগে অফিস থেকে ফিরেছেন। গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে আজকাল। বাইরে এখন মেঘের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘরে গুমোট। বাতাস থম ধরা। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন-এর ভিতরদিকে গলির ধাঁধার মধ্যে একটা অদ্ভুত আলো-বাতাসহীন ঘর। জানালা-দরজা সবই আছে, তবু আলো বা বাতাস কিছুই আসে না। একটা হলদে বালবের আলো বোধহয় সারাদিনই জ্বলে। বহু আদ্যিকালের একটা পাখা ঘুরছে ওপরে। তার বিষণ্ণ শব্দ হচ্ছে ঘটাং ঘটাং। দেয়ালে পোঁতা গজালের সঙ্গে তার দিয়ে বাঁধা কয়েকটা কাঠের তক্তায় বিস্তর পুরনো পঞ্জিকা জমা হয়ে আছে, বেশ কিছু সংস্কৃত আর বাংলা জ্যোতিষের বই, কয়েকখানা ইংরেজি বইও। পুরনো একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরে অসম্পূর্ণ একটা কোষ্ঠীপত্র পড়ে আছে, দোয়াতদান, কলম, ডটপেন, লাল, নীল আর কালো কালির দোয়াত, চশমার খাপ, কোষ্ঠীর তুলোট কাগজ, নোট বই, চিঠি গেঁথে রাখবার কাঠের তলাওলা শিক, তাতে বিস্তর পুরনো চিঠি। এ সবের মধ্যে নরেনবাবু বেশ মানানসই। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গোলগাল খুব একটা হাসেন না, তবে মুখে একটু স্মিতভাব। আমার কোষ্ঠীর ছক আঁকা কাগজটা দেখছিলেন বাইফোকাল চশমা দিয়ে। মাথাটা নিচু, টাকের ওপর কয়েকটা চুল পাখার হাওয়ায় ঢেউ দিচ্ছে।

একটা বছর আট-নয়েকের ছেলে বুঝি টেবিল থেকে নরেনবাবুর অজান্তে একটা ডটপেন নিয়ে গিয়েছিল, সেটা ফেরত দিতে এসে সুট করে টেবিলের ওপর পেনটা ফেলে দিয়েই দেখি না-দেখি না ভাব করে চলে যাচ্ছিল । নরেনবাবু গম্ভীর মুখটা তুলে বললেন—এই শোন। ছেলেটা একটু ভয়ে-ভয়ে কাছে আসতেই বাঁ হাতটা দিয়ে কষিয়ে একটা চড় দিলেন গালে। বললেন—কতদিন বারণ করেছি, আমার টেবিলে জরুরি সব জিনিস থাকে, হাত দিবি না। অ্যাঁ, কতদিন বারণ করেছি?

চড় খেয়ে ছেলেটার বোধহয় মগজ নড়ে গিয়েছিল, কথা বলতে পারল না। ভ্যাবলার মতো কিছুক্ষণ চেয়ে হাত মুঠো করে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ভিতর দিকের দরজার কেলেকিষ্টি নোংরা পর্দাটা সরিয়ে চলে গেল । নরেনবাবু নির্বিকারভাবে আবার আমার ছক দেখতে লাগলেন। না, খুব নির্বিকারভাবে নয়, মাঝে মাঝে দেখছিলাম তিনি আড়চোখে ভিতর বাড়ির দরজাটার দিকে তাকাচ্ছেন। ওদিক থেকে কিছু একটা প্রত্যাশা করেছিলেন বোধহয়। ছেলেকে চড় মারাটা বোধহয় তাঁর ভুলই হয়েছে।

ভুল যে হয়েছে সেটা বোঝা গেল কয়েক সেকেন্ড বাদেই। পর্দার ওপাশ থেকে আচমকা এক বিদ্রোহী গলা অত্যন্ত থমথমে স্বরে বলে উঠল—ব্যাপার কী, দাসুকে মেরেছ কেন? গালে গলায় পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে।

নরেনবাবুর বাইফোকাল ঝলসে উঠল, গম্ভীর গলায় বললেন—শাসন করার দরকার ছিল, করেছি। তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে নাকি! যাও, ভিতরে যাও।

—ইঃ, শাসন! সংসারের কুটোগাছটি নাড়ো না, ছেলেপুলে কোনটা পড়ল, কোনটা কাঁদল তার হদিস জানো না, শাসনের সময় বাপগিরি!

বাইফোকালটা পর্দার দিকেই ফোকাস করে মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন নরেনবাবু। আমি বাইরের লোক, তবু আমার সামনেই ঘটনাটা ঘটছে বলেও তিনি খুব একটা সংকোচ বোধ করছেন, এমন মনে হল না। গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—আমার টেবিলের জিনিস তোমাদের কতদিন হাত দিতে বারণ করেছি। এর একটা কাগজপত্র হারালে কী ক্ষতি হবে তা মুখ্যুরা বোঝে না। ফের যদি কখনও কেউ হাত দেয় তো হাত ভেঙে দেব।

—ইঃ, মুরোদ কত! গায়ে হাত দিয়ে দেখো ফের, ও সব ভণ্ডামির জিনিস নুড়ো জ্বেলে পোড়াব। হাবাগোবা সব লোক ধরে এনে দিনমান ধরে কুষ্ঠী না কপাল দেখে ঝুড়ি ঝুড়ি বানানো কথা বলে যাচ্ছে। জ্যোতিষে ক'পয়সা আসে শুনি? বেশির ভাগ লোকই তো ছোলাগাছি দেখিয়ে সরে পড়ে। কবে থেকে বলছি, মহিন্দির বুড়ো হয়ে দেশে চলে যাচ্ছে, তার কয়লার দোকানটা ধরে নাও, কানু পানু বসে আছে, তারা দেখবে'খন। তা সংসারের যাতে সুসার হয় তাতে আবার কবে উনি গা করলেন! আছেন কেবল তেজ দেখাতে!

বাইফোকালটা খুব হতাশভাবে নেমে পড়ল টেবিলে। নরেনবাবু শুধু বললেন—মেয়েমানুষ যদি সব বুঝত তা হলে দুনিয়াটা অনেক সুস্থ থাকত। বোকা মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করার মতো অভিশাপ আর হয় না, যাও, তুমি ভিতবে যাও।

—আর তুমি বুঝি বুদ্ধির পাইকিরি নিয়ে বসে আছ! সংসারে মাসান্তে ক'টা টাকা ফেলে দিয়ে অমন ফুল-ফুল বাবুগিরি করে বেড়াতে পারলেই খুব বুদ্ধি হল, না! বোকা মেয়েছেলে! বোকা বলেই তোমার মতো আহাম্মকের ঘর করতে হয়। বুদ্ধিমতী হলে তিন লাথি মেরে সংসার ভেঙে চলে যেত।

বাইফোকালটা আরও নত হয়ে পড়ে। নবেনবাবুর এই বিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হই।

পর্দার ওপাশ থেকে বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর সরে গেল। গৃহকর্ম রয়েছে। নরেনবাবু ছক থেকে মাথা তুলে আমাকে বললেন—রবিটা নীচস্থ রয়েছে। মঙ্গলটা পড়ল তৃতীয়ে। একমাত্র শনিটাই যা স্বক্ষেত্রে পঞ্চমে।

বলে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এ সবই আমার জানা কথা। রবি নীচস্থ, শনি পঞ্চমে।

নরেনবাবু বললেন—কেতুটাই ডোবাচ্ছে। বাঁদিকের ঘরে পড়ল কি না! বাঁদিকে কেতু ভাল নয়।

আমি হতাশ বোধ করতে থাকি।

উনি মাথা নেড়ে বললেন—কার্তিক মাসে জন্ম হলে বড় মুশকিল। আমারও তাই। রবিটা নীচে পড়ে থাকলে কী করে কী হবে!

—কিছু হবে না?

নরেনবাবু গম্ভীর মুখে বলেন—এখনই সব বলা যাবে না। আগে নবাংশটা দেখি। সময় লাগবে। আপনি বরং ও হপ্তায় আসুন। ততদিনে করে রাখব। তবে বিদেশযাত্রার একটা যোগ আছে। নবাংশটা না করলে বোঝা যাবে না। পাঁচুবাবু আপনার কে হন?

—খুব দূর সম্পর্কের দাদা।

নরেনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—অনেককাল দেখি না পাঁচুবাবুকে। আগে খুব আসতেন। উনি আমার প্রথম দিককার ক্লায়েন্ট!

—উনিই আপনার কথা বলেছিলেন। বলতে গেলে উনিই পাঠিয়েছেন আমাকে।

নরেনবাবু মাথা নেড়ে বলেন—বরাবর উনি লোক ধরে নিয়ে আসতেন আমার কাছে। ওঁর ধারণা ছিল, আমি খুব বড় জ্যোতিষী হব। জ্যোতিষীর যে ধৈর্য স্থৈর্য দরকার, আর হিসেবের মাথা, সে সব আমার ছিলও। কিন্তু নিজের কোষ্ঠী বিচার করে দেখেছিলাম, আমার দাম্পত্য জীবনটা ভাল হবে না। হলও না। পুরুষমানুষের বউ যদি ঠিক না হয় তো তার সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। এই যে রাস্তায় ঘাটে অতি সাধারণ সব মানুষকে দেখেন তাদের মধ্যে অনেকের ছক বিচার করলে দেখবেন, অনেকেরই বড় বড় সব মানুষ হওয়ার কথা। কেউ নেতা, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ সাহিত্যিক। বেশিরভাগেরই হয় না কেবল ওই বউয়ের জন্যই। বউ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। পাঁচুবাবুরও খুব আশা ছিল আমার ওপর। ওই সংসারের জন্যই হল না। তা পাঁচুবাবু আজকাল আর আসেন না কেন?

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি—তাঁর আর ভবিষ্যৎ কিছু নেই। হাসপাতালে পড়ে আছেন। মৃত্যুশয্যা।

নরেনবাবু বাইফোকাল খুলে রেখে চোখ দুটো ধুতির খুঁটে মুছলেন। আবার বাইফোকাল পরে নিয়ে বললেন—বয়সও হল। সত্তর-পঁচাত্তর তো হবেই।

—তা হবে।

—কোন হাসপাতালে?

—কবিরাজি হাসপাতাল, শ্যামবাজারে।

নরেনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—চিনি।

আমি বলি—যাবেন নাকি একদিন দেখতে? খুব খুশি হবেন তা হলে। ওঁর তো কেউ নেই। চেনা লোক কেউ গেলে খুব খুশি হন।

নরেনবাবু উদাস হয়ে বলেন—আমার সময় কোথায়!

বলে একটু চুপ করে থাকেন উনি তারপর টেবিলের ওপর সেই অসম্পূর্ণ কোষ্ঠীপত্রটা পেতে ঝুঁকে পড়ে বললেন—গিয়েই বা হবে কী? মরুণে মানুষকে দেখতে আমার ভাল লাগে না, মন খারাপ হয়। অনেককাল দেখিনি, ওঁকে খামোকা এখন দেখে মন খারাপ করার মানে হয় না। তার চেয়ে চোখের আড়ালে যা হয় হোক। সেই ভাল। হয়েছে কী?

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম—বুড়ো বয়সের নানা রোগ। ভীষণ খেতে ভালবাসতেন, সেই থেকে ডায়াবেটিস হয়েছিল। এখন শোনা যাচ্ছে, ক্যানসারও দেখা দিয়েছে। বাঁচবেন না, তবে এখনও বেশ হাসিখুশি আছেন।

নরেনবাবু এই প্রথম একটু হাসলেন—পাঁচুবাবু বরাবরই সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। ভাগ্যবান। মরাটা নিয়েই আমি ভাবি। কবে, কোথায়, খাবি খেতে খেতে মরব। পাঁচুবাবুর মতো আমি তো আর সদানন্দ পুরুষ নই। একবার এই গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন থেকে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন শোভাবাজার অবধি নিখুঁতি খাওয়াবেন বলে। অমন নিখুঁতি নাকি কোথাও হয় না। চাচার হোটেলে বহুবার মাংস খাইয়েছেন। নানান শখ শৌখিনতা ছিল তাঁর যা দেখে বোঝা যেত ভিতরটা সব সময়ে রসে ডগমগ। প্রায়ই বলতেন, আশি বছর বয়সের পর ধর্মকর্মে মন দেব। খুব বাঁচার ইচ্ছে ছিল, আবার মরতেও খুব পরোয়া ছিল না। প্রায়ই কেওড়াতলা নিমতলা সব ঘুরে বেড়াতেন। কত সাধুসঙ্গ করেছেন, সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে টাকা খরচ করতেন। সেই পাঁচুবাবু মৃত্যুশয্যায়। এ কি ভাবা যায়?

পাঁচুদার কথায় আমিও দুঃখিত হয়ে পড়ি। বলতে কী, কলকাতা শহরটা পাঁচুদাই আমাকে চিনিয়েছিলেন। সদানন্দ মানুষ। সংসারে কারও পরোয়া ছিল না। রাইটার্স বিল্ডিংসের ল্যান্ড রেভিনিউতে ভাল চাকরি করতেন। তাঁর যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বে বাজার ছিল সস্তাগণ্ডা। পয়সার তাঁর ছড়াছড়ি যেত। মনে পড়ল গতকালও পাঁচুদা একটু তেলমুড়ি খাওয়ার বায়না করেছিলেন। সেটা যে খাওয়া বারণ তা নয়। তাঁর স্টেজ-এ কিছুই বারণ নয় আর। যা খুশি খেতে পারেন। ডাক্তাররা অবস্থা বুঝে সব বারণ তুলে দেয়। কিন্তু পাঁচুদার তেলমুড়ি খাওয়ার পয়সা নেই এখন আর।

নরেনবাবু ফের বাইফোকালটা খুলে চোখ মুছে বললেন—নবাংশটা করে রাখবখন। কিন্তু আমি বলি কী, আপনি বরং এখন থেকেই বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা দেখুন। এক ঝলক বিচার করে যা দেখেছি, হয়ে যাবে।

একটু শিউরে উঠে বলি—বলছেন?

—বলছি।

একটা ছোট শ্বাস ফেলে উঠে আসি।

বস্তুত সদ্য সদ্য জীবনের দশ-দশটা বছর নষ্ট করে আমি এই সে দিন সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরেছি। কিন্তু সে কথা নরেনবাবুকে বলার কোনও মানে হয় না। বিদেশে যাওয়াটাই যাদের জীবনের চরম লক্ষ্য আমি তাদের দলে নই।

খুব অল্প বয়সেই আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটে ছিল। ভিখিরির ছেলে অল্প বয়সেই নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করতে শেখে। কারণ তাকে কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করে না। লক্ষ করে দেখেছি, শীতে বর্ষায় কাঙাল গরিবের শিশু জল নিয়ে খেলা করে, ধুলো বালিতে গড়ায়, যা খুশি খায়, অসম্ভব নিষ্ঠুরতায় মারপিট

করে। সেসবের প্রতিরোধশক্তি ওদের মধ্যে আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। নিদারুণ অভাব ওদের চারপাশের রুক্ষতাকে প্রেমহীন ভালবাসাহীনভাবে গ্রহণ করতে শিখিয়ে দেয়, অল্প বয়সেই তারা তাদের পরিবেশ সম্পর্কে বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। ধুলো-খেলা করতে করতে উঠে গিয়ে ভিক্ষের হাত পাতে, বিয়েবাড়ির ফুটপাথে রাস্তার কুকুর তাড়িয়ে খাবার খুঁটে আনে, দুধের শিশু মাকে ছেড়ে সারাদিন একা পড়ে থাকে, কাঁদে না। ওই তাদের খেলা ও জীবন। মা-বাবা মরলে ছেলেমেয়ের শোক বা কদাচিৎ সন্তান মারা গেলে মায়ের শোক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অকারণ মায়া তাদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে না কখনও।

ভিখিরিদের সম্বন্ধে এত কথা বললাম, তার মানে এই যে, আমাদের জীবনযাপন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তৈরি করে দেয়। শৈশবে আমার চেতনা হওয়ার পর থেকেই আমি স্বাভাবিকভাবেই জানতে পেরেছিলাম, যে খিদে পেলেই খাবার এসে হাজির হয় না। এও জানতাম, ছোটখাটো ব্যথা বেদনা, খিদে বা মারধোরে কাঁদতে নেই। কান্না বৃথা, কেউ সেই কান্না ভোলাতে আসে না। এও জানতাম, আমার বাবার থাপ্পড়ের জোর খুব বেশি, মার নিস্পৃহতা ছিল পাহাড়ের মতো অটল। উনিশশো সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পরই ঢাকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা আমাদের পরিবারে জনসংখ্যা খুব কম ছিল না। ওই অত লোকের মধ্যে থেকে থেকে আমাদের আত্মসচেতনতাও অনেক কমে গিয়েছিল। রাণাঘাটের কাছে এক ক্যাম্পে তখন থাকি, অনেক উদ্‌ভ্রান্ত লোক চারিদিকে, খাওয়া-পরার কোনও ঠিক নেই। মচ্ছবের মতো দু বেলা কারা যেন খিচুড়ি খাওয়াতে আসে। খাওয়া বলতে ওইটুকুই। সারাদিন বহুবার খিদে পেত, খিদে মরে যেত। প্রথমে কাঁদতাম খুব, কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে বুঝতে পারতাম কান্নার মূল্য দেওয়ার কেউ নেই। বাবার এক খুড়ি ছিল দলে, খুনখুনে বুড়ি, সেই ঠাকুমা মাঝে মাঝে কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন, কাঁপা কাঁপা স্বরে কিছু বলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর চোখের কোল ছিল ফোলা, চোখ ঘোলাটে, চোখের দোষেই সব সময়ে অশ্রুপাত করতেন, সেটা কান্না ছিল না । সেই ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ বড় একটা পাত্তা দিত না। দরমার বেড়া দেওয়া দমবন্ধ সেই ঘরে আমরা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকতামও না। অনেক আমাদের বয়সি ছেলেমেয়ে জুটেছিলাম সেইখানে। ক্রমে খিদে ভুলে খেলায় মেতে থাকতে শিখেছিলাম। মার্বেল নেই, লাট্টু নেই, ঘুড়ি লাটাই জোটে না, তবু কত রকম তুচ্ছাতিতুচ্ছ খেলা আমরা তৈরি করে নিতাম। মাটির চাড়া ছুঁড়ে সিগারেটের খালি প্যাকেট জিতে নেওয়ার খেলা, দাড়িয়াবান্ধা, দড়ি পাকিয়ে বল তৈরি করে তাই দিয়ে ফুটবল। দেশের বাড়িতে আমরা নাকি তিনবার ভাত খেতাম, তা ছাড়া সারাদিন ধরে মুড়ি মুড়কি, আমটা জামটা তো ছিলই। সেই সব ভুলতে শিশুদের দেরি হয়নি। আমরা খুব চট করে রুক্ষতাকে টের পেয়ে তা গ্রহণ করতে শিখেছিলাম। রাণাঘাটে আমরা অবশ্য খুব বেশিদিন থাকিনি। সেখান থেকে হাবড়া, ব্যান্ডেল, গোসাবা হয়ে আমরা অবশেষে কলকাতায় আসি। বাবা পূর্ববঙ্গে জমির আয় থেকে সংসার নির্বাহ করতেন, খুব বেশি লেখাপড়া বা বৃত্তিগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। চাকরি-বাকরি পাওয়ার প্রশ্ন ছিল না, উদ্যোগের অভাব, আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং উদ্বেগে তিনি আরও অপদার্থ হয়ে যাচ্ছিলেন। সহ-উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সারাদিন কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতেন আর বাড়ি ফিরে কেবলই ফিসফাস করে পরামর্শ করতেন সকলের সঙ্গে। পরামর্শের শেষ ছিল না । কার্যকর কিছুই হত না। আমরা কাছাকাছি বয়সের চার ভাই, আর তিন বোন মিলে সাতজন, মা বাবা ঠাকুমা, এক কাকা কাকিমা আর তাদের তিন ছেলেমেয়ে, আবার এক ছোট কাকা—এই বিশাল পরিবার বিনা টিকিটে ট্রেনে, হাঁটাপথে কিংবা যেমন-তেমন ভাবে এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে হয়রান। কলকাতায় আমরা দমদমের কাছে এক খোলা মাঠে জড়ো হয়েছিলাম। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাবা-কাকাদের মধ্যে খুব ভালবাসা ছিল, ছাড়াছাড়ি হওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। কিন্তু বোঝা গিয়েছিল, ওইভাবে যৌথ পরিবার রক্ষার চেষ্টা করলে আরও মুশকিলে পড়তে হবে। মেজোকাকা তাঁর পরিবার নিয়ে একদিন ভিন্ন হয়ে গেলেন। শোনা গেল, আদি সপ্তগ্রামে তাঁর এক খুড়শ্বশুরের জমিজমা আর কলাবাগান আছে, তদুপরি তিনি একটিমাত্র সন্তানকে হারিয়ে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। কাকাকে তিনি জমি বাগান তদারকির কাজ দিয়েছেন। কাকা সপরিবারে চলে গেলে পরিবারের লোকের চাপ কিছু কমল। যেখানে যাই সেখানেই আমাদের বয়সী কাঙাল ছেলেপুলে জুটে যায়। আমরা খুব খেলি। বলতে কী, সেই সময়ে একটা বড়সড় ছেলে আমাদের

ভিক্ষে চাইতে শিখিয়েছিল। ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে আমরা বড় রাস্তায়, বাজারে এবং রেল স্টেশনে বহুবার ভিক্ষে করেছি। তবে কারও বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করত। আমরা বড়জোর পথচলতি মানুষের কাছে হাত পেতে বলতে পারতাম—দুটো পয়সা দেবেন? পয়াস পেলে কুপথ্য কিনে খেতাম। ছোটখাটো চুরি করতাম কখনও সখনও। লাউটা, মুলোটা, ঘটি কি বাটি পেলে বেচে দিতাম। রেলের কামরায় উঠে খুঁজতাম যাত্রীদের ফেলে যাওয়া জিনিস। আমাদের বখে যাওয়ার ব্যাপারটা মা-বাবা কদাচিৎ লক্ষ করেছেন। মা দু-দুটো কোলের মেয়েকে সামলাতে ব্যস্ত, বাবা অভাবে পাগল, ছোটকাকা সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিষণ্ণ। তিনি মানুষটা ছিলেন বড় ভাল, বুদ্ধিমান এবং মেধাবী। নীরবে তিনি তাঁর সঙ্গে আনা কিছু পুরনো পড়ার বই বারবার পড়তেন। তাঁর তাড়া খেয়ে আমরা চার ভাই কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছিলাম। লেখাপড়া আমার খুব খারাপ লাগত না, অক্ষর চেনা রিডিং পড়া যোগবিয়োগ ইত্যাদির মধ্যে আমি কিছু নতুন রকম খেলার রহস্য টের পেয়েছিলাম। ছোটকাকার বিষণ্ণতার গভীরতা আমরা টের পাইনি, যখন পেলাম তখন সেই আত্মহননকারীর দেহটি এক শীতের ভোরে দমদম জংশনের কাছে রেল লাইনে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে ছিল। ছোটকাকার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারের জনসংখ্যা কমল, আরও কমল যখন আমার বড় দুই ভাই পরপর টাইফয়েড আর উদরিতে মারা যায়। এইসব মৃত্যু খুবই শোকাবহ বটে কিন্তু তবু বলি স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত জীবনে এই রকম শোক যতখানি ধাক্কা দিতে পারত ততটা হয়নি। ক্যাম্পে মৃত্যু দেখে আমরা অভ্যস্ত। শুধু সেই খুনখুনে বুড়ি ঠাকুমা চোখের দোষেই হোক আর শোকেই হোক অবিরল অশ্রুপাত করে বিলাপ করতেন। মা-বাবা অচিরে সামলে উঠলেন। শোকের সময় কই?

শুনতে পেলাম বাবা কন্ট্রোলের কাপড়ের একটা ব্যবসা পেয়েছেন। সেটা ভাল না খারাপ এ সব বিচার তখন মাথায় আসে না। একটা কিছু পাওয়া গেছে, একমাত্র সংবাদ। কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েক পদ রান্না হয়, একটু নতুন জামাকাপড়ের মুখ দেখি। বাবা একটা হাতঘড়ি পর্যন্ত কিনে ফেললেন। অতিলোভে বোধহয় তাঁতি নষ্ট হল। সে ব্যবসা বাবার চেয়ে বিচক্ষণতর লোকেরা হাতিয়ে নেয়। একটা রেশনের দোকানে বাবা কিছুকাল চাকরি করলেন। অভিজ্ঞতা বাড়ছিল। এর পরই বাবা এক বড় উকিলের মুহুরি হলেন। তার পরের পর্যায়ে বাবা স্বাধীনভাবে শিয়ালদা কোর্টে বসে কোর্ট ফি পেতে লাগলেন, দলিল তৈরি, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির দালালি করে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছে গেলেন। অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত দীনদরিদ্রের মতো, খুবই সামান্য খাওয়া-পরার মধ্যে একরকমের নিশ্চয়তা পেয়ে গেলাম। এক সেই বুড়ি ঠাকুমার অনুল্লেখ্য মৃত্যু ছাড়া আর তেমন অঘটন কিছু ঘটেনি। আমি ছোটকাকার কাছে শেখা সামান্য লেখাপড়ার ব্যাপারটি ভুলিনি। তিনি মারা গেলে তাঁর বইগুলো আমার দখলে আসে। সেগুলো নিয়েই আমার অনেকসময় কাটত। বাবা কোর্টের কাজ পাওয়ার পর, প্রায় দশ বছর বয়সে আমি দমদমের একটা ওঁছা স্কুলে ভর্তি হতে যাই। সেই স্কুলে যে যায় তাকেই ভর্তি করা হয়, যে ক্লাসে যার খুশি। নামকোবাস্তে একটা ভর্তির পরীক্ষা নেওয়া হয় মাত্র। আমি যেতেই তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, আমি কোন ক্লাসে ভর্তি হতে চাই। আমি বললাম সিক্সে। তাঁরা কয়েকটা ট্রানশ্লেশন জিজ্ঞেস করলে আমি চটপট বলে দিই। একজন মাস্টারমশাই বললেন—বাঃ, ভেরি ইন্টেলিজেন্ট! আমি ভর্তি হয়ে গেলাম। পরের পরীক্ষা থেকে আমি প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকি। স্কুলটা যথার্থ খারাপ বলেই আমার মতো মাঝারি ছাত্রের পক্ষে ফার্স্ট হওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু তাতে একটা সুবিধে হয়েছিল, এভাবে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেতে থাকে। প্রায় দিনই টিফিনের পর স্কুল ছুটি হয়ে যেত। ক্লাস প্রায়ই ফাঁকা পড়ে থাকত মাস্টারমশাইয়ের অভাবে। পড়ানো ছিল খুবই দায়সারা গোছের। আমি তাই বাড়িতে পড়তাম। দমদমের কাছে আমাদের কলোনির পরিবেশ ছিল খুবই খারাপ। চুরি, গুণ্ডামি, মারপিট, জবরদখল, চরিত্রহীনতা, অশ্লীল ঝগড়া এ সব ছিল আমাদের জলভাত। এই পরিবেশ সহ্য করতে পারতেন না আমার ছোটকাকা। তা ছাড়া জীবনের হতাশার দিকটাও তাঁর সহ্য হয়নি, তাই তাকে মরতে হয়েছিল। আশ্চর্য এই, তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁকে আমার বড় বেশি মনে পড়তে থাকে এবং আমার জীবনে তিনিই সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলেন। সেই উদ্বাস্তু পল্লীর সবচেয়ে অশ্লীল গালিগালাজ আমার একসময় ঠোঁটস্থ ছিল, বখামির চূড়ান্ত একসময়ে আমি করেছি। কিন্তু ক্রমে আমার এই পল্লীর কুশ্রীতা থেকে মানসিক মুক্তি ঘটে। আমি আমার আর তিন ভাইবোনকেও

প্রাণপণে এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করতাম। বাবাকে বলতাম—চলুন, আমরা অন্য কোথাও বাসা করি। বাবা খুব বিরক্ত হয়ে বলতেন—তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে লেখাপড়া করে। আর কিছুদিনের মধ্যেই জমির স্বত্ব আমরা পেয়ে যাব। মাগনা জায়গা ছেড়ে আহাম্মক ছাড়া কেউ যেতে চায়?

আমি বাবার মতো করে বুঝতে শিখিনি। জমির জন্য তো মানুষ নয়। মানুষের জন্যই জমি। সেই মানুষই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, মানুষকেই যদি নীতিহীনতায় পশুত্বে নেমে যেতে হয় তো জমিটুকু আমাদের কতটুকু অস্তিত্বের আশ্রয় হতে পারে? অবশ্য বাবা একটা যুক্তিসিদ্ধ কথাও বলতেন—দেখো, পরিবেশ থেকে পালানোর চেষ্টা কোরো না। সর্বত্র পরিবেশ একই রকম। যদি পারো, সাধ্য থাকে তো পরিবেশকে শুদ্ধ করে নাও।

আমি তখন ছেলেমানুষ, আদর্শের কথা ভিতরে সাঁ করে ঢুকে তীরের মতো গেঁথে যেত। তার থরথরানি থাকত অনেকক্ষণ। বুঝতাম, সত্যিই কোথায় যাব? বেলঘরিয়া থেকে গড়িয়া পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরে এর চেয়ে ভাল বা সুস্থ পরিবেশ খুব একটা নজরে আসেনি তো? আমাদের কলোনিতে দু-চারজন ভাল লোক ছিলেন ঠিকই। তাঁরা দশের ভাল করতেন, উপকার করে বেড়াতেন, ঝগড়া কাজিয়া মেটাতেন, তা সত্ত্বেও বলতে পারি তাঁরা আমাদের মধ্যে এমন কিছুর সঞ্চার করতে পারেননি যার দ্বারা আমরা উদ্বুদ্ধ হই, সংবর্ধিত হই। এ বাড়ির মেয়ে পালিয়ে যায়, ও বাড়ির ছেলে কালোবাজারি করে, অমুকের বউ পরপুরুষের সঙ্গ করে—এই ছিল আমাদের নিত্যকার ঘটনা। প্রচণ্ড অভাবের চাপে মানুষ কত কী করে! এই সব মরিয়া ও নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে-যাওয়া মানুষের কাছে ধরবার ছোঁবার মতো কোনও বাস্তব আদর্শ কেউ দিতে পারেনি। ভাল কথা সবাই বলছে, দেশ জুড়ে বক্তৃতার অভাব নেই, কিন্তু কেউ জানে না কোন পথে, কোন আদর্শে মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। তার ওপর নানা বিরুদ্ধ মতেরও জন্ম হচ্ছে রোজ। সেই মতামতের ঝড়ে আমরা আরও উদভ্রান্ত। কোন দিকে গেলে ঠিক হয় তার বুঝতে পারি না। তবু দল বেঁধে বক্তৃতা শুনতে যাই। এর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই, ওর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই। কে কেমন বলল সেইটে নিয়ে মাথা ঘামাই। এদিকে দরমার বেড়া বা চালের টিন পাল্টাতে আমাদের জেরবার হয়ে যায়, পুজোর জামাকাপড়ের জন্য বাবাকে প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখি। পুজো উপলক্ষে জামাকাপড় কেনা হয় বটে, কিন্তু বছরে ওই একবারই আমাদের যা কিছু কেনা হয়। সেটা না হলে লজ্জা নিবারণের সমস্যা। আমরা এ সব নিয়ে ব্যস্ত; এর চেয়ে দূরের বস্তু অর্থাৎ পুরো দেশ কিংবা মানুষের ভবিষ্যৎ—এ সব আমাদের ভাববার সময় নেই।

প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করা গেল। আমাদের পরিবারে এ নিয়ে খুব একটা হইচই করার অবস্থা আমাদের নয়। বাতাসা লুট দেওয়া হল মাত্র। বাবা কিছু বেসামাল রইলেন কয়েকদিন। তাঁর সেজো ছেলে মানুষ হচ্ছে, এরকম একটা বিশ্বাস তাঁর হয়ে থাকবে। তখন তিনি প্রায়ই ছোটকাকার সঙ্গে তুলনা করে বলতেন—প্রভাসটা ঠিক ছানুর মতো হয়েছে। ছানুও বেঁচে থাকলে আজ কত বড় মানুষ হত। এই তুলনায় কেন জানি না আমি অত্যন্ত আহ্লাদ বোধ করতাম। কৈশোরোত্তীর্ণ ছোটকাকা কবে মরে গেছেন, তবু আমার ভিতরে ওই মানুষটি এক বিগ্রহের মতো স্থির হয়ে থাকে। ওই সৎ, নিরীহ, মেধাবী মানুষটিকে ভালবাসা আমার শেষ হয়নি। আমার হতভাগ্য পরিবেশে যত মানুষ দেখেছি তার মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে কোমল। চোখ বুজলেই দেখতে পাই, একটা জীর্ণ হলুদ চাদরে খালি গা ঢেকে খুপরির মধ্যে জানালার ফুটোর ধারে একমনে গণিতের বই খুলে বসে আছেন। মেয়েদের দিকে তাকাতেন না, খিদের কথা বলতেন না, কখনও কোনও অসুবিধে বা অভাবের অভিযোগ ছিল না। অল্প কথা বলতেন। কখনও কখনও আমাদের পড়ানোর পর গল্প শোনাতেন, কিংবা চুপ করে আমাদের নিয়ে বসে থাকতেন। শুনতে এইটুকু। কিন্তু আমার জীবনে কোনও মানুষই তাঁর মতো অত অল্প আচরণের ভিতর দিয়ে অত শেখাতে পারেনি।

বি.এস-সি পর্যন্ত পাশ করতে আমার খুব কষ্ট হয়নি। ফিজিক্সে অনার্স নিয়েছিলাম, পরীক্ষার আগে সেটা ছেড়ে দিতে হয়। তার কারণ, আমরা ভাই-বোনেরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের চাহিদা বাড়ছে, বাবার রোজগার বাড়ছে না। ফলে আমাকে বেশ কয়েকটা টিউশানি নিতে হয়। অপুষ্টির ফলে আমার শরীর ভাল ছিল না, চোখের দোষে মাথা ধরত, লো প্রেসার ছিল, বেশি রাত জেগে পড়াশুনো

করতে গিয়ে স্নায়ুর দোষেই বুঝি খুব খিটখিটে আর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। মাসান্তে আমার রোজগারের টাকা তখন সংসারের পক্ষে অপরিহার্য। কম বয়সে এ সব দায়িত্ব নিয়ে বেশ বুড়িয়ে গেছি অল্প বয়সেই। সে এক রাহুগ্রস্ত যৌবন। ছোটভাইটা বড় হতেই বুঝলাম তার লেখাপড়ার মাথা নেই। বোন দুটোরও প্রায় একই দশা। টেনেটুনে স্কুল ফাইনালটাও যদি পাশ করানো যায় এই ভরসায় আমি ছোটভাইটার পিছনে খুব খাটতাম। সে বখাটে ছেলে ছিল না, আমাকে ভয়ও পেত। কিন্তু তার মাথা পড়াশুনো নিতে পারত না। অবোধ শিশুর মতো সে চেয়ে থাকত আমার দিকে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মারতাম তাকে। মনে হত এই নির্বোধদের ভরণপোষণ করাই বুঝি হবে আমার একমাত্র কাজ সারাজীবন। তাই ওই রাগ ও বিরক্তি। মন ভাল থাকত না। আই এস-সি-র রেজাল্ট খারাপ ছিল না আমার। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অ্যাডমিশন টেস্টের লিস্টে নাম উঠেছিল। কিন্তু সেই ব্যয়সাপেক্ষ পড়াশুনোর অবস্থা নয় বলে পড়িনি। বি. এস-সি-র অর্নাসটাই ছিল আশা-ভরসা। কিন্তু ফাইনালের আগে বুঝতে পারলাম, হবে না। আমার মনঃসংযোগ নেই, ধৈর্য নেই, শরীরেও সয় না। অনার্স ছেড়ে বিষণ্ণ চিত্তে পরীক্ষা দিয়ে দেদার নম্বর পেয়ে ডিস্টিংশনে পাশ করলাম। এম. এস.-সি পড়া হল না। একটা চাকরি পেয়ে গেলাম ডবলিউ. বি. সি-এস পরীক্ষা দিয়ে। তুমুল আনন্দিত হল আমার পরিবার। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, ফিজিক্সের অনার্সটাও হল না, জীবনের অনেক বড় সার্থকতা আমার হাতের নাগাল দিয়ে পালিয়ে গেছে, সেই তুলনায় সরকারি চাকরিটুকু আমাকে কী আর দিতে পারে? তাই তখন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড় বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। নিজের পরিবারের প্রতি এক প্রচণ্ড আক্রোশও তখন থেকে জন্ম নেয়। এরা আমাকে এদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আটকে রেখেছে। আমাকে বড় হতে দিচ্ছে না, আমার অন্তর্নিহিত গুণগুলির বিকাশ ঘটতে দিচ্ছে না।

এই নির্মম আক্রোশ থেকেই তলায় তলায় আমি গোপনে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। জানতাম, আমি চলে গেলে এদের সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঘটবে, সরকারি চাকরির নিশ্চিত আয় এদের আশ্রয় দেবে না। তবু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে বড় বেশি নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। জার্মানিতে প্রথম একটি চাকরি পেয়ে যাই, তারা যেতে লিখল। গোপনে পাসপোর্ট করলাম, ভিসার আবেদন জমা দিলাম। বাড়ির কেউ জানল না। কিছু টাকা জমানো ছিল দু বছর চাকরির। সেই টাকা দিয়ে জাহাজের টিকিট কেটে বাড়িতে খবর দিলাম। এক নিস্তব্ধতা নেমে এল বাড়িতে। সকলেই এক অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখেছিল আমাকে। তারা যতদূর সাফল্যের কথা ভাবতে পারে আমি তো ততদূর সফলতা অর্জন করেছি। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে অফিসারের সরকারি চাকরি করি। গেজেটে নাম ওঠে, আমার জন্য সচ্ছল পরিবার থেকে পাত্রীর খবর আসছে। মা-বাবাও উদ্যোগ করছেন। এর মধ্যে এ কী! তারা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি এতদূর হৃদয়হীন হতে পারি তাদের ধারণা ছিল না। অবশ্য কেউ কোনও জোরালো আপত্তি তুলল না। আমি অবশ্য তাদের বোঝালাম, আমার এবং সকলের ভবিষ্যতের জন্য এটা দরকার। বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন। মা তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করে। বোনেরাও খুশি হয়নি। কেবল ভাইটা খুশি হয়েছিল, দাদা না থাকলে তাকে আর ওরকম প্রচণ্ড মারধোর বকুনি সহ্য করতে হবে না।

জার্মানিতে চলে গিয়েছিলাম দশ বছর আগে । তারা আমাকে শ্রমিকের চাকরি করাত। বহু কষ্টে অনেক চেষ্টায় আমি গেলাম আমেবিকায়। মোটামুটি ভাল খেতাম, পরতাম, মাঝারি চাকরি জুটেছিল। কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা? তার কী হবে? কেবল ভাল খাওয়া-পরার জন্য তো আমি এতদূর আসিনি। কিছু একটা শিখে, জেনে যেতে হবে যা আমাকে অনেক উঁচুতে তুলে দেবে। অত্যন্ত দ্রুতবেগসম্পন্ন পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়েই আমার সময় ফুরিয়ে যেত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হল না । কমপ্রেসর মেশিন সম্পর্কে শিখবার জন্য অবশেষে আমি চলে আসি সুইজারল্যান্ডে। ব্যল শহরে দীর্ঘকাল লেগে থাকলাম একটা কারখানায়। বেতনের প্রচণ্ড অসাম্য। জার্মান, ইটালিয়ান শ্রমিকেরা বেশি অঙ্কের পে-প্যাকেট পায়, আমরা অনেক কম। তবু প্রচণ্ড পরিশ্রম করতাম। কিন্তু অতবড় কম্প্রেসর তৈরির কারখানার কাজ আমি একা শিখব কী করে! আমার মৌলিক কারিগরিবিদ্যা নেই, পরিকল্পিতভাবে আমি আসিওনি। কেবল ভসভসে আবেগ সম্বল করে এসে চাকরিতে ঢুকেছি। বুঝেছি, কেবল চাকরিই সার হল। এই হতাশা কাটাতে আমি এক জার্মান মেয়েকে দু বছর বাদে বিয়ে করি। তার

দেড় বছর বাদে সে ছেড়ে চলে যায়। আর ততদিনে দশ-দশটা বছর পার হয়ে গেল। খবর পেয়েছি, বাবা-মা এখনও কোনওক্রমে বেঁচে আছে, ভাই রেলের পোর্টার, বোনেরা যে যার রাস্তা দেখেছে। হতাশার ভরে আমি একদিন ফেরবার প্লেনে চাপলাম।

অলকা

ভোরের প্রথম আলোটি পুবের জানালা দিয়ে এসে আমার জয়পুরি ফুলদানিটার ওপর পড়েছে। ফুলদানিতে কাল সন্ধের রজনীগন্ধা একগোছা। ফুল এখনও সতেজ। কালকের কয়েকটা কুঁড়ি আজ ফুটেছে। সাদা ফুলের ওপর ভোরের রাঙা আলো এসে পড়েছে, জয়পুরি ফুলদানিটার গায়ে চিকমিক করে আলো। ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই ফুলদানি, তাই আয়না থেকেও আলোর আভা এসে ওকে সম্পূর্ণ আলোকিত করেছে। তিন আয়নার ড্রেসিং টেবিল ফুলদানি আর ফুলের তিনটে প্রতিবিম্ব বুকে ধরে আছে। একগোছা রজনীগন্ধা চারগোছা হয়ে কী যে সুন্দর দেখাচ্ছে!

আমার বদ অভ্যাস, খুব ভোরে আমি উঠতে পারি না। আমার বাপের বাড়ির দিকে সকলেরই এই এক অভ্যাস। কেউ ভোরে ওঠে না। আমাদের বাপের বাড়িতে সবার আগে উঠত আমার বুড়ি ঠাকুমা। ভোরে চারটেয় উঠে খুটুর-খাটুর করত, জপতপ করত। আর তারপর সাড়ে সাতটা বা আটটা নাগাদ আর সবাই। এ আমাদের ছেলেবেলার অভ্যাস। বিয়ে হওয়ার পর এই বদ অভ্যাস নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে আমাকে। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সব রাত থাকতে উঠে ঘর-গেবস্থালির কাজ শুরু করে দিত। প্রথম প্রথম নতুন বউ-পনা দেখিয়ে আমিও ভোরে উঠতাম, কিন্তু তাতে শরীব বড় খারাপ হত। সারাদিন গা ম্যাজম্যাজ, ঘুম-ঘুম, অস্বস্তি। কপালক্রমে আমার বিয়ে হয়েছিল এক ধার্মিক পরিবারে। ধর্ম ব্যাপারটা আমি দুচোখে দেখতে পারি না। আমার বাপের বাড়িতে অবশ্য একটু লক্ষ্মীর পট, কালীর ছবি, বালগোপাল বা শিবলিঙ্গ দিয়ে একটা কাঠের ছোট্ট ঠাকুরের সিংহাসন ছিল এবং তার সামনে ঠাকুমা রোজ একটু ফুল জল বাতাসাও দিত। কিন্তু ওইটুকুই। আমাদের আর কারও ধর্মীয় ব্যাপারে কোনও উৎসাহ ছিল না। বড় জোর বৃহস্পতিবার পাঁচালি পড়ত মা, শনিবারে কোনও-কোনওদিন লুট দেওয়া হত। কিন্তু এ সবই ছিল দায়সারা। আমাদের ঠাকুরঘরটাই ছিল শোওয়ার ঘর। সেই ঘরে সবাই জুতো পরেই ঢুকত আর ঠাকুরের সিংহাসনের বাঁ দিকে যে আলনা ছিল তার নীচের তাকে জুতো রাখত সবাই। বাবার গলায় পইতা বলে কোনও বস্তু ছিল না, আমার দাদা বা ভাইদের কারওরই পইতে-টইতে হয়নি। আমাদের কুলগুরু বংশের শেষ গুরু ছিল কেশব ভট্টাচার্য। আমার বয়স যখন তেরো তখন কেশবের বয়স বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। সে লোকটা ছিল ডাকপিওন। মাঝেমধ্যে সে আমাদের বাড়ি এলে আমরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম। সে কুলগুরুর তোলা আদায় করতে বেরোত। যদিও তার শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না, তার কাছে ঠাকুমার পর আর কেউ মন্ত্র নেয়নি। কিন্তু ঠাকুমা তাকে ভীষণ শ্রদ্ধাভক্তি করত, ওই পুঁচকে কেশবের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে পায়ের ধুলো নিত, নিজে উপোস থেকে সারাদিন রান্নাবান্না করে কেশবকে খাওয়াত, মোটা দক্ষিণা দিত, পালে-পার্বণে ধুতি-চাদর দেওয়া তো ছিলই। বলতে কী, কেশব বেশ সুপুরুষ ছিল। নাদুস-নুদুস চেহারা, ফরসা রং, চোখদুটো খুব বড় বড়। কিন্তু সে সাজতে জানত না, সাদামাটা ধুতি, ময়লা পিরান, খোঁচা দাড়ি নিয়ে আসত। সে এসে খুব তাকিয়ে দেখত আমাকে। আমরা যদিও তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম, সে কিছু মনে করত না। মান-অপমান বোধ তার খুবই কম ছিল। বরং সে মাঝে মাঝে ভ্যাবলার মতো হাসত। ধর্মের কথা সে জানতও না, বলতও না। সে এলেই আমার দাদা অভিজিৎ চেঁচিয়ে বলত—ওই কেশবশালা এসেছে মাসকাবারি নিতে। ও কেশব, আজ আমাদের জামাকাপড় কেচে দিয়ে যাবি, বাসন মেজে দিয়ে যাবি। শুনলে ঠাকুমা রাগারাগি করত, কিন্তু কেশব নির্বিকার। সে বরং কখনও-সখনও এমন কথা বলত—দূর শালা, গুরুগিরির বড় ঝামেলা। সব জায়গায় লোক হুড়ো দেয়।

আমি বাসি কাপড় ছাড়তাম না, পায়খানার কাপড় পালটাতাম না, এঁটোর বিচার ছিল না। ভাত খেতে

বসে আমরা সবাই বরাবর বাঁ হাতে জল খেয়েছি। বাবা শুয়োর, গোরুর মাংস খেতেন, হুইস্কি-টুইস্কি তো ছিলই। আমরা এই পরিবেশে মানুষ হয়েছি। শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে আমাদের আদি বনেদি বাড়ি। সেইখানে জন্মে আমরা বড় হয়েছি। কোনও দিন অভাব টের পাইনি। যদিও আমাদের বংশগৌরব আর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবু আমাদের অসুবিধে ছিল না। বাবা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, অনেক টাকা সাধু ও অসাধু উপায়ে আয় করতেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ মানতেন না।

আমাদের পুরনো বাড়িটার নাম আমরা দিয়েছিলাম 'বার্ডস হাউস'। প্রকাণ্ড এজমালি বাড়িটায় যে আমাদের কত দূর ও নিকট সম্পর্কের শরিকেরা বাস করতেন তার আদমসুমারি হয়নি। শরিকের ঝগড়া তো ছিলই। কার ভেজা কাপড় কার গায়ে লাগল, কে তার সামনের বারান্দায় টিন দিয়ে ঘিরে নতুন ঘর তুলবার চেষ্টা করছে, কে তার ভাগের জায়গায় বাচ্চাকে হিসি করিয়েছে—এইসব সমস্যা অহরহ সকলের মাথা গরম রাখত।

শোনা যায়, আমার বাবা যৌবন বয়সে খ্রিস্টান হয়েছিলেন। কিন্তু গোটা ধর্মের প্রতি তাঁর এমন বিরাগ ছিল যে শেষ পর্যন্ত খ্রিস্ট-ভজনাও তাঁর হয়ে ওঠেনি। আমাদের সেই বিশাল এজমালি বাড়িতে আমরা মোটামুটি একঘরে হয়েই ছিলাম, অন্য সবাই আমাদের ম্লেচ্ছ বলে এড়িয়ে চলত।

আমার একুশ বছর বয়েসের সময় বিয়ে হয়। বিয়ে হল এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁরা শ্রীহট্ট জেলার লোক, চৈতন্যদেবের ভক্ত। আমার স্বামী যদিও খুব বড় চাকরি করতেন না, তবু তাঁদের পরিবারটা বেশ সচ্ছল ছিল। আমার স্বামী জয়দেব চক্রবর্তী স্মল স্কেল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রির অফিসার ছিলেন। ছোটখাটো চেহারা, বেজায় ভালমানুষ, তবে কখনও কখনও তাঁকে বদরাগি বলে মনে হত। স্বামী সম্পর্কে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে বলছি, সেটা খুব ভাল লাগছে না। বরং বলি জয়দেব লোকটা ভালই ছিল। কিন্তু সে যতখানি সুপাত্র ছিল, তার চেয়ে বোধহয় তুলনামূলকভাবে আমি আরও ভাল পাত্রী ছিলাম। চেহারার জন্য আমার খ্যাতি ছিল সর্বত্র। কিছুকাল লোরেটোতে পড়েছি। কিন্তু আমার চরিত্রের সুনাম ছিল না বলে সেই স্কুল ছাড়তে হয়। পরে আমি একটা সাদামাটা স্কুল থেকে পাশ করি। তা হলেও আমি গড়গড় করে ইংরেজি বলতে পারতাম, নাচে-গানে ছিলাম চমৎকার, অভিনয়ে সুনাম ছিল। সোজা কথায়, গৃহকর্ম করে জীবন কাটানোর জন্য আমি তৈরি হইনি। তেরো-চোদ্দো বছর বয়স থেকেই আমার নানারকম লঘু যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এবং লোরেটোতে পড়বার সময়ে আমি যখন ক্রিক রোতে এক মাসির বাড়িতে থাকতাম তখনই আমার কয়েকবার সম্পূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা ঘটে যায়। আর, এজন্য কখনওই আমার কোনও অনুশোচনা বা প্রতিক্রিয়া হয়নি, কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমাদের পরিবারে ঢিলাঢালা নৈতিক পরিবেশে আমি মানুষ। আমার মা খুব উঁচু সমাজের মেয়ে, বাবাও উচ্চাভিলাষী এবং নৈতিক আদর্শবোধ থেকে মুক্ত ছিলেন। কাজেই আমরা শরীরকে শরীর ভাবতেই শিখেছি, তার সঙ্গে, মন বা বিবেককে মেশাইনি। এমনকী আমার যৌবনপ্রাপ্তির পর বাবাও অনেক সময়ে আমাকে ফচকেমি করে জিজ্ঞেস করেছেন—কী রে মেয়ে, কটা ছেলের বুকে ছুরি মেরেছিস? অর্থাৎ আমরা খুবই উদার পরিবেশে বড় হয়েছি। আমার বড় দাদা, বাবা এবং মার সামনেই সিগারেট খেত। সে কিছু রোগা ছিল বলে বাবা প্রায়ই তাকে বলত—তুই মাঝে মাঝে বিয়ার খাস, তাতে শরীরটা অনেক ফিট থাকবে। উত্তরে আমার দাদা অভিজিৎ বলত—দূর, বিয়ার আমার পোষায় না, আমার প্রিয় ড্রিংক হচ্ছে হুইস্কি।

আমি সুন্দরী ছিলাম, নইলে ওই গোঁড়া পরিবারে আমার বিয়ে হত না। কিন্তু বিয়েটা যে কেন হয়েছিল সেটা আমি আজও ভেবে পাই না। প্রথম কথা, ওর চেয়ে ঢের ভাল বিয়ে হওয়ার কথা। দ্বিতীয়ত, আমাদের দুই পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গির এত পার্থক্য যে বিয়ের প্রস্তাবই উঠতে পারে না। তবু হয়েছিল। একদিন কলকাতা থেকে বোধহয় কিছু মার্কেটিং করে দাদার সঙ্গে লোকাল ট্রেনে ফিরছিলাম, তখন বেলা এগারোটা হবে। ট্রেন ফাঁকা, আর একটা ফাঁকা কামরায় জয়দেবের বাড়ির লোকজন—মা, পিসি, জ্যাঠা গোছের সবাই যাচ্ছে তারকেশ্বরে। আমি তাদের পাশেই বসেছিলাম। বিধবা পিসি আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন—আহা মা, বড় সুন্দর দেখতে গো তুমি! কোথায় থাকো বাছা?

এইভাবে পরিচয়। তারপর বলতে কী, তাদের বাড়ি থেকেই লোকজন এসে খোঁজখবর করল,

বিয়ের প্রস্তাব দিল। ভাংচি দেওয়ার লোকও ছিল এজমালি বাড়ির শরিকদের মধ্যে। তারা গিয়ে পাত্রপক্ষকে গোপনে জানিয়ে এল যে বাবা খ্রিস্টান, আচার-বিচার মানে না, আমাদের চরিত্র খারাপ। কিন্তু তাতে আটকাল না। আমাকে তাদের বড় বেশি পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বিয়েটা ভেঙে গেলে অবশ্য ভালই হত। আমার মায়ের অনিচ্ছা ছিল, শুনেছি জয়েদেবের বাবারও আপত্তি ছিল। জয়েদেবের বাবা গুজবগুলিকে উড়িয়ে দিতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁর বোন, অর্থাৎ জয়দেবের পিসিই তাঁকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলেন। অন্য দিকে আমার বাবা হঠাৎ তাঁর হিসেবি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, যে নীতিহীনতা ও অনাদর্শ দিয়ে তিনি তাঁর মেয়েকে মানুষ করেছেন সেগুলি মেয়ের বিয়ের সময়ে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষত, আমাদের তো শত্রুর অভাব নেই। তাই বাবা হঠাৎ বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর থেকেই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধভাবে আমাকে বিয়েতে রাজি করালেন, দীর্ঘ আলোচনার পর। মায়েরও মত হল। এবং সে সময়েই মা আমাকে গোপনে জিজ্ঞেস করে জেনে নেন যে আমি সত্যিকারের কুমারী আছি কি না। তাঁর কোনও কারণে সন্দেহ হয়ে থাকবে। আমি অবশ্য স্পষ্ট জবাব দিইনি। কিন্তু মায়েরা তো বোঝে।

জয়দেবকে আমি খুব নিরাসক্তভাবে বিয়ে করি। পাত্র আমার পছন্দ ছিল না। ছোটখাটো চেহারার পুরুষ এমনিতেই আমি দেখতে পারি না, তার ওপর তার আবার নানারকম নৈতিক গোঁড়ামি ছিল। সেগুলো আরও অসহ্য। যেমন, বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যে সে শারীরিক দিক দিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হয়নি। যেদিন হল, সেদিন মিলনের আগে সে আমার কুমারীত্ব পরীক্ষার চেষ্টা করেছিল । অবশ্য কীভাবে পরীক্ষাটা করেছিল তা আমি বুঝতে পারিনি তখন, পরে বুঝেছিলাম। কিন্তু এটা কোন মেয়ে আজকাল সহ্য করবে?

পরীক্ষা করে অবশ্য সে বুঝতে পেরেছিল যে আমি কুমারী নই। আর আমিও তার বাতিক দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে এ লোকটা স্বামী হওয়ার উপযুক্তই নয়। কী করে যে ও আমার সঙ্গে, আমি ওর সঙ্গে ঘর করব সেটা বিয়ের পরেই আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

শ্বশুরবাড়িতে আমার নতুন নামকরণ হল, লতিকা। এটা ওদের বাড়ির নিয়ম, নতুন বউ এলে ওরা তার নাম পালটে নতুন নাম রাখে। এতে আমাদের আপত্তি ছিল। হুট বলতে কেন যে কেউ আমার জন্মাবধি নিজস্ব নামটা বাতিল করে দেবে। আমি যে নিজেকে বরাবর অলকা বলে জানি। অচেনা লতিকা আমি হতে যাব কোন দুঃখে? আমি খুব লাজুক মেয়ে নই, ভিতুও নই, তাই শ্বশুরবাড়ির নিয়মকানুনগুলোর বিরুদ্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করেছিলাম। এটা ওরা ভাল চোখে দেখেনি। জয়দেবকে নাম বদলানোর ব্যাপারটা বলতেই ও খুব বিরস মুখে বলল—তোমার নামধাম বদলে ফেলাই ভাল।

—কেন? আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম।

—তোমার অতীতটা খুব ভাল নয় তো, তাই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আমার অতীত কি খারাপ?

—খুব।

—কী করে বুঝলে?

জয়দেব তার বোকা এবং ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে বলল—যারা বোঝে তারা ঠিক বোঝে।

আমি কী বলব ওকে, কী বললে ওর চূড়ান্ত অপমান হয় তাই ভাবছিলাম। ও আমাকে বলল—কেন, তুমি কি জানো না?

—কী জানার কথা বলছ?

—তুমি যে খারাপ?

সাধারণ বাঙালি মেয়েদের মতো আমার হুট করে চোখের জল আসে না। বরং সে সব পরিস্থিতিতে আমার একরকমের পুরুষের রাগের মতো রাগ হয়, থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করে।

অবশ্য জয়দেবকে আমি থাপ্পড় কষাইনি, শুধু বলেছি—না, আমি খারাপ বলে নিজেকে জানি না। বরং মানুষকে যারা সাদা মনে গ্রহণ করতে পারে না তাদেরই খারাপ বলে জানি।

জয়দেব গম্ভীর হয়ে বলল—মানুষকে সাদা মনে গ্রহণ করব! কেন?

—কেন করবে না?

—কেন করব? মানুষ নিজের সম্পর্কে যা বলে তা কি সব সময় সত্যি হয়?

—না-ই হল। ভালমন্দ মিশিয়েই মানুষ, মানুষ হওয়াটাই তার যোগ্যতা।

জয়দেব একটু হাসল। কিন্তু সে ঠিক হাসি নয়। বরং হাসির মুখোশে ঢাকা নিষ্ঠুরতা।

সে বলল—এই যে তুমি, তোমার কথাই যদি ধরা যায়, নিজের সম্পর্কে বলছ যে তুমি খারাপ নও। কিন্তু তোমার শরীর বলছে যে তা নয়।

—আমার শরীর কী বলেছে তোমার কানে কানে?

—বলেছে যে বিয়ের সময় তুমি কুমারী ছিলে না।

বললাম—গাধার মতো কথা বোলো না, তোমার মতো সন্দেহবাতিক যাদের তারা বিয়ে করে কোন মুখে?

জয়দেব মুখ কঠিন করে বলে—যাদের বাতিক নেই তারাই বোকা, যারা মানুষকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে তারাই অবিবেচক।

—তুমি কী করে বুঝলে যে আমি কুমারী ছিলাম না! তুমি কি ডাক্তার না হঠযোগী?

জয়দেব বলে—ডাক্তার বা হঠযোগী হওয়ার দরকার হয় না। একটু সন্ধিৎসু হলেই চলে, আর একটু বুদ্ধিমান হলেই হয়। কেন, তুমি কি অস্বীকার করতে চাও?

—নিশ্চয়ই। তুমি পিশাচের মতো কথা বলছ।

—না। শোনো, শরীর পরীক্ষা করে সবই বোঝা যায়। তুমি হয়তো জানো না, আমি জানি।

—তুমি ছাই জানো। তুমি পাগল, তোমার বাড়িসুদ্ধ পাগল। আমার খুব ভুল বিয়ে হয়েছে, বুঝতে পারছি।

জয়দেব রেগে গেল না। খুব রাগি মানুষ জযদেব ছিল না। ওর রাগ খুব ঠাণ্ডা আর দৃঢ়।

ও বলল—বিয়ে যে ভুল হয়েছে তাতে সন্দেহ কী। পিসিমার জন্যই হল। কিন্তু হয়ে যখন গেছেই তখন যতদূর সাকসেসফুল করা যায় সেটা দেখাই আমার লক্ষ্য।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—না, সন্দেহ দিয়ে শুরু হলে বিয়ে সাকসেসফুল হয় না। তার চেয়ে সম্পর্ক ভেঙে ফেলাই ভাল।

জয়দেব এই প্রথম একটু ভয় পেল যেন, একটু চঞ্চল হয়ে বলল—এ তো সাহেব রাজত্ব নয় যে যখন-তখন বিয়ে ভাঙা যাবে!

—সে তোমরা বুঝবে না।

জয়দেব আমার দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে বলল—শোনো, সাহেবদের দেশে একটা মানুষের সঙ্গে একটা মেয়েমানুষের বিয়ে হয়, বিয়েটা সেখানে ব্যক্তিগত ঘটনা, তার সঙ্গে পরিবার বা সমাজের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশে তো তা নয়।

—তত্ত্বকথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। তুমি যদি অত বড় অপমানটা আমাকে না করতে তাও না হয় হত। আমি ও সব বুঝি না, বুঝবও না।

—তোমাকে একটু বুঝতেই হবে যে। বলতে গিয়ে জয়দেবের স্বর যথেষ্ট নরম হয়ে এল। তার মুখচোখে ভিতু-ভাবও একটু ফুটে উঠল কি?

আমি শুনতে চাইছিলাম না। উঠে চলে আসছি, জয়দেব তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ধরে ফেলল। ঝনাৎ করে নতুন চুড়ি-শাঁখায় ভরা হাতটা শব্দ করে উঠল। আমি হাত টেনে বললাম—ছেড়ে দাও।

সেও হাত ধরে রেখে বলল—একটু শোনো, দুটো কথা...

ও ছোটখাটো মানুষ, আমার হাত ধরে আটকে রাখার মতো যথেষ্ট গায়ের জোরই ওর নেই। নেচে কুঁদে বরং আমার হয়েই সেই আধা-পুরুষটা দুহাতে আমার কোমর জাপটে ঝুলে পড়ল, বলল—যেয়ো না। শুনে যাও।

ওর পা থেকে কোমর অবধি মেঝেয় লুটোচ্ছে, ঊর্ধ্ব অঙ্গ ঝুলছে আমার কোমর ধরে, হাস্যকর দৃশ্য। কিন্তু আমার হাসি পায়নি। ওর ওই সর্বস্ব দিয়ে ঝুলে থাকা টানে হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে যেতে আমি ওর মুখে থাবড়া দিলাম কয়েকটা। ও তবু ছাড়ল না। আমি টাল সামলাতে না পেরে থপ করে

বসে পড়লাম মেঝেতে। দরজা অবশ্য বন্ধ ছিল, তখন ছুটির দিনের দুপুরবেলায় বাড়ির বেশির ভাগ লোকই ঘুমোচ্ছে, তবু কথাবার্তা শুনে কেউ কৌতূহলী হতে পারে তো! বিশেষ করে জয়দেব এ সব ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিল। দিনের বেলায় সকলের সামনে আমার সঙ্গে কখনও কথা বলত না। বিয়ের একমাসের মধ্যেও দুপুরবেলা কখনও শারীরিকভাবে মিলিত হয়নি। সে নাকি শাস্ত্রে বারণ আছে। অসহ্য! অবশ্য মিলিত হয়েও সে যে আমাকে সুখী করতে পারত এমন নয়।

যাই হোক, দুজনে এক অস্বাভাবিক কুস্তির প্যাঁচ কষে যখন বসে বা শুয়ে আছি তখন জয়দেব আমাকে এইভাবে ধরে থেকে বলল—রাগ করে বুদ্ধি হারিয়ো না। বিয়ে ব্যাপারটাকে আমরা সামাজিক কর্তব্য হিসেবে মনে করি, তাতে দুই পরিবারের মান-মর্যাদাও জড়িত। তাই বলি হঠাৎ ডিভোর্সের কথা চিন্তা করে সব ভণ্ডুল কোরো না।

—আমাকে চিন্তা করতেই হবে। আর চিন্তাই-বা কী, আমি ঠিক করে ফেলেছি।

জয়দেব কোমর ধরে পড়ে আছে। সুযোগ বুঝে সে হঠাৎ আমার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে বলল—তাতে তোমার-আমার কারও সম্মান বাড়বে না। লোকে ছি ছি করবে।

সেই মুহূর্তে জয়দেবকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম। লোকটার কিছু দুর্জয় কুসংস্কার আর লোকলজ্জা আছে, যার জন্য ও আমার সব কলঙ্ককেও হজম করে যাবে। এটা বুঝে আমি আর একটু চাপ সৃষ্টি করার জন্য বললাম—তা হলে বলো, কী করে বুঝলে যে আমি কুমারী নই।

জয়দেব ভীত চোখে চেয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থেকেই হঠাৎ চোখ বুজে বলল—আমার ভুল হতে পারে অলকা।

—তার মানে?

—তার মানে কুমারীত্ব পরীক্ষার কোনও নিশ্চিত উপায় নেই।

—তবে বললে কেন?

—দেখলাম, তুমি স্বীকার করো কি না।

আমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের জন্মগত কিছু বুদ্ধি তো থাকেই। এই বোকাটা কী করে ভাবল যে আমি স্বীকার করব? আমি বললাম—কী স্বীকার করব?

জয়দেব হঠাৎ খুব বদলে গিয়ে বলল—আমাকে ক্ষমা করো।

বলতে নেই, সেই ক্ষমা প্রার্থনার কারণটা ছিল প্রবল কামেচ্ছা। হঠাৎ ওই রাগারাগি থেকে শারীরিক টানাটানির ফলে পরস্পরের নৈকট্য, ঘন শ্বাস, দেহগন্ধ, স্পর্শবিদ্যুৎ—সব মিলেমিশে এক প্রবল চুম্বকের ক্ষেত্র তৈরি করে দিল। দেহ-অভিজ্ঞতা তো তখনও আমাদের নতুন, তাই সামলাতে পারল না জয়দেব। ঝগড়াটা শরীরের মিলন দিয়ে শেষ হল।

আবার হলও না।

প্রভাসরঞ্জন

সুইস এয়ারের যে উড়োজাহাজে আমি ফিরছিলাম তাতে খুব একটা ভিড় ছিল না। জানালার ধারে এক জার্মান বুড়ি, তার পাশে এক বুড়ো, পরের সিটটায় আমি। বুড়োর হাতে আর্থারাইটিসের ব্যথা, তাই বুড়ি বুড়োকে কফি কাপ ধরে ধরে খাইয়ে দিচ্ছিল, খাবার মুখে তুলে দিচ্ছিল। বুড়োর মুখে বোধহয় প্যারালাইসিসের ছোঁয়া আছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সুপ গড়িয়ে পড়ে, মাংসের টুকরো হঠাৎ করে কোলের ওপর পড়ে যায়। ন্যাপকিন তুলে বুড়ি বারবার মুখ মুছিয়ে দেয়, আর আমার দিকে অপ্রতিভ হাসি হেসে চেয়ে কেবলই ক্ষমা চায়। বুড়োর কাঠামোটা বিশাল, এক সময়ে যৌবনকালে দাঙ্গাহাঙ্গামা করত বোধহয়। এখন বয়সে বড় জব্দ। কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যায়, খুব জোরে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে শ্বাস ছাড়ে। অনবরত সেই শব্দে প্রেশারাইজড আবহাওয়ার উড়োজাহাজের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও আমি জেগে উঠি। বিরক্ত হই। বুড়ো আমার দিকে একটু একটু অপরাধবোধ নিয়ে তাকায়। বুড়ো-বুড়িকে আমার খারাপ লাগছিল না। বেশ ভালবাসা দুজনের। আমার জার্মান বউ সিসি আমাকে

খুব ভালবাসত, যদি বিয়েটা টিকত আর আমরা এরকম বুড়ো হতাম, তবে কি তখনও আমার জন্য এতটা করত সে?

সিসির কথা একটু একটু ভাবছিলাম। ফ্রাঙ্কফুর্টে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। জার্মান মেয়েদের মতো গায়েগতরে বিশাল ছিল না, বেশ একটু নরম-সরম ছোট মাপের চেহারা। রোগাটে, সাদাটে, ভাবালু। খুব ভুলো মন ছিল তার। সেইসব দেখে আমি ঝপাং করে তার প্রেমে পড়ে গেলাম। সে তো পড়লই, যৌবনকালে ওরা বড় বেশি প্রেমে পড়ে। পরিচয়ের পর প্রেম হওয়ারও আগে আমরা এক বিছানায় বিস্তর শুয়েছি। যাকে ফুর্তিবাজ বলে আমি ঠিক তা নই। বিদেশে মেয়েদের গা-দেখানো এবং গায়ে পড়ার প্রবণতা এত বেশি ছিল যে সেখানে তাদের জলের মতো ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমারও এরকম অভিজ্ঞতা কিছু ঘটেছিল। সিসি তাদের মধ্যেই একজন। একসঙ্গে কিছুদিন থাকার জন্য ভূমিকা-টুমিকা করতে হয়নি। এবং কিছুকাল থেকে সরে পড়াতেও বাধা ছিল না। ফ্রাঙ্কফুর্টে আমার পনেরো দিনের ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফেরবার আগের দিন অবধি আমি সিসির একঘরের ছোট্ট বাসায় ছিলাম। থাকার খরচটা আমার বেঁচে যাচ্ছিল। ওকে আমার পছন্দও হচ্ছিল খুব। আসার দিন সকালে ঘুম থেকে ভাল করে ওঠার আগেই বিছানাতেই ওকে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিই। ও খুব হেসে বলল—ঠিক এরকম ভঙ্গিতে আর কেউ কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে বলে আমি জানি না। সিসি কিন্তু প্রস্তাব পেয়ে ভীষণ খুশি। ওর জীবনে সেটাই প্রথম প্রস্তাব। সেই দিনই রেজিস্ট্রি করে আমি ব্যলে চলে আসি। দেড় মাস পর সিসিও এল, আমরা দুজনে বেশ একটু কষ্ট করে থাকতাম। কারণ, ও এসে প্রথম প্রথম চাকরি পায়নি। তার ওপর গর্ভবতী। চাকরি পেলেও করতে পারত না। ও তখন রক্তাল্পতায় ভুগছে, সঙ্গে আনুষঙ্গিক নানা অসুস্থতা। আমার বেতন খুব বেশি ছিল না, সিসির চিকিৎসা আর যত্নের জন্য পুরো টাকাটা বেরিয়ে যেত। মাস চারেক পর একটু সুস্থ হয়ে সে ফিরে গেল ফ্রাঙ্কফুর্টে, আবার কদিন পর এল। আমিও যেতাম। ব্যলেই অবশেষে সে চাকরি পায় আমার কোম্পানিতেই। যথাসময়ে আমাদের এক পুত্রসন্তান হয়। তার গায়েব রংটা আমার রং ঘেঁষা বটে, কিন্তু দুরন্ত ইউরোপীয় রক্ত শরীরে বইছে, বিশাল ছেলেটা জন্মেই জার্মানদের মতো গাঁক গাঁক করে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

ছেলেটা যখন মাস চার-পাঁচেকের হল তখন সে আমার অতি আদরের ধন। বড়সড় চেহারা, কান্নাকাটি নেই, আমার কোলে উঠলে খুব চেঁচাত আনন্দে। অবিকল কাকাতুয়ার মতো শব্দ করত সে উত্তেজনার সময়ে। টিভি দেখতে খুব পছন্দ করত, কী কারণে জানি না লাইটার বা দেশলাই জ্বাললে খুব ভয় পেত। এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনলেই কাঁদো-কাঁদো মুখ হয়ে যেত। তার চার মাস বয়সে রং অনেক ময়লা হয়ে গেল, দাঁত উঠবার সময়ে বেশ রোগাও হয়ে গেল সে। তার প্রিয় খাবার ছিল মিষ্টি, চকোলেট বা ক্যান্ডি পেলে মুখের নাল দিয়ে মাখামাখি করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চুষতে ভালবাসত। সে বেশ বড়সড বাচ্চা ছিল, তবু তাকে দেখলেই বোঝা যেত যে সে ভারতীয় সন্তান, মুখে সিসির আদল থাকা সত্ত্বেও।

তার যখন পাঁচ মাস বয়স তখনই সিসি আর আমি আলাদা হওয়ার মনস্থ করি। আমার দিক থেকে ব্যাপারটা ছিল মর্মান্তিক, বাচ্চাটাকে ছেড়ে কী করে থাকব! সিসিও জার্মানিতে ফিরে যাওয়ার জন্য এবং ভিন্ন জীবনের জন্য খুবই উদগ্রীব। আমার মতো নিস্পৃহ এবং কম আমুদে লোককে সে সহ্য করতে পারত না। যেমন আমি পারতাম না তার অতি উচ্ছল ও খানিকটা নীতিবিগর্হিত চলাফেরা। আমার ভিতরে এক তেমাথাওলা ভারতীয় গেঁয়ো বুড়োর বাস। সে কেবলই সতী-অসতী, ভাল-মন্দ, নীতি-অনীতি বিচার করে যায়। কতবার তার মুখে হাতচাপা দিতে গেছি, থামাতে পারিনি। অশান্তির শুরু সেখানেই! একসময়ে আমার এও মনে হয়েছিল, সিসি চলে গেলেই বাঁচি, দেশে ফিরে একজন বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে সুখে থাকব।

কিন্তু ছেলেটাই মস্ত বাধা।

আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, আগেই বলেছি। সেটাও এই বিচ্ছেদের আর একটা কারণ। উপরন্তু সিসির বাবা মা বার্লিন থেকে তাকে ক্রমাগত চিঠি দিচ্ছিল ফিরে যাওয়ার জন্য। সিসি একটা মস্ত ভুল করেছে, তাদের ধারণা। সব মিলিয়ে একটা ঘোঁট পাকাল।

তারপর বিচ্ছেদ। ছেলের নাম রেখেছিলাম নীলাদ্রি। পরে সেই নাম সিসি বদলে দিয়েছিল কি না

জানি না। নীলুর জন্য আজও আমার মন বড় কেমন করে।

নীলু তার মার সঙ্গে জার্মানি ফিরে গেছে, আর আমার সঙ্গে তার দেখা হবে না। দেখলে চিনবেও না তেমন করে। এতকাল ইউরোপে তবু তার কাছাকাছি ছিলাম। উড়োজাহাজ যখন উড়িয়ে আনছিল আমাকে পুবের দিকে তখন কেবল মনে হচ্ছিল, নীলুর কাছ থেকে কত দূরে সরে যাচ্ছি।

পাশের বুড়োটা আমার হাঁটুতে হাত রাখল হঠাৎ। তন্দ্রা ভেঙে চমকে উঠি। তাকাতেই বুড়ো নাকের বাঁশি বাজিয়ে জড়ানো গলায় কী যেন বলে। আমি অস্পষ্ট শুনতে পাই—হাইজ্যাক!

ততক্ষণে বুড়িও সটান উঠে বসেছে। বুড়িও বলল—হাইজ্যাকারস—।

আন্তর্জাতিক বিমানে আজকাল সবসময়েই হাইজ্যাকের ভয়। বিমানের দুর্ঘটনার ভয়ের চেয়ে এই ভয় কিছুমাত্র কম নয়। কোথায় কোন গেরিলা বা লিবারেশন আন্দোলনেব বিপ্লবী পিস্তল-বোমা নিয়ে উঠে বসে আছে কে জানে! মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায় সর্বত্রই গভীর অসন্তোষ। দেশপ্রেমিক বা ভাড়াটে গেরিলা সর্বত্রই বিরাজ করছে। কখন কোন বিমানকে ভয় দেখিয়ে তারা অজানা ঠিকানায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, মুক্তিপণ হিসেবে কতজনকে আটকে রাখে বা হত্যা করে তার কোনও ঠিক নেই। তাই আজকাল আন্তর্জাতিক বিমানে উঠলে অনেকেরই বুক একটু ধুকপুক করে।

তাই বুড়ো-বুড়ির চাপা আর্তনাদ শুনে চমকে উঠে তাকিযে সামনের তিন সারি দূরত্বে একজন আরবকে দেখতে পাই। অবশ্য সে আরব কি না তা বলা খুবই মুশকিল, তবে সে যে মধ্যপ্রাচ্যের লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গাল ও থুতনি জুড়ে চাপা দাড়ি। চমৎকার মোটা গোঁফ। বাচ্চা একটা হাতির মতো তার বিশাল চেহারা। তাকে কয়েকবারই টয়লেটের দিকে যেতে দেখেছি উড়োজাহাজে ওঠার পর থেকে। পেটের রোগ, বহুমূত্র বা বাতিক না থাকলে অতবার কেউ বাথরুমে যায় না। কিন্তু তখন তাকে সন্দেহ হয়নি। এখন দেখি, কাঁধে একটা এয়ার ব্যাগ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে এক দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপে এয়ার ব্যাগটা ঝুলছে ব্যাগের চেন খোলা, তাব বাঁ হাতটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকানো। খুবই সম্ভব, সে ব্যাগের মধ্যে গুপ্ত গ্রেনেড বা পিস্তল ছুঁয়ে আছে, এবং পিছনের দিকে তার কোনও সহ-গেরিলার দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে—সব প্রস্তুত কি না।

একটু আগেই নীলুর কথা ভেবে আমার চোখে জল আসছিল। ছেলেকে ইউরোপে রেখে আমি চলে যাচ্ছি। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, আমার পরিচয় তার জীবন থেকে মুছে যাবে, আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে যাব পরস্পরের কাছে। অথচ সে আমারই বীজ, আমাব শরীব থেকে তার অস্তিত্বের জন্ম। এতখানি আমাদের আত্মিক সম্পর্ক, তবু সে আজ আমার কেউ না। খুবই শিশু অবস্থায় সে আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিল, সেই বয়স পর্যন্ত তাব হাবভাব, হাসা-কাঁদা, অবোধ শব্দ সবই আমার ভিতরে টেপ রেকর্ড করা আছে। স্মৃতির বোতাম টিপে দিলেই টেপ রেকর্ড বাজতে থাকে। সবই মনে পড়ে। আমার মাথার ভিতর থেকে একটা প্রোজেকটার মেশিন চোখের পর্দাব ওপবে তার সব চলচ্চিত্র ফেলতে থাকে। ছেলেটাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না, অধিকারবোধ ছাড়তে চায় না। নীলু আমার ছেলে—এই বাক্যটা ধ্রুবপদের মতো মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ফেরে। একটা অসহায় ভালবাসা বাৎসল্য আমাকে খুবই উত্তেজিত এবং অবসন্ন করে দেয়। দেশে ফিরে যাচ্ছি, সেখানেও আমার জন্য কোল পেতে কেউ বসে নেই। আদরে আহ্লাদে আমার দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। ছেলেবেলা থেকে আমাদের পরিবারে ভালবাসার চাষ কম দেখেছি। দুঃখে দারিদ্র্যে হতাশায় আধমরা মানুষ ছিলাম আমরা, পেটের ভাতই ছিল তখন ভালবাসার চরম নিদর্শন।

বাবা-মা বুড়ো হয়েছেন। সংসার প্রায় অচল। প্রথম প্রথম আমি টাকা পাঠিয়েছি। বিয়ে করার পর তাও পাঠাতে পারিনি। কীভাবে সংসার চলে তা আমার জানা নেই, জানতেও চাইনি। ও সব জানতে গেলে মন ভারাক্রান্ত হয়। তাই না জানারই চেষ্টা করেছি। বাবার চিঠিতে যে অংশ সংসারের দুঃখের বিবরণ থাকত সেই অংশ আমি বাদ দিয়ে পড়তাম। জানতাম, তাদের জন্য আমার আর কিছু করার নেই, খামোকা তবে তাদের দুঃখের কথা জেনে কী হবে।

এরোপ্লেনে বসে আমি সারাক্ষণ আমার দুটো জীবনের কথা ভাবছিলাম। স্বদেশে আমার দারিদ্র্যপীড়িত জীবন, বিদেশে আমার নানা আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা। এর ওপর নীলুর স্মৃতি। বিদেশিদের

মধ্যে এত বেশি সন্তানস্নেহ বোধহয় নেই। অন্তত আমার মতো পিপাসার্ত পিতৃহৃদয় আমি কারও দেখিনি। নিজের বাপ-মায়ের মধ্যেও পুত্রস্নেহের কোনও বাহুল্য প্রকাশ পেত না। তা হলে আমার এই প্রবল স্নেহ এল কোত্থেকে?

পরে আমি অনেক ভেবে এর একটা উত্তর খুঁজে পাই। আসলে স্বদেশে যারা আমার আপনজন তাদের কোনওদিনই আপন বলে মনে হয়নি। একমাত্র ছোটকাকাকে মনে হত। কেন মনে হত তা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। কিন্তু যেই তাকে সত্যিকারের ভালবাসতে শুরু করি সেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আবার বিদেশেও তাই। আমার ছেলেটিকে বুকে চেপে যখনই ভাবতে শুরু করি এই আমার নিজস্ব সন্তান, তখনই তার ছেড়ে যাওয়ার সময় হল।

আশ্চর্য এই, নীলাদ্রির মুখে আমার ছোটকাকার মুখের ছাপ ছিল। এও হতে পারে, স্নেহের দুর্বলতা থেকেই আমি তার মুখে কাকার আদল দেখতাম। পৃথিবীতে আমার প্রিয় জনের সংখ্যা খুব কম। বাবা-মার প্রতি আমার দুর্বলতা বা শ্রদ্ধা খুব বেশি থাকার কথা নয়। শিশুকাল থেকে অভাব, আর সংসারের ভার কাঁধে বয়ে তাঁদের ওপর আমার বীতশ্রদ্ধা এসে গিয়েছিল। মনে হত, আমার কোমরে শেকল দিয়ে সংসারটা কে যেন বেঁধে দিয়েছে, যার জন্য আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, অনার্স ছাড়তে হয়েছিল, জীবনের অনেক সার্থকতা আমাকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু লগ্ন পার হয়ে গেল। তাই নিজের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আমার এক বিরূপ মনোভাবের জন্ম হয়। যখন বিদেশে সিসিকে বিয়ে করলাম তখন সাময়িকভাবে মনে হয়েছিল, এই বুঝি ভালবাসার আশ্রয় পেলাম। ভুল, খুবই ভুল সেটা। সে ভালবাসার শুরু দেহের প্রেম দিয়ে তার বিয়ে কতদূর নিয়ে যেতে পারে আমাদের। শরীর জুড়োল তো ভালবাসা ফুরোল। আমরা কেবল শরীর দিয়ে পরস্পরকে ভালবাসার চেষ্টা করেছি। পরস্পরের সান্নিধ্য রাখা ছিল সামাজিক কর্তব্যের মতো । সেখানে বিশাল ও ব্যাপ্ত কর্মময় জীবনে সিসিও যেমন ব্যস্ত, আমিও তেমনই ব্যস্ত তাই আমাদের পরস্পরের ওপর নির্ভরতা কমে গিয়েছিল। ভারতীয় সংস্কারবশত আমি তার স্বাধীন চলাফেরা বা বহির্মুখিনতা খুব বেশি পছন্দ করতে পারতাম না। তাই সিসি নয়, নীলুই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। তার মুখের দিকে তাকালে আমার বুক ঠাণ্ডা হয়ে যেত। তাই নীলু চলে গেলে সারা পৃথিবীতে আমার আর কেউ রইল না।

না বিদেশে, না স্বদেশে, কোথাও আমার কেউ নেই—এরকম একটা বোধ আমার বুকে পাথরের মতো জমে আছে। বিদেশে থাকার আনন্দ নেই, স্বদেশে ফেরার আনন্দ নেই। আমার মতো এমন উদ্বাস্তু কে আছে কোথায়। এরকম মনের অবস্থায় মাঝে মাঝে আমার মরতে ইচ্ছে করত। কিন্তু মরাটা জীবনে একবারই ঘটে, তাই সেই নিশ্চিত অভিজ্ঞতাটিকে আমি কিছু বিলম্বিত করছিলাম। দেখা যাক, মরবার আগে কোথাও কোনও ভালবাসা বা প্রিয়ত্বের আলো চিড়িক দেয় কি না। তারপর আমার হাতের মুঠোয় মৃত্যু তো আছেই। এরকম মানসিকতা থেকে আমার মৃত্যুভয় কেটে গিয়েছিল। অন্তত কেটে গেছে বলেই ধারণা ছিল আমার।

আরব লোকটা যখন ওইরকম একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঘুরে তার সঙ্গীকে দেখছে আর আমার পাশের বুড়োটার একটা প্রকাণ্ড কাঁপা-কাঁপা ঘামে ভেজা হাত এসে আমার কবজি পাকড়ে ধরল, আর বাঁশির মতো শ্বাস ফেলতে ফেলতে যখন সে বারবার বলতে থাকল—'আইজ্যাক, 'আইজ্যাক', তখন অন্য অনেক যাত্রীও তন্দ্রা ভেঙে সচকিত হয়ে বসে পরিস্থিতি লক্ষ করছে। তাদের অনেকের মুখেই ভয়ের পাঁশুটে ভাব, তখনই আমিও হঠাৎ টের পেলাম, বাস্তবিক আমি আন্তরিকভাবে কোনওদিন মরতে চাইনি। মনে হল, জীবন কত সুন্দর ও বিশাল ছিল আমার। বয়স পড়ে আছে অঢেল। এখনও চেষ্টা করলে জীবনে কত কী করতে পারি।

আরব লোকটা তার প্রচণ্ড ঘন ভ্রূ দিয়ে ভ্রূকুটি করে 'আলিজা' কিংবা অনুরূপ একটা চাপা ধ্বনি করল। সম্ভবত কারও নাম। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। একটু আগেই ডিনার হয়ে গেছে, সেই অতি সুস্বাদু খাবারের স্বাদ এখনও জড়িয়ে আছে জিভে। সামান্য একটু মদ খেয়েছিলাম, তার রিমঝিম নেশা এখনও মাথায় রয়ে গেছে। সুন্দর একটা শারীরিক তৃপ্তির পর একটু আগে কফি শেষ করে সিগারেট খেয়েছি। সেইটাই কি জীবনের শেষ পানভোজন? কে জানে, কে বলবে?

ও পাশের বুড়িটা একটা ফোঁপানির শব্দ করল। সাহেব মেমরা কম কাঁদে। প্রকাশ্যে তো কখনওই

কাউকে কাঁদতে দেখিনি। কিন্তু বয়সের দোষে এবং ভয়বশত বুড়ি কাঁদছিল। কথা প্রসঙ্গে জেনেছিলাম, তাদের ছেলেপুলে নেই, দুজনেরই আগে একবার করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তাদের পরস্পরের এই বিয়েটা অনেকদিন স্থায়ী হয়েছে, মৃত্যুর আগে তাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—বলেছিল বুড়ি। বুড়োর গা একটা কম্বলে ভাল করে ঢেকে-ঢুকে দিচ্ছিল একটু আগে, তাতে আমিও সাহায্য করেছি। আমার জীবনে ভালবাসা নেই বলেই বোধহয় তাদের ওই ভালবাসা আমার খুব ভাল লেগেছিল। এই তো এরা দুনিয়ার আর কারও পরোয়া করে না, পরস্পরকে নিয়ে কেমন মেতে আছে। প্রিয়জনের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুতেই তো এই পৃথিবী আর জীবনকে উপভোগ করা সম্ভব নয়। জীবনের একেবারে শেষভাগেও এই দুই অথর্ব স্বামী-স্ত্রী নিজেদের বেঁচে থাকাকে একরকম করে উপভোগ করছে দেখে আমার একটু ঈর্ষা-মেশানো আনন্দ হচ্ছিল।

আরব লোকটা কাকে ডাকল কে জানে! কিন্তু পেছন থেকে কোনও উত্তর এল না। আরবটা তখন তার সিট থেকে বেরিয়ে মাঝখানের প্যাসেজটায় দাঁড়াল, তখনও ব্যাগের মধ্যে হাত। খুব সম্ভবত সেই লুকানো হাতটা গ্রেনেডের সেফটি ফিউজ আলগা করছে আস্তে আস্তে। প্যাসেজে দাঁড়াতেই তার বিশাল চেহারাটা আরও বিশাল নজরে পড়ল। তার বাহুর ঘের বোধহয় আমার বুকের সমান হবে। বুকটা মাঠের মতো ধূ-ধূ করা বিরাট। ইচ্ছে করলে ও বোধহয় ঘুষি মেরেই পলকা প্লেনটাকে তুবড়ে দিতে পারে। কিন্তু আপাতত সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, চোখে ভ্রূকুটি। ডান হাতটা খানিকটা মুঠো পাকিয়ে আছে। যাত্রীরা সবাই দৃশ্যটা দেখছে, কিন্তু কেউ নড়ছে না। কিন্তু অস্ফুট 'হাইজ্যাক' শব্দটা চারপাশ থেকে শুনতে পাচ্ছি। ফিসফাস শব্দ হচ্ছে। একটা বছর ছয়েকের বাচ্চা প্লেনের পিছন দিকে রয়েছে, তার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, পরিষ্কার ইটালিয়ান ভাষায় সে তার মাকে জিজ্ঞেস করছে—মরে গেলে আমাদের কি রোমে ফিরতে দেরি হবে?

আমাদের দমদমের বাড়িতে একদিন একটা কাক ডানা ভেঙে পড়ে গিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যায়, আর তাকে ঘিরে সারাদিন হাজারটা কাক চেঁচামেচি করেছিল। আমার ছোট ভাই দৃশ্যটা খুব করুণ চোখে দেখেছিল। পর দিন যখন আবার এঁটো কাঁটা কাক খেতে এসে উঠোনে নামছে তখন সে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা কাককে দেখিয়ে বলল—দাদা, ওই কাকটা কাল মরে গিয়েছিল না রে?

সেই স্মৃতিটা মনে আসতেই এক ঘোর মায়ায় আমার বুক ভরে গেল। শিশুরা তো মৃত্যুকে জানে না! ওই মেয়েটির কণ্ঠস্বর আমাকে যেন চাবুক মারল। নীলুর কথা মনে এল, ছোট ভাইটার কথা মনে এল। স্নেহমায়ায় বুক ভরে গেল। আর ওই তীব্র চেহারার আরব লোকটির দিকে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আমার ভিতরে মৃত্যুভয়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটাল যেন।

আরবটা এক পা, এক পা করে কয়েক পা এগিয়ে এল। দাঁড়াল। আবার এগোল। দাঁড়াল। সেই একই ভঙ্গিতে তার ডান হাত মুঠো পাকানো। বাঁ হাত ব্যাগের মধ্যে ভরা। একটু বাদেই কিছু একটা ঘটবে। লোকটার মুখে-চোখে এক কঠিন আত্মপ্রত্যয়। মৃত্যুর প্রতি সে নির্মমভাবে উদাসীন। সবরকম বিপদকে নিয়েই সে বেঁচে আছে।

আর তখন হঠাৎ আমার মানসিক একটা বিকলতা ঘটে গেল। হঠাৎ যেন এরোপ্লেনের মৃদু চাপা শব্দ, আর অতি ক্ষীণ থরথরানি থেমে গেল। আর আমি এক স্বপ্নময় দৃশ্যের মধ্যে ঢলে পড়লাম।

সেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবতাবর্জিত।

দেখি, একটা বিচিত্র দেশে আমি পৌঁছে গেছি। এখানে মাটির রং নীল, তার ওপর হলুদ সবুজ লাল গোলাপি, হরেক রকমের ঘন ঘাস গজিয়ে চারধারে যেন এক বিভিন্ন রঙের দাবার ছক তৈরি করে রেখেছে। এইসব রঙিন ঘাসের নিখুঁত চৌখুপির ধারে ধারে নাতিদীর্ঘ গাছে সম্পূর্ণ গোল রামধনু। ছবিতে যেমন সব কাল্পনিক পাখি দেখা যায়, তেমনই সব পাখি উড়ছে চারধারে। আকাশের রং উজ্জ্বল নীল, তাতে গোল গোল সুন্দর নানাবর্ণের মেঘ। তারাগুলো অনেক কাছে কাছে ফুটে আছে। আর প্রতিটি তারার মধ্যেই নাক মুখ চোখ আঁকা। আকাশের একধারে একধারে এত বড় একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে যে মনে হয় দিগন্তের প্রায় বারো আনা অংশ জুড়ে আছে। চারধারে ছোট ছোট টিলা রঙিন কাচ আর কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়ি। রাস্তা দিয়ে পুতুলেরা হেঁটে যাচ্ছে। দুটো কুকুর অবিকল মানুষের ভাষায়

কথা বলছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। গ্রোসারি শপ-এর সামনে একটা টেকো পুতুল একটা পাখির সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করছে। তিনজন পরী উড়ে উড়ে রামধনুগুলোয় আরও ভাল করে রং দিয়ে দিচ্ছে। একটা খেলনা মোটরগাড়ি মোরগের ডাকের মতো ভেঁপু বাজিয়ে চলে গেল। চারধারে কী এক অপরিসীম শান্তি, এক মৃত্যুহীন নিরাপদ শাশ্বত জগৎ!

পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, নীলুর জন্য যে সব ছবির বই কিনে দিয়েছিলাম আমি, তারই কোনওটার মধ্যেই এই ছবিটা ছিল। আমি সেইরকমই একটা ছবির মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

আমি হঠাৎ ডুকরে বলে উঠলাম—নীলু!

আরব লোকটা সেই মুহূর্তেই আবার ডাকল—আলিজা!

এবার পিছন থেকে একটা শব্দ হল। তারপর একটা লম্বা, সুন্দরপানা মেয়ে উঠে এল কোথা থেকে। তারও অবিকল মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা। সে এসে এই বিশাল লোকটায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল। এই মেয়েটাই কি ওর সহ-গেরিলা?

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অলকা

এই সকালবেলায় আমার ঘরখানা চমৎকার দেখাচ্ছে। সারা দিনের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দের হল সকালবেলা। আমি খুব ভোরে উঠতে পারি না বলে আমার একরকম দুঃখ আছে। তবে মাঝে মাঝে বেশ ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে ঘরময় সকালের রোদ দেখি। কী সুন্দর লাগে ভোরের একটা আলাদা গন্ধ! লক্ষ করে দেখেছি, সকালে ঘুম থেকে উঠলেই মানুষকে সবচেয়ে ভাল দেখায়।

পার্ক সার্কাসের এই ফ্ল্যাটটা প্রথমে ভাড়া করেছিল আমাদের এক মাসতুতো দাদা। আমার বিয়ের ছ মাস পর আমি আর জয়দেব হনিমুন করতে যাই শিলঙে। বুদ্ধিটা কার ছিল কে জানে। জয়দেবদের পরিবারে হনিমুনের চল ছিল না। কিন্তু আজকাল বাঙালি সমাজে হনিমুনের চল হয়েছে। আমার মনে হয় জয়দেবই আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য পরিবার থেকে কিছুদিন আমাকে নিয়ে আলাদা হতে চেয়েছিল। সেইটেই হল কাল।

শিলঙে আমরা একটি হোটেলের ঘরে দুটো ঝগড়াটে বেড়ালের মতো দিনরাত ফোঁসফোঁস করতাম। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতাম না।

জয়দেব হয়তো বলল—এক গ্লাস জল দাও তো!

আমার প্রেস্টিজে লাগল, বললাম—গড়িয়ে খাও, নয়তো বেয়ারাকে বলো।

—তুমি তো আমার বউ, এটুকু করলে তো দোষ হয় না।

—বউ মানে তো ঝি নয়।

একদিন একটা মেয়েকে দেখে জয়দেব বলল—দেখ, মেয়েটি কী সুন্দর!

স্বামী কোনও যুবতীকে সুন্দর দেখলে স্ত্রীর একটু হিংসে হওয়ার কথা, আমার হল না। বললাম—বেশ সুন্দর!

—আলাপ করব?

—করো না। তবে তুমি তো তেমন স্মার্ট নও, ভাল করে ভেবে-চিন্তে কথা বলো।

জয়দেব অবশ্য গেল না কথা বলতে। চেরাপুঞ্জি দেখতে গিয়েও খুব তুচ্ছ কারণে একচোট ঝগড়া হল। জয়দেব বলল—চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় এটা কিন্তু সত্যি নয়। আমি রিসেন্টলি একটা বিদেশি ম্যাগাজিনে পড়েছি আর একটা কোনও জায়গায় যেন এর চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়।

চেরাপুঞ্জিতে না হয়ে অন্য কোথাও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হলেই-বা আমার ক্ষতি কী? কিন্তু যেহেতু জয়দেব বলছে, সেই হেতু আমার কথাটা ভাল লাগেনি, মনে হয়েছিল ও একটু পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা করছে।

আমি বললাম—আন্দাজে বোলো না।
—না অলকা, আমি পড়েছি।
—মিথ্যে কথা। চেরাপুঞ্জিতেই বেশি বৃষ্টি হয়।
জয়দেব রেগে বলে—আমি বলছি আমি পড়েছি।
—পড়লেও ভুল পড়েছ। আমরা ছেলেবেলা থেকেই চেরাপুঞ্জিকে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির জায়গা বলে জানি।
—ভুল জানো।
—তুমি ভুল পড়েছ।
এইভাবেও আমাদের ঝগড়া হত।
শিলং বা চেরাপুঞ্জির দোষ নেই, ভূগোল বই বা বিদেশি ম্যাগাজিনও দায়ী নয়। আমরা দুজনেই টেলিফোনে দুটো রং নাম্বার পেয়ে অচেনা লোককে চেনা ঠাওরাবার অভিনয় করছি।
শিলং থেকে দুজনেই কিছু রোগা হয়ে ফিরে এলাম। শ্বশুরবাড়িতে কিছুকাল থেকে শরীর আরও খারাপ হল। লোকে ভাবল বোধহয় মা হতে চলেছি। ডাক্তার দেখে বলল—না, পেটে ফাংগাস হয়েছে।
শরীর সারাতে বাপের বাড়ি গেলাম। মাসখানেক পর জয়দেব নিতে এল। গেলাম না। জয়দেব তখন গ্রামে ঘুরে কটেজ আর স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ-এর জন্য কী সব কাজ করে বেড়ায়। বাড়িতে খুব একটা থাকে না। শুনলাম, প্রাচীন মন্দিরের ওপর থিসিস লিখছে ডকটরেট করার জন্য। আমি শ্বশুরবাড়ি যেতে চাই না শুনে রাগ করে বলল—আমি কুড়ি দিন বাইরে বাইরে ঘুরে ফিরলাম, তুমি এ সময়ে যাবে না আমার কাছে?
আমি প্লেটে করে আচার খাচ্ছিলাম, জিভে টকাস টকাস শব্দ করে বললাম—আমাকে দিয়ে তোমার কী হবে? বউগিরি করতে আমার ভাল লাগে না।
জয়দেব আমার আচার খাওয়া দেখছিল। ওই সিরিয়াস অবস্থাতেও ওর মুখ রসস্থ হয়ে গিয়েছিল, মুখের ঝোল টেনে বলল—বউ গিরি কথাটা কি ভাল।
আমি হেসে ফেললাম। বললাম—ভাল না মন্দ কে জানে। আমার তো তাই মনে হয়।
জয়দেব হাল না ছেড়ে বলল—তুমি কি আমাকে একটুও সহ্য করতে পারো না?
—পারতে পারি। যদি তুমি আলাদা থাকো।
—আলাদা থাকলে কী হবে?
—আমি আলাদা বাসায় স্বাধীনভাবে থাকতে পারি। তোমাদের বাড়ির অত লোকের মধ্যে থাকতে আমার ভাল লাগে না। তুমি আলাদা বাসা করে খবর দিয়ো। যাব।
—এই কি শেষ কথা?
—হ্যাঁ।
—আমার বাড়ির লোক তোমার কী ক্ষতি করেছে?
—তা জানি না। তবে যদি আমাকে চাও তো বাড়ি ছাড়তে হবে।
জয়দেব ভাবল। ফিরে গেল। মনে হল, কথাটা সে ভেবে দেখবে।
কিন্তু জয়দেবকে আমি তখনও ঠিক চিনতে পারিনি। বাড়ি ছাড়বার ছেলে জয়দেব ছিল না। কদিন পর তার একটা পরিষ্কার চিঠি এল। বাঁকুড়ার এক গ্রাম থেকে লিখে পাঠিয়েছে—অলকা, বিয়ে ভাঙার জন্য যা করতে হয় তা তুমি করতে পারো। আমি ইনিশিয়েটিভ নেব না। বিয়ে ভাঙা আমি পাপ বলে মনে করি। কিন্তু তুমি যদি চাও তো দাবি ছেড়ে দেব।
চিঠিটা পেয়ে যে খুব উল্লসিত হয়েছিলাম তা নয়। কোথায় যেন আমার মেয়ে-মানুষি অহঙ্কারে একটু ঘা লাগল। যত যাই হোক, একবার বিয়ে হয়ে গেলেই তো মেয়েরা আর কুমারী রইল না। এই বাংলাদেশে কুমারী যে নয়, সে একা হলে বড় মুশকিল।

এই চিঠি এলে আমাদের পরিবারেও হুলুস্থুল পড়ে গেল। বাবা যত প্রগতিপন্থী হোন, মা যত আধুনিকা হোন, মেয়ে বিয়ে ভেঙে স্বামী ছেড়ে চলে আসবে, এটা তাঁরা সহজভাবে মেনে নিতে

পারেননি।

বাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন—চল অলকা, আজই তোকে তোর শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে আসি।

মাও বাবার সঙ্গে একমত। আমার ঠাকুমা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করলেন। দাদাও খুশি নয়।

অথচ আমি-ই বা কেন শ্বশুরবাড়ি যাব?

বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া লাগল। আমি স্পষ্ট বললাম, যদি জয়দেব বাড়ি থেকে আলাদা হয় একমাত্র তবেই আমি ফিরে যেতে পারি।

বাড়ির লোকজন আমার মতে মত দিল না। জোর করতে লাগল। আমি প্রায় একবস্ত্রে মাসির বাড়ি চলে এলাম।

মাসিও বাঙালি হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমাকে চূড়ান্ত প্রশ্রয় দিয়েছে একসময়ে। সব রকম আধুনিকতায় শিক্ষিত করেছে, তবু দেখা গেল আমার এই বিয়ে-ভাঙার ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছে না। বলল—দূর মুখপুড়ি, স্বামীর সঙ্গে যত ঝগড়াই করিস, বিয়ে ভাঙতে যাস না। এ দেশে যারা বিয়ে ভাঙে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হয়, হুট করে এই কম বয়সে ও সব করিস না।

মাসির সঙ্গেও বনল না। অথচ কেন জানি না মনটা বড্ড আড় হয়ে আছে, জয়দেব বা তার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না।

আমার আর এক মাসির ছেলে অসীমদা তখন বিলেত যাচ্ছে। বউ-বাচ্চা নিয়েই চলে যাবে। পাঁচ-সাত বছর ফিরবে না। তার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ থাকবে এমন কথা হচ্ছিল। কলকাতায় বাসা পাওয়া প্রচণ্ড সমস্যা বলে তারা ফ্ল্যাটটা ছাড়তে চাইছিল না। তখন আমি অসীমদাকে বললাম—ফ্ল্যাটটায় আমাকে থাকতে দাও।

অসীমদা খুশি হয়ে বলল—তবে তো ভালই হল। কতগুলো দামি ফার্নিচার রয়েছে, তুই আর জয়দেব থাকলে ভালই হবে।

জয়দেব থাকবে না, আমি একা থাকব—এটা আর অসীমদার কাছে ভাঙলাম না।

ওরা যেদিন রওনা হয়ে গেল সেদিন বিকেলে গিয়ে ফ্ল্যাটটা দখল করলাম। জীবনে এই প্রথম একা থাকা। একদম একা। একটু ভয়-ভয় করছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড আনন্দও হচ্ছিল। একা আর স্বাধীন হওয়ার মধ্যে কী যে আনন্দ!

বাড়ি থেকে মা বাবা আত্মীয়স্বজনরা এসে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক জ্বালাতন করল, আমি জেদবশত গেলাম না। বাড়িতে ফিরে গেলেই ক্রমাগত আমার ওপর নানাদিক থেকে চাপ সৃষ্টি হবে। অনেক ঠেস-দেওয়া বাঁকা কথা, অনেক চোরা-চাউনি আর মুচকি হাসি সইতে হবে। তার চেয়ে বেশ আছি। ফিরে গেলাম না বলে সকলেরই রাগ, মা তো মুখের ওপরে বলেই গেল—তুমি বদমাশ হয়ে গেছ। নষ্টামি করার জন্যেই একটা ফ্ল্যাটে একা থাকবার অত শখ।

ব্যাপারটা তা নয়। বিয়ের আগে যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আমার মনের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। পুরুষদের প্রতি আমার এক ধরনের অনাগ্রহ, উদাসীনতা, কেন জানি না, জন্মেছে।

একা ফ্ল্যাটে থাকতে হলে চাকরি চাই। কলকাতায় চাকরির বাজার তো তেমন সুখের নয়। তবু চেষ্টা-চরিত্র করে এক চেনা সূত্র ধরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক অধ্যাপকের বাড়িতে বাচ্চা রাখার কাজ পেলাম। ইংরিজিতে বলে বেবি সিটার। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে। স্ত্রী ডাক্তার। তারা মানুষ বেশ ভাল। বালিগঞ্জ প্লেসে তাদের বাড়িতে সকাল আটটা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত সাত আর তিন বছরের দুটো ছেলেমেয়েকে সামলে রাখতাম। দুপুরের খাবার দিত আর দুশো টাকা মাইনে। সাত বছরের ছেলেটা কনভেন্টে পড়তে যেত। তাই তাকে বেশি আগলাবার দরকার পড়ত না। তিন বছরের মেয়েটাকে সারাদিন ঘড়ি ধরে সাজাতাম, খাওয়াতাম, গল্প বলে ঘুম পাড়াতাম। বেশ লাগত। অসম্ভব মিষ্টি আর দুষ্টু মেয়েটা, সাতদিনেই সে আমার বড় বেশি ন্যাওটা হয়ে গেল। তার কচি মুখের দিকে চেয়ে বুকের মধ্যে ঢেউ দিত একটা কথা—আমার যদি এরকম একটা মেয়ে থাকত।

যে সব বাচ্চার মা চাকরি করে তাদের যে কী দুরবস্থা হয় তা এই দুটো বাচ্চাকে দেখেই বুঝতাম। দুজনেই কিছু অস্বাভাবিক রকমের চঞ্চল, অভিমানী, আর নিষ্ঠুরও ছিল। প্রথমে গিয়েই আমি বাচ্চাদুটোর মধ্যে কেমন ভয়-মেশানো সন্দেহ-মেশানো একরকমের দৃষ্টি দেখেছিলাম চোখে। সারাদিন

ওরা মায়ের জন্য অপেক্ষা করত মনে মনে। ডাক্তার মায়ের ফিরতে রাত হত। তখন মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েও জেগে জেগে 'মা' বলে ডেকে ফের ঘুমোত। অন্য কোনও বাচ্চা দেখলেই মেয়েটা তাকে গিয়ে মারত, খিমচে দিত, চোখে খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করত। সব সময়ে সে যেন তার প্রতি এক অজানা অন্যায়ের শোধ নেওয়ার চেষ্টা করত। বড় কষ্ট হত আমার।

মাস তিনেকের মধ্যেই আমি বাচ্চা দুটোর আসল মা হয়ে উঠলাম। সারাদিন আমি তাদের নিয়ে থাকি। আমার নিজের ছেলেমেয়ে হলে তাদের নিয়ে কী করতাম সেই ভেবে মায়ের মতো সব হাবভাব করি, বায়না রাখি, শাসন করি। ওরা তাই আমার মধ্যে হারানো মা কিংবা নতুন মা খুঁজে পেল। নিজেদের মার জন্য খুব বেশি অস্থির হত না। বরং আমি সন্ধেবেলা চলে আসবার জন্য তৈরি হলে মেয়েটা ভয়ংকর কান্নাকাটি করত। তাকে ঘুম না পাড়িয়ে আসা মুশকিল হয়ে উঠল। এইভাবেই জড়িয়ে পড়লাম ওদের সঙ্গে। কিন্তু বাচ্চাদের বাবা রোহিতাশ্ব চৌধুরী একদিন আমাকে বললেন—অলকা, আপনি তো খুবই শিক্ষিতা এবং ভদ্রঘরের মেয়ে, এ কাজ আপনার উপযুক্ত নয়। যদি বলেন তো আপনার জন্য একটা ভদ্রগোছের চাকরি দেখি।

তাই হল। এ কথার মাস দুয়েকের মধ্যে আমি একটা বাঙালি বড় ফার্মে টাইপিস্ট-ক্লার্কের চাকরি পেলাম। বাচ্চাদের জন্য মনটা খুব ফাঁকা লাগত। ওরা আর একজন বেবি সিটার রেখেছে জেনে মনটাও খারাপ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসি ওদের, এটা-সেটা কিনে দিই। কিন্তু মাতৃত্বের এক অসম্ভব ক্ষুধা বুকের মধ্যে কেবলই ছটফট করে।

জয়দেবের সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদের কোনও সক্রিয় চেষ্টা আমি করিনি। সে বড় হাঙ্গামা। উকিলের কাছে যাও, সাক্ষী জোগাড করো। তা ছাড়া আমার অভিযোগ-বা কী হবে জয়দেবের বিরুদ্ধে? তাই ও সব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আলাদা আছি বেশ চলে যাচ্ছে, আব কেন মামলার হাঙ্গামায় যাওয়া? জয়দেব তো আমাকে চিমটি দিচ্ছে না!

যুবতী মেয়ে। একা থাকি। আমার কি কোনও বিপদ হয়নি?

হয়েছিল। কিন্তু সে তেমন কিছু নয়। অসীমদার ফ্ল্যাটে একটা ফোন ছিল, তাতে কিছুদিন একটি ভিতু ছোকরা আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করাব চেষ্টা করে। আমি ফোন তুলেই গলা চিনেই ফোন ছেড়ে দিতাম। তিন মাস পর সে হাল ছেড়ে দেয়। ওপরতলার এক মহিলার ফ্ল্যাটে মদ আর জুয়ার আড্ডা বসত। একবার সেখানকার এক মাতাল আমার ঘরের কড়া নেড়েছিল, আমি দরজা খুললে সে আমাকে ধরবারও চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা মাতলামি। পরে সে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিল।

এরকম দু-একটি ছোটখাটো ঘটনা বাদ দিলে আমার জীবন ছিল বেশ নিবাপদ। আমি একা থাকি না দোকা থাকি সেটাও তো সবাই জানত না। কলকাতায় কে কাকে চেনে!

তবে আমি যে-ফার্মে চাকরি করতাম সেই ফার্মের একটি উজ্জ্বল সুপুরুষ আর স্মার্ট ছেলে আমার প্রতি কিছু দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে দু-একবার রেস্টুরেন্টে গেছি, বেড়িয়েছি এদিক-ওদিক। কিন্তু কী জানি তার প্রতি আমার কখনও কেন আগ্রহ জাগল না।

তবে সে একবার আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

প্রভাসরঞ্জন

আমার জীবন শুরু হয়েছে কয়েকবার। শৈশবে যে-জীবন শুরু করেছিলাম দেশভাগের পর তা শেষ হয়ে যায়। নতুন এক রুক্ষ ভিখিরির স্নেহহীন জীবন শুরু করেছিলাম। মধ্যে যৌবনে বিদেশে গেলাম নতুন আর একরকম জীবন শুরু করতে।

কতবার কতভাবে শুরু হল, আবার শেষও হয়ে গেল। এখনও আয়ু অনেকটা পড়ে আছে, কতবার আরও নিজের জন্ম ও মৃত্যু দেখতে হবে কে জানে?

ফেরার সময়ে সেই এরোপ্লেনেই যেমন, গেরিলারা যদি প্লেন হাইজ্যাক করে নিয়ে যেত, যদি মুক্তিপণ হিসেবে বন্দি করত আমাদের এবং যদি প্রতি ছ ঘণ্টা অন্তর এক-একজন যাত্রীকে গুলি করে

মেরে ফেলত তাদের দাবির বিজ্ঞপ্তি হিসেবে? না, সে সব কিছুই হয়নি। না হলেও সেই কয়েকটা মুহূর্তের আকণ্ঠ মৃত্যুভয় আমাকে একেবারে শেষ করে ফেলল।

সেই রূপসী তরুণীটি দৈত্যকার লোকটির সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে কী বলছিল তা বোঝার সাধ্য আমার ছিল না। চোখের পলক না ফেলে হাঁ করে চেয়ে দেখছি দৃশ্যটা, আমার পাশে বসা বুড়োর নাকে বাঁশির শব্দ হচ্ছে, বুড়ি অস্পষ্ট স্বরে কেঁদে কী যেন বলছে বুড়োকে। প্লেনসুদ্ধ যাত্রীরা আতঙ্কে চেয়ে আছে দৃশ্যটার দিকে।

মেয়েটা কথা বলতে বলতে এক পা দু পা করে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। লোকটা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, চোখ দুখানায় বাদামি আগুন ঝলসাচ্ছে। তারা দুজন চারদিকে যাত্রীদের চোখকে গ্রাহ্য করছে না, যেন আর কেউ যে উপস্থিত আছে এ তারা জানেই না।

মেয়েটা খুব কাছাকাছি এগিয়ে গেলে দৈত্য লোকটার চোখ-মুখ হঠাৎ খুব নরম হয়ে গেল। দুটো প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির মতো হাতে লোকটা সেই পলকা মেয়েটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তারপর চকাস চকাস করে চুমু খেতে লাগল।

ঠিক এরকমটার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। ডানদিকে একটা লোক হেসে উঠল। পাশের বুড়ি বুড়োকে বলছে—ও গড, হি উইল ব্রেক দ্য গার্লস ব্যাক। পিছন থেকে একটা হাততালির শব্দ আসে। একজন বলে ওঠে—হ্যাপি এন্ডিং। পিছনের ইটালিয়ান বাচ্চাটা বিস্মিত স্বরে বলে ওঠে—ওরা কখন মারবে? চুমু খাওয়ার পর?

দুজন সুন্দরী হোসটেস এতক্ষণ সামনের দিকে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল এদিকে চেয়ে। এবার তারা প্রাণ পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে আসে। দৈত্যটির পিঠে টোকা দিয়ে একজন জার্মান ভাষায় বলে—ইচ্ছে হলে আপনি বসতে পারেন। সামনের দিকে একটা টুইন সিট আছে।

লোকটা মেয়েটাকে খানিক নিষ্পিষ্ট করে মুখ তুলে বলে—ড্রিঙ্ক আনো, আমার তেষ্টা পেয়েছে।

পিছনে যেখানে আলিজা বসেছিল তার পাশের সিটে একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের তরুণ ছিল। তাকে কেউ লক্ষ করিনি এতক্ষণ। সবাই ঘাড় ঘোরাচ্ছে দেখে আমিও পিছু ফিরে ছেলেটাকে দেখতে পাই। একটা বাদামি শার্ট গায়ে, গলার টাইটা আলগা, মুখটা অসম্ভব লাল, দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, সে এই প্রেমের দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না, অসম্ভব রেগে গেছে এবং এক্ষুনি সে একটা কিছু করবে।

কী সে করত জানি না, তবে দৈত্যকায় লোকটির বুকে সেঁটে থেকেই মেয়েটা একবার পিছু ফিরে চেয়ে চোখের একটা ইশারা করল তাকে! সে বসে পড়ল ধীরে ধীরে।

দৈত্য লোকটা সেই মেয়েটিকে নিয়ে আরও সামনের দিকে কোথাও গিয়ে বসল।

আমি হোসটেসকে ডেকে একটু ড্রিংকস চাইলাম। আর সেটি পরিবেশনের সময়ে জিজ্ঞেস করতেই সুন্দরী হোসটেসটি মৃদু স্বরে বলল—লাভ ট্র্যাংগল।

কিন্তু একটু বাদে পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে নিচু স্বরে কী যেন বলল অনেকটা সময় ধরে। তারপর দেখি, তরুণী হোসটেস ছাইরঙা এক আতঙ্কিত মুখে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে বেতার-ঘরের দিকে। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হোসটেসের মুখের ভাব অনেকেই লক্ষ করেনি। তাই বেশির ভাগ লোক নিশ্চিন্তে বসে আছে। আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

বেইরুটে প্লেন থামতে দরজা খুলে কয়েকজন বিশালদেহী যাত্রী উঠল। তাদের চেহারা হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। উঠে মুহূর্তের মধ্যে তারা প্লেনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল চোখের পলকে দেখি তাদের হাতে হাতে উঠে এসেছে এল.এম.জি. কারবাইন, থমপসন অটোম্যাটিক। চারজন সেই দৈত্যের মতো লোকটা আর তার বিস্মিত বান্ধবীকে ঘিরে ফেলল। দুজন গিয়ে ধরল পিছনের ছেলেটিকে।

বাচ্চা হাতির মতো লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে চাইল। রাগে তার মুখ টকটকে লাল। চেঁচিয়ে সে তার দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন গালাগাল করছিল পিছনের ছেলেটিকে। আর সেই ছেলেটিও কী যেন জবাব দিচ্ছে বেপরোয়া মুখে।

ছদ্মবেশী আর্মড গার্ড তিনজনকেই নামিয়ে নিয়ে গেল মেশিনগান আর অটোম্যাটিকের নল গায়ে ঠেকিয়ে। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে সার্চ করা হল প্লেন। গুঞ্জন শোনা গেল, ওই তিনজনই ছিল গেরিলা।

বেইরুটের পর তারা প্লেন হাইজ্যাক করত। প্রেমের ত্রিকোণ বাধা হয়ে না দাঁড়ালে কী হত বলা মুশকিল। প্রেমে ব্যর্থ পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে তাদের সব গুপ্তকথা বলে দিয়েছিল।

গেরিলাদের ক্ষেত্রে এরকম বড় একটা হয় না, আমি জানি। সর্বত্রই আমি মৃত্যুপণ গেরিলাদের লক্ষ করে দেখেছি। প্রেম তাদের কাছে কোনও সমস্যাই নয়। আমার এখনও মনে হয় ওরা গেরিলা ছিল না। পিছনের ছেলেটি নিজেদের গেরিলা বলে পরিচয় দিয়ে ইচ্ছে করেই গণ্ডগোল পাকিয়েছিল। কিন্তু সত্যিকারের ঘটনা কী তা আমি আজও জানি না। কিন্তু প্লেন বেইরুট থেকে উড়লে মনে হয়েছিল, আমরা আবার জীবন ফিরে পেলাম। আমি যে-জীবন ফিরে পেলাম সেটা কেমন? সে-জীবন শেষ হলেই-বা কী ক্ষতি ছিল?

দমদমের দরিদ্র বাড়িটিতে এসে যখন পৌঁছোলাম তখন আমার বাবা-মা যথাসাধ্য আনন্দ প্রকাশ করলেন। ইতিমধ্যে আমার ছোট ভাই একটা বিয়ে করেছে। আমার ভাই, ভ্রাতৃবধূও যথাসাধ্য খুশির ভাব দেখাল। ভাইয়ের সদ্য একটি ছেলে হয়েছে। আমি বিদেশ থেকে কিছু লোভনীয় জিনিস এনেছিলাম। সেগুলো বাড়ির লোকদের বিলিয়ে দিলাম। সবাই অসম্ভব খুশি হল তাতে। একেই তারা ভাল জিনিস চোখে দেখেছে কম, তার উপরে এত সব হরেক রকম মহার্ঘ দ্রব্য দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

এই উত্তেজনা বাড়াতে আমার বোনেরা তাদের বাচ্চাকাচ্চা আর স্বামী নিয়ে চলে এল বেড়াতে। খুবই হতাশ হই তাদের দেখে। দুই ভগ্নিপতির মধ্যে একজনকে দেখলেই মনে হয় লোফার। অন্যজন কিছুটা ভদ্রলোক আর সুপুরুষ হলেও নির্বোধ। কারওরই সংসারের অবস্থা ভাল নয়। মা আমাকে চুপি চুপি জানাল, ছোট জামাই নাকি গুণ্ডামি, চুরি, ছিনতাই করে। বড়জন একটা প্রাইভেট ফার্মে কেয়ারটেকার।

এরা সব এক জায়গায় জুটতে খুব হট্টগোল হল। ঝগড়াঝাঁটিও প্রায়ই লেগে যায় দেখলাম। একদিন বাবা খুব গম্ভীরভাবে আমাকে গোপনে ডেকে নিয়ে বললেন—শোনো বাবা প্রভাস, তোমার ছোট ভাই আর তার বউ এখন চায় আমি আর তোমার মা আলাদা হয়ে অন্যত্র গিয়ে থাকি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—আপনি আর মা যাবেন কেন? এ বাড়ি তো আপনার, দরকার হলে ওরা চলে যাবে।

—সে সব আইনের কথা শুনছে কে? আমাদের বুড়ো বয়সে আর তেমন তেজ নেই যে গলাবাজি করে গায়ের জোরে দখল রাখব। তার উপর নিজের সন্তান যদি শত্রুতা করে, তবে আর কী করার আছে? ওরা দুজনে মিলে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলছে দিন-রাত। তোমার মা অবশ্য ওদের দিকে টেনে চলেন, কিন্তু তাতেও সুরাহা হবার নয়। যদিও-বা তোমার মাকে ওরা আশ্রয় দেয় আমাকে থাকতে দেবে না।

কথাটা শুনে আমি ভয়ঙ্কর রেগে যেতে পারি। হঠাৎ কেন যেন নিজের ছেলেবেলার কথা আদ্যন্ত মনে পড়ে। ভাবি, আমাদের নিষ্ঠুর ছেলেবেলা আমাদের স্বার্থপরতা ছাড়া আর কী শেখাবে! আমার ভাই তার নিজের জীবন ও পরিবেশ থেকে সেই শিক্ষাটাই নিয়েছে। ওর বউও খুব উঁচু পরিবারের মেয়ে নয়। কথায় কথায় মা একদিন বলে ফেলেছিলেন, বউমার মা নাকি ঝিগিরি করত। তবে আগে ওরা ভদ্রলোক ছিল, অবস্থার ফেরে এই দশা। সে যাই হোক, আমার ভাইয়ের বউ নিমি খুব খোঁপায় চোপায় মেয়ে। টকাটক কথা বলে, মেজাজ দেখাতে ভয় পায় না, কাউকে তোয়াক্কার ভাব নেই। এ ধরনের মেয়েরা সহজেই স্বামীকে বশ করতে পারে। মা-বাবাকে আলাদা করার প্রস্তাবটি হয়তো তার মাথাতেই প্রথম এসে থাকবে। যথাসময়ে আমার ভাই সেই ভাবনায় ভাবিত হয়েছে।

বাবাকে বললাম—বোঝাপড়া করে নিন। আমিও বলব'খন।

বাবা বললেন—এ বাড়ির অর্ধেক স্বত্ব তোমারও। আমি বলি কী, তুমি যখন এসেই গেছ ভাল সময়ে, তখন বাড়িটা ভাগ করে নাও। আমি তোমার ভাগে থাকব, তোমার মা না হয় তাঁর ছোট ছেলের কাছে ইচ্ছে হলে থাকবেন।

শুনেই আমার গা রি-রি করে ওঠে। এই ঘিঞ্জি কলোনির তিন কাঠা জায়গায় দীনদরিদ্র একটুখানি দরমার বাড়ি—এর আবার ভাগ-বাঁটোয়ারা! তার উপর এখানে স্থায়ী ভাবে থাকার ইচ্ছেও আমার কখনওই হয়নি। নিজের আত্মীয়স্বজন আমার এখন আর সহ্য হয় না।

আমি বললাম—ভাগ-বাঁটোয়ারা করার ইচ্ছে হয় না। এইটুকু জায়গা ভাগ করলে থাকবে কী?

বাবা বলেন—তবে বাবা, তুমি আলাদা কোথাও বাড়ি করো, বুড়ো বয়সে আমি গিয়ে তোমার কাছে শান্তিতে মরি।

আমি সামান্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলি—বরাবরই কি আপনাদের বোঝা আমাকে বইতে হবে না কি? একটা জীবন সংসারের পিছনে অপচয় করেছি। এখনও কি আমাকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন না?

বাবা খুব অবাক হয়ে বললেন—তোমাকে কোন কাজে কবে বাধা দিলাম বলো তো। ঠিক কথা তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, কিন্তু অত ভাল সরকারি চাকরি ছেড়ে বিদেশে গেলে, আমরা তো বাধা দিইনি। এত বছর তো আমরা তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকিনি। এই বুড়ো বয়সে এখন আর তোমরা ছাড়া আমাদের অভিভাবক কে আছে।

আমার নিষ্ঠুর মন এখন আর সহজে গলে না। খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, আচ্ছা, সুহাসের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ভাগ করে দেব, আপনারা আমার ভাগেই থাকবেন। কিন্তু আমি এ বাড়িতে থাকব না।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

বাসায় খুব ভাল লাগে না। কারণ, এখানে আমার আপনজন বলতে কেউ নেই, সারা পৃথিবীতে কেউ নেই, একমাত্র নীলু ছাড়া। বোন ভগ্নিপতিরা চলে গেল, তবু বাড়িতে গণ্ডগোল থামে না। প্রায় সারাদিনই সুহাসের বউ নিমি-বাবাকে বকাবকি করে। মা খুব একটা পালটা ঝগড়া করে না, কিন্তু ছেড়েও দেয় না। বাবা মাঝে মাঝে লাঠি হাতে তেড়ে ছেলের বউকে মারতে যায়। অমনি নিমি বেরিয়ে এসে কোমরে হাত রেখে ই-ইঃ মারবে! মারুক তো দেখি! বলে চেঁচায়। বাবা ভয়ে পিছিয়ে আসে, আর নিমি তখন এক নাগাড়ে যাচ্ছেতাই বলে যায়। আমি যে বিদেশ-ফেরতা ভাসুর বাড়িতে আছি তা গ্রাহ্য করে না। ঝিয়ের মেয়েই বটে। সুহাস কোথায় কাজ করে তা আমি এখনও ভাল জানি না, তবে যা-ই করে, তা যে খুব উঁচু ধরনের কাজ নয় তা ওর আচার-আচরণ থেকেই বোঝা যায়। ওর সহকর্মীরা যে নিচুতলার লোক তা সুহাসের কথা শুনলেও টের পাই। কথায় কথায় মুখ খারাপ করে ফেলে। একটু আড়াল হয়ে বিড়ি টানে দেখি। বউকে নিয়ে সপ্তাহে দুবার নাইট শো দেখতে যায়।

বাড়ির খাওয়াদাওয়া অত্যন্ত নিচু মানের। আমি এসে অবধি বাড়িতে বেশ কিছু সংসার খরচ দিয়েছি, তবু খাওয়ার মান ওঠেনি তেমন। তবে মাঝে মাঝে আমার মুখরক্ষা করতে মুরগি রান্না হয়। প্রথম দিন আমাকে খাওয়ার সময়ে কাঁটা-চামচ দেওয়া হয়েছিল দেখে হেসে ফেলেছিলাম।

বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি। বাইরে বাইরে খামোকা ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কোথাও যাওয়ার ঠিক থাকে না। চাকরি-বাকরি করব, না ব্যবসা করব, তা নিয়ে ভাবি না। বেশ একটা ছুটি-ছুটি মনের ভাব নিয়ে আছি।

বিদেশে আমার যে টাকা জমেছিল তা নেহাত কম নয়। এ দেশের মুদ্রামানে প্রায় লাখ চারেক টাকা। তাই এখনই চাকরির জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।

পাঁচুদার সঙ্গে খাতির ছিল। তার খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম ভদ্রলোক মরতে চলেছেন।

অলকা

উঠে পড়লাম।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। ঝি সরস্বতী আজ আসবে কি না বুঝতে পারছি না। এত বেলা তো সে কখনও করে না! আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। এক রিকশাওলার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমার কাছে একশোটা টাকা চেয়েছিল। দেব কোত্থেকে? আমার বাড়তি টাকা যা আছে তা বড় অল্পে অল্পে জমানো। দিই কী করে?

দাঁত মেজে এক কাপ চা করে খেলাম। বিছানা তুলতে ইচ্ছে করছে না। থাকগে, কে-ই-বা আসছে দেখতে! সরস্বতী যদি আসে তো তুলবেখন। সকালের চা করা, বিছানা তোলা এসব ও-ই করে।

আমি খবরের কাগজ রাখি না। ছোট্ট একটুখানি একটা ট্রানজিস্টর রেডিয়ো আছে। সেটাই আমার

সঙ্গী। অবশ্য এ ফ্ল্যাটে মস্ত একটা রেডিয়োগ্রাম আছে অসীমদার, কিন্তু সেটার যন্ত্রপাতিতে মরচে, চলে না। আমার ট্রানজিস্টার সেটটারও ব্যাটারি ডাউন। চেরা আওয়াজ আসে। রেডিয়োটা চালিয়ে একটা ফ্যাসফেসে কথিকা হচ্ছে শুনে, বন্ধ করে দিলাম।

আজ ছুটি। কিন্তু ছুটির দিনগুলোই আমার অসহ্য। সময় কাটতে চায় না। শ্রীরামপুরের বাড়িতে চলে যেতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু গেলেই অশান্তি। মাসির বাড়িতেও যাওয়া হয় না। রোহিতাশ্ব চৌধুরীর বাড়িতে যেতে কেমন যেন লজ্জা করে আজকাল, ওদের বাড়িতে বেবি সিটারের চাকরি করেছি বলেই বুঝি এক হীনম্মন্যতা কাজ করে।

মুশকিল হল, আমার বাসাতেও কেউ আসে না। আজ রোববারে কেউ কি আসবে? আসবে না, তার কারণ আমাকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। আমার তেমন বন্ধুবান্ধবও নেই। মাঝে মাঝে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে।

এখনও বর্ষা নামেনি এ বছর। গরমকালটা বড় বেশিদিন চলছে। এইসব ভয়ংকর রোদের দিনে ঘরের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছেও হতে চায় না। একা ঘরে সারা দিনটা কাটাবই-বা কী করে?

জানালা-দরজা খোলা। আলোয় আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘর। আমি বাথরুমে ঘুরে এসে আয়নার সামনে বসে একটু ফিটফাট করে নিই নিজেকে। চুল আঁচড়াই, মুখে অল্প একটু পাউডার মাখি, কপালের একটা ব্রণ টিপে শাঁস বের করি। বেশ চেহারাটা আমার। লম্বা টান সতেজ শরীর, গায়ে চর্বি খুব সামান্য, মুখখানা লম্বা ধাঁচের, পুরু কিন্তু ভরন্ত ঠোঁট, দীর্ঘ চোখ। নাকটা একটু ছোট কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। গায়ের রঙে জেল্লা আছে।

অনেককাল নাচি না। আজ একটু ইচ্ছে হল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটু পা কাঁপিয়ে নিলাম। তারপর কয়েকটা সহজ মুদ্রা করে নিয়ে ধীরে ধীরে নাচতে থাকি। কিন্তু বুঝতে পারি শরীর আর আগের মতো হালকা নেই। বেশ কষ্ট হয় শরীর ভাঙতে, দমও টপ করে ফুরিয়ে গেল। হাঁপিয়ে বসে পড়লাম। তাতেও হল না। পাখা চালিয়ে শুয়ে রইলাম মেঝেয়। ঠাণ্ডা মেঝে, বুক জুড়িয়ে গেল। শুয়ে থেকে হঠাৎ মনে হল আজ কেউ আসবে। অনেককাল কেউ আসে না। আজ আসবে। ভাবতে ভাবতে ঝিমধরা মাথায় কখন যে তন্দ্রা এল। সরস্বতী আসেনি, হরিণঘাটা ডিপো থেকে দুধের বোতল আনা হল না। একটু আনাজপাতি, মাছ বা ডিম কিছু আনিয়ে রাখা দরকার ছিল। তাও হল না। সকালের জলখাবার বলতে কিছু খাইনি এখনও, খিদে পেয়েছে। এসব ভাবতে ভাবতেও তন্দ্রা এল। কী আলিস্যি আর অবসাদ যে শরীরটার মধ্যে। বয়স হচ্ছে নাকি। মাগো!

খুব বেশিক্ষণ মটকা মেরে পড়ে থাকা হল না। পিয়ানোর হালকা শব্দ তুলে কলিং বেল পিং আওয়াজ করল। সদর দরজাটা ভেজানো আছে, সরস্বতী হলে বেল না বাজিয়ে হুড়ুম দুড়ুম করে ঢুকে পড়ত। এ সরস্বতী নয়, অন্য কেউ।

দরজা খুলে একটু খুশিই হই। আমার অফিসের সেই স্মার্ট ও সুপুরুষ যুবক সুকুমার দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। যদিও সুকুমারকে আমি সেই অর্থে ভালবাসি না, তবু ওর সঙ্গ তো খারাপ নয়। জানি না বাপু আমাদের মনের মধ্যে কী পাপ আছে। পাপ একটু-আধটু আছে নিশ্চয়ই। নইলে সুকুমারের ওই দুর্দান্ত বিশাল জোয়ান চেহারা আর হাসির জবাব রঙ্গ-রসিকতায় ভরা কথাবার্তা আমার এত ভাল লাগে কেন। আমরা পরস্পরকে 'তুমি' করে বলি, সেটাও পাঁচজনের সামনে নয়, দুজনে একা হলে তবেই। তা হলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটু পাপ-টাপের গন্ধ পাওয়া যাবে।

বাইরের ঘরে বসে ও তেমনি হাসি মুখে বলল—তোমাকে একটু বিরহী বিরহী দেখাচ্ছে অলি।

ওর হাসিটা যেন একটু কেমন। মানুষ খুব নার্ভাস হয়ে পড়লে মাঝে মাঝে ও রকম হাসি হাসে। ওর মতো চটপটে বুদ্ধিমান ছেলের নার্ভাস হওয়ার কথা নয়।

আমি বললাম—বিরহ নয় বিরাগ। বোসো, আজ আমার ঝি আসেনি; নিজেকেই চা করতে হবে।

ও বিরস মুখ করে বলে—ও, আমি ভেবেছিলাম তোমার বাসায় আজ ভাত খাব দুপুরে। কিন্তু ঝি যখন আসেনি—

কথাটা আমার কানে ভাল শোনাল না। ভাত খাবে কেন? এ প্রস্তাবটা কি একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না।

আমি বললাম—আমি নিজে কতদিন না রেঁধে শুকনো খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিই। আজও অরন্ধন।

সুকুমার নড়েচড়ে বসে বলল—এসে তোমার ডিসটার্ব করছি না তো?

—মোটেই নয়। আজ আমার খুব একা লাগছিল।

—আমারও।

—মনে হচ্ছিল কেউ আসবে।

সুকুমারের মুখ হঠাৎ খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও বলে—কে আসবে বলে ভেবেছিলে? আমি?

—না। বিশেষ কারও কথা নয়। যে কেউ।

—আমার কথা তুমি ভাবো না অলি?

পুরুষমানুষদের এই এক দোষ। তারা চায় মেয়েরা সব সময় তাদের কথা ভাবুক। বড় জ্বালা। জয়দেবও বোধহয় তাই চাইত।

আমি একটু হেসে বললাম—ভাবব না কেন? তবে আমার ভাবনা খুব ভাসা ভাসা। গভীর নয়।

সুকুমারের স্মার্টনেস আজ যে কোথায় গেল! সে আজ একদম বেকুব বনে গেছে। মুখের রং অন্যরকম, চোখ অন্যরকম। আমি বাতাসে একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

আজ সুকুমার খুব ভাল পোশাক পরে এসেছে। সাদা রঙের ওপর নীল রঙের নকশা করা পাতলা টেরিভয়েলের ছ্যাঁদাওয়ালা জামা, খুব সুন্দর ধূসর রঙের প্যান্ট পরা, পায়ে ঝকঝকে মোকাসিন। হাতে এই ছুটির দিনেও একটা পাতলা ভি আই পি স্যুটকেস। রুমালে মুখ মুছে বলল—আমি হঠাৎ এলাম বলে কিছু মনে করো না।

আমি হেসে বললাম—তুমি এর আগেও একবার এসেছিলে, তখনও কিছু মনে করার ছিল না। মনে করব কেন?

সুকুমার ভাল করে কথা বলতে পারছে না আজ। আমার দিকে ভাল করে তাকাচ্ছেও না। বলল—ভীষণ খারাপ সময় যাচ্ছে আমার।

—কেন, খারাপের কী? সদ্য একটা লিফট পেয়েছ!

সুকুমার ব্যথিত হয়ে বলে—সবসময়ে টাকার পয়েন্টে লোকের ভাল-মন্দ বিচার করা যায় না। সে সব নয়। আমার মনটা ভাল নেই।

—কেন?

—তোমার সেটা বোঝা উচিত।

আমি এ ব্যাপারে খানিকটা নিষ্ঠুর। সুকুমার কী বলতে চায় তা আমার বুঝতে দেরি হয়নি। কিন্তু এসব প্রস্তাবকে গ্রহণ বা গ্রাহ্য করা আমার সম্ভব নয়। বললাম—তোমার প্রবলেম নিয়ে আমি চিন্তা করব কেন? আমার ভাববার মতো নিজস্ব প্রবলেম অনেক আছে।

—অলি, তুমি কিন্তু সেলফ সেন্টারড।

—সবাই তাই। তুমিও কি নিজের স্বার্থ থেকেই সব বিচার করো না?

সুকুমার সিগারেট খেল কিছুক্ষণ। ওর হাত বশে নেই। বলল—সেটা ঠিকই। কিন্তু তুমি যে হ্যাপি নও এটা নিয়েও আমি ভাবি।

আমি হেসে বললাম—সেটা ভাবতে না, যদি আমার ওপর তোমার লোভ না থাকত।

—লোভ! বলে আঁতকে উঠল সুকুমার। বলল—লোভ অলি? লোভ কথাটা কত অশ্লীল তুমি জান? লোভের কথা বললে কেন?

—তবে কী বলব, প্রেম? ভালবাসা?

সুকুমার অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলে—আমি তো তাই ভাবতাম।

মাথা নেড়ে বললাম—পুরুষমানুষ আমি কম দেখিনি। লোভ কথাটাই তাদের সম্বন্ধে ঠিক কথা। পুরুষেরা মেয়েদের চায় বটে, কিন্তু সে চাওয়া খিদের খাবার বা নেশার সিগারেটের মতো।

—তুমি বড্ড ঠোঁটকাটা। বলে সুকুমার হাসে একটু। বলে—সে থাকগে। তর্ক করে কি কিছু প্রমাণ করা যায়? বরং যদি আমাকে একটা চানস দিতে অলি, দেখতে মিথ্যে বলিনি।

—চা করে আনব?

—আনো।

চা খেয়ে সুকুমার নিজের হাতের তেলোর দিকে নতমুখে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ।

আমার একটু মায়া হল। ও আমাকে ভয় পাচ্ছে। এত বড় চেহারা, এত ভাল দেখতে, তবু নরম গলায় বললাম—কী বলবে বলো।

—কী বলব, বলার নেই।

—শুধু বসে থাকবে?

—না, উঠে যাব। এক্ষুনি।

—সে তো যাবেই জানি। কিন্তু মনে হচ্ছিল, আজ তুমি কী একটা বলতে এসেছিলে।

সুকুমার হঠাৎ তার যাবতীয় নার্ভাসনেস ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে মরিয়া হয়ে খাড়া উঠে বসল। আমার দিকে সোজা অকপট চোখে চেয়ে বলল—শোনো অলি, তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না। অনেক চেষ্টা করেছি মনে মনে, পারিনি।

এ সব কথা শুনলে আমার হাই ওঠে। অবাস্তব কথা সব, একবিন্দু বিষয়বুদ্ধি নেই এ সব আবেগের মধ্যে। আমি এঁটো কাপ তুলে নিয়ে চলে আসি। বেসিনে রেখে ট্যাপ খুলে দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম একা। ভাল লাগে না।

হঠাৎ সুকুমার ঘরের বাইরের থেকে ভিতরে চলে এল, খুব কাছে পিছনের দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দু কাঁধ আলতো হাতে ধরে অল্প কাঁপা গলায় আর গরম শ্বাসের সঙ্গে বলল—অলি, এর চেয়ে সত্যি কথা জীবনে বলিনি কাউকে। গত তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। কিছুই ভাল লাগছে না, তাই আজ দীঘা যাওয়ার টিকিট কেটে এনেছি।

—যাও ঘুরে এসো। সমুদ্রের হাওয়ায় অনেক রোগ সেরে যায়, এটাও হয়তো যাবে।

—রোগ! কীসের রোগ! আমার কোনও রোগ নেই।

কলের জল পড়ে যাচ্ছে হিলহিল করে। সেই দিকে চেয়ে থেকে বললাম—কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নাও, তোমার হাত ভীষণ গরম।

এ সব সময় যা হয়, তাই হল। অপমানিত পুরুষ যেমন জোর খাটায়, তেমনি সুকুমারও আমাকে জড়িয়ে ধরল হঠাৎ। একটা বিরক্তিকর অবস্থা।

হটাৎ সরস্বতীর ভৌতিক গলা চেঁচিয়ে উঠল—উরেব্বাস, এ কী গো!

সুকুমার প্রায় স্ট্রোকের মুরগির মতো অবশ হয়ে টলতে টলতে সরে গেল। সরস্বতী দরজায় দাঁড়িয়ে।

লজ্জায় মরে গিয়ে বললাম—এই হচ্ছে তোমাদের দাদাবাবু। ফেরাতে এসেছে।

জয়দেব আর আমার বিয়ে ভাঙার ব্যাপার সরস্বতী জানে। তাই সে বুঝল সুকুমারই হচ্ছে সেই জয়দেব। খুব হাসিমুখে বলল—তা হলে এত দিনে বাবুর মতি ফিরেছে, ভূত নেমেছে ঘাড় থেকে।

আমি কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম—দেরি করলে যে বড়! সারা সকাল আমি কিছু খাইনি জানো!

—কী করব দিদি, টাকার জোগাড় করতে সেই মোমিনপুর গিয়েছিলাম কুসমীর কাকার কাছে। সে পানের দোকান করে। পয়সা আছে। দয়া-ভিক্ষে করতে পাঁচশোটা টাকা দেবে বলেছে।

আমি বললাম—কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সারো তো। বোকো না।

—দাদাবাবুর জন্য মিষ্টি-টিষ্টি এনে দেব নাকি? দাও তা হলে পয়সা। চায়ের জল চড়িয়ে দোকান থেকে আসি।

কঠিন গলায় বললাম—না।

বসবার ঘরের ঠিক মাঝখানটায় সম্পূর্ণ গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে ছিল সুকুমার। ভাল পোশাক, চমৎকার চেহারা, তবু কী অসহায় আর বোকা যে দেখাচ্ছে!

আমি হেসেই বললাম—মাথা ঠাণ্ডা রেখো, বুঝলে? আমারও তো কিছু নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে।

—সে জানি।

—ছাই জানো। আমার স্বামী লোকটা খুব খারাপ নয়। অন্তত লোকে তাকে খারাপ বলে না। তবু তাকে আমার পছন্দ হয়নি বলেই তার সঙ্গে থাকিনি। তুমি কি ভাবো আমি একা থাকি বলে খুব সহজে

বশ করে নেওয়া যাবে আমাকে?

—তুমি কখনওই আমাকে বুঝলে না অলি। বোধহয় ভালবাসা তুমি বুঝতেই পারো না। থাকগে, যা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা করে দিয়ো।

সুকুমার চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম—এখন কি সোজা দীঘায় যাবে।

সুকুমার হতাশ গলায় বলল—দীঘায় একা যাওয়ার প্রোগ্রাম তো ছিল না।

—তা হলে?

—ইচ্ছে ছিল তোমাকেও নিয়ে যাব। দুটো কটেজ বুক করে রেখেছি, সরকারি বাসে দুটো টিকিট কেটে রেখেছি। কিন্তু সে সব ক্যানসেল করতে হবে।

ওর দুঃসাহস দেখে আমি হতবাক। বলে কী! আমাকে নিয়ে দীঘা যেতে চেয়েছিল?

কিন্তু এ বিস্ময়টা আমার বেশিক্ষণ থাকল না। ওরকম পাগলামির অবস্থায় মানুষ অনেক বেহিসেবি কাজ করে। বললাম—আমাকে দীঘায় নিয়ে কী করতে তুমি?

সুকুমার মনোরুগির মতো হাসল একটু। বলল—আমাকে বিশ্বাস কোরো না অলি। আমার মাথার ঠিক নেই। কত কী ভেবে রেখেছি, কত কী করতে পারি এখনও।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—এ সব ভাল নয়। তুমি আমার ক্ষতি ছাড়া কিছু করতে পারো না আর।

—বোধহয় তুমি ঠিকই বলছ। আমি নিজেকেও আর বিশ্বাস করি না।

আমি বললাম—দাঁড়াও, এক্ষুনি চলে যেয়ো না।

—কেন?

—মনে হচ্ছে, তুমি একটা বিপদ করবে। বসে একটু বিশ্রাম করো। আর বরং দুপুরে এখানেই খেয়ে যাও।

সুকুমার বসল।

সুকুমার প্রায়ই এর ওর হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে। আসলে ও হাত দেখার কিছুই জানে না, কেবল ব্লাফ মারে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বানায় বেশ চমৎকার। নতুন ধরনের কথা বলে। কাউকে হয়তো বলে, শীতকালটায় আপনি খুব বিষণ্ণ থাকেন। আমাদের অফিসের বড়কর্তাকে একবার বলেছিল—সামনের মাসে আপনাকে চশমার পাওয়ার পালটাতে হবে, একটা দাঁত তোলাবেন ফেব্রুয়ারি মাসে। এই রকম সব। অফিসের মেয়েদের হাত দেখে এমন সব কথা বলে যে মেয়েরা পালাতে পারলে বাঁচে। একবার আমার হাত দেখে সুকুমার বলেছিল—শুনুন মহিলা, আপনার একটা মুশকিল হল আপনি সকলের সঙ্গে বেশ সহৃদয় ব্যবহার করতে ভালবাসেন। স্নেহ-মায়া আপনার কিছু বেশি। কিন্তু তার ফলে লোকের সব সময়ে মনে হয় যে আপনি তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন বা প্রেমে পড়েছেন। একটু রূঢ় ব্যবহার করতে শিখুন, ভাল থাকবেন।

কী ভীষণ মিথ্যে কথা, আবার কী ভীষণ সত্যিও! সুকুমারের ওই ভুয়ো ভবিষ্যদ্বাণী তার নিজের সম্পর্কে কেমন খেটে গেল।

স্নেহবশে মায়ায় ওকে আমি দুপুরে খেয়ে যেতে বললাম। আসলে ওই ছুতোয় ওকে একটুক্ষণ আটকে রাখার জন্য। নইলে ওর যেরকম মনের অবস্থা দেখছি, হয়তো রাস্তায় গিয়ে গাড়ি চাপা পড়বে। আর সেই আটকে রাখাটাই বুঝি ভুল হল। সুকুমার ভাবল, আমার মানসিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে, আমি ওকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছি।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সুকুমার বাইরের ঘরে বসে সিগারেট ধরাল। সরস্বতী চলে গেছে, কাল সকালে ফের আসবে। যাওয়ার আগে সে সুকুমারের সঙ্গে কিছু তরল রসিকতাও করে গেল আমাকে নিয়ে।

আমি মনে মনে চাইছিলাম সুকুমার এখন চলে যাক। সুকুমার গেল না। সারা বেলা আমাদের খুব একটা কথা হয়নি। আমি রান্নাঘরে রেঁধেছি, সুকুমার বাইরের ঘরে বসে বইপত্র পড়েছে।

দুপুরে রোদ আর গরমের ঝাঁঝ আসে বলে দরজা-জানালা সরস্বতী যাওয়ার আগেই বন্ধ করে দিয়ে যায়। বেশ অন্ধকার আবছায়ায় সুকুমারের সিগারেট জ্বলছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। ছুটির দিনে আত্মীয়স্বজন কেউ যদি হুট করে চলে আসে, তো আমার কোনও সাফাই কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু

সুকুমারকে কী করে চলে যেতে বলি?

মুখোমুখি বসেছিলাম। বললাম—তুমি কি বিশ্রাম করবে, না যাবে এক্ষুনি?

সুকুমার আয়েসের স্বরে বলল—এই গরমে বের করে দেবে নাকি?

—তা বলিনি—বলে অস্বস্তিতে চুপ করে থাকি। ভেবে-চিন্তে বললাম—তা হলে এ ঘরে বিশ্রাম নাও। আমি ও ঘরে যাই।

শোওয়ার ঘরে এসে কাঁটা হয়ে একটু শুতে-না-শুতেই আবছা একটা মূর্তি এসে হঠাৎ জাপটে ধরল আমাকে। সুকুমার। আমি প্রতিমুহূর্তে এই ভয় পাচ্ছিলাম। ওর শ্বাস গরম, গা গরম, উন্মাদের মতো আশ্লেষ। ও খুনে গলায় বলল—তোমাকে মেরে ফেলব অলি, যদি রাজি না হও আমাকে বিয়ে করতে।

আমার কোনও কথাই ও শুনতে পাচ্ছে না। গ্রাহ্য করছে না আমার কিল, ঘুষি, আঁচড়, কামড়।

হঠাৎ বহুকাল নিস্তব্ধতার পর বিপদসঙ্কেতের মতো টেলিফোনটা বেজে উঠল। সেই শব্দে চমকে সুকুমার একটু থমকাল। আমি নিজেকে সামলে গিয়ে টেলিফোন তুলে বললাম—হ্যালো।

একটা গম্ভীর গলা বলল—আপনার ঘরে কে রয়েছে?

এত ভয় পেয়েছিলাম যে রিসিভার হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কে বলছেন?

উত্তর এল—ওই লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দিন।

টেলিফোনটা কেটে গেল আচমকা!

প্রভাসরঞ্জন

সকাল থেকেই আজ মেজাজে আছি। কোনও খুশখবর নেই, মন ভাল থাকার কোনও কারণও দেখছি না, তবু কেন মনটা নবাবি করছে?

ওই রকম হয় মাঝে মাঝে। বেঁচে থাকাটাকে যখন শবদেহ বহনের মতো কষ্টকর লাগে সব সময়ে, তখন মাঝেমধ্যে বুঝি প্রাকৃতিক নিয়মে মরবার আগে হঠাৎ সুস্থ হয়ে ওঠার ছদ্ম লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঈশ্বর করুণাপরবশ হয়ে এক বিন্দু খুশি মিশিয়ে দেন জীবনে। তখন বুঝতে হয় যে কঠিন দিন আসছে।

সে যাকগে। অতীতের চিন্তা আর ভবিষ্যতের ভাবনা দিয়ে এখনকার খুশির মেজাজটাকে নষ্ট করার মানেই হয় না। দীর্ঘদিন ইউরোপে থেকে শিখেছি, বর্তমানটাকে যতদূর সম্ভব উপভোগ করাটাই আসল। যে সময় চলে গেছে বা যে সময় আসেনি, তার কথা চিন্তা করা এক মস্ত অসুখের কারণ। যদি আমুদে হতে চাও তো সে চিন্তা ছাড়ো।

প্রায় এক মাস হয়ে গেল দমদমের বাড়ি ছেড়ে পার্ক সার্কাসে চলে এসেছি। স্থায়ীভাবে এসেছি এ কথা বলা যায় না। মা-বাবাকে সেরকম কিছু বলে আসিনি। তবে দমদমে বাড়িতে আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। সেখানে বড্ড বেশি অশান্তি। আমার ভ্রাতৃবধূটি বাড়িটাকে নরক করে তুলেছে।

একদিন বীভৎস ঝগড়ার পর আমি ভাইকে ডেকে বললাম—পাড়ার পাঁচজনকে ডাকো, বাড়ি ভাগ হোক।

তাতে সুহাসের আপত্তি। সে বলে—ভাগাভাগি কীসের!

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—বাবা চাইছেন তোমার-আমার মধ্যে ভাগ করে দিতে।

সে বলল—তুমি তো আর এখানে থাকবে না। চলেই যাবে অন্য কোথাও। তবে ভাগ করব কেন?

সুহাসের বউও তেড়ে এল—আপনার কোনও দাবি নেই। আপনি তো বাইরের লোক হয়ে গেছেন। আমরা থাকি, বাড়িতে আমাদের স্বত্ব বেশি।

কথাটা অযৌক্তিক, কিন্তু এত জোর দিয়ে বলল যে আমি খুব অসহায় বোধ করতে লাগলাম। আমার মাও, কেন জানি না, বাড়ি ভাগাভাগির বিরুদ্ধে। কেবল বাবা ভাগাভাগি চাইছেন, এবং খুব মরিয়া হয়ে চাইছেন। কাজেই ফের ঝগড়া লেগে গেল।

নিমি আমাকে স্পষ্ট বলল—আপনার তো চরিত্র খারাপ। বিদেশে কী সব করে বেড়িয়েছেন তা কি

আমরা টের পাইনি?

সুহাস নিমির পক্ষ নিয়ে বলে—তোমাকে তো ওদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই এসে ঘাড়ে পড়েছ। বেশি স্বত্ব-টত্ব দেখিয়ো না, খারাপ হয়ে যাবে। এ পাড়ায় এখনও আমার এক ডাকে দুশো লোক চলে আসবে।

সুহাসের কথা শুনে খুব অবাক হই না। এরকমটাই আশা করছিলাম এতদিন। আর ও কথাটা ঠিক, এ পাড়ায় ওর বেশ হাঁক-ডাক আছে।

এ রকম কুৎসিত পরিস্থিতিতেই ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছি। ঝগড়া, মারামারি, পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা গালাগালি এ সবই আমাকে গঙ্গাজলে শুদ্ধ করেছে বহুবার।

ভয়টয়ও বড় একটা হল না। শুধু ঠাণ্ডা গলায় সুহাসকে বললাম—বাড়ি ভাগ ঠেকাতে পারবে না। দরকার হলে আমি পুলিশকে খবর দেব, বলব যে তুমি আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছ।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! সুহাস আর তার বউ ঝগড়ার চোটে প্রায় নাচতে লাগল। সুহাস তড়পায়, পেছন থেকে নিমি তাকে সাহস দেয়। শক্তিদায়িনী নারী কাকে বলে জানলাম! দুজনেই দিগ্বিদিকশূন্য, কাপড়-চোপড় গা থেকে খসে পড়ছে প্রায়।

এ বাড়ি ভাগ করা যে আমার কর্ম নয় তা বুঝলাম। ভীমরুল চাক বেঁধেছে, ঢিল মারলে রক্ষে নেই। বাবাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললাম—দেখছেন তো ওদের অ্যাটিচুড। বাড়ি ভাগ কী করে হবে?

বাবা অসহায়ভাবে বললেন—তুমি আলাদা বাসা করো।

সেই পুরনো কথা। বিরক্ত হয়ে বলি—সেটা সম্ভব নয়। আলাদা বাসা করলেও আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব না। আমার একা থাকা দরকার।

বাবা চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ বাদে বললেন—বাবা প্রভাস, আমি সারা জীবন কখনও সুখে থাকিনি। গত জন্মের দোষ ছিল বোধহয়। তা এখন কী করতে বলো আমাকে? গলায় দড়ি দেব?

আমি কিছু লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকি।

বাবা বললেন—তুমি বিদেশ থেকে ফিরে এসেছ দেখে বড় আশায় বুক বেঁধেছিলাম। বিশ্বাস ছিল, তুমি আমাকে ফেলবে না। কিন্তু এখন—

আমি বললাম—তার চেয়ে কোনও বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে—

বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম—কোনও আশ্রম-টাশ্রমে যদি বন্দোবস্ত হয়, তা হলে?

বাবা মাথা নাড়লেন। চোখে বুঝি জল এসেছিল, সেটা মুছে নিয়ে বললেন—বুঝেছি। আপত্তি কী? তাই না হয় দেখো।

বাবাকে ভরসা দিয়ে বললাম—টাকা যা লাগে আমি কষ্ট করে হলেও দেবখন।

—সে জানি। দিয়ো। তোমরা না দিলে গতি কী?

যোগাযোগ করে নানা মুরুব্বি ধরে বাবার জন্য কাশীতে একটা বন্দোবস্ত হল। মাসখানেক আগে বাবা একখানা তোরঙ্গ আর শতরঞ্জিতে বাঁধা বিছানা নিয়ে ট্রেনে চাপলেন।

মার জন্য খুব চিন্তা নেই। মা যেন কীভাবে এই সংসার প্রোথিত বৃক্ষের মতো রয়েই গেল। সাধারণত শাশুড়ির সঙ্গে বউদের অবনিবনা দেখা যায়। আমাদের বাড়িতে উল্টো নিয়ম দেখি। তার মানে এই নয় যে নিমিতে আর মাতে ঝগড়া হয় না। বরং খুবই হয়। কিন্তু সুহাসের বুঝি মায়ের প্রতি একটু টান আছে। বাড়িতে ঢুকেই বিকট একটা 'মা' ডাক দেয় রোজ। আর একটা ব্যাপার হল, এ সংসারে হাজারো কাজে মা জান বেটে দেয়। বিনি মাগনা কেবল খোরাকি দিয়ে এমন বিশ্বস্ত ঝি-ই-বা নিমি কোথায় পাবে? তাই ঝগড়াঝাঁটি হলে, মাকে ফেলতে চায় না। মায়েরও আবার সুহাসের ওপর টান বেশি। এ সব টানের কোনও ব্যাখ্যা হয় না। সবচেয়ে অপদার্থ ছেলেটাকেই মা কেন ভালবাসে তা বিশ্লেষণ করা বৃথা।

বাড়ির এই পরিস্থিতিতে যখন আমি বাড়ি ছাড়ব-ছাড়ব ভাবছি, সেই সময়ে মুমূর্ষ পাঁচুদা একদিন আমাকে বললেন—তোর যখন বনছে না তখন আমার বাসাটায় গিয়ে থাক না কদিন। তালাবদ্ধ পড়ে আছে।

বাঁচলাম হাঁফ ছেড়ে। শোনার পর অপেক্ষা করিনি। সে রাতটা ভাল করে ভোর হওয়ার আগেই

পাঁচুদার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটে এসে উঠেছি।

ব্যাচেলার মানুষ পাঁচুদা। ঘরে রান্নাবান্নার সব বন্দোবস্ত রয়েছে। আসবাবপত্রও কিছু কম নেই। সারাজীবন নিজের শখ শৌখিনতার পিছনে অজস্র টাকাপয়সা ঢেলে গেছেন। টাকাপয়সা জমাননি বড় একটা। ঠকবাজেরাও লুটেপুটে নিয়েছে। ফ্ল্যাটে এসে শুনলাম ছ'মাসের ভাড়া বাকি পড়ে আছে। অথচ বাথরুমে গিজার, ঘরের মেঝেয় কার্পেট, রান্নাঘরে মিনি রেফ্রিজারেটার—কী নেই?

হাসপাতালে দেখা করতে গেলে পাঁচুদা বললেন—যদি আমি বেঁচে যাই তো আলাদা কথা, নইলে ওই ফ্ল্যাট তোকেই দিয়ে গেলাম। সব জিনিসপত্রসুদ্ধু।

আমি বললাম—অত কিছু বলার দরকার নেই পাঁচুদা। আপনি মরছেন না শিগগির। আপাতত কিছুদিন থাকার জায়গা পেলেই আমার যথেষ্ট।

বাড়িওলাকে ছ'মাসের ভাড়া আমাকে শোধ করতে হল। লোকটা গণ্ডগোল শুরু করেছিল। টাকাপয়সা খরচ হল বটে, কিন্তু মোটামুটি একটা থাকার জায়গা পেয়ে বড় খুশি লাগল। দমদমের নরক থেকে তো দূরে আছি।

জ্যোতিষ নরেনবাবু কিন্তু মাস দুয়েক আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মাসখানেকের মধ্যে বাসস্থানের পরিবর্তন।

লোকটার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

সারাদিন প্রায়ই কাজ থাকে না। রান্নাবান্না করি, খাই। দুপুরে একটু ঘুম। বিকেলের দিকে নরেনবাবু কিংবা পাঁচুদার ওখানে যাই। বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। নিরালা, নির্জন সময় কাটে। বেঁচে থাকার অর্থ নেই।

এ বাড়ির দোতলা থেকে প্রায়ই একটা মেয়েকে নামতে উঠতে দেখি। চেহারাটা বেশ। বিয়ের বয়স হয়েছে তো বটেই, একটু বেশিই হয়েছে বুঝি। মাথায় সিঁদুর দেখি না। খুব সাজগোজ করে অফিসে যায়। তার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনও কেউ আসে না বড় একটা। মেয়েটা আমার মতোই একা কি?

ভেবে ভেবে একটু কেমন হয়ে গেল মনটা, দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে আমার মেয়েদের সম্পর্কে বাঙালিসুলভ লজ্জা-সঙ্কোচ হয় না। আবার কাউকে দুদিন দেখলেই প্রেমে পড়ে যাওয়ার মতো দুর্বলতাও নেই আমার। বরং মেয়েদের ব্যাপারে আমি এখন অতিশয় হিসেবি।

নীচের তলায় পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক বড় একটা ইংরেজি কাগজের রিপোর্টার। অল্প ক' দিনেই আমার সঙ্গে বেশ খাতির হয়ে গেছে। তাঁর বউকে বউদি বলে ডাকি। মাঝেমধ্যে মাংস বা মাছ পাঠিয়ে দেন, কফি করে ডেকে নিয়ে খাওয়ান। দুজনেরই বয়স চল্লিশের ওপরে। রিপোর্টার ভদ্রলোকের নাম মধু মল্লিক। নিজের কাজে তাঁর বেশ সুনাম আছে। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান অনেকবার ঘুরে এসেছেন। নিজের কাজকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। আর সেই কারণেই তাঁকে অনবরত বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়। গত কয়েক মাসে দেখলাম, মধু মল্লিক একবার দিল্লি-বম্বে, একবার অরুণাচল প্রদেশ একবার ওড়িশা ঘুরে এলেন। তা ছাড়া দিন-রাত অফিসের গাড়িতে শহর চক্কর মারা তো আছেই। বলেন—ভাই, এই চাকরি করতে করতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে দুদিন ঘরে থাকতে হলে হাঁপিয়ে পড়ি। তাই ভয় হয়, রিটায়ার করলে এক হপ্তাও বাঁচব না।

বউদি সারাদিনই প্রায় একা। তিনটে ছেলেমেয়ে আছে যথাক্রমে চোদ্দো, বারো ও তিন বছরের। ছোটটি ছেলে, বড় দুটি মেয়ে। মেয়ে দুজন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে মডার্ন স্কুলে। নাচ গান শেখে, একজন ওরিগামি শেখে, অন্যজন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস করতে রামকৃষ্ণ মিশনে যায়। বেশ ব্যস্ত তারা। ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বউদি খানিকটা নিঃসঙ্গ। আমাকে ডেকে নিয়ে গল্প করতে বসেন। বেশ একটা মা-মা ভাব তাঁর মধ্যে। মোটাসোটা গিন্নিবান্নি চেহারা। মুখে সর্বদা পান আর হাসি।

সে যাকগে। বউদির একটা সময় কাটানোর শখ আছে। স্বামী খবরের কাগজের রিপোর্টার, বউ পাড়ার যাবতীয় খবরের সংবাদ সংস্থা। পরিচয় হওয়ার সাত দিনের মধ্যে আমি এ পাড়ার যাবতীয় খবর জেনে গেছি। তার মধ্যে একটা খবরই কেবল বউদি ভাল করে জানেন না। সে হল ওপর তলার ওই মেয়েটির খবর।

দুঃখ করে বললেন—অলকার বড্ড ডাঁট, বুঝলেন। অসীমবাবুরা যেমন সোশ্যাল মানুষ ছিলেন, বোনটি ঠিক তেমন আনসোশ্যাল। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না, নিজেকে নিয়ে ওরকম থাকে কী

করে?

আমি বললাম—নিশ্চয়ই একা থাকতে ভালবাসে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

বউদি হেসে বলেন—আপনি বিদেশে ছিলেন বলেই মেয়েদের একা থাকায় দোষ দেখেন না।

সে অবশ্য ঠিক। আমাকে স্বীকার করতে হয়।

বউদি বললেন—একা কি আর সাধ করে আছে। স্বামী নেয় না, সে এক কথা। আবার শুনি মা-বাপের সঙ্গেও বনিবনা নেই।

—দেখতে কিন্তু বেশ।

—হ্যাঁ। কিন্তু নাকটা চাপা। রংও এমন কিছু ফরসা নয়।

হাসলাম। মেয়েদের ওই এক দোষ। কাউকে সুন্দর দেখতে চায় না। একটু না একটু খুঁত বের করবেই।

বউদি বললেন—ওকে যে কেন সবাই এত সুন্দর দেখে বুঝি না। আমাদের কর্তাটিও প্রথম ওকে দেখে মূর্ছা যেতেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—মেয়েটি কেমন?

বউদি ভ্রূ কুঁচকে বললেন—ভাল আর কী! এসব মেয়েরা আর কত ভাল হবে? তবু মিথ্যে কথা বলব না। এ বাড়িতে তেমন কিছু দেখিনি ওর। একা একা চুপচাপ থাকে। কারও দিকে লক্ষ করে না। বরং তিনতলার অবাঙালি পরিবারটা ভীষণ বাজে।

তবু অলকা সম্পর্কে খুব বেশি জানা গেল না। ওর স্বামী কে, কেন তার সঙ্গে ওর বনিবনা নেই, সে সব জানা থাকলে বেশ হত।

মধু মল্লিক একদিন জিজ্ঞেস করেন—ও মশাই, চাকরি-বাকরি চান না কি কিছু? আপনার তো বিদেশের টেকনোলজি জানা আছে।

আমি বললাম—কারখানার চাকরি করা আর পোষাবে না। ব্যবসা কিছু করতে পারি।

উনি তখন বললেন—জার্নালিজম করবেন? আপাতত একটা ফিচার লেখার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

রাজি হলাম। টাকার জন্য নয়, সময় কাটানোর জন্য। গোটা দুই ফিচার লেখার বরাত পেয়ে ক'দিন বেশ ছোটাছুটি আর ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। প্রথম ফিচারটা ছিল কলকাতার হোটেলের ব্যবসার ওপর, দ্বিতীয় ফিচার ছিল যে সব ইন্ডাস্ট্রি এদেশে নেই সেগুলোর ওপর।

প্রথম ফিচারটির মালমশলা সংগ্রহ করতে সারা কলকাতা চার-পাঁচদিন দাবড়ে বেড়াতে হল। তারপর একদিন বসে মধু মল্লিকের টাইপরাইটার নিয়ে এসে লেখা শুরু করলাম। গরম পড়েছে বড্ড। পাখা চালিয়ে ঘরের দরজা খুলে হাট করে বসে কাজ করছি, এমন সময়ে, একজন বেশ লম্বা চওড়া লোককে ওপরতলায় উঠতে দেখলাম। প্রথমটায় কিছু সন্দেহ হয়নি, কিন্তু একটু বাদেই বউদি এসে এক কাপ চা রেখে বললেন—ভাই প্রভাসবাবু, একটু আগে একটা লোক—বেশ সুন্দর চেহারা, অলকার ঘরে ঢুকেছে।

আমি বললাম—ভাই-টাই কেউ হবে।

—না মশাই, ভাই-টাই নয়।

—তবে?

—সেইটেই রহস্য।

—ওর স্বামী নয় তো?

—না না, স্বামীদের হাবভাব অন্যরকম। এ লোকটাকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছিল। প্রেমে পড়েছে এমন চেহারা।

—যে খুশি হোগ গে। আমি অবহেলাভরে বললাম।

বউদি বিরসমুখে বললেন—ভাবসাব ভাল নয়। একা অসহায় পেয়ে মেয়েটাকে যদি কিছু করে! আমাদের কর্তা থাকলে ঠিক ইন্টারফিয়ার করত। ওর খুব সাহস।

আমি পাত্তা দিলাম না। বউদি চলে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে লেখাটা তৈরি করছিলাম।

প্রথম ফিচার বেরোবে খবরের কাগজে, একটু যত্ন নিয়ে কাজ করাই ভাল।

দুপুর বেলায় যখন খাচ্ছি, তখন বউদি এসে শেষতম বুলেটিন দিলেন—লোকটা এখনও নীচে নামেনি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—তাতে কী?

বউদি হঠাৎ লাজুক স্বরে বললেন—ওপরতলায় একটা হুটোপাটির আওয়াজও পাচ্ছি।

আমি টেলিফোন তুলে নম্বরটা ডায়াল করলাম। বউদি অবাক হয়ে দেখছিলেন। তারপর হেসে কুটিপাটি।

অলকা

লন্ড্রিওয়ালা আমার একটি শাড়ি হারিয়েছে। মনটা ভীষণ খারাপ। লন্ড্রিওয়ালা অবশ্য বলেছে—পাওয়া যাবে, ভাববেন না। কিন্তু আমার ভরসা নেই। আজ সকালে গিয়ে লোকটাকে খুব বকাবকি করেছিলাম। প্রথমটা তেমন রা করেনি। তারপর হঠাৎ কথার পিঠে কথা বলতে শুরু করল। বলল—সব লন্ড্রিতেই ওরকম হয়। আমাদের নিয়ম যা আছে, ওয়াশিং চার্জের দশগুণ ক্ষতিপূরণ ত্রিশ টাকা। আমি ক্ষতিপূরণ নিয়ে যেতে পারেন।

আমি অবাক, বলে কী! ধোলাই তো মোটে তিন টাকার, তার দশগুণ হয় ত্রিশ টাকা। কিন্তু আমার চাঁদেরি শাড়িটার দাম পড়েছিল একশো নব্বই, জয়দেব একটা একজিবিশন থেকে কিনে দেয়। খুব বেশি শাড়িটাড়ি জয়দেব আমাকে কিনে দেয়নি ঠিকই, কিন্তু যে কখানা কিনে দিয়েছিল তার কোনওটাই খেলো ছিল না। এ সব ব্যাপারে ওর রুচিবোধ ছিল দারুণ ভাল।

শাড়িটার জন্য রাগে-দুঃখে আমি পাগল-পাগল। বললাম—ইয়ার্কি করছেন নাকি? দুশো টাকার শাড়ির ক্ষতিপূরণ ত্রিশটাকা? আমি ক্ষতিপূরণ চাই না, শাড়ি খুঁজে দিন।

লন্ড্রিওয়ালাও মেজাজ দেখাল-হারানো শাড়ির দাম সবাই বাড়িয়ে বলে। ও সব আমাদের জানা আছে। যা নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নিতে পারেন, শাড়ি পাওয়া যাবে না। যা করবার করতে পারেন, যান।

শেষের ওই 'যান' কথাটাই আমাকে ভীষণ অবাক আর কাহিল করে দিল। লন্ড্রিওয়ালা লোকটার চেহারা ভীষণ লম্বা, কালো, গুণ্ডার মতো, বয়সেও ছোকরা। কয়েকদিন কাচিয়েছি এ দোকানে, খুব একটা খারাপ ব্যবহার করেনি। আজ হঠাৎ মনে হল, এই ইতর লোকটাই বুঝি দুনিয়ার সেরা শয়তান। আমারই বা কী করার আছে? কী অসহায় আমরা! 'যান' বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

রাগে, দুঃখে ফেটে পড়ে আমি বললাম—যান মানে! কেন যাব? আপনি যে কাপড়টা চুরি করে নেননি তার প্রমাণ কী? ওয়াশিং চার্জের দশগুণ ক্ষতিপূরণ দিলেই যদি অমন দামি একখানা কাপড় হাতিয়ে নেওয়া যায়—!

লোকটা বুক চিতিয়ে বলল—অ্যাঃ,দামি কাপড়! আমরা ভদ্রলোকের ছেলে, বুঝলেন! দামি জিনিস অনেক দেখেছি, ফালতু পার্টি নই।

দোকানের দু-একজন কর্মচারী মালিকের পক্ষে সায় দিয়ে কথা বলছে। খুব অসহায় লাগছিল আমার। এ সময় একজন জোরালো পুরুষ-সঙ্গীর বড় দরকার হয় মেয়েদের।

একথা ভাবতে-না-ভাবতেই হঠাৎ যেন দৈববলে একজন ভদ্রলোক রাস্তা থেকে উঠে এলেন দোকানে। বেশ ভদ্র চেহারা, তবে কিছু রোগাভোগা। চোখেমুখেও বেশ দুঃখী বিনয়ী ভাব।

লোকটা দোকানে ঢুকে কয়েক পলক আমাকে দেখে নিয়ে মাথা নিচু করে বলল—ট্রাবলটা কী?

শোনাবার লোক পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম। অবিরল ধারায় কথা বেরিয়ে আসছিল মুখ থেকে।

লোকটা শুনল। কথার মাঝখানে মাথাও নাড়ল। দোকানদার বাধা দিয়ে নিজের কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু লোকটা তাকে পাত্তা দিল না। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেটুনে একটা শ্বাস ফেলে বলল—হুঁ।

লোকটাকে আমার চেনা-চেনা ঠেকছিল প্রথম থেকেই। কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু তখন শাড়ি হারানোর দুঃখ আর লন্ড্রিওয়ালার অপমানে মাথাটা গুলিয়ে ছিল বলে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

লোকটা লন্ড্রিওয়ালার দিকে একটু ঝুঁকে খুব আস্তে, প্রায় ফিসফিস করে কী যেন বলল। লন্ড্রিওয়ালা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, দেখলাম।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছি। কিছু শুনতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছিল লোকটা যেন লন্ড্রিওয়ালার বন্ধু, আবার আমারও শুভানুধ্যায়ী।

খানিকক্ষণ ওইসব ফিসফাস কথাবার্তার পর হঠাৎ লন্ড্রিওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে বলল—দিদি, একটা শেষ কথা বলে দেব? আমি একশোটা টাকা দিতে পারি খুব জোর।

আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই। যদিও আমার শাড়িটার দাম অনেক বেশি, তা হলেও সেটা তো অনেকদিন পরেছি। তা ছাড়া ত্রিশ টাকার জায়গায় একশো টাকা শুনে একটা চমক লেগে গেল। তবু বেজার মুখ করে বললাম—তাও অনেক কম। তবু ঠিক আছে।

লন্ড্রিওয়ালা টাকা নিয়ে কোনও গোলমাল করল না, সঙ্গে সঙ্গে একটা ড্রয়ার টেনে টাকা বের করে দিল। রসিদ সই করে দিলে লন্ড্রিওয়ালা লোকটিকে বলল—প্রভাসবাবু, আপনিও সাক্ষী হিসেবে একটা সই করে দিন।

লোকটা সই করলে আমি নামটা দেখলাম। প্রভাসরঞ্জন। কোনও পদবি লিখল না।

বেরিয়ে আসার সময় প্রভাসরঞ্জনও এল সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তায় কাঠফাটা রোদ। এই সকালের দিকেই সারা দিনের অসহনীয় গরমের আন্দাজ দিচ্ছে। আমি ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে পরে নিলাম। এখন অফিস যাব, তাই ট্রাম রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার আগে প্রভাসবাবুকে বললাম—আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি না এলে লোকটা টাকাটা দিত না।

প্রভাসবাবু মৃদু হেসে বললেন—আপনি কি টাকাটা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন?

আমার ভ্রূ কুঁচকে গেল। প্রশ্নটার মধ্যে একটু যেন খোঁচা আছে। বললাম—না। কেন বলুন তো।

—একটা শাড়ির সঙ্গে কত কী স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। শাড়ির দামটা তো বড় নয়।

আমি মৃদু হেসে বললাম—তাই। তা ছাড়া শাড়িটাও বড় ভাল ছিল।

প্রভাস মাথা নেড়ে বলেন—বুঝেছি। ও টাকা দিয়ে আর একটা ওরকম শাড়ি কিনবেন?

—কিনতে পারি। কিন্তু একরকম শাড়ি তো আর পাওয়া যায় না। দেখা যাক।

প্রভাসরঞ্জন আমার সঙ্গে ট্রাম রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন—শাড়িটা আপনাকে কে দিয়েছিল?

এবার আমি একটু বিরক্ত হই। গায়েপড়া লোক আমার দুচোখের বিষ। বললাম—ওটা আমার খুব পারসোনাল ব্যাপার।

প্রভাসরঞ্জন আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে বললেন—আমি অবশ্য আন্দাজ করতে পারি।

করেছিস না হয় একটু উপকার, তা বলে পিছু নেওয়ার কী? পুরুষগুলো এমন বোকা হয়, কী বলব! তবু ভদ্রতা তো আর আমাদের ছাড়ে না। আমার আবার ওই এক দোষ, সকলের সঙ্গে প্রশ্রয়ের একটু সুরে কথা বলে ফেলি। তা ছাড়া, লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর আন্দাজটা সত্যিই হতে পারে-বা।

বললাম—কী আন্দাজ করলেন?

প্রভাসরঞ্জন মৃদু স্বরে বললেন—আপনার স্বামী।

আমি একটু কেঁপে উঠলাম মনে মনে। কপালে বা সিঁথিতে আমি সিঁদুর দিই না। সম্পূর্ণ কুমারীর চেহারা আমার। তা ছাড়া যে এলাকায় আছি সেখানকার কেউ আমাকে চেনে না। এই লোকটা জানল কী করে যে আমার একজন স্বামী আছে?

এবার একটু কঠিন স্বরে কথা বলাটা একান্ত দরকার। লোকটা বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

বললাম—আমার স্বামীর খবর আপনাকে কে দিল? আমার স্বামী-টামী কেউ নেই।

·লোকটা অবাক হয়ে বলে—নেই! তা হলে তো আমার আন্দাজ ভুল হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ। এরকম অকারণ আন্দাজ করে করে আর সময় নষ্ট করবেন না। পুরুষমানুষদের কত কাজ

থাকে। পরের ব্যাপার নিয়ে মেয়েরা মাথা ঘামায়।

প্রভাসরঞ্জন কিন্তু অপমান বোধ করলেন না। বড্ড গরম আর রোদে ভদ্রলোক ঘেমে নেয়ে যাচ্ছেন। একটা টার্কিশ রুমালে ঘাড় গলা মুছলেন। পরনে একটা পাজামা আর নীল শার্ট। শার্টের কাটছাঁট বিদেশি। বাঁ হাতে বড়সড় দামি ঘড়ি। চেহারা দেখে সচ্ছল মনে হয়।

অপমান গায়ে না মেখে প্রভাসরঞ্জন বললেন—আমি আপনার ফ্ল্যাটের নীচের তলায় থাকি। আপনি তো ঠিক চিনবেন না আমাকে। পাঁচুবাবু নামে যে বুড়ো ভদ্রলোক হাসপাতালে গেছেন আমি তাঁরই ফ্ল্যাটে—

আমি হাসলাম। বললাম—ও, ভালই তো। আমি অবশ্য ও বাড়ির কারও সঙ্গে বড় একটা মিশি না।

—ভুল করেন।

—কেন?

—মেশেন না বলেই আপনাকে নিয়ে লোক খুব চিন্তা-ভাবনা করে, নানা গুজব রটায়।

আমি তা জানি। রটাবেই, বাঙালির স্বভাব যাবে কোথায়? বললাম—আমি ভুল করি না, ঠিকই করি। ওদের সঙ্গে মিশতে রুচিতে বাধে।

প্রভাসরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন—সেটা হয়তো ঠিকই। তবে আমি অন্য ধাতুতে গড়া, সব রকম মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে আমাব অভ্যাস হয়ে গেছে।

উনি কার সঙ্গে মিশেছেন, কেন মিশেছেন সে সম্পর্কে আমার কৌতূহল নেই। পার্ক সার্কাসের ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে আমি সানগ্লাসের ভিতর দিয়ে পার্কের দিকে চেয়ে থাকি। একটা কাক বুঝি ডানা ভেঙে কোনও খন্দে পড়েছে, তাকে ঘিরে হাজারটা কাকের চেঁচামেচি। কান ঝালাপালা করে দিল। তবু কাকের মতো এত সামাজিক পাখি আর দেখিনি। ওদের একজনের কিছু হলে সবাই দল বেঁধে দুঃখ জানাতে আসে। মানুষের মধ্যে কাকের এই ভালটুকুও নেই।

ট্রামের কোনও শব্দ পাচ্ছি না। বললাম—তাই নাকি?

এই 'তাই নাকি' কথাটা এত দেরি করে বললাম যে প্রভাসরঞ্জন একটু অবাক হয়ে বললেন—কিছু বললেন?

আমি বললাম—কিছু না।

প্রভাসরঞ্জন আমার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। রোদ, গরম সব উপেক্ষা করে। আজকাল প্রায়ই পুরুষেরা আমার প্রেমে পড়ে যায়। এঁর সম্পর্কেও আমার সে ভয় হচ্ছে। বেচারা!

একটু ভদ্রতা করে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম—লন্ড্রিওয়ালা কি আপনার চেনা?

—না তো! বলে ফের বিস্ময় দেখালেন উনি।

আমি বলি—আপনার কথায় লোকটা তা হলে ম্যাজিকের মতো পাল্টে গেল কেন?

—ওঃ! সেও এক মজা। ওর দোকানে আমিও কাচাতে-টাচাতে দিই, সেই সুবাদে একটু চেনা। একবার একটি প্যান্টের পকেটে ভুলে আমার পাসপোর্টটা চলে গিয়েছিল। সেইটে দেখে ও হঠাৎ আমাকে সমীহ করতে শুরু করে।

—পাসপোর্ট! আপনি বিদেশে ছিলেন নাকি?

—এখনও কি নেই? গোটা পৃথিবীটাই আমার বিদেশ।

ট্রাম কেন এখনও আসছে না এই ভেবে আমি কিছু অস্থির হয়ে পড়লাম। কারণ, আমার মনে হচ্ছিল, এ লোকটা পাগল। এর সঙ্গে আমি এক বাড়িতে থাকি ভাবতেও খুব স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

প্রভাসরঞ্জন হাতের মস্ত ঘড়িটা দেখে কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—আপনার ট্রাম তো এখনও এল না। অফিস ক'টায়?

আমি বললাম—দশটায়। তবে দশ-পনেরো মিনিট দেরি করলে কিছু হবে না।

ব্যথিত হয়ে প্রভাসরঞ্জন বলল—ওটা ঠিক নয়। দশ-পনেরো মিনিট দেরি যে কী ভীষণ হতে পারে।

আমি হেসে বললাম—কী আর হবে! সকলেরই একটু দেরি হয়। ট্রাম বাসে সময়মতো ওঠাও তো মুশকিল।

হুঁ। প্রভাসরঞ্জন বললেন—তার মানে কোথাও কেউ একজন দেরি করছে, সেই থেকেই দেরিটা

সকলের মধ্যেই চারিয়ে যাচ্ছে। ধরুন একজন স্টার্টার বাস ছাড়তে দেরি করল, ড্রাইভারও একটা পান খেতে গিয়ে দু মিনিট পিছোল, বাস দেরি করে ছাড়ল, সেই বাস-ভর্তি অফিসের লোকেরও হয়ে গেল দেরি। এই রকম আর কী। একজনের দেরি দেখেই অন্যেরা দেরি করা শিখে নেয়।

আমি হাসছিলাম।

উনি বললেন—কী করে অবস্থাটা পালটে দেওয়া যায় বলুন তো।

—পালটানো যায় না। ওই বুঝি আমার ট্রাম এল—

—হ্যাঁ। কিন্তু খুব ভিড়, উঠতে পারবেন না।

ভিড় ঠিকই। ট্রাম বাসের একটু দেরি হলেই প্রচণ্ড ভিড় হয়। তবে আমার অভ্যাস আছে।

—চলি। বলেই ট্রামের দিকেই এগোই।

প্রভাসরঞ্জন হঠাৎ আমার পিছন থেকে অনুচ্চ স্বরে বললেন—সেদিন দুপুরে কে একটা লোক আপনার ঘরে ঢুকেছিল বলুন তো, আপনার স্বামী।

কথাটা শুনে আমি আর ঘাড় ফেরালাম না; শুনিনি ভান করে ভিড়ের ট্রামে ধাক্কাধাক্কি করে উঠে গেলাম ঠিক।

আমার কোনওদিনই তেমন ঘাম হয় না, ইসিনোফিলিয়া আছে বলে প্রায় সময়ই বরং আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ শীত করে ওঠে। কিন্তু আজ আমি অবিরল ঘামছিলাম। সারাদিন বড় বেশি অন্যমনস্কও রইলাম আমি। মনে হচ্ছে, লন্ড্রিতে ওই লোকটার আসা, গায়ে পড়ে উপকার করা আর তার পরের এত সব সংলাপ এ সবই আগে থেকে প্ল্যান করে করা। এতদিন আমার জীবনটা যত নিরাপদ আর নির্বিঘ্ন ছিল এখন যে আর ততটা নয় তা বুঝতে পেরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এরা বা এই লোকটা অন্তত আমার বিয়ের খবর রাখে।

সাতদিন কেটে গেছে, প্রভাসরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় বা নামবার মুখে পাঁচুবাবুর বাইরের ঘরে থেকে খুব টাইপ রাইটারের আওয়াজ পাই। দরজা ভেজানো থাকে, কাউকে দেখা যায় না। আমিও তো আমার সিঁড়ির গোড়ায় বেশিক্ষণ থাকি না। বরং ভূতের ভয়ে কোনও জায়গা দিয়ে যেতে যেমন গা ছমছম করে, তেমনি একটা ভাব টের পাই। তাই সিঁড়ির মুখটা খুব হালকা দ্রুত পায়ে পেরিয়ে পক্ষিণীর মতো উড়ে যাই।

আমি খুব সাবধান হয়ে গেছি আজকাল। বাইরের দরজাটায় সব সময় ল্যাচকিতে চাবি দিয়ে রাখি। স্পাই হোল দিয়ে না দেখে আর নাম ধাম জিজ্ঞেস না করে বড় একটা দরজা খুলি না। অবশ্য আমার ঘরে আসবেই-বা কে?

একদিন আমার দাদা অভিজিৎ এল। সে বরাবর রোগা দুর্বল যুবক, শীত গ্রীষ্মে গলায় একটা সুতির কম্ফর্টার থাকবেই। ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে পারে না, সারা বছর তার সর্দি থাকে। ডাক্তার বলেছে এ রোগ সারার নয়।

সকালবেলায় দাদা এসে ঘরে পা দিয়েই ঝগড়া শুরু করল—এ তুই শুরু করেছিস কী বল তো! আমাদের পরিবারটা মডার্ন বটে, কিন্তু তুই যে সব লিমিট ছাড়িয়ে গেলি!

রাগ করে বললাম—ও কথা বলছিস কেন? একা থাকি বলে যত খারাপ সন্দেহ, না?

—বটেই তো। জয়দেবের সঙ্গে না থাকিস আমরা তো রয়েছি। এ দেশের সমাজে একা থাকে কোন মেয়ে?

—আমি থাকব।

—না, থাকবি না। তোর ঝাটি-পাটি যা আছে গুছিয়ে নে, আমি ট্যাকসি ডাকি।

নিজের বাড়ির কোনও লোককেই আজকাল আমার সহ্য হয় না। ওরা আমাকে স্বাভাবিক জীবন গ্রহণ করতে শেখায়নি। সেটা আজকাল আমি বড় টের পাই। চারদিকে যখন স্বামী-স্ত্রীর বসবাস দেখি তখনই আমার মনে হয়, আমারই যেন কী একটা ছিল না, হয়তো সইবার শক্তি বহনের ক্ষমতা, যা না থাকলে বিবাহিত জীবন বলে কিছু হয় না।

আমি দাদার জন্য চা করতে গিয়ে মনটাকে শক্ত করলাম খুব।

ফিরে এসে বললাম—জয়দেব বা আর কারও সঙ্গে আমি থাকব না।
—জয়দেবেরই বা দোষটা কী?
—যাই হোক। সব কি তোকে বলতে হবে নাকি?
কথায় কথায় ঝগড়া লেগে গেল। দাদা খুব জোরে চেঁচিয়ে কথা বলছিল। এই সময় ফোনটা আবার বাজল। দৌড়ে গিয়ে রিসিভার কানে তুলতেই সেই ধীর গম্ভীর গলায় বলল—আপনার ঘরে লোকটা কে?
আমি ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললাম আসুন না প্রভাসবাবু একটু হেলপ করবেন। এ লোকটা আমার দাদা, বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।
টেলিফোনে গলাটা শুনেই আজ আমি লোকটাকে চিনে ফেলেছি। কথা কটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশে হাসি শোনা গেল। প্রভাসরঞ্জন বললেন—বড্ড মুশকিল হল দেখছি! চিনে ফেললেন! দাদা কী বলছেন?
—ফিরে যেতে।
—তাই যান না। জয়দেববাবুর তো কোনও দোষ নেই।
—আপনি সেটা জানলেন কী করে?
—খোঁজ নিয়েছি। ইনফ্যাক্ট আমি জয়দেববাবুর সঙ্গেও দেখা করেছি ক'দিন আগে।
—মিথ্যে কথা।
—না, মিথ্যে নয়। আমি এখন একটা ডেইলি নিউজ পেপারের স্পেশাল রিপোর্টার। মধু মল্লিক যে কাগজে কাজ করেন।
—তাতে কী?
—সেই কাগজের তরফ থেকে স্মল স্কেল আর কটেজ ইন্ডাস্ট্রির একটা সার্ভে করেছিলাম। জয়দেববাবু ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। খুব পণ্ডিত লোক।
—আমার কথা উঠল কী করে?
—উঠে পড়ল কথায় কথায়।
দাদা এসে এ ঘরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ফোনের কথা শুনছে। একবার চোখের ইশারা করে জিজ্ঞেস করল—কে?
আমি হাত তুলে ওকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে ফোনে বললাম—না, আপনিই আমার কথা তুলেছিলেন।
—তাই না হয় হল, ক্ষতি কী?
—ক্ষতি অনেক। তার আগে বলুন, আপনার এ ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট কেন?
প্রভাসরঞ্জন কিছু গাঢ় গলায় ইংরিজিতে বললেন—বিকজ আই হ্যাভ অলসো লস্ট সাম অফ মাই হিউম্যান পজেশনস।
ফোন কেটে গেল।
দাদা বলল—কে রে?
—একজন চেনা লোক।
দাদা গম্ভীর হয়ে বলল—চেনা লোক! বাঃ, বেশ। চেনার পরিধি এখন পুরুষমহলে বাড়ছে তা হলে।
আমি ছোট্ট করে বললাম—বাড়লে তোর কী?
—আমার অনেক কিছু। সে থাকগে, একি লোকটা তোকে কী বলছিল?
আমি হঠাৎ আক্রোশে রাগে প্রায় ফেটে পড়ে বললাম—তোরা কেউ কি আমাকে শান্তিতে থাকতে দিবি না!
দরজার কাছ থেকে প্রভাসরঞ্জন বললেন—শান্তিতে কি এখনই আছেন? যান তো, একটু চা করে এনে খাওয়ান।
আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম লোকটার সাহস দেখে।

প্রভাসরঞ্জন

পাঁচুদাকে দেখেই বুঝি যে লোকটার হয়ে গেছে। ব্যাচেলার মানুষ আত্মীয়স্বজন বলতেও কাছের জন কেউ নেই, মরলে কেউ বুক চাপড়াবে না, অনাথা বা অনাথ হবে না কেউ। সেই একটা সান্ত্বনা। তবু একটা মানুষ ছিল, আর থাকবে না এটা আমার সহ্য হচ্ছিল না। বলতে কি পাঁচুদার জন্য বেশ দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম।

ব্যাচেলারদের বেশি বয়েসে কিছু-না-কিছু বাতিক হয়ই। সম্ভবত কামের অচরিতার্থতা, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি মিলেমিশে তাদের বায়ুগ্রস্ত করে তোলে। পাঁচুদারও তা-ই হয়েছিল। চিরকাল তাঁর দূর সম্পর্কের যত আত্মীয়স্বজন তাঁর কাছ থেকে পয়সাকড়ি বা জিনিসপত্র হাতিয়েছে। ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসী জ্যোতিষেরাও কাজ গুছিয়েছে কম নয়। পাঁচুদা কয়েকবারই জোচ্চোরদের পাল্লায় পড়ে ব্যবসাতে নেমে ঠকে এসেছেন। তাঁর বাপের কিছু টাকাও তিনি পেয়েছিলেন, চাকরির বেতন তো ছিলই, সব মিলেই বেশ শাঁসালো খদ্দের। লোকে ঠকাবে না কেন? প্রতি বছর মাসখানেক ধরে তীর্থ ভ্রমণ করতেন। ভারতবর্ষের এমন জায়গা নেই যেখানে যাননি। শেষ বয়সটায় বেশ কষ্ট পেলেন।

আমার মধ্যে একটা পাপবোধ ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় যখন প্রচণ্ড অভাবের সময় চলছিল তখন এই পাঁচুদা বেশ কয়েকবার আমাদের অনাহার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই তাঁর প্রতি আমাদের একটা মতলববাজ মনোভাব জন্মায়। পাঁচুদা মানেই হচ্ছে আদায়ের জায়গা। তাই পাঁচুদা আমাদের বাড়িতে এলেই আমরা খুশি হতাম, যখন-তখন তাঁর বাসা বা অফিসে গিয়ে নানা কাঁদুনি গেয়ে পয়সা আদায় করেছি। আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফি তিনিই দেন। আর, আমি তাঁর একটা সোনার বোতাম চুরি করেছিলাম।

এসব কথা তাঁকে আর বলার মানে হয় না। তবু যখন শ্যামবাজারে আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়ে এক কঙ্কালসার চেহারাকে দেখি তখনই সেইসব পাপের কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে। নিজেকেই বলি—প্রভাসরঞ্জন, পাপের কথা স্বীকার করে নাও, খ্রিস্টানরা যেমন যাজকদের কাছে করে।

আমার কথা শুনে পাঁচুদা হেসে বললেন—যা যা জ্যাঠা ছেলে, চুরি করেছিস বেশ করেছিস। সেই চুরির বোতাম আজ তোকে দান করে দিলাম, যা।

ক্যানসারের কষ্ট তো কম নয়। শরীর শুষে ছিবড়ে করে ফেলেছে প্রতিনিয়ত। কিছু খেতে পারেন না। যা খান তা উঠে আসে ভেতর থেকে । ক্রমশ শরীর ছেড়ে যাচ্ছে তাঁর সব শক্তি। এখন কঙ্কালসার হাতখানা তুলতেও তাঁর বড় কষ্ট। মাঝে মাঝে দেখি বুকের কম্বলটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে কাঁদেন। সে কান্নাও অতি ক্ষীণ। যেমন পাঁজরের খাঁচা থেকে এক বন্দি ভোমরার গুঞ্জনধ্বনি উঠে আসে।

পত্রিকা অফিস থেকে আজকাল প্রায়ই নানা জায়গায় পাঠায়। আর দু-এক মাসের মধ্যেই আমাকে পাকা চাকরিতে নেওয়া হবে। সাংবাদিকের এই চাকরি আমার খুব খারাপ লাগছে না। কিন্তু সব সময়ে একটা এই দুঃখ, আমি নানা দেশ ঘুরে যে প্রযুক্তি শিখেছি তা কোনও কাজে লাগল না। জীবনের দশ দশটা বছর আমি বৃথা অন্বেষণে কাটিয়ে এসেছি। আয়ুক্ষয়।

সুইজারল্যান্ডে আমাদের কারখানা দেখতে সেবার এক জাপানি প্রতিনিধি দল এল। বেঁটে বেঁটে চেহারার হাস্যমুখ, বুদ্ধির আলোজ্বলা ছোট ছোট চোখের মানুষ। প্রত্যেকেই বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার তাদের দেশে। কারখানা দেখার অনুমতি চাইল। ওপরওয়ালা আমাকে এবং আরও কয়েকজনকে ডেকে ওদের কারখানা দেখাতে বলে দিলেন। অনুমতি পেয়ে জাপানিদের চেহারা ধাঁ করে পালটে গেল। পরনের স্যুট খুলে ওভারঅল পরে নিল সবাই, খাতা-পেনসিল-পেন-কম্পাস সাজিয়ে নিল। তারপর প্রতিটি যন্ত্র আর যন্ত্রাংশের মধ্যে ওরা কালিঝুলি মেখে ঢুকে যেতে লাগল। ভাল করে লাঞ্চ পর্যন্ত করল না । ভূতের মতো শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের সমস্ত রহস্য জেনে নিতে লাগল। পরপর সাত দিন একনাগাড়ে তার কারখানাটিকে জরিপ করতে লাগল । শেষ দিকে ওদের চলাফেরা, যন্ত্রের ব্যবহার এবং কথাবার্তা শুনে হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি এ কারখানায় এতকাল থেকেও যে সব রহস্য জানি না ওরা অল্প দিনেই তা সব জেনে গেছে।

জাপানিরা দেশে ফিরে যাওয়ার দু বছরের মধ্যে জাপান থেকেই বিশ্বের বাজারে কম্প্রেসর মেশিন

ছাড়া হল। সুইস কম্প্রেসরের চেয়ে তা কোনও অংশে খারাপ তো নয়ই, বরং দামে অনেক সস্তা। এমনকী ওরা সুইস যন্ত্রের নকল করেছে বলেও মনে করার কারণ নেই। যন্ত্রের মৌল রহস্যটা জেনে গিয়ে ওরা ওদের মতো যন্ত্র বানিয়েছে।

এ ঘটনার বছরখানেকের মধ্যেই একটি ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যার দল সুইজারল্যান্ড যায়। ব্যল-এ এসে তারা আমাদের কারখানাতেও হানা দিয়েছিল । স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন—তোমার দেশের লোকদের তুমিই এসকর্ট করে নিয়ে কারখানা দেখাও।

ভারতের লোক এসেছে শুনে আমি খুবই উৎসাহ বোধ করি। দলে একজন বাঙালিও ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে তিনি একটু অবাক হলেন। কিন্তু তিনি দেশে খুব বড় চাকরি করেন, আর আমি এ কারখানার একজন স্কিলড লেবার মাত্র। তাই তিনি আমার সঙ্গে বিশেষ মাখামাখি করলেন না, একটু আলগা আলগা ভালবাসা দেখালেন। মোট ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে তাঁরা অত বড় কারখানাটার হাজারো যন্ত্রপাতি দেখে ফেললেন। যা-ই দেখাই তা-ই দেখেই বলেন—ওঃ, ভেরি গুড। হাউ নাইস! ইস ইট! যন্ত্রপাতি তাঁরা ছুঁয়েও দেখলেন না। তারপর ম্যানেজারের ঘরে বসে কফি খেয়ে চলে গেলেন। পরে স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন—তোমার দেশের লোকেরা এত অল্প সময়ে এত বড় প্রোজেক্টের সব বুঝে ফেলল?

তখন আমি ঠিক করেছিলাম এরা যা করেনি তা আমাকেই করতে হবে। তারপর কিছুদিন আমি একা একা পুরো যন্ত্রপাতির নকশা কপি করতে শুরু করি। এমনিতেই ভূতের মতো খাটুনি ছিল, তার ওপর বাড়তি খাটুনি যোগ হল। হয়তো পেরেও যেতাম। কিন্তু ঠিক সেই সময় বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় আমার ভিতরকার সব উৎসাহ নিভে যায়। তবু যা শিখেছিলাম, যা কপি করেছিলাম তাও বড় কম নয়। যে-কোনও ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে আমার প্রযুক্তির ধারণা অনেক প্রাঞ্জল এবং বাস্তব। আমি হাতে-কলমে যন্ত্র চালিয়েছি। যন্ত্রের সব চরিত্রই আমার জানা। এখনও ভারী কম্প্রেসর মেশিনেব যে-কোনও কারখানায় আমার অভিজ্ঞতা অসম্ভব রকমের কার্যকর হতে পাবে।

কিন্তু তা হল না। আমি এখন নানা চটুল বা রাশভারী বিষয় নিয়ে খবরেব কাগজে ফিচার লিখছি। লিখতে আমার খারাপ লাগে না ঠিকই, কিন্তু সব সময়েই আমার অধীত বিদ্যাব অপচয়ের জন্য কষ্ট হয়, যা কষ্ট করে শিখে এসেছি তা এ দেশে কাজে লাগল না। অবশ্য আমি এখানকার কলকারখানায় চাকরি করতে আর উৎসাহীও নই। আমি চেয়েছিলাম নিজেই একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করব।

এখন টাইপ রাইটারের খটখটানির মধ্যে একরকমের নতুন জীবনের খবর পেয়ে যাচ্ছি। মধু মল্লিক এসে প্রায়ই খবর দেন, আমার ফিচারগুলো কাজের হচ্ছে।

মধু মল্লিক একদিন এসে বললেন—কস্ট অফ প্রোডাকশন কমিয়ে আনার ব্যাপাবে আপনার ফিচারটা সাঙ্ঘাতিক হয়েছে। কিন্তু প্রভাসভাবু, আমাদের সবচেয়ে বেশি কটেজ আর স্মল স্কেল। শুধু হেভি ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে এদেশের ইনকাম স্টেবল করা যাবে না। আপনি কি এ কথা মানেন?

আমি মানি। মধু মল্লিকও মানেন দেখে খুব খুশি হলাম। বললাম—কটেজ বা স্মল স্কেল না থাকলে দেশের প্রাণ নষ্ট হয়ে যায় এ আমি স্বীকার করি। তা ছাড়া এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক ওইসব নিয়ে আছে। কৃষিভিত্তিক সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওটার খুবই দরকার।

—লিখুন না একবার স্মল আর কটেজ নিয়ে। মধু মল্লিক বললেন। কাজ সহজ নয় তবে আমার অফিস থেকে প্রচুর সাহায্য করা হল এ ব্যাপারে! কুটির এবং ছোট ছোট শিল্পের ওপর পত্রিকা চারটে সিরিয়াল ছাপাবে। আমাকে সে জন্য গোটা পশ্চিমবাংলার গাঁয়ে গঞ্জে চলে যেতে হল। সরকারি লোকদের সঙ্গে দেখা করা। সেই সূত্রেই জয়দেবের সঙ্গে দেখা বাঁকুড়ায়। ভারী দুঃখী চেহারার লোক এবং খুবই ভালমানুষ। ডক্টরেট হয়েছেন সম্প্রতি, জানেনও বিস্তর। একখানা নতুন বই লিখেছেন ফোক আর্ট সম্পর্কে। কথায় কথায় বিয়ের কথা উঠতে আমি বলেছিলাম—আমার বউ-ছেলে সব পর হয়ে গেছে। সেই ভ্যাকুয়ামটা পূর্ণ করতে এখন আমার অনেক কাজ চাই। নইলে একা হলেই ভূতে পায়।

জয়দেব আমার হাত চেপে ধরে বললেন—আমার কেসও আপনার মতো। আমার ছেলেপুলে নেই, কিন্তু বউ ছিল। প্রায় বিনা কারণে সে আমাকে ছেড়ে গেছে।

যোগাযোগটা খুবই অদ্ভুত। অলকার স্বামীকে যে এত সহজে দুম করে খুঁজে পাব কখনও ভাবিনি।

পরিচয় বেরিয়ে পড়তে যখন অলকার খবর দিলাম তখন জয়দেব হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে জিজ্ঞেস করল—ও কি আবার বিয়ে করবে?

—না, না।

—ওকে বলবেন, মেয়েদের দুবার বিয়ে হতে নেই। সেটা খুব খারাপ। ও আমাকে ছেড়ে যাওয়ায় আমাদের পরিবারে মস্ত ঝড়ের ধাক্কা গেছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা তো কখনও সমাজ বা পরিবারের পারসপেকটিভে দাম্পত্য জীবনের কথা ভাবে না। যদি ভাবত তা হলে অলকা অত সহজে ছেড়ে যেতে পারত না। অপছন্দের স্বামীকেও মানিয়ে নিত। আর এও তো সত্যি যে, আজকের অপছন্দের লোক কালই প্রিয়জন হয়ে উঠতে পারে, যেমন আজকের প্রিয়জন হয়ে যায় কাল দুচোখের বিষ!

সত্যি কথা। সহ্য করা বা বহন করা আজকের মানুষের ধাতে নেই। অপছন্দের জিনিস তারা খুব তাড়াতাড়ি বাতিল করে দেয়। নতুন জিনিস নিয়ে আসে। আর এইভাবেই তাদের স্বভাব হয়ে উঠেছে পিছল ও বিপজ্জনক।

আমি বললাম—আপনি কি এখনও অলকাকে ভালবাসেন?

কেমন একরকম লোভী শিশুর মতো তাকাল জয়দেব। অনেকক্ষণ বাদে মাথা নেড়ে বলল—তাতে কী যায় আসে! ও তো আর আমাকে ভালবাসে না!

আমি চিন্তা করে বললাম—দেখুন, ভালবাসাটা সব সময়েই তো আর হুস করে মাটি ফুঁড়ে ফোয়ারার মতো বেরোয় না। ওটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। ভালবাসার চেষ্টা থেকেই ভালবাসা আসে।

—সে হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই চেষ্টারও অভাব রয়েছে। তিলমাত্র মমতা থাকলে তাকে বাড়িয়ে বিরাট ভালবাসা জন্মাতে পারে। কিন্তু যেখানে সেই তিলমাত্রও নেই?

আমি ভাবিত হয়ে পড়ি। এবং ফিরে আসি।

কলকাতায় এসেই একটু ঝামেলায় পড়ে গেলাম।

একদিন অনেক রাত অবধি টাইপ মেশিন চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছি। ভোররাতে এসে ঘুম ভাঙাল সুহাস।

দরজা খুলে তাকে দেখে খুব খুশি হই না, বললাম—কী রে, কী চাস?

—মার খুব অসুখ। এখন-তখন অবস্থা। কী করব।

শরীরে একটা ধনুকের টংকার বেজে উঠল। মা!

কথা আসছিল না মুখে। অবশ হয়ে চেয়েছিলাম, সুহাস বলল—কিছু টাকা দাও।

—টাকা দেব? অবাক হয়ে বলি—টাকা দেব সেটা বড় কথা কী। আগে গিয়ে মাকে একটু দেখি! তুই ট্যাক্সি ডাক তো।

বলে আমি ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পরছিলাম। সুহাস ট্যাক্সি আনতে যায়নি, দরজার কাছে দোনোমনো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পড়তে বলল—তুমি বিশ্রাম নাও না! এক্ষুনি যাওয়ার দরকার নেই খুব একটা। অবস্থা যতটা খারাপ হয়েছিল ততটা এখন নয়। তুমি ব্যস্ত মানুষ, দু-চারদিন পরে যেয়ো।

ওর কথা বুঝতে পারছিলাম না একদম। আবোল-তাবোল বকছে? এই বলল খারাপ অবস্থা, আবার বলছে তত খারাপ নয়। কেমন একটু সন্দেহ হল মনে। বললাম—তোর মুখে সত্যি কথা-টথা আসে তো ঠিক?

—বাঃ, মিথ্যে বলছি নাকি?

—মার অসুখ, তা আমাকে যেতে বারণ করছিস কেন?

—তোমার অসুবিধের কথা ভেবেই বলেছি। যাবে তো চলো।

—ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়, আমি যাব।

দমদমের বাসার কাছে এসে যখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছি তখন সুহাস 'এই একটু আসছি' বলে কথায় কেটে পড়ল। বাড়িতে ঢুকে দেখি মা পিছনের বারান্দায় বসে কুলোয় রেশনের চাল বাছছে।

আমি গিয়ে মার কাছে বসতেই মা কুলো ফেলে আমাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বলল, ওরা বলে তুই

নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছিস। কোনও এক বিধবা না সধবার সঙ্গে নাকি তোর বিয়ে সব ঠিক?

আমি স্তম্ভিত হয়ে মাকে দেখি। অনেকক্ষণ বাদে বলি—তোমার কী হয়েছে? শুনলাম তোমার খুব অসুখ!

—হলে বাঁচি বাবা। সে অসুখ যেন আর ভাল না হয়। কিন্তু গতরে তো অসুখও একটা করে না তেমন।

—সুহাস আজ সকালে গিয়ে তোমার অসুখের নাম করে টাকা চেয়েছিল।

মা হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলে—ওর অবস্থা খুব খারাপ বাবা, নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তাই বোধহয় এই ফিকির করেছিল।

রান্নাঘর থেকে নিমি খুব হাসিমুখে এককাপ চা নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল—দাদাকে কতদিন বাদে দেখলাম! খুব ব্যস্ত শুনি!

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—সুহাস কোথায় গেল বউমা?

—এসে পড়বে এক্ষুনি। বসুন না।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—ও আসবে না, আমি জানি। বউমা, তুমি মার কাপড়চোপড় যা আছে গুছিয়ে দাও। আমি মাকে নিয়ে যাব।

মা শুনে কেমন ধারা হয়ে গিয়ে বলল—সে কী কথা বলিস! এখন আমি কোথায় যাব?

আমি চড়া গলায় বললাম—যেতেই হবে। এখানে তোমার গুণের ছেলে তোমাকে ভাঙিয়ে ব্যবসা শুরু করতে চলেছে যে! কত বড় সাহস দেখেছ!

অমনি নিমি ঘর থেকে তেড়ে এসে বলল—বেশি বড় বড় কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি। আপনার কীর্তিরও অনেক জানি!

দুচার কথায় প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে গেল। পাড়ার লোক এসে জুটতে লাগল চারদিকে।

আমি মাকে বললাম—মা, তোমাকে যেতেই হবে। এ নরকে আর নয়।

বোধহয় আমাকে ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচাতেই মা উঠে গিয়ে একটা টিনের তোরঙ্গ গুছিয়ে নিল। আমি মাকে নিয়ে চলে এলাম।

কয়েকদিন মন্দ গেল না। মা রান্না বান্না করে, আমি কাজে যাই। মধু মল্লিকের সবাই মার দেখাশুনা করে। এমনকী অলকা পর্যন্ত খোঁজ খবর নিয়ে যায়। কিন্তু এতসব ভদ্রলোক এবং লেখাপড়া জানা পরিবেশে থেকে মার অভ্যাস নেই। সব সময় তটস্থ ভাব। মাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় অবশ্য আমার ছিল না, দিনরাত ঘুরি, রাত জেগে ফিচার টাইপ করি।

দিন পনেরো পরে মা একদিন মিনমিন করে বলল—প্রভাস, একবার বরং দমদম থেকে ঘুবে আসি।

গম্ভীর হয়ে বলি—কেন?

মা ভয় খেয়ে বলে—সুহাস আর নিমি যেমনই হোক ওদের ছেলেমেয়েগুলো আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না।

আমি বললাম—মা, সুহাস আর নিমি তোমার ওপর কেমন নির্যাতন করে বলো তো! মারে নাকি?

মা শ্বাস ফেলে বলে—অমানুষের সব দোষ থাকে বাবা। মাকে মারবে সে আর বেশি কথা কী?

—তবু যেতে চাও?

—ওদের কাছে যেতে চাইছি নাকি! ওই যে ছেলেমেয়েগুলো, ওরা যে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে আমার জন্য কাঁদে।

—কাঁদবে না, অভ্যাস হয়ে যাবে।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—তুই একটা বিয়ে কর। তখন এসে পাকাপাকিভাবে তোর কাছে থাকব।

আমি বললাম—বাবার কাছে যাবে মা? চাও তো বন্দোবস্ত করে দিই।

—যাব বই কী। যাবখন। শীতটা আসুক।

বুঝলাম, এ জন্মের মতো সুহাসের হাত থেকে মার মুক্তি নেই। সুহাস যেমনই হোক, তার বংশধরেরা মার রক্তের স্রোত নিজের দিকে টেনে নিয়েছে। আর ফেরানো যাবে না।

মাকে একদিন ফের গিয়ে দমদমের বাড়িতে রেখে এলাম।

এই ঝামেলায় আর জয়দেবের কথা তেমন মনে ছিল না। কাজের চাপও ক্রমশ বাড়ছে। হঠাৎ একদিন সাত সকালে জয়দেব নিজেই এসে হাজির।

অলকা

মেঘৈর্মেদুরম্বরম। কাল রাত থেকে বৃষ্টি ছাড়েনি। যেমন ভয়ঙ্কর তেজে কাল রাত ন'টায় বৃষ্টি এল প্রায় ঠিক তেমনি তেজে সারা রাত ধরে বৃষ্টি পড়ল। ঘুমের মধ্যেই মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, কলকাতা ভেসে যাবে।

একটা গোটা ফ্লাটে সম্পূর্ণ একা থাকতে আমার যে ভয়-ভয় করে তা মিথ্যে নয়। শোয়ার আগে বারবার দরজা জানালার ছিটকিনি দেখি, খাটের তলা, আলমারির পেছনে এবং আর যে সব জায়গায় চোর-বদমাশ লুকিয়ে থাকতে পারে তা ভাল করে না দেখে শুই না। ভূতের ভয় ছেলেবেলা থেকেই ছিল না, তবে বড় হওয়ার পর কখনও কখনও কী যেন একটা ভূত-ভূত ভয়ের ভাব হয়। বিশেষ করে যেদিন বৃষ্টি নামে। কাল সারা রাতের অঝোর বৃষ্টিতে বারবার জানালার শার্সিতে টোকা পড়েছে বৃষ্টির আঙুলে, দরজা ঠেলেছে উন্মত্ত বাতাস। ঝোড়ো বৃষ্টিতে কলকাতার ট্রামবাস ডুবে গেল বুঝি। শহরটা বোধহয় একতলা সমান জলের তলায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এমন বাদলা বহুকাল দেখিনি।

ঘুম ভেঙে একবার উঠে দেখি, রাত দুটো। শীত-শীত করছিল। বাথরুমে গিয়ে হঠাৎ কেন গা ছমছম করল। একটু শিউরে উঠে প্রায় দৌড়ে এসে বাতি না নিভিয়ে চাদব মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাতি জ্বালানো থাকায় ভয়-ভয় ভাবটা কমল বটে, কিন্তু ঘুম আসে না। কোনওখানে মানুষের জেগে থাকার কোনও শব্দ হচ্ছে না। কুকুরের ডাক, বেড়ালের আওয়াজ কিছু নেই। ঘনঘোর মেঘ ডেকে ওঠে কেবল, বৃষ্টির জোর বেড়ে যায়, চারিদিক লণ্ডভণ্ড হতে থাকে। শুয়ে থেকে বুঝতে পারছিলাম, পৃথিবীতে একা হওয়ার মধ্যে কোনও সুখ নেই। একা মানুষ বড় নিস্তেজ, মিয়োনো।

নরম বালিশ বারবার মাথার তাপে গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি বালিশ উল্টে দিচ্ছি বারবার। বর্ষাকালের সোঁদা স্যাঁতা এক গন্ধ উঠেছে বিছানা থেকে। কিছুতেই রাত কাটছে না।

এইভাবে রাত আড়াইটেয় বড় অসহ্য হয়ে উঠে বসলাম। বুকেব ভিতরটা ফাঁকা লাগছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল কারও সঙ্গে একটু কথা বলতে, কারও কথা শুনতে। কিন্তু আমার তো তেমন কেউ নেই।

জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। ব্যালকনির দিকে জানালাব শার্সির পাল্লা আছে, অন্যগুলোয় কাঠের পাল্লা। শার্সিতে চোখ রেখে দেখি ভূতের দেশেব অন্ধকাব চাবদিক। নীচের রাস্তায় পরপর আলোগুলোর মধ্যে দুটো মাত্র জ্বলছে এখনও। সেই আলোয় দেখা গেল, রাস্তায় হাঁটুজল। জলে প্রবল বৃষ্টির টগবগানি। আকাশ একবার দুবার চমকায়, গম্ভীব মেঘধ্বনি হয়। বড় একা লাগে।

আমার পরনে নিতান্তই সংক্ষিপ্ত পোশাক। গায়ে কেবল ব্লাউজ, পরনে সায়া। রাতে এত বেশি গায়ে রাখতে পারি না। ঘরের বাতি জ্বালা রেখে এ পোশাকে জানালায় দাঁড়ানো বিপজ্জনক। কিন্তু ওই নিশুত রাতে কে আর দেখবে। আর মনটাও বড় অস্থির তখন। ঠাণ্ডা শার্সিতে গাল চেপে ধরে বিবশার মতো বাইরে তাকিয়ে থেকে থেকে আস্তে আস্তে জগৎসংসারের ওপর এক গভীর অভিমান জেগে উঠল। কেবল মনে হতে লাগল—তোমাদের কাছে আমার আদর পাওনা ছিল। কেন তোমরা কেউ কখনও আমাকে ভালবাসলে না? বলো কেন...?

কখনও কেঁদেছি আপনভোলা হয়ে। কাঁদছি আর কাঁদছি। আর কাকে উদ্দেশ করে যেন বিড়বিড় করে বলছি—এবার একদিন বিষ খেয়ে মরব, দেখো।

এ কথা বিশেষ কারও উদ্দেশ করে বলা তা সঠিক আমিও জানি না। তবে এই প্রচণ্ড বৃষ্টির রাতে যখন চারদিকের সব নাগরিকতা মুছে গিয়ে অভ্যন্তরের বন্যতা বেরিয়ে আসে, যখন মনে হয় এইসব ঝড়বৃষ্টির মতো কোনও অঘটনের ভিতর দিয়েই আমাকে সৃষ্টি করেছিল কেউ, তখন আর কাউকে নয়,

কেবল এই জন্মের ওপরেই বড় অভিমান হয়।

একা, বড় একা।

শার্সির কাছ থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে আসি। সাজানো ঘর-দোর ফেলে অসীমদা কেন বিদেশে চলে গেছে তার পরিবার নিয়ে। হয়তো ফিরবে, হয়তো কোনওদিনই ফিরবে না। এই যে আলমারি, খাটপালঙ্ক, রেডিয়োগ্রাম, নষ্ট ফ্রিজ, টেলিফোন, এরা কারও অপেক্ষায় নেই, এরা কারও নয়। তবু মানুষ কত যত্নে এইসব জমিয়ে তোলে। কান্না পাচ্ছিল। টেলিফোনের সামনে বসে বিড়বিড় করে বললাম—কোনও মানুষকে জাগানো দরকার, আমাকে ভূতে পেয়েছে আজ রাতে, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে, আমি বড় একা।

টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে থাকি। কোনও বিশেষ নম্বর ধরে নয়, এমনি আবোল-তাবোল যে নম্বর মনে আসছে সেই ঘরে আঙুল দিয়ে ডিস্ক ঘুরিয়ে দিচ্ছিলাম। প্রথমবার অনেকক্ষণ ধরে রিং হল, কেউ ধরল না। আমার ভয় করছিল শেষ পর্যন্ত কেউ কি ফোন ধরবে না?

তৃতীয়বার রিং হতে দু মিনিট বাদে একটি মেয়ের ঘুম-গলা ভেসে এল—

—আমি অলকা।

—অলকা! কোন অলকা? এটা ফোব সিক্স ডবল থ্রি...

আমি বললাম—শুনুন, রং নাম্বার হয়নি, আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

অবাক মেয়েটি বলল—কী কথা?

আমি বললাম—আপনার কে কে আছে? স্বামী।

—আমার বিয়ে হয়নি।

—মা? বাবা? ভাইবোন?

—বাবা আছেন। এক ভাই। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো! এত রাতে এসব কী প্রশ্ন?

—আমার বড় একা লাগছে। ভয় করছে। আপনার নাম কী?

ওপাশের মেয়েটি অবশ্যই খুব ভাল স্বভাবের মেয়ে। অন্য কেউ হলে ফোন রেখে দিত। এ কিন্তু জবাব দিল। বলল—আমার নাম মায়া দাস।

—কী করেন?

—কলেজে পড়াই। কিন্তু আমার এখন খুব টায়ার্ড লাগছে। আপনি কে বলুন তো!

—আমি অলকা। আমি একটা ফ্ল্যাটে একা থাকি। আজ রাতে বড় ঝড়-বাদল, আমার ভাল লাগছে না।

—সেই জন্য? আমার ফোন নম্বর আপনি জানলেন কী করে?

—জানি না তো! এখনও জানি না। আন্দাজে ছ'টা নম্বর ডায়াল করছিলাম, নম্বরগুলো মনেই নেই এখন। আপনি রাগ করলেন?

—না, রাগ নয়। আমাকে অনেক খাতা দেখতে হচ্ছে। ভীষণ টায়ার্ড।

—তা হলে ঘুমোন।

—শুনুন, আপনি আমার চেনা কেউ নন তো? ফোনে মজা করার জন্য পরিচয় গোপন রেখে...

—না না। সেসব নয়। আমি আসলে চাইছি, কিছু লোক আমার মতোই জেগে থাকুক আজকের রাতে। আমার কেবল মনে হচ্ছে আমি ছাড়া সারা কলকাতায় বুঝি আর কেউ জেগে নেই।

ওপাশে বোধহয় মেয়েটির বাবা জেগে গেছেন। এক গম্ভীর পুরুষের স্বর শুনতে পেলাম—কে রে মায়া? কোনও অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

মায়া বোধহয় মাউথপিসে হাত চাপা দিল। কিছুক্ষণ সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তারপর মায়া বলল—আপনার নাম—ঠিকনা কিছু বলবেন?

—কেন?

—বাবা বলছেন, আপনার কোনও বিপদ ঘটে থাকলে আমরা হেল্প করার চেষ্টা করতে পারি।

—অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার বিপদ কিছু নেই। শুধু ভয় আছে। ঘুম ভাঙালাম বলে কিছু মনে করবেন না।

—আমার বাবা ডি এস পি। কোনও ভয় করবেন না।

ঠিক এই সময়ে মায়ার বাবা ফোন তুলে নিয়ে বললেন—হ্যালো, আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?

—পার্ক সার্কাস। খুব অসহায় গলায় বললাম।

—বাড়িতে একা আছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন, বাড়ির লোকজন কোথায় গেল?

একটু চুপ করে থেকে বললাম—আমি একাই থাকি।

মায়ার বাবা একটু গলা ঝেড়ে বললেন—ও। বয়স কত?

—বেশি নয়। একুশ-বাইশ।

—কী করেন।

—একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করি।

—ঠিকানাটা বলুন।

একটু দ্বিধায় পড়ে যাই। নার্ভাসও লাগছে খুব। এতটা নাটক না করলেও হত। ঠিকানা দিলে ডি এস পি সাহেব হয়তো থানায় ফোন করে দেবেন, পুলিশ খোঁজ নিতে আসবে। কত কী হতে পারে!

ঝুঁকি না নিয়ে বললাম—কাকাবাবু, মাপ করবেন। অনেক বিরক্ত করেছি।

উনি বললেন—শুনুন, আমার মনে হচ্ছে আপনি কোনও বিপদে পড়েছেন, কিন্তু বলতে সংকোচ করছেন। আমি অ্যাকটিভ পুলিশের লোক, নিঃসংকোচে বলতে পারেন। আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে পারি।

ওঁর এই সহৃদয়তা আমার ভাল লাগছিল। কিন্তু কী করব, আমার যে পুলিশের কোনও দরকার নেই! এই বৃষ্টি-বাদলার রাতে আমি মানুষের জেগে-থাকার শব্দ শুনতে চেয়েছিলাম মাত্র। হয়তো এটা ভীষণ ছেলেমানুষি। এইভাবে ফোন করে লোককে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত করা ঠিক হয়নি। তবু আর তো কোনও উপায় ছিল না।

ভদ্রলোক বারবার 'হ্যালো হ্যালো' করছেন সাড়া না পেয়ে। আমার কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার জোগাড়। আস্তে আস্তে বলতে হল—না কাকাবাবু, কোনও বিপদ নয়। কেবল ভয়। এখন ভয়টা কেটে গেছে। তারপর ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

বাকি রাতটা আধো-জাগা আধো-ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দিতে দিতে বারবার ডি এস পি ভদ্রলোকের সাহায্য করা, প্রোটেক্ট করার কথাটা মনে পড়ছিল। আমাকে কেউ রক্ষা করুক, ত্রাণ করুক এ আমার অসহ্য। আমি কি অসহায়, অবলা?

ঠিক এই কারণেই প্রভাসরঞ্জন বাবুকে আমি পছন্দ করতে পারি না। যেমন অপছন্দ আমার সুকুমারকে। এমনকী উপরওয়ালার ভূমিকা নেওয়ার একটা অস্পষ্ট চেষ্টা করেছিল বলেই বোধহয় জয়দেবকেও আমি নিতে পারিনি স্বামী হিসেবে। জয়দেবের অবশ্য আরও অনেকগুলো খাঁকতি ছিল।

সকালেও বৃষ্টি ছাড়েনি। এ বৃষ্টিতে ঝি আসবে না জানি। কাজেই সকালে উঠে ঘরদোর সারতে হল নিজেকেই। এক অসম্ভব একটানা প্রবল বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। আমার ফ্ল্যাট থেকে রাস্তার কোনও গাড়িঘোড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, নীচের হাঁটুজলে কিছু গরিব ঘরের ছেলে চেঁচাচ্ছে আর বল খেলছে। কয়েকবার রিকশার ঘণ্টির শব্দ হল। কাদের ঘর থেকে উনুনের ধোঁয়া আসছে ঘরে।

চালে-ডালে খিচুড়ি চাপিয়ে এক কাপ কফি নিয়ে জানালার ধারে বসি। আকাশের মেঘ পাতলা হয়ে আসছে। বৃষ্টির তেজ এইমাত্র খানিকটা কমে গেল। ধরবে। অফিসে যাওয়াটা কি আজ ঠিক হবে? না গেলেও ভাল লাগে না। একা ঘরে সারাদিন। কী করি?

বেলা নটায় উঠে স্নান সেরে নিলাম। ভেজা চুল আজ আর শুকাবে না। কিন্তু রাতে ঘুম হয়নি, স্নান না করলে সারাদিন ঘুমঘুম ভাব থাকত। কিন্তু স্নান করেই বুঝলাম, হুট করে ঠাণ্ডা লেগে গেল। গলাটা ভার, চোখে জল আসছে, নাকে সুড়সুড়, তালুটা শুকনো-শুকনো। ছাতা হাতে অফিসে বেরোলাম তবু শেষ পর্যন্ত।

সিঁড়ির নীচেই প্রভাসরঞ্জন দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তার জল দেখছিলেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন—যাবেন কী করে? যা জল!

—যেতে হবে যেমন করে হোক।

—ট্রাম-বাসও পাবেন না। দুটো-একটা যা চলছে তাতে অসম্ভব ভিড়। আমি একটু আগে বেরিয়ে দেখে এসেছি।

একটু ইতস্তত করছিলাম। রাস্তায় বেরিয়ে যদি ফিরে আসতে হয় তো যাওয়াও হল না, জল ভেঙে ঠাণ্ডাও লেগে গেল হয়তো।

প্রভাসরঞ্জন বললেন—খুব জরুরি কাজ নাকি?

—জরুরি। একটা ফাইল ক্যাবিনেটের চাবি আমার কাছে রয়ে গেছে।

—রেনি ডে-তে কি আর অফিসের কাজকর্ম হবে?

—হবে।

এই বলে রাস্তাঘাট একটু দেখে নিয়ে সত্যিই বেরিয়ে পড়ি। রাস্তায় পা দিতে-না-দিতেই একটা পাতলা মেঘের আস্তরণ কাটিয়ে রোদ দেখা দিল। কী মিষ্টি রোদ! গোড়ালিডুবু জল ভেঙে, শাড়ি সামলে কষ্টে এগোতে থাকি। ঠাণ্ডা জলে পা দিতেই শরীর একটা শীতের কাঁপনি দিচ্ছে। দিক। গোটা দুই ট্যাবলেট খেয়ে নেব। ট্যাবলেট ক্যাপসুলের যুগে অত ভয়ের কিছু নেই।

ভাগ্য ভাল, ডিপোর কাছ বরাবর যেতে-না-যেতেই লেডিজ স্পেশাল পেয়ে পেলাম।

অফিসে এসেই বেয়ারাকে দিয়েই গোটা দশেক ট্যাবলেট আনিয়ে দুটো খেয়ে ফেললাম। তারপর চা। শরীরটা খারাপই লাগছে। সর্দি হবে।

গামবুট আর বর্ষাতিতে সেজে সুকুমার আজ বেশ দেরিতে অফিসে এল। ও আবার ম্যানেজমেন্টকে বড় একটা তোয়াক্কা করে না। অফিসে ঢুকেই ধরাচূড়া ছেড়ে সোজা আমার টেবিলের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল—দুটো সিনেমার টিকিট আছে। যাবে? ইংরিজি ছবি।

আমি ওর বিশাল স্বাস্থ্যের চেহারাটা দেখলাম খানিক। এর আগে ওর সঙ্গে কয়েকবারই সিনেমায় গেছি। তখন সংকোচ ছিল না। সেদিন আমার ফ্ল্যাটে সেই কাণ্ড ঘটানোর পর থেকে ও আর বড় একটা কাছে ঘেঁষেনি এতদিন। লজ্জায় লজ্জায় দূরে দূরে থাকত। আজ আবার মুখোমুখি হল।

বললাম—আজ শরীর ভাল নেই।

—কী হয়েছে?

—সর্দি।

—ওতে কিছু হবে না। চলো, ঠেসে মাংস খেয়ে নেবে। মাংস খেলে সর্দি জব্দ হয়ে যায়।

হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেললাম—আর সুকুমার জব্দ হবে কীসে?

সুকুমার দু পলক আমাকে দেখে নিয়ে অত্যন্ত নির্লজ্জ গলায় বলল—মাংসে। যদি সেই সঙ্গে হৃদয় পাওয়া যায় তো আরও ভাল।

একবার আক্রান্ত হওয়ার পর আমার সাহস কিছু বেড়েছে। বললাম—এত দাবিদাওয়া কীসের বলো তো। বেশ তো আছি। তুমি তোমার মতো, আমি আমার মতো।

—আমি আমার মতো নেই।

এটা অফিস, এসব কথাও বিপজ্জনক। তাই মুখ নিচু করে বললাম—এসব কথা থাক সুকুমার।

—থাক। তবে এসব কথা আবার উঠবে, মনে রেখো।

আমি ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলাম। পুরুষেরা অসম্ভব দখলদার এক জাত।

দুটো সিনেমার লাল টিকিট বের করে সুকুমার আমার সামনেই ছিঁড়ল কুটিকুটি করে। আমার টেবলের উপর ছেঁড়া টিকিটের টুকরো কাগজ জড়ো করে রেখে বলল—জানতাম তুমি যেতে চাইবে না। কিন্তু আমারও তো একটা সুযোগ দরকার।

অফিসে আজ কাজকর্মের মন্দা। লোকজন বেশি আসেনি। বেশ বেলা করে দু-চারজন এসেছে বটে, তবু বড্ড ফাঁকা ঠেকছে অফিস। নিরিবিলিতে বসে কথা বলতে বাধা নেই। সত্যি বলতে কী, আমার কথা বলতে ইচ্ছেও করছিল।

বললাম—সুযোগ মানে কিন্তু দখল করা নয়। আমি কারও সম্পত্তি হতে পারিনি, কোনওদিন পারবও না।

—তা হলে আমাকেই তোমার সম্পত্তি করে নাও না। চিরকাল তোমার হুকুমমতো চললেই তো হল।

হাসলাম। ছেলেমানুষ।

বললাম—ওরকম নেতানো নির্জীব পুরুষও মেয়েদের পছন্দ নয়।

—তা হলে কী হবে?

—কিছু হবে না।

—কীসের বাধা অলকা? তোমার স্বামীর কথা ভাবছ?

মাথা নেড়ে বললাম—না। তবে সেটাও ভাবা উচিত। এখনও তার সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়নি।

—করে নাও।

বড় করে একটা শ্বাস ফেলে বললাম—সে অনেক ঝামেলা, দরকারও দেখি না। কিছুদিন গেলেই সে নিজেই মামলা করবে। আমি কোর্টে যাব না, এক্সপার্টি হয়ে ওকে ডিক্রি করে দেব।

—সেটা অনিশ্চিত ব্যবস্থা অলকা। উনি যদি মামলা না করেন?

—বয়ে গেল।

সুকুমার মাথা নেড়ে বলে—তুমি অত আলগা থেকো না। কেন নিজেকে নষ্ট করছ? আমি যে শেষ হয়ে যাচ্ছি!

কী থেকে কী হয়ে গেল মনের মধ্যে।

মেঘভাঙা অপরূপ রোদের ঝরনা বয়ে যাচ্ছে চারদিকে। অফিসঘরে গনগন করছে আলোর আভা। দুদিন মনমরা বৃষ্টির পর কী ভাল এই রোদ্দুর। কাল রাতের সেই একা থাকা ভয়ংকর ছবি মিথ্যে মনে হয়। আবার সেই বাসায় আজকেও আমাকে একা ফিরে যেতে হবে। যদি রাতে বৃষ্টি আসে ফের, রাতে আবার ঘুম ভেঙে ভূতে-পাওয়া মাথা নিয়ে বসে থাকতে হবে।

হ্যাঁ, ঠিক। প্রোটেক্টার না হোক, আমার একজন সঙ্গী চাই। কাউকে না হলে বাঁচব কী করে?

সুকুমার দেখতে বেশ। তা ছাড়া বড় সরল, সোজা ছেলে। কখনও ওকে খারাপ লাগেনি। আজ অপরাহ্ণের আলোয় অফিসঘরে বসে মুখোমুখি ওর দিকে চেয়ে হঠাৎ কী হয়ে গেল। ভাবলাম—কী হবে এত বাছবিচার করে! নিজেকে নিয়ে আর কত বেঁচে থাকা।

বললাম—শোনো সুকুমার, আমি ডির্ভোস চাই।

—চাও? ও লাফিয়ে ওঠে।

—চাই। আমার স্বামীও চায়। হয়তো ডিভোর্স পেতে কিছু সময় লাগবে।

—তারপর কী করবে অলকা?

—তারপর করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে সুকুমার। এক দুরন্ত অধৈর্য অনুভব করে বলি।

—অলকা, যদি আমরা এক্ষুনি বিয়ে করি, তা হলে?

আমি ক্ষণকাল চুপ করে থাকি। বুকের মধ্যে নানা ভয়, দ্বিধা, সংস্কার ছায়া ফেলে যায়।

তারপর বলি—কয়েকটা দিন সময় দাও।

—দিলাম। কতদিন বলো তো

—দেখি।

একরকম কথা দেওয়াই হয়ে গেল সুকুমারকে। একটু হয়তো কিন্তু রইল, দ্বিধা রইল, তবু ওটুকু কিছু নয়। সেসব দ্বিধা, ভয় ভেঙে সুকুমার ঠিক সাঁতরে আসবে কাছে।

রাতটা মাসির বাড়িতে গিয়ে কাটালাম। জ্বর এল রাতে। তিনটে দিন বাড়ির বার হওয়া গেল না। অল্প জ্বরেই কত যে ভুল বকলাম ঘোরের মধ্যে।

চারদিনের দিন ফের ফ্ল্যাটে ফিরে এলাম। মাসি আজকাল আর আটকে রাখে না, যেতে চাইলে এককথায় ছেড়ে দেয়। ঢিলে বলগা মেয়েকে সকলেরই ভয়।

দোতলার ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা জানালা হাট করে খুলে বদ্ধ বাতাস তাড়াই। ধুলো-ময়লা পরিষ্কার

করি। রবিবার। তাড়া নেই।

চায়ের জল চাপিয়ে এলোচুলের জট ছাড়াতে একটু ব্যালকনিতে দাঁড়াই।

কলিং বেল বাজল। এ সময়ে কেউ আসে না। একমাত্র সুকুমার আসতে পারে। তার তর সইছে না।

কাঁপা বুক নিয়ে গিয়ে দরজা খুলেও সাপ দেখে পিছিয়ে আসার অবস্থা। চৌকাঠের ওপারে জয়দেব দাঁড়িয়ে।

কিছুক্ষণ কথা ফোটে না কারও মুখে। জয়দেবের চেহারা রোদে পোড়া, তামাটে, কিছু রোগা হয়েছে। মাথার চুল এত ছোট যেন মনে হয় কদিন আগে ন্যাড়া হয়েছে। পরনে ধুতি আর ক্রিমরঙা সুতির শার্ট। কিন্তু ধুতিটা এমনভাবে পরেছে যে মনে হয় পাশের ফ্ল্যাট থেকে এল। বাইরে বেরোবার পোশাক নয়।

চৌকাঠের বাইরে থেকে জয়দেব এক পাও ভিতরে আসার চেষ্টা করল না। দাঁড়িয়ে থেকে বলল—তুমি এখানে থাকো সে খবর সদ্য পেয়েছি।

—কী চাও?

খুব সাধারণ আলাপচারির গলায় জয়দেব বলল—কিছু চাই না অলকা। তোমার কাছে ডিভোর্সে মত দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, তার কোনও উত্তর দাওনি। তোমার কি মত আছে?

একটু গম্ভীর হয়ে বলি—দরজার বাইরে থেকে অত জোরে ওসব কথা বলছ কেন? ভিতরে এসো।

জয়দেব এল। কোনওদিকে তাকাল না, ঘরের আসবাবপত্র লক্ষ করল না। খুবই কুণ্ঠিত পায়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বলল—আমি নীচের তলায় প্রভাসবাবুর বাসায় উঠেছি কাল এসে।

প্রভাসের সঙ্গে জয়দেবের চেনা আছে জানতাম। তাই চমকালাম না। দরজা বন্ধ করে এসে জয়দেবের মুখোমুখি বসে বললাম—আমি খুব তাড়াতাড়ি ডির্ভোস চাই।

জয়দেব মুখখানা করুণ করে বলল—তাড়াতাড়ি চাইলেই তো হয় না! কোর্ট থেকে এ সব কেসে বড় দেরি করে। তাড়াতাড়ি চাইলে আরও আগে জানালে না কেন? কবে কেস ফাইল করা যেত।

আমি মাথা নিচু করে বলি—শোনো, ডিভোর্স পেতে দেরি হোক বা না হোক, আমরা তো একটা এগ্রিমেন্টে আসতে পারি!

—কী এগ্রিমেন্ট?

—ধরো, আমরা কাউকে কোনও অবস্থাতেই দাবি করব না! পরস্পরের কোনও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাব না!

—তার জন্য এগ্রিমেন্ট লাগে না অলকা। জয়দেব বলল—আমরা সেই রকমই আছি। কথার স্বর শুনেই বোঝা যায়, জয়দেবের মন এখন অনেক গভীর হয়েছে। জীবনে কোনও একটা সত্য বস্তুর সন্ধান না পেলে মানুষ এত গভীর থেকে কথা বলতে পারে না। তাই আমি ওর মুখেব দিকে কয়েকবার তাকালাম। ও আমাকে দেখছিল না। চোখ তুলে দেওয়ালের মাঝারি উচ্চতায় চেয়েছিল। সেই অবস্থায় চেয়ে থেকেই বলল—তুমি একটি ছেলেকে পছন্দ করো শুনেছি। তাকে বিয়ে করার জন্যই কি এত তাড়া?

সত্যিকারের অবাক হয়ে বলি—না তো! আমি কাউকেই পছন্দ করি না।

—সুকুমার না কী যেন নাম, শুনছিলাম। তোমার অফিসের।

—ওঃ! বাস্তবিক আমার সুকুমারের মুখটা এখন মনে পড়ল। বললাম—পছন্দ নয়। তবে ওই একরকম।

—ভাল।

—তুমি ডিভোর্স চাইছ কেন? বিয়ে করবে? বললাম।

ও অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল—বিয়ে আর না। মুক্তি চাইছি, নইলে বড় কষ্ট হয়।

—কষ্ট কীসের?

—ওই একটা অধিকারবোধ থাকে তো পুরুষের। সেইটে মাঝে মাঝে চাড়া দেয়। ডিভোর্স হয়ে গেলে একরকম শান্তি।

—ও।

—আচ্ছা—বলে জয়দেব কুণ্ঠিত পায়ে উঠল। উকিলের চিঠি দেব। তুমি কি অ্যালিমনি চাও?

—সেটা কী?

—খোরপোষ।

—না, না! চমকে উঠে বলি।

—আচ্ছা তা হলে—

—আচ্ছা। বললাম।

দরজা খুলে জয়দেব চলে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে ওর পায়ের শব্দ যখন নামছে তখন আমি ঘরের মধ্যে চুলের জটে আঙুল ডুবিয়ে বসে আছি। কত ভাবনা! সে যেন এক আলো-আঁধারের মধ্যে ডুবে বসে থাকা। উঠলাম না, রাঁধলাম না, খেলাম না। শুধু বসে রইলাম।

হঠাৎ এক ভয়ের আঙুল হৃৎপিণ্ডে টোকা মারল। নড়ে উঠল বুকের বাতাস। সচেতন ভীতগ্রস্ততায় টের পাই—আমি কাউকেই ভালবাসি না। কাউকে নয়। কেবলমাত্র নিজেকে। আমি কোনওদিন কাউকে ভালবাসতে পারব না।

কী করে বেঁচে থাকব আমি?

পৃথিবীতে কত দুর্যোগের বর্ষা নামবে কতবার! কত একা কাটবে দিন! কাউকে ভাল না বেসে আমি থাকব কী করে?

বিকেল কাটল। নীচের তলা থেকে অহঙ্কারী জয়দেব একবারও এল না খোঁজ করতে। সুকুমার টেলিফোনও করল না। বড় অভিমানে ভরে গেল বুক। সারাদিন খাইনি, স্নান করিনি, কে তার খোঁজ রাখে!

সন্ধে হল, রাত গড়িয়ে গেল গভীরের দিকে।

শরীর দুর্বল। মাথা ফাঁকা। মনটায় তদগত একটা আচ্ছন্নতা। ভূতে পেয়েছে আমাকে। উঠে গিয়ে ছারপোকা মারবার অমোঘ ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে টেবিলে বসলাম। চিরকুটে লিখে রাখলাম—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

লিখে বিছানায় শুয়ে আস্তে শিশির মুখ খুলে ঠোঁটের কাছে এনে পৃথিবীকে বললাম—ভালবাসা ছাড়া কী করে বাঁচি বলো! বাঁচা যায়? ক্ষমা করো।

ঠিক এ সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল মৃদু সেতারের মতো। উঠলাম না। শিশিটা উপুড় করে দিলাম গলার মধ্যে।

হায়! ফাঁকা শিশি প্রেমহীন হৃদয়ের মতো চেয়ে রইল আমার শূন্য হৃদয়ের দিকে। এক ফোঁটা বিষও ঢালতে পারল না সে। অমৃতও না।

উঠে টেলিফোনটা যখন ধরছি তখন কেন যেন খুব ইচ্ছে করছিল, টেলিফোনে যেন জয়দেবের গলার স্বর শুনতে পাই।

বাঘু মান্নার বরাত
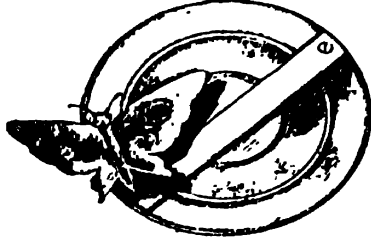
বাঘু মান্নাকে কেন যে গোঁসাইপুরের লোকেরা বাঙাল বলে তা বাঘু বুঝে উঠতে পারে না। বাঘুর বাড়ি হল খন্যান, সেই হুগলি জেলা। নিকষ্যি ঘটি। শ্বশুরবাড়ি পীরগঞ্জ। সেও ঘটিস্য ঘটি দেশ। তবে কিনা গোঁসাইপুরের লোকেদের ধারণা, এ জায়গা ছাড়া আর সব জায়গাই হচ্ছে বাঙাল দেশ। গোঁসাইপুর জায়গাটাকে বুঝে নিতে একটু সময় লেগেছিল বাঘুর। জন্ম-বয়সে সে তো আর বিদেশ-বিভুঁই যায়নি। খন্যানের রেলস্টেশনটা অবধি চোখে দেখেনি এই সেদিন অবধি। তারপর বিয়ে করতে যখন পীরগঞ্জে গেল তখন বেশ দূরেই যাওয়া হল তার। সেই বীরভূম। তারপর মাসিশাশুড়ির সম্পত্তির গন্ধ পেয়ে এই গোঁসাইপুর।

বিয়ে করল পীরগঞ্জে গেরস্তঘরে। অবস্থা কিছু ভাল নয়। একখানা সাইকেল দিতেই শ্বশুরের মুখখানা তেলোহাঁড়ি হল। গাঁ-ঘরে সাইকেল দেওয়াটা নিয়মের মধ্যেই পড়ে, চাইতে হয় না। কিন্তু ফেরেব্বাজ শ্বশুর সেটাও চেপে যেতে চেয়েছিল। পরে চেয়েচিন্তে আদায় করতে হয়। তবে, খামতি যা ছিল তা হাঁকডাকে পুষিয়ে দিত শ্বশুর। কালেভদ্রে গেলে কোমরের কষি বাঁধতে বাঁধতে উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরবাড়ির দিকে ফিরে হাঁক মারত, ওরে জামাই এয়েছে, পুকুরে জাল ফ্যাল, জাল ফ্যাল। তা জাল ফেলা হত কি না কে জানে, কিন্তু খাওয়ার পাতে চুনোপুঁটি বরাদ্দ ছিল। পরে শুনেছে, জাল ফেলার ব্যাপারটাও ফেরেব্বাজি, তাদের মোটে পুকুরই নেই।

বাঘু পাত্র হিসেবে জুতের নয়। তার বাপ-মাও ধরে নিয়েছিল, এ ছেলের গতিক সুবিধের হচ্ছে না। বাঘুরা তিন ভাই। বড় দু জন ডাকাবুকো, বিষয়ী। বাঘু তাদের মতো নয়। তার ওপর অল্পবয়সেই কুসঙ্গে পড়ে নেশাভাঙও ধরে ফেলেছিল। একে একে দু ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল। বাঘু তখন বাইশ-তেইশ বছরের জোয়ান। নেশা করে এখানে সেখানে পড়ে থাকে। তারই মধ্যে একদিন ভাইরা গিয়ে চ্যাং দোলা করে তুলে এনে পুকুরে চুবিয়ে মাথায় টোপর পরিয়ে ড্যাং ড্যাং করে নিয়ে চলল বিয়ে দিতে। কিছু ভাল করে বুঝে উঠবার আগেই বিয়ে হয়ে গেল। বউয়ের নাম শুনল, ময়না। বিয়ে ব্যাপারটা মন্দ লাগল না বাঘুর। লোকজন, আলো রোশনাই, বাদ্যি বাজনা, খাওয়া দাওয়া, দেওয়া থোওয়া, হাসি মশকরা সব মিলিয়ে জম্পেশ ব্যাপার। তবে কে পাত্রী ঠিক করল, কবে বিয়ের তারিখ হল এ সব সে জানেও না। বেশি জানার দরকারই বা কী? বিয়ে দিয়ে তাকে ঘরবাসী করার মতলব ছিল বাড়ির লোকের। কিন্তু ময়নাকে নিয়েই বাধল গোল। ছ মাসের মাথায় সে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে বাপের বাড়ি গিয়ে উঠল। সেখান থেকেই খবর পাঠাল, শ্বশুরঘর করতে তার বয়েই গেছে।

এরকম ধারা যে হবে তা বাঘুর বাড়ির লোক একরকম ধরেই নিয়েছিল। তাদের না আছে পয়সার জোর, না ছেলেটা মানুষের মতো মানুষ। ছ মাসের মধ্যে ছ দিনও বউয়ের সঙ্গে রাত কাটায়নি বাঘু। তা বলে হম্বিতম্বি করতে ছাড়েনি বাঘুর বাপ-ভাইরা। বাঘুর অবশ্য তাপ-উত্তাপ কিছু ছিল না। তার তো মজার অভাব নেই। এখানে সেখানে মদের ঠেক, নেশার দেদার ব্যবস্থা। ময়নার অভাব সে টেরও পেল না। তবে বাপ ভাই মা আর বউদিদিদের গঞ্জনায় তাকেও মাঝে মধ্যে ঝগড়া করতে শ্বশুরবাড়ি যেতে হত। কিন্তু ময়না মোটেই দেখা করত না তার সঙ্গে। গাঁ-ঘরে এমন তেজালো মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। ময়নাকে আনা তো গেলই না, উপরন্তু সে গোঁসাইপুরের মাসির আশকারা পেয়ে একদিন সোজা চলে গেল মাসির কাছে। ভারী তেজালো মাসি। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখে সেখানে আরও দুই সতীন মজুত। মাসি সোজা একবস্ত্রে বেরিয়ে এসে পড়ল। তারপর ভারী কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে মাস্টারি জুটিয়ে নিজের ভার নিজেই নিল। জোতজমি করল, ঘর তুলল, নানা কাজে জড়িয়ে পড়ল। লীলাময়ীর ভারী নামডাক এদিকে। পতিত উদ্ধার করে বেড়ায়, মেয়েদের উসকে দেয়। পুরুষরা ছিল তার চোখের বিষ। মাসি ময়নাকে নিজের কাছে শুধু রেখেই দিল না, বিয়ে ছাড়কাট করার জন্য উকিলও লাগাল। বলল, ময়নার আমি আবার বিয়ে দেব। একটা হাঘরে মোদো মাতাল ছেলের সঙ্গে

বিয়ে দিয়ে বেড়াল পার করেছে ওর বাপ, আমি ও বিয়ে মানি না।

বিয়ে হয়েও তাই বাঘু একলা একলাই রয়ে গেল। লীলাময়ীর থানে এসে হুজ্জুত করার সাহস ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। বাঘু বউ দিয়ে করবেটো কী? বরং ঝামেলা বাড়ানো। দিব্যি হেসেখেলে দিন কেটে যাচ্ছে।

অসুবিধেটা দেখা দিল বাপ মরার পরই। ভাইরা সব জোতজমি ভাগ বাটোয়ারা করে ভিন্ন হল। এক একজনের ভাগে যা পড়ল তা আতস কাচ দিয়ে দেখতে হয়। মিলেজুলে যখন ছিল তখন একরকম চলে যেত। ভিন্ন হওয়ার পর হাঁড়ির হাল। তবু দুই ভাই বিষয়ী এবং খাটিয়ে বলে সামলে গেল, বিপদে পড়ল বাঘু। একদিন চটকা ভেঙে বুঝল, তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড়।

নেশাভাঙের কথা দূরে থাক, দুবেলা দুমুঠো ভাতই জুটত না তখন। দাদারা কুকুর-তাড়া করে দূরে রাখে। ইয়ারবন্ধুরা পরামর্শ দিল, একবার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখ যদি কিছু হয়।

ততদিনে বাঘু ময়নার মুখটাও ভুলে গেছে। তবু গেল। শ্বশুরমশাই যথারীতি পুকুরে জাল ফেলার জন্য হাঁকাহাঁকি করলেন এবং শাশুড়ি পুঁটিমাছ দিয়ে ভাত খাওয়ালেন। বিকেলবেলার দিকে মুড়ি আর ফুটকড়াই ভাজা দিয়ে জলখাবার খেয়ে সে একটা ঢেঁকুর তুলে শ্বশুরমশাইয়ের কাছে কথাটা পেড়ে ফেলল। তেমন মন্দ কথাও নয়। সে এখন ঘরজামাই থাকতে চায়।

দুনিয়ার কত শ্বশুর আছে যারা জামাইয়ের কাছ থেকে এহেন প্রস্তাব পেয়ে বগলে চাঁদ পাওয়ার মতো আহ্লাদে আটখানা হতেন। কিন্তু এই শ্বশুর আঁতকে উঠেই বললেন, ঘরজামাই! বলো কী হে! ময়না এখন তার মাসির হেপাজতে। তোমার সঙ্গে একটা নামমাত্র বিয়ে হয়েছিল বটে, তা সে তো কোর্টকাছারি করে লীলাময়ী ছাড়ান কাটান করে ফেলেছে। লীলাময়ী ময়নার আবার বিয়ে দেবে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তুমি এখন আর আমার জামাই-ই তো নও, ঘরজামাই তো দূরের কথা।

ছাড়ান-কাটান যে হয়ে গেছে তাও জানত না বাঘু। শুনল, একতরফা হয়ে গেছে। উকিলের চিঠি, আদালতের নোটিশ সবই নাকি জারি হয়েছিল বাঘুর নামে। হবে। তার বাড়িতে কে আর অত খতিয়ে দেখেছে। তবে ভারী দমে গেল বাঘু। এখন উপায়?

শ্বশুরমশাই একটু চাপা গলায় বললেন, আমরা সেকেলে লোক। তাই জামাই বলে তোমাকে খাতির যত্ন করছি বাবা। নইলে তুমি বাড়ির পরস্য পর। আর একটা কথা, লীলাময়ীর কাছে হুট করে গিয়ে হাজির হয়ো না। জাঁহাবাজ মেয়েছেলে। হাতে ষণ্ডাগুণ্ডা আছে।

বাঘু মলিন মুখে গাঁয়ে ফিরে এল। মুখ দেখেই স্যাঙাতরা বুঝল, মাল আবার ঘাড়ে চাপতে এসেছে। সবচেয়ে ঘড়েল লোকটি হল শিবপদ। সে পরামর্শ দিল, শোনো বাঘু, মরণ তো একবারই। যাও গিয়ে গোঁসাইপুরেই হানা দাও। শত হলেও সাত পাকে বাঁধা বউ, ফেলবে না। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারে। তা করুক। কে-ই বা তোমাকে মান্যিগণ্যি করছে বলো। প্রাণ আগে না মান আগে? তবে বেশি আইন টাইন বা গায়ের জোর দেখিয়ো না। শুধু মোলায়েম করে মাসিকে বলবে, কাজটা কি ভাল হচ্ছে। সধবার বিয়ে দেওয়াটা উচিত হচ্ছে না।

বাঘু প্রথমটায় রাজি হল না। তার ভারী ভয় করছিল। ময়নার মুখটাও যে তার মনে নেই। শ্বশুরমশাই গুণ্ডার ভয়ও দেখিয়ে রেখেছেন। লীলাময়ী ভারী গেছো মেয়েছেলে। কেন যে লোকের ওরকম মাসি থাকে তা কে জানে। আর জুটল এসে তারই কপালে।

বাঘু খন্যানে কিছুকাল কষ্টেসিষ্টে রইল। নেশাভাঙ ছুটে গেছে খিদের জ্বালায়। স্যাঙাতরা আর চিনতেও চায় না, দাদারা দূরছাই করে। বাঘু একদিন গভীর রাতে পেটে খিদে নিয়ে বসে গম্ভীরভাবে ভাবল। তবে দেখল, মরা তার বরাদ্দ আছে। কেউ খণ্ডাতে পারবে না। বরাত ঠুকে একবার গোঁসাইপুর হাজির হয়ে দেখেই না কী হয়।

ভোর না হতেই বাঘু রওনা দিল। ভয়ে, অনিশ্চয়তায়, খিদেয় যখন আধমরা হয়ে পৌঁছল তখন নতুন জায়গায় পৌঁছনোর পক্ষে সময়টাকে ভাল বলা যায় না। ভরসন্ধে। রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই না জুটলে বড়ই মুশকিল। তবে বাঘুর একটা সুবিধে আছে, মদ, ভাঙ গাঁজা, যা হোক চড়িয়ে নিয়ে যেখানে সেখানে পড়ে থাকলেই হবে।

বেশি খুঁজতে হল না, যাকে লীলাময়ীর নাম বলে সে-ই ভারী খাতির করে পথ দেখিয়ে দেয়। পৌঁছে

দেখে, একতলা দিব্যি পাকাবাড়ি। সামনে বাগান। অনেকবার আগু পিছু করে এবং অনেক ভেবেচিন্তে বাঘু শুধু কয়েকবার গলা খাঁকারি দিতে পারল। তার বেশি আর মুরোদে কুলোলো না।

তবে কিনা বেশিক্ষণ আর নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হল না। লীলাময়ীর বাড়িতে অনেকের যাতায়াত। বিশেষ করে মেয়েছেলেদের। তাদেরই একজন তাকে আগাপশতলা চোখের নজরে জরিপ করে নিয়ে বলল, অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে কী মতলবে?

আজ্ঞে এটা আমার শ্বশুরবাড়ি।

শ্বশুরবাড়ি! এ তো লীলামাসির আশ্রম।

আজ্ঞে, তিনি আমার মাসিশাশুড়ি।

বললেই হল।

ধর্মতই বলছি, বছর দুই আগে ময়নার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।

এ কথায় মেয়েছেলেটি এমন চোখ করে তার দিকে তাকাল যে বাঘুর রক্ত জল হয়ে যেতে লাগল। তারপরই মেয়েটা বিকট গলায় বলল, ওঃ তুমিই সে-ই-বদমাশ। তুমিই সেই মাতাল! হাড় হাভাতে বউঠ্যাঙানো বীর! ময়নার জীবনটা তুমি মাটি করেছ তা হলে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা...

তারপর এমন চিল-চ্যাঁচাতে লাগল যে লহমায় লোক জড় হয়ে গেল চারদিকে। বাঘুর তখন পালানোর পথ নেই। টালুমালু হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে আর শুকনো মুখে ঢোঁক গেলার চেষ্টা করছে।

গোলমালে ময়না আর তার সাংঘাতিক মাসিও বেরিয়ে এল। ঘটনাটা বুঝে উঠতে এবং বাঘুকে চিনতে একটু সময় লাগল তাদের। তবে মাসি ঘটে কিছু বুদ্ধি ধরেন। বাঘুর বিচারটা পথের ওপর না করে ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে বাঘুকে মেঝের ওপর নিলডাউন করিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মতলব কী?

বাঘু তখন চিঁ চিঁ করছে। হাত জোড় করে বলল, বদ মতলব কিছু নেই। না খেতে পেয়ে মরতে বসেছি, শেষ দেখা দেখতে এলাম।

তাতে চিঁড়ে ভিজল না। মাসির সন্দেহ বাঘু ময়নার বিয়েতে বাগড়া দিতে এসেছে।

বাঘু মাথা নেড়ে বলল, ওরকম কথা ভাবাও পাপ, ধর্মত বলছি ময়নার বিয়েতে আমি ঘাড়ে করে সাত পাকের পিঁড়ি ঘুরিয়ে দেব।

অনেক রাত অবধি তাকে নিয়ে নানা কথা আলোচনা হল। ময়না অবশ্য সামনে এল না, আর বাঘু খিদে তেষ্টা পরিশ্রমে বসে বসে ঢুলতে লাগল। এত ভ্যাজরং ভ্যাজরং তার ভাল লাগছিল না।

রাত এগারোটা নাগাদ মাসি তাকে ঘুম থেকে তুলে বলল, আজ রাতের মতো বারান্দায় পড়ে থাকো। কাল সকালে এ তল্লাট ছেড়ে চলে যাবে। নইলে বিপদ আছে।

বাঘু ভারী মুষড়ে পড়ল। কোথায় যে যাবে তা-ই বুঝতে পারছে না। খেতে টেতেও দিল না এরা। রাতে বাঘু খালি পেটে ঠাণ্ডার মধ্যে বারান্দায় শুয়ে অকাতরে ঘুমোল বটে, কিন্তু মাঝরাতেই কাঁপিয়ে জ্বর এল। সকালে দেখা গেল, জ্বরের তাড়সে ভুল বকছে। সেই অবস্থায় হাসপাতালে চালান দেওয়া হল তাকে। সেখানে মেঝের ওপর কম্বলের বিছানায় ফেলে রাখল। চারিদিকে গু-মুত, কুকুর-বেড়াল, ছুঁচো-ইঁদুর, টপাটপ রুগিরা টসকে যাচ্ছে। সে এক বিভীষিকা। বাঘু জ্বর নিয়েই হামাগুড়ি দিয়ে পালানোর তালে ছিল। হল না। সিঁড়ি থেকে পড়ে চোট হয়ে গেল মাথায়। তবে দিন সাতেক বাদে তার জ্বর ছাড়ল। মাথার চোটটাও আর তেমন টের পাচ্ছিল না। একদিন সকালবেলা তার যখন পরিপূর্ণ জ্ঞান হল তখন চারদিককার নরকটাকে ভাল করে চেয়ে দেখল সে। মানুষে আর পশুতে কোনও তফাত নেই। জীবনে কোনও ভাল কাজ করেনি সে! বড় দুঃখ হল নিজের জন্য। সে উঠে চারদিক ঘুরে টুরে দেখে। এক গাছা ঝাঁটা আর বালতি জোগাড় করে আনল। হাসপাতালটা মোটেই বড় নয়। দুখানা মোটে ওয়ার্ড। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় সে গোটা জায়গাটা সাফ করে ফেলল। ফিনাইলের বোতল ছিল না, ব্লিচিং পাউডার ছিল। তাই লাগাল। রুগিরা ভারী অবাক হয়ে দেখতে লাগল তাকে। আর এই যে সবাই তাকে দেখছে এটা ভারী নেশার মতো পেয়ে বসল তাকে। বাঘু সকাল-বিকেল নিজে থেকেই হাসপাতাল সাফাই চালিয়ে যেতে লাগল। তিন দিন বাদে হাসপাতালের ধাঙড়রা এসে ধরল তাকে। প্রথমে হম্বি তম্বি তারপর অশ্রাব্য গালাগাল, তারপর মারধোর। বাঘু যে-কাজ করেছে তাতে নাকি

তাদের চাকরি যাওয়ার ভয় দেখা দিয়েছে। মার খেয়ে বাঘু আবার শয্যা নিল। তবে হাসপাতালে নয়, বাইরের রাস্তায়। কাজটা বাঘু তো খারাপ করেনি। রুগিরাও দেখেছে তা। তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও সাক্ষী। সুতরাং ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াল। এক দল লোক এসে বাঘুকে তুলে ফের হাসপাতালে ভর্তি করাল। তারপর বেধড়ক ঠ্যাঙাল ধাঙড়দের। সে অ্যাইসা ঠ্যাঙানি যে হাড়গোড় সব দ হয়ে গেল। যাই হোক এই ঘটনায় বাঘুর নামটা বেশ ছড়াল। বাঘেন্দ্র মান্না যে লোকের উপকার করতে ভালবাসে এবং নামে বাঘা হলেও যে সে হালুম-বাঘা নয় তাও সবাই স্বীকার করে নিল।

কিন্তু হাসপাতাল তো আর বাসাবাড়ি নয়, চিরকাল সেখানে থাকাও যায় না। দিন পনেরো বাদে তার ছুটি হয়ে যেতে সে ফের চোখে সরষেফুল দেখতে লাগল।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাঘু রাস্তায় এসে পড়ল, চারদিকেই নানা রাস্তা নানা দিকে গেছে। কিন্তু বাঘুর মুশকিল হল তার কোথাও যাওয়ার নেই। শীতের সকালে ফুরফুরে রোদে কত লোক হাঁটা-চলা করছে, বাজার যাচ্ছে, বাড়ি যাচ্ছে, কাজে যাচ্ছে, খোকাখুকিরা ইস্কুলে-কলেজে যাচ্ছে। বাঘু তৃষিত নয়নে চেয়ে রইল। অমনধারা তারও কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে।

গোসাঁইপুর অজ গাঁ নয়, বরং বেশ ফাঁদালো গঞ্জ জায়গা। মাইল তিনেক দূরেই মহকুমা শহর। গোসাঁইপুরে শহরের বেশ ছাপ আছে। হরবখত রিকশা চলছে রাস্তায়, সাঁ করে মোটর গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে, সাইকেলও মেলা। দোকানপাটও বেশ জমজমাট। রাস্তার ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসে গোসাঁইপুর জায়গাটাকে বুঝবার চেষ্টা করতে করতে বাঘু পেটে খিদের ডাক শুনতে পায়। পিত্তি পড়ে জিব তেতো। গালে দাড়ি কুটকুট করছে, মাথা খাচ্ছে উকুনে। কিন্তু সেগুলো কোনও অসুবিধে নয়, সমস্যা হল, বাঘু এখন করে কী? যায়ই বা কোথায়? তার হল নেশাখোরের মাথা, বেশি বুদ্ধি টুদ্ধি খেলে না। নেশার ঘোরে আয়ুক্ষয় হয়েছে, ভগবান যে হাত পা চোখ মগজ দিয়ে রেখেছেন তার ব্যবহারই হল না ভাল করে।

মাঝবয়সি রোগা একজন মানুষ দুটো ভারী থলে দু হাতে টেনে নিয়ে যেতে হিমশিম খাচ্ছিল। বাঘুর কী মনে হল, করারও তো কিছু নেই তার, টপ করে উঠে গিয়ে একটা থলে ধরে বলল, দিন আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

লোকটা রগচটা। খ্যাঁক করে উঠল: বয়ে দেবে মানে? ইয়ারকি নাকি?

লোকটা কৃপণই হবে আন্দাজ করে বাঘু বলল, পয়সা লাগবে না। এমনি দিয়ে আসছি চলুন। আপনার কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট লোকটার বাস্তবিক হচ্ছিলও। গজগজ করে বলল, চালের কথাটা আগে বললেও পারত তো মাগি। তা হলে আজ বগলাটাকে আর কাছারি পাঠাতুম না।

কাকে বলল কে জানে। মানুষ একা একা কত কথা বলে। তবে শেষ অবধি থলে দুটো বাঘুর হাতে দিয়ে লোকটা পিছু পিছু আসতে লাগল। সাবধানী মানুষ, বাঘু যাতে পালাতে না পারে তাই চোখে চোখে রাখছে।

পালানোর কথাই ওঠে না। দশ সের চাল আর পাঁচ-সাত সের বাজারের থলে নিয়ে উপোসি শরীরে পালানোর তাকৎ তার নেইও। হাসপাতাল থেকে সদ্য বেরিয়েছে বাঘু, বোঝা টানতে তার জিব বেরিয়ে যাচ্ছিল। তবে পরের উপকার করার একটা নেশা আছে। যখন ঝোঁকটা চাপে তখন অন্যদিকে খেয়াল থাকে না।

লোকটা কেমন তা তখনও জানে না বাঘু। তবে কিপটে, তাতে সন্দেহ নেই। একটু রগচটা গোছেরও। লোকটা যেমনই হোক, তার গিন্নি ভাল মানুষ। বেশ আহ্লাদি গোলগাল চেহারার মেয়েছেলে। বাঘু বোঝা দুটো নামানোর 'পর যখন হাঁপাচ্ছে তখন গিন্নি বেরিয়ে এসে বলল, এ আবার কাকে নিয়ে এলে গো!

রাস্তার লোক। বলে লোকটা বাঘুর দিকে ফিরে সন্দিহান গলায় বলল, চার আনা পয়সা দিচ্ছি, এর বেশি কিন্তু এখানকার রেট নয়।

পয়সা নিলে পরোপকারের আর মজাটা কী? বাঘু দম নিতে নিতে হাতজোড় করে বলল, কিছু লাগবে না। একটু খাওয়ার জল পেলেই হবে।

একেবারে কিছুই নয়?

আজ্ঞে না। আমি মুটে নই। আপনার কষ্ট হচ্ছিল, তাই—

লোকটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। পয়সা ছাড়া যে দুনিয়ায় কোনও কাজ হয় তা তার ধারণাই ছিল না। বিশেষ করে এই কলিযুগে। লোকটা সিকিটা রেখে মানিব্যাগ থেকে একটা আধুলি বের করে ফেলল। তারপর বাঘুকে ভাল করে দেখে আধুলিটাও দিতে সাহস হল না তার। সেটাও খুচরোর খোপে ফের ভরে রাখল।

গিন্নি জল দিলেন, সঙ্গে দুখানা রুটি আর তরকারি। বাঘু সেটা আর ফেরাতে পারল না। পেটে দুটো বাঘ আঁচড়া-আঁচড়ি করতে লেগেছে।

খেতে বসিয়ে গিন্নিরা কথা আদায় করেন। ইনিও করলেন। তবে বাঘুর লুকোছাপা করার কিছু নেই। সব বৃত্তান্ত বলে দিল।

গিন্নি বেশি কিছু বললেন না, শুধু বললেন, দুপুরেও তুমি এখানেই দুটি খেয়ো বাবা। আর শোনো, যার মাল বয়ে এনেছ তিনি হলেন ডাকসাইটে যতীন উকিল, তোমার একটা হিল্লে করে দিতে পারেন। লীলাময়ীকে আমি খুব চিনি। আমার ভাইঝি টেঁপিটার কপাল তো ভাঙল ওই লীলাময়ীই। কী না, বর নাকি বুড়ো! তা চল্লিশ বছর বয়সে পুরুষ মানুষ বুড়ো হয় এই প্রথম শুনলুম।

বাঘু মাথা নেড়ে বলল, হিল্লে আর হওয়ার নয়।

ময়না তোমার কেমনধারা বউ? পালিয়েই বা এল কেন?

বাঘুর এইটেই সমস্যা। ময়নার সঙ্গে তার আলো-বাদ্যি-মন্ত্রপড়া করে বিয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই হয়নি। কাজেই ময়নাকে বউ বলে দাবি করাটা একটু বাড়াবাড়িই হত তার পক্ষে, দাবি-দাওয়া তোলেওনি সে। মাথা চুলকে বাঘু বলল, আজ্ঞে সে এক বৃত্তান্ত, তবে বউ আর বলি কী করে? শুনছি ছাড়ান কাটান হয়ে গেছে। ময়নার আবার বিয়ে।

তা শুনেছি। কিন্তু পালিয়ে এল কেন? মারধোর করতে নাকি?

জিব কেটে বাঘু বলল, কী যে বলেন! মারধোর নয়। পালিয়ে এসে কাজটাও ময়না ভালই করেছিল। আমি কি একটা মানুষ ছিলুম মা? চৌপর দিন মদ গিলে পড়ে থাকতুম, নেশার ঘোরে দিনরাত কখন পার হয়ে যেত। মাথার ওপর বাপ ছিল বলে ঠেলাটা টের পাইনি তখন। এখন পাচ্ছি।

ও বাবা, নেশা এখনও আছে না কি?

মাথা নেড়ে বাঘু দুঃখের সঙ্গে বলল, ভাতই জুটছে না তো নেশা।

তোমার বয়স তো এখনও কম, এ বয়সেই নেশা করতে কেন?

আজ্ঞে ঠিক বলতে পারব না, আমার মাথাটায় এখনও তেমন করে কিছু বসছে না, সবটাই কেমন ধাঁধার মতো লাগছে।

আহা রে।

বাঘু দুপুরে ভরপেট ভাত খেয়ে টানা একখানা ঘুম দিয়ে যখন উঠল তখন শরীরটা বেশ ঝরঝরে। খানিকক্ষণ পড়ন্ত বেলায় হাঁ করে দুনিয়াটা দেখল। সামনেই রাস্তা। লোকজন যাতায়াত করছে। পুরুষেরা বউ নিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে বেড়িয়েছে। আহ্লাদ খসে পড়েছে মুখে চোখে। বাঘু এত আহ্লাদের ছবি আগে দেখেনি। কয়েকবার হাই তুলে বসে বসে সে ভাবল, দুনিয়াটার কাছে আমার চাওয়ার আছেটা কী?

অনেক ভেবে দেখল, নাঃ, চাওয়ার আর তার কিচ্ছুটি নেই। এমনকী আজ রাতে সে যদি মরেও যায় তা হলেও হয়। কিছু যায় আসে না।

সন্ধেবেলা যতীনবাবু ঘরে ডেকে নিয়ে বসিয়ে বললেন, এখানে পাকাপাকি খ্যাঁটের ব্যবস্থা হয়ে গেল বলে ভেবো না কিন্তু। আমি হিসেবি লোক।

বাঘু লজ্জার সঙ্গে মাথা নামিয়ে বলল, আজ্ঞে সেটা আজ সকালেই বুঝে গেছি।

আজকের রাতটা থাকো। কাল অন্য ব্যবস্থা করে নিয়ো।

যে আজ্ঞে।

এবার তোমার বৃত্তান্তটা বলো তো শুনি। গিন্নির কাছে খানিক শুনেছি।

বাঘু বলল, কিছু রাখঢাক করল না। উকিলের জেরা বলেও কথা। যতীনবাবু নড়ে চড়ে বসে শেয়ালের মতো একটু হাসলেন। তারপর বললেন, মাসোহারার একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। তোমার কেস তো বেশ স্ট্রং। তবে মামলা লড়তে হবে। লীলাময়ী শক্ত লোক।

বাঘু আইন টাইন জানে না। তার জানবার দরকারও নেই। উদাস গলায় বলল, ঝগড়াঝাঁটি করতে তো আসা নয়। একটু বুঝতে এসেছিলুম।

কী বুঝতে এসেছিলে?

আজ্ঞে তাও ঠিক জানি না। ইয়ারদোস্তরা বলল, একবার যাও। আমিও এলুম।

তোমার মতো উজবুক জন্মে দেখিনি। থাকগে ব্যাপারটা আমাকেই বুঝতে দাও।

॥ ২ ॥

একমাত্র ময়নাই জানে যে, বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও সে এখনও শরীরে আর মনে কুমারীই আছে। ছ মাস শ্বশুরঘরে ছিল, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই হয়নি। কুল্যে তিন-চার দিন বাঘু মান্না রাতে ঘরে ছিল, অবশ্য বেঘোর অবস্থায়। এক বিছানায় যুবতী বউ, তবু তাকিয়েও দেখেনি, তখন দুঃখে চোখে জল আসত ময়নার, এখন ভাবে, উঃ বাবা, খুব বাঁচা বেঁচে গেছি।

কুমারী থাকার কথাটা অনেককে বলে দেখেছে ময়না, কেউ ঠিক বিশ্বাস করতে চায় না। বিয়ে যখন হয়েছিল তখন কিছু একটু হয়েই থাকবে। তাই আজকাল আর কাউকে আগ বাড়িয়ে বলে না ময়না। তবে নিজের মনে সে এই কুমারী থাকার ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে। বাঘু মান্না মানুষই ছিল না। দিনরাত যখনই তাকে দেখা যেত, তখনই মাতাল। হাটে মাঠে, রাস্তায় ঘাটে, পড়ে থাকা ছাড়া বাঘুকে অন্য অবস্থায় বড় একটা দেখা যেত না। বাঁচতে হলে একটা মানুষের খাবার দাবারও চাই। তা-ই বা কীভাবে জুটত, কে খাওয়াত কে জানে। ছ মাস ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিল ময়না, তারপর সব জানিয়ে মাসিকে চিঠি লিখল। মাসিই একমাত্র ভরসা। গোসাঁইপুরে মাসি অনাথা আশ্রম করেছে, মেয়েদের হাতের কাজ আর লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাবলম্বী করছে, দরকারমতো অত্যাচারিতা মেয়েদের বিয়ে ভাঙার বন্দোবস্ত করছে। লীলামাসি লিখল, বিবাহিতা মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি থেকে জোর করে তুলে আনা যায় না। আইনে আটকায়। দুলুকে পাঠাচ্ছি। তার সঙ্গে চুপচাপ চলে আসিস বাপের বাড়ি। তারপর সময়মতো আমি তোকে নিয়ে আসব।

দুলু ময়নার খুড়তুতো ভাই। ম্যাটিনি শো সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা বলে পালিয়ে চলে এল ময়না। তারপর নিরাপদে মাসির বাড়িতে। নিজের কুমারী জীবনটাকে এইখানে এসেই সত্যিকারের উপভোগ করতে লাগল ময়না। মেয়েরা যে আলাদা মানুষ, স্বামীর ঘর আর ছেলেপুলে মানুষ করতেই যে তাদের জন্ম নয়, এটা টের পেতে লাগল। মাসির নিজের ঘর সংসার নেই বটে, কিন্তু দুনিয়াটাই মাসির সংসার। অনাথা আশ্রম আছে, বাচ্চাদের ইস্কুল আছে, মহিলা সমিতি আছে, একেবারে জমজমাট অবস্থা। শ্বাস ফেলার সময় নেই। ময়না যখন এসে মাসির পাশে দাঁড়াল তখন মাসি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, পুরনো কথা ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবনটা শুরু কর। মেয়েরাই একদিন দুনিয়াটে চালাবে, দেখিস।

তবে সব জিনিসেরই ভাল মন্দ দুটো দিক আছে। অনাথাশ্রমের অনেক মেয়েই আসলে অনাথা নয়, বিনিমাগনা খাওয়া পরার লোভে এসে সত্যিমিথ্যে বানিয়ে বলে ঢুকে পড়ে। তাদের মধ্যে অনেকে চুরি করে পালিয়েছে। কাজকর্ম কেউ তেমন করতে চায় না। অনেকে নগদ পয়সা চায়। ঝগড়াঝাঁটিও লেগেই আছে। বাচ্চাদের স্কুলে প্রায়ই বেতন বাকি পড়ে। সেলাইস্কুলটা চলে নেহাত দায়সারা গোছের। ময়না এসে অনেক ভূত ঝেড়েছে। কেউ অনাথা বলে এসে হাজির হলেই ঢুকতে দেয় না। খোঁজ নেয়। আশ্রমের জন্য মাতব্বর লোকদের কাছে চাঁদা আদায় করে। বাচ্চাদের স্কুলে বেতন বাকি পড়লে নাম কেটে দেয়। সেলাইস্কুলের সঙ্গে সে আরও কয়েকটা জিনিস যোগ করেছে। রান্না, গান, টোটকা, এখন সব মিলিয়ে একরকম ভালই চলে। মাসির হিসেব-নিকেশের বালাই ছিল না। ময়না এসে খাতাটাতা করেছে। এখন তাকে ছাড়া মাসি অচল।

সারাদিন এই বিছানো সংসারের হাজারো কাজে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে গিয়েই ময়না টের পায়, সে কুমারী। কোনও পুরুষের স্পর্শ তাকে কলঙ্কিত করেনি। সে বড় বেঁচে গেছে। ভারী একটা সুখ আর গর্ব হয় তার। বাঘু মান্নার সঙ্গে তার সহবাস হলে আজও গা একটু ঘিনঘিন করত তার।

কুমারীই থাকতে চেয়েছিল ময়না। এইসব ভারী উত্তেজক আর মজার কাজে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারত সে। মাসিরও তাতে সায় ছিল। কিন্তু মুশকিল বাধাল প্রদীপ।

লীলাময়ীর সংগঠনটা মেয়েদের নিয়ে হলেও কিছু পুরুষ বরাবরই যেমন বাগড়া দিয়েছে, তেমনই কিছু পুরুষ আবার সাহায্যও করেছে। যারা সাহায্য করেছে তারা বেশির ভাগই অল্পবয়সি ছেলে। তাদের ঝোঁকটা অনাথাশ্রমের যুবতীদের দিকেই একটু বেশি বটে, কিন্তু লীলাময়ীর নির্দেশে তারা বহু ভাঙা বিয়ে জুড়ে দিতে সাহায্য করেছে, অত্যাচারী শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে হামলা করে শাসিয়ে বউদের নিরাপদ করেছে, চাঁদা তুলেছে, টাকা তুলবার জন্য যাত্রা থিয়েটার জলসা করেছে। লীলাময়ী ডাকলেই তারা হাজির।

প্রদীপ ছিল এদেরই পাণ্ডা। তার মা নেই, লীলাময়ী তাঁকে মা ডাকতে শিখিয়েছেন। এখন গাল ভরে মা ডাকে। ডাকার মতো একটা বাবা আছে বটে প্রদীপের, তবে বাপটা সুবিধের নয়। টাকার কুমির। দালালি করে দোহাত্তা রোজগার। মদ-মেয়েমানুষের দোষও আছে। প্রদীপ একমাত্র সন্তান হলেও বাপ-ছেলের বনিবনা নেই। ছেলে যে লীলাময়ীকে মা ডাকে সেটাও তার গাত্রদাহের আর এক কারণ। তার ওপর ছেলে ডাকাবুকো, তেজি, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়, পার্টি করে।

হারাধন পাণ্ডার ছেলে হিসেবে প্রদীপ পাণ্ডা সুখের জীবনই কাটাতে পারত। কিন্তু তার ধাতটা অন্য বলে তা হল না। সে অন্যরকম হল। সে মানুষের জন্য কাজ করতে ভালবাসে, পরোপকার করে বেড়ায়, বাপের মহাজনির টাকা দুহাতে বিলিয়ে দিতে ভালবাসে।

মাসির কাছে আসার পর থেকেই ময়না প্রদীপকে লক্ষ করেছে। ছিপছিপে পাতলা চেহারা, পরনে সবসময়ে ডোরাকাটা শার্ট আর জিনসের প্যান্ট, দিনরাতের বাহন একখানা দামি সাইকেল।

লক্ষ করলেও তাকে নিয়ে কিছু ভাবেনি ময়না। তখনও মনে হত পরপুরুষের কথা ভাবাও পাপ। তারপর বাঘু মান্নার সঙ্গে বিয়ে-বিয়ে খেলার পাট চুকল, প্রদীপের সঙ্গে ভাব হল। কথা হল, কথা নানা মোড় ফিরল। চোখে চোখে হল।

তারপর প্রদীপ একদিন বলল, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে মাসিকে বলি যে তোমাকে আমি বিয়ে করব?

ময়না হুট করে জবাব দিল, না। দিতে নেই। ভাবতে সময় চাইল। মাসিকে লুকিয়ে সে কিছুই করে না। সব শুনে লীলাময়ী বললে, প্রস্তাবটা তো খুবই ভাল, তোকে বিয়ে করলে প্রদীপের ওপর আমার আরও জোর হয়। কিন্তু বাপটা খুব ঝঞ্ঝাট করবে । হারাধন পাণ্ডার ক্ষমতা অনেক। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করতে ভয় পাই মা।

ময়না সুতরাং নিজেকে গুটিয়ে রাখল।

প্রদীপ কাঁচা ছেলে। ময়নাকে দেখে সে মুগ্ধ, বেহেড। তাকে কিছু বোঝানো গেল না। সে ময়নাকে বলল, বাবার ভয়ে পিছিয়ে যাবে? তা হলে আর কীসের আন্দোলন তোমাদের?

ময়না সসঙ্কোচে বলল, ভয় আমার নিজেকে নিয়েও। অতীতের সব কথা কি মুছে ফেলা যায়?

না মুছলে এগোবে কী করে? তুমি কি সেই হাজব্যান্ডকে ভালবাসতে?

ময়না ঠোঁট উল্টে বলল, ভালবাসা! তার মুখটাও ভাল করে দেখিনি কখনও। আমি আজও কুমারী। সম্পূর্ণ কুমারী।

প্রদীপ একমাত্র লোক যে কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করল এবং আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেল। তার মুখে আনন্দের দীপ্তিটা দেখে কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল ময়নার। পুরুষেরা তা হলে যতই আধুনিক হোক, এখনও কুমারী মেয়েকেই বউ করতে চায়! বড্ড স্বার্থপর জাত।

প্রদীপ বলল, তোমার মুখ থেকে এটা শুনে কী যে আনন্দ হচ্ছে। তা হলে আপত্তি কোরো না। বাবা যা-ই করুক আমি সামলাব।

কী করে সামলাবে?

জানি না, ঠিক করিনি। বিয়ে তো আগে করি তারপর ভেবে দেখব।

ময়না বুদ্ধিমতী, মাথা নেড়ে বলল, আমি ঘরপোড়া গোরু। এক অশান্তিতে বিয়ে ভেঙেছি, ফের বিয়ে করে ঘাড়ে অশান্তি নিতে চাই না। তুমি আগে তোমার বাবার মত নাও।

বাবা আর ক'দিন?

তুমি কি বাবার মৃত্যু চাও?

তাই চাইলাম না কি? বলছি বুড়ো তো হচ্ছে। রক্তের জোর কমছে।

ময়না মৃদু একটু হাসল, ওর ছেলেমানুষি দেখে। তারপর বলল, মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষে একটু তফাত আছে, সেটা বোঝো না? পুরুষেরা বড্ড আবেগে চলে, মেয়েদের একটু হিসেব কষতে হয়।

তার মানে আমি তোমার প্রেমে পড়লেও তুমি পড়োনি। তুমি কেবল হিসেব কষছ।

তোমাকে আমার একটুও অপছন্দ নয়। নইলে কি মাসিকে বলতাম। তুমি বরং আমাকে আর একটু ভাবতে দাও।

বেশি ভাবলে যদি তোমার অমত হয়?

প্রদীপের উৎকণ্ঠ, উদগ্রীব বায়নাদার শিশুর মতো মুখভাব দেখে করুণা হল ময়নার। সে বলল, অমতের কথা ওঠে না, সব দিক বজায় রাখতে হলে একটু ভাবতে হয়।

গাঁ গঞ্জে ছেলেতে মেয়েতে একটু আধটু গুজগুজ ফুসফুস হলেই তা পাঁচকান হয়ে ঢি ঢি পড়ে যায়। ময়না আর প্রদীপকে নিয়েও কথা রটতে দেরি হল না।

হারাধন পাণ্ডা তেড়ে এল একদিন। লীলাময়ীকে বলল, বৃন্দাবন খুলেছ, অ্যাঁ! বৃন্দাবন? মেয়েছেলের ব্যবসা ফেঁদে কাঁচা ছেলেগুলোর মাথা চিবিয়ে খাচ্ছ!

কিন্তু মুশকিল হল, লীলাময়ী কোনও জবাব দিতে পারলেন না। হারাধন পাণ্ডার তড়পানিতে ভড়কে যাবেন তেমন মেয়ে লীলাময়ী নন। কিন্তু জবাব দিতে পারলেন না অন্য এবং গুরুতর কারণে। হারাধন পাণ্ডার বয়স হয়েছে, শরীরের মধ্যে জরা আর ক্ষয় ঢুকেছে। এত উত্তেজনা আর রাগ তার নিজেরই সহ্য হল না। আস্ফালন করতে করতে নিজেই বুকে হাত চেপে হঠাৎ চোখ উলটে দড়াম করে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল। তারপর ডাক্তার-বদ্যি-হাসপাতাল। মাসখানেক বাদে যখন হারাধন ফের বাড়ি ফিরে এল তখন আর সেই হারাধন নেই। জবুথবু, দুর্বল, লাঠিতে ভর। তেজ নেই, চোখের দৃষ্টি ঘোলা। সম্বল শুধু গোঁ।

বাপের হয়ে প্রদীপ ক্ষমা চাইতে এসেছিল লীলাময়ীর কাছে। লীলাময়ী বললেন, আমি অনেক ঘাটের জল খেয়েছি বাবা, ও সব আমি গায়ে মাখি না। তবে তোমার বাবার যা অবস্থা দেখলুম তাতে ভয় হয়েছিল পাছে খুনের দায়ে পড়ি। আমি বলি কী, এখন ময়নার কাছ থেকে একটু তফাত থাকো, তোমার বাবা একটু সামলে উঠুন, তারপর দেখা যাবে।

তফাত হওয়াটা প্রদীপের কাছে তখন পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। একবেলা ময়নার মুখখানা না দেখলে তার সর্বাঙ্গ হায়-হায় করতে থাকে। পাল্লার একদিকে ময়না আর অন্যধারে দুনিয়ার তাবৎ সুন্দরী, বাপ-মা, টাকা-পয়সা, হিরে-জহরত, নীতি-ধর্ম বসালেও ময়নার দিকে পাল্লা বেশি ভারী। তফাত হবে কী করে প্রদীপ?

বাপ হাসপাতালে শোওয়া অবস্থাতেই ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করতে লাগল রোজ। আত্মীয়-স্বজনরা এসে নানাবিধ গঞ্জনায় অতিষ্ঠ করে তুলল প্রদীপকে। সে তিষ্ঠোতে পারছিল না। শুধু ময়নার জন্যই যা কিছু সয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে বর্ধমান থেকে কাকামশাই এসে উদ্ধার করলেন প্রদীপকে। বললেন, আমার কারবার দেখার লোক নেই। তুই গেলে আমার উপকার হয়।

প্রদীপ বর্ধমানে চলে গেল। আনন্দের সঙ্গেই গেল। গিয়ে লম্বা লম্বা চিঠি লিখতে লাগল ময়নাকে। শনি-রবিবার এসে হাজিরও হত মাঝে মাঝে।

যদি কেউ ময়নাকে জিজ্ঞেস করে, প্রদীপ তো তোমাকে ওরকম উন্মাদের মতো ভালবাসে; কিন্তু তুমি কি ওকে ভালবাস? তা হলে ময়না চট করে জবাব দিতে পারবে না। আসলে ভালবাসা জিনিসটা কী তা-ই সে বুঝে উঠতে পারেনি আজও। তার বুকের মধ্যে কোনও উথাল-পাথাল নেই, উত্তেজনা নেই, শিহরন নেই। প্রদীপকে তার ভাল লাগে, কথা বলতে খারাপ লাগে না, বিয়ে করতেও আপত্তি

নেই। কিন্তু প্রদীপকে না হলেই জীবন অন্ধকার এমনটাও তো কই তার মনে হয় না!

এই সব ভাবে আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ময়না।

অনাথাশ্রমের একটা মেয়ে সুবালা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসে আছে। তাকে নিয়ে কদিন খুব হই-চই গণ্ডগোল। একটা রিকশাওয়ালার সঙ্গে পিরিত করতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ করে বসে আছে। এইসব ঘটনা যে-কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই ক্ষতিকর। রিকশাওয়ালা নবীন বিয়ে করতে রাজি নয়। দেশের বাড়িতে তার বউ আছে, ছেলেপুলে আছে। লীলাময়ী যখন এ সব নিয়ে বিপর্যস্ত তখনই হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা উটকো একটা ভিখিরির দশা লোক এসে বলল, আমি বাঘু মান্না।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

লোকটাকে এক পলক দেখেই পালাল বটে ময়না, কিন্তু মনটা ভারী তেতো হয়ে গেল। কপালটাই তার খারাপ। এ সময়ে এই লোকটির এসে জুটবার কোনও মানেই হয় না।

মাসি এমনিতে নিষ্ঠুর প্রকৃতির নন। কিন্তু সুবালাকে নিয়ে মেজাজ বিগড়ে ছিল বলে পুরুষ জাতটার ওপরেই খেপে আছেন কয়েকদিন। তাই বাঘু মান্নাকে শীতের রাতে বারান্দায় ফেলে রাখলেন। পরদিন ঘোর জ্বরবিকার দেখে চালান করে দিলেন হাসপাতালে।

আপদ গেছে।

ক'দিন বাদেই আপদটার নতুন খবর আনল লীলাময়ীর ঝি কস্তুরী, বাজারটা রান্নাঘরের দরজায় নামিয়ে সে উত্তেজিত গলায় বলল, সেদিনকার সেই লোকটা গো—সেই যে ময়নাদিদির আগের বর—বাঘু না কী যেন নাম—তাকে হাসপাতালের ধাঙড়রা পিটিয়ে একেবারে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে।

মাসি রাঁধছে, ময়না জোগান দিচ্ছে, দুজনেই একটু বিরক্তির সঙ্গে ঘটনাটা নিল। মাসি বললেন, কী হয়েছিল?

যা শুনলুম লোকটা নাকি ধাঙড়দের কাজ করে দিচ্ছিল। হাসপাতাল ঝাঁটপাট দেওয়া, ধোয়ামোছা। তাইতেই ধাঙড়রা রেগে গিয়ে খুব মেরেছে। তুলকালাম কাণ্ড হচ্ছে দেখ গে যাও।

কেউ গেল না দেখতে। বাঘু মান্নাব খবরের জন্য কেউ ব্যস্ত নয়। তবে খবর এল। গোসাঁইপুর ছোট জায়গা। খবর তো চাপা থাকে না। বাঘু মান্না নামে একটা লোক যে একটা বীরত্বের কাজ করেছে সেটা অতিরঞ্জিত হয়েই কানে এল তাদের।

রাত্রিবেলা যখন অর্ডারি তসরের শাড়িতে কাঁথা ফোঁড়ের কাজ করছিল ময়না তখন মাসি তাকে আচমকা জিজ্ঞেস করল, লোকটা কেমন ছিল বল তো!

কোন লোকটা?

ওই বাঘু মান্না। খুব খারাপ ছিল নাকি?

ভাল মন্দ কিছুই জানি না। তার সঙ্গে ভাল করে কথাই হয়নি কখনও।

মাতাল ছিল সে তো জানি। আর কী রকম ছিল?

বলতে পারব না। কিন্তু ও কথা কেন?

সেদিন শীতের মধ্যে বারান্দায় বার করে দিয়েছিলুম। কাজটা ভাল করিনি। সেদিন মাথাটা বড্ড গরম ছিল। সুবালা হারামজাদি যে ওরকম করবে কে জানত!

সেদিন ঠিক কাজই করেছিলে। বারান্দায় যে ঠাঁই হয়েছিল তাই ঢের।

তুই কিছু মনে করিসনি তো?

দাঁতে সুতো কাটতে গিয়ে থেমে ময়না অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, আমি কী মনে করব? মনে করার কথাই বা ওঠে কেন?

লীলাময়ী গম্ভীর হয়ে গিয়ে খুব আস্তে করে বলেন, কোন কাজটা যে ঠিক হচ্ছে আর কোনটা যে ভুল হচ্ছে সেটা আজকাল যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। বয়সের দোষই হবে।

ও সব নিয়ে ভেবো না। বাঘু মান্না বদ্ধ মাতাল। বাইরে পড়ে থাকার অভ্যাস তার খুব আছে। পেটে মদ থাকলে ঠাণ্ডাটা লাগত না। সেদিন পেটে মদ ছিল না বলে লেগেছে।

লীলাময়ী আয় ব্যয়ের একটা হিসেব করছিলেন, সেটা ঠেলে সরিয়ে রেখে ভারী উদাস গলায় বললেন, আজকাল সব ছাইমাটি বলে মনে হয়।

ছাইমাটি আবার কী। কীসের কথা বলছ।

লীলাময়ী উদাস গলায় বললেন, এই যে এত কিছু করলুম, ছোট হলেও একটা অনাথাশ্রম তো বটে, সেলাইয়ের স্কুল, তাঁতশিক্ষা, গানের স্কুল, বাচ্চাদের স্কুল—একজনের পক্ষে কম নয় কাণ্ডখানা। কিন্তু এত কিছু করে কী হল বল।

অনেক তো হয়েছে মাসি। কত মেয়ে তো বেঁচে গেছে।

সে তো ঠিক। কিন্তু আবার দেখ সুবালার মতো গেরোও তো আছে। অনাথাশ্রমে এই নিয়ে চারজন এরকম কাণ্ড করল। এদের জন্যই এক একসময়ে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

তোমাকে আজ কী যেন কামড়াচ্ছে মাসি।

কামড়াবে না! আমার জীবনটা যদি তোর হত তবে বুঝতিস। দুনিয়াভরা সব অকৃতজ্ঞ। লীলাময়ীর দোষ দেখলেই সব ফোঁস করে ওঠে। কিন্তু লীলাময়ী যে ভালটুকু করে তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

ময়না মাসিকে চেনে। মাঝে মাঝে দোর্দণ্ডপ্রতাপ লীলাময়ীর এরকম ভাব আসে। তখন তোয়াজি কথা বলতে হয়। ময়না সেলাইটায় একটু ঢিলে দিয়ে বলল, তোমার দোষ যারা দেখে তারা তো অন্ধ। ওদের কথা ছাড়ো। সমাজের ভাল যারা করে তাদের ওপর সকলের হিংসে। নিজেরা পারে না তো। কিন্তু তোমার গুণের কথাও কি বলে না লোকে? সবাই বলে।

লীলাময়ী কথাগুলো শুনলেন। আবার শুনলেনও না। বয়স খুব বেশি হয়নি লীলাময়ীর। চল্লিশের মধ্যেই। তবু হঠাৎ বেশ বুড়ো দেখাল তাঁকে।

হঠাৎ নীরবতা ভেঙে লীলাময়ী জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, বাঘু মান্না কি লেখাপড়া জানত?

কেন বলো তো!

এমনি জিজ্ঞেস করছি।

ম্যাট্রিক পাশ বলে শুনেছি।

ও বাবা। তা হলে তো অনেক পড়েছে।

আজকাল ন্যাড়াছ্যাড়া কত লোক ম্যাট্রিক পাশ করে। বাঘু যে আজ কেন তোমাকে কামড়াচ্ছে কে জানে। তবে যাই বলো, লেখাপড়া তার কোনও কাজে লাগেনি। মদের ঘোবে সেসব ভুলেও মেরে দিয়েছে। ও সব নিয়ে ভাবছ কেন?

লীলাময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমাকে সব কিছু নিয়েই ভাবতে হয়। সব ভাবনা যখন একসঙ্গে এসে মাথায় ভর করে তখন যে কী যন্ত্রণা। ওই সুবালা মুখপুড়িকে নিয়েও কি কম জ্বালা আমার! নবীন যদি তাকে শেষ অবধি বিয়ে না-ই করে তবে কী হবে বল তো! পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করতে বলব? সেটা তো পাপ হবে। আবার যদি বাচ্চাটা হয়ও তখন তার বাপের পরিচয় কী হবে?

ময়না ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী আবার হবে! বাচ্চাটা অনাথাশ্রমেই মানুষ হবে। এরকম আকছার হচ্ছে। অনাথাশ্রম তো রয়েছেই সেইজন্য।

সে তো ঠিকই রে। কিন্তু সেটা হল মন্দের ভাল। আমি চাই ভাল করতে। মন্দের ভাল দিয়ে কতদিন চলবে?

তোমার সব বিদঘুটে কথা, বিদঘুটে ভাবনা। অত ভেবো না তো।

আমার কি ভাবনার শেষ আছে? তুই কি জানিস যে আমার সতীন পোয়েরা আজকাল আমাকে চিঠি লেখে!

কই, বলোনি তো কখনও! কী লেখে তারা?

আজকাল প্রায়ই তাদের চিঠি পাই। কী আর লিখবে, অভাবে পড়েছে, তাই সাহায্য চায়।

তাই বলো। আমি ভাবলুম বুঝি তোমার খবর নেয়।

সেও নেয়। চিঠিতে গালভরা মা ডাক, তার আগে আবার শ্রীচরণেষু পাঠ লেখা থাকে। ধানাই পানাই মেলা কথা। আসল কথাটি থাকে শেষে। অভাব, দিন চলে না।

তাদের লজ্জা করে না লিখতে!

লজ্জা করলে তাদের চলবে কেন? আমার তো মনে হয় ওদের বাপই ও সব লেখায়। কে জানে

বাবা সে নিজেই ছেলেদের নাম দিয়ে লেখে কি না।

এ কথায় ময়না একটু খুক করে হাসল। তারপর বলল, মেসো কি বেঁচে আছে এখনও?

মেসো বলে ফেলেই জিব কাটল ময়না। মাসি বিয়ে-ভাঙা তেজি মেয়ে, মেসো কথাটা শুনে রেগে যাবে হয়তো।

লীলাময়ী রাগলেন না। হয়তো খেয়ালই করেননি। উদাস গলায় বললেন, বেঁচে থাকবে না কেন! তার তো বয়স বেশি নয়। পঞ্চান্ন-ছাপান্ন হবে।

লোকটা কেমন ছিল মাসি?

লীলাময়ী ময়নার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, তুই যেমন বাঘু মান্নাকে চিনিস আমিও গুণেন সামন্তকে ততটুকুই চিনি। কেমন লোক তা কী করে জানব? তবে জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী, বেহায়া তো বটেই। ঘর করলে হয়তো আরও গুণের কথা বেরোত। তবে একটা জিনিস দেখেছি, ভারী হাসিখুশি আর আহ্লাদি মুখ। যখন ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে মারতে গেছি তখনও হাসি-হাসি মুখ করে দাওয়ায় বসে ছিল, পালায়নি বা উল্টে তেড়েও আসেনি।

মারলে?

না। হাতটা তুলেও ঠিক পারলুম না। ওই হাসি-হাসি মুখের জন্যই।

লোকটা কী করল তখন?

পায়ে ধরতে এসেছিল। দু ঘরের দরজায় আগের পক্ষের দুই বউ দাঁড়িয়ে ফুঁসছে আর তিন নম্বর বউয়ের পা ধরতে ধুমসো লোকটা এক পাল ছেলেপুলের সামনে দিনে দুপুরে উঠোনে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে—ভাবতে পারিস?

ময়না হি হি করে হেসে বলল, ভীষণ হাসি পাচ্ছে মাসি।

হাসি তো এখন আমারও পায়। তখন তো হাসি পায়নি, লোকটাকে খুন করতে ইচ্ছে হয়েছিল।

সে-ই চিঠি লেখে কী করে বুঝলে?

সে-ই লেখে বা ছেলেদের দিয়ে লেখায়। ও মানুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। যাদের মেরুদণ্ড থাকে না তারা সব পারে।

তা এখন কী করবে? সাহায্য পাঠাবে না কি?

ভেবে দেখিনি। চিঠিগুলো আসে, পড়ি, রেখে দিই। কিছু ভাবিনি।

তুমি আজকাল বড্ড নরম হয়ে গেছ মাসি।

ওই তো বয়সের দোষ। কম বয়সে রোখ বেশি থাকে, বয়স বাড়লে নানা বিবেচনা আসে। বাঘুকে সেদিন ঠাণ্ডায় বারান্দায় বের করে দিয়েছিলাম বলে মনটা কেন যেন খারাপ লাগছে। দাবি-দাওয়া নিয়ে তো আসেনি, আতান্তরে পড়ে এসেছিল।

সে তো ঝড়ে বাদলায় রাস্তার কুকুরটাও এসে ঘরে ঢুকতে চায়। তার কী করা যাবে? মেরুদণ্ড থাকলে সেই লোক কি এসে এখানে হাজির হয়। বেহায়া তো বাঘু কিছু কম নয়।

লীলাময়ী উদাস গলায় বললেন, তোদের বিয়ে যে ছাড়ান-কাটান হয়েছে তা তো বাঘু জানত না।

জানত না মানে? নোটিশ হয়ে গিয়েছিল।

সেই নোটিশ কার হাতে গেছে কে জানে। বাঘুর ভাইটাইরা হয়তো বুঝতেই পারেনি ইংরিজি নোটিশ। দেয়ওনি ওর হাতে।

সে তো আর আমাদের দোষ নয়।

দোষ কে বলেছে। তবে বাঘু যে জানত না সেটা ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। জানলে হয়তো আসত না।

তুমি বড্ড বাঘু-বাঘু করছ মাসি। বাঘু যে কোন মন্ত্রে তোমাকে বশ করল।

লীলাময়ী হাসলেন। বললেন, বশ নয় রে। দুঃখী মানুষ দেখলে আমার যে কষ্ট হয় তা বাঘুকে দেখেও হয়েছিল। তার বেশি কিছু নয়, তুই কথাটা ঘুরিয়ে ধরিসনি যেন। রাস্তার কুকুর বললি তো। বাঘু তা-ই। তবে কুকুরটার জন্যও তো মানুষের মাঝে মাঝে কষ্ট হয়।

ময়না ফুঁসে উঠতে যাচ্ছিল। ভাবল মাসির মনটা ভাল নেই আজ। থাক। সতীন পোয়ের চিঠি মাসির

এই ভাবান্তরে ইন্ধন দিচ্ছে না তো! হতেও পারে। নাঃ, মাসির জায়গাটা একদিন তাকেই নিতে হবে। মাসি বড় নরম হয়ে পড়ছে।

পরদিন সকালে কস্তুরী যখন বাজারের টাকা নিচ্ছিল তখন লীলাময়ী তাকে বললেন, ওরে বাঘু মান্নার খবরটা একটু নিয়ে আসিস তো। মার খেয়ে কী হল ছোঁড়ার!

বেঁচে আছে। আবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তো।

সে তো জানি। লোকের মুখে শুনেওছি। চিরকাল তো আর হাসপাতালে থাকবে না, একদিন ছুটি তো হবে। একটু খবর নিস তো বাবা।

খবর পাওয়া গেল আরও দিন সাতেক বাদে। কস্তুরী বাজার থেকে ফিরে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বলল, ওগো তোমাদের সেই বাঘু মান্না যতীন উকিলের ঠাঁই গিয়ে জুটেছে কাল থেকে।

যতীন উকিল! বলে লীলাময়ী একটু ভাবনায় পড়লেন।

ময়না স্নান করে এসে উঠোনে কাপড় মেলতে মেলতে কথাটা শুনতে পেল। তার কোনও ভাবান্তর হল না।

লীলাময়ী আপনমনে বললেন, যতীন তো হারাধনের লোক।

কস্তুরী ঝেঁঝে উঠে বলল, কে জানে বাবা কে কার লোক। তবে যতীন খারাপ যন্তর এটা জেনে রেখো। যে উকিলের পসার নেই সে বড় পাজি হয়। কেবল কলকাঠি নেড়ে বেড়ায়।

ময়না যতই ব্যাপারটা উড়িয়ে দিক, বাঘু মান্নার গোসাঁইপুরে এসে উদয় হওয়াটা যে ভাল লক্ষণ নয় এটা লীলাময়ী টের পাচ্ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক। ময়নার বিয়ে হয়েছিল, বিয়ে ভেঙেও গেছে, এটা সবাই জানে। বিয়ে কার সঙ্গে হয়েছিল, কী বৃত্তান্ত তা লোকে জানে না। আর এই না-জানাটাই ছিল একরকম ভাল। কিন্তু বাঘু উদয় হওয়ায় অজানা ভাবটা রইল না। এখন লোকে বাঘুকে দেখবে, বিচার করবে, নানা কথা ফাঁস হতে থাকবে। নতুন করে একটা পুরনো ব্যাপারকে খুঁচিয়ে ঘুলিয়ে তুলবে লোকে। লীলাময়ীর শত্রুর অভাব নেই। তাদের মধ্যে একজন হল ওই যতীন উকিল।

তুমি কেন যে এ নিয়ে এত ভাবছ মাসি। বাঘু কী করবে? তার কোনও ক্ষমতাই নেই। কোর্ট কাছারি করার ক্ষমতাও তার হবে না। আর করবেই বা কেন? তবে তোমার সতীন পোয়েদের মতো সেও কিছু সাহায্য চাইতে পারে।

চাইলে কী করবি?

তাড়িয়ে দেব।

লীলাময়ী মাথা নেড়ে বললেন, তোর বেজায় বুকের পাটা। বয়স কম তো! আমার আজকাল সব ব্যাপারেই কেমন ভয়-ভয় করে।

ভয় পেয়ো না। আমি তো আছি। আমি সব সামাল দেব।

লীলাময়ী চুপ করে রইলেন।

দিন কয়েক বাদে শেয়ালের মতো মুখ করে ভর-সন্ধেবেলা যতীন উকিল হাজির। প্রথম মন-ভেজানো নানারকম বিনয়-বচন। মুখে হাসিখানা ঝোলানো।

ময়না আর লীলাময়ী নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করে টেলিপ্যাথি করে নিলেন। হিসেব করে কথা কইতে হবে এবার। যতীনের মতলব আছে।

ধানাই পানাই শেষ করার পর গলাটলা পরিষ্কার করে নিয়ে মোলায়েম গলায় যতীন বলল, লীলাদিদি, বড় মুশকিলে পড়েছি। বাঘেন্দ্র মান্না বলে কাউকে কি চেনেন? নামটাও খুব অদ্ভুত, এমন বিটকেল নাম জন্মে শুনিনি বাবা। তা নাম যেমন বিটকেল, লোকটাও তেমনি বিটকেল। নানা আগড়ম বাগড়ম বকছে। ময়নার সঙ্গে নাকি তার একটা কীরকম সম্পর্ক ছিল। আমার তো বিশ্বাস হয়নি। তাই আসা।

লীলাময়ী জবাব দেওয়ার আগেই ময়না হিমশীতল গলায় বলল, ঠিকই বলেছে। বাঘুর সঙ্গে আমার একটা বিয়ে হয়েছিল। আর কী জানতে চান?

যতীন ভারী যেন চমকে উঠল কথাটা শুনে। শশব্যস্তে বলে উঠল, তাই নাকি! তাই নাকি! দ্যাখো কাণ্ড!

ময়না বলল, বিয়েটা ভেঙে গেছে। আদালতের রায় আমাদের কাছে আছে। দেখতে চান?

যতীন উকিল সবেগে মাথা নেড়ে বলে, কোনও দরকার নেই। ও বিয়ে ভেঙে ভাল কাজই করেছ। বানরের গলায় মুক্তোর মালা।

ময়না এ কথায় একটু ভিজল। নরম হয়ে বলল, বাঘুও বোধহয় সেটা জানে।

জানে বইকী। তার বিয়ে যে ভেঙে গেছে এটা সে অবশ্য এখানে আসার আগে জানত না। আহাম্মক আর কাকে বলে। ট্যাঁকে পয়সাও নেই যে একটা বেলা পেটটা চালিয়ে নেবে। বাড়ি ফিরবার রাহাখরচটা পর্যন্ত জোগাড় হচ্ছে না।

ময়না মৃদুস্বরে বলল, ওকে মাসির কাছে আসতে বলবেন। মাসি ওর ভাড়াটা দিয়ে দেবে।

তা তো বটেই। লীলাদিদি কত লোকের সাহায্য করে। রাহাখরচটা এমন কিছু বেশিও নয়। আমিও দিয়ে দিতে পারতুম। তবে ভাবলুম, ন্যায্যত ওটা তোমাদেরই দেওয়ার কথা।

ময়না আর কিছু বলল না, ভাবল কথা বুঝি শেষ হয়ে গেছে, এবার যতীন উকিল উঠবে।

কিন্তু যতীন উঠল না। বসে বসে যেন খানিকক্ষণ গভীরভাবে কী চিন্তা করে ময়নার দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা ময়না, তোমার রোজগার এখন তো বেশ ভালই।

ময়না অবাক হয়ে বলল, ভাল মানে?

কেমন হয় টয়?

কী আবার হবে। বাচ্চাদের পড়াই, সেলাই করি, গান শেখাই। চলে যায় কোনও রকমে।

শ চার পাঁচ হবে কি? না কি একটু বেশিই?

হিসেব করিনি। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছেন?

কথাটা কী জানো, বাঘু হল বেকার, কপর্দকহীন বলতে গেলে। খুব বিপদের মধ্যেই আছে। ভাবছিলাম, তোমার রোজগার থেকে মাসে মাসে তাকে কিছু দেওয়া গেলে কেমন হয়।

ময়না স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আমার রোজগার থেকে বাঘুকে দেব? কেন আমার পয়সা কি সস্তা?

ময়নার গলায় যথেষ্ট ঝাঁঝ ছিল, কিন্তু যতীন উকিল একটুও চটল না। মৃদু একটু হেসে বলল, উদয়াস্ত রক্ত জল করা পয়সা কি কারও সস্তা হয়? সে কথা বলছি না। বলছিলুম, এ বেচারার দিকটা কে দেখে বলো! এর চলবে কী করে?

তার আমি কী জানি! বাঘুর সঙ্গে আমার তো সম্পর্ক নেই। যাদের আছে তারা দেখুক।

সম্পর্ক তার এখন কারও সঙ্গেই নেই। বাপ মরেছে, ভাইরা বিষয়-সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। এ বেচারা পড়েছে বিপদে। তুমি যদি ওরটা একটু চালিয়ে নিতে পার তবে ছেলেটা বেঁচে যায়।

ময়না এবার সত্যিকারের রাগল। প্রায় চেঁচিয়ে বলল, কোন সাহসে আপনি এ কথা বলছেন বলুন তো। একটা মাতাল বদমাশ লোকের জন্য আমি টাকা দেব কেন?

যতীন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, না দিলে চলবে কেন?

ময়না আরও রাগল, আরও চেঁচাল, চলবে কেন মানে? এ কি জবরদস্তি নাকি?

লীলাময়ী এতক্ষণ কথা বলেননি। এবার হাত তুলে ময়নাকে নিরস্ত করে যতীনের দিকে চেয়ে বললেন, বাঘু কি খোরপোষ চায়?

যতীন উকিল এবার হাসলেন। বললেন, এবার একটা কথার মতো কথা বলছেন বটে লীলাদিদি। বাঘু হল তো বাইরের লোক। বাইরের লোককে আমরা বাঙাল বলি। তা বাঘু বাঙাল মানুষ যেমনই হোক, পাগল ছাগল মাতাল যাই হয়ে থাকুক না কেন, ময়নার সঙ্গে তার আইনত আর ধর্মত বিয়ে হয়েছিল। সম্পর্কটা এখন আর স্বামীস্ত্রীর নেই বটে, কিন্তু ক্ষতিপূরণের সম্পর্ক শেষ হয়নি। সুতরাং বাঘু ইচ্ছে করলে কোর্টকাছারি করে খোরপোষ আদায় করতে পারে। আমি অবশ্য সেকথা বলি না। ততদূর করার দরকারও নেই। আপসে হয়ে গেলেই ভাল। শত হলেও সে বাইরের লোক। তাকে নিয়ে ফ্যাকড়া তুলে আমরা সম্পর্ক খারাপ করি কেন?

ময়না ফের চেঁচাল, কক্ষনও না। কিছুতেই সেই মাতালটাকে আমি এক পয়সাও দেব না।

লীলাময়ী ফের হাত তুললেন। তিনি ডিভোর্সের মামলার আইন জানেন। যতীন উকিল কী চাইতে

এসেছে তাও তাঁর আঁচ করা ছিল। তিনি বললেন, খোরপোষ কি বাঘু চেয়েছে?

খোরপোষ কথাটা বড্ড বিচ্ছিরি। খোরপোষ বলে নয়, গরিবকে কিছু দিলেন এরকম মনে করে দিলেও হবে। বাঘু বাঙাল টাকার পরিমাণ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। দেড় দুশো করে দিলেও হয়ে যাবে। পেট তো মোটে একটা।

ময়না বুঝতে পারল, এর মধ্যে আইনের একটা প্যাঁচ আছে। তবু সে যথাসাধ্য তেজ প্রকাশ করে বলল, ঠিক আছে, তাকে আদালতেই যেতে বলবেন। আদায় করুক সে খোরপোষ। আমি এমনিতে দেব না।

যতীন উকিল তবু চটল না। ভারী মিষ্টি করে বলল, আমি তো বলেই দিয়েছি বাঘু বাঙাল বাইরের লোক। তার হয়ে ওকালতি করতে আমার আসা নয়। বরং তোমার পক্ষই আমার নেওয়া উচিত। আর আসাও সেইজন্যই বলছি কী, যদি আপসে হয়ে যায় তা হলে আর আইন-আদালত করা কি ভাল?

লীলাময়ী এবার মাঝখানে পড়ে বললেন, ময়না যা বলছে সেটা ধরবেন না। আমি জানতে চাই বাঘু খোরপোষ চায় কি না।

না চাইলে আমার আসবার তো দরকার ছিল না লীলাদিদি।

আমি তার মুখ থেকে একবাব শুনতে চাই।

তার মুখ থেকে! কেন বলুন তো!

যতীন উকিল খুবই যেন বিস্মিত এমনভাবে চেয়ে রইল লীলাময়ীর দিকে।

লীলাময়ী মৃদুস্বরে বললেন, সে নিজে চাইলে আমরা দেব।

যতীন উকিল খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আপনি এখন যা বলছেন সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয় লীলাদিদি। সে যখন আতান্তরে পড়ে এসেছিল তখন তাকে আপনি আমল দেননি। বারান্দায় বের করে দিয়েছিলেন। খেতেও দেননি। এখন শুধু তার মুখের কথাটা শুনলেই তাকে খোরপোষ দেবেন এটা কি বিশ্বাস করার মতো কথা। সে তো একবার মুখ ফুটে চেয়েছিল, তখন তাকে পাত্তা দেননি কেন?

সে সব বলেছে বুঝি?

তার লুকোবার তো কিছু নেই।

আমার সেদিন মাথার ঠিক ছিল না। কত দিক সামাল দিয়ে আমাকে চলতে হয় সে তো জানেন। পরে মনে হয়েছে, ময়নাকেও বলেছি, কাজটা ঠিক হয়নি।

যতীন উকিল মাথা নেড়ে বলে, কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি লীলাদিদি। লোকটা নিউমোনিয়ায় মরতে পারত। তাতে আপনার বদনাম বাড়ত।

আমি তার কাছে ক্ষমা চাইব।

যতীন খুব হাসল। বলল, ক্ষমা টমা বুঝবার মতো এলেম তার নেই। সে একেবারে ল্যাজেগোবরে হয়ে আছে। ভিতুও খুব। হাসপাতালে ধাঙড়দের হাতে মার খেয়ে মরতে বসেছিল। আপনাদেরও সে খুব ভয় পায়। ক্ষমা চাইলে ঘাবড়ে যাবে।

সে এখন কোথায় আছে? আপনার বাড়িতে?

আমার বাড়িতেই আছে বটে, তবে না থাকার মতোই। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। কোথায় যায়, কী করে তা জানি না। তার নাগাল পাওয়া মুশকিল।

লীলাময়ী বুঝলেন, বাঘুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারটা যতীন ঘটতে দিতে চায় না। তিনি হঠাৎ বললেন, বাঘু কেমন লোক যতীনবাবু?

যতীন মাথা নেড়ে বললেন, গরিবেরা কি আর একবগ্গা মানুষ হয়? তারা কখনও ভাল, কখনও মন্দ। যখন যে পরিস্থিতিতে পড়ে।

এখনও মদ খায়?

আগে খেত নাকি? কী জানি, জানি না। তবে মদ খাওয়ার পয়সা তার নেই।

লীলাময়ী মৃদুস্বরে বললেন, তার আরও অনেক কিছুই নেই। তার ঘটে এত বুদ্ধি নেই যে, খোরপোষ আদায় করবে। তাকে আপনি বুদ্ধি দিয়েছেন, তাই না।

যতীন হাসল, বুদ্ধি যার না থাকে তাকে বুদ্ধি জোগানোই তো উকিলের কাজ।
যতীন চলে যাওয়ার পর ময়না আর লীলাময়ী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।
ময়না বলল, তুমি লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দিলে না কেন মাসি? আমার এমন রাগ হচ্ছিল।
রাগ করে লাভ কী? আইন বাঘুর পক্ষে। তুইও মাথা ঠাণ্ডা কর তো। রাগিস না। যতীন উকিল যে এরকম একটা কিছু করবে তা আমার আন্দাজ ছিল।
রাগে উত্তেজনায় ময়না রাতে খেতে পারল না। বিছানায় শুয়ে তপ্ত মাথায় ছটফট করতে লাগল। তার মেজাজ চটকে গেছে, ঘুম চটকে গেছে। সে এখন হাতের কাছে পেলে বাঘুর গলায় আঁশবটি বসিয়ে দেয়।

॥ ৩ ॥

বাঘু বাঙাল যে পাগল লোক এটা অল্প দিনেই লোকে বুঝে গেছে। সারাদিন ধরে লোকটা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে বসে পড়ে গল্প করে। তার চেয়েও বড় কথা, লোকটা বেগার খাটতে বড় ভালবাসে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রাস্তা পার করে দিল, কারও মোট বয়ে দিল, অশ্বিনীবাবুর যে নতুন বাড়ি উঠেছে সেখানে গিয়ে কুলি কামিনদের সঙ্গে ইট বয়ে এল খানিক, কারও নারকেলগাছ থেকে নারকেল পেড়ে দিল, বাজারে ঝগড়া কাজিয়ার মাঝখানে গিয়ে পড়ে দু পক্ষকে থামাল, কারও কুয়োয় নেমে জিনিস উদ্ধার করে দিল, কিন্তু পয়সাটয়সা নিল না বা চাইল না। এ লোক বাঙাল নয় তো কে বাঙাল?
বাঘুর বাইটা চেপেছে হাসপাতাল থেকেই। হাসপাতালে ঝাঁটা মেরেই সে বুঝতে পেরেছিল, এ একটা কাজের মতো কাজ। তারপর থেকেই তার কাজের মতো কাজের নেশা। তা হাসপাতালেও মাঝে মাঝে যায় বাঘু। সাফসুতরো করে দিয়ে আসে। ধাঙড়রা তাকে আর কিছু বলে না। বরং তাদের সঙ্গে বাঘুর এখন রীতিমতো ভাবসাব। তারা তাকে বিড়িটিড়ি দিতে চায়। বাঘু নেয় না।
বাঘু এখন নতুন চোখে দুনিয়াকে দেখছে। বহুকাল দেখেনি। নেশার ঘোরলাগা চোখে সে একরকম আবছা একটা চেহারা দেখত বটে পৃথিবীটার, কিন্তু সেটা যে কেন টিঁকে আছে তা বুঝতে পারত না। পৃথিবীটা কেন টিঁকে আছে তা আজও বোঝে না বাঘু। তবে নতুন চোখে বুঝবার চেষ্টা করছে।
যতীনবাবু বড় রাগ করে মাঝে মাঝে, ওহে দিব্যি তো খ্যাটনের জোগাড় করতে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছ, তা নামছ কবে?
আজ্ঞে নামলেই নেমে যাই।
আর ভালমানুষি দেখাতে হবে না। মাজাটা একটু দাবাও বসে বসে। বড্ড রস জমে যায় আজকাল।
যতীনবাবুর মাজা দাবাতে কোনও অপমান বোধ করে না বাঘু। সে এও জানে যতীনবাবুর মুখের কথাগুলো ধরতে হয় না। লোকটা কেপ্পন বটে, বজ্জাতও হতে পারে, কিন্তু বাঘুর বিশ্বাস, লোকটা তার ভালই চায়।
একদিন রাত্রিবেলা যতীনবাবু বাইরে থেকে ফিরে এসে আহ্লাদের সঙ্গে বলল, ওহে বাঙাল, তোমার হিল্লে বুঝি হয়ে গেল।
কীসের হিল্লে?
খোরপোষটা বোধহয় পেয়ে যাবে। লীলাদিদির কাছে গিয়েছিলুম। ময়না একটু তড়পাচ্ছিল বটে, কিন্তু লীলাদিদি জল। মাসে মাসে যদি দেড় দুশো টাকা আদায় হয় তা হলে তো লটারিই মেরে দিলে হে প্রায়। ঘরে বসে গতর না নেড়ে রোজগার। আর গতর যদি একটু নাড়ো, চাষবাসে কিছু তুলতে পারো, তা হলে তো গন্ধমাদন হয়ে গেল।
বাঘু আগে ভাবত না, আজকাল ভাবে। ভাবন-রোগটা তার ইদানীং হয়েছে। যে-কোনও কথাই সে আজকাল নেড়েচেড়ে শুঁকে টিপে দেখে। কথাটা পচা না বাসি, টক না মিষ্টি, ভাল না মন্দ এ সব বিচার করতে তার সময় লাগে। এ কথাটাও সে অনেকক্ষণ ভাবল। দু দিন ধরে নাগাড়ে ভাবল।
একদিন সে যতীনবাবুকে বলল, আপনি আর ও বাড়িতে যাবেন না।

কোন বাড়িতে?
ওই লীলাময়ী মাসির বাড়িতে।
কেন বলো তো!
দুটো অবলা মেয়ে করেকর্মে খাচ্ছে ওদের পয়সা আমি নিতে পারব না।
তোমাকে কি আর সাধে বাঙাল বলি? ভালমানুষির একটা শেষ আছে হে। এটা কলিযুগ মনে রেখো।
আপনি আর যাবেন না।
রোসো বাপু, কথাটা তোমাকে নিয়ে নয়। কথাটা হল আইনের। আইন যখন বলছে তোমার খোরপোষটা প্রাপ্য তখন ওটা ধর্মত তোমার প্রাপ্য। নিলে পাপ হবে না, অন্যায়ও হবে না।
আমি অত কথা বুঝি না। আমার মাথায় কুলোয় না। তবে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।
ইচ্ছে না হলেও উপায় নেই। এ সব কথা বাইরে বলার দরকার নেই। চুপচাপ থাকবে। মাথায় যখন কুলোয় না তখন বেশি বুঝবার দরকারই বা কী তোমার? যা করার আমি করব।
বাঘুর এ কথাটাও পছন্দ হল না। কথাটা বড্ড বেশি দুর্গন্ধযুক্ত। কথাটা তার একদম পছন্দ হচ্ছে না।
মাজার ব্যথাটা বেড়েছে বলে যতীনবাবুকে একটা বাঁধা রিকশার বন্দোবস্ত করতে হল। রোজ কাছারিতে নিয়ে যাবে। ফেরত আনবে। যতীনবাবু বাঘুকে বললেন, তুমিও রোজ চলো আমার সঙ্গে। কাছারিতে গেলে মানুষের চোখ ফোটে, জ্ঞান বাড়ে।
তা যায় বাঘু। যতীনবাবু মহকুমা শহরের কাছারিবাড়িতে ঢুকে গেলে নবীন অন্য ট্রিপ মারতে যায়। বাঘু বটতলায় বসে থাকে। নানা লোকের সঙ্গে গল্প করে। কখনও বা বেরিয়ে শহরটা ঘুরে দেখে আসে। এক আধদিন নবীন তাকে রিকশায় তুলে খানিক চক্কর মেরে আনে।
একদিন কথায় কথায় নবীন বলল, ময়না নাকি তোমারই বউ?
জিভ কেটে বাঘু বলল, কোন জন্মে ছিল। ওটা কিছু নয়। ছাড়ান কাটান হয়ে গেছে।
তবে তুমি মাল এখানে ঘুরঘুর করছ কেন?
যাওয়ার জায়গা নেই যে।
ওরা দুটোই গেছো মাগি। যদি লাগতে এসে থাকো তা হলে কপালে দুঃখ আছে।
লাগতে আসিনি।
আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল, জানো না তো! সুবালা নামে একটা মেয়ে—কার সঙ্গে না কার সঙ্গে তার পিরিত—আমাকে ধরে বলল, বিয়ে করতে হবে।
বাঘু কথাটার মধ্যে দুর্গন্ধ পাচ্ছিল। তাই অপলক চেয়ে রইল।
নবীন বলল, বাচ্ছা বাধিয়ে বসেছে তার আমি কী করব? আমার বলে বউ-ছেলে আছে।
বাঘু নবীনকে খুব লক্ষ করছিল। হঠাৎ বলল, সুবালাকে তুমি চিনলে কী করে?
চেনা আর কীসের? এক জায়গায় থাকলে চেনাজানা হয়ই। কথাবার্তা হত মাঝেসাঝে। তাই থেকেই ধরে নিল যে, আমিই হচ্ছি সেই লোক।
সুবালা তোমার নাম বলেছে?
ওই তো হয়েছে মুশকিল। মেয়েটা ন্যাকার হদ্দ।
এত লোক থাকতে তোমার নামই বা বলে কেন?
মেয়েরা বিপদে পড়লে ওরকম বলে। আমাকে বোধহয় বোকাসোকা ঠাউরেছে। ঘাড়ে চালান দিতে সুবিধে।
তোমাকে দেখে বোকা লোক মনে হয় না।
এ কথায় নবীন চটল। বলল, দেখ বাঙাল, তোমার বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। আর অত জেরাই বা কীসের।
বাঘু খুব কাহিল হাসি হেসে বলল, জেরা করব কেন, ব্যাপারটা বুঝতে চাইছি। আজকাল কথা বুঝতে আমার সময় লাগে। দুনিয়াটা আমার কাছে নতুন তো।
নবীন খ্যাক করে হেসে বলল, সাধে কি আর তোমাকে বাঙাল বলেছে।

সুবালা মেয়েটা কেমন?
বললুম না ন্যাকার হদ্দ। বদের হাঁড়ি।
দেখতে শুনতে কেমন?
ভাল আর কী। ওই একরকম। কেন ওদিকে ঝোঁকার চেষ্টা কেন? খুব রস হয়েছে?
বাঘু মাথা নেড়ে বলল, না হে, ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছি।
বুঝবার কিছু নেই রে ভাই, দুনিয়ায় মেয়েপুরুষ যত দিন আছে তত দিন ও সব হবেই। ভগবানের লীলা সব।
বাঘু নবীনকে ভাল করে দেখে নিল। নবীন যে যতীনবাবুর রিকশাওয়ালা হয়েছে তার পিছনে কি কারণ নেই? যতীন উকিল বুদ্ধি দেওয়ার ওস্তাদ লোক।
নবীনও অনেকক্ষণ বাঘুকে নিরিখ করল। তারপর হঠাৎ নরম সুরে বলল, বাঙাল, একটা কথা বলব?
কী কথা?
যদি কথার মধ্যে প্যাঁচ না ধরো তবে বলি।
প্যাঁচ ধরতে আমি এখনও শিখিনি। তবে বুঝতে আমার একটু সময় লাগে।
বলছিলুম কি তোমার তো কাঁচা বয়স, একাবোকা মানুষ। কোনও পিছুটান নেই। কী বলো? সব ঠিক বলছি তো!
তা তো ঠিকই বলছ।
তুমি একবার সুবালাকে দেখো।
দেখে?
দেখলে তোমার মায়া হবে। কোনও গু-খেকোর ব্যাটা তার সর্বনাশ করে গেছে বলে মেয়েটার জীবন কেন নষ্ট হয়। সে খারাপ মেয়ে নয়; আমি জানি। সঙ্গদোষে পড়ে আর লীলা-ময়নার অত্যাচারে বখে গিয়েছিল।
তারপর? থামলে কেন?
এর পরের কথাটাই কঠিন।
এ পর্যন্ত আমি দিব্যি বুঝতে পারছি।
কী বুঝলে?
তুমি সুবালাকে একবার বললে ন্যাকার হদ্দ আর বদের হাঁড়ি পরে ফের বললে সে ভাল মেয়ে। কোনটা ধরব বলো তো!
বাঙাল, তোমাকে যত বোকা দেখায় তুমি তত নও। তা সেকথা থাক। সুবালা আমার নাম বলে বেড়াচ্ছে বলেই আমার রাগ। নইলে সুবালা যে ভাল মেয়ে তা আমি জানি।
কীভাবে জান?
চিনি যে।
ভাল করে চেনো?
খুব ভাল করে।
এবার বলো।
বলছিলাম কী তাকে একবার দেখো, কথাটথা বলো। যদি তার জন্য তোমার মায়া হয় তা হলে একটা সাহসের কাজ করেই ফেলো।
যে-কাজটা তুমি করতে পারোনি সেইটে তো!
সেইটেই।
তুমি করলেও তো পারতে।
নবীন একটু রসস্থ হয়েছে। গাঢ় গলায় বলল, ভাইরে, আমিই করতুম। কিন্তু গাঁয়ে আমার বউ ছেলে রয়েছে। আমার শ্বশুর আবার মাতব্বর লোক, পার্টি করে। ভয় খাই।
সুবালাকে তোমার পছন্দই ছিল তবে?

ছিল। মিথ্যে কথা বলব না। খুবই পছন্দের মেয়ে।

ঠিক আছে। দেখব।

তুমি লোকটা বড় ভাল হে বাঙাল। বড় কলজেওয়ালা লোক, দিলওয়ালা লোক আজকাল আর চোখেই পড়ে না। তা হলে সুবালাকে আজই বলি।

বলবে? কীভাবে বলবে? তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়?

নবীন খুব সেয়ানা হাসি হেসে বলল, হয়। খুব কান্নাকাটি করে দিনরাত। গলায় দড়ি-দেওয়ার কথাও বলে। আমি আবার কান্নাকাটি সইতে পারি না।

তুমি যখন যাবে আমাকেও নিয়ে যেয়ো।

যাব। সেই কথাই ভাল। একটু নিশুত রাত না হলে সুবিধে হয় না। লীলাময়ীর নজর চারদিকে।

বাঘুর আজকাল কী হয়েছে, সে লোকের কথার যেমন গন্ধ পায় তেমনি আকৃতিও টের পায়। নবীনের কথাগুলো যেন তেরছা, কোনাচে উঁচুনিচু। কেমন যেন টকচা গন্ধ আছে তাতে। কথাগুলো সে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে দেখল। সুবালার একটা মুখ সে কল্পনা করে নিল। গোলপানা, থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, চোখে চাউনিটা নিস্তেজ।

সুবালাকে নবীন তার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে, এটা বেশ বুঝতে পারে বাঘু। কিন্তু সুবালাকে নিয়ে বাঘু যে কী করবে সেটাই তার মাথায় খেলল না। অনেক ভেবেও সে ঠিক করতে পারল না, মেয়েমানুষ দিয়ে তার কী দরকার।

যতীনবাবু রিকশার সিটে বসে, পাশে বাঘু। আগে বাঘু পাদানিতে উবু হয়ে বসত, আজকাল যতীনবাবু তাকে পাশেই বসায়। কেন কে জানে। বাঘু বুঝতে পারে না।

যতীন ফেরার পথে বলল, ওহে বাঙাল, আজ একটু হারাধন পাণ্ডার বাড়ি হয়ে যাব। তোমার জন্যই যাওয়া।

হারাধন পাণ্ডা কে তা বাঘু জানে না। কেউ একজন হবে, পৃথিবীতে কত মানুষ। হারাধন, যতীন, নবীন, লীলাময়ী, সুবালা...মানুষের কি শেষ আছে!

যতীন বলল, হারাধন পাণ্ডার নামও বোধহয় শোনোনি!

না। কে তিনি?

তার ছেলের সঙ্গেই ময়নাকে ঝোলাতে চাইছে লীলাদিদি। জল অনেক দূর গড়িয়েছিল।

তা হবে। বাঘু কথাগুলো বুঝতে পারে। মানুষে মানুষে নানারকম সম্পর্ক হয়। শরীরের, মনের। বাঘুর কোনও সম্পর্ক নেই কারও সঙ্গে। সে ভারী একটেরে একপেশে লোক।

যতীন বলল, হারাধনের বিরাট বাড়ি, মেলা পয়সা। বুড়ো মরলে পুরো সম্পত্তিটা লীলাময়ী আর ময়না মিলে গাপ করবে। সেই মতলবেই তো প্রদীপের সঙ্গে ময়নাকে ভেড়ানো। হয়েই যাচ্ছিল ব্যাপারটা। বুড়ো মরতে বসেছিল। কপাল জোরে বেঁচে গেছে বলে লীলাময়ীর মুখের গ্রাসটা ঝুলে আছে এখনও। তবে আইন মোতাবেক প্রদীপকে ত্যাজ্যপুত্তুর করলে লীলাময়ীর বাড়া ভাতে ছাই পড়ে। বুড়ো সেইজন্যই ডেকে পাঠিয়েছে। তোমাকে সঙ্গে নিচ্ছি কেন জানো?

কেন?

তোমাকে দেখলে বুড়ো আরও খেপবে। ত্যাজ্যপুত্তুর না করেই ছাড়বে না। বুড়ো বয়সে বড় ঘন ঘন মত বদলায় তো মানুষ।

বাঘু এত প্যাঁচ ধরতে পারছে না। কথাগুলো মাথায় বসতে সময় নিচ্ছে।

হারাধন পাণ্ডা ভারী নিস্তেজ চোখে সামনের দিকে চেয়ে বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে বসে আছে। গায়ে তুশের চাদর। গলায় কমফর্টার। পায়ে মোজা। যতীন বাঘুর পরিচয় দিল, সামনে ঠেলে দাঁড় করিয়ে আলোয় ভাল করে দেখাল তাকে। বলল, এই হল বাঘু মান্না। আপনাকে এর কথা তো বলেছি।

হারাধনের ভাবান্তর হল না। বাঘুকে নিস্তেজ চোখে একটু দেখে নিয়ে বললেন, আমার তো সব ছাইমাটি হল, এখন আর কী করা!

যতীন তাড়াতাড়ি বলল, ভাববেন না দাদা, আইনের প্যাঁচ জোর কষেছি। লীলাময়ী টের পাচ্ছে কত ধানে কত চাল। বাঘু এসে পড়ল, একেবারে ভগবানের আশীর্বাদ। আর কাণ্ডখানাও দেখুন, এসে জুটল

আমার বাড়িতেই। এর মধ্যে ভগবানের কারসাজি না থাকলে এরকম হয় বলুন!

হারাধন যেন গরম হচ্ছেন না। শরীরের সমাধিতে ভারী ডুবে আছেন। এ সব কথা ঢেউ খেলছে না মনের মধ্যে। বিড়বিড় করে কী একটু বকলেন আপনমনে। তারপর বললেন, সব ছাইমাটি হয়ে গেল।

কে জানে কেন এ কথাটা বাঘু বুঝল। কথাটার মধ্যে কর্পূরের মতো একটা গন্ধ আছে। উবে যাচ্ছে, সব উবে যাচ্ছে। দুনিয়াটাই উবে যাচ্ছে যেন।

বাঘু বলে উঠল, ঠিক কথা।

হারাধন এবার বাঘুর দিকে চাইলেন। ঘোলাটে চোখ। চোখ ভরা জল। বড় ডুবে আছেন লোকটা। বিড় বিড় করে কী বললেন। মাথা নাড়লেন।

যতীন উকিল বলে উঠল, সর্বনাশ! কেস তো কেরাসিন দেখছি। বুড়ো যদি টসকায় তা হলে সম্পত্তি চলে গেল বললাম লীলাময়ীর হাতেই।

গেলেও যে যতীন উকিলের ক্ষতিটা কী তা ভাল বুঝতে পারল না বাঘু। রামের সম্পত্তি যদি শ্যাম পায় তা হলে যদুর তাতে মাথাব্যথা কেন? এই কেনর একটা জবাব থাকা দরকার। বাঘু তার নতুন মাথায় এসব প্যাঁচালো ব্যাপার ধরতে পারছে না।

হারাধন বাঘুর দিকেই চেয়ে ছিলেন। বললেন, যখন ব্যাথাটা ওঠে বুঝলে—যখন ব্যথাটা ঠেলে ঠেলে ওঠে—তখন মনে হয় দুনিয়ায় আর কিছু নেই—শুধু ব্যথাটা আছে আর আমি আছি। ব্যথা উঠলে দুনিয়াটা ছাইমাটি হয়ে যায়। তখন ছেলে থাকে না, মেয়ে থাকে না, বউ থাকে না, টাকা পয়সা কিচ্ছু থাকে না, ভগবান অবধি বিস্মরণ—ওফ—কী ব্যথা রে বাপ।

বাঘু মাথা নেড়ে বলে, ঠিক কথা।

যতীন উকিল তাকে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলে, আকথায় সময় নষ্ট করো কেন? কাজটা গুছিয়ে নিতে হবে না? এইবেলা সইসাবুদ না হলে পরে পস্তাতে হবে। বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি কাজটা সেরে নিই ততক্ষণে।

বাইরে শীতের ঘোর-লাগা মায়াবী সন্ধে ঘনিয়ে এল। কুয়াশার স্বপ্নের মধ্যে জোনাকি জ্বলছে নিবছে। মশার শব্দ ঘন হয়ে এল। আর ঘন হল ঝিঁঝি পোকার শব্দ। বড্ড শীত। বাঘু সিঁড়িতে বসে চেয়ে রইল। কতকাল সাদা চোখে সাঁঝ দেখেনি সে। আজকাল দেখে আর মুগ্ধ হয়।

শীতের ভারী বাতাসে একটা চেনা গন্ধ ভেসে এল বাঘুর নাকে। নাকটা চনমন করে উঠল। বাঘু চকিতে চারপাশে চাইল। কোথা থেকে যে আসছে গন্ধটা! একেবারে ম'ম' করছে চারদিক।

বাঘু বাতাস শুঁকতে শুঁকতে উঠে এদিক-ওদিক করে সটান হারাধন পাণ্ডার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়াল। যতীন উকিল আর হারাধন দুজনেই গেলাস হাতে বসা। টেবিলে বোতল। খুব চলছে। হারাধনের সেই নিস্তেজ মনমরা ভাবটা আর নেই। শরীরে দিব্যি চনমনে ভাব। মুখে খ্যালখ্যালে হাসি।

বাঘু একটু সরে এল। যতীন উকিলের মাথায় বুদ্ধিও খেলে বাবা!

ঘণ্টাটাক বাদে যতীন উকিল ফাইল বগলে বেরিয়ে এল। মুখে হাসি হাসি ভাব। মদের গন্ধ। বাঘুর দিকে চেয়ে বলল, হয়ে গেল। কাজ ফরসা।

কী হয়ে গেল তা আর জিজ্ঞেস করল না বাঘু। জেনে তার কী লাভ? কার সম্পত্তি কার ঘাড়ে আসবে তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। তবে তার চোখের সামনে দুনিয়াটা পরতে পরতে ঢাকনা খুলে দিচ্ছে। আগে অনেক কিছুই দেখতে পেত না বাঘু। আজকাল পাচ্ছে। কে যেন অনেক শতরঞ্চি আর কাঁথাকানি দিয়ে দুনিয়াটা মুড়ে রেখেছিল। এখন ঢাকনা তুলে নিচ্ছে একে একে।

যতীন উকিল তার গালের ওপর একটা মোদো গন্ধের শ্বাস ছেড়ে বলল, বুঝলে! মাথায় বুদ্ধিটা চট করে এসে গেল। হারাধন পাণ্ডা হচ্ছে মদে চোবানো মানুষ, তার কি এমন শুকনো থাকলে চলে! দিলুম আবার বোতলের ডোজ। একেবারে হড়হড় হয়ে গেল।

রিকশা থেকে নামবার সময় নবীন কানে কানে বলল, আজ রাতেই কিন্তু—মনে আছে তো!

আছে।

বারোটার পর আমি আসব।

ঠিক আছে।

বাঘু ঠিক বুঝতে পারছে না, মেয়েমানুষ দিয়ে তার সত্যিই কী হবে। তবে এতে করে যদি নবীনের কিছু সুবিধে হয়, যদি সুবালার ভাল হয় তবে তার কোনও আপত্তি নেই। দুনিয়াটার পরত খুলছে। কত কী আছে দেখার, জানার।

নিশুতি রাতে নবীন এসে হাজির হল, আলোয়ানে মাথামুখ ঢেকে। মুখে চোর-চোর ভাব।

বাঙাল, ডুবিয়ো না।

ডোবাব কেন?

তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না যে। তুমি বড় বিটকেল লোক।

তা বটে।

কথাটা স্বীকার করছ?

করছি।

॥ ৪ ॥

পাশাপাশি দুটো চৌকিতে ময়না আর লীলাময়ী। কারও চোখেমুখে ঘুম নেই। ময়না যে কেন বারবার এপাশ ওপাশ করে কে জানে।

লীলাময়ী বললেন, ঘুম আসছে না, নাকি রে।

না মাসি। যতীন উকিল মাথাটা এমন গরম করে দিয়ে গেল।

মুখে চোখে জল চাপড়ে আয়। ঠাণ্ডা লাগাসনি যেন। আজ আমাবও বায়ু চড়েছে।

ময়না উঠল না। লেপমুড়ি দিয়ে পড়ে থেকে বলল, লোকটা যে কত বড় শয়তান!

কার কথা বলছিস?

বাঘু মান্না। জাতে মাতাল, তালে ঠিক।

ওরে তার মাথায় এত বুদ্ধি নেই। তাকে বুদ্ধি দিয়েছে লোকে।

তা দিক। তা বলে ও বুদ্ধি নেবে কেন?

কী আর করবি। অত ভাবিস না। এ সমাজে অবলা মেয়েমানুষ কিছু একটা বড় কাজ করলেই পুরুষগুলোর আঁতে লাগে। আর কিছু পারুক না-পারুক মেয়েমানুষকে বিপদে ফেলতে তাদের বড় সুখ। ও সব গায়ে মাখিসনি। আমার পরে তোকেই সব কাজ করতে হবে। মন শক্ত কর।

আমি খুব শক্ত মাসি। তুমিই বরং নরম। সহজে গলে যাও।

লীলাময়ী প্রথমটায় কিছু বললেন না। একটু বাদে বললেন, নানা কথা কানে আসছে।

কী কথা?

বাঘু মান্নার কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। লোকে বলে, বাঘু বাঙাল পাগলাটে বটে, কিন্তু ভারী ভাল লোক। সে পাঁচজনের জন্য খুব করে।

তোমার বিশ্বাস হয়?

কী জানি বাবা, তবে গঙ্গারাম ডাক্তার বলছিল, বাঘু মান্না তার পুকুরের পানা তুলে দিয়েছে, একটি পয়সা নেয়নি। শুধু তাই নয়, দু বছর আগে গঙ্গার মায়ের আঠারো ভরির বিছেহার জলে পড়ে গিয়েছিল। সেটাও তুলে দিয়েছে বাঘু।

হলেই বা।

তাই বলছিলাম, হয়তো লোকটা খারাপ নয়। তার সঙ্গে যে বড় খারাপ ব্যবহার করেছিলুম সেইটে মনে করে কষ্ট হচ্ছে।

যা করেছিলে ভালই করেছিলে। তুমি তাকে চেনো না।

তুইও কি চিনিস?

না। আমার আর চেনার দরকারও নেই। তাকে মুছে ফেলেছি।

মুছে ফেলেছিস বেশ করেছিস। তোকে আর তার ঘর করতে বলছি না। বলছিলুম একদিন ডাকিয়ে আনিয়ে বলি, বাছা, কিছু মনে কোরো না। তোমার প্রতি অন্যায় করেছিলুম সেদিন।

আশকরা দিয়ো না মাসি, পেয়ে বসবে।

দুজনে আবার চুপ।

ময়না ভারী বিরক্ত, ভারী জ্বালাতন। সারাদিন "বাঘু মান্না বাঘু মান্না" শুনতে হচ্ছে তাকে আজকাল। এমনকী মশাগুলো যে গুনগুন করছে তার মধ্যেও সে "বাঘু মান্না বাঘু মান্না" শুনতে পায়। হাড়হাভাতে হাড়গিলে ভিখিরির অধম একটা লোক, যাকে সবাই ভুলে গিয়েছিল সে আবার বদ মতলব নিয়ে ফিরে এসে জায়গা দখল করতে চাইছে, গলায় গামছা দিয়ে মাসোহারা আদায় করার ফিকির করছে, এটা ভারী অসহ্য লাগে তার। গায়ে বিছুটির জ্বালা, বুকে লঙ্কাবাটার জ্বলুনি। চোখ কচকচ করে ঘুমহীনতায়। মেয়েমানুষ হয়ে জম্মানোর অভিশাপ আর অপমানে তার যেমন চোখে জল আসতে চায়, তেমনি বুকের মধ্যে ফোঁসফোঁসানিও ওঠে রাগের।

বেশ তো, সেই ওই নপুংসককে না হয় মাসোহারাই দেবে। একটা আখাম্বা পুরুষ একজন মেয়েমানুষের কাছ থেকে নিক না হাঁটু গেড়ে বসে খোরপোষ। পাঁচজন দেখুক সেই উলট-পুরাণ। বেশ হবে।

ভাবতে ভাবতে উঠে বাথরুমে গেল ময়না। চোখে মুখে ঘাড়ে হিমঠাণ্ডা জল দিল ইচ্ছে মতো। হোক জ্বর সর্দি, হোক নিউমোনিয়া। মরতে কোনও মেয়েই ভয় পায় না।

লীলাময়ী শেষ রাতে ঘুমিয়েছেন। ময়নার ঘুম এলই না।

দিন তিনেক বাদে সুবালা লীলাময়ীকে বলল, মা, তোমাকে আর যন্ত্রণা দেব না। আমি চলে যাব।

কোথায় যাবি? মরবি নাকি?

না। মরতে ইচ্ছে যায় না গো। মরলে যে দুটো প্রাণ যাবে।

নবীন কি কোনও ব্যবস্থা করেছে? সে তো পালিয়ে বেড়ায়।

সে নয়! অন্য লোক।

কাকে জোটালি? বন্দোবস্তই বা কী রকম?

তোমাকে না জানিয়ে তো কিছু করব না, মা। তবে কথাটা বলতে লজ্জা করে বড়।

যে লজ্জা বাধিয়ে বসে আছিস তার চেয়ে বেশি লজ্জার আর কী হবে?

একজন সব জেনেশুনে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।

বিয়ে! সত্যিকারের বিয়ে, নাকি বিয়ের নামে একটা ভড়ং। শেষে দুদিন বাদে যদি লাথি দিয়ে তাড়ায় তখন কী করবি?

সে সে রকম লোক নয়।

কী করে বলছিস? এত তাড়াতাড়ি জোটালিই বা কোত্থেকে?

জুটে গেল মা। আমার কথা সব শুনেটুনে বলল, আমার চালচুলো নেই, গতরখানা শুধু আছে। জন্মেও কোনও কাজ করিনি কখনও। তবে যদি রাজি থাকো বিয়ে করতে, তা হলে খাটব।

এ আবার কেমনধারা কথা! কোন লক্ষ্মীছাড়াকে জোটালি! তাকে এনে দাঁড় করা আগে আমার সামনে। তাকে আগে দেখি, তার কথা শুনি, তবে মত দেব। শেষে একটা যার তার সঙ্গে গিয়ে যদি জুটিস তবে আমারই বদনাম হবে। বদনাম করার লোকের অভাব নেই, সব মুখিয়েই আছে।

সুবালা একটু কাঁদল। তারপর রান্নাঘরের দাওয়ায় সিঁড়িতে সসংকোচে বসে বলল, বদনাম তোমার কম তো হয়নি মা, আমার জন্য। আর বেশি কী-ই বা হবে।

কাঁদিস না, যদি সে লোক ভাল হয়ে থাকে, তবে না হয় বেকার হলেও, তার একটা কাজ জুটিয়ে দিতে বলব কাউকে। কথা তো সেটা নয়। কথা হল, তুই এত হালকা মনের মেয়ে কেন রে? এই তো সেদিন নবীনের সঙ্গে ঢলাঢলি করলি, তারপর আবার এখন আর একজনের দিকে ঝুঁকেছিস। এত সস্তা যদি হয়ে যাস তবে কপালে যে দুঃখ আছে। চট করে ঢলে পড়িস কেন?

সুবালা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, এটা সে বৃত্তান্ত নয়।

তা হলে কোন বৃত্তান্ত?

সুবালা ঘাড় হেঁট করল। খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, নবীনের সঙ্গে যেরকমধারা ছিল সেরকম নয়। ঢলাঢলি নয়, আমার দুঃখের কথা শুনে লোকটা পাশে দাঁড়াতে রাজি। নবীনই এনেছে একে।

নবীন। বলিস কী? বলে লীলাময়ী বাক্যহারা হলেন।

সুবালা ফের কাঁদল। নিজের আঁচল আঙুলে জড়াতে জড়াতে, আর খুলতে খুলতে বলল, নবীনের ভয় তুমি ওকে পুলিশে দেবে। তাই ও আমার জন্য পাত্র জুটিয়ে এনেছে।

লীলাময়ীর তবু বাক্য সরল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এরকমও হয় নাকি রে? সে তোকে নষ্ট করল, তারপর আবার পাত্র জোটাল। তুইও রাজি হলি, নির্লজ্জ কোথাকার?

কী করব? রাজি না হলে যে তোমার লজ্জা?

ময়না কুটনো কুটছিল। কাজ থামিয়ে কথা শুনতে হচ্ছিল তাকে। এরকম ঘটনা সে আগে শোনেনি। এবার মাসির দিকে চেয়ে বলল, বাধা দিচ্ছ কেন মাসি? সুবালার যদি এতে একটা হিল্লে হয় তো হোক না।

লীলাময়ী সন্দিহান চোখে ময়নার দিকে চেয়ে বললেন, এটা হিল্লে না কোনও ষড়যন্ত্র তা কে বলবে? যদি নিয়ে গিয়ে আর কাউকে বেচে টেচে দেয় তখন? মেয়েদের নিয়ে কত খারাপ ব্যবসা আছে।

কথাটা শুনতে পেয়ে অশ্রুমুখী সুবালা মাথা নেড়ে বলল, এ আমাকে বেচবে না মা।

তুই তাকে চিনিস?

তোমরাও চেনো।

কে সে বলবি তো!

বললে ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যায় যদি!

ছোট মুখে বড় কথা! কেন, ও কথা বলছিস কেন?

সে যে তোমাদের আত্মীয়, ময়নাদিদির...

বাকিটা শুনতে হল না ময়নার। কানটান সব ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল এক ভয়ংকর অপমানে, লজ্জায়, ঘেন্নায়।

লীলাময়ী বললেন, কে বললি?

বলিনি এখনও। বলব বলে চেষ্টা করছি, মুখে আসছে না, ভয় করছে।

ময়নাদিদি, না কী যেন বললি?

সেই কথাই তো। পাত্র হল বাঘু মান্না।

লীলাময়ী ফের বাক্যহারা হলেন।

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। সুবালা এই অসহ্য নীরবতা সহ্য করতে পারছিল না। তার মন বলছিল, পাপ হচ্ছে, সুতরাং নীরবতা ভেঙে সে-ই বলল, কাজটা কি পাপ হল মা? কিন্তু আমার তো দোষ নেই।

লীলাময়ী অনেকক্ষণ বাদে ধরে থাকা দমটা ছাড়লেন। তারপর বললেন, না, পাপ হবে কেন? তাকে তো ময়না কবে ছেড়ে দিয়েছে। সম্পর্কও চুকেবুকে গেছে। তোর কোনও পাপ হয়নি।

আমি বড় ভয় পাচ্ছিলুম বলতে। তারপর ভাবলুম, ময়নাদিদির বিয়ে তো প্রদীপবাবুর সঙ্গে একরকম ঠিকঠাক, হয়তো তোমরা আমাকে খারাপ ভাববে না।

ভাবিনি।

ময়না ফের আলুর খোসা ছাড়াতে লাগল বটে, কিন্তু তার ভারী অপমান লাগছিল। অথচ অপমান বোধ করার তেমন কোনও স্পষ্ট কারণ নেই। বাঘু মান্না মাতাল এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। তার ওপর হাড়হাভাতে, কপর্দকশূন্য। তাকে কবে বাতিল করে দিয়েছে ময়না। তবু যে অপমান বোধ করছে সে, তার কারণ বোধহয়, সুবালার মতো নষ্ট মেয়েছেলের সঙ্গে বাঘুর নাম জড়ানো বলে। বাঘুর সঙ্গে ময়নার নামটাও তো জড়ানো। এতে একটা গোলমালে সূক্ষ্ম এবং অবুঝ অপমান হচ্ছে ময়নার।

লীলাময়ী একটু বাদে সামান্য গাঢ় গলায় বললেন, ভাল করে খোঁজটোজ না নিয়ে কিছু করিসনি। শুনেছি সে খুব মাতাল।

আমার আর বাছাবাছি করার উপায় নেই মা। তবে সে আর মদটদ খায় না।

খায় না ঠিক জানিস?

জানি মা। বাঘু বাঙালকে এ তল্লাটের সবাই চিনে গেছে কিনা, মাতাল নয়, তবে খ্যাপাটে গোছের।

সে আবার কীরকম? পাগল টাগল নাকি?

সুবালা এত দুঃখেও একটু হাসল। বলল, পাগল আর বলি কী করে! তেমন পাগল নয়। তবে বিটকেল কিম্ভূত সব কথা বলে। আমাকে কী বলল জানো মা? বলল, তোমার কথাগুলো বেশ গোল গোল, আর তাতে মৌরির গন্ধ আছে।

ও মা: সে কী কথা রে!

তাই তো বলছি, একটু খ্যাপা আছে লোকটা। বলল, মানুষের কথা বুঝতে আমার একটু সময় লাগে। আগে তো নেশার ঘোরে দুনিয়াটা ডুবে থাকত। আজকাল চারদিকটা বড্ড ভেসে উঠেছে, কত আলো, কত রং, কত কাজ, কত কথা।

তা হলে তো মাথায় বেশ দোষ আছে বলতে হয়।

তা একটু আছে। কিন্তু সে লোক বড় ভাল মা।

লীলাময়ী বিরস গলায় বললেন, তুই যখন আমার কাছে এসেছিলি তখন তো তোর এতটুকু বয়স। তোর গেঁজেল বাপ পৌঁছে দিয়ে গেল। তারপর গিয়ে মাসটাক বাদে ফাঁসিতে লটকাল। মেয়ের মতো মানুষ করেছি। যা করবি এবার থেকে ভেবেচিন্তে করবি।

আমাদের গবেট মাথা মা, ভাবনাচিন্তা কি আর আসে।

তাকে একবার আনতে পারিস আমার কাছে?

বাঘুকে? সে তোমাকে যমের মতো ভয় পায়।

কেন আমাকে ভয়ের কী?

সে জানি না।

একবার তাকে একটু দেখতুম। কুকুর বেড়ালের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিলুম তো। ছেলেটা কষ্ট পেয়েছে খুব।

কষ্ট কীসের মা! বাঘুর তার চেয়ে ঢের বেশি দুর্গতি গেছে। ও সব সে মনে রাখেনি।

যদি তাকে আনতে পারিস তো ভাল। আর বলিস, বিয়ে করলে বিয়ের মতোই করতে হবে। মন্ত্র পড়তে হবে, মালাবদল করতে হবে। লোকজনকে খাওয়াতেও হবে।

সুবালা ভয়-খাওয়া গলায় বলল, কে করবে মা অত? তার অবস্থা তো জানো।

আমি কিছু খরচ দেব। বলিস তাকে।

বলব।

সুবালা উঠে গেল। ময়না মাথা নিচু করে যেমন কাজ করছিল তেমনি করে যেতে লাগল। লীলাময়ী তার দিকে একবার তাকালেন। কী একটা বলি-বলি করেও বললেন না।

ময়না হঠাৎ কাটা তরকারির থালাটা সামনে ঠেলে দিয়ে উঠে গেল।

লীলাময়ী কিছু বুঝলেন না। তবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। প্রদীপ পাণ্ডার সঙ্গে ময়নার বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। হারাধন বেঁচে থাকতে তা কি হবে?

॥ ৫ ॥

বাঘু খোরপোষ চাইছে। বাঘু সুবালাকে বিয়ে করছে। এ সব গোলমেলে ব্যাপার কেন ঘটছে তা বুঝতে পারছিল না ময়না। শুধু টের পাচ্ছে তার ভিতরটা অপমানে জ্বালায় ঝাঁ-ঝাঁ করে পুড়ে যাচ্ছে। তার কাছ থেকে খোরপোষ আদায় করে নতুন বউ নিয়ে সংসার পাতবে নাকি শয়তানটা? এত দূর? ময়না, তো ভাবতেই পারছে না ঘটনাটা।

সারাদিন এমন আনমনা রইল ময়না যে, ইস্কুলে পড়াতেই পারল না ভাল করে। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ল ছুটির আগেই। তার মনে হচ্ছে এর একটা বিহিত করা দরকার।

যতীন উকিলের বাড়ি যখন হাজির হল ময়না তখন পড়ন্ত বেলা। বাড়িতে কেউ আছে বলে প্রথমটায় মনে হল না। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর একটা লোক ঘুমচোখে এসে দরজা খুলল। আর ময়না হাঁ হয়ে গেল লোকটাকে দেখে।

এ সে লোকই বটে। তবে হাড়হাভাতে ভাবটা আর নেই। গালে নরম দাড়ি, চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে।

বেশ দেখাচ্ছে।

ভারী ভিতু চোখে চেয়ে লোকটা বলল, কাকে খুঁজছেন? বউঠান শীতলাবাড়িতে, উকিলবাবু কাছারিতে।

আর বাঘু মান্না?

লোকটা যেন ভয় পেয়ে এক পা সরে গেল, আমিই।

ময়না ঘরে ঢুকে কপাট দিয়ে দাঁড়াল মুখোমুখি, সুবালাকে নাকি বিয়ে করার ইচ্ছে!

লোকটা চিনতে পারছে না ময়নাকে। দুচোখে ভরা বিস্ময় নিয়ে চেয়ে থেকে বলে, ঠিক তা নয়। সে বিপদে পড়ে ধরেছে তাই রাজি হয়েছি। আপনি কি তার কেউ হন?

ময়নার চোখ দুটো জ্বলন্ত হয়ে উঠছিল ক্রমে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে, বিয়ে করার মতলবটা মাথায় ঢোকাল কে?

বাঘু মাথা চুলকে অসহায় ভাব করে বলল, ভাবলুম মেয়েটার যদি উপকার হয়। নবীনও ধরে পড়েছিল খুব।

শুধু সেইজন্য? নাকি নিজেরও ইচ্ছে ছিল।

মেয়েমানুষ দিয়ে আমার কী হবে বলুন! না, আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে কিছু নেই।

লোকে বললেই নাচতে হবে? পুরুষমানুষ নাকি হনুমান?

বাঘু একটু হাসল, আপনি বোধহয় তার কেউ হবেন। বোন টোন বোধহয়। আমার কোনও দোষ নেই কিন্তু। সুবালা বড় আতান্তরে পড়েছে। লীলাময়ীর ওখানেও সুবিধে হচ্ছে না।

ওঃ সুবালার দুঃখে তো নাল গড়াচ্ছে দেখছি?

বাঘু আবেগে মাথা নেড়ে বলল, না না, আমি ঠিক ওরকম নয়।

তা হলে কীরকম?

বাঘু অসহায়ভাবে চাবদিকে তাকাল। তারপর বলে, কীরকম তা, কি আমিই জানি! বড্ড নেশা করতুম এককালে। দুনিয়াটাও চেনা হল না, আমি কেমন মানুষ তাও ঠাওর পেলুম না। এখন বুঝবার চেষ্টা করছি।

আক্কেলটা কবে হল!

সে অনেক কথা। বলতে গেলে মহাভারত।

এই পোড়া মুখখানাকে বোধহয় মনেও পড়ে না!

বাঘু বড় বড় চোখ করে মুখখানা দেখে। কিন্তু মনে পড়ে কি?

ময়না ঝংকার দিয়ে বলল, শুভদৃষ্টির সময় তো চোখে পড়েছিল, না কি?

বাঘু হঠাৎ সভয়ে আরও দু-পা পিছিয়ে গেল। তারপর অবিশ্বাসের গলায় বলল, আপনি কি লীলাময়ীর সে-ই বোনঝি!

কেন, আর কোনও সম্পর্কের কথা মনে পড়ল না? নেশার ঘোর কি এখনও কাটেনি নাকি।

বাঘুর মনে পড়েছে, কিন্তু সে মাথা নেড়ে বলল, সে সম্পর্ক তো ছাড়ান কাটান হয়ে গেছে। লীলাময়ীর কাছে আদালতের রায় আছে।

তাই বুঝি সুবালার সঙ্গে মাখামাখির খুব সুবিধে হয়েছে!

বাঘু একটু বিপন্ন বোধ করল। হঠাৎ মাথা নেড়ে বলল, আপনি যা বলছেন এর মধ্যে গরম মশলার গন্ধ পাচ্ছি। কথাগুলো ভারী অদ্ভুত। দুর্বো ঘাসের মতো সরু সরু, কচি, সবুজ।

বাঃ, কথার তো খুব গোছ দেখছি।

কী করব, আমার যে ওরকমই মনে হচ্ছে।

ময়না ফোঁস করে একটা শব্দ করল। তারপর অনবরত ফোঁস-ফোঁস। সে যে কাঁদছে, ভীষণ কাঁদছে এটা বুঝতে তার অনেকক্ষণ সময় লাগল। সে বাঘু মান্নার ভূত ঝেড়ে দিতে এসেছিল, তবে কাঁদে কেন? সে বুঝতে পারছে না।

বাঘু এক পা এগোলো। আরও এক পা। দ্বিধা, ভয়।

ময়না এগোলো চিতা বাঘের মতো।

তারপর যা হল, তা ভারী লজ্জার কথা। কহতব্য নয়।

অসুখের পরে
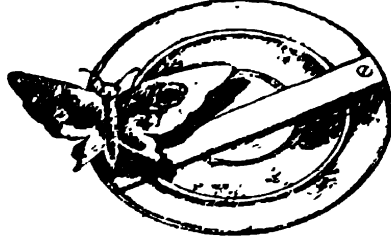
বাতাসে আজ কিছু মিশে আছে। রহস্যময় গোপন কোনও শিহরন ? কোনও আনন্দের খবর ? কোনও সুগন্ধ ? কোনও মধুর অশ্রুত শব্দের কম্পন ? হেমন্তের সকালে ভিতরের বারান্দায় টিয়া পাখি অস্ফুট কিছু কথা বলতে চাইছে। ভোরের আলোটিতে আজ কিছু গাঢ় হলুদের কাঁচা রং।

শিয়রের মস্ত জানালার খড়খড়ির একটি পাটি ভাঙা। পুবের তেরছা রোদ একফালি এসে পড়ে আছে মেঝেয়, যে মেঝে প্রায় একশো বছরের পুরনো। মস্ত উঁচু সিলিঙে খেলা করছে রোদের আভা। বিমের খাঁজে চতুর পায়ে ঘুরছে ফিরছে বন্দনার পোষা পায়রারা।

বন্দনার আজ আর অসুখ নেই। তিন দিন হল জ্বর ছেড়ে গেছে। শরীরটা ঠাণ্ডা, বড় বেশি ঠাণ্ডা হয়ে আছে তার। একটুও জোর নেই গায়ে। তবু এমন ভাল দিনটা কি বয়ে যেতে দেওয়া যায় ?

তাদের ঘরগুলো বড্ড বড় বড়। কী বিরাট তার পালঙ্কখানা ! কত উঁচু। এই পালঙ্কে তার দাদু শুত, তারও আগে হয়তো শুত দাদুরও দাদু। এই পালঙ্কেরও কত যে বয়স ! এতকালের জিনিস, তবু পাথরের মতো নিরেট। বন্দনা উঠে বসল। পালঙ্কের অন্য পাশে মা ছিল শুয়ে। ভোরবেলা উঠে গেছে। এ সময়ে মা ঠাকুরঘরের কাজ সারে। তারপর রান্নাঘরে যায়।

বসে বন্দনা আগে তার এলোমেলো চুল দুর্বল হাত দুটি দিয়ে ধরল মুঠো করে। তার অনেক চুল। চুলের ভারে মাথাটা যেন টলমল করে। যেমন ঘেঁস তেমনি লম্বা। খোঁপা বাঁধলে মস্ত খোঁপা হয় তার।

একটু কষ্ট করেই এলো খোঁপায় চুলগুলোকে সামাল দিল সে। তারপর নামবার চেষ্টা করল। পালঙ্ক থেকে নামা খুব সহজ নয়, বিশেষ করে দুর্বল শরীরে। পালঙ্কটা বড্ড উঁচু বলে নামা-ওঠার জন্য একটা জলচৌকি থাকে। বন্দনা সেটা দেখতে পেল না। বোধহয় অন্য ধারে রয়েছে। পালঙ্কটা পার হয়ে ওপাশ দিয়ে নামবে কি না একটু ভাবল বন্দনা। এই পালঙ্ক তার ছেলেবেলার সাথী। রেলিং বেয়ে, ছত্রি বেয়ে কত খেলা করেছে। আজ কি পারবে না একটু লাফ দিয়ে নামতে ? দুর্বল হাঁটু কি বইতে পারবে তাকে। গত পনেরো দিন সে বিছানা থেকে খুব কমই নেমেছে। বিছানায় বেডপ্যান, বিছানায় স্পঞ্জ, বিছানাতেই খাওয়া। বিছানা তাকে খেয়ে ফেলেছিল একেবারে।

আস্তে তার ফর্সা ডান পাখানা মেঝের দিকে বাড়িয়ে দিল বন্দনা। পাখানা শূন্যে দুলছে। মেঝে নাগালের অনেক বাইরে। দুর্বল হাতে খাটের বাজু চেপে ধরে খুব সাবধানে কোমর অবধি ঝুলিয়ে দিল বন্দনা। তারপর ঝুপ করে নামল। টলোমলো দুটি পা তাকে ধরে রাখতে পারছিল না প্রায়। খাটে ভর দিয়ে সে যখন দাঁড়াল তখন মুখে একটা হাসি ফুটল তার।

বন্দনার পরনে একখানা ভারী কাপড়ের নাইটি। গুটিয়ে গিয়েছিল, ঠিকঠাক করে নিল বন্দনা। মেঝে থেকে পাথুরে শীতলতা শরীর বেয়ে উঠে আসছে। একটু শীত করছে তার। শিয়রের কাছে ভাঁজ করা টমেটো রঙের পশমের চাদর রাখা আছে। বন্দনা সেটা গায়ে জড়িয়ে নিল।

তার চেহারা কি খুব খারাপ হয়ে গেছে ? উত্তর দিকে মেঝে থেকে প্রায় সিলিং অবধি বিশাল মেহগনি কাঠের আলমারির গায়ে খুব বিরাট আয়না লাগানো। আয়নার পারা কিছু উঠে গেছে। তার সামনে এসে দাঁড়াল বন্দনা। নিজেকে তার একটুও পছন্দ হল না দেখে।

বিবর্ণ রক্তহীন পাঁশুটে মুখ। বরাবরই সে একটু রোগা। এখন কঙ্কালসার হয়েছে তার শরীর। গলাটা কত সরু হয়ে গেছে আরও। ঝ্যালঝ্যাল করছে গায়ের পোশাক।

বন্দনা তার দুটি হাওয়াই চটি পরে নিল। ধীর পায়ে সে এসে দাঁড়াল ভিতরের বারান্দায়। তাদের পুরনো আমলের বাড়ির সবকিছুই বড় বড়। এই বারান্দায় একসময়ে দুশো লোক পংক্তিভোজনে বসত। আজকাল পংক্তিভোজন হয় না। বারান্দার সামনের দিকে ওপর থেকে

অনেকটা জুড়ে কাঠের আবডাল, তার নীচে রঙিন কাচ। বুক সমান লোহার মজবুত রেলিং। বারান্দায় কয়েকটা খাঁচা দুলছে। আগে অনেকগুলো খাঁচা ছিল। আজকাল নেই। মোট চারটে খাঁচার মধ্যে দুটিতে দুটি পাখি আছে। একটায় টিয়া, অন্যটায় একটা বুলবুলি। আর দুটো খাঁচা উত্তরের শিরশিরে হাওয়ায় দুলছে।

খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে টিয়াকে একটু দেখল বন্দনা। খাঁচার মধ্যে পাখি দেখতে তার ভাল লাগে না। বিলু পাখি পোষে। কিন্তু বিলু বড় হচ্ছে, এখন আর পাখির দিকে মন নেই তেমন। বিলু এখন ক্রিকেট খেলতে যায়, ফুটবল খেলতে যায়। বিলুর এখন অনেক পড়াশোনার চাপ।

বুকসমান রেলিঙের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বন্দনা নীচের বাঁধানো উঠোনটা দেখল। ভাঙা শান, কোনও কচু গাছের ঝোপ, ঘাস, আগাছা। উঠোনের মাঝখানে বাঁধা তারে কয়েকটা কাপড় শুকোচ্ছে। উঠোনের ওপাশে কাছারি-ঘর। অবশ্য এখন আর নায়েব গোমস্তা কেউ নেই। ওখানে এখন মদনকাকা থাকে। কাছারি-ঘর ছাড়িয়ে একটা বাগানের মতো আছে। তারপর ভাঙা দেউড়ি।

এ বাড়ির মধ্যে এখনও একশো বছরের পুরনো বাতাস। এখনও তাদের ছায়া-ছায়া ঘরগুলোতে গুনগুন করে বেড়ায় কত ইতিহাস। দেয়ালে দেয়ালে এখনও সোনালি ধাতব ফ্রেমে বাঁধানো অয়েল পেন্টিং। তাদের পূর্বপুরুষেরা ছবির চোখ মেলে চিত্রার্পিত চেয়ে থাকে।

ঘুরে দাঁড়ালেই দেখা যাবে দেয়ালে আঠা দিয়ে সাঁটা লেনিনের একখানা ছবি। ধুলোটে ময়লা পড়েছে ছবিতে, বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবু মা কখনও ওই ছবি খুলতে দেয়নি কাউকে। ছবিটা লাগিয়েছিল বন্দনার দাদা প্রদীপ। দাদা আর নেই।

আজ হেমন্তের এই সকালে বন্দনা টের পাচ্ছে, তার চারদিককার আবহে একটা চোরা আনন্দের স্রোত। কেন ? সে কি অসুখ থেকে উঠেছে বলে ?

বন্দনা লেনিনের ছবিটার দিকে চেয়ে রইল। ওই ছবিটার দিকে তাকালে তার দাদার কথা মনে পড়ে। একটু কষ্ট হয়।

ঘর থেকে মা ডাকল, বন্দনা, কোথায় গেলি দুর্বল শরীরে ?

এই তো মা আমি ! বারান্দায়।

তার ফর্সা গোলগাল মা বেরিয়ে এল বারান্দায়, ওমা, তুই উঠে এসেছিস ?

আজকের দিনটা কী ভাল, না মা ?

আয় ফলের রস এনেছি।

এখানে এনে দাও।

ফলের রস বন্দনার ভাল লাগে না। তার কিছুই খেতে ভাল লাগে না। মায়ের ভয়ে খায়। তার মা দুঃখী মানুষ।

কিন্তু আজ দুঃখের দিন নয়। কী সুন্দর একটা দিন যে বন্দনাকে উপহার দিয়েছে এই পৃথিবী। আজ যেন স্বপ্নের আলো, স্বপ্নের বাতাস। আজ যেন কিছুই সত্যি নয়, সব রূপকথা।

সাদা পাথরের ভারী গেলাসে চুমুক দিয়ে সে ফলের রসেও একটা আলাদা স্বাদ পেয়ে গেল। ছোট্ট ছোট্ট তিনটে চুমুকের পর সে মুখ তুলে বলল, আজ আমগাছ তলায় একটু বসব মা ?

মা তার দিকে চেয়ে বলে, আজ থাক না। দোতলা একতলা করতে কষ্ট হবে।

না মা, কষ্ট হবে না। কতদিন ঘরে পড়ে আছি বলো তো !

তা হলে দাঁড়া, বাহাদুরকে বলি ইজিচেয়ারটা পেতে দিতে।

একটু সাজবে কি বন্দনা ? আজ যেন কয়েদখানা থেকে মুক্তি। অসুখের চেয়ে খারাপ কয়েদখানা আর কী আছে ?

আয়নার সামনে নিজের পাঁশুটে চেহারাটার মুখোমুখি ফের দাঁড়ায় সে। খড়ি-ওঠা মুখে একটু ক্রিম ঘসতেই মুখের রুগ্ণতার রেখাগুলি ফুটে উঠল ভীষণ। কেন যে সে এত রোগা ! এই শরীরে অসুখ হলে শরীর যেন হাওয়ায় নুয়ে পড়তে চায়।

এ শরীরে রং-চং মানাবে না বলে খুব হালকা গোলাপি রঙের একটা তাঁতের শাড়ি পরে নিল

সে। চুল আঁচড়াল। তারপর পশমের টমেটো রঙা শালটা জড়িয়ে ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড হলঘর পেরিয়ে দরদালানে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল সে। পাথরে বাঁধানো চওড়া সিঁড়ি, লোহার কারুকাজ করা রেলিং। আজ মনে হচ্ছে, কতদূর নেমে গেছে সিঁড়ি, সে কি পারবে এত সিঁড়ি ভাঙতে ? মাঝ-সিঁড়ির চাতালে মস্ত শার্সি দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে। বাইরের আলোয় যেন নেমন্তন্নের চিঠি। এসো, এসো, আজ তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। আজ তোমার দিন।

পিছনের বাগানে কিছু পরিচর্যা আছে। বুড়ো মালি গোপাল এখন থুত্থুড়ে হয়ে গেছে। তার বাঁকা কোমর সোজা হতে চায় না, হাত কাঁপে, কানে শুনতে পায় না, চোখেও ছানি। তবু সে পিছনে একটুখানি জায়গায় মায়ের পুজোর জন্য ফুল ফোটায়। বাকি অনেকটা জমি ফাঁকা পড়ে আছে, আগাছা আর ঘাসের জঙ্গল। ঘের-দেয়াল দু জায়গায় ভেঙে গেছে বলে আজকাল গোরু মোষ ঢোকে, চলে আসে পথবাসী কুকুর। গোপালের বাগানের জন্য ছোট্ট একটু চৌখুপি জায়গা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে মা। এর বেশি গোপাল আর পারে না।

সেই চৌখুপি জায়গার মুখোমুখি পুরনো আমগাছের ছায়ায় ইজিচেয়ার পাতা হয়েছে।

উৎসবের বাড়িতে গেলে যেমন সবাই আসুন বসুন করে আজ বন্দনা বাইরে পা দেওয়ামাত্র যেন নিঃশব্দে চারদিকে একটা অভ্যর্থনা হতে লাগল তার। খোলা বাতাস তার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল। রোদ জাপটে ধরল তাকে আদরে। কতদিন পর তার এই একটুখানি বাইরে আসা।

এ তার আজন্ম চেনা বাগান, চেনা গাছ। এই বাড়ির মতো এত প্রিয় জায়গা এ পৃথিবীতে কোথাও নেই তার। এ বাড়ি ছেড়ে সে কোনওদিন কোথাও যেতে পারবে বলে মনে হয় না। কত মায়ায় যে মেখে আছে বাড়িটা। মেঘলা দিন বা গ্রীষ্মের দুপুরে, শীতের সন্ধে বা নিশুত রাতে এ বাড়িটা নানারকম রূপ ধরে।

বাড়িটা অবশ্য এখন আর সুন্দর নেই। ছাদের গম্বুজগুলো ভেঙে পড়ে গেছে, নোনা আর শ্যাওলা ধরেছে দেয়ালে, অশ্বত্থের চারা উঁকি দিচ্ছে এখানে সেখানে। কতকাল মেরামত হয়নি, কলি ফেরানো হয়নি। তবু আজও এই গম্ভীর বাড়ি চারদিকটাকে যেন শাসনে রাখে। লোকে এখনও ভক্তি শ্রদ্ধা করে এসব বাড়িকে। মলি বলে, তোদের বাড়িটা ফিউডাল হলেও বেশ কমফোর্টেবল। স্পেস একটা মস্ত বড় ফ্যাক্টর। আমাদের বাড়িতে স্পেস নেই বলেই যত গণ্ডগোল। যত ঘেঁষাঘেষি হবে, মানুষে মানুষে, তত বেশি ক্ল্যাশ হবে, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারবে না। স্পেস একটা মস্ত বড় সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর। সেদিক দিয়ে তোদের বাড়িটা দারুণ ভাল। বিগ হাউস, বিগ স্পেস, আইসোলেশন। গুড। ভেরি গুড। আমি ছেলেবেলা থেকে একটা আলাদা ঘরে একা থাকার স্বপ্ন দেখি। কী রকম ক্রাউডেড বাড়িতে আমরা থাকি বল তো। ওরকমভাবে থাকলে মানুষের ইমাজিনেশন মরে যায়, গুড কোয়ালিটিজ নষ্ট হয়ে যায়, সবচেয়ে বেশি হয় মেন্টাল ডিস্ট্যাবিলাইজেশন।

বন্দনা কথাটা কি স্বীকার করে ? সে কখনও মলির মতো ক্রাউডেড বাড়িতে থাকেনি। তাদের বাড়িতে মানুষ খুব কম। তবু এ বাড়িতে কি অশান্তির অভাব ? এই চুপচাপ বাড়ির ভিতরেও নিঃশব্দে ছিঁড়ে যায় কত বাঁধন, নিশুত রাতে কত চোখের জলে ভিজে যায় বালিশ, বুকের ভিতর কত তুষের আগুন জেগে থাকে ধিকিধিকি। এই গম্ভীর শান্ত বাড়ির বাইরে থেকে কি তা বোঝা যায় ?

আজ দুঃখের দিন নয়। আজ এই রোদে হাওয়ায় বসে থাকতে বন্দনার কী ভালই না লাগছে, উড়ে যাচ্ছে দিন। নীল আকাশে সাদা হাঁসের মতো ভেসে যাচ্ছে হালকা পাখায়। আনন্দে দম নিতে মাঝে মাঝে কষ্ট হচ্ছে তার। বুকের ভিতরটা ডগমগ করছে। এমন দিনে কি দুঃখের কথা ভাবতে হয়।

বাহাদুর দুধের গেলাস নিয়ে এল।

টক করে খেয়ে নাও তো খুকুমণি।

কাচের গেলাসে সাদা দুধ, ওপরে আর নীচে দুটো চিনেমাটির প্লেট—দৃশ্যটা দেখলেই বন্দনার জিব থেকে পেট অবধি বিস্বাদে ভরে যায়। দুধের চেয়ে খারাপ জিনিস পৃথিবীতে আর কী আছে ? তবু রোজ খেতে হয়।

বাহাদুর তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসে, নাক টিপে খেয়ে নাও। হারা দিব।

আগে দাও। বলে হাতখানা পাতে বন্দনা।

মা ওপর থেকে দেখছে কিন্তু। বলে বাহাদুর বাঁ হাতে গেলাসটা ধরে ডান হাতে গায়ের খাটো হাতাহীন মোটা কাপড়ের সবুজ জামার ঝুল-পকেট থেকে কয়েকটা ভাজা কচি হত্তুকি বের করে তার হাতে দিল।

খেজুরের বিচির মতো সরু আর ছোট এই হত্তুকি বালিতে ভেজে কৌটোয় ভরে, দেশ থেকে নিয়ে আসে বাহাদুর। খেতে যে খুব ভাল লাগে বন্দনার তা নয়। কিন্তু বিস্বাদ কিছু খাওয়ার পর হারা চিবোলে মুখ পরিষ্কার হয়ে যায়। মুচমুচে কষ-কষ জিনিসটার ওই একটা উপকার আছে।

কোনও কিছুই সে তাড়াতাড়ি খেতে পারে না। আস্তে খায়, অনিচ্ছের সঙ্গে খায়। বাহাদুর সামনে উবু হয়ে বসে বলল, আজও জোর মারপিট লাগবে।

কার সঙ্গে ?

বাবুর সঙ্গে ল্যাংড়ার। দোকান পসার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সকালে বাজারে গিয়ে শুনে এলাম।

আজ মারপিট হবে ? কেন মারপিট হবে আজ ? এমন সুন্দর একটা দিনে কোনও খারাপ ঘটনা কি ঘটতে পারে ? রোদে হাওয়ায় এই যে উজ্জ্বল একটা ভাল দিন এল আজ, এ কি বৃথা হয়ে যাবে ?

তাদের বাড়ির পিছনের দিকে দেয়ালের ওপাশে ভীষণ নোংরা একটা গরিব পাড়া আছে। শোনা যায় তারা একসময়ে এ বাড়ির প্রজা ছিল। ঘিঞ্জি অলিগলি আর খাপরা বা টালির ঘর, দু-চারটে পাকা বাড়ি, কাঁচা নর্দমা, মাইকের আওয়াজ আর ঝগড়া—এই সব নিয়ে ওই পাড়া। ওখানেই ল্যাংড়া নামে খোঁড়া একটা ছেলে থাকে। ভীষণ গুণ্ডা। আর বাবু হল সুবিমল স্যারের দলের ছেলে। সেও গুণ্ডা, তবে লেখাপড়া জানে। সে দক্ষিণের পাড়ায় থাকে। তার বাবা পঞ্চানন সেন দুঁদে উকিল। বন্দনার বোকা দাদা প্রদীপ সুবিমল স্যার আর বাবুর পাল্লায় পড়েই পলিটিক্স করতে গিয়েছিল।

ভাজা হত্তুকি খাওয়ার পর জল খেলে জিবটা মিষ্টি মিষ্টি লাগে। কিন্তু বাহাদুরকে এখন জলের কথা বলার মানেই হয় না। বাহাদুর একটু তফাতে ঘাসের ওপর আঁট করে বসেছে।

ল্যাংড়া শালা গত সপ্তাহে দুটো পাম্প মেশিন চুরি করে এনেছে। তোলা তুলছে। কোমরে আজকাল রিভলভার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

করুণ গলায় বন্দনা বলল, আজ ওসব কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না বাহাদুর। আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

মাকে বলেছি, পিছনের দেওয়ালটা সারিয়ে নিতে। ল্যাংড়া খচ্চর একদিন ঢুকে ওইখানে জামগাছের তলায় দলবল নিয়ে মদ খাচ্ছিল। তোমার তখন জ্বর।

ও মাগো! কী সাহস!

ও শালার খুব বুকের পাটা।

মদ খাচ্ছিল ? তোমরা কিছু বললে না ?

কে কী বলবে ? আমি গিয়ে বললাম, এখানে ঢুকেছিস কেন ? বলল, তাতে তোর বাবার কী রে শালা ? ফোট। আমি বললাম, হীরেনবাবুকে বলে দিলে তুলে নিয়ে যাবে। তাতে তেড়ে এল। তবে আর বেশিক্ষণ বসেনি।

হীরেনকাকুকে বলেছ নাকি ?

আরে না। পুলিশওলাদের তো জানো। এরও খায়, ওরও খায়। হীরেনবাবু যদি তুলেও নিয়ে যায় ল্যাংড়া একদিন বেরিয়ে আসবেই। তার আগে ওর দলবল হামলা চালাবে। আমাদের কে আছে বলো! ঝুটঝামেলা না করে দেয়ালটা গেঁথে দিলেই হয়। কত টাকারই বা মামলা ?

দুধটার বিস্বাদ আর টের পাচ্ছিল না বন্দনা। তার সুন্দর দিনটা শেষ অবধি ছাই হয়ে যাবে ? তাদের এই স্বপ্নের বাড়ির মধ্যে কি ঢুকে পড়বে ওই বিচ্ছিরি বাইরেটা ? এ বাড়ির মধ্যে তাদের একটা শান্ত, স্নিগ্ধ জগৎ। হয়তো অনেক চোরা-অন্ধকার আছে, তবু বাইরে থেকে এসে বাড়িতে ঢুকলেই একশো-দেড়শো বছরের পুরনো গন্ধ, পুরনো বাতাস, পুরনো আবহের রূপকথা যেন বুকে তুলে নেয়।

বাহাদুর একটু উদাস হয়ে সামনের দিকে চেয়েছিল। পঞ্চাশের ওপরে বয়স। বাড়ি উত্তরপ্রদেশের এক পাহাড়ি গ্রামে। বন্দনার জন্মের আগে থেকেই সে এ বাড়িতে আছে। মাঝে মাঝে দেশে যায়। তার খুব ইচ্ছে,গোরু আর মোষ কিনে দুধের ব্যবসা করে। কিন্তু তত টাকা আজও জমাতে পারেনি। তার দেশে বড় টানাটানি।

দুধটা শেষ করে গেলাসটা ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখল বন্দনা।

তোমার দেশের গল্প করো না বাহাদুর।

এখন নয়। কাজ আছে। রাতে হবে।

গল্প কিছুই নয়। একটা পাহাড়ি গ্রাম, পাশে একটা ঝরনা বয়ে গেছে। সেখানে ছাগল চরে বেড়ায়, মকাই ধান গম হয়। গরিব লোকেরা কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকে। এই হল গল্প। তবু বন্দনা যেন গ্রামটা স্পষ্ট দেখতে পায়। পাথর গেঁথে তোলা ঘর, ওপরে টিন বা টালির ছাউনি। নিরিবিলি, নিশ্চুপ, তার মধ্যেই হয়তো একটা মোরগ ডেকে ওঠে। পাখিরা কলরব করে উড়ে যায়। ঝরনায় জল খেতে আসে ভীরু পায়ে হরিণেরা। গম পেষাইয়ের শব্দ ওঠে জাঁতায়। ফুল ফোটে। হাওয়া বয়। সন্ধের পর শীতের রাতে আগুন ঘিরে বসে গল্প করে গাঁয়ের লোকেরা। সেই গাঁয়ে কোনও বাইরের লোক যায় না। শুধু তারা থাকে তাদের নিয়েই। এই গাঁয়ের তেমন কোনও লোমহর্ষক গল্পও নেই। বাহাদুর শুধু মন্থর গলায় দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে যায়। বন্দনার কী যে ভাল লাগে!

বন্দনার খুব ইচ্ছে করে একটা পাহাড়ি গাঁয়ে গিয়ে থাকে। বন্দনা তেমন কোথাও যায়নি কখনও। পাহাড়ে খুব কম। একবার দার্জিলিং গিয়েছিল। তখন থেকে পাহাড়ের কথা তার খুব মনে হয়।

বাবা একটু ঘরকুনো মানুষ ছিল বলে তাদের কোথাও তেমন বেড়াতে যাওয়া হয়নি। শুধু ঘরকুনো নয়, ভীষণ ভিতুও। বাবা মেঘনাদ চৌধুরির নামটা যেমন বীরত্বব্যঞ্জক, স্বভাবটা ঠিক তার উল্টো। তবে বাবা একজন কবির মতো মানুষ। দুখানি মায়াবী চোখ দিয়ে অবিরল বিশ্রী পৃথিবীর ওপর নানা কল্পনার ছবি এঁকে যেত। বন্দনা ছিল বাবার প্রাণ। পৃথিবীতে এত ভালবাসা কি আর হয়? বন্দনা বাবাকে কত ভালবাসত?

বাবা জিজ্ঞেস করলে বন্দনা বলত, আকাশের মতো।

বাবার সঙ্গে খাওয়া, বাবার বুক ঘেঁসে শোওয়া, বাবার সঙ্গে সর্বক্ষণ। গায়ের গন্ধটা অবধি কী মিষ্টিই না লাগত! কত কী ভুলে যেত বাবা! গায়ে উল্টো গেঞ্জি, দু পায়ে দুরকম চটি, নুন আনতে বললে চিনি আনা। বাবার ভুলের গল্পের শেষ নেই। একজন কবির মতো মানুষ। অন্যমনস্ক, মাথায় চিন্তা এবং দুশ্চিন্তার বাসা, মুখে সবসময়ে একটা অপ্রস্তুত হাসি। বাবার ফুলের বাগানের শখ ছিল, আর গানের। কোনওটাই বাবা নিজে পারত না। কিন্তু বাবার সময়ে পিছনের বিস্তৃত বাগানে হাজারো রকমের ফুলের চাষ হত, আর মাঝে মাঝে গায়ক গায়িকাকে ডেকে এনে ছোট্ট গানের আসর বসাত। বেশির ভাগই রবীন্দ্রসঙ্গীত।

বাবার কোলের কাছটিতে বসে মুগ্ধ হয়ে গান শুনতে শুনতেই একদিন তার ভিতরকার ঘুমন্ত সুর গুনগুন করে জেগে উঠেছিল।

আগের দিন সন্ধেবেলা বাবুপাড়ার মণিকাদি গান গেয়ে গেছেন, একটা গান কিছুতেই ছাড়ছিল না বন্দনাকে। রাতে ঘুমের মধ্যেও গানটা হয়েছিল তার বুকের মধ্যে। গোধুলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা। সবচেয়ে ভাল লাগত, চেয়েছিনু যবে মুখে তোলো নাই আঁখি, আঁধারে নীরব ব্যথা দিয়েছিল ঢাকি....

পরদিন সকালে ইস্কুলে যাওয়ার আগে স্নান করবে বলে মাথায় তেল ঘসতে ঘসতে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গাইছিল বন্দনা।

বাবা পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, মাগো, তোমার গলায় যে সরস্বতী ভর করে আছেন!

সেদিনই মণিকাদির কাছে নিয়ে গেল বাবা, মণিকা, তুমি ওকে শেখাও। মাত্র আট বছর বয়স, পারবে।

বন্দনা পেরেছিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে স্কুলের ফাংশনের বাঁধা গায়িকা। নানা ছোটখাটো অনুষ্ঠানে ডাক আসতে লাগল। বাবা নিয়ে যেতে লাগল নানা জায়গায়। রেডিয়োর শিশুমহলে গেয়ে এল একবার।

সেই থেকে গানে গানে ভরে উঠতে লাগল জীবন। গানের হ্যাপাও ছিল কম নয়। তেরো বছর বয়সেই বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল মধুবাবুর বাড়ি থেকে। ছেলে ডাক্তারি পড়ে। প্রেমপত্র আসতে লাগল অনেক। রাস্তায়-ঘাটে ছেলেদের চোখ তাকে গিলে খেতে লাগল। সে এমন কিছু সুন্দরী নয়, তবুও। সে এদের কারও প্রেমে পড়েনি কখনও। কিন্তু কেন যে একজনের কথা ভাবলেই আজও তার ভিতরটা আলো হয়ে যায়। অথচ সে তো গরিব এক পুরুতের ছেলে। তার বেশি কিছু নয়। শিশুকালে সে একবার পুতুলের বিয়ের নেমন্তন্নে ডেকে অতীশকে বলেছিল, তোমার সঙ্গেই তো আমার বিয়ে হবে, না অতীশদা ?

অতীশ জিভ কেটে বলেছিল, তাই হয় খুকি ? তোমরা আমাদের অন্নদাতা। মনিব।

প্রেমপত্র পেলেই ছুট্টে এসে চিঠিটা বাবাকে দিত বন্দনা, দেখ বাবা কী সব লিখেছে !

দু-একটা চিঠিতে অসভ্য কথা থাকত বটে, কিন্তু বেশির ভাগই ছিল আবেগের কথায় ভরা। আবেগের চোটে বানানের ঠিক থাকত না, বাক্যেও নানা গণ্ডগোল থেকে যেত। বাবা আবার সেগুলো লাল কালিতে কারেকশন করে নিজের কাছে রেখে দিত।

সবচেয়ে ভাল চিঠিটা লিখেছিল বিকু। তাতে ইংরিজিতে একটা কথা লেখা ছিল, লাভার্স অ্যাট ফার্স্ট সাইট, ইন লাভ ফরএভার। পরে বন্দনা জানতে পেরেছে ওটা ফ্রাঙ্ক সিনাট্রার একটা বিখ্যাত গানের লাইন।

এইসব চিঠিপত্র নিয়ে বাবার সঙ্গে তার আলোচনা এবং হাসাহাসি হত। বাবা বলত আমার তিনটে স্টাম্প। তিনটেকেই গার্ড দিয়ে খেলতে হয়। তুই হচ্ছিস আমার মিডল স্টাম্প। সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট।

মিডল স্টাম্পই বটে। দাদা আর ভাইয়ের মাঝখানে সে। তার ওপর সে আবার মেয়ে। বাবার চোখের মণি। বুকের ধন।

সন্ধেবেলা ঘুমিয়ে পড়া ছিল তার দোষ। ছিল কেন, আজও আছে। কেউ তুলতে পারত না খাওয়ার সময়ে। বাবা এসে তুলত, বুকের ধন, বুকের ধন, ওঠো।

ঘুমচোখে তুলে বাবা নিজের হাতে গরাস মেখে খাইয়ে দিত। বাবার হাতে ছিল মায়া। সেই হাতের গরাসটা অবধি স্বাদে ভরে থাকত।

কোম্পানির কাগজ, শেয়ার আর ডিভিডেন্ড এসব কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে বন্দনা। আসলে এই তিনটে শব্দ থেকেই তাদের ভাতকাপড়ের জোগাড় হত। মেঘনাদ চৌধুরীর কোম্পানির কাগজ ছিল। অর্থাৎ শেয়ার। আর ফাটকা খেলার নেশাও ছিল। চাকরি করেনি কখনও। আজও তাদের চলে ওই কোম্পানির কাগজে। অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে আরও। আরও।

বিজু একবার বলেছিল, তোদের বাড়ির দেওয়ালগুলো অত মোটা মোটা কেন বল তো ? শুনেছি রাজা জমিদাররা আগের দিনে শত্রুদের মেরে দেওয়ালে গেঁথে ফেলত। তাই নাকি ?

বন্দনা খুব হেসেছিল।

ফচকে মেয়ে বিজু বলল, যদি তা না হয় তবে নিশ্চয়ই দেওয়ালের ভিতরে গুপ্তধন আছে।

আহা ! তা যদি হত ! দেওয়াল ভাঙলেই যদি ঝরঝর করে ঝরে পড়ত মোহর !

মায়ের কাছে আজকাল কিছু চায় না বন্দনা। চাইলেই মায়ের মুখখানা শুকিয়ে যায়। বন্দনা চায় না, কিন্তু বিলু চায়। ফুটবল খেলার বুট, সাইকেল, এয়ারগান, দামি কলম, প্যান্ট বা শার্ট। বিলু তো মায়ের মুখ লক্ষ করে না। তার তত সময় নেই। সে হুট করে আসে, হুট করে বেরিয়ে যায়। এখন বাইরের জগৎ তাকে অনেক বেশি টানে।

দাদাকেও টেনেছিল। প্রদীপ একটু বোকা ছিল। আর খুব গোঁয়ার। পঞ্চানন সেনের ছেলে বাবু ছিল ওর খুব কাছের লোক। পঞ্চানন সেনের মেল্লা টাকা আর মেলা ছেলেপুলে। বাবু বোধহয় তাঁর সাত নম্বর সন্তান। বেশ ভদ্র চেহারা, কথাবার্তায় প্রবল আত্মবিশ্বাস, কিন্তু অহঙ্কার নেই। বাবু

মানুষের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করে না। কিন্তু প্রয়োজন হলে রুদ্রমূর্তি ধরে তাণ্ডব লাগিয়ে দিতে পারে। বাবু ছিল প্রদীপের হিরো। ছেলেবেলা থেকে সে বাবুর সাগরেদি করে এসেছে।

বাবুর হিরো হলেন সুবিমল স্যার। তাঁর কথায় গোটা এলাকা ওঠে বসে। সুবিমল স্যার একেবারে সাধুসন্নিসির মতো মানুষ। তাঁর ধ্যানজ্ঞান হল পার্টি। বিয়ে করেননি, পৈতৃক বাড়ির বাইরের দিককার একখানা ছোট্ট ঘরে ছোট্ট একটা তক্তপোশে দিনরাত বসে থাকেন। সামনে বিড়ির বাণ্ডিল, দেশলাই আর ছাই বা বিড়ির টুকরো ফেলার জন্য মাটির ভাঁড়। গাদা গাদা কাগজপত্র চারদিকে ছড়ানো। ঘরে সর্বদাই পার্টির ছেলে ছোকরাদের ভিড়। ঘড়ি ঘড়ি চা আসে সেখানে। দু বেলা দু মুঠো খাওয়া ছাড়া ভিতর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। অথচ ভিতর বাড়িতে ভরভরন্ত সংসার। দুই ভাই, ভাইয়ের বউ এবং ছেলেমেয়েরা, সুবিমল স্যারের মা এখনও বেঁচে। সুবিমল স্যারও হিরো, তবে অন্য ধরনের। তাঁর ত্যাগ, তিতিক্ষা, সরল জীবন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—এরও কি ভক্ত নেই ? সুবিমল স্যারের অনেক ভক্ত। তিনি কলেজের পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রফেসর। ক্লাস খুব কমই নেন। সবাই সমীহ করে চলে।

প্রদীপ বাবুর সঙ্গে সেখানে গিয়ে জুটল। যারা নেতা হতে পারে না তারা নেতাদের খিদমদগার হয়। প্রদীপ ছিল তাই। বোকা ছিল বলে তার পড়াশুনোয় উন্নতি হয়নি। রাজনীতিতেও নয়। সে পার্টির আদর্শ ভাল করে বুঝতও না। সে শুধু ছিল বাবু আর সুবিমল স্যারের অন্ধ ভক্ত। ও বাড়িতেই পড়ে থাকত বেশির ভাগ সময়। চা এনে দিত, পোস্টার লিখত, ইস্তাহার বিলি করত আর বিপ্লব-বিপ্লব করে মাথা গরম করত। ইলেকশন ক্যাম্পেনের সময় প্রদীপ রাত জেগে দেওয়ালে লিখছিল। নির্দোষ কাজ। মাঝরাতে বিপক্ষের ছেলেরা এসে দেওয়ালের দখল নিয়ে ঝগড়া বাধায়। তারপর হাতাহাতি মারপিট। তার জের চলল দু-তিন দিন ধরে। দ্বিতীয় দিন রাতে সুবিমল স্যারের বাড়ি থেকে গভীর রাতে ফেরার সময় রথতলার মোড়ে তাদের বিপক্ষের দল ঘিরে ফেলল। গোলমালে অন্যগুলো পালাল, বোকা প্রদীপ পারল না। বুকে ছোরা খেয়ে মরে গেল। না, একজন পালায়নি। সে হল অতীশ। প্রদীপকে বাঁচাতে পারেনি বটে, কিন্তু ছিল।

মৃত্যু যে এত সহজ তা জানাই ছিল না বন্দনার। এই জানল। পরদিন ওই জায়গাটায় শহিদ বেদি তৈরি হল। লেখা হল কমরেড প্রদীপ চৌধুরি অমর রহে। পার্টির ছেলেবা এসে বাবাকে কত সান্ত্বনা দিল।

বাবার অফস্টাম্প উপড়ে গেল সেদিন। কবির মতো মানুষটির টানা টানা মায়াবী দুখানি চোখে পৃথিবীর সব স্বপ্নের রং মুছে গেল। এ যে কঠোর বাস্তব ! এ যে রক্তে রাঙা ধুলোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা নিজের সন্তান। দিশেহারা বাবা কেবল ছোটাছুটি করতে লাগল। ঘরে, বারান্দায়, রাস্তায়, এর ওর তার বাড়ি। একবার বন্দুক নিয়েও বেরিয়ে পড়েছিল। মা কয়েকদিনের জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। বন্দনা আর বিলু এত ভয় আর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল যে, তারা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল।

শহিদ বেদিটা আর নেই। ইট আর সিমেন্টের কাঁচা বেদি কবেই লোপাট হয়ে গেছে। প্রদীপ নেই, মানুষের মনে তার স্মৃতিও নেই। শুধু এ বাড়িতে কয়েকজন মানুষের কাছে প্রদীপ আজও বেঁচে আছে স্মৃতি হয়ে।

মাকে প্রথম দুঃখটা দিয়ে গেল দাদা। এ বাড়িতে বন্দনার জন্মের পর প্রথম শোক। তার আশ্চর্য অভিঘাত এবং প্রতিক্রিয়া যেন ঝনঝন করে বাজত তাদের অস্তিত্বে।

প্রদীপের মৃত্যুর পর হীরেনবাবুর যাতায়াত শুরু হয়। এনকোয়ারি। এনকোয়ারির পর এনকোয়ারি। বুলু নামে একটা ছেলে প্রদীপকে মেরেছিল। সে ফেরার হয়ে যায়। মাঝখানে শুধু জেরার জবাব দিতে দিতে হাঁপিয়ে গেল তারা। বুলু ধরা পড়ল না। লোকে বলত, পুলিশ ওকে ধরবেই না। সাঁট আছে।

বুলু ছেলেটা যে কে তা আজও জানে না বন্দনা। শুনেছে, সে একটা বস্তিবাসী ছেলে। মস্তান। তার বাপের একটা তেলেভাজার দোকান আছে বাজারে। আসলে সেখানে দেশি মদের সঙ্গে খাওয়ার জন্য চাট তৈরি হয়। শুধু বাহাদুর মদ খায় বলে দোকানটা চেনে।

হীরেনবাবু বাপটাকে অ্যারেস্ট করেছিল। পরে ছেড়ে দেয়। তার তো কোনও দোষ ছিল না।
মাকে দ্বিতীয় দুঃখটা দিল বাবা। প্রদীপের মৃত্যুর দুবছর বাদে যখন শোকটা তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, যখন বাবার চোখে মায়াবী দৃষ্টিটা ফের ফিরে এসেছে এবং মা যখন সংসারের কাজে মন দিয়েছে ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল। পৃথিবীতে কতই না আশ্চর্য ঘটনা ঘটে !
রমা মাসি তার মায়ের আপন পিসতুতো বোন। অন্তত পনেরো ষোলো বছরের ছোট । দেখতে ভারী মিষ্টি। ডান চোখের নীচে একটা জরুল থাকায় মুখখানা যেন আরও সুন্দর দেখাত। রংটা চাপা ছিল বটে, কিন্তু রমাকে কেন যেন ওই রংই মানাত।
বিশু কবিরাজ হাঁপানির ওষুধ দেয়। খুব নাম। রমা মাসির হাঁপানি সারাতে মধ্যপ্রদেশ থেকে তার মা তাকে পাঠিয়েছিল এখানে। সেই সূত্রে রমা এ বাড়িতে দু মাস ছিল।
কবে কী হয়েছিল কে বলবে ? এই প্রকাণ্ড বাড়ির আনাচে কানাচে কবে যে বাবার সঙ্গে রমা মাসির হৃদয় বিনিময় হল ! বন্দনা অন্তত জানে না।
দুজনে অবশ্য ঠাট্টা-ইয়ার্কি হত খুব। খাওয়ার টেবিলে, বাগানে। মাঝে মাঝে সিনেমায় যাওয়া হত সবাই একসঙ্গে। যেমন সব হয়।
একদিন গভীর রাতে ঘুমচোখে বন্দনা শুনেছিল মা আর বাবাতে কথা হচ্ছে।
মা বলল, কথাটার জবাব দেবে ? না কি ?
একথার কি জবাব হয় ?
তার মানে মনে পাপ আছে।
পাপের কথা বলছ কেন ? তোমার মনেই পাপ আছে।
আমি কি ভুল দেখেছি ?
ভুল ছাড়া কী ? তোমাকে সন্দেহ বাইতে ধরেছে।
সন্দেহ ?
সন্দেহ ছাড়া কী ?
আমার চোখে তো ছানি পড়েনি ! তুমি অন্ধকারে বারান্দায় ওর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিলে। খুব ঘেঁসে। তখন আমার নীচের তলায় রান্নাঘরে থাকার কথা। বন্দনা মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছিল। বিলু ফেরেনি। ঠিক বলছি ?
একবার তো বললে। শুনেছি।
তুমি তো ভাবনি যে, আমি এসে পড়ব !
এলে তো কী হল ? আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, হাওয়া খাচ্ছিলাম। ও এসে পাশে দাঁড়াল। গল্প করছিলাম।
তা বলে অত ঘেঁসে ?
তাতে কী ? অন্ধকারে যত ঘেঁসে মনে হয়েছে ততটা নয়। তফাত ছিল। তুমি কি আমাকে চরিত্রহীন মনে করো ?
আগে তো কখনও করিনি।
মেয়েদের ওইটেই দোষ। স্বামীদের অকারণে সন্দেহ করে। বাবা একটু হাসবার চেষ্টা করেছিল এসময়ে। হাসিটা ফোটেনি।
মা একটু চুপ করে থেকে বলল, ওকে আমি চিনি, ঢলানি মেয়ে। পুরুষ-চাটা। তা বলে তুমি তো আর সস্তা নও। হেসে উড়িয়ে দিয়ো না। তুমি কালই ওর ফেরত যাওয়ার টিকিট কিনে এনো। ওকে আর এখানে রাখব না।
তাই হবে।
সারা রাত বারবার ঘুম চটে গেল বন্দনার। বুকের মধ্যে একটা ভয়-ভয়, একটা ব্যথা, একটা অস্বস্তি। বাবা আর মায়ের মধ্যে ঝগড়াঝাটি খুব কম হয়। মা শান্ত ও সংসারমুখী মানুষ, বাবা উদাসীন ও অন্যমনস্ক। মা যদিও বা কখনও কখনও ঝগড়া করে বাবা একদমই নয়। ফলে ঝগড়া হয় না, একতরফা হয়ে যায়।

সেই রাতে মা বাবার ওইসব কথাবার্তার পর কেউই এসে আর প্রকাণ্ড পালঙ্কের বিছানায় শুল না ! মা আর বাবার মাঝখানে শোয় বন্দনা, বাবার দিকে একটু বেশি ঘেঁসে। সেই রাতে বাকি রাতটুকু একাই শুয়ে থাকল সে। একা লাগছিল, ফাঁকা লাগছিল, কান্না পাচ্ছিল। রমা মাসিকে মনে হচ্ছিল, রাক্ষুসি। কেন এল এ-বাড়িতে ? না এলেই তো ভাল ছিল !

অথচ আশ্চর্য এই, সেই রাতের আগে অবধি রমা মাসির মতো এমন চমৎকার বন্ধু আর পায়নি বন্দনা। গল্পে, গানে, খুনসুটি আর হাসিতে তাদের দুজনের চমৎকার সময় কাটত। সকালে উঠেই সে গিয়ে পুবের ঘরে রমা মাসির বিছানায় ঢুকে যেত। ভোরবেলা শুয়ে শুয়েই কত গল্প হত। স্কুলের সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময়টা দুজনে সব সময় লেগে লেগে থাকত।

রমা মাসির বুকের ভিতরে একটা সাঁই সাঁই শব্দ হত প্রায় সবসময়। কখনও মৃদু, কখনও জোরালো। গ্রীষ্মকালেও গলায় কম্ফর্টার। ঠাণ্ডা জল ছুঁতেই পারত না। পায়ে বারো মাস মোজা। মুখখানায় একটা করুণ ভাব থাকত সবসময়ে।

বিশু কবিরাজ চিকিৎসা শুরু করার পর রমা মাসির হাঁপের রোগ অনেকটা কমে গিয়েছিল। চেহারার উন্নতি হয়েছিল অনেক। রমা মাসির গানের গলাখানা ছিল চমৎকার। কিন্তু হাঁপানির জন্য গাইতে পারত না। টান কমে যাওয়ার পর এক একদিন গাইত। কী সুরেলা গলা !

মা আর বাবাতে যে রাতে ওইসব কথা হল তার পর দিন সকালে বন্দনা রোজকার মতো মাসির কাছে গেল না। তার চোখে সেই সকালে ছিল অন্ধকার। মটকা মেরে অনেকক্ষণ পড়ে রইল বিছানায়। বেশ বেলা অবধি। কেউ তাকে ডাকতে এল না।

আটটার সময় এল রমা মাসি।

ওমা ! তুই এখনও শুয়ে আছিস ? কেন রে ? শরীর খারাপ নাকি ?

রমার করুণ মুখের দিকে চেয়ে সে কিছুতেই ভাবতে পারল না যে, এ একটা রাক্ষুসি। রমা মাসির অসহায় মুখখানা দেখলেই এমন মায়া হয় !

রমা মাসি তার পাশটিতে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ওঠ। অনেক বেলা হয়েছে।

মাসি, তুমি কবে ফিরে যাবে ?

রমা একটু চুপ করে থেকে বলল, এবার যাব। অনেকটা তো ভাল হয়ে গেছি। কেন বল তো ! আমি গেলে তোর মন খারাপ লাগবে, না ?

হ্যাঁ মাসি। তবে তোমারও তো মা-বাবার জন্য মন কেমন করে, তাই না ?

মাসি আবার একটু চুপ করে থেকে বলে, করে।

আমি তো মা-বাবা ছাড়া থাকতেই পারি না।

রমা মাসি করুণ একটু হেসে বলল, সবাই কি তোদের মতো সুখী ? আমাদের কিন্তু তোদের মতো এত ভাব-ভালবাসা নেই।

ওমা ! কেন মাসি ?

আমরা পাঁচ বোন, পাঁচটা গলগ্রহ। আমাদের আদর করবে কে ?

যাঃ, কী যে বলো।

ঠিকই বলি। আমরা পাঁচ বোন কী করে হলাম জানিস ? বাবা ছেলে-ছেলে করে পাগল, প্রত্যেকবার ছেলে চায় আর আমরা একটা একটা করে মেয়ে জন্মাতে থাকি। আমরা হলাম বাবার পাঁচটা হতাশা।

সেই সকালে রমা মাসিকে মন থেকে অপছন্দ করার চেষ্টা করেছিল বন্দনা, কিন্তু ঘেন্নাটা আসতে চাইছিল না।

রমা মাসি তদগত হয়ে জানালার বাইরের দিকে চেয়ে ছলছল চোখ করে বলল, তোদের বাড়িতে কী ভাল আছি বল তো। আমাদের বাড়িতে তো এত আদর নেই। বাবার সামান্য চাকরি। ছোট বাসা। আমরা পাঁচ-পাঁচটা বোন বেড়ে উঠছি। না রে, তোদের মতো আমরা নই। আমাদের মধ্যে ভালবাসা খুব কম। আমার তো একটুও ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।

ব্যগ্র হয়ে বন্দনা বলল, না না মাসি, ওরকম বোলো না। তুমি ফিরে যাও।

রমা হেসে ফেলল। বলল, তাড়াতে চাস নাকি ?

না মাসি, মা বাবাকে ছেড়ে থাকতে নেই। ওঁদেরও নিশ্চয়ই তোমাকে ছেড়ে কষ্ট হচ্ছে !

কে জানে ? কষ্ট কেন হবে ? কষ্টের কী আছে ?

নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি বুঝতে পারছ না।

রমা তবু মাথা নেড়ে বলল, আমাদের সংসার যদি দেখতিস তা হলে ওকথা বলতিস না। আমরা পাঁচটা বোন ধুলোয় পড়ে বড় হয়েছি। আদর কে করবে বল ! মা রোগা-ভোগা মানুষ, বাবা তো উদয়াস্ত ব্যস্ত। তার ওপর প্রায় রাত্রেই দেশি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ফেরে। কী সব অসভ্য গালাগাল করে মাকে। আগে মারধরও করত। আমরাও বাবার হাতে অনেক মার খেয়েছি। এখন মারে না, কিন্তু গালাগাল করে। তুই যেমন সুন্দর বাড়িতে, সুন্দর সংসারে বড় হচ্ছিস, আমাদের ঠিক তার উল্টো।

তোমার বাবা মদ খায় ?

খায়। দুঃখেই খায় হয়তো। অভাব-কষ্টে মাথাটা ঠিক রাখতে পারে না। পাঁচটা মেয়ে এখন গলার কাঁটা। মদ খেলে সেই চাপা দুঃখ আর রাগ বেরিয়ে আসে।

তোমার তো তা হলে খুব কষ্ট মাসি।

সে কষ্টের কথা তুই ভাবতেও পারবি না। আমার একটুও ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না।

তোমাদের পাঁচ বোনে ভাব নেই ?

আছে। আমরা তো সমান দুঃখী, তাই আছে একটু, ঝগড়াও হয় মাঝে মাঝে।

রমার জন্য কষ্ট হওয়ার চেয়ে বন্দনার দুশ্চিন্তাই হয়েছিল বেশি। মাসি যে ফিরে যেতে চাইছে না। যদি ফিরে না যায় তা হলে তো এ বাড়িতে আরও অশান্তি দেখা দেবে।

দুদিন বাদে ফের গভীর রাতে পাশ ফিরতে গিয়ে বাবার স্পর্শ না পেয়ে জেগে গেল বন্দনা। তখন শুনল বারান্দায় মায়ে আর বাবায় কথা হচ্ছে।

মা বলল, তুমি মাঝরাতে উঠে কোথায় যাচ্ছিলে ?

বাবা অবাক হয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছিলাম মানে ? ঘরে গরম লাগছে, ঘুম আসছে না। তাই একটু বারান্দায় এসেছি।

গরম লাগলে তো পাখা খুলে দেওয়া যায়, জানালা ফাঁক করে দেওয়া যায়, উঠে বারান্দায় আসার দরকার ছিল কি ?

বন্দনার বাবা একজন কবির মতো মানুষ। উদাসীন, আনমনা। বাবা কখনও গুছিয়ে বলতে পারে না। সামান্য কারণেই ভীষণ ঘাবড়ে যায়। মায়ের কঠিন শীতল গলায় ওই প্রশ্নের জবাবে বাবা তোতলাতে লাগল, আমি তো একটু খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালাম, কী দোষ হল তাতে ?

খোলা হাওয়ায় দাঁড়ানো না কী সে তুমিই জানো। কোনও দিন তো তোমাকে মাঝরাতে উঠতে দেখি না। গরম তো আগেও পড়ত। আজকাল হঠাৎ মুক্তবায়ুর দরকার বাড়ছে কেন ?

তুমি কি কিছু একটা বলতে চাইছ ?

চাইছি। তোমার মতলবটা কী ?

আমার কোনও মতলব নেই। তুমি আমাকে এত অপমান কোরো না। আমার মরতে ইচ্ছে করছে।

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, পুরুষমানুষকে যে বিশ্বাস করে সে বোকা, আমি ও পাপ বিদেয় করতে চাই। তুমি রমার টিকিট কেটেছ ?

বাবা স্তিমিত গলায় বলল, শুধু টিকিট কাটলেই কি হয় ? সঙ্গে কে যাবে ? মধ্যপ্রদেশ অবধি একটা বয়সের মেয়ে কি একা যেতে পারে ? আগে চলনদার ঠিক করতে হবে।

মা একটু চুপ করে থেকে বলে, বাহাদুর দেশে যেতে চাইছে। ও সঙ্গে যাক। রমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে দেশে চলে যাবে।

ঠিক আছে। বাহাদুরকে বলে রাজি করাও, আমি টিকিটের জোগাড় দেখছি।

কাল থেকে তুমি বন্দনাকে নিয়ে এ ঘরে থাকবে। আমি রাতে রমার ঘরে শোব। ও ঘরে একটা

বাড়তি চৌকি আছে।

বাবা অসহায় গলায় বলল, তোমার যা খুশি করো। সামান্য বারান্দায় আসা নিয়ে যে এত কথা উঠতে পারে জানা ছিল না।

বারান্দায় আসা নিয়ে কথা উঠছে না। বারান্দার ওই কোণে একজন ঢলানি থাকেন। ভাবছি, দুজনে ইশারা ইঙ্গিত হয়ে ছিল কি না।

বাবা শুধু অনুতাপ ভরা গলায় বলল, ছিঃ ছিঃ !

ছিঃ ছিঃ তো আমার বলার কথা।

তুমি বলতে পারছ এসব কথা ? তোমার মন সায় দিচ্ছে ?

নইলে বলছি কী করে ?

এতকাল আমার সঙ্গে ঘর করার পর আমাকে তুমি এই চিনলে ?

ঘটনা ঘটলে তবে তো মানুষকে চেনা যায় ! তোমাকে নতুন করে এই তো চিনছি। নিজের ওপর তোমার কোনও কন্ট্রোল নেই। তোমাকে ভূতে পেয়েছে।

আর বোলো না, আমার বড্ড গ্লানি হচ্ছে।

বাবা কি কেঁদে ফেলল ? গলাটা কেঁপে হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল। তার বাবা একজন কবির মতো মানুষ। বাস্তবজ্ঞানবর্জিত, দুর্বলচিত্ত, ব্যক্তিত্বহীন।

বড্ড কষ্ট হয়েছিল বন্দনার। উঠে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, তুমি কেঁদো না বাবা, তুমি কাঁদলে আমারও যে কান্না পায়।

তারপর মা আর বাবা এসে তার দু পাশে শুয়ে পড়ল। যেন দুটি ঠাণ্ডা পাথর তার দু দিকে। সে যে জেগে আছে তা বুঝতে না দেওয়ার জন্য মড়ার মতো পড়ে রইল বন্দনা। জলতেষ্টা পেয়েছিল, বাথরুম পেয়েছিল, কিন্তু সব চেপে রাখল সে।

পর দিন সকালটা খুব মনে আছে বন্দনার, একটা থমথমে গম্ভীর সকাল। বাবা ঘুম থেকে উঠেই কী একটা ছুতোয় বেরিয়ে গেছে। একটু বেলায় মা একতলার রান্নাঘর থেকে দোতলায় উঠে এল। তখন সামনের বারান্দায় একা চুপ করে বসে ছিল রমা। পাশেই পড়ার ঘরে বন্দনা। বই খুলে খারাপ মন নিয়ে বসে আছে। পড়বার ভান করছে, পড়ছে না। বিলুর সঙ্গে তার ঝগড়া লেগে যায় বলে বিলুর পড়ার ঘর একতলায়। দোতলাটা সুতরাং নিরিবিলি।

মা বারান্দায় গিয়ে পিছন থেকে বলল, রমা, তুই সব গোছগাছ করে রাখিস। দু একদিনের মধ্যেই ফিরে যাবি।

রমা মাসি যেন চমকে উঠে পিছন ফিরে চেয়ে দিদিকে দেখল। মুখখানা ছাইরঙা হয়ে গেল যেন। অবাক গলায় বলল, ফিরে যাব ?

ফিরে যাবি না তো কী ? এখানে কি পাকাপাকিভাবে থাকতে এসেছিস ?

মায়ের গলার চড়া আওয়াজ শুনে রমা আরও একটু অবাক হল। বলল, তা তো বলিনি রেণুদি। ফিরে যাওয়ার কথা আগে বলোনি তো, হঠাৎ বললে বলে বললাম।

হঠাৎ আবার কী ? দু মাস তো হয়ে গেছে। রোগও সেরেছে। এখন এখানে বসে থাকার মানেই হয় না। যা, সব গুছিয়ে-টুছিয়ে নে। তোর জামাইবাবু টিকিট কাটবার ব্যবস্থা করছে।

কার সঙ্গে যাব ?

বাহাদুর তোকে পৌঁছে দিয়ে দেশে যাবে।

বাহাদুর ! বলে চুপ করে রইল রমা।

বাহাদুর পুরনো বিশ্বাসী লোক। তার ওপর ভরসা করা যায়।

আমি থাকলাম বলে তোমাদের বুঝি অসুবিধে হল রেণুদি ?

তা সুবিধে-অসুবিধে তো আছেই।

রমা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সাদা-হয়ে-যাওয়া ঠোঁটে একটু হাসল। বলল, কাল রাতে আমার খুব জ্বর এসেছে রেণুদি। আমার শরীরটা আজ একটুও ভাল নেই। তুমি আজই যেতে বলছ না তো।

কত জ্বর তোর ?
মাপিনি। তবে কাঁপুনি দিয়ে মাঝরাতে জ্বর এল। অনেক জ্বর।
ঠিক আছে। ডাক্তার এসে দেখুক।
ডাক্তার লাগবে না। এরকম জ্বর আমার মাঝে মাঝে হয়। আমার তো পচা শরীর, ঠাণ্ডা লাগলেই বিছানা নিতে হয়। একটু শুয়ে থাকলেই হবে। তুমি ভেবো না, আমি ঠিক গুছিয়ে নেব।
মা গম্ভীর মুখ করে বলল, না, ডাক্তার আসবে। তুই ঘরে যা। আমি ডাক্তার ডেকে পাঠাচ্ছি।
এ বাড়ির পুরনো ডাক্তার সলিল দাশগুপ্ত এলেন। রুগি দেখে বললেন, টেম্পারেচার তো নেই দেখছি। শরীরটা একটু উইক। টনসিল আছে নাকি ?
রমা মাসি করুণ গলায় বলল, জ্বর কিন্তু এসেছিল ডাক্তারবাবু। বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যে করে বলছি না।
দাশগুপ্ত হেসে বললেন, অবিশ্বাস করছে কে ? জ্বর আসতেই পারে। তবে এখন নেই।
মা কঠিন গলায় বলল, জ্বর নানারকম আছে। সব কি আর ধরা যায় !
রমা করুণ গলায় বার বার বলতে লাগল, না রেণুদি, বিশ্বাস করো, আমার সত্যিই জ্বর এসেছিল। অনেক জ্বর।
মা কঠিন গলায় বলল, ঠিক আছে। ওষুধ খাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।
ডাক্তারবাবু একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে চলে গেলেন। মা ফিরে গেল রান্নাঘরে। বন্দনা পড়ার ঘরে। পড়ার ঘরের পাশেই রমা মাসির ঘর। মাঝখানের দরজাটা বন্ধ। পড়ার ঘর থেকে বন্দনা শুনতে পাচ্ছিল, রমা মাসি খুব কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, হেঁচকি তুলে।
বাড়িটা বড্ড থমথমে হয়ে গেল।
দুপুরে উদভ্রান্ত চেহারায় বাবা ফিরতেই মা বলল, কোথায় গিয়েছিলে ?
কাজ ছিল।
কী কাজ ?
ছিল।
রমার টিকিটের কী হল ?
ব্যবস্থা করে এসেছি।
কবেকার টিকিট ? কাকে কাটতে দিয়েছ ?
কেদারকে।
কেদার দত্ত নামে বাবার এক বন্ধু আছে রেলে কাজ করে। তাদের টিকিট সে-ই কেটে দেয়।
মা জিজ্ঞেস করল, কবেকার টিকিট ?
যবেকার পায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।
মা আর কিছু বলল না। কিন্তু বাড়িটা থমথম করতে লাগল। স্কুল থেকে ফিরে বন্দনা দেখল, নিজের ঘরে শুয়ে আছে রমা মাসি। সারা দিন খায়নি। তার বাবা কোথায় ফের বেরিয়ে গেছে। বন্দনার বন্ধুর সংখ্যা বরাবরই কম। এ বাড়ির নানারকম বিধিনিষেধ থাকায় সে যখন-তখন বেরোতেও পারে না। তার একমাত্র স্বাধীনতা বাগান আর ছাদ। সেদিন সে একটু ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে ছাদে উঠে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল, পড়ন্ত শীতের শেষবেলায় পশ্চিম দিগন্তের আশ্চর্য বিষণ্ণ সূর্যাস্ত। মাথার ওপর মস্ত আকাশ জুড়ে নেমে আসছে আগ্রাসী অন্ধকার।
কী হয়েছে তা সে ভাল জানত না তখনও। নিষিদ্ধ সম্পর্ক সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট হয়নি। শুধু বুঝতে পারছে রমা মাসি আর বাবাকে নিয়ে একটা কিছু ঘুলিয়ে পাকিয়ে উঠছে। কী হবে এখন ? ভেবে একা একা কাঁদল বন্দনা। বাবাও সারা দিন খায়নি। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।
বাবা ফিরল সন্ধে পার করে। গলা অবধি মদ খেয়ে এসেছে। চুর মাতাল। কোনও দিন জ্ঞানবয়সে বাবাকে মদ খেতে দেখেনি বন্দনা। কী যে হয়েছিল সেদিন ! মনে কষ্ট হলে কি মানুষ মদ খায় ?
তবে তার বাবা চেঁচামেচি করেনি, অসংলগ্ন কথাও বলেনি। টলতে টলতে এল, উঠোনেই

তিনবার পড়ে গেল দড়াম দড়াম করে। সিঁড়ি বেয়ে উঠল হামাগুড়ি দিয়ে। তাতেও পড়ে গেল। পরে বাহাদুর আর মদনকাকা এসে ধরে তুলে বড় খাটে শুইয়ে দিল বাবাকে। তারপর বিছানা আর মেঝে ভাসিয়ে বমি করল বাবা। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোনোর আগে ভাঙা ফ্যাসফ্যাসে গলায় শুধু একবার বলল, যদি গলায় দড়ি দেয় তা হলে কী হবে ? সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে না হাজতে ?

সেদিন তাকে বাবার কাছে শুতে দেয়নি মা। সে আর মা শুল বিলুর ঘরে। আলাদা খাটে বিলু। সে আর মা একসঙ্গে।

বন্দনার ঘুম আসছিল না ভাল করে। বার বার ছিঁড়ে যাচ্ছে ঘুম। তার মধ্যেই টের পেল, মা বার বার উঠে বারান্দায় যাচ্ছে। রমা মাসির ঘর থেকে গোঙানির মতো শব্দ আসছিল মাঝে মাঝে। মা বোধহয় কেন গোঙাচ্ছে দেখতে যাচ্ছিল। কিংবা বাবা ও ঘরে যায় কি না।

পরদিন সকালে বিলু তাকে বলল, এ বাড়িতে কী সব হচ্ছে রে দিদি ?

বিলু কিছু জানে না। তার তো বাইরের জগৎ নিয়েই বেশি কাটে। বন্দনা গম্ভীর হয়ে বলে, কী আবার হবে ? কিছু হয়নি।

বাবা নাকি কাল মদ খেয়ে এসেছে ?

তোকে কে বলল ?

আমি নীচের তলায় মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছিলাম তো, নিজের চোখে দেখেছি। কী হচ্ছে রে ? ফুলুদি যেন কী সব বলছিল। রমা মাসিকে নিয়ে নাকি কী সব গোলমাল হয়েছে।

ফুলুদি এ বাড়ির কাজের মেয়ে। ঠিকে। সেও পুরনো লোক। একটু বোকা হলেও খুব কাজের এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাদের দুই ভাইবোনের ওপর সুযোগ পেলে খবরদারি করতে ছাড়ে না।

বন্দনা ঠোঁট উল্টে বলে, কে জানে কী হচ্ছে। তোর অত জেনে কী হবে ?

বিলু গম্ভীর হয়ে বলল, এ বাড়িতে কেউ আমাকে কিছু বলতে চায় না। এটা খুব খারাপ নিয়ম। রমা মাসি নাকি চলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ। গেলে বাঁচি।

কিন্তু রমা মাসি তো খুব ভাল। আমাকে কত গল্প বলে।

ছাই ভাল।

রমা মাসি সকালে উঠল। শরীর অসম্ভব দুর্বল। তাই নিয়েই বাক্স গোছাতে বসল। খোলা দরজা দিয়ে বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে দেখছিল বন্দনা। গোছানোর মতো তেমন কিছু আনেনি মাসি। সামান্যই কখানা কাপড়চোপড়। তবে মা বেশ কয়েকখানা শাড়ি দিয়েছিল মাসিকে। সেগুলো মাসি সরিয়ে সাজিয়ে রাখল বিছানায়, বাক্সে ভরল না।

বেলা দশটা নাগাদ মা ওপরে উঠে এল। সোজা গিয়ে রমা মাসির ঘরের দরজায় দাঁড়াল। বলল, খাবি আয়। না খেয়ে থাকলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। তুই উপোস করছিস আর উনি মাতাল হয়ে ফিরছেন। প্রেমের জ্বালা তো দেখছি সাঙ্ঘাতিক।

রমা মাসি বসে ছিল মেঝেতে। পাশেই খাট। মাসি মাথাটা বিছানায় নামিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল, কেন অমন করে বলছ রেণুদি ? আমি কী করেছি ?

মা ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, কী করেছিস তাও কি বলে দিতে হবে ? সর্বনাশী। যা করেছিস তা রাক্ষুসি ছাড়া কেউ করে ? এখন দয়া করে এখানে দেহত্যাগ কোরো না। আত্মহত্যা করতে হলে নিজের জায়গায় গিয়ে কোরো। এখন উঠে দয়া করে দুটি গেলো, আর আমাকে রেহাই দাও।

দৃশ্যটা আজও ভোলেনি বন্দনা। রমা মাসি চোখের জলে ভাসা মুখখানি তুলে বিকৃত গলায় বলল, খাব রেণুদি, না খেয়ে যাব কোথায় ? চলো, যাচ্ছি।

নীচের খাওয়ার ঘরে মায়ের পিছু পিছু দুর্বল ধীর পায়ে নেমে গেল রমা মাসি। পিছনে চুপি চুপি বন্দনাও। একটু দূর থেকে, দরজার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বন্দনা দেখল, রমা মাসি প্রাণপণে রুটি গিলবার চেষ্টা করছে, কাঁদছে, জলের গেলাস মুখে তুলছে। বিষম খাচ্ছে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল মাসির। দুই গাল ফুলে আছে রুটির দলায়। গিলতে পারছে না। তবু কী প্রাণান্তকর চেষ্টা। শেষ অবধি পারল না। বেদম কাশি, বিষম, বমি সব একসঙ্গে ঘটল।

মাসি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে চেয়ার-সমেত।

বন্দনা ভয়ে পালিয়ে এল।

পরে শুনেছে, মা ওই অবস্থায় মাসিকে রুটি বেলার বেলন দিয়ে বেদম মেরেছিল। ফুলুদির সামনে। ফুলুদিই পরে বলে, ওভাবে মারা ঠিক হয়নি মায়ের। ওভাবে কেউ মারে ?

রমা মাসি অবশ্য মরেনি। শব্দ পেয়ে বাহাদুর দৌড়ে এসে মাসিকে তুলল। চোখেমুখে জল দিল। আঙুল দিয়ে মুখ থেকে রুটির দলা বের করল। তারপর ধরে ধরে দোতলায় এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। শূন্য দৃষ্টি কাকে বলে সেই প্রথম দেখেছিল বন্দনা। মাসি শুয়ে আছে খাটে। নিস্পন্দ। শুধু চোখ দুটি খোলা। সেই চোখে পলকও পড়ছে না, অথচ কিছুই যেন দেখতেও পাচ্ছে না।

আজও সেইসব দিনের কথা ভাবলে রমা মাসির জন্য কষ্ট হয় বন্দনার। অপরাধ যতই হোক, শাস্তি দেখতে কারই বা ভাল লাগে !

বাবা উঠল অনেক বেলায়। চোখ মুখ ফোলা, কেমন, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। ঘুম থেকে উঠেই তাকে ডাকল বাবা, বন্দনা মা, কোথায় তুমি ?

বন্দনা ছুটে গিয়েছিল, এই তো বাপি।

তার বাবা চারদিকে পাগলের মতো চেয়ে দেখছিল। বলল, আমার কেমন লাগছে। একটু জল দেবে ?

রাতে কেউ খাটের পাশে টুলে কাল জল রাখেনি। বন্দনা জল এনে দিতেই বাবা মস্ত কাঁসার গেলাসটা প্রায় এক চুমুকে খালি করে দিয়ে বলল, আমার কি জ্বর ? গায়ে হাত দিয়ে দেখ তো !

গায়ে হাত দিয়ে বন্দনা চমকে গেল। বাবার খুব জ্বর। বলল, হ্যাঁ বাপি।

আমার খুব শীত করছে।

তা হলে শোও বাপি, আমি গায়ে ঢাকা দিয়ে দিই।

না না। আমাকে এখনই স্নান করতে হবে।

জ্বর-গায়ে স্নান করবে ?

হ্যাঁ মা। আমার গা বড় ঘিন ঘিন করছে।

তা হলে যে তোমার জ্বর আরও বাড়বে !

না, কিছু হবে না। এই বলে বাবা গিয়ে কলঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বন্দনা শুনতে পেল বাবা মগের পর মগ জল ঢালছে গায়ে। পাগলের মতো। দরজায় অনেকবার ধাক্কা দিল বন্দনা, বাবা, আর নয়।

বাবা শুনল না। অনেকক্ষণ বাদে যখন বাবা গা মুছে বেরিয়ে এল তখন শীতে চড়াইপাখির মতো কাঁপছে। ছোট দুই হাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় নিয়ে এল বন্দনা। গায়ে ঢাকা দিল। বলল, কেন স্নান করলে বাবা ? তোমার যে জ্বর !

বড্ড ঘিন ঘিন করে যে ! বড্ড ঘিন ঘিন।

বিকেলে যখন জ্বর মাত্রাছাড়া হল তখন ডাক্তার দাশগুপ্ত এলেন। বললেন, এ তো সাঙ্ঘাতিক কনজেশন দেখছি বুকে ! নিউমোনিয়ায় না দাঁড়িয়ে যায়।

নিউমোনিয়াই দাঁড়াল শেষ অবধি।

অন্য ঘরে তখন রমা মাসি দিনের পর দিন চুপ করে শুয়ে বসে থাকছিল। কেদার দত্ত টিকিট নিয়ে আর এল না। কয়েকদিন পর মাসিকে নীচের একটা এঁদো ঘরে চালান দিল মা। বলল, ওপরে এসো না। নীচেই থেকো। আর ঘরের দরজা আটকে রাখবে সব সময়ে।

মাসি নীরবে এই নিয়ম মেনে নিল।

মা একটা পোস্টকার্ড লিখল মধ্যপ্রদেশে।

কয়েকদিন বাদে রমা মাসির মায়ের কাছ থেকে জবাব এল : মা রেণু, রমাকে নিয়ে কি তোদের খুব অসুবিধা হচ্ছে ? রমা বড় শান্ত মেয়ে। তোর পিসেমশাই ছুটি পেলেই গিয়ে নিয়ে আসবে। চিন্তা করিস না।

বাবার অসুখ সারল একদিন। কিন্তু সারল না বাড়ির থমথমে ভাবটা। কয়েকটি মাত্র প্রাণীর বাস, তবু একজন যেন অন্যদের থেকে কত দূর।

মা একদিন মধ্যরাতে ফের বাবাকে ধরল, তোমার কেদার দত্তের কী হল ? টিকিট নিয়ে এল না তো ?

হয়তো ভুলে গেছে।

আর কত মিথ্যে কথা বলবে বলো তো ?

মিথ্যে কথা ! বলে বাবা কেমন তটস্থ হয়ে পড়ল।

মিথ্যে নয় ? কেদার দত্তের কাছে তুমি যাওইনি কখনও।

যাইনি !

ডাইনির পাল্লায় পড়লে মানুষের কি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে ? ও তো তোমাকে খেতে এসেছে। তোমাকে খাবে, এ সংসার উড়িয়ে-পুড়িয়ে খাক করবে।

বাবা চুপ করে রইল। অন্ধকারে বাবার মুখটা দেখতে পাচ্ছিল না বন্দনা। কিন্তু তার খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল। তার বাবা একজন অসহায় মানুষ। কবির মতো মানুষ।

ঘটনাটা শুরু হয়েছিল এক মধ্যরাতে, মা আর বাবার কথাবার্তা সেদিন ঘুম ভেঙে শুনে ফেলেছিল বন্দনা। সেই ঘটনার মাস দুই বাদে একদিন সত্যিই মাসির টিকিট কাটা হল। বাহাদুর তৈরি হল সঙ্গে যাবে বলে।

তখন সন্ধেবেলা, রাত সাড়ে আটটার ট্রেন ধরতে হবে বলে মাসি কাপড় পরে তৈরি হল। ভাতও খেয়ে নিল। হঠাৎ বাবা মাকে বলল, রেণু, তুমি ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসো।

কেন ?

নইলে খারাপ দেখাবে।

দেখাক।

নইলে আমাকে যেতে হয়।

তুমিই যাও।

যাব ? তোমার তো ফের সন্দেহ হবে।

সন্দেহ ! সন্দেহের কিছু নেই। তোমরা দুজনেই পাপী। যাও তোমার তো চুলকুনি আছে।

কী যে বলো। শুনলে ও কী মনে করবে ?

কী আবার মনে করবে ? ওর মনে করার ভয় করি নাকি ? যা সত্যি তাই বলছি।

বাবা একটু ইতস্তত করে বলল, চলেই তো যাচ্ছে। সব ভুলে যাও। বড় সামান্য কারণেই এত কাণ্ড হয়ে গেল।

আমার কাছে কারণটা সামান্য নয়।

বাবা হতাশ হয়ে বলল, তুলে দিয়ে আসি। নইলে কথা থাকবে।

যাও, কিন্তু আবার ট্রেনে চড়ে বোসো না। তোমার যা অবস্থা দেখছি।

এইসব ঠেস-দেওয়া কথার পরও কিন্তু বাবা গিয়েছিল স্টেশনে। গিয়েছিল, কিন্তু ফেরেনি, আজও ফেরেনি।

রাত নটার পর বাহাদুর ফিরে এসে বলল, দিদিমণি তো হাওয়া।

মা চেঁচিয়ে উঠে বলল, তার মানে ?

কিছু বুঝলাম না।

কী বুঝলে না ?

গাড়িতে ওঠার পর বাবু আমাকে বললেন, ওরে রাস্তার খাবার দিতে ভুলে গেছে, একটা পাঁউরুটি নিয়ে আয় দিদিমণির জন্য, আমি পাঁউরুটি আনতে গেছি, এক মিনিট হবে, এসে দেখি দিদিমণি নেই, বাবুও নেই। সুটকেসও নেই। একজন প্যাসেনজার বলল, ওরা পিছনের দরজা দিয়ে নেমে গেছে।

সে কী ?

আমি একটু ভাবনা করে নেমে পড়লাম, ভাবলাম খবরটা দিয়ে যাই।

মা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে থরথরিয়ে কেঁপে উবু হয়ে বসে পড়ল, শুধু বলল, এও হয়? হতে পারে?

বাহাদুর তার মালপত্র রেখে মদনকাকাকে নিয়ে ফের স্টেশন-চত্বর খুঁজতে গেল, যদি কোথাও পাওয়া যায়।

চিরকুটটা পাওয়া গেল শোওয়ার ঘরের কাশ্মীরি গোল টেবিলটার ওপর। একটা কাচের গেলাসে চাপা দেওয়া একসারসাইজ বুকের একটা রুল-টানা পাতায় শুধু লেখা, আমাদের খুঁজো না, পাবে না।

কিন্তু ঘটনার প্রথম ধাক্কাটা সামলে মা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বাঘিনীর মতো তার চেহারা, দাঁতে দাঁত পিষে শুধু বলতে লাগল, এত সহজে ছেড়ে দেব? এত সহজে ভেঙে দিয়ে যাবে আমার সংসার?

সুতরাং পাড়া প্রতিবেশী এল, পুলিশ এল, দু-একজন নেতাও এলেন। তাঁদের মধ্যে সুবিমল স্যার। প্রদীপের মৃত্যুর পর থেকে সুবিমল স্যারকে একদমই পছন্দ করত না মা, নাম শুনলেই রেগে যেত। কিন্তু এ ঘটনার পর সুবিমল স্যার খুবই কাজে লাগলেন। তাঁর দলের ছেলেরা সারা শহরে তোলপাড় করে বেড়াল দুজনের খোঁজে। সারা শহরে ঢি ঢি। তারা ভাই বোন স্কুলে অবধি যেতে পারত না লজ্জায়।

সেইসব দিন খুব মনে আছে বন্দনার। বাইরের এইসব ঘটনাবলি তাকে আরও ভয় পাইয়ে দিত, সে গুটিয়ে যেত নিজের মধ্যে। বুকটা কী ভীষণ টনটন করত বাবার জন্য। তার ভাল মানুষ, কবির মতো বাবার এ কী হল? এখন সে কী করে থাকবে বাবা ছাড়া?

মাঝরাতে একদিন ঘুম থেকে তাকে ঠেলে তুলে মা বলল, রাক্ষুসি, ঘুমের মধ্যে কার নাম করছিলি?

অবাক বন্দনা ভয় খেয়ে বলল, কার মা?

খবরদার ও নাম আর উচ্চারণ করবি না, বাবা! কীসের বাবা রে? জন্ম দিলেই বুঝি বাবা হয়? এত সহজ!

এই বকুনির অর্থ কিছুই বোঝেনি সে। শুধু বুঝল সে ঘুমের মধ্যে বাবাকে ডেকেছিল।

মাসির কথাও কি মনে হত না তার? খুব হত। দুঃখী, রোগা মেয়েটা সেই যে সকালে মায়ের তাড়া খেয়ে গিয়ে গোগ্রাসে রুটি খাচ্ছিল, সেই দৃশ্য কি ভোলা যায়? মাসিকে তো একসময়ে সে ভীষণ ভালবাসত। দু একদিন গল্প করতে করতে এক খাটে ঘুমিয়েও পড়েছে প্রথম প্রথম। মাসির প্রথম আসার পর কী আনন্দেই তাদের কাটত। এই মস্ত বাড়িটায় একজন নতুন এলে তাদের এমনিতেই ভাল লাগে। তার ওপর মাসির মতো অমন মিশুকে মিষ্টি মানুষ। তারপর কী যে হয়ে গেল।

আজ অবধি মাসিকে পুরোপুরি ঘেন্না করতে পারে না বন্দনা। কিছুতেই পারে না। আর বাবাকে সে আজও অন্ধের মতো ভালবাসে। তবু দুজনকে একসঙ্গে ভাবলে তার কষ্ট হয়। কেন এরকম করল বাবা?

দিন সাতেক বাদে রমা মাসির মা এল আর এক মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। বাবা আসতে পারল না, তার নাকি ছুটি নেই। সেই দিদা এসে অনেক কান্নাকাটি করল, রেণু, তোর সর্বনাশ করল আমার পেটের মেয়ে। গলায় দড়ি দিলেও কি এ জ্বালা জুড়োবে?

মা কাঁদতে কাঁদতে আর ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, সে শুধু আমার সর্বনাশই করেনি ফুলপিসি, একটা গোটা সংসার ছারখার করে দিয়ে গেছে। আমার ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল। বাইরের সমাজে মুখ দেখানোর উপায় রইল না। কেন যে সর্বনাশীকে এ বাড়িতে পাঠাতে গেলে!

দিদাও হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার জ্বালা যদি বুঝতিস রেণু। একটা পাঁড় মাতালের ঘর করি, ঘাড়ের ওপর পাঁচটা সোমত্থ মেয়ে। কী সুখে আছি বল! তার ওপর এই মেয়ে মুখে চুনকালি দিয়ে গেল। গলায় দড়ি জুটল না ওর?

সারাদিন ধরে থেকে থেকে এইসব বিলাপ। বন্দনা দিদাটিকে আগে কখনও দেখেনি। রোগাভোগা মানুষ, সরল সোজাও বটে। দিদাকে তার খারাপ মানুষ মনে হয়নি। রমা মাসির সেজদি ক্ষমাও খুব ভাল। দেখতে রমার মতো নয়। একটু মোটাসোটা আহ্লাদি চেহারা। তবে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল, মুখখানা দুঃখে ভার।

বন্দনাকে বলেছিল, আমাদের বোনে বোনে খুব ভাব ছিল। রমা সবচেয়ে নরম মনের মেয়ে। হ্যাঁ রে, কেন এরকম হল ? রমা তো এরকম ছিল না।

বন্দনা কান্না চেপে বলেছিল, আমি জানি না মাসি।

জামাইবাবুকে তো আমি কখনও দেখিনি। তবে শুনেছি উনিও খুব ভাল মানুষ।

আমার বাবা খুব ভাল।

ক্ষমা মাসির সঙ্গে তার তেমন ভাব হল না বটে, কিন্তু বন্দনার এই মাসিটিকে খুব খারাপ লাগল না। তার ওপর একটা লজ্জার ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তারা খুব মনমরা।

হীরেনবাবু তখন প্রায় রোজ বিকেলের দিকে আসতেন এবং মেঘনাদকে শিগগিরই অ্যারেস্ট করে আনবেন বলে তড়পাতেন। তাঁকে চা-বিস্কুট আর জর্দা পান দেওয়া হত। তিনি মাঝে মাঝেই মাকে জিজ্ঞেস করতেন, মেঘনাদবাবু নগদ টাকা কত নিয়ে গেছে বলে আপনার মনে হয় ? গয়না টয়না নেয়নি তো !

বন্দনার খুব রাগ হত শুনে। তার বাবা কি চোর ?

দিদা একদিন হীরেনবাবুকে বলল, জামাই আমার হিরের টুকরো ছেলে। ওর কোনও দোষ নেই। আপনি আমার মেয়েটাকে চুলের ঝুঁটি ধরে নিয়ে এনে ফেলুন। আমি ও পাপের বোঝা নিয়ে ফিরে যাই। রেণুর সংসারটা বাঁচুক। ওর মুখের দিকে যে চাইতে পারি না।

হীরেনবাবু বিজ্ঞের মতো হেসে বলেছিলেন, ব্যাপারটা যদি অত সহজ হত তা হলে তো কথাই ছিল না, অ্যারেস্ট করতে হলে দুজনকেই করতে হবে। বাইগ্যামির চার্জে।

ফুলদিদা আর ক্ষমা মাসি প্রায় মাস খানেক ছিল। দুজনেই বেশ সরল আর ভালমানুষ গোছের। তারা অষ্টপ্রহর মাকে সান্ত্বনা দিত আর রমা মাসির নিন্দে করত।

কিন্তু রমা মাসির একার দোষ বলে মনে হত না বন্দনার। রমা মাসি তো খারাপ ছিল না। কিন্তু সংসারে বোধহয় অদৃশ্য ভূত কিছু আছে। তারাই ঘাড়ে এসে চাপে কখনও সখনও।

দিদা আর মাসি চলে যাওয়ার পর একদিন কেদারকাকু এসে খবরটা দিলেন, মেঘনাদ বড় আত্মগ্লানির মধ্যে আছে বউঠান। ছেলে মেয়ের জন্য বড্ড কান্নাকাটি করছে। আপনার কথাও খুব বলছে।

মা খুব শান্ত গলায় বলল, উনি কোথায় আছেন ?

প্রথমটায় আমার কোয়ার্টারেই গিয়ে উঠেছিল। পরে একটা বাসা ঠিক করে উঠে যায়। তবে রোজই আসে। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। কেন যে এ কাজ করল। সবই ভবিতব্য।

আজ সকালের ঝলমলে রোদে চারদিক যেন ভেসে যাচ্ছে আনন্দে। আজ পুরনো দুঃখের কথা ভাবতে নেই। শুধু সুখ বা দুঃখের সময় বন্দনার মনে হয় এখন বাবা থাকলে বেশ হত। বুকের ভিতরটা টনটন করে তখন।

পায়রারা চক্কর খাচ্ছে মাথার ওপর। এ বাড়ির পোষা পায়রা। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে। আকাশের গায়ে যেন এক অঞ্জলি ফুল।

এরকম কত ঐশ্বর্য দিয়ে যে পৃথিবীটা সাজানো ! একটা ফুলের দিকে চেয়ে থাকলেও আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। তাকে দেখতে শেখাত বাবা। বাবার চোখ ছিল কবির মতো। স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত। বাবা বলত, এ পৃথিবীর রূপের যেন শেষ নেই। জানালা দিয়ে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে, তাতে ঝিরিঝিরি নিমের ছায়া, ভাল করে দেখিস, কী অদ্ভুত সুন্দর। নিবিষ্ট হয়ে নিবিড়ভাবে দেখতে হয়।

বাবা ছিল এক কবির মতো মানুষ, বাবা কি আজও সেরকম আছে ? কে জানে। রমা মাসিকে নিয়ে সেই যে চলে গেল বাবা, গেল তো গেলই।

॥ দুই ॥

বাঁশের সাঁকোটার মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল অতীশ। তার মাথায় এক বস্তা বেগুন। সে বি-কম পাশ। দিন চারেক আগে সকালে দৌড়োনোর সময় তার ডান কুঁচকিতে একটা টান ধরেছিল। অন্য কেউ হলে বসে যেত। সে বসেনি। নিজেকে চালু রেখেছে। বসলে তার চলবে না। কিন্তু ব্যথাটা আজও সাঙ্ঘাতিক আছে। ডান পায়ে বেশি ভর দিতে পারে না। এমন চিড়িক দেয় যে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি টের পাইয়ে ছাড়ে। বেশি ব্যথায় একটা অবশ ভাব হয়, আর মাংসপেশি শক্ত হয়ে গুটলি পাকিয়ে থাকে। এসব নিয়েই চলা।

বাঁশের সাঁকোটা পার হওয়া খুব সহজ নয়। দুখানা বাঁশ পাশাপাশি ফেলা, একধারে বাঁ পাশে একখানা নড়বড়ে রেলিং। পরান আগেই বলে রেখেছে, ধরার বাঁশটায় বেশি ভর দেবেন না। ওটা শুধু টাল সামলানোর জন্য।

আসার সময়ে ভাবনা হয়নি। তরতর করে পেরিয়ে এসেছে। তখন মাথায় পঁচিশ কেজির বেগুনের বস্তা ছিল না। এখন সেটা টলমল করছে মাথায়। তার ওপর পায়ে হাওয়াই চটি। গত রাত্তিরের বৃষ্টিতে গাঁ-গঞ্জে কাদা ঘুলিয়ে উঠেছে। গোড়ালি অবধি এঁটেল মাটিতে মাখামাখি। জামা প্যান্টের পিছনে, মাথা অবধি হাওয়াই চটির চাঁটিতে ছিটকে উঠেছে কাদা। এখন সেই পিছল হাওয়াই চটি পায়ে সাঁকো পেরোনোর অগ্নিপরীক্ষা।

পরান পিছনেই। ঘাড়ে শ্বাস ফেলে বলল, আপনি পেরে উঠবেন না। দাঁড়ান, আমার বস্তাটা ওপারে রেখে এসে আপনারটা পার করে দিই।

অতীশ পাল্টা প্রশ্ন করল, তুমি পারলে আমি পারব না কেন ?

সবাই কি সব পারে ?

জীবন-সংগ্রাম কাকে বলে জানো ? এই সংগ্রামটা নিজেই করতে হয়। সব জায়গায় তো আর পরানচন্দ্র দাসকে পাওয়া যাবে না।

পরানের পায়েও হাওয়াই চটি, লুঙ্গিটা অর্ধেক ভাঁজ করে ওপরে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছে বলে বাঁকা ঠ্যাংদুটো দেখা যাচ্ছে। গায়ে একটা হাওয়াই শার্ট। পরান বেঁটে এবং খাটিয়ে পিটিয়ে লোক। হাসল। বলল, বেগুন নিয়ে যদি পড়েন তো বেগুনও গেল, আপনিও গেলেন। আমার অভ্যাস আছে। একটু দাঁড়ান।

এই বলে পরান অতীশকে ডিঙিয়ে সাঁকোতে উঠে পড়ল। ওপাশ থেকে বিড়ি মুখে একটা লোক সাঁকোতে উঠতে গিয়ে পরানকে দেখে সরে দাঁড়াল।

অতীশ নিবিড় চোখে পরানকে লক্ষ করছিল। কায়দাটা কি খুব কঠিন ? বাঁশে একটা মচমচ শব্দ হচ্ছে, একটু একটু দেবেও যাচ্ছে। পরান একটা আলতো হাত বাঁশের রেলিঙে রেখে পা দুটো সামান্য ঘসটে ঘসটে পেরিয়ে যাচ্ছে। ওর বস্তায় ত্রিশ কেজির মতো বেগুন।

অতীশ দেরি করল না। ঠাকুর স্মরণ করে অবিকল ওই কায়দায় সাঁকোতে উঠে পড়ল। বাঁশের সাঁকোতে একটা মচাক করে জোর শব্দ হল। একটু কাঁপল কি ? পরান নয়, ওপাশের লোকটা হঠাৎ হেঁকে বলল, দাঁড়াও বাপু, দুজনের ভর সইবে না। আক্কেল নেই তোমার ?

আড়চোখে খালের দিকে চাইল অতীশ। ছোট খাল। জল কম, কিন্তু কাদা থিকথিক করছে। পড়লে গলা অবধি গেঁথে যাবে।

সাঁকোর ওপর দু কদম এগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অতীশ। পরান ওপারে পা দিতেই সেও ধীরে ধীরে পা ঘসটে ঘসটে এগোতে থাকে। বাঁ হাতে আলতো করে রেলিং ধরা। পারবে না ? এসব না শিখলে তার চলবে কেন ?

ওপার থেকে পরান বলল, কথা শুনলেন না তো ! পারবেন কি ? নইলে বলুন, আসি।

না। পারব।

পারার জন্য যেটা দরকার সেটা হল অখণ্ড মনোযোগ। পা যাতে বেচাল না পড়ে আর শরীর যাতে হেলে না যায়। ডান কুঁচকিটা ঠিক থাকলে কোনও চিন্তা ছিল না। কিন্তু টাটানিটা যেন বাড়ল

সাঁকোর মাঝবরাবর এসে। অবশ লাগছে, দুর্বল লাগছে ব্যথার জায়গাটা। দাঁতে দাঁত চেপে সে মনে মনে বলল, যতই কামড়াও আমি ছাড়ছি না। তুমি ব্যাটা আমার চাকর, যা বলব শুনতে হবে।

ডান কুঁচকি এই ধমকে ভয় পেল বলে মনে হয় না। তবে অতীশ মাঝ-সাঁকো থেকে সামান্য ঢালে সাবধানে পা রাখল। বড় নড়বড় করছে সাঁকোটা, এত ওজন তার যেন সওয়ার কথা নয়।

হড়বড় করবেন না, ধীরে সুস্থে আসুন। নীচের বাঁশে দড়ির বাঁধন আছে, বাঁশের গিঁট আছে, সেগুলোর ওপর পা রাখুন। পা একটু আড়া ফেলবেন। দুই বাঁশের মাঝখানে পা ফেললে বাঁশ ফাঁক হয়ে পা ঢুকে যেতে পারে। পুরনো বাঁধন তো, তার ওপর মাথায় অত ওজন।

পরান বরাবরই একটু বেশি বকবক করে। এসব কি আর সে জানে না ? প্রাণের দায়েই জানে। প্রাণের দায়ই তো যত আবিষ্কারের মূল।

ঢালের মুখে ডান পা একটু পিছলে গেল হঠাৎ। বুকটা কেঁপে উঠে মাথা অন্ধকার হয়ে গেল তার। এই রে ! গেলাম !

কিন্তু পাটা একটা বড় বাঁধনের দড়িতে আটকাল। বস্তাটা একটু দুলে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে দোলটা সামাল দিল অতীশ। তারপর ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে লাগল। শালার ডান কুঁচকি কুকুরের মতো কামড়াচ্ছে। জায়গাটা ফুলে উঠল নাকি ?

একেবারে শেষ দিকটায় পরান এগিয়ে এসে বস্তাটা ধরল।

অতীশ একটু রেগে গেল। অযাচিত সাহায্য সে পছন্দ করে না। বলল, ধরলে কেন ? পেরিয়েই তো এসেছিলাম।

পরান অতীশকে চেনে। একটু ভয়ও খায়। বলল, একেবারে শেষ সময়ে মাঝে মাঝে ভরাডুবি হয় যে।

ইংলিশ চ্যানেল পেরোনোর সময় কোনও সাঁতারুকে স্পর্শ করা বারণ। করলেই সেই সাঁতারু ডিসকোয়ালিফায়েড। এইরকমই শুনেছে অতীশ। তার মনে হল, এই সাঁকো পেরোনোতেও সে ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে গেল পরানের জন্য।

পরান তার বস্তাটা নামিয়ে রেখেছিল। তুলতে গিয়েও থেমে বলল, আপনি বড্ড ঘামছেন। একটু জিরিয়ে নেবেন নাকি ?

অতীশ টের পাচ্ছে তার ডান পা থরথর করে কাঁপছে। কুঁচকির ব্যথার জায়গাটা জ্বলছে লঙ্কাবাটার মতো। আর মাইলটাক বয়ে আনা বেগুনের বস্তার ভারে কাঁধ ছিঁড়ে পড়ছে। তবু বলল, আমার জিরোনোর দরকার নেই।

পরান বলল, আরে, তাড়া কীসের ? গাড়ি সেই ছটায়। একটু বিড়ি টেনে নিই। দিন বস্তাটা ধরে নামাই। পট করে ফেলবেন না যেন। চোট লাগলে বেগুন দরকচা মেরে যায়।

বস্তাটা নামিয়ে ঘাসজমির ওপর রাখল অতীশ। তারপর চারদিকে চাইল। বেশ জায়গাটা। উঁচু মেটে রাস্তার দুধারে পতিত বুনো জমি। বসতি নেই। গাছপালা আর এবড়ো খেবড়ো জমি।

লোকটা খাল পেরিয়ে ওধারে চলে গেছে। চেয়ে দেখছিল অতীশ। ওপাশে আবাদ। কত লোক কত ভাবে বেঁচে আছে।

পরান পথের ধারে হেলানো বাবলা গাছের গোড়ার ওপর বসে বিড়ি ধরিয়েছে। বিড়ি ধরানোটা অছিলা। এই ফাঁকে অতীশকে একটু জিরেন দিতে চায়। ও কি ভাবে অতীশ কমজোরি, পরেসান ? এইটেই অতীশ সহ্য করতে পারে না। সে কি ওর করুণার পাত্র ?

পরান বিড়ি খেতে খেতে বলল, এ আপনার পোষাবে না বাপু। এই গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে গিয়ে পাবেন ক পহা ? বরং পুরুতগিরিতে লাভ।

পরানের কথায় কান না দিলেও চলে। পরান হচ্ছে নীচের তলার লোক। ওর সমস্যা কম। দেহখানি পাত করে ওকে খেতে হয়। ভদ্রলোকদের গতর খাটাতে দেখলে ও ফুট কাটবেই।

অতীশের রিক্সা গত এক সপ্তাহ নেই। পুজোপাটেরও বরাত নেই। সংসারটা চলে কীসে ? পরান বলল, ভুবনডাঙার বেগুন এনে বেচলে কেজিতে দু টাকা চার আনা করে লাভ। তাই আসা।

পরানের সঙ্গে তার তফাত হল, পরানের রাস্তাটা সিধে। সে গাঁয়ে গঞ্জে বন্দোবস্ত করে আসে।

হপ্তায় হপ্তায় গিয়ে মাল খরিদ করে আনে। তারপর বেচে। তার ওইতেই হয় বা চলে যায় বা চালিয়ে নিতে হয়। আর অতীশের হচ্ছে দু নৌকো সামাল দিয়ে চলা। তারা বামুন, গরিব। অথচ ভদ্রলোকও। সে যে বি-কম পাশ এটা আর এক ফ্যাকড়া। তাই পরানের মতো তার রাস্তা তত সরল নয়।

অতুলবাবুর মেয়ে শিখা গাড়ি চালাচ্ছিল। স্টেশনে একটা ট্রিপ মেরে সওয়ারি নিয়ে ফিরছিল অতীশ। সে ঠিক জানে শিখা লাইসেন্স পেলেও হাত এখনও ঠিক হয়নি। চালপট্টির মধ্যে সরু রাস্তায় শিখার গাড়ির বনেট তার বাঁ দিকের চাকায় লেগে রিক্সা উল্টে দিল। শিখা বাচ্চা মেয়ে, তার দোষ দেয় না অতীশ। কিন্তু দোষ বাড়ির লোকের, কেন ওইটুকু মেয়ের হাতে গাড়ি ছেড়ে দেয়? রিক্সাটা গেল ভোগে! সওয়ারি একটা যুবক ছেলে, অ্যাকসিডেন্টের সময় চটপট লাফ মেরে নেমে গিয়েছিল। তার লাগেনি। হই-হই হল বটে, কিন্তু অতুলবাবুর মেয়ে বলে কথা! তার সাত খুন মাপ।

রিক্সা ভাঙায় মনোজবাবু রেগে আগুন। রিক্সা বন্ধ হয়ে গেল। পরান বলেছিল, যান না, অতুলবাবুর কাছে একবার গিয়ে দাঁড়ান। ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু দিলেও দিতে পারে।

ওসব করে কী হবে? দু পাঁচটা কটু কথা বলবে বোধহয়। দয়া করে যা দেবে তাতে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ। থাকগে।

বামুন তো, বুদ্ধি আর কত হবে? আমরা হলে আদায় করে ছাড়তাম।

ওইটেই মুশকিল। সে পরান নয়, আবার পরানের চেয়ে উঁচুও নয় পয়সার দিক দিয়ে।

দু পুরুষ ধরে ভাঙনটা শুরু হয়েছে। বাবাই প্রথম ভদ্রলোকের মুখোশটা খুলে বাজারে আলুর স্টল খুলেছিল। আলুর বিক্রি বারো মাস। দরও বাঁধা। আয়ও বাঁধা। গলায় পৈতে নিয়ে তার বাবা পঁচিশ বছর আলু বেচছে, আবার পালপার্বণে পুজোও করে আসছে। তাতে সংসারের সুসার কিছু হয়নি। তারা খোলার ঘরে ভাড়া থাকে। কোনওরকমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

অতীশের বড় দুই দিদির কারও চাকরি হয়নি। ঘরে বসে পোশাক তৈরি করে বিক্রি করে। ছোট এক ভাই আর বোন স্কুলে পড়ে।

স্কুলে কলেজে অতীশ ভাল দৌড়বাজ বলে নাম করেছিল। ক্লাস থ্রি থেকে সব ফ্ল্যাট রেসে ফার্স্ট। ফিনফিনে পাতলা শরীরে সে যে এত ভাল দৌড়োয় তা তাকে দেখলে বিশ্বাস হয় না। অতীশের খুব ইচ্ছে ছিল, দৌড়ে নাম করবে, চাকরি পাবে। কিন্তু হল কী অনেক ঘোরাঘুরি করেও সে কলকাতার কোনও অ্যাথলেটিক ক্লাবে ঢুকতে পারল না। কেউ পাত্তাই দেয় না তাকে। মহকুমা আর জেলাস্তরে কিছু নাম হয়েছিল। ব্যস, ওই পর্যন্তই। তবে সে চেষ্টা ছাড়েনি। এখনও সে ভোররাতে উঠে দৌড়োয়, প্র্যাকটিস বজায় রাখে। দিন সাতেক আগে স্ট্যামিনা বাড়ানোর জন্য সে একটা রেললাইনের টুকরো দড়ি দিয়ে কোমরের সঙ্গে বেঁধে সেটাকে ছেঁচড়ে দৌড়োনোর চেষ্টা করেছিল। বেহিসেবি আন্দাজের ফল যা হয়। লোহাটা ছিল দারুণ ভারী। দৌড়োতে গিয়ে খিঁচ লেগে যায়।

কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে কুঁচকির ব্যথাটা কমানোর চেষ্টা করল অতীশ। ব্যথা কমল বলে মনে হয় না। তবে ঘাড়ে বোঝা নেই বলে একটু আরাম লাগছে।

বিড়ি শেষ করে পরান বলে, চলুন, রওনা হই। এখন না বেরোলে গাড়ি পাব না।

ঠিক আছে। চলো।

বস্তাটা ধরে মাথায় তুলে দেব কি? না কি সম্মানে লাগবে?

সম্মানে লাগবে।

তা হলে নিজেই তুলে ফেলুন।

বোঝাটা নামানোর পর ঘাড়ের টনটনানিটা টের পেতে শুরু করেছে অতীশ। এর আগেও অন্যান্য আবাদ থেকে বার কয়েক সবজি নিয়ে গেছে। তবে ব্যাপারটা তার এখনও অভ্যাস হয়নি। পরান বলে, ধীরে ধীরে ঘাড় শক্ত হয়ে যাবেখন। বামুনের ঘাড় এমনিতেই শক্ত। সহজে নুইতে চায় না।

অতীশ ক্রমশ বুঝতে পারছে ব্রাহ্মণত্ব আর বজায় রাখা যাচ্ছে না। বাবা মেলা বামনাই শিখিয়েছিল তাকে। যজমানি বামুন বলে কথা। কিন্তু সে সব যেতে বসেছে পেটের দায়ে।

বস্তাটা প্রথমে হাঁটুর চাড়ে পেট বরাবর, তারপর দুহাতের ঝাঁকিতে মাথায় তুলতেই ভারী টালমাটাল খেয়ে যায় অতীশ। ঘাড়ে মচাক করে একটা শব্দ হল নাকি ? সরু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল।

পরান অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে তার বোঝাটি মাথায় তুলে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে। বলল, মাঝবরাবর হয়নি, ডানধারে কেতরে আছে। একটা ঝাঁকি মেরে একটু বাঁয়ে নিন। নইলে কষ্ট হবে।

ব্যালান্স রাখাই কষ্ট। বস্তাটায় ঝাঁকি মেরে মাঝবরাবর করার চেষ্টা করল সে। বিড়ে নেয়নি বলে মাথায় বেগুনের বোঁটা খোঁচা মারছে। বিড়েটা নিল না লজ্জায়। প্রেস্টিজে লেগেছিল। মাথায় বিড়ে নেয় তো কুলিরা। সে কেন নেবে ?

পরান বলেছিল, বিড়ে না নিলে মাথায় চোট হয়ে যেতে পারে।

কুঁচকির কষ্টের সঙ্গে ঘাড়ের কষ্টটাও যোগ হল। পরান আগে হাঁটছে এবার, পিছনে অতীশ। অনেক কিছু পারতে হবে তাকে এখন। অনেক কষ্ট সইতে হবে। মানুষ সব পারে। কত শক্ত শক্ত কাজ করছে। স্টেশনের কুলিরা এর তিন ডবল মাল টানে অহরহ।

কুঁচকিটা এবার যাবে। ডান হাঁটু মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ছে ব্যথায়।

যদি সুবল মহাজন ঠিকঠাক দাম দেয় তবে মায়ের হাতে গোটা চল্লিশেক টাকা দিতে পারবে আজ। পঁচিশ কেজির মাল থেকে যদি ছাপ্পান্ন টাকা চার আনা লাভ হয় তবে খরচ খরচা বাদ দিয়ে ওরকমই থাকবে। কিন্তু ঠিকঠাক কত থাকবে তা বলা কঠিন।

বাঁ ধারের মাঠে নামতে হবে। সাবধানে নামবেন, জায়গাটা বড্ড গড়ানে। পিছলও আছে।

দুর্গম-গিরি কান্তার মরু নয়, তবু তার মধ্যেই যে কত ফাঁদ পাতা দেখে অবাক হতে হয়। উঁচু পথ থেকে মাঠে নামবার জায়গাটা এমন খাড়াই যে, দেখলে ভয় করে। সরু একটা আঁকাবাঁকা নালার মতো। হাল্কা পায়ে নামা কঠিন নয়। কিন্তু বেজুত কুঁচকি, টনটনে ঘাড় আর বেগুনের বোঝা নিয়ে নামা আর এক কথা। আজ যেন সবটাই তার কাছে শক্ত লাগছে।

পরান নেমে গিয়ে দাঁড়াল। পিছু ফিরে দেখছে তাকে। কী দেখছে ? ফুল প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরা ভদ্রলোকের ছেলেটা ছোটলোক হওয়ার কী প্রাণপাত চেষ্টা করছে দেখ। এ কোনওদিন ভদ্রলোকও হবে না, ভাল করে ছোটলোকও হতে পারবে না।

জন্মাবধি অতীশ ধার্মিক ও ঈশ্বরবিশ্বাসী। পুজোপাঠ ইত্যাদির মধ্যেই তার জন্ম। বাবার সঙ্গে সঙ্গে সে ছেলেবেলা থেকে পুরুতের কাজে পাকা হয়েছে। ওই ঈশ্বরবিশ্বাস আজও মাঝে মাঝে তার কাজে লাগে। এই যেমন এখন। সে ওই বিচ্ছিরি নালার মতো সর্পিল পথটা দিয়ে নেমে পড়ার আগে চোখ বুজে একবার ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করে নিল। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করতে হয় অন্ধের মতো। বুদ্ধি বিবেচনা আত্মশক্তি তখন কোনও কাজেই লাগে না। তখন ওই বিশ্বাসটার দরকার হয়। কিন্তু জীবনে যত ঘসটানি খাচ্ছে অতীশ তত যেন বিশ্বাসটার রং চটে যাচ্ছে।

বেগুনের বস্তার ঠেলায় আর মাধ্যাকর্ষণের টানে নামাটা হল হড়হড় করে। টাল রাখা কঠিন। কুঁচকির সঙ্গে ডান হাঁটুও সঙ্গতে নেমে পড়েছে। ব্যথাটা আর এক জায়গায় নেই, গোটা পা-ই যেন গিলে ফেলছে ব্যথার কুমির।

তবু পড়ল না অতীশ। দৈব আর পুরুষকার দুটোই বোধ হয় খানিক খানিক কাজ করল। মাঠে নেমে পড়ার পর সে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে বলল, চল।

পরান আর কথা বাড়াল না। সামনে সামনে হাঁটতে লাগল। গত কালের বৃষ্টিতে ক্ষেতে কাদা জমে আছে। আলপথও খুব নিরাপদ নয়। তবে ক্ষেতের চেয়ে শুকনো।

আগে পরান পিছনে অতীশ। চলেছে। তেপান্তরের মাঠ ফুরোচ্ছে না। বোধ হয় ফুরোবেও না ইহজীবনে। পরান এগিয়ে যাচ্ছে, পিছিয়ে পড়ছে অতীশ। তার ডান পা আর যেতে রাজি নয়। টাটিয়ে উঠছে। ফুলে উঠছে কুঁচকি। ভাবনাচিন্তা ছেড়ে দিয়েছে অতীশ। চলছে একটা ঘোরের মধ্যে। শরীর নয়, একটা ইচ্ছাশক্তি আর অহংবোধই চালিয়ে নিচ্ছে তাকে।

শিখার গাড়ি যখন তার রিক্সাকে পিছন থেকে এসে মারল তখন ছিটকে পড়েছিল অতীশ। সেই পড়ে যাওয়াটা খুব মনে আছে তার। রিক্সা চালাচ্ছে নিশ্চিন্তমনে, আচমকা একটা পেল্লায় ধাক্কায় খানিকটা ওপরে উঠে গদাম করে পড়ে যাচ্ছিল সে, তার সঙ্গে রিক্সাটাও খানিক লাফিয়ে উঠল, তারপর পড়ল তার ওপরেই। তখন কিছুই করার ছিল না অতীশের। হাত পা বোধ বুদ্ধি সব যেন অকেজো হয়ে গেল। তখন সে যেন এই বেগুনের বস্তাটার মতোই এক জড় পদার্থ। ভাগ্যের মার যখন আসে তখন মানুষের কি কিছু করার থাকে ? ডান কনুই, মাথা, কোমর কেটে ছড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যতটা হওয়ার কথা ততটা হয়নি।

কথাটা হল, এক একটা সময়ে মানুষের কিছুই করার থাকে না। শত বুদ্ধিমান, বিদ্বান, কেওকেটা মানুষও তখন গাড়ল-বুদ্ধু-ভ্যাবাচ্যাকা।

শিখা নেমে এল গাড়ি থেকে। একটু অপ্রস্তুত। তবু বলতে ছাড়ল না, হর্ন দিয়েছি, শুনতে পাওনি ?

তা শুনেছিল হয়তো। চালপট্টিতে হর্নের অভাব কী ? থিক থিক করছে রিক্সা, টেম্পো, লরি। কোন হর্নটা শুনবে সে ? জবাবটা মুখে এল না, মাথাটা বড্ড গোলমাল ঠেকছিল তখন। লোক জমেছিল মেলা। দুচারজন অতীশের পক্ষ নিলেও বেশির ভাগই অতুলবাবুর মেয়ের দিকে। হর্ন দেওয়া হয়েছিল, সুতরাং দোষ কী ?

অতীশ ভাবে, গাড়িতে যেমন হর্ন থাকে, তেমনি ব্রেকও তো থাকে! একটায় কাজ না হলে আর একটা দিয়ে লোককে বাঁচানো যায়। মেয়েটা আনাড়ি ড্রাইভার, সে কথা কে শুনবে ? ভাঙা রিক্সা যখন টেনে তুলছে অতীশ, তখন অতুলবাবুর মেয়ে গাড়িতে ফের স্টার্ট দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল।

ঘটনাটা বড্ড মনে আছে তার। ভোলা যাচ্ছে না। মনোজবাবু রাগ করে রিক্সা কেড়ে নিলেন। সেই থেকে একরকম ঘর-বসা অবস্থা তার।

তেপান্তরের মাঠ পেরোচ্ছে দুজন। সামনে শুধু ধু-ধু ন্যাড়া ক্ষেত। সামনে আরও এগিয়ে গেছে পরান। দূরত্বটা কি বেড়ে যাচ্ছে ? হেরে যাচ্ছে নাকি সে ? জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে পড়ছে ? কিন্তু তা হলে তার চলবে কী করে ? খুঁড়িয়ে, লেংচে, হিঁচড়ে তাকে বজায় রাখতে হবে গতি।

বড্ড ঘাম হচ্ছে তার। শরৎকাল শেষ হয়ে এল। তেমন গরম কিছু নেই। পরানচন্দ্রেরও তেমন ঘাম হচ্ছে না। মাঠের ওপর দিয়ে ফুরফুরে হাওয়াও বয়ে যাচ্ছে। তবু এত ঘামছে কেন সে ?

দূরে ওই কি রেলবাঁধ দেখা যাচ্ছে ? খেলনাবাড়ির মতো স্টেশন কি ওই ঝোপজঙ্গলে ঢাকা ? পরানচন্দ্র এবার দাঁড়াল। তারপর ফিরল তার দিকে।

কেমন বুঝছেন ?

ভাল। তুমি এগোও।

ডান কনুইয়ের কাছ বরাবর একটু শিরশির করছিল। আড়চোখে চেয়ে দেখল, একটা শুঁয়োপোকা বাইছে। বাঁ হাতের আঙুলে শুঁয়োটাকে চেঁছে ফেলে দিল সে। এবার চুলকুনি শুরু হবে। না, আর পারা যায় না যে!

তবু পেরেও যায় মানুষ। কামড়ে থাকলে মানুষ না পারে কী ? অতীশও পারল। তবে কিনা যখন রেলবাঁধে উঠে স্টেশনের চত্বরে এসে বস্তাখানা নামাল তখন তার মাথাটা একদম ভোম্বল হয়ে গেছে, ঠিক যেমন শিখার গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে হয়েছিল সেদিন।

পরান প্ল্যাটফর্মের বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বিড়ি ধরাচ্ছিল। বলল, এলেন তা হলে ?

অতীশ জবাব দিল না। ডান পাটা সামনে লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে থেবড়ে বসে গেল পরানের পাশে।

জল খাবেন তো বাইরের টিপকলে খেয়ে আসুন। এখনও সময় আছে।

জলের কথায় সচকিত হল অতীশ। তাই তো! তার যে বুক পেট সব তেষ্টায় শুকিয়ে আছে! শরীরের নানা অস্বস্তির মধ্যে তেষ্টাটা আলাদা করে চিনতে পারছিল না এতক্ষণ।

সে উঠল। বড় কষ্ট উঠতে। দাঁড়াতে গেলেই ডান পাটা বেইমানি করে যাচ্ছে। নেংচে খুঁড়িয়ে

সে স্টেশনের বাইরে এসে টিউবওয়েলটা দেখতে পেল। যখন জল খাচ্ছিল তখন কলকল শব্দ করে পেটের মধ্যে খোঁদলে জল নেমে যাওয়ার শব্দ পেল। বড্ড খালি ছিল পেটটা।

জল খেয়ে ফিরে এসে দেখে পরান দার্শনিকের মতো মুখ করে চুপচাপ বসে আছে। বিড়িটা শেষ হয়েছে।

আপনার কথাই ভাবছিলাম।

অতীশ একটু হাসল, কী ভাবলে ?

ভাবছিলাম, আপনি মেলা কষ্ট করছেন। এতে মজুরি পোষাবে না। আমাদের পুষিয়ে যায় কেন জানেন ? আমরা এইসবের মধ্যেই জন্মেছি। শরীর যে খাটাতে হবে তা জন্ম থেকেই জানি। আপনার তো তা নয়। কোথায় ভদ্রলোকের ছেলে চাকরিবাকরি করবেন, তা নয়, এই উঞ্ছবৃত্তি।

অতীশ ঠ্যাংটার কথা ভাবছিল। ডান পা গুরুতর রকমের বেচাল। এই অবস্থায় শালাকে লাই দিলে মাথায় উঠবে। কিন্তু শাসনেই বা রাখা যায় কী করে তা বুঝতে পারছে না।

আপনার পায়ে হয়েছেটা কী ?

অতীশ অবহেলার ভাব করে ঠোঁট উল্টে বলল, দৌড়োতে গিয়ে টান লেগেছে। ঠিক হয়ে যাবে।

পরান উঠে পড়ল। বস্তাটা দাঁড় করিয়ে বলল, উঠুন। গাড়ি আসছে।

সন্ধের মুখে নিজেদের স্টেশনে নেমেই অতীশ বুঝতে পারল, একটা কিছু পাকিয়েছে। স্টেশন চত্বরটা বড্ড থমথমে।

কী হল পরান ?

কিছু একটা হবে। দোকানপাট বন্ধ মনে হচ্ছে।

বাইরে একটাও রিক্সা নেই। এ সময়ে মেলা রিক্সা থাকবার কথা। রিক্সা থাকলে অতীশের সুবিধে হত। তার পয়সা লাগত না। এ শহরের অধিকাংশ রিক্সাওলাই তার বন্ধু।

একটু দমে গেল সে। ফের বস্তা মাথায় নিয়ে বাজার অবধি ল্যাংচাতে হবে।

পুলিশের গাড়ি গেল, দেখলেন ?

দেখলাম।

বাবু আর ল্যাংড়ার মধ্যে লেগে গেল নাকি ?

তা লাগতে পারে। চলো।

বাজারে মালটা গস্ত করা গেল না। বাজার বন্ধ। বাবু আর ল্যাংড়ার দলে বোমাবাজি হয়েছে। ছোরাছুরি চলেছে, পাইপগান আর রিভলভারও বেরিয়েছিল। সব দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছে ব্যাপারিরা। একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছে।

এ সবই বাজারে এসে শোনা গেল। কয়েকজন বাজারের চত্বরে কুপি জ্বালিয়ে বসে তাস খেলছিল। তারাই বলল।

ভাগ্য ভাল যে বেগুনের বস্তাটা বাড়ি অবধি টেনে নিতে হল না। বাজারের চৌকিদারকে বলে মহাজনের দোকানের সামনে রেখে বাড়ি ফিরল অতীশ। টাকাটা আজ পেলে ভাল হত।

বাড়ির পিছন দিকটায় তাদের পাড়া। ল্যাংড়ার ঠেক। বড় রাস্তা থেকে বড় বাড়ির মস্ত নিরেট দেওয়াল ঘেঁসে সরু গলি দিয়ে ঢুকতে হয়। গলির এক পাশে বড় বাড়ির দেওয়াল, অন্য পাশে গরিবগুর্বোদের খোলার ঘর। কুলিকামিন, ঠেলাওয়ালা রিক্সাওলাদের বাস।

অন্যান্য দিনের তুলনায় পাড়াটা আজ অন্ধকার আর নিঃঝুম। মানুষ ভয় পেয়েছে। আজকাল মানুষ সহজেই ভয় পায়। ঠ্যাং টেনে টেনে হাঁটছে অতীশ। ব্যথা বাড়ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে টেরই পাওয়া যায় না। কিন্তু যেই একটায় ব্যথা বা চোট হল তখনই সেটা যেন জানান দিতে থাকে। এই এখন যেমন ব্যথা-বেদনার ভিতর দিয়ে তার ডান পা জানান দিচ্ছে, ওহে, আমি তোমার ডান পা! বুঝলে ? আমি তোমার ডান পা! খুব তো ভুলে থাকো আমায়, এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছ তো!

অতীশ বিড়বিড় করে, পাচ্ছি বাবা, খুব পাচ্ছি। এখন বাড়ি অবধি কোনওক্রমে বয়ে দাও

আমাকে। তারপর জিরেন।

কথাটা মিথ্যে। কারণ আগামী কাল প্রগতি সংঘের স্পোর্টস। বরাবর ওরা ভাল প্রাইজ দেয়। এবারও ভি আই পি সুটকেস, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, হাতঘড়ি, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি প্রাইজ আছে। বিধান ভৌমিকের চিট ফান্ডের কাঁচা পয়সা প্রগতি সংঘের ভোল পাল্টে দিয়েছে। বিধান এবার সেক্রেটারি। তা ছাড়া বাবু মল্লিক আছে। গত বছর যে বিরাট ফাংশন করেছিল তাতে বোম্বে থেকে ফিল্ম আর্টিস্ট আর গায়ক-গায়িকাদের উড়িয়ে এনেছিল। অনেক টাকার কামাই। সেইসব টাকার একটা অংশ প্রগতি সংঘের পিছনে কাজ করছে। প্রগতি সংঘ এখন শুধু এই শহর বা মহকুমা নয়, গোটা জেলারই সবচেয়ে বড় ক্লাব।

অতীশের প্রাইজ দরকার। স্কুল কলেজে যত প্রাইজ সে পেয়েছে তার প্রায় সবই বেচে দিতে পেরেছে সে। কাপ-মেডেলগুলো তেমন বিক্রি হয় না, হলেও খুব নামমাত্র দামে। তবে অন্য সব জিনিস বেচলে কিছু পয়সা আসে। আজ রাতে পায়ে একটু সেঁকতাপ দিতে হবে। একটু মালিশ লাগাবে। সকালে একটু প্র্যাকটিস। তারপর দুপুরেই নামতে হবে ট্র্যাকে। সে এ তল্লাটের নাম-করা দৌড়বাজ, সে পুরুত, সে একজন কায়িক শ্রমিক এবং একজন কমার্স গ্র্যাজুয়েট। তবু নিজেকে তার একটা বিস্ময়ের বস্তু মনে হয় না। মনে হয়, এরকম হতেই পারে।

এই ফিরলে গুরু ? বলে অন্ধকারে একটা ছোকরা একটু গা ঘেঁসে এল।

নির্বিকার অতীশ বলল, হ্যাঁ।

খুব ঝাড়পিট হয়ে গেল আজ। রাস্তায় পুলিশ দেখলে না ?

হ্যাঁ।

সাত আটজনকে তুলে নিয়ে গেছে। ল্যাংড়া হাপিস।

ও।

ল্যাংচাচ্ছ কেন ? কী হয়েছে ?

ও কিছু নয়। একটু টান লেগেছে শিরায়।

ছেলেটা বিশু। বন্ধুমতো, একটু চামচাগিরিও করে তার। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, বাবু ঠিক এন্ট্রি নিয়ে নেবে, বুঝলে ? আজ বড় বাড়ির অন্দরের গেট অবধি এসে গিয়েছিল। বহুত বোমাবাজি হয়েছে। ল্যাংড়া শেষ অবধি চাল বেয়ে বেয়ে দক্ষিণের খালধারে নেমে পালিয়ে যায়।

এসব অতীশকে স্পর্শ করে না। এসব যেন অন্য জগতের খবর। ওই জগতের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই। তার জগৎ খুব ছোটো, সংকীর্ণ এই গলিটার মতোই। সে জানে অনেক ব্যথা বেদনা বাধা সয়ে তাকে গতি বজায় রাখতে হবে। আজ রাতে ব্যথাটা যদি কমে ভাল, নইলে কাল এই বিষব্যথা নিয়েই তাকে দৌড়ে নামতে হবে। হাততালি নয়, জয়ধ্বনি নয়। তাকে একটা দামি প্রাইজ পেতেই হবে। সকালে আদায় করতে হবে বেগুনের টাকা। তার অনেক কাজ। বাবু আর ল্যাংড়ার কাজিয়ায় তার কোনও কৌতূহল নেই।

তবে ল্যাংড়া ইস্কুলে অতীশের সঙ্গে একক্লাসে পড়ত। ভীষণ ভাব ছিল দুজনে। প্রায় সময়েই গলাগলি করে ফিরত। একসঙ্গে খেলে বেড়াত রাস্তায় রাস্তায়। একটা তফাত ছিল। রেগে গেলে ল্যাংড়া খারাপ গালাগাল দিত লোককে। অতীশের মুখে খারাপ কথা আসত না। দিনরাত পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা গালাগালি শুনে আসছে অতীশ জন্মাবধি। আজ অবধি শালা কথাটাও উচ্চারণ করতে তার সংকোচ হয়। ল্যাংড়া জলের মতো ওসব বলত। সিক্সে দুবার ফেল করে পড়া ছেড়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে তার অন্য লাইনে উত্থান হতে লাগল। তখন কালো গুণ্ডার যুগ। চোলাই আর জুয়ার ঠেক তো ছিলই তার। এইসব বস্তিতে যে সব ছোটখাটো মেশিনপত্র নিয়ে নানা ব্যবসা করে লোক তাদের কাছ থেকে তোলা নিত। বড় কালীপুজো করত, যেমন গুণ্ডারা করেই থাকে। ল্যাংড়া কিছুদিন কালোর সাকরেদি করেছিল। কিন্তু বড় হওয়ার ইচ্ছে তার বরাবর। কী কারণে কে জানে, কালোর সাকরেদ পল্টুকে টিউবওয়েলের ধারে এক রাতে খুন করল ল্যাংড়া। তুচ্ছ কারণই হবে। হয়তো খুনটা ছিল আত্মপ্রকাশের ঘোষণা। দিন তিনেক দু পক্ষের বিচ্ছিন্ন মারপিট চলল। তারপর কালো বেগতিক বুঝে পাড়া ছেড়ে পালাল। ল্যাংড়া লিডার হয়ে গেল।

কালো ছমাস বাদে এল। মস্তানি করতে নয়, বোধহয় পেটের তাগিদে। আর বউ বাচ্চার টানে। ল্যাংড়া ভরসন্ধেবেলা ল্যাম্পপোস্টের নীচে তার গলায় ড্যাগার ঠেকিয়ে কথা আদায় করল। নিজের লেদ মেশিন আর কেরোসিনের দোকান ছাড়া অন্য কিছুতে মাথা গলাতে পারবে না। কালো রাজি হয়ে গেল।

এসব ঘটনায় অবশ্য কোনও অভিনবত্ব নেই। গুণ্ডাদের উত্থান পতন এভাবেই সর্বত্র হয়ে থাকে। হয়তো এতটা শান্তিপূর্ণভাবে নয়, হয়তো দু-চারটে খুনজখম হয়। ল্যাংড়া শুধু পাড়াই দখল করেনি, সে এখন শহরটাই দখল করতে চাইছে। হয়ে উঠতে চাইছে হিরো। খানিকটা হয়েছেও। নইলে অপরূপা দিদিমণির মতো এম এ বিটি সুন্দরী মেয়ে ওর প্রেমে পড়ে?

গতবছর বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় খুব ঝামেলা হয়েছিল। প্রতিবারই হয়। মেয়েরা পরীক্ষায় বসলেই তাদের যত ভক্ত প্রেমিক, হবু প্রেমিক তাদের সাহায্য করতে এসে জোটে। প্রেমিকাদের ইমপ্রেস করতে অনেক দুঃসাহসী কাণ্ডও করে তারা। দেয়াল টপকে লাইন বেয়ে উঠে নকল সাপ্লাই, খাতা বাইরে এনে প্রশ্নের উত্তর লিখে ফের দিয়ে আসা ইত্যাদি। স্কুল কর্তৃপক্ষ জ্বালাতন হয়ে শেষে শান্তিরক্ষার জন্য ল্যাংড়াকে ডেকে এনেছিল। ল্যাংড়ার বীরত্ব, চেহারা এবং হয়তো আরও কিছু অপরূপা দিদিমণিকে একেবারে বিহ্বল করে ফেলল। ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সের অপরূপা ল্যাংড়ার চেয়ে বছর তিন চারের বড়। ভাল ঘরের মেয়ে। বাবা সরকারি অফিসার ছিলেন, এখন রিটায়ার্ড, দাদা বাইরে কোথায় যেন প্রফেসর। শোনা যাচ্ছে, অপরূপা আজকাল ল্যাংড়াকে পড়াচ্ছে, সৎপথে আনার চেষ্টা করছে। বিয়েও খুব শিগগিরই।

এসব ঘটে যায় সিনেমার ছবির মতো। অতীশের কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। চারপাশে কত কী ঘটে যাচ্ছে, সেসবের মাঝখান দিয়ে তার জীবনটা চলেছে ঠিক যেন একটা সরু গলির মতো।

বিশু সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আজ দিদিমণি বাবুকে খুব রগড়ে দিয়েছে, বুঝলে?

তাই নাকি?

বোমবাজির আগে বাবু যখন বড় রাস্তায় পজিশন নিচ্ছিল তখন অপরূপা দিদিমণি রিক্সা করে এসে নামল। তখনই লেগে গেল। বাবু নাকি বলেছিল আপনি একজন শিক্ষিতা ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে ওরকম একটা নোংরা অশিক্ষিত গুণ্ডার সঙ্গে কী করে মেলামেশা করেন। দিদিমণি বহুত বিগড়ে গিয়ে চিল্লামিল্লি করতে লাগল, আপনি না মার্কসিস্ট! শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলে বেড়ান! কোন লজ্জায় বলেন?

প্রেমট্রেম নিয়ে মাথা ঘামায় না অতীশ। তবে তার মনে হল, প্রেম ব্যাপারটা হয়তো এরকমই।

বিশু বলল, অপরূপা দিদিমণি মেয়েছেলে না হয়ে পুরুষ হলে বহুত বড়া রুস্তম হত, বুঝলে গুরু? ল্যাংড়া লাগত না ওর কাছে। যখন বোমবাজি শুরু হল তখনও বেঁটে ছাতা নিয়ে বাবুকে তেড়ে মারতে যাচ্ছিল। তারপর কী করেছে জানো? থানায় গিয়ে বড়বাবুকে পর্যন্ত আঁখ দেখিয়েছে। বলেছে, বাবুর এগেনস্টে যদি কেস না লেখেন তো আমি চিফ মিনিস্টার আর প্রাইম মিনিস্টারকে জানাব। তারপরই তো পুলিশ নামল। নইলে ল্যাংড়ার যা অবস্থা করেছিল একদম কেরাসিন। বাবু আজই পাড়া দখল করে নিত।

পাড়া কে দখল করল না-করল তাতেও অতীশের কিছু যায় আসে না। বাবুদা লেখাপড়া জানা, ভদ্র ছেলে। এ পাড়ায় ঘর নিয়ে সে একসময়ে মার্কসবাদের ক্লাস নিত। তখন অতীশও তার ক্লাসে নিয়মিত গেছে। অনেক নতুন কথা শিখিয়েছিল বাবুদা। অধিকাংশই অবশ্য অতীশের এখন মনে নেই। শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা, যৌথ খামার, শ্রমিক আর কৃষকের অধিকার ইত্যাদি। পরে পার্টির গুরুতর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় মার্কসবাদের পাঠশালাটা উঠে যায়। সে পুরুতের ছেলে এবং পুজো আচ্চা করে বেড়ায় বলে বাবুদা কখনও টিটকিরি দেয়নি। বরং খুব আন্তরিকভাবেই বলত, পুজো করছ? ভাল করে করো। ওর মধ্যে কিছু আছে কি না খুঁজে দেখো ভাল করে। আমার কী মনে হয় জানো? ভগবানের চেয়ে অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হল সমাজে নিজের স্থানটা আবিষ্কার করা।

নিজের স্থানটা আজও আবিষ্কার করতে পারেনি অতীশ। যখন রিক্সা চালায় তখন ভাড়া নিয়ে

কত হেটোমেটো লোকও কত অপমান করে, মারতে আসে, গাল দেয়। আবার যখন কোনও বাড়িতে পুজো করতে যায়, তখন কত বুড়িধুড়িও মাটিতে পড়ে পায়ের ধুলো নেয়। সবজির পাইকার তাকে জিনিসের ন্যায্য দাম দিতে গড়িমসি করে, আবার ভিক্টরি স্ট্যান্ডে যখন দাঁড়ায় তখন কত হাততালি পায় সে। সুতরাং এ সমাজে তার স্থানটা কোথায় তা স্থির করবে কী করে সে ?

বিশু বলল, বাবু হুজ্জুতটা কেন করছে জানো ?

না। কেন ?

কিছুদিন আগে সুবিমল স্যার ল্যাংড়াকে ডেকে পাঠিয়ে বলে, তুই পার্টিতে চলে আয়, তা হলে পার্টি তোকে দেখবে। ল্যাংড়া মুখের ওপর না বলতে পারেনি। কিন্তু পরে বলে পাঠিয়েছে পার্টিতে যাবে না। স্বাধীনভাবে থাকবে। শালা বুদ্ধু আছে। পার্টির সঙ্গে লাগলে উড়ে যাবে একদিন। আজ পালিয়ে বেঁচে গেছে, কিন্তু রোজ তো আর লাক ফেবার করবে না, কী বলো গুরু ? বাবু ওকে ঠিক একদিন ফুটিয়ে দেবে। পার্টিতে গেলে দোতলা বাড়ি আর মোটরবাইক দুটোই হয়ে যেত।

ল্যাংড়ার আপাতত দুটো স্বপ্ন। একটা দোতলা বাড়ি করবে, আর একটা হোন্ডা মোটরবাইক কিনবে। পাড়ার সবাই সে কথা জানে। তার মানে এ নয় যে, এ দুটো হলেই ল্যাংড়া ভাল ছেলে হয়ে যাবে। তা নয়। আপাতত এ দুটো স্বপ্ন দেখছে, পরে আরও স্বপ্নের আমদানি হবে। অতীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই বেকারির যুগে মস্তানিও একটা ভাল প্রফেশন। ল্যাংড়াকে আর চাকরির ভাবনা ভাবতে হয় না, ভাত রুটির চিন্তা নেই।

খড়কাটা কলের পাশেই মদন দাসের খুপরির সামনে মাতাল মদনকে পেটাচ্ছিল তার লায়েক ছেলে পানু। পেটানোটা যেন জুতমতো হয় তার জন্য মদনের বউ নবীনা আর মেয়ে সুমনা তার দুটো হাত দুদিকে দিয়ে চেপে ধরে আছে। পিছন থেকে কোমর ধরে আছে ছেলে নয়ন। মদনের মুখ থেকে যেসব গালাগাল বেরোচ্ছে তার চেয়ে খারাপ কথা পৃথিবীতে আর অল্পই আছে। আগে মদনই মাতাল হয়ে ফিরে বাড়িসুদ্ধ লোককে পেটাত আর গাল দিত। আজকাল চাকা ঘুরে গেছে। ব্যাপারটা অতীশের খারাপ লাগে না। এ যেন অতীতের দেনা শোধ হচ্ছে। বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে গেছে দৃশ্য দেখতে । চোখ ভিডিও ক্যামেরা কাম টেপ রেকর্ডার। হাবিব তনবীরের নাটক পয়সা খরচা করে দেখতে যাওয়ার দরকার কি ?

বিশু এখানেই কেটে গেল। অতীশ দাঁড়াল না। এগোতে লাগল। এই যে হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় টেরই পাওয়া যায় না। কিন্তু এক একটা যখন বিগড়োয় তখন সেটাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে গুরুতর ভি আই পি। কুঁচকির সঙ্গে একটা সাইকোলজিক্যাল যুদ্ধে নামার চেষ্টা করছে অতীশ। হচ্ছে না। রবি ঠাকুরকে একবার কাঁকড়া বিছে কামড়েছিল। সেই অসহ্য ব্যথা ভুলবার জন্য রবি ঠাকুর শরীর থেকে মনকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। ফলে আর ব্যথা টেরই পেলেন না। মনকে শক্ত করতে পারলে হয়তো হয়। অতীশ মনে মনে জপ করতে লাগল, এটা আমার কুঁচকি নয়, এটা আমার কুঁচকি নয়....

একটু কমপ্রেস আর গরম চুন-হলুদ দিয়ে রাখবে আজ রাতে। দরকার হলে কাল স্পোর্টসের আগে একটা ব্যথার ইনজেকশন নিয়ে নেবে। তারপর ব্যথা দুনিয়ে যদি বিছানায় পড়ে থাকতে হয় সেভি আচ্ছা।

বাড়ি ফেরা কথাটাই ক্রমে অর্থহীন হয়ে আসছে অতীশের জীবনে। বাড়ি একটা ঠেক মাত্র। অনেকটা রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমের মতো। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার জন্য গাড়ি বদল করা মাত্র। তাদের একখানা মাত্র ঘর, সাতটি প্রাণী, একটা চৌকি আছে, তাতে বাবা শোয়। আর বাদবাকি মেঝেতে মাদুর পেতে। তাতেও জায়গা হয় না। অতীশ রাতে শুতে যায় ইস্কুলবাড়ির বারান্দায়। তাদের কলঘর নেই, বারোয়ারি পায়খানা, স্নানের জন্য দূরের পুকুর অথবা রাস্তার কল। তবু বাড়ি ফেরার একটা নিয়ম চালু আছে। জানান দিয়ে যাওয়া যে, আমি আছি।

মেঝেতে মাদুরের ওপর উপুড় করা একটা কৌটোর মাথায় হ্যারিকেন বসানো। সেই আলোয় ভাগ বসিয়েছে পাঁচ জন, বড়দি কুরুশ কাঠিতে অর্ডারি লেস বুনছে, ছোড়দি একটা সোয়েটারে ডিজাইন তুলছে, দুই ভাইবোন পড়ছে, মা চাল বাছছে, বাবা বিছানায় চাদরমুড়ি দিয়ে শোওয়া।

তাকে দেখে মা একটা শ্বাস ফেলল। বোধহয় অনেকক্ষণ ওই উদ্বেগের শ্বাসটি বুকে চেপে রেখেছিল।

কোথায় ছিলি ?

গাঁয়ে গিয়েছিলাম।

বড় বাড়ি থেকে বাহাদুর এই নিয়ে তিনবার এল খোঁজ করতে।

কী ব্যাপারে ?

বন্দনার অসুখ সেরেছে, আজ তাই নারায়ণপুজো। কর্তামা সকাল থেকে উপোস। তোর বাবার জ্বর, যেতে পারছে না। তাড়াতাড়ি যা।

মেদুর শব্দটার অর্থ খুব ভাল করে জানে না অতীশ। তবে তার বুকের ভিতরটা যেন মেদুর হয়ে গেল। একটা খাঁ খাঁ মরুভূমির মতো শুখা প্রান্তরে এ বুঝি মেঘের ছায়া, দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিপাত। দ্বিরুক্তি না করে সে হাতমুখ ধুয়ে পুজোর কাপড় পরে নামাবলী চাপিয়ে নারায়ণশিলা নিয়ে রওনা হল।

বড় বাড়িতে আসতে হলে আগে বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরে দেউড়ি দিয়ে ঢুকতে হত। আজকাল পিছনের ঘের-পাঁচিলের ভাঙা অংশটা দিয়েই ঢোকা যায়। আর ঢুকলেই অন্য জগৎ। স্বপ্নের মাখামাখি। ঊষর মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের মতোই কি ? চারদিককার ক্ষিন্ন ক্ষুব্ধ, দরিদ্র পটভূমিতে এ এক দূরের জগৎ। দোতলার ঘরে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা জাপানি পুতুলের সারি যেমন অবাক চোখে দেখত অতীশ, এ যেন সেরকমই কিছু। এখানে যেন ধুলো ঢোকে না, ময়লা ঢোকে না, নোংরা কথা ঢোকে না, মতবাদ ঢোকে না। বড় বাড়ি যেন এখনও কাচের আড়ালে জাপানি পুতুল।

তা অবশ্য নয়। বড় বাড়ি ভাঙছে। অবস্থা পড়ে যাচ্ছে। সবই জানে অতীশ। তবু আজও বড় বাড়িতে এলে তার বুকের ভিতরটা মেদুর হয়ে যায়। মন নরম হয়ে আসে।

কুল-পুরোহিত বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ার পর মেঘনাদ চৌধুরির বাবা হরিদেব চৌধুরি অতীশের বাবা রাখাল ভট্টাচার্যকে সামান্য মাসোহারায় পুরোহিত নিযুক্ত করেন। রাখাল ভট্টাচার্য অন্য দিকে তেমন কাজের লোক নন, কিন্তু পুজোপাঠ ভালই জানতেন। বাড়ির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন জগদ্ধাত্রী। রোজ রাখাল ভট্টাচার্য পুজো করতে আসতেন। অতীশ যখন সবে হাঁটতে শিখেছে তখন সেও বাবার সঙ্গে আসত। সেই বিস্ময়ের বুঝি তুলনা নেই। বস্তির নোংরা অপরিসর অন্ধকার ঘর থেকে যেন রূপকথার জগতে আসা। কত বড় বাগান, কী সুন্দর সিঁড়ি, কত বড় বড় ঘর, আলমারিতে সাজানো কত জিনিস। বাবা পুজো করত আর অতীশ গুটগুট করে হেঁটে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াত।

একদিন সে ছাদে উঠে গিয়েছিল একা। উঠেই সে বিস্ময়ে স্তব্ধ। কত বড় আকাশটা ! অথচ কত কাছে। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। দেখতে দেখতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তখন বিকেল। সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় চারদিক যে কী অপরূপ হয়েছিল সেদিন।

হরিদেব চৌধুরি সন্ধের পর ছাদে গিয়ে বসতেন। তাঁর জন্য একটা ডেক-চেয়ার পাতা ছিল ছাদে। অতীশ একসময়ে সেই বিশাল ডেকচেয়ারে উঠে বসল। তারপর আকাশ দেখতে দেখতে গভীর ঘুম। তাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে সারা বাড়িতে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল সেদিন। তাকে খুঁজে বের করেছিল প্রদীপদা। সেই থেকে প্রদীপদার সঙ্গে ভাব। যেখানেই প্রদীপদা সেখানেই সে। প্রদীপদা বাঁখারি দিয়ে ধনুক বানাত, পেয়ারার ডাল কেটে বানাত গুলতি, ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দিত। সব কাজে সাহায্যকারী ছিল সে। প্রদীপদা যখন পার্টি করতে গেল তখনও সে ছিল সঙ্গে।

বাবুদা একবার তাকে বুঝিয়েছিল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা এত সূক্ষ্ম আর এত চালাকিতে ভরা যে তা বুঝে ওঠাই কঠিন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওই সম্পর্কই ধ্বংস করে দিতে থাকে মানুষের মূল্যবান মেরুদণ্ড।

কথাটা উঠেছিল একটা বিশেষ কারণে। প্রদীপদা আর বাবুদার মধ্যে পার্টিতে একটা খাড়াখাড়ি

চলছিল। সুবিমল স্যার প্রদীপদাকে একটু বিশেষ পছন্দ করতেন বলেই বোধহয়। প্রদীপদা খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল না, পলিটিক্সও হয়তো ভাল বুঝত না। কিন্তু সে যা করত তা প্রাণ দিয়ে করত। একটা জান-কবুল ভাব ছিল। সুবিমল স্যারের পক্ষপাত বোধহয় সেই কারণেই। সেই সময়ে বাবু একদিন অতীশকে পাকড়াও করে বলেছিল, তুই কি ওর চাকর যে ওর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াস ? তোর বাবা ওদের কর্মচারী হতে পারেন, তুই তো নোস।

একটু তর্ক করার চেষ্টা করেছিল অতীশ। পারেনি। বাবুদার কাছে তখন সে মার্ক্সবাদের পাঠ নেয়, পারবে কেন ? মুখে না পারলেও মনে মনে সে জানত, বাবুদার ব্যাখ্যাটা ভুল। তার সঙ্গে প্রদীপদার প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেই থেকে মনে একটা ধন্ধের সঞ্চার হল অতীশের, কে জানে হয়তো বাবুদাই ঠিক বলছে। মনের গভীর অভ্যন্তরে হয়তো এখনও সামন্ত প্রভুর প্রতি আনুগত্যের ধারা রয়ে গেছে। এবং একথাও ঠিক, সে প্রদীপদার এক নম্বর আজ্ঞাবহ। বরাবর প্রদীপদা যা বলেছে তাই করে এসেছে। কেন করেছে ? এই দাস্যভাব কোথা থেকে এল ?

নানা মতবাদের প্রভাবে মানুষের স্থির চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। হরেক রকম ব্যাখ্যা আর অপব্যাখ্যায় তৈরি হয় কূট সন্দেহ। আর সন্দেহ ঢুকে গেলেই অনেক সহজ জিনিসও জটিল হয়ে ওঠে। কথাটা কানে ঢোকার পর থেকেই সে একটা অসহ্য অস্থিরতায় ভুগেছে। পরদিন ভোরবেলা প্র্যাকটিসের সময় সে এত জোরে দৌড়েছিল যেমনটি আর কখনও দৌড়োয়নি। বোধহয় মাইল দশেকের বেশিই হবে। পরেশ পালের ইটভাঁটি ছাড়িয়ে সেই লোহাদিঘি পর্যন্ত।

বাগানটা পার হতে আজ সময় নিল অতীশ। বুকে অনেক মেদুরতা। আতা গাছটার নীচে বসে আজকাল তিনতাস খেলে ল্যাংড়া আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। ওইখানে শিশু বন্দনা বসে পুতুল খেলত শীতের রোদে। অতীশ কতবার তার পুতুলের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়েছে। মিছে নেমন্তন্ন অবশ্য। কাঁকর দিয়ে তরকারি। পাথরকুচি পাতার লুচি। কাদামাটি দিয়ে পায়েস। একটু বড় হয়ে বন্দনা যখন গান গাইত, তবলায় ঠেকা দিতে ডাক পড়ত তার। বড় বাড়ির আলমারিতে সাজানো জাপানি পুতুলের মতোই দেখতে ছিল মেয়েটা। মুখে স্বপ্ন মাখানো। কী অবাক দৃষ্টি ছিল চোখে ! তখন বালিকা-বয়স, তখনও শ্রেণীচেতনা আসেনি। তখনও গরিব বলে চিনতে পারেনি অতীশকে। কর্মচারী বলে চিনতে পারেনি। তখন বায়না করত। পেনসিল এনে দাও, গ্যাস-বেলুন এনে দাও, রথ সাজিয়ে দাও, একটু বড় হয়ে যখন গরিব আর কর্মচারী বলে বুঝতে শিখল তখন ফরমাশ করত। উল এনে দাও, ট্রেসিং পেপার নিয়ে এসো, ডলির বাড়ি থেকে নজরুলের স্বরলিপিটা এনে দিয়ে যাও। বায়না আর ফরমাশের মধ্যে তফাত হল।

প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা আর কাটিয়ে উঠতে পারল না তারা। এখনও বড় বাড়ির হুকুম হলে তারা সব করতে পারে। মেঘনাদ চৌধুরি তার শালিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই মাসোহারা উঠে গেছে। তবু এক অদৃশ্য নিয়মে এরা এখনও তাদের প্রভুই। এইসব সামন্ত প্রভুর স্বরূপ চিনিয়ে দিতেই তো বাবুদা মার্কসবাদের পাঠশালা খুলেছিল। অতীশ শিখেওছিল অনেক, কিন্তু তাতে কাজ বিশেষ হয়নি। আজও বড় বাড়িতে ঢুকতে ঘাড় নুয়ে পড়ে। স্মৃতি খারাপ জিনিস, শ্লথ করে দেয় মানুষকে, ব্যাহত হয় গতি, তবু বড় বাড়িতে ঢুকলেই দামাল সব স্মৃতি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাগানটা খুব আস্তে আস্তে পার হল অতীশ।

সামন্ততান্ত্রিক সিঁড়িটার গোড়ায় এসে ঊর্ধ্বমুখ হল সে। কেন যে এত উঁচু উঁচু বাড়ি বানাত সে আমলের লোকেরা ! একতলা থেকে দোতলায় উঠতেই যেন হাজারটা সিঁড়ি। গুনতিতে হাজার না হলেও টাটানো কুঁচকি নিয়ে উঠতে হাজারটারই পেরাসনি পড়ে যাবে।

বন্দনা দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়। এত রোগা, সাদা আর বিষণ্ণ হয়ে গেছে এ যেন বাস্তবের বন্দনা নয়, অনেকটাই বিমূর্ত, তাকে দেখেই বন্দনা ঝঙ্কার দিল, এতক্ষণে আসার সময় হল ! মা সকাল থেকে উপোস করে বসে আছে। কাণ্ডজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে তোমার ! মা, ওমা, দেখ শাঁখ বাজাবে না উলু দেবে। তোমার পূজনীয় পুরুত ঠাকুর এসে গেছে।

বাকি সিঁড়ি কটা নিজেকে হিঁচড়ে টেনে তুলতে দম বেরিয়ে গেল অতীশের। উঠে খানিকক্ষণ হাঁফ সামলাল। কাল স্পোর্টসের মাঠে এই কুঁচকি তাকে কতটা বহন করবে কে জানে।

বড় বাড়ির পুজোর ঘরটি চমৎকার। আগাগোড়া শ্বেত পাথরে বাঁধানো মেঝে, মস্ত কাঠের সিংহাসনে বিগ্রহ বসানো, সামনে পঞ্চপ্রদীপ, ধূপ। স্থলপদ্ম আর শিউলির গন্ধে ম ম করছে চারদিক। পুরুতের জন্য মস্ত পশমের আসন পাতা।

তার ভিতরে দুজন লোক ঢুকে বসে আছে। রাখাল ভট্টাচার্য আর কার্ল মার্কস। যখন মার্কসবাদের পাঠশালায় পাঠ নিত তখন থেকেই তার ভিতরে এই দুজনের ধুন্ধুমার লড়াই। কখনও এ ওকে ঠেসে ধরে, কখনও ও একে পেড়ে ফেলে। মাঝে মাঝে লড়াই এমন তুঙ্গে ওঠে যে কে কোন জন তা চেনাই যায় না। কেউ হয়তো কার্ল ভট্টাচার্য হয়ে যায়, কেউ হয়ে যায় রাখাল মার্কস। এই দুজনের পাল্লায় পড়ে সে হয়েছে একটি বকচ্ছপ। আস্তিক না নাস্তিক তা বোঝা দুস্কর।

আচমন সেরে সে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, যজ্ঞ হবে নাকি কর্তামা ?

কর্তামা পাটায় চন্দন ঘষতে ঘষতে বললেন, হবে না মানে ?

হবে ? ডোবালে। বসতেই কুঁচকি আর এক দফা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। এই প্রবল অস্বস্তি নিয়ে কতক্ষণ টানা যায় ?

এই দুর্দিনেও পাড়া ঝেঁটিয়ে বুড়োবুড়ি এসে জুটেছে। মস্ত ঠাকুরঘরে দেয়াল ঘেঁসে সার সার আসনে তারা বসা। সব ক জোড়া চোখ তার দিকে। পুজোয় ফাঁকি দেওয়ার জো নেই।

এই কি তোদের পুরুত নাকি রে বন্দনা ? এ মা, এ তো বাচ্চা ছেলে। পারবে ?

পারে তো ! পুরুতেরই ছেলে।

তবু ভাই, পুরুত একটু বয়স্ক না হলে যেন মানায় না।

খুব সাবধানে মুখটা একটু ফিরিয়ে কোনাচে চোখে মেয়েটাকে একবার দেখে নিল অতীশ। শ্যামলা রং, কিন্তু মুখখানা ভারী সুশ্রী। চোখ দুটো একটু কেমন যেন। যেন এক জোড়া সাপ হঠাৎ বেরিয়ে এসে ছোবল দিল।

অতীশ উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করতে লাগল।

রাখাল ভট্টাচার্য সংস্কৃত শিখেছিলেন টোলে। উচ্চারণটি নিখুঁত। অতীশ শিখেছে রাখাল ভট্টাচার্যের কাছে। সংস্কৃত মন্ত্রের একটা গুণ হল, উচ্চারণ ঠিক হলে আর কণ্ঠস্বরে সঠিক সুরের একটা দোল লাগাতে পারলে আজও হিপ্নোটিক। শুধু গরিব কেন, বড়লোকেরও আফিং।

আফিংটা ক্রিয়া করছে নাকি ? ঘরটা হঠাৎ চুপ মেরে গেল ! গলাটা উঁচুতেই তুলেছে অতীশ। রাখাল ভট্টাচার্য এইরকমই শিখিয়েছে তাকে। মন্ত্র উচ্চগ্রামে পাঠ করতে হয়, তাতে বাড়ির সর্বত্র মন্ত্রের শব্দ পৌঁছয়, তাতে বায়ু পরিশ্রুত হয়, জীবাণু নাশ হয়, অমঙ্গল দূর হয়। মন্ত্রের অত শক্তি আছে কি না জানে না অতীশ। আছে কি নেই বিচার করার সে কে ? তার কাজ হল করে যাওয়া। ভাল যদি কিছু হয় তো হোক।

যজ্ঞ শেষ করে শান্তিজল ছিটিয়ে অতীশ উঠল। ঘোষাল ঠাকুমা ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এসে এক গাল হেসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, কী পুজোটাই করলি দাদা আজ ! স্বচক্ষে দেখলুম ঠাকুর যেন নেমে এসে সিংহাসনে বসে হাসছেন।

বটে ঠাকুমা ? বলে অতীশ একটু হাসল।

তোর ওপর কি আজ ভর হয়েছিল দাদা ?

তা হয়তো হবে। কত কী ভর করে মাথায়।

ও দাদা, তুই বি কম পাশ এত ভাল পুরুত, ভদ্রলোকের ছেলে, তার ওপর বামুন, রিক্সা চালানোটা ছেড়ে দে না কেন দাদা ! ও কি তোকে মানায় ?

রিক্সা চালানোর কথা উঠলেই মুশকিল। কর্তামা নিজেও একদিন না জেনে তার রিক্সায় উঠেছিলেন। ভাড়া দেওয়ার সময় মুখের দিকে চেয়ে আঁতকে উঠলেন, তুই ! তুই রিক্সা চালাচ্ছিস ?

শ্রমের মর্যাদার কথা এঁদের বুঝিয়ে লাভ নেই। এঁরা বুঝবেন না। তাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল অতীশ। কর্তামা রাগের চোটে কেঁদেই ফেললেন প্রায়। তুই না আমাদের পুরুত ! ছিঃ ছিঃ, তোর রুচিটা কী রে ?

তার এক সহপাঠিনী অনুকাও না জেনে তার রিক্সায় উঠেছিল। মাঝপথে হঠাৎ অতীশ রিক্সা চালাচ্ছে টের পেয়ে চলন্ত রিক্সা থেকে লাফিয়ে পড়ে শাড়িতে পা জড়িয়ে কুমড়ো গড়াগড়ি।

তবু তো বেগুনের বস্তার কথা এরা জানে না।

ঘোষাল ঠাকুমা তার ডান হাতখানা ধরে আছে এখনও, ওসব তোর সইবে না রে ভাই। ছেড়ে দে।

ঘোষাল ঠাকুমা তার তেরো বছরের নাতনি সুচরিতার সঙ্গে অতীশের বিয়ে ঠিক করে রেখেছেন। তার মায়ের কাছে প্রস্তাব গেছে। মা হেসে বলেছে, আপনার নাতনিকে আমার ছেলে খাওয়াবে কী মাসিমা ? ছেলে আগে দাঁড়াক।

ঘোষাল ঠাকুমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতীশ দাঁড়াবেই।

দাঁড়াতেই চাইছে অতীশ, তার মতো আরও বহু ছেলে ছোকরাও দাঁড়াতে চাইছে। দাঁড়াতে গিয়েই যত ঠেলাঠেলি আর হুড়োহুড়ি। পলিটিক্স করে বাবুদা দাঁড়িয়ে গেল, মস্তানি করে ল্যাংড়া। অতীশ কি পারবে ? যে গলিপথ সে অতিক্রম করছে তার শেষে জয়মাল্য নিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে নেই, অতীশ জানে।

কর্তামা পেতলের গামলায় সিন্নি মাখতে মাখতে মুখ তুলে বললেন, কী কাণ্ড হয়েছে জানিস ? তোদের ওই ল্যাংড়া দলবল নিয়ে আমাদের বাগানের ভিতরে ঢুকে দেয়াল টপকে বাইরে বোমা মারছিল। উল্টে বাইরের ছেলেরাও ভেতরে বোমা ফেলেছে। কী কাণ্ড বাবা, ভয়ে দরজা জানালা এঁটে ঘরে বন্ধ হয়ে ছিলাম। গোপালটা বাগানেই থাকে। বুড়ো মানুষ, হার্টফেল হয়ে মারা যেতে পারত। মদন তাকে ভিতরবাড়িতে টেনে আনতে গিয়েছিল, এই বড় ছোরা নিয়ে মদনকে এমন তাড়া করেছে যে পালানোর পথ পায় না।

অতীশ চুপ করে রইল। এরকমই হওয়ার কথা।

কর্তামা করুণ মুখ করে বললেন, সন্ধেবেলা হীরেন দারোগা এসে কথা শুনিয়ে গেল। আমরা নাকি যণ্ডাগুণ্ডাদের প্রশ্রয় দিচ্ছি। ঘটনা পুলিশকে জানাচ্ছি না। আমাদের বাড়িতে নাকি বোমা মজুত রাখা হয়। আজ আমি ঠিক করে ফেলেছি, বাড়ি বিক্রি করে দেব। শাওলরাম মাড়োয়ারি কিনতে চাইছে। ছেলে মেয়ে রাজি ছিল না বলে মত দিইনি। আজ ঠিক করে ফেলেছি। এত বড় বাড়ি ঝাড়পোঁছে কষ্ট, ট্যাক্সও গুনতে হয় একগাদা। আমাদের এত বড় বাড়ির দরকার কী বল !

দেয়ালটা সারালে হয় না কর্তামা ?

সে চেষ্টাও কি করিনি। মিস্ত্রি বলল, দেয়াল ঝুরঝুরে হয়ে গেছে, ভাঙা জায়গায় গাঁথনি দিলে দেয়ালসুদ্ধু পড়ে যাবে। মেরামত করতে হলে চল্লিশ ফুট দেয়াল ভেঙে ফেলে নতুন করে গাঁথতে হবে। তার অনেক খরচ।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নাইলনের ব্যাগে ভরে অতীশ যখন সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে তখন মেয়েটা সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়ে ডাকল, শুনুন !

অতীশ মুখ তুলে শ্যামলা মেয়েটিকে দেখতে পেল। ছিপছিপে চেহারা। চোখ দুখানা এত জিয়ন্ত যে তাকালেই একটা সম্মোহনের মতো ভাব হয়।

কিছু বলছেন ?

আপনার সংস্কৃত উচ্চারণ কিন্তু খুব সুন্দর।

ও। তা হবে।

আপনি বোধহয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের একটু নকল করেন, তাই না ?

অতীশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, তা হবে।

তবু বেশ সুন্দর। আমি দীপ্তি। বন্দনার পিসতুতো দিদি।

ও। অতীশ আর তা হবে বলল না। বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল অবশ্য।

আমি খুব বিচ্ছু মেয়ে। ভাব করলে টের পেতেন। কিন্তু আপনি যা গোমড়ামুখো, ভাব বোধ হয় হবে না।

আমি বড় সামান্য মানুষ। আমার সঙ্গে ভাব করে কী হবে ? ভাব হয় সমানে সমানে।

তাই বুঝি! আমি কিন্তু জমিদার-বাড়ির কেউ নই। সামান্য একজন অধ্যাপকের মেয়ে। আমার অত প্রেজুডিস নেই। আপনি কি নিজেকে খুব ছোট ভাবেন ?

নিজেকে যে কী ভাবে অতীশ তা কি সে নিজেই জানে! কথাটার জবাব না দিয়ে সে একটু হাসল।

আমি এখানে বেড়াতে এসেছি। কিন্তু আসতে না আসতেই কী কাণ্ড! শহরটা যে একটু ঘুরে দেখব তার উপায় নেই। আপনি আমাকে শহরটা একটু ঘুরিয়ে দেখাবেন ?

আমি ?

নয় কেন ? আমার তো আর সঙ্গী নেই। বন্দনা সবে জ্বর থেকে উঠেছে, বিলু ছেলেমানুষ, মামিমার শরীর ভাল নয়। কে আমার সঙ্গী হবে বলুন তো! দেখাবেন প্লিজ ?

কীসে ঘুরবেন ? হেঁটে ?

কেন, আপনার রিক্সায়!

মেয়েটা অপমান করতে চাইছে কি না বুঝবার জন্য অতীশ চকিতে তার দিকে তাকাল।

মেয়েটার মুখে একটু রসিকতা নেই। একটু ঝুঁকে চাপা আন্তরিক গলায় বলল, আপনি রিক্সা চালান জেনে আমি ভীষণ ইমপ্রেসড। মুভ্‌ড্‌। এরকম সাহস কারও দেখিনি। আমি আপনার সঙ্গেই ঘুরতে চাই। রিক্সা চালিয়ে আপনি এই সমাজকে শিক্ষিত করছেন। আপনাকে শ্রদ্ধা করা উচিত।

অতীশের হাসি পাচ্ছিল। এত শক্ত কথা সে ভাবেনি। বলল, আচ্ছা।

কালকেই। সকালে যখনই আপনার সময় হবে। প্লিজ!

বাড়ি ফিরে যখন কুঁচকিতে গরম চুন-হলুদ লাগাচ্ছিল তখন অতীশ মাকে জিজ্ঞেস করল, ও বাড়ির দীপ্তিকে চেনো ?

কে দীপ্তি ? বন্দনার সেই পিসতুতো বোনটা নাকি ?

হ্যাঁ।

বড়দি সেলাই করতে করতে বলল, পাজির পা-ঝাড়া।

মা বলল, স্বামীটা তো ওর জ্বালাতেই বিষ খেয়ে মরল। একটা দু বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা। স্বামী এক কাঁড়ি টাকা রেখে গেছে। পায়ের ওপর পা তুলে খাচ্ছে।

অতীশ অবাক হয়ে বলল, বিধবা ? কই, দেখে মনে হল না তো!

মা একটু বিষ মেশানো গলায় বলে, মনে হবে কী করে ? ডেঁড়েমুশে মাছ মাংস খাচ্ছে, রংচঙে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেন্ট পাউডার লিপস্টিক মাখছে, কুমারী না বিধবা তা বোঝার জো আছে।

বড়দি দাঁতে একটা সুতো কেটে বলল, চরিত্রও খারাপ।

মেয়েদের এই একটা দোষ। কারও কথা উঠলেই তার দোষ ধরে নিন্দেমন্দ শুরু করে দেবে। এ বাড়িতে সেটা খুবই হয়ে থাকে। মা আর দিদিদের প্রিয় পাসটাইম।

মা বলল, হঠাৎ ওর কথা কেন ?

অতীশ গম্ভীর গলায় বলল, আলাপ হল।

বড়দি বলল, তবে মেয়েটার গুণও আছে। নাচ গান জানে, লেখাপড়া জানে। কলেজে পড়ায়।

মা বলল, অমন লেখাপড়ার মুখে আগুন।

ব্যাগটা উপুড় করল মা। তারপর জিনিসপত্রের দিকে চেয়ে থেকে বলল, এই দিল ? চাল তো আধ কেজিও হবে না। এই নাকি ভুজ্যি ? কাঁচা পেঁপে, ছটা আলু, উচ্ছে, দুটো বেগুন, আর দশটা টাকা মোটে দক্ষিণা! বড় বাড়ির নজর নিচু হয়ে যাচ্ছে। আগে কত দিত।

বড়দি বলল, কর্তামা আর পারে না। ওদের আয় কী বলো তো!

নেই-নেই করেও আছে বাবা। পুরনো জমিদারদের কত কী লুকোনো থাকে।

কর্তামার নেই মা। তার দরাজ হাত। থাকলে কি বাড়ি বিক্রি করার কথা ভাবত ?

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

যখন অনেক রাতে খাটিয়া নিয়ে ইস্কুলবাড়ির বারান্দায় শুতে যাচ্ছিল অতীশ তখনও ওই দুটো চোখ বার বার ছোবল দিচ্ছিল তাকে। একটা মৃদু বিষ নেশার মতো আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে। একটা ফিকে জ্যোৎস্না উঠেছে আজ। চারদিক ভুতুড়ে। শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম এল না। মাঝরাতে দূরে বোমার শব্দ শুনতে পেল, পুলিশের জিপ আর ভ্যান দ্রুত চলে গেল, কোথায় একটা সমবেত চিৎকার উঠল।

প্রদীপদা খুন হল রথতলার তেমাথায়। রাত তখন দেড়টা বা দুটো। তারা চারজন ছিল। প্রদীপদা, সে, দলের আর দুটো ছেলে। রথতলার তেমাথার কাছ বরাবর সুনসান রাস্তায় আচমকা অন্ধকার ফুঁড়ে আট দশ জন ছেলে দৌড়ে এল বাঁ দিক থেকে। মুখে কালিঝুলি মাখা। হাতে রড, চপার, ড্যাগার। আত্মরক্ষার জৈব তাগিদের বশেই তাদের দলের দুটো ছেলে ছিটকে পালিয়ে গেল। প্রদীপ—গোঁয়ার প্রদীপ পালাল না। সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, অ্যাই, কী হচ্ছে ? কী চাও তোমরা ?

ব্যস, ওইটুকুই বলতে পেরেছিল প্রদীপ। পরমুহূর্তেই ঘিরে ফেলেছিল আততায়ীরা। চার-পাঁচ হাত পিছনে দাঁড়িয়ে শরীরে স্তম্ভন টের পেয়েছিল অতীশ। পালায়নি, কিন্তু সেটা বীরত্বের জন্য নয়। ভয় আর বিস্ময়ে তার শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। যেমন দৌড়ে এসেছিল তেমনি দৌড়ে আবার অন্ধকারে পালিয়ে গেল ওরা। অতীশ খুব ধীরে, সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেল প্রদীপের কাছে। প্রদীপের শরীর থেকে প্রাণটা তখনও বেরোয়নি। খিঁচুনির মতো হচ্ছে। শরীরটা চমকে চমকে উঠছে। গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা গার্গলের মতো শব্দ হচ্ছিল। রক্তে স্নান করছিল প্রদীপ। ওই রক্তের মধ্যেই হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার করছিল অতীশ, প্রদীপদা ! প্রদীপদা !

একবার চোখ মেলেছিল প্রদীপ। কিন্তু সে চোখ কিছু দেখতে পেল না। তারপর ধীরে ধীরে খিঁচুনি কমে এল। শরীরটা নিথর হয়ে গেল।

গোটা মৃত্যুদৃশ্যটা প্রায় নিষ্পলক অবিশ্বাসের চোখে দেখেছিল অতীশ। এইভাবে মানুষ মরে !

দলের ছেলেরা এল একটু বাদে। তুমুল চিৎকার করছিল তারা। রাগে, আক্রোশে। প্রদীপদাকে কাঁধে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তখন ঘাড় লটকে গেছে, হাতপাগুলো ঝুলছে অসহায়ের মতো, শরীরে প্রাণের লেশটুকু নেই।

বাবুদা তাকে ধরে তুলে নিয়ে এল সুবিমল স্যারের বাড়িতে। বলল, কী হয়েছিল সব বল।

প্রথমটায় কথাই এল না তার মুখে। জিভ শুকিয়ে গেছে, ভাষা মনে পড়ছে না। তাকে জল খাওয়ানো হল, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হল। তারপর বলতে পারল হেঁচকি আর কান্না মিশিয়ে।

পুলিশ তাকে জেরায় জেরায় জেরবার করে ছেড়েছিল। কর্তামা তাকে জর্জরিত করেছিলেন বিলাপে, তুই ছিলি, তবু বাঁচাতে পারলি না ওকে ? কীসের বন্ধু তুই ? কেমন বন্ধু ?... ওরে, সেই সময়ে কি একবার মা বলে ডেকেছিল ? জল চেয়েছিল ? নিরীহ মানুষ কর্তাবাবু পর্যন্ত বন্দুক নিয়ে খুনিকে মারবেন বলে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কাকে মারবেন তিনি ? আততায়ী কি একজন ? পরে পুলিশ তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বন্দুক নিয়ে যায়।

সেই ঘটনার পর পলিটিকস থেকে সরে এল অতীশ। তারপর থেকেই সে একা হয়ে গেল। সংকীর্ণ করে নিল নিজের জীবন-যাপনকে। পলিটিকস সে সত্যিকারের করেওনি কখনও। শুধু প্রদীপদার সঙ্গে লেগে থাকত বলে যেটুকু করা। তখন মাত্র উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, সেই বয়সে বুঝতও না কিছু।

পাড়ার মধ্যে একটা হুটোপাটির শব্দ পাওয়া গেল। একদল ছেলে দৌড়ে গেল সামনের রাস্তা দিয়ে। একটা কুকুর কেঁদে উঠল শাঁখের মতো শব্দ তুলে। একটা টর্চ জ্বলে উঠল কোথায় যেন। নিবে গেল ফের।

কাল সকালে উঠে একটু দৌড় প্র্যাকটিস করতে হবে। তারপর বেগুনের দাম তুলতে হবে। বাবার জ্বর না ছাড়লে আলুর দোকানে বসতে হবে। দুপুরে প্রগতি সংঘের স্পোর্টসে নামতে হবে। আর... আর... দীপ্তিকে রিক্সায় চাপিয়ে শহর দেখাতে হবে।

কাছেপিঠে দুম দুম করে উপর্যুপরি দুটো বোমা ফাটল। একটা মস্ত হাই তুলল অতীশ। ঘুম

পাচ্ছে। ইস্কুলবাড়ির খোলা বারান্দায় আজকাল গভীর রাতে বেশ ঠাণ্ডা লাগে। ভোর রাতে রীতিমতো শীত করে। গায়ে চাদরটা টেনে সে শুয়ে পড়ল।

দুখানা মায়াবী, রহস্যময় চোখ তার দুচোখে চেয়ে রইল। ওই চোখ দুখানাই তাকে পৌঁছে দিল ঘুমের দরজায়। ঘুমের মধ্যেও যেন চেয়ে রইল তার দিকে। পলকহীন, হিপ্নোটিক।

॥ তিন ॥

তাদের একটা খোকা হয়েছে। তারা খুব কষ্টে আছে, অভাবের কষ্ট, মনের কষ্ট, ছেলেমেয়ের জন্য মন-কেমন করা। যদি ফিরে আসতে চায় তবে রেণু কি কিছু মনে করবে? এটুকু কি মেনে নিতে পারবে না? তারা না হয় নীচের তলায় স্টোর রুমে থাকবে, মুখ দেখাবে না। রমার হাঁফানি আবার বেড়েছে, কে জানে বাঁচবে কি না, ছোট খোকাটারও বড্ড অসুখ হয় ঘুরে ঘুরে। রেণু কি পারবে রমাকে একটু মেনে নিতে? জীবনের তো আর খুব বেশি বাকি নেই। কে কতদিনই বা আর বাঁচবে? আয়ু তো ফুরিয়েই আসছে। রেণু কি পারবে না সেই কথা ভেবে ক্ষমা করে নিতে?

পাছে ডাকে চিঠি মারা যায় এবং পাছে ডাকের চিঠির জবাব মা না দেয় এবং পাছে নিজের ঠিকানা রেণুকে জানাতে হয় সেই জন্যই চিঠিটা মেঘনাদ পাঠিয়েছেন দীপ্তির হাতে।

চিঠিটা নিয়ে মা গভীর রাতে বিছানায় এল। তাকে ডেকে বলল, পড়।

বন্দনা অবাক হয়ে চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল, কার চিঠি মা?

তোর বাবার।

বাবা! গলায় যেন একটা আনন্দের ঝাপটা লাগল। বাবা চিঠি দিয়েছে! এর চেয়ে বড় খবর আর কী হতে পারে? চিঠিটা খুলল বন্দনা, তারপর ধীরে ধীরে পড়ল। প্রত্যেকটা শব্দ দুবার তিনবার করে। এ তার বাবার হাতের লেখা। এ চিঠিতে বাবার স্পর্শ আছে। আনন্দ আর বিষাদের একটা উথালপাথাল হচ্ছিল বুকের মধ্যে। চিঠি পড়তে পড়তে চোখ ভরে জল এল। বাবাকে কত কাল দেখে না বন্দনা! মা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। কিন্তু চেয়ে থাকা আর দেখা তো এক জিনিস নয়। মায়ের দু চোখও ভেসে যাচ্ছিল জলে।

কত বড় অপমান বল তো? রমাকে নিয়ে এ বাড়িতে এসে থাকতে চাইছে! আমার চোখের ওপর! আমার নাকের ডগায়! এমন নির্লজ্জও হয় মানুষ!

কেঁদো না মা। কেঁদো না। বাবা তো লিখেইছে, খুব কষ্টে আছে।

কষ্টে তো থাকবেই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে না! বিনা দোষে আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল, ছেলেমেয়ে দুটোর কথা পর্যন্ত ভাবল না একবার। প্রেমে এমন হাবুডুবু খাচ্ছিল যে নিজের মুরোদ কতটুকু তা অবধি মনে ছিল না। এখন তো কষ্ট পাবেই।

বাবাকে তুমি কী লিখবে মা?

কী লিখব? কিচ্ছু লিখব না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক। এ চিঠির আমি কোনও জবাব দেব না। ঠিকানাটা পর্যন্ত জানানোর সাহস হয়নি। পাছে আমি পুলিশ লেলিয়ে দিই। এই তো মুরোদ।

দীপ্তিদি বাবার ঠিকানা জানে না মা?

বলছে তো জানে না। সত্যি বলছে কি না কে জানে। হয়তো জানে, বলতে চাইছে না। ও হয়তো বারণ করে দিয়েছে।

দীপ্তিদি কি চিঠিটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এসেছে মা?

তাই তো মনে হচ্ছে, নইলে হুট করে আসবে কেন? এতদিন তো খোঁজখবরও নেয়নি। চিঠিটা হাতে দেওয়ার আগে অনেক নাটক আর ন্যাকামি করে নিল। রাতের খাওয়ার পর ওর ঘরে ডেকে নিয়ে 'কিছু মনে কোরো না মামি, রাগ কোরো না মামি' এইসব বলে খুব মামার দুর্দশার ইতিহাস শোনাল। মামার খাওয়া জোটে না, রোগা হয়ে গেছে। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে, বাজারে অনেক দেনা, এইসব। মামা নাকি আমাদের জন্য দিনরাত কাঁদে, বোনের কাছে গিয়ে দুঃখের কথা বলে।

কত কী। এইসব ভূমিকা করে চিঠিটা বের করে দিল।

মায়ের কঠোর মুখখানার দিকে চেয়ে বুক শুকিয়ে গেল বন্দনার। তার মা কাঁদছে বটে, কিন্তু কাঁদছে ঘেন্নায়, আক্রোশে, অপমানে। বাবাকে কখনও ক্ষমা করতে পারবে না মা। কিন্তু বন্দনার বুকটা ব্যথিয়ে উঠছে বাবার কষ্টের কথা জেনে। তার ভাবে ভোলা, কবির মতো মানুষ বাবা যে কখনও কোনও কষ্ট সহ্য করতে পারত না!

দীপ্তিকে কী বলেছে জানিস?

কী মা?

বলেছে চিঠিটা পড়ার সময় আমার মুখের ভাব কেমন হয় তা যেন ভাল করে লক্ষ করে। দীপ্তিই হাসতে হাসতে বলছিল। আরও বলল, মামা তোমাকে এত ভয় পায় যে তোমার কথা উঠলেই কেমন যেন ফ্যাকাসে আর নার্ভাস হয়ে যায়। এসব ন্যাকামির কথা শুনলে কার না গা জ্বলে যায় বল তো।

বন্দনা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, বাবা তো তোমাকে একটু ভয় পায় মা।

ছাই পায়। ভয় পেলে আমার নাকের ডগায় রমার সঙ্গে ঢলাঢলি করতে পারত?

বন্দনা তার দুর্বল দুই হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, বাবাকে ছাড়া কত দিন কেটে গেল আমাদের বলো তো! বাবার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। যদি সত্যিই না খেতে পেয়ে বাবা মরে যায় তখন কী হবে মা?

তার আমি কী করব? যদি এসে সত্যিই হাজির হয় তা হলে তো তাড়াতে পারব না। এ বাড়ি-ঘর তো তারই। আমি কে? যদি সত্যিই আসে তা হলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

দীপ্তিদিকে তুমি কিছু বলেছ মা?

এখনও বলিনি। কাল বলে দেব, ওর মামা ইচ্ছে করলে আসতে পারে। বিষয়-সম্পত্তির মালিক তো সে-ই। তবে যদি আসে তা হলে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।

কোথায় যাবে মা?

এ শহরে থাকার অনেক জায়গা আছে।

বন্দনা চুপ করে রইল। তারা কেউই অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারল না। ছুটছাট বোমার আওয়াজ শুনল। পুলিশের জিপ কতবার টহল দিল পাড়ায়। মাঝে মাঝে বিকট চেঁচামেচি হচ্ছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বন্দনা খুব নরম সতর্ক গলায় ডাকল, মা।

কী?

ধরা গলায় বন্দনা বলল, বাবার জন্য আমার মন বড্ড কেমন করছে মা। বাবাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ওই সর্বনাশীকে কেন যে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলাম! দীপ্তি বলছিল, রমার নাকি শরীর খুব খারাপ। হাঁফানিতে যদি মরত তা হলেও হাড় জুড়োত। কিন্তু শুনতে পাই হাঁফানির রুগিরা নাকি অনেককাল বাঁচে।

রমা মাসির মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল বন্দনার। কী করুণ আর সুন্দর মুখখানা! রমা মাসি মরে গেলে কি খুশি হবে বন্দনা? একটুও না। রমা মাসি বেঁচে থাকুক, বাবা ফিরে আসুক, মা আর বাবার মিলমিশ হয়ে যাক— হয় না এরকম? ভগবান ইচ্ছে করলে হয় না?

মা বলল, তার ওপর আবার বুড়ো বয়সে ছেলে হয়েছে। ঘেন্নায় মরে যাই। লজ্জা শরমের যদি বালাই থাকত। ফিরে তো আসতে চাইছে, এসে পাঁচজনকে মুখ দেখাবে কোন লজ্জায়? লোকে ছি-ছি করবে না? গায়ে থুথু দেবে না?

বন্দনার কাছে তার বাবা যা, মায়ের কাছে তো বাবা তা নয়। বাবা শত অপরাধ করে থাকলেও বন্দনার বুক ভরে আছে বাবার প্রতি ভালবাসায়। বাবার অপরাধ তার কাছে ক্ষমার যোগ্য মনে হয়। মায়ের কাছে তো তা নয়। তার মতো করে বাবাকে কেন যে ভালবাসতে পারে না মা সেইটেই বুঝতে পারে না বন্দনা।

অন্য পাশ ফিরে সে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। বাবার জন্য বড় ভার হয়ে আছে বুক। বাবা

খেতে পায় না, বাবা বড় কষ্টে আছে। তার চোখ ভেসে যায় জলে।

মাও যে ঘুমোতে পারছে না তা টের পায় বন্দনা। মা ছটফট করছে। এপাশ ওপাশ করছে। উঠে উঠে জল খাচ্ছে।

মা আর বাবার কি আর কোনওদিন মিলমিশ হবে না ভগবান ?

দীপ্তি অনেক বেলা অবধি ঘুমোয়। ভোরবেলা দুবার তার ঘরে গিয়ে ফিরে এল বন্দনা। আটটা নাগাদ যখন দীপ্তি উঠে ব্রাশে পেস্ট লাগাচ্ছে তখন গিয়ে বন্দনা তাকে ধরল।

আমাকে বাবার কথা একটু বলবে দীপ্তিদি ?

দীপ্তি খুব সুন্দর করে হাসল। বলল, আয়, বোস। তোকে মামি কিছু বলেছে বুঝি ?

হ্যাঁ। বাবার চিঠি পড়ে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। বাবা বুঝি তোমাদের বাড়ি যায় ?

আগে যেত না। মামা তো লাজুক মানুষ। একটা কেলেঙ্কারি করে ফেলায় খুব লজ্জায় ছিল। তবে ইদানীং যায়।

বাবার কি খুব কষ্ট দীপ্তিদি ?

দীপ্তির মুখখানা উদাস হয়ে গেল। বলল, কষ্ট! সে কষ্ট তোরা ভাবতেই পারবি না। হাওড়ার একটা বিচ্ছিরি বস্তির মধ্যে একখানা ঘর ভাড়া করে আছে। অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে। বাথরুম নেই, কল নেই। রাস্তার কলে গিয়ে চান করতে হয়। বারোয়ারি পায়খানা। একদম নরক। যে ঘরে থাকে সেখানেই তোলা উনুনে রান্নাবান্না। মামাকে দেখলে চিনতে পারবি না, এত রোগা হয়ে গেছে। মাথার চুল প্রায় সবই উঠে গেছে। একটা লোহার কারখানায় কী যেন সামান্য একটা চাকরি করে, উদয়াস্ত খাটায় তারা। কী যে অবস্থা, দেখলে চোখে জল আসে।

শুনতে শুনতেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিল বন্দনা। বলল, আরও বলো দীপ্তিদি।

কেন শুনতে চাস ? যত শুনবি তত কষ্ট। অমন একটা সুখী শৌখিন মানুষের যে কী দুর্দশা হয়েছে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

কাঁদতে কাঁদতে বন্দনা বলল আমাদের কথা বলে না ?

বলে না আবার! তোদের কথা বলতে বলতে হাউ হাউ করে কাঁদে।

বন্দনার হিক্কা উঠছিল। বলল, আমাকে ঠিকানাটা দেবে দীপ্তিদি ?

ঠিকানা! সেই বস্তির কি ঠিকানা-ফিকানা আছে ? থাকলেও ঘরের নম্বর-টম্বর তো জানি না। একদিন মামা আমাকে আর মাকে নিয়ে গিয়েছিল। ছেলেটার মুখেভাত হল তো, আয়োজন টায়োজন কিছু করেনি। একটু পায়েস রেঁধে মুখে ছোঁয়াল। সেদিনই মাকে আর আমাকে নিয়ে গিয়েছিল জোর করে। বলল, আমার তো আর এখানে স্বজন কেউ নেই, তোরাই চল। তাই গিয়েছিলাম। গিয়ে মনে হল, না এলেই ভাল হত। বাচ্চাটাও হয়েছে ডিগডিগে রোগা। এত দুর্বল যে জোরে কাঁদতে অবধি পারে না।

বন্দনা আকুল হয়ে বলল, কী হবে বলো তো দীপ্তিদি ?

পেস্ট মাখানো ব্রাশটা হাতে ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দীপ্তি। তারপর বলল, মামি বোধহয় রাজি হবে না, না ?

মা বলছে বাবা এ বাড়িতে এলে মা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

সে তো ঠিক কথাই। এ তো আর আগের যুগ নয় যে, পুরুষমানুষরা দুটো-তিনটে বউ নিয়ে একসঙ্গে থাকবে। মামাকে আমি সে কথা বলেওছি। একজনকে ডিভোর্স করো।

বাবা কী বলল ?

মামা কাউকে ত্যাগ করতে পারবে না। বড্ড নরম মনের মানুষ তো, একটু সেকেলেও।

বন্দনা ধরা গলায় বলল, আমার বাবা বড্ড ভাল। কিন্তু বুদ্ধি নেই। ওই রমা মাসিই তো সব গণ্ডগোল করে দিল।

দীপ্তি বন্দনার দিকে তাকিয়ে বলল, তোর তাই মনে হয় ? আমার কিন্তু রমাকে খারাপ লাগেনি। খুব নরম সরম, খুব ভিতু আর ভদ্র। সে বারবার বলছিল, ডিভোর্স করলে আমাকেই করুক। আমাদের তো তেমন করে বিয়েও হয়নি। কালীঘাটের বিয়ে, ওটা না মানলেও হয়। কিন্তু রেণুদি

তো ওঁর সত্যিকারের বউ। আমি রাক্ষসী, রেণুদির সর্বনাশ করেছি।

রমা মাসিকেই কেন ডিভোর্স করুক না বাবা।

দীপ্তি করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, সেটা কি খুব নিষ্ঠুরতা হবে না ? রমা কোথায় যাবে বল তো। বাপের বাড়িতে গেলে ঝেঁটিয়ে তাড়াবে। আর তো ওর কেউ নেই। মামা ত্যাগ করলে ওকে ভিক্ষে করতে হবে। নইলে সুইসাইড।

বন্দনা একটু শিউরে উঠল। না, সে ওসব চায় না। রমা মাসিকে তার কখনও খারাপ লাগত না। শুধু বাবার সঙ্গে ওরকম হল বলে—

দীপ্তি বলল, মামা কিছুতেই রমাকে ছাড়তে পারবে না। দুজনেই দুজনকে খুব ভালবাসে। অত অভাব, অমানুষিক কষ্ট, তবু ভালবাসে। এ যুগে এরকমটা ভাবাই যায় না।

এই ভালবাসার কথা শুনে বন্দনার একটুও ভাল লাগল না। বাবা কেন রমা মাসিকে এত ভালবাসছে ? বাবার তো ভালবাসার কথা মাকে।

দীপ্তি বাথরুমে গেলে বন্দনা এল পড়ার ঘরে। অস্থির। এ ঘরে বিলু শোয়। এখনও ঘুমোচ্ছে পড়ে।

এই বিলু, ওঠ। উঠবি না ?

কয়েকবার নাড়া খেয়ে বিলু উঠল।

কী রে দিদি ? তুই কাঁদছিস কেন ?

তোর বাবার কথা মনে হয় না ?

বিলু অবাক হয়ে বলে, কেন হবে না ? বাবার কী হয়েছে ?

কিছু হয়নি। বাবা এখন খেতে পায় না জানিস ? খুব কষ্টে আছে।

কে বলল ?

বাবার চিঠি এসেছে। দীপ্তিদি সব জানে।

বিলু ঘুম-ভাঙা চোখে একটু হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল। ছেলে বলেই বোধহয় বিলু খানিকটা ভুলে থাকতে পারে। তার আছে বাইরের জগৎ, আছে খেলা, আছে নানা কৌতূহল। বন্দনার ততটা নয়। অসুখে পড়ে থেকে সে সারাক্ষণ বাবার কথা ভেবেছে। তার অসুখ হলে বরাবর বাবা এসে বিছানায় সারাক্ষণ পাশে বসে থাকত। বড় নরম মনের মানুষ।

বিলু হঠাৎ বলল, বাবা কী চাকরি করে ?

একটা কারখানায় কী যেন করে। সামান্য কাজ।

বিলু আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, তোকে কাঁদতে দেখে আমি ভেবেছিলাম বাবা বুঝি মরেটরে গেছে।

যাঃ। কী যে বলিস।

বিলুও উঠে কলঘরে গেল। পড়ার টেবিলে চুপ করে বসে রইল বন্দনা। তার সামনে সমস্যাটা যেন একবোঝা জট-পাকানো উল। তাতে গিঁট, ফাঁস, জড়িয়ে মড়িয়ে একশা। বাবা, মা, রমা মাসি এই তিনজন মিলে কী যে একটা পাকিয়ে তুলল।

বাবুদা এল সাড়ে আটটা নাগাদ। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। পরনে ধুতি আর সাদা শার্ট। বাবুদাকে প্যান্ট ট্যান্ট পরতে কখনও দেখেনি বন্দনা। মুখখানা সর্বদাই ভদ্রতায় মাখা। সবসময়ে নরম গলায় কথা বলে। কথাবার্তায় শিক্ষা আর রুচির ছাপ আছে। বাবুদা একা নয়, সঙ্গে কয়েকটা ছেলে। এ বাড়ির আজকাল আর আগল নেই। বাবুদা সোজা ওপরে উঠে এল।

বন্দনা দরদালানে লেনিনের ছবিটার নীচেই একটা চেয়ারে বসে একখানা শরৎ রচনাবলী পড়ার চেষ্টা করছিল। আজ মন বসছে না। মনটা বড্ড উড়ুউড়ু। মনটা বড় খারাপ। নইলে আজও সোনালি মিঠে রোদ উঠেছে। আজও সুন্দর দিনটি। শুধু বন্দনার চোখই সুন্দর দেখছে না কিছু।

বাবুদাকে দেখে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল সে। বাবুদা বলল, উঠতে হবে না। বোসো। তুমি খুব ভুগে উঠলে, না ?

হ্যাঁ। আমার টাইফয়েড হয়েছিল।

খুব রোগা হয়ে গেছ।
হ্যাঁ।
মাসিমা কোথায় ?
বাবুদাকে দেখলে বা কথাবার্তা শুনলে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে, গতকাল এই বাবুদাই দলবল নিয়ে ল্যাংড়াকে টিট করতে এসেছিল। কেউ বিশ্বাস করবে না এই বাবুদা কাল ওরকম সাঙ্ঘাতিক বোমাবাজি করে গেছে।
বন্দনা বলল, আপনি বসুন, মাকে ডাকছি।
মা রান্নাঘরে জলখাবারের তদারকি করছিল। মুখখানা ভার, বিষণ্ণ। সারা রাত মা ঘুমোয়নি, জানে বন্দনা।
মা, বাবুদা এসেছে। তোমাকে ডাকছে।
মা বিরক্ত হল। বলল, কী চায় বাবু ?
তা জানি না।
মা আঁচলে হাতটা মুছতে মুছতে বলল, যা, যাচ্ছি।
মা আসতেই বাবুদা চেয়ার ছেড়ে বিনয়ী ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল।
কেমন আছেন মাসিমা ?
আমি ভাল নেই। বড় অশান্তিতে আছি। কিছু বলবে ?
হ্যাঁ মাসিমা। কাল ল্যাংড়া আব তার দলের ছেলেরা ও বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে আমাদের ওপর বোমা মেরেছে।
জানি।
ও নাকি এখানে একটা ডেরা করেছে ?
তা করেছে।
আমাদের সেটা কেন জানাননি মাসিমা ? জানালে আমরা কবে ওকে সরিয়ে দিতাম।
কাকে বাবণ করব বলো তো ? আজকাল আমার বাগানে কত লোক সারাদিন ঢোকে। নারকেল পেড়ে নিয়ে যায়, গাছ থেকে ফল নিয়ে যায়, ফুল নিয়ে যায়। এমনকী আজকাল ছাগলও বেঁধে রেখে যায় দেখছি। দেয়াল সারালে হয়তো হয়। কিন্তু তার অনেক খরচ। মিস্ত্রিরা বলে গেছে ত্রিশ ফুট দেয়াল ভেঙে ফেলে নতুন করে গাঁথতে হবে।
সেটা পরের কথা। ল্যাংড়া যাতে এখানে ঢুকতে না পারে তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আপনি পারমিশন দিলে আমাদের দলের কয়েকটা ছেলে পালা করে পাহারা দেবে। তারা ভাল ছেলে।
মা কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, পাহারা দেবে ?
আপনার আপত্তি থাকলে নয়। আপনাদের পিছনের দিকের ফাঁকা গোয়ালঘরটায় বসেই বোধহয় ওরা বোমা বাঁধে।
মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এ বাড়ি কি রক্ষা হবে বাবু ? বড্ড ভয় পাচ্ছি।
আমাদের জানালে এত কাণ্ড ঘটত না।
বড় বাড়ির অবস্থা কি আর তোমরা জানো না। দুটো নাবালক ছেলেমেয়ে, বুড়ো মালি, বাহাদুর আর মদনকে নিয়ে থাকি। আমাদের সহায়-সম্বল তো কিছু নেই। কাল কিন্তু বাইরে থেকেও বাড়ির ভিতরে বোমা পড়েছে।
জানি মাসিমা। কাজটা উচিত হয়নি। আমি ক্ষমা চাইছি। তা হলে অনুমতি দিচ্ছেন ?
তোমার দলের ছেলেরা আবার অশান্তি করবে না তো ? ধরো যদি ল্যাংড়া ঢুকতে চায় তবে তারা হয়তো মারদাঙ্গা করবে।
না মাসিমা। ল্যাংড়া বাড়াবাড়ি করলে তারা গিয়ে শুধু আমাদের খবর দেবে।
তাতে যদি আমাদের ওপর ল্যাংড়ার আক্রোশ হয় ?
অত ভয় পাবেন না মাসিমা। গুণ্ডাবাজি খতম করার চেষ্টাই তো আমরা করছি। ল্যাংড়া ভয়

পেয়ে পালিয়েছে। সে তেমন কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই।

দেখো বাবা, আমি কিন্তু খুব অসহায় মানুষ।

অসহায় কেন মাসিমা ? আমরা তো আছি। আমরা সবাই প্রদীপের বন্ধু। প্রদীপের মতো সাহসী ছেলে কটা হয় ? আপনি একজন সাহসী সৈনিকের মা।

মায়ের চোখ ছলছল করে উঠল। আঁচলে চোখ চেপে ধরে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, ঠিক আছে।

বাবু যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল তখন মা তাকে আবার ডাকল, বাবু, শোনো।

কী মাসিমা ?

আমাকে সস্তায় একটা বাসার খোঁজ দিতে পারো ?

বাসা ? কেন মাসিমা ?

আমার বড় দরকার। একখানা ঘর হলেও চলবে। কিন্তু ভাড়া বেশি যেন না হয়। তুমি তো অনেককে চেনো, একটু খোঁজ নেবে ?

ঠিক আছে।

খুব তাড়াতাড়িই চাই কিন্তু।

দেখব মাসিমা।

বাবু চলে যাওয়ার পর বন্দনা অবাক হয়ে বলল, কার জন্য বাসা খুঁজছ মা ? কে থাকবে ?

আমরা থাকব। তুই, আমি আর বিলু।

কেন মা ?

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেছি তোর বাবাকে একটা চিঠি লিখব। বলব চলে আসুক সে। তার বাড়িঘর বুঝে নিক। সুখে থাকুক। আমি তার পথের কাঁটা, সরে যাব।

এত তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেললে মা ? বাবা তো লিখেছে আমাদের জন্যও তার মন কেমন করে। তাই আসতে চাইছে।

তুই কিচ্ছু বুঝিসনি। আসল কথা, নিজের বাড়ির দখল চাইছে। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা লিখলেও আসল কথা হল তাই।

বন্দনা কী করে মাকে বোঝাবে যে, বাবা মোটেই বাড়ির দখল চায়নি। বাবা চেয়েছে এ বাড়ির এক কোণে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘরে ভিখিরির মতো একটু আশ্রয়। তার বাবা একটা গর্হিত অন্যায় করে ফেলেছে ঠিকই, তবু বাবা একজন চমৎকার মানুষ। একজন কবির মতো মানুষ। একজন নরম ও উদাসী মানুষ।

মা সে কথা বুঝল না। বলল, তাকে তোরা আর কতটুকু চিনিস ? আমি চিনি হাড়ে হাড়ে। চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে এ বাড়িতে থাকতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে। এখন সে এসে নতুন বউ, নতুন ছেলে নিয়ে সুখের সংসার পাতুক। আমরা বিদেয় হয়ে যাব।

কিন্তু বন্দনার এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। এ বাড়ির মধ্যে কত পুরনো বাতাস, কত অদ্ভুত আলোছায়ার খেলা, কত স্বপ্নের মতো ব্যাপার আছে। এ বাড়ি ছেড়ে গিয়ে কি সে বাঁচবে ?

সকাল নটায় একটা রিক্সা এসে সামনের উঠোনে থেমে পঁক পঁক করে হর্ন দিচ্ছিল। শরৎ রচনাবলী রেখে বন্দনা গিয়ে ঝুঁকে দেখে অবাক। রিক্সায় অতীশ সিটে বসে আছে। ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে আছে বারান্দার দিকে। দেখে বন্দনার ভিতরটা জ্বলে গেল।

কী চাও।

অতীশ গম্ভীর মুখে বলল, তোমার কলকাতার দিদি আসতে বলেছিল। শহর দেখবে।

তোমার রিক্সায় ?

হ্যাঁ।

রাগে এত গরম হয়ে গেল তার মাথা যে সে কিছুই বলতে পারল না। খানিকক্ষণ জ্বালাভরা চোখে অতীশের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, তুমি না একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছিলে ?

হ্যাঁ।
তবু চালাচ্ছ?
গাড়ি চালালে একটা দুটো অ্যাকসিডেন্ট হয়ই।
এত অপমান লাগছিল বন্দনার যে, বলার নয়। সে উঠে দীপ্তির ঘরে গেল।
এই দীপ্তিদি।
দীপ্তি একটা হলুদ জমি, কালো টেম্পল পাড়ের শাড়ি পরছিল যত্ন করে। স্নান করে এসেছে। ভেজা চুল এলানো রয়েছে পিঠের ওপর। হাসিমুখে বলল, কী রে?
তুমি অতীশদাকে রিক্সার কথা বলেছ?
হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে গেল দীপ্তির। চোখ উজ্জ্বল হল। বলল, কী সাঙ্ঘাতিক ছেলে বল তো!
সাঙ্ঘাতিকটা আবার কীসের দেখলে?
বি-কম পাশ, ওরকম ভাল চেহারা, কী ভাল সংস্কৃত উচ্চাবণ, ভাল অ্যাথলিট, সেই ছেলে রিক্সা চালায়, এটা একটা দারুণ ব্যাপার নয়?
আমার তো রাগ হয়।
আমার শ্রদ্ধা হয়। ও ছেলে যখন রিক্সা চালায় তখন সেইসঙ্গে এই সমাজকে যেন অপমান করে। যে দেশ ওরকম একটা ছেলের দাম দিতে পাবে না, সে দেশকে এভাবেই অপমান করা উচিত।
বন্দনা এসব তত্ত্ব বোঝে না। তবে অতীশ রিক্সা চালালে তার ভীষণ লজ্জা করে। সে কুঁকড়ে যায়।
প্লিজ দীপ্তিদি, তুমি ওর রিক্সায় উঠো না। আমি বাহাদুরকে পাঠিয়ে অন্য রিক্সা আনিয়ে দিচ্ছি।
দীপ্তি অবাক হয়ে বলে, ও মা! কেন রে? তুই কি ভাবিস আমার বেড়ানোর খুব শখ হয়েছে? তোদের অখাদ্য শহর দেখার একটুও ইচ্ছে আমার নেই। আমি ওর রিক্সায় উঠতে চেয়েছি, সেটা একটা থ্রিলিং এক্সপেরিয়েন্স হবে বলে। ও চালাবে, আমি বসে বসে দেখব রাস্তায় ভদ্রলোকদের মুখগুলো কেমন হয়ে যায়।
কাঁদো-কাঁদো মুখে বন্দনা বলল, কিন্তু ও তো রিক্সাওলা নয় দীপ্তিদি। ওরা যে ভদ্রলোক। ও অমন বিচ্ছিরি লোক বলেই রিক্সা চালায়।
তুই অমন অস্থির হচ্ছিস কেন? ওর প্রতিবাদটা বুঝতে পারছিস না? টের পাস না যে এটা ওর বিদ্রোহ? ভদ্রতার মুখোশ টেনে খুলে দিতেই তো চাইছে ও। আমি এরকম সাহসী ছেলে দেখিনি।
বন্দনা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘর থেকে দৌড় পায়ে বেরিয়ে এল। দুর্বল শরীর সইল না, বারান্দায় এসে সে উবু হয়ে বসে পড়ল মুখ ঢেকে। নীচে অতীশের রিক্সা যেন তাকে ঠাট্টা করতেই হর্ন দিচ্ছে। পঁক পঁক।
দীপ্তির ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে বন্দনার। দীপ্তিদি যেন কী।
সে হামাগুড়ি দিয়ে রেলিঙের কাছে এগিয়ে গেল।
নীচে অতীশ তার রিক্সায় বসে আছে। সেদিকে চেয়ে থেকে বন্দনা মনে মনেই বলল, তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক।
অতীশ হঠাৎ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বলে, তোমার দিদিকে তাড়াতাড়ি করতে বলো। মাত্র দু ঘণ্টার কড়ারে রিক্সা এনেছি। বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে গণেশকে রিক্সা ফেরত দিতে হবে।
রাগ করে ঘরে এসে শুয়ে রইল বন্দনা। তার রাগ হচ্ছে, তার অপমান লাগছে। আজকের দিনটা তার ভাল যাচ্ছে না। শুয়ে শুয়েই সে শুনতে পেল দীপ্তিদির হালকা চটির শব্দ চটুল গতিতে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। রিক্সা দুবার হর্ন দিল, পঁক পঁক।
ঘরের মধ্যে কান্না পাচ্ছে বন্দনার। হাঁফ ধরে যাচ্ছে, আজ কী ভীষণ খারাপ একটা দিন।
শরৎশেষের সকালবেলায় চমৎকার একটা সোনালি আলো পাঠালেন ভগবান। সেই আলোর সঙ্গে পাঠালেন শিরশিরে উত্তুরে হাওয়া। আলো হাওয়ায় মাখামাখি হয়ে চারদিকে নানা কাণ্ড ঘটতে

লাগল। বাগানে গাছের ছায়ায় বেতের চেয়ারে বসে বন্দনা দেখছিল। মনে মনে নানা কথা, নানা উল্টোপাল্টা চিন্তা। বাবার চিঠিটা সে কতবার পড়েছে তার ঠিক নেই। শরৎ রচনাবলীর মধ্যে যত্ন করে রাখা চিঠিটা আবার বের করল। সস্তা খাম, এক্সারসাইজ বুক থেকে ছিঁড়ে-নেওয়া পাতায় ডট পেন দিয়ে লেখা। চিঠিটার চেহারাই এমন গরিবের মতো যে, কষ্ট হয়। লজ্জার মাথা খেয়ে মাকে লেখা বাবার এই চিঠির ভিতর দিয়েই সে এই অকরুণ পৃথিবীকে খানিকটা বুঝে নিচ্ছিল।

বাবার চিঠিটা আর একবার খুলে পড়তে যাচ্ছিল বন্দনা, এমন সময়ে হঠাৎ সামনে যেন মাটি ফুঁড়ে একটা ছেলে উঠে দাঁড়াল। এমন চমকে গিয়েছিল বন্দনা।

এঃ, তুই যে একদম শুঁটকি মেরে গেছিস! কী হল তোর?

বন্দনার বুকটা ধকধক করছিল, বলল, এমন চমকে দিয়েছিস!

অবু, অর্থাৎ অবিনশ্বর অতুলবাবুর ছেলে, শিখার ভাই এবং তারই সমবয়সী। শিখাদের বাড়িতে তারা একসঙ্গে কত ক্যারম লেখেছে! অবু বেশ লম্বা চওড়া, নবীন দাসের ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম করে।

তোর কি অসুখ ফসুখ কিছু করেছিল নাকি রে বন্দনা?

টাইফয়েড।

তাই অত রোগা হয়ে গেছিস। তোকে চেনাই যাচ্ছে না। রোজ ছোলা ভেজানো খা, আর এক গ্লাস করে ঘোল, আর দু চামচ ব্র্যান্ডি মেশানো দুধ, দেখবি তাকৎ এসে যাবে।

তোর মতো হোঁতকা না হলেও আমার চলবে।

আমি হোঁতকা নাকি? আমি হলাম মাসকুলার। বাইসেপ দেখবি?

মা গো! ওসব কিলবিলে মাস্‌ল দেখলে আমার বিচ্ছিরি লাগে। বোস না, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

আরে, বসবার জন্য কি এসেছি নাকি? তোদের বাড়ি পাহাবা দিচ্ছি।

পাহারা দিচ্ছিস! তার মানে?

তোদের বাড়িতে নাকি ল্যাংড়া একটা ঠেক করেছে! সেই জন্যই বাবুদা পাঠাল পাহারা দিতে। ল্যাংড়া অবশ্য পালিয়ে গেছে। তবু যদি আসে।

বন্দনা হেসে ফেলল, তুই একা পাহারা দিচ্ছিস! ইস, কী আমার বীর রে!

অবু একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমি একা নই। বিশ্বজিৎ আর অমল নামে দুটো ছেলেও আছে। ওদের রিভলভার আছে। আমি হচ্ছি মেসেনজার। কিছু হলে দৌড়ে গিয়ে খবর দিতে হবে বাবুদাকে।

বন্দনা ভয় পেয়ে বলল, রিভলভার! রিভলভার কেন বল তো!

অবু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ভয় পেলি নাকি? আরে দূর, আজকাল রিভলভার টিভলভার হাতে হাতে ঘোরে। কোনও ব্যাপারই নয়। আজকাল রিভলভার হল খেলনা। আসল জিনিস হল স্টেনগান, এ কে ফর্টি সেভেন, এইসব।

তুই খুব পেকেছিস কিন্তু অবু।

অবু হি হি করে হাসল। সবে গোঁফের রেখা উঠেছে, ফর্সা, গোল মুখের অবু এখন কত ছেলেমানুষ। বলল, আজ তা হলে তুই কলসি রেসে নামছিস না?

বন্দনা লজ্জায় রাঙা হল। বরাবর সে প্রগতি সংঘের স্পোর্টসে কলসি মাথায় দৌড়ে নাম দেয়। আজ অবধি একবারও পারেনি। তার মাথা থেকে কলসি পড়বে কি পড়বেই। সে লজ্জায় হাসতে লাগল, যাঃ।

তোর ঠ্যাং দুটো খুব সরু সরু তো, তাই তোর ব্যালান্স নেই। ললিতাদি যোগ ব্যায়ামের ক্লাস খুলেছে। ভর্তি হবি? দুদিনে চেহারা ফিরিয়ে দেবে।

যাঃ। ব্যায়াম জিনিসটা এত বাজে আর একঘেয়ে।

আর শুঁটকি হয়ে থাকা বুঝি ভাল?

শুঁটকি আছি বেশ আছি, তোর তাতে কী? আজকাল রোগা হওয়াই ফ্যাশন, জানিস?

তা বলে তোর মতো রোগা নয়। তুই তো বারো মাস ভুগিস। আজ জ্বর, কাল সর্দি, স্কিপিং করলে পারিস।
ওসব আমার ভাল লাগে না। ক্যারম খেলবি অবু ?
অবু তার কবজির ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে বলল, ক্যারম খেলব কী রে ? আমি এখন অন ডিউটি রয়েছি না ! আমি এখন ব্ল্যাক ক্যাট। কম্যান্ডো। তোদের সিকিউরিটি গার্ড।
ল্যাংড়াকে দেখলেই তো পালাবি।
অবু হি হি করে হাসল। তারপর বলল, ল্যাংড়া তোদের বাড়িতে ঢুকে কী করে বল তো ! বোমা ফোমা বাঁধে নাকি ?
ঠোঁট উল্টে বন্দনা বলে, কে জানে কী করে ! আমাদের বাড়িটা তো এখন খোলা হাট।
জানিস তো আজ অপরূপা দিদিমণি বস্তিতে মিটিং করবে ! সবাইকে নাকি ডেকে ডেকে বলবে ল্যাংড়াকে সাপোর্ট করার জন্য। ল্যাংড়া নাকি পাড়ার লোকের উপকার করে বেড়ায়, পাড়ার জুয়ার ঠেক নাকি সেই ভেঙেছে, ল্যাংড়ার জন্যই মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশানে বাবুদাদের ক্যান্ডিডেট বিধুবাবু জিততে পারেনি। অপরূপাদি সবাইকে এসব কথা বলে বেড়াচ্ছে। আমরা নাম দিয়েছি ল্যাংড়া বাঁচাও আন্দোলন।
বন্দনা করুণ মুখ করে বলল, কিন্তু অপরূপাদি দারুণ পড়াত। এত সুন্দর সুন্দর গল্প বলত ক্লাসে।
আরে সে তো আমিও জানি। দিদিও তো পড়ত ওর কাছে। কিন্তু ল্যাংড়ার সঙ্গে অ্যাফেয়ারের পর অপরূপাদি একদম ভোগে চলে গেছে। ল্যাংড়াকে পার্টিতে ঢুকতে দিচ্ছে না কে জানিস তো ! অপরূপাদি। আরে, আজকাল পার্টির শেল্টার না পেলে কেউ কি কিছু করতে পারে ? ল্যাংড়া যদি মরে তবে অপরূপাদিই কিন্তু রেসপনসিবল।
বন্দনা চোখ পাকিয়ে বলল, তুই এত পেকেছিস কবে থেকে রে ? খুব পার্টি করে বেড়ানো হচ্ছে ?
আরে না। পার্টি ফার্টি তারাই করে যাদের হাতে মেলা সময় আছে। আমার বলে হেভি পড়ার চাপ, তার ওপর বডি বিল্ডিং, সময় কোথায় ? তবে বাবুদা বা সুবিমল স্যার বললে মাঝে মাঝে ফ্যাক খেটে দিই। বাবাকে তো জানিস, পার্টি করলে পুঁতে ফেলবে।
তা হলে করিস কেন ?
সোশ্যাল ওয়ার্ক হিসেবে কিছু কিছু করি। পলিটিকস নয় বাবা। তোদের বাড়ি পাহারা দেওয়াটাও তো একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক, নাকি ? আফটার অল তোরা একসময়ে আমাদের জমিদার ছিলি। একটা দায়িত্ব আছে।
নাঃ, তুই সত্যিই খুব পেকেছিস।
অবু হি হি করে হাসল।
তোর ভয় করে না অবু ?
কীসের ভয় ?
জানিস তো, আমার দাদার কী হয়েছিল !
জানব না কেন ? স্যাড ব্যাপার।
পিছন দিকে একটু দূরে একটা কর্কশ লাউড স্পিকারে মাইক টেস্টিং শুরু হতেই কথা থামিয়ে উৎকর্ণ হল অবু। তারপর বলল, ওই বোধহয় অপরূপাদির মিটিং শুরু হল। যাই, শুনে আসি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে।
অবু হালকা পায়ে বাগানটা পার হয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে গলে বাইরে বেরিয়ে গেল। গাছের ছায়ায় একা ঝুম হয়ে বসে রইল বন্দনা। হাতে বাবার চিঠি। মাথার মধ্যে কত চিন্তা ভেসে ভেসে ছায়া ফেলে যাচ্ছে। আজ তার মনে হল, পৃথিবীতে তাদের মতো দুঃখী মানুষ আর কেউ নেই।
সে শুনতে পাচ্ছিল, বহু দূরে একটা বিচ্ছিরি লাউড স্পিকারে অপরূপা দিদিমণি চিৎকার করে একটা ভাষণ দিচ্ছে। কী বলছে তা এত দূর থেকে শোনা গেল না। ল্যাংড়াকে বন্দনা পছন্দ করে না ঠিকই, তবু অপরূপা দিদিমণি যে ওর জন্য এত বিপদ মাথায় নিয়েও একটা লড়াই করছে এটা খুব

ভাল লাগে বন্দনার। সে নিজে তো কারও জন্য কখনও লড়াই করেনি। তার তো কোনও লড়াই নেই। 'ল্যাংড়া বাঁচাও আন্দোলন' বলে অপরূপাদিকে ঠাট্টা করে গেল বটে অবু, কিন্তু ঠাট্টা শুনে বন্দনার একটুও হাসি পায়নি। অপরূপাদিকে নিয়ে ঠাট্টা করার সে কে ?

তার পোষা কয়েকটা কবুতর ছাদ থেকে নেমে এল ঝটপট করতে করতে। তারপর তার চেয়ার ঘিরে গুড়গুড় শব্দ করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মনটা যেন একটু ভাল হয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ফের অনেক কথার ছায়া এসে পড়ল মনের ওপর।

দীপ্তিদিকে তার কেন আর একটুও ভাল লাগছে না ? এই মস্ত ফাঁকা বাড়িটায় তারা তিনটি মোটে প্রাণী। সে, বিলু আর মা। সারাদিন তারা নানা বিষণ্ণতায় ডুবে থাকে। তাই কেউ এলে ভীষণ আনন্দ হয় বন্দনার। তাকে আর ছাড়তেই চায় না। ঠিক যে রকম হয়েছিল রমা মাসির বেলায়। রমা মাসিকে চোখের আড়াল করত না সে! তারপর একদিন এমন হল যখন রমা মাসি ফিরে গেলে সে বাঁচে। শেষে রমা মাসি গেল বটে, কিন্তু নিয়ে গেল তার জীবনের সব আনন্দ, সব আলো, সব উল্লাস। কাল যখন দীপ্তিদি এল, তখন কী যে আনন্দ হয়েছিল বন্দনার। আজ মনে হচ্ছে, দীপ্তিদি চলে গেলেই ভাল। ওকে আর একটুও ভাল লাগছে না তার। বিধবা হয়েও মাছ-মাংস খায়, একাদশী অম্বুবাচী করে না, পুরুষদের সঙ্গে ঢলাঢলি করে বেড়ায়। অতীশ কি এত সব জানে ? জানে কি যে, দীপ্তিদির জন্যই তার বর আত্মহত্যা করেছিল ? নিশ্চয়ই জানে না, জানলে এত মেশামেশি করত কখনও ?

দীপ্তিদি আজ সকালে নিজের ঘরে খুব গুনগুন করে গান গাইছিল। খুশিতে মুখখানা খুব ডগোমগো। কীসের এত আনন্দ ওর ? একজন বিধবার কি এত আনন্দ করা উচিত ? বিশেষ করে যে বাড়িতে এত দুঃখ, এত শোকতাপ ?

॥ চার ॥

টুপি মাথায় একটা লোক চেঁচিয়ে বলছিল, লাস্ট ল্যাপ! লাস্ট ল্যাপ! কথাটা অতীশের কানে ঢুকল, কিন্তু বোধে পৌঁছোল না। শেষ ল্যাপ বলে কিছু কি আছে ? সামনে অফুরান মাঠ। চুনের দাগ যেন দূর পাল্লার রেল-লাইনের মতো অনন্তে প্রসারিত। ইনজেকশনের ক্রিয়া অনেকক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে। তার কুঁচকিতে এখন কুমিরের কামড়। চিবিয়ে খাচ্ছে হাড়গোড, মাংস, মজ্জা, আগুন জ্বলছে ব্যথার। আগের ল্যাপে সে ডিঙিয়েছে সুকুমার আর আজিজুলকে। তিন চার ফুট আগে দৌড়োচ্ছে গৌরাঙ্গ, আরও আগে নবেন্দু। অসম্ভব! অসম্ভব! এই দৌড়টা সে পারবে না।

কিন্তু সেই মানুষ পারে, যে কিছুতেই হার মানে না। আগের তিনটে রেস সে জিতেছে। তখন ইনজেকশনের ক্রিয়াটা ছিল, পাল্লাও কম। একশো, দুশো আর চারশো মিটার। চারশো মিটারের পর অনেকগুলো অন্য আইটেম ছিল। যত সময় গেল তত কমে গেল ওষুধের ক্রিয়া। ডাক্তার অমল দত্ত অবশ্য তাকে বলেছিলেন, এই পা নিয়ে দৌড়োবি ? পাগল নাকি ? তোর পায়ের অবস্থা ভাল নয়। স্ট্রেন পড়লে পারমানেন্টলি বসে যাবি।

কথাটা কানে তোলেনি সে। কাকুতি মিনতি করেছিল। ডাক্তার দত্ত একটু ভেবে বলেছিলেন, স্পোর্টসের ঠিক আগে আসিস। দিয়ে দেব।

পার্মানেন্টলি বসে যাওয়ার কথা শুনেও ভয় পায়নি অতীশ। ভয় পাওয়ার নেইও কিছু। এই দুটো পা তাকে অনেক দিয়েছে। কিন্তু দুটো পাকে কী দিতে পেরেছে সে ? পেটে পুষ্টিকর খাবার যায় না, যথেষ্ট বিশ্রাম নেই, যথোচিত ম্যাসাজ হয় না, এমনকী একজোড়া ভদ্রস্থ রানিং স্পাইক অবধি নেই। তবু অযত্নের দুখানা পা তার হাত ভরে দিয়েছে প্রাইজে। আর পা দুটোকে বেশি খাটাবে না অতীশ। বয়সও হচ্ছে। হাঁটাচলা বজায় থাকলে, আলু বেগুনের বোঝা বইতে পারলেই যথেষ্ট।

ধপ্ ধপ্ ধপ্ ধপ্ করে মাঠের ওপর কয়েকজোড়া ক্লান্ত ভারী পা পড়ছে, উঠছে, পড়ছে উঠছে। হৃৎপিণ্ডের শব্দের মতো। পাঁচ হাজার মিটারের শেষ ল্যাপ এক মারাত্মক ব্যাপার। দীর্ঘ দৌড়ের শেষে এসে জেতার ইচ্ছে উবে যায়, দিকশূন্য ও উদভ্রান্ত লাগে, বুক দমের জন্য আকুলি ব্যাকুলি

করে, হাত পা মাথা সব যেন চলে যায় ভূতের হেফাজতে। নিজেকে নিজে বলে মনে হয় না। অতীশের মাথা থেকে পায়ের তলা অবধি ঘামছে। গায়ের শার্ট ভিজে লেপটে আছে গায়ের সঙ্গে। চোখ ধোঁয়া ধোঁয়া। বুদ্ধি কাজ করছে না। ধৈর্য থাকছে না, মনের জোর বলে কিচ্ছু নেই। কত দূর অবধি চলে গেছে চুনের দাগে চিহ্নিত ট্র্যাক। এই দৌড়টা মারতে পারলে সে হবে ওভার-অল চ্যাম্পিয়ন। চ্যাম্পিয়নকে আজ দেওয়া হবে একটা সাদা কালো টিভি। সেটা বেচলে হাজার বারোশো টাকা চলে আসবে হাতে। সুমিত ব্রাদার্সের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।

তার অগ্রবর্তী দুজন দৌড়বাজের অবস্থাও তারই মতো। ঘাড় লটপট করছে। পা টানছে না, স্পিড বলে কিছু নেই। শুধু একটু ইচ্ছের ইনজিন টেনে নিচ্ছে তাদের।

মিউনিসিপ্যালিটির মাঠ ভাল নয়। একটা গর্তে বাঁ পাটা পড়তেই টাল খেল শরীরটা। পড়লে আর উঠতে পারবে না অতীশ। কী বলছিল লোকটা? লাস্ট ল্যাপ। সর্বনাশ! লাস্ট ল্যাপ! অতীশ কি পারবে না? ধোঁয়াটে মাথায় একটা লোকের চেহারা মনশ্চক্ষে দেখতে পেল অতীশ। না, লোকটাকে সে কখনও দেখেনি। তার ছবিও না। তবু দেখল। কোন অলিম্পিকে যেন ম্যারাথন দৌড়োচ্ছিল লোকটা। লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে, মচকে গেছে পা। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তবু দৌড়ে যাচ্ছিল সে। প্রাইজের আশা ছিল না, শুধু দৌড়টা শেষ করতে চেয়েছিল। দৌড় শেষ করাই ছিল আসল কথা। শেষ অবধি সকলের পরে সে যখন স্টেডিয়ামে ঢুকল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। স্টেডিয়ামের আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে লোকটা শুধু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে শেষ করছে দৌড়। সমস্ত স্টেডিয়াম উঠে দাঁড়াল তার সম্মানে। করতালিতে ফেটে পড়ল চারদিক। বিজয়ী সে নয়, তবু এক অপরাজেয় মানব। কোনও মেডেলই পায়নি সে, তবু সে লক্ষ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল মানুষের আবহমানকালের সংগ্রামের ইচ্ছাকে।

পারব না? আমি পারব না? ভগবান! অতীশের সঙ্গে গৌরাঙ্গের দূরত্ব বাড়েনি। একই আছে এখনও। কিন্তু গৌরাঙ্গর কুঁচকিতে ব্যথা নেই। দূরত্বটা থেকেই যাবে।

একটা বাঁক আসছে। অতীশ বুক ভরে একটা দম নেওয়ার চেষ্টা করল। বুক হাফরের মতো শব্দ করে উঠল হঠাৎ। দুটো পায়ে নবতর শক্তি সঞ্চার করার জন্য অতীশ তার পা দুখানার উদ্দেশে বলতে লাগল, কাম অন! কাম অন বয়েজ! কাম অন...

একটা ছায়ার মতো গৌরাঙ্গকে নিজের পাশাপাশি দেখতে পেল অতীশ। তারপর ছায়াটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সামনে শুধু নবেন্দু।

আর কতখানি বাকি? চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না অতীশ। চারপাশটা কেমন যেন ছায়া-ছায়া, যেন ওয়াশের ছবির মতো আবছা! চোখে নেমে আসছে কপালের অবিরল ঘাম। একটা তীব্র, অসহনীয় ব্যথার গর্জন শুনতে পাচ্ছে সে। এ ছাড়া শরীর-বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে তার। শুধু টেনে নিচ্ছে নিজেকে, হিঁচড়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রোগ ও জরাগ্রস্ত মানুষ যেভাবে প্রায় শবদেহের মতো নিজের অস্তিত্বকে আমৃত্যু টানে। কিন্তু শরীর কীসের জন্য, যদি তার কাছ থেকে আদায় না করা যায় অস্তিত্বের সুফল?

বহু দূরে সে ট্র্যাকের ওপর একটা টানা আবছা লাল ফিতে আর কয়েকজন মানুষকে দেখতে পেল। ওই কি শেষ সীমানা? নবেন্দু এখনও প্রায় চার পাঁচ ফুট আগে। এতটা গ্যাপ! অসম্ভব! অসম্ভব!

কে যেন অতীশের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, পারব! পারতেই হবে। কাম অন বয়েজ! কাম অন...

মাধ্যাকর্ষণ বড় প্রবল। তাকে টেনে নিতে চাইছে ভূমিশয্যা। তার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে জলে ডুব দিয়ে বসে থাকতে। ইচ্ছে করছে লেবুপাতা দিয়ে মাখা পান্তাভাত খেতে। তার ইচ্ছে করছে পৃথিবীর সব প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে।

সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্য? জাগল অতীশ। দেখল। নবেন্দু কি আরও একটু এগিয়ে গেছে? নবেন্দুকে না সে আগেরবার অনেক পিছনে ফেলে জিতেছিল?

কাম অন বয়েজ! কাম অন!

দুটো পা লোহার মতো ভারী। শব্দ হচ্ছে ধপ ধপ। যেন হাতির পা। গোদা পা। তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না তারা।

নবেন্দু একবার ঘাড় ঘোরাল। তাকে দেখে নিল।

ভুল। মারাত্মক ভুল। ঘাড় ঘোরাতে নেই কখনও। অন্তত শেষ ল্যাপে নয়। দুটো কদম যোগ করে নিল অতীশ। গ্যাপ কমে গেছে। আর একটু... আর একটু...

গ্যাপ কমছে। কমছে।

কাম অন বয়েজ...

শরীরের একটা উথাল পাথাল তুলল অতীশ। দৌড়োচ্ছে না, যেন নিজেকে ছুড়ে দিচ্ছে সামনে। ঢেউয়ের মতো।

নবেন্দু দ্বিতীয় ভুল করল, আবার ফিরে তাকিয়ে। তার চোখে বিস্ময়। হাঁটুতে হাঁটুতে লেগে একবার ভারসাম্য হারাতে হারাতে সোজা হল নবেন্দু।

অতীশ মনে মনে বলল, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।

একটা ঝটকায় তারা পাশাপাশি। কারা চিৎকার করছে মাঠের বাইরে থেকে? কাদের মিলিত কণ্ঠ জয়ধ্বনির মতো তার নাম ধরে ডাকছে, অতীশ! অতীশ!

শেষ কয়েক পা অতীশ দৌড়োল একশো মিটারের দৌড়ের মতো। প্রাণ বাজি রেখে।

লাল ফিতে বুক দিয়ে ছুঁয়ে সে একবার দুহাত ওপরে তুলবার চেষ্টা করল। তারপর সেই দুই হাতে একটা অবলম্বন খুঁজতে খুঁজতে চোখ ভরা অন্ধকার নিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাঠে। সে জিতেছে!

চোখে মুখে জলের ঝাপটা খেয়ে দু মিনিট বাদে তার জ্ঞান ফিরল। আরও দশ মিনিট বাদে ভিক্টরি স্ট্যান্ডে উঠল সে অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে। চারদিক ফেটে পড়ছে উল্লাসে। সে জানে, সে অলিম্পিক জেতেনি, বিশ্বরেকর্ড করেনি। ভারতবর্ষের এক ছোট্ট অখ্যাত শহরে জেলাওয়ারি একটা প্রতিযোগিতায় জিতেছে মাত্র। তার নাম ছোট্ট করেও বেরোবে না খবরের কাগজে। তার এই কৃতিত্বের কথা দর্শকরা দু দিন বাদেই ভুলে যাবে। হয়তো এই জয়ের দাম দিতে চিরকালের মতো বসে যাবে তার ডান পা। তবু নিজের ভিতরে সে এক নবীকরণ টের পেল। বারবার নিজের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে না পারলে তার এই ছোট বেঁচে থাকা যে বড় নিরর্থক হয়ে যায়!

হর্ষধ্বনি ও হাততালি, পিঠ চাপড়ানি আর হ্যান্ডশেক এ সবই অতি উত্তেজক জিনিস। তার চেয়েও মারাত্মক কিশোরী ও যুবতীদের চোখে ক্ষণেকের বিহ্বল ও সম্মোহিত চাহনি। যদিও এসবই অস্থায়ী, তবু সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারে না অতীশ। এই খেলার মাঠ থেকেই তার চোখের সামনে কতগুলো প্রেম হল, তাদের বেশ কয়েকটা বিয়ে অবধি গড়িয়ে গেল। মানুষ যখন হঠাৎ করে লাইমলাইটে চলে আসে তখন সাবধান না হলে মুশকিল। এ সবই অতীশ জানে। মাত্র এক বছর আগে এই মাঠেই এরকমই স্পোর্টসের দিনে শিখা তার প্রেমে পড়েছিল। ভি আই পিদের জন্য সাজানো চেয়ারে বসে হাঁ করে তার দৌড় দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়ে গেল, বিবশ হয়ে পড়ল। তারপরই ওদের কাজের মেয়ে ময়নার মারফত চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল অতীশের কাছে। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত। এখানে সেখানে দেখা করতে বলত। অতুলবাবুর মেয়ে বলে কথা, তাকে অপমান করলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে তার ঠিক কী? তাই দু একটা চিঠির জবাব ময়নার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল অতীশ। তাতে খুব বিনয়ের সঙ্গে সে জানিয়েছিল যে, সে মোটেই শিখার উপযুক্ত নয়। সে অত্যন্ত গরিব ও নাচার.. ইত্যাদি। দেখা-সাক্ষাতেও এসব কথাই সে বলত। কিন্তু শিখার তখন জ্বর-বিকারের মতো অবস্থা। দুনিয়া এক দিকে, অতীশ অন্য দিকে। শিখা তাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল। অতীশ পালিয়েছিল ঠিকই, তবে শিখাকে নিয়ে নয়, শিখার হাত থেকে। হাওড়ার কাছে একটা গ্রামে তার মামার বাড়িতে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। বাঁচোয়া এই যে, খেলার মাঠের এইসব সম্মোহন আর বিহ্বলতা বেশিক্ষণ থাকে না। বড্ড অস্থায়ী। চিতু নামে ডাক্তারি পাশ করা একটি ছেলে শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলল। বেঁচে গেল অতীশ। তবু তার সেই অ্যাকসিডেন্টটার কথা খুব মনে হয়। চালপট্টিতে শিখার গাড়ির ধাক্কায় সে

চিতপটাং হয়ে গিয়েছিল। অল্পের জন্য বড় চোট হয়নি। সেদিনকার আর সব চোট তুচ্ছ মনে হয়, যখন মনে পড়ে, সেদিন শিখা তাকে চিনতে পারেনি।

দুটো একটা এরকম কেস কাটিয়ে উঠেছে অতীশ। আজ সারা সকাল আর এক জোড়া মুগ্ধ ও বিহ্বল চোখ তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে। এ চোখজোড়া দীপ্তির। অতীশের চেয়ে অন্তত পাঁচ সাত বছরের বড় এবং বিধবা এবং সন্তানের মা। আজকাল অবশ্য ওসব কেউ মানছে না। সব দিকেই শুধু "বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও" স্লোগান। কিন্তু বাঁধ ভাঙার দুটো বাধা আছে। মার্কসবাদের পাঠশালায় নৈতিকতার একটা শিক্ষা ছিল। ফস্টিনস্টি জিনিসটা মার্কসবাদে গৃহীত নয়। অন্য দিকে তার পারিবারিক ধারাটাও ওরকমই কিছু একটা তার মধ্যে সঞ্চারিত করে থাকবে।

রিক্সা চালানোটা যে একটা ভীষণ বীরত্বের ব্যাপার এবং অতীশ রিক্সা চালিয়ে যে এই অন্তঃসারশূন্য সভ্যতাকে চাবুক মারছে, সভ্যতার মুখোশ টেনে খুলে ফেলছে—এসব শক্ত কথা তার কস্মিনকালেও মনে আসেনি। তার বাড়ির কেউ পছন্দ না করলেও অতীশ রিক্সা চালিয়েছে বসে না থেকে কিছু একটা করার তাগিদে। সেটা যে এরকম একটা মহান ব্যাপার তা দীপ্তিই আজ তাকে শিখিয়েছে। শহর দেখতে দেখতে তাকে একবার দীপ্তির সঙ্গে শহরের সবচেয়ে ভাল রেস্তোরাঁয় বসে গল্পও করতে হয়েছে। তখন দুখানা চোখের সব সম্মোহন উজাড় করে দিয়েছে দীপ্তি। কলকাতার মেয়ে তো, ওদের সব ব্যাপারে তাড়াহুড়া। মোটে সময় দিতে চায় না কিছুতে।

বলল, আপনি আমার সঙ্গে কলকাতায় চলুন। ওখানে অনেক স্কোপ। আমার ফ্ল্যাটটাও মস্ত বড়, দেড় হাজার স্কোয়ার ফুট। স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন।

আর একটা শিথিল মুহূর্ত এল দুপুরবেলায় নির্জন নদীর ধারে কাছারির ঘাটে দাঁড়িয়ে। বটের ঝিরঝিরে ছায়া, নীচে ঘাট, ঘাটে ডিঙি নৌকো বাঁধা, জলের কুচি কুচি ঢেউয়ে রোদের হিলিবিলি। খপ করে তার হাতটা নিজের নরম কবোষ্ণ হাতে ধরে ফেলে দীপ্তি বলল, আপনাকে আমার এত ভাল লাগছে কেন বলুন তো। এই শোনো, এখন থেকে তোমাকে আমি তুমি বলব। তুমিও বলবে তো!

মফস্বলি মাথায় এসব সহজে ঢুকতে চায় না। এ যেন সিনেমা বা উপন্যাস। সত্যি নয়। ভদ্রতাবশে হাতটা ছাড়াতেও পারেনি অতীশ। খেয়ার মাঝি বুড়ো মৈনুদ্দিন তার খোড়ো ঘরের দরজায় বসে দৃশ্যটা দেখছিল।

দীপ্তি ধরা গলায় বলল, আমার কিছুরই অভাব নেই, জানো? আমার হাজব্যান্ড প্রচুর রোজগার করত। ব্যবসা ছিল, শেয়ার কেনার নেশাও ছিল। ব্যাঙ্কে আমার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পচছে। বছরে কত টাকা ডিভিডেন্ড পাই ভাবতেও পারবে না। অভাব কীসের জানো? আমার ভালবাসার একটা লোক নেই। এমন একজন যার জন্য প্রাণপাত করে কিছু করতে ইচ্ছে করে। যাকে ঘিরে লতিয়ে ওঠা যায়। মেয়েদের তো লতার সঙ্গেই তুলনা করা হয়, না?

মৈনুদ্দিন ঠিক এ সময়টায় গলা খাঁকারি দিয়েছিল। গলার দোষ হতে পারে, আওয়াজ দেওয়াও হতে পারে।

চলো, নৌকোয় একটু বেড়িয়ে আসি। যাবে?

তা গেল অতীশ। মরা নদীতে চর পড়ে গেছে অনেকটা। ওপাশের সরু ধারাটায় কিছু গভীরতা আছে, এপাশে হাঁটুজল। মৈনুদ্দিন চরটা পাক মেরে ওপাশের শ্মশানঘাট অবধি নিয়ে গেল। দীপ্তি মুগ্ধ, স্বপ্নাতুর। ডিঙির হেলদোলে বারবার মুখোমুখি বসা অতীশের হাত চেপে ধরছিল। ওর গা থেকে নানা ধরনের সুগন্ধি আসছিল তখন। অতীশ হলফ করে বলতে পারবে না যে, তার খারাপ লেগেছিল। কিন্তু ভিতরে হচ্ছিল অন্যরকম। সেখানে যেন তুফানে পড়া নৌকো বাঁচাতে "সামাল সামাল" বলে গলদঘর্ম হচ্ছে দুই পাকা মাঝি। মার্কস আর রাখাল ভট্টাচার্য।

কাছারির ঘাটে যখন এসে নৌকো ভিড়ল তখন দীপ্তি একটু একটু মাতাল। অতীশের হাত জড়িয়ে ধরে টলতে টলতে উঠে এল ভাঙা পাড় বেয়ে। বটগাছের ঝিরঝিরে ছায়ায় তার দুখানা চোখ তুলে শুভদৃষ্টির কনের মতো অতীশের দিকে স্বপ্নাতুর চেখে বলল, কী ভাল লাগল, না?

অতীশ ভেবেছিল, এই অস্থায়ী সম্মোহনটা কেটে যাবে। সে রিক্সাটা টেনে এনে সামনে দাঁড়

করিয়ে বলল, এবার যেতে হবে।

দীপ্তি মাথা নেড়ে মিষ্টি হেসে বলল, না। এখনই না। একটু বোসো তো আমার পাশে।

অতীশ একটু গাঁইগুঁই করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত ধরে টানলে সে কী করতে পারে ? রিক্সা বড্ড ঘেঁস জায়গা। দুজনকে খুব চেপে ধরল একসঙ্গে।

দীপ্তি একটু হাসির ঝিলিক তুলে তার দিকে তাকাল। তাকাতেও পারে বটে মহিলা। তাকিয়ে তাকিয়েই খুনখারাবি করে দিতে পারে। অতীশ তো আর পাথর নয়। মার্কস এবং রাখাল ভট্টাচার্য দুজনেই সাধ্যমতো লড়েছেন। কিন্তু তাঁরা বুড়ো মানুষ, কটাক্ষের ধারে কচুকাটা হওয়ার জোগাড়। দুই বুড়ো হেদিয়ে পড়েছেন তখন। আর সেইসময়ে ডাইনির শ্বাসের মতো সর্পিল সব অদ্ভুত বাতাস আসছিল নদীর জল ছুঁয়ে। আর তখন রোদের আলোয় সঞ্চারিত হচ্ছিল ভুতুড়ে রং। আর দীপ্তির গা থেকে মদির এক গন্ধ আসছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে, দ্বিপ্রহরে, লোকলজ্জা ভুলে বসে ছিল অতীশ। ভগবানের দিব্যি, তার খারাপ লাগছিল না। ওইভাবে বসে থাকাটার কোনও কারণ নেই, প্রয়োজন নেই, তবু কেন যে ভাল লাগছিল তা কে বলবে ?

কাছাকাছি মুখ, দীপ্তি তার গালে শ্বাস ফেলে বলল, তোমার এত গুণ, কেন যে মফস্বল শহরে পড়ে আছ ! এখানে তোমার কিছু হবে না। তোমার কলকাতায় যাওয়া উচিত।

কলকাতায় গেলে তার কী হবে তা অতীশ বুঝতে পারল না। তবে সে প্রতিবাদও করল না। মার্কসবাদের শিক্ষা তাকে টাকাওলা লোকদের ঘৃণা করতেই প্ররোচিত করেছে। কিন্তু কার্যত তা পেরে ওঠেনি অতীশ। বরং টাকাওলা মানুষজনকে সে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই একটু সমীহ করতে থাকে। দীপ্তির প্রতিও তার সমীহের ভাবটা এসে পড়ছিল। তার সঙ্গে ছিল একটা শরীরী উত্তেজনা। আরও ছিল, একটু মোহময় ভাব। আরও কিছু থাকতে পারে। অত জটিল, সূক্ষ্ম ব্যাপার সে বুঝতে পারে না।

তুমি আমার কথাটার এখনও জবাব দাওনি।

অতীশ ভাবছিল। বটের ছায়ায় রিক্সার সিটে দীপ্তির পাশে বসে থেকে পরিষ্কার মাথায় কিছু ভাবা অসম্ভব। তবু প্রস্তাবটা তার মন্দ লাগেনি। কলকাতায় গেলে কী হবে তা সে জানে না। তবে অনেক সম্ভাবনা খুলে যেতে পারে। সে বলল, ভেবে দেখব।

বেশি ভাবতে গেলে কিছু হয় না, জানো ? এটা ভাববার যুগ নয়। কুইক ডিসিশনের যুগ। চটপট ঠিক করে ফেলতে হয়। ভাবতে গেলে করাটা আর হয়ে ওঠে না।

মাত্র কাল রাতে মেয়েটার সঙ্গে পরিচয়। আর আজ সকালের মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের আলাপে যে এতটা হতে পারে তা কী করে বিশ্বাস করবে অতীশ ? কুইক ডিসিশনের যুগই হবে এটা। মফস্বল শহরে তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে, যুগটা কেমন তা বুঝতে পারেনি এতদিন। যুগটা যদি এতটাই এগিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে এত পিছন থেকে দৌড়ে যুগটাকে কি ধরতে পারবে সে ?

আজ তার মাথা কিছুটা বিভ্রান্ত। কোন এক রহস্যময় কারণে বয়সে বড়, বিধবা, সন্তানবতী এক মহিলা তাকে টানছে। বড্ড টান।

বিশু ভ্যানগাড়িটা ডেকে নিয়ে এল। বলল, চলো গুরু, মাল গস্ত করতে হবে।

মাঠটা ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে আসছে। রোদ মরে সন্ধে নামতে আর দেরি নেই। বিস্তর গাড়ি জড়ো হয়েছিল। এক একটা গাড়িতে ভি আই পিরা একে একে মাঠ ছেড়ে যাচ্ছে। ম্যারাপের একটু পশ্চিমে আতা গাছটার তলায় পায়ের কাছে সাজানো চারটে ব্রিফকেস, একটা টিভি বাক্স আর হাতে একটা মস্ত খাবারের বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অতীশ। হাততালি, হর্ষধ্বনি থেমে গেছে, বিহ্বল ও সম্মোহিত যুবতী ও কিশোরীরা রওনা হয়ে গেছে যে যার বাড়িতে। একটু ফেকলু লাগছে নিজেকে এখন। সে বলল, চল।

বিশু মাল তুলে ফেলল গাড়িতে। বলল, কুঁচকির খবর কি ?

দড়ির মতো ফুলে আছে। ইলেকট্রিক শকের মতো ব্যথা।

পা-টা কি ভোগে চলে যাবে গুরু ?

যায় যাবে। উদাস গলায় বলল অতীশ।

আফসোস কি বাত।

ভ্যানগাড়ির পেছনদিকে দুজনে দুধারে পা ঝুলিয়ে বসেছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় ভ্যানগাড়ি ঝকাং ঝকাং করে লাফাচ্ছে। তাতে কুঁচকির ব্যথা ঝিলিক মেরে উঠছে মাথা অবধি।

মেয়েছেলেটা কে গুরু ?

কোন মেয়েছেলেটা ?

যাকে আজ খুব ঘোরালে।

ব্যথায় মুখটা একটু বিকৃত করে অতীশ বলল, সওয়ারি।

ফেস কাটিংটা ভাল। বলে বিশু চুপ করে গেল।

ছোট শহর, এখানে সবাই সব জেনে যায়। লুকোছাপা করার উপায় থাকে না। কলকাতা এরকম নয়। যা খুশি করো, কেউ গায়ে মাখবে না। অতীশ একটু গুম মেরে রইল। ফেস কাটিংটা ভাল—একথা বলার মানে কী ?

সুমিত ব্রাদার্স ভাল পার্টি। মাল গস্ত করে দু হাজার টাকা পেয়ে গেল অতীশ। সকালে বেগুনের দাম তুলেছে পাইকারের কাছ থেকে। আজকের দিনটা ভালই। কতটা ভাল তার আরও হিসেব নিকেশ আছে।

সবটা টাকার হিসেব তো নয়। আজকের দিনটা যেন একটা মাল্টি ভিটামিন ক্যাপসুল। একটাই দিন, কিন্তু তার মধ্যে যেন অনেকগুলো দিনের ঘটনাবলি কেউ ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অতীশের মাথা এত নিতে পারছে না। একটু টলমল করছে। শুধু বারবার বিশুর কথাটা ঘুরে ফিরে টোকা মারছে মাথায়, ফেস কাটিংটা ভাল। তার মানে কি, তাকে আর দীপ্তিকে নিয়ে গালগল্প ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ? ফেস কাটিংটা ভাল এ কথার ভিতর কি চাপা ইঙ্গিত আছে ? ও কি বলতে চাইছে, চালিয়ে যাও গুরু, মালটা খারাপ নয় ?

খাবারের বাক্সটা দুজনে ভাগাভাগি করে খেল ইস্কুলের ফাঁকা মাঠে জ্যোৎস্নায় বসে। দুটো চিকেন স্যান্ডউইচ, দুটো সন্দেশ, একটা ফিস ফ্রাই আর দুটো কলা। সব শেষে যখন কলাটা খাচ্ছে দুজনে সেই সময়ে পর পর দুটো বোমার শব্দ হল কাছেপিঠে।

বিশু কান খাড়া করে শুনে বলল, আজ লাগবে।

অতীশ শুধু বলল, হুঁ।

কলার খোসাটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিশু বলল, ল্যাংড়া আজ এন্ট্রি নেবে। বুঝলে ! আজ বিকেলে পুলিশ পিকেট উঠে গেছে। এই মওকা।

॥ পাঁচ ॥

চোখের ওই বিহ্বল দৃষ্টি, মুখের ওই সম্মোহিত ভাব এসবই চেনে বন্দনা। কী ভাবে চেনে তা সে বলতে পারবে না। হয়তো রমা মাসির মুখেও এরকম দেখে থাকবে। দুপুরে যখন দীপ্তিকে নামিয়ে দিয়ে গেল অতীশ তখনও দোতলার বারান্দায় রেলিঙের পাশে শানের ওপর পাথরের মতো বসে ছিল বন্দনা। অতীশ একবার উর্ধ্বমুখ হয়ে বারান্দার দিকে তাকাল। তাকে দেখতে পায়নি। তারপর রিক্সার মুখ ঘুরিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল। দীপ্তি সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে। রোদে ঘুরে মুখখানা লাল। কপালে একটু ঘাম। কিন্তু ক্লান্তি নয়, সারা শরীর যেন ডগমগ করছে আনন্দে। তখনই বন্দনা দীপ্তির চোখে সেই বিহ্বলতা দেখতে পেল।

বুকের ভিতরটা যেন নিবে গেল বন্দনার। বিকল হয়ে গেল হাত পা। স্থবির হয়ে গেল শরীর।

কী রে এখানে বসে আছিস যে।

দীপ্তি যে হাসিটা হাসল সেই হাসিই অনেক খবর দিয়ে দিল বন্দনাকে। সে বলল, এমনিই।

আজ কত ঘুরলাম ! তুই সঙ্গে গেলে বেশ হত।

বন্দনা অবাক হয়ে বলল, আমি সঙ্গে গেলে... ?

কথাটা শেষ করল না সে। একটা প্রশ্নের মতো ঝুলিয়ে রাখল। অতীশকে সামনে পেলে সে

ওর জামা খিমচে ধরত এখন, বলত, তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক ! বিচ্ছিরি লোক ! বিচ্ছিরি লোক !

দীপ্তি নিজের ঘরে পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে গুনগুন করে গান গাইছিল। আর বারান্দায় বসে অসহায়ের মতো কান্না সামলানোর চেষ্টা করছিল বন্দনা। পৃথিবীটা যে কেন এত খারাপ !

পিছনের বাগানে গাছতলায় তার পুতুলের সংসারে কতবার মিছে নেমন্তন্ন খেতে এসেছে একটি কিশোর। যার চোখ মুখ ছিল ভারী সহজ ও সরল, দুটো চোখে ছিল বিস্ময়ভরা লাজুক চাহনি। তখন কোঁচা দুলিয়ে খাটো ধুতি পরত অতীশ, গায়ে ছিল জামা। সংকোচ ছিল, লজ্জা ছিল। কত শাসন করেছে তাকে বন্দনা। বাগানে তখন অনেক বেশি গাছপালা, ঝোপঝাড় ছিল। অনেকে এসে জুটত তখন। রাজ্যের ছেলেমেয়ে মিলে চোর-চোর খেলত। তার মনে আছে অতীশকে একবার ধরে এনে চোর সাজিয়েছিল তারা। অতীশের সে কী হাসি। কাউকেই সে ছুঁতে পারছিল না। দৌড়ে দৌড়ে হয়রান হল। বন্দনার তখন মায়া হয়েছিল। কামিনী ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সে হাত বাড়িয়ে বলল, এই নাও, আমাকে ছুঁয়ে দাও তো অতীশদা। অতীশ চমকে উঠে বলে, তাই কি হয় খুকি ? তুমি বড় বাড়ির মেয়ে, তুমি কেন চোর হবে ? বন্দনা তখন দৌড়ে গিয়ে অতীশকে ছুঁয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, এইবার ? বন্দনা চোর সাজল, কিন্তু আর সবাই পালালেও অতীশ এসে সামনে দাঁড়াল বোকার মতো, এই নাও খুকি, আমাকে ছুঁয়ে দাও তো ! এত দৌড়ঝাঁপ তোমার সহ্য হবে না। এত রাগ হয়েছিল তখন অতীশের ওপর।

আজ চোখে জল আসতে চায় কেন যে !

তার বাবার পিছু পিছু অতীশ টুকটুক করে শান্ত পায়ে হেঁটে আসত। বাবার পাশে চুপ করে বসে পুজো করা দেখত। কখনও ঘুরে ঘুরে তাদের এঘর ওঘরে সাজানো জিনিস দেখে বেড়াত। মা কখনও কিছু খাবার দিলে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠত খুশিতে। কত যত্ন করে খেত ! খিদে ছিল, কিন্তু লোভ ছিল না কখনও। বন্দনা যখন গান গাইতে শুরু করে তখন তো অতীশ বেশ বড়টি হয়েছে। চুপ করে বসে গান শুনত। একটু আধটু তবলা বাজাতে শিখেছিল, ঠেকা দিত।

তাদের কত ফাইফরমাশ যে খেটে দিত অতীশ তার ইয়ত্তা নেই। ওই উঁচু উঁচু নারকোল গাছে উঠে কাঁদি কাঁদি নারকোল পেড়ে দিত আর বন্দনার তখন কী ভয় করত ! অত উঁচু থেকে যদি পড়ে যায় ! সে চিৎকার করতে থাকত, ও অতীশদা ! নেমে এসো না ! পড়ে যাবে যে !

না না পড়ব না খুকি। আমি কত গাছ বেয়ে বেড়াই !

একদিন বন্দনা জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কেন আমাদের এত ফাইফরমাশ খাটো ?

অতীশ অবাক হয়ে বলেছিল, তাতে কী ? তোমরা ব্রাহ্মণ জমিদার ! আমাদের অন্নদাতা, মনিব।

এমন ভারিক্কি চালে বলেছিল যে বন্দনা হেসে বাঁচে না।

আজ হাসি পায় না বন্দনার। একটুও হাসি পায় না।

খাওয়ার পর নিজের ঘরে চুপ করে শুয়েছিল বন্দনা। শরীরটা ভীষণ দুর্বল লাগছে। মনটা অন্ধকার।

দীপ্তি এসে বলল, কী রে ঘুমোচ্ছিস ?

না দীপ্তিদি, দুপুরে আমি ঘুমোতে পারি না।

তা হলে বসে একটু গল্প করি।

মুখে জোর করে হাসি টেনে উঠে বসল বন্দনা।

ঘরে রোদের কয়েকটা চৌখুপি এসে মেঝের ওপর পড়ে আছে। পায়রা ডাকছে। কাকের ডাকে খাঁ খাঁ হয়ে যাচ্ছে অপরাহ্ণ।

দীপ্তি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, ছেলেটা এত ইন্টারেস্টিং যে আমি ঠিক করেছি ওকে কলকাতায় নিয়ে যাব।

বন্দনা অবাক হয়ে বলে, নিয়ে যাবে ? নিয়ে কী করবে দীপ্তিদি ?

কী করব তা এখনও ঠিক করিনি। ছেলেটার অনেক গুণ। আজ শুনলাম ও নাকি ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ , কল সারাইয়ের কাজ, মোটর মেকানিকের কাজ সবই একটু আধটু জানে। টাইপ-শর্টহ্যান্ডও শিখেছিল। এত শিখেও মফস্বলে ওর তো কিছু হল না। ভাবছি কলকাতায় নিয়ে

গিয়ে ওকে একটা কোনও ট্রেনিং দেওয়াব। এখানে তো কোনও স্কোপ নেই। খেটে মরবে, পেট ভরবে না।

শুধু পরোপকার ? আর কিছু নয় ? বন্দনা বড় বড় চোখ করে দীপ্তির মুখটা দেখছিল। সেই মুখে না-বলা অনেক ভাব খেলা করছে। বারবার যেন নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পাচ্ছে। এ লক্ষণ সে চেনে।

দীপ্তি বলল, অমল তো আমার কোনও অভাব রেখে যায়নি। ভাবছি, যদি একটা ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি তবে টাকাটা সার্থক হবে।

আজ তোমরা কোথায় কোথায় গিয়েছিলে দীপ্তিদি ?

ওঃ, আজ সারা শহরটা পাগলের মতো ঘুরেছি। নদীর ধারটা দারুণ ভাল। নৌকোতেও চড়লাম একটু।

বন্দনা একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। সেই শ্বাসটা তার বুকের মধ্যে একটু ব্যথা হয়ে থম ধরে রইল।

তুমি কি তোমার সঙ্গেই অতীশদাকে নিয়ে যাচ্ছ ?

না। আমি কাল ফিরে যাব। অতীশ যাবে আরও এক মাস বাদে। একটু গুছিয়ে নিয়ে যাবে।

খুব সরলভাবে বন্দনা জিজ্ঞেস করল, অতীশদা কোথায় থাকবে ?

কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে দীপ্তি বলল, এখনও ঠিক করিনি। বন্ডেল রোডে তো আমার আরও একটা ফ্ল্যাট পড়ে আছে। ভাড়া দিইনি। ওখানে অমলের কম্পিউটার আর আরও সব কী যেন আছে। তালাবন্ধ পড়ে থাকে। সেখানেই থাকতে পারবে।

তোমার অনেক টাকা, না দীপ্তিদি ?

দীপ্তি একটু উদাস হয়ে বলল, টাকা ! তা হয়তো আছে। অমলের তো টাকার নেশা ছিল। কিন্তু টাকা দিয়ে কী হবে বল, মানুষটাই তো থাকল না।

মানুষকে ধরে রাখা যে কত কঠিন তা বন্দনার মতো আর কে জানে ? কেউ মরে যায়, কেউ চলে যায়। কী যে একা আর ফাঁকা লাগে তার ! চোখ ভরে জল আসছিল তার।

গল্প করতে এসেছিল দীপ্তি। কিন্তু কেন যেন তাল কেটে গেল। জমল না। যাই রে, কাল সকালেই গাড়ি, গুছিয়ে নিই। বলে দীপ্তি হঠাৎ উঠে গেল।

বিকেলে তার মা গলদঘর্ম হয়ে একটা চিঠির মুসাবিদা করছিল। লেখা-টেখার অভ্যাস নেই। বন্দনাকে ডেকে বলল, ওরে দেখ তো, ভুলভাল লিখেছি কি না। কতকাল কিছু লিখিনি, বানানই ভুলে গেছি। একটু দেখে দে তো মা।

বন্দনা লজ্জা পেয়ে বলল, তুমি বাবাকে লিখছ, আমার কি সে চিঠি পড়া উচিত ?

আহা, এ কি আর সেই চিঠি নাকি ? এ চিঠির মধ্যে গোপন কথা আর কী থাকবে ! পড়ে দেখ।

বন্দনা পড়ল। বেশি বড় চিঠি নয়। সম্বোধনে এখনও শ্রীচরণেষু লিখতে ভোলেনি মা। লিখেছে, তোমার বাড়িতে তুমি আসতে চাও আমি বারণ করার কে। বরং তোমার বাড়িতে আমিই তো অনধিকারীর মতো বাস করছি। আমি অন্য বাড়ি দেখছি, শিগগিরই ছেলে মেয়ে নিয়ে চলে যাব। তোমার পথে আর কোনও কাঁটা থাকবে না। শাওলরাম মাড়োয়ারি এ বাড়ি কিনতে চাইছে। যদি তাকে বাড়ি বিক্রি করো তা হলে তোমার বড় দুটি ছেলে-মেয়ের জন্য কিছু রেখো। ওদের তো ভবিষ্যৎ আছে।

চিঠিটা পড়তে পড়তে আবার চোখে জল এল বন্দনার। তার বাবা আর মায়ের মধ্যে কত ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, এখন কত দূরের হয়ে গেছে দুজনে। কেন যে এমন হয়।

ভুলভাল নেই তো।

না মা।

পাঠাব এ চিঠি ?

পাঠাও।

পশ্চিমে দিগন্তে যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল আজ তখন ছাদের ওপর থেকে আকুল চোখে চেয়ে ছিল

বন্দনা। তার মনে হচ্ছিল এই যে সূর্য অস্ত গেল আজ, আর উঠবে না কখনও। এর পর থেকে অনন্ত রাত্রি। শুধু অন্ধকার।

সন্ধের অন্ধকার যখন বিশাল পাখা মেলে অতিকায় এক কালো পাখির মতো নেমে আসছে, যখন গাছে গাছে পাখিদের তীব্র কলরব, পায়রারা ঝটপট করে নেমে আসছে ছাদে, ঠিক তখনই দু দুটো বোমা ফাটল পরপর।

আশ্চর্য এই—আজ ওই বিকট শব্দে একটুও চমকাল না বন্দনা। তার কোনও ভয় করল না। বরং ছাদ থেকে ঝুঁকে সে দেখার চেষ্টা করছিল, বোমা দুটো কোথায় ফাটল। বাগানের পিছন দিকে ধোঁয়া উঠছে নাকি ?

পিছনের বাগানের একটা ঝোপ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল অবু। ওপরের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, এই বন্দনা!

কী রে ?

ঘরে যা। ল্যাংড়া অ্যাটাক করছে।

তার মানে ?

ঘরে পালা।

বন্দনা একটু হাসল। বলল, এই তোর সাহস ?

আমি যাচ্ছি খবর দিতে। ঘরে যা।

বন্দনা ঘরে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। দেওয়ালের ওপাশে গলিতে একটা দৌড়োদৌড়ি হচ্ছে। কে যেন ঢিল মেরে ল্যাম্প পোস্টের বাল্‌ব্ ভেঙে দিল। অবু দৌড়ে চলে গেল সদরের দিকে। বাইরে থেকে আরও দুটো বোমা এসে পড়ল পিছনের বাগানে। বাইরে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, এই শালা, জানে মেরে দেব..

ধীরে, ধীরে সন্ধ্যার ভারী বাতাসে বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। ছাদ থেকেই সে শুনতে পেল, তাদের দোতলায় দুড়দাড় করে জানালা দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মা চিৎকার করল, ওরে বাহাদুর! বিলু! বিলু কোথায় ?

বিলু নীচের ঘরে আছে মা। পড়ছে।

আর বন্দনা ?

দেখতে পাইনি।

সর্বনাশ! দেখ কোথায় গেল রোগা মেয়েটা!

দীপ্তিদি তার ঘর থেকে বেরোল বোধহয়। আতঙ্কিত গলায় বলল, এ জায়গায় তোমরা কেমন করে থাকো মামি! রোজ এরকম হয় নাকি ?

আর বোলো না বাছা। কী যে ষণ্ডামি-গুণ্ডামি শুরু হয়েছে আজকাল। ভয়ে মরি। বন্দনা কি তোমার ঘরে ?

না তো মামি।

তা হলে কোথায় গেল ?

ছাদে যায়নি তো ?

বন্দনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এখন তাকে ঘরে যেতে হবে। ঘরে যেতে তার একটুও ইচ্ছে করছে না। জানালা দরজা বন্ধ করে দম চেপে থাকা তার পক্ষে এখন অসম্ভব। সে মরেই যাবে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। আজ কী তিথি জানে না সে। মস্ত চাঁদ দেখে মনে হয়, পূর্ণিমার কাছাকাছি। এখন কি ঘরে যেতে ইচ্ছে করে ?

বাহাদুরের পায়ের শব্দ উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। বন্দনার আর ছেলেমানুষির বয়স নেই। তবু সে হঠাৎ ছাদের দক্ষিণ কোণে রাখা আলকাতরার পিপেটার পিছনে গিয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল। বাহাদুর ছাদে এসে চারদিকটা দেখে নিয়ে ফের দৌড়ে নীচে চলে গেল।

না মা, ছাদে তো দিদিমণি নেই।

ওমা! কী সব্বোনেশে কথা! মেয়েটা তা হলে গেল কোথায় ?

দীপ্তি বলল, অমন অস্থির হোয়ো না মামি, আমি দেখছি। কোনও বান্ধবীর বাড়িতে যায়নি তো! আমাকে না বলে তো কোথাও যায় না।

পিপের আড়াল থেকে উঠে রেলিঙে ফের ভর দিয়ে দাঁড়ায় বন্দনা। শালটা আনেনি। তার শীত করছে। ঠাণ্ডা লাগবে কি? লাগুক। তার একটুও আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

শাওলরাম মাড়োয়ারি এ বাড়ির দাম দিতে চেয়েছে চৌদ্দ লাখ টাকা। চৌদ্দ লাখ শুনে মা সে কী খুশি! শাওলরামের সামনেই বলে ফেলল, আমি রাজি আছি শাওলরামজি। আপনি ব্যবস্থা করুন। উনি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আমাকে দিয়ে রেখেছেন।

কথাটা সত্যি। বাবা চলে যাওয়ার পর তার খোলা দেরাজে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা পাওয়া গিয়েছিল। তার মায়ের বা তাদের যেন কষ্ট না হয় তার জন্য তার ভাল বাবা সর্বস্বই প্রায় সঁপে দিয়ে গিয়েছিল মায়ের হাতে।

বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা আগেই হয়ে যেত। কিন্তু মদনকাকা শাওলরামের দর শুনে মাকে এসে বলল, বউদি, আপনার কি মাথাটা খারাপ হল?

কেন মদন, দরটা তো খারাপ নয়। চৌদ্দ লাখ তো অনেক টাকা!

এ বাড়ির চৌহদ্দির মাপ চার বিঘার ওপর, পাঁচ বিঘার কাছাকাছি। এখন শহরের এ জায়গায় লাখ টাকা করে কাঠা যাচ্ছে। শুধু জমির দামই তো কোটি টাকার কাছাকাছি!

শুনে মার চোখ কপালে উঠল, বলো কি মদন? এক কোটি?

বাড়ির দামটা ধরলে আরও দশ লাখ উঠবে। বাড়ির দাম বেশিই হত। কিন্তু পুরনো বাড়ি শাওলরাম রাখবে না। ভেঙে মালপত্র বেচবে। তা বেচলেও কম হবে না। বার্মা সেগুনের কাঠ আর মার্বেলের দামই তো কত উঠবে।

মা একটু হতাশ হয়ে বলল, অত কি দেবে? তবু শাওলরাম একটা দর দিয়েছে। আর তো কেউ দরও দিচ্ছে না।

কেউ কিনতে আসছে না, কারণ শাওলরাম সবাইকে টিপে রেখেছে। আপনাকে চৌদ্দ লাখ দেবে, আরও পনেরো বিশ লাখ টাকা অন্যদের খাওয়াবে। ওসব চালাকি তো আমরা জানি। আপনি চেপে বসে থাকুন। শাওলরামই দর বাড়াবে।

কথাটা শুনে মায়ের ভরসা হল না। বলল, অত টাকা কেউ দেবে না মদন।

এক লপ্তে না হল, ভাগে ভাগে বিক্রি করবেন না হয়। তাতে অনেক বেশি টাকা পাবেন।

কে ওসব করবে? আমার কি কেউ আছে?

এই বলে মা একটু কান্নাকাটি করল। যাই হোক, এইসব কথাবার্তার পর বাড়ি বিক্রি পিছিয়ে গিয়েছিল। দু মাস বাদে শাওলরাম এসে ফের তাগাদা দিতে লাগল। এ বার আরও দু লাখ বেশি দর দিতে রাজি হল, যেন খুব ঠকা হয়ে যাচ্ছে এমন মুখের ভাব করে। আরও দুমাস বাদে হীরেনবাবু আর অতুলবাবুর মধ্যস্থতায় শাওলরাম বিশ লাখ টাকা পর্যন্ত উঠল। বলে গেল, এ দর আর বাড়বে না।

এসব এক মাস আগেকার কথা। বন্দনার এত মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, সেই মন খারাপই যেন জ্বর হয়ে দেখা দিল।

এই বাড়িটার পরতে পরতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে যেন রেণু-রেণু হয়ে ছড়িয়ে আছে। এত মায়া যে, এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা সে ভাবতেই পারে না। কিন্তু বাবা যখন রমা মাসিকে নিয়ে আসবে তখন তো মা থাকবে না এ বাড়িতে। মাকে ছেড়ে সেও তো থাকতে পারবে না। কী যে হবে। তার চেয়ে এই তিনতলার ছাদ থেকে যদি আজ সে লাফিয়ে পড়ে মরে যায় তাও ভাল। শরীরে নয়, অশরীরী হয়ে এই বাড়িতেই হয়তো ঘুরে ঘুরে বেড়াবে সে।

বাগানে একটা টর্চের ঝিলিক দেখা গেল। দশ বারোটা ছেলেকে জ্যোৎস্নার মধ্যে ছুটতে দেখতে পেল বন্দনা। কে যেন চেঁচিয়ে বলল, দেয়ালের আড়ালে প্রোটেকশন নিয়ে চালাস।

দুটো ছেলেকে দেয়ালের ওপরে উঠে দাঁড়াতে দেখতে পেল বন্দনা। হাতে কিছু একটা অস্ত্রশস্ত্র আছে। বাইরের গলিটা এখন নিঃঝুম।

ফট করে একটা শব্দ হল কোথায় যেন। বন্দনা শিহরিত হয়ে টের পেল ভ্রমরের মতো গুঞ্জন তুলে তার মাথার ওপর দিয়ে কী যেন একটা উড়ে গেল। দেয়াল থেকে দুটো ছেলেই লাফিয়ে নেমে পড়ল এদিকে। কে যেন বলল, গুলি চালাচ্ছে শালা। জোর বেঁচে গেছি।

তবু ভয় করল না বন্দনার। জ্যোৎস্নায় স্নান করতে করতে সে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। রেলিঙের ওপর তার দুখানা আলগোছ হাত। সটান হয়ে স্পষ্ট হয়ে সে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ মায়ের গলা শুনতে পায় বন্দনা, ওরে আমার মেয়েটা...

বন্দনা নড়ল না। আজ রাতে তার খুব মরতে ইচ্ছে করছে।

তাদের বাগানে আরও কয়েকটা ছেলে ঢুকে পড়েছে। ধুতি আর শার্ট পরা বাবুদাকে সে এই ম্লান জ্যোৎস্নার আলোতেও চিনতে পারল। বাবুদা বলল, সবাই এখানে ঢুকলে হবে না। বড় রাস্তা দিয়ে গলির দুটো মুখ দিয়ে ঢুকতে হবে। কালকের মতো।

আদেশ পেয়েই কয়েকজন ফিরে দৌড়ে গেল সদরের দিকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপরই বাইরের গলিতে প্রচণ্ড শব্দে চার-পাঁচটা বোমা ফাটল। সেই সঙ্গে গুলির আওয়াজ। আরও দুটো ভ্রমরের গুঞ্জন খুব কাছ দিয়েই উড়ে গেল বন্দনার।

তবু একটুও ভয় করল না তার। পাথরের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পৃথিবীর কোনও ঘটনাই তাকে আজ আর স্পর্শ করছে না যেন। তার খুব হালকা লাগছে। তার ভেসে পড়তে ইচ্ছে করছে হাওয়ায়।

তাদের সদর দরজার কড়া ধরে কে যেন জোর নাড়া দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে একটা তীব্র চিৎকার কর্তামা। কর্তামা।

মা সভয়ে চিৎকার করে ওঠে, কে ? কে রে ? কী হয়েছে রে ?

অতীশের আর্তস্বর শোনা গেল, কর্তামা, ছাদে বন্দনা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে নামিয়ে আনুন। বাইরে গুলি চলছে।

বন্দনা ছাদে ? কে বলল তোকে ?

আমি দেখেছি কর্তামা। ও পিছন দিকেই দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকেই গুলি চলছে। ওকে নামিয়ে আনুন।

বন্দনার সমস্ত শরীর জুড়ে একটা রাগের স্রোত বয়ে গেল। সে ছুটে উল্টো দিকের রেলিঙে এসে ঝুঁকে ক্রুদ্ধ গলায় বলল, বেশ করেছি দাঁড়িয়ে আছি। তাতে তোমার কী ? তোমার কী ?

উঠোনের দিকটায় সরে গেল অতীশ। ল্যাংচাচ্ছে। ওপর দিকে চেয়ে বলল কী করছ তুমি ওখানে ?

আমি মরব। তোমার তাতে কী ?

অতীশ হতভম্ব হয়ে বলল, মরবে কেন ? নেমে এসো।

আমার মরতে ইচ্ছে হয়েছে। তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক।

জ্যোৎস্নায় ঊর্ধ্বমুখ হয়ে অতীশ অসহায় গলায় বলল, ওসব বলতে নেই। বেঁচে থাকতে মানুষ কত কষ্ট করে জানো না ? নেমে এসো।

নামব না। যাও, কী করবে ? তুমি লোভী। টাকার জন্য সব করতে পারো তুমি। দীপ্তিদির সঙ্গে পর্যন্ত...

সিঁড়ি দিয়ে মা আর বাহাদুর উঠে আসছিল দ্রুত। আর সময় নেই। ওরা ধরে নিয়ে যাবে। বন্দনা আরও ঝুঁকে পড়ল নীচের দিকে, তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক। বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি লোক।

অতীশ খুব ভালমানুষের মতো গলায় বলল, হ্যাঁ, তা তো জানি। অনেকদিন ধরে জানি। আমি একটা বিচ্ছিরি লোক।

কী করছিস সর্বনাশী। কী করছিস ? বলতে বলতে মা এসে ধরল তাকে।

বাহাদুর মুখে আফশোসের শব্দ করে বলল, পড়েই যেতে যে আর একটু হলে।

বন্দনা নেমে এল। একটু ঘোর-ঘোর অবস্থা তার। যেন পুরো চৈতন্য নেই। যেন খানিকটা স্বপ্নাচ্ছন্ন। খানিকটা জাগা।

মা চাপা স্বরে বলল, গা যে বেশ গরম। ছাদে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলি রে অসভ্য মেয়ে ?

অনেকক্ষণ মা।

কেন ?

আমার মন ভাল নেই মা, আমার মন ভাল নেই।

রাতে জ্বর বাড়ল বন্দনার। বুকে একটু ব্যথা, কাশি, সর্দি, হাঁচি, আর বাইরে তখন অবিশ্রান্ত বোমার শব্দ। গুলির শব্দ। যেমন দেওয়ালির দিন শোনা যায়, অবিকল তেমনি।

বন্দনার জ্বর উঠল একশো চারে। বিকারের ঘোরে সে দেখছে, ফুটফুটে শীতের সকালে তাদের শান্ত বাগানে গাছের ছায়ায় বসে সে পুতুল খেলছে। আজ পুতুলের বিয়ে। পুরুতমশাই কখন আসেন তার জন্য অপেক্ষা করছে সে।

মধ্যরাতে পুলিশের গাড়ি ঢুকল পাড়ায়। প্রথম টিয়ার গ্যাস। তারপর গুলি। বাড়ি ঘর ভরে গেল বারুদের গন্ধে।

ভোররাতে পিছনের বস্তির টিউবওয়েলের ধারে গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল ল্যাংড়া। পুলিশের শক্তিশালী রাইফেলের গুলি তার ঘাড় ভেঙে দিয়ে গেছে, বুকে মস্ত ফুটো দিয়ে রক্তের ফোয়ারা বেরিয়ে রাস্তা ভাসিয়ে দিল।

পরদিন নির্বিকার সূর্য ফের উঠল আকাশে। ততক্ষণে কোলাহল থেমে গেছে। মোট চারটে ডেডবডি তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। সকাল আটটার ট্রেন ধরবে বলে রওনা হয়ে গেল দীপ্তি। বাহাদুর তাকে রিক্সা ডেকে তুলে দিয়ে এসে বলল, ল্যাংড়া সাফ হয়ে গেছে মা। বাঁচা গেল।

মদনকাকা তার হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে এসে বন্দনার নাড়ি ধরে অনেকক্ষণ দেখে বলল এ যে খুব জ্বর!

হ্যাঁ। একশো চার। মা বলল।

নাড়ির অবস্থাও ভাল বুঝছি না। জ্বর বিকারে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। নিউমোনিয়া হওয়াও আশ্চর্য নয়। অ্যালোপ্যাথিই ভাল বউঠান। টাইফয়েডের পর শরীর কাঁচা থাকে।

ঘোরের মধ্যেই চোখ মেলে বন্দনা জিজ্ঞেস করল, ও কি চলে গেছে ?

মা ঝুঁকে বলল, কে ? কার কথা বলছিস ? দীপ্তি ? সে এই তো গেল। গিয়ে নাকি কলেজ করবে।

ডাক্তার ডেকো না মা, আমি আর ভাল হতে চাই না।

ও কী কথা ? চুপ করে শুয়ে থাক।

কে মারা গেছে মা ?

ও ল্যাংড়া।

আর ?

আর কে জানি না। মোট চারজন।

উঃ।

কী হল ?

খবর নাও কে মারা গেল আর।

ওসব যণ্ডা-গুণ্ডাদের খবরে আমাদের কী দরকার ? মরেছে বাঁচা গেছে।

উঃ মা, খবর নাও।

নিচ্ছি মা নিচ্ছি। ও বাহাদুর খবর নে তো কে কে মারা গেছে।

একটু বাদে মা এসে বলল, ল্যাংড়া, কুচো, ভোলা আর বিশু। কারা এরা তাও জানি না বাবা। তবে ভোলার মা বছরটাক আগে আমাদের বাড়িতে ঠিকে কাজ করত। বেচারা।

বন্দনা অস্ফুট গলায় বলল, কত শুদ্ধ ছিলে তুমি, কত পবিত্র ছিলে! এঁটোকাঁটা হয়ে গেলে ? আমার তো মোটে সতেরো বছর বয়স....এখনও কত দিন বাঁচতে হবে বলো তো! একা! কী ভীষণ একা।

মা বলল, মনটা ভাল নেই মা, আমাদের অতীশটাকে নাকি পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

বন্দনা কথাটা শুনতে পেল না। এক ঘুমঘোর তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে তখন।

মা বলল, পুলিশ নিয়ে তো বড্ড মারে। বোকা ছেলেটা। পুলিশের হাত থেকে নাকি বন্দুক কেড়ে নিতে গিয়েছিল।

চার দিন বাদে জ্বর ছাড়ল বন্দনার। একগাদা অ্যান্টিব্যয়োটিক খেয়ে শরীর আরও দুর্বল। আরও দুদিন বাদে হঠাৎ তাদের উঠোনে একটা রিক্সা এসে থামল ঠিক দুপুরবেলায়। একজন রোগা বুড়ো মানুষ একখানা ছোট ব্যাগ হাতে খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল। গায়ে একটা হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি, পরনে আধময়লা ধুতি, পায়ে হাওয়াই চটি। বারান্দায় তার চেয়ারে বসে ছিল বন্দনা। বুড়ো মানুষটিকে দোতলায় বিনা নোটিশে উঠে আসতে দেখে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে ছিল বন্দনা। কোনও আত্মীয় কি ? চেনা ?

মানুষটি তার দিকে কেমন এক বিমূঢ় চোখে চেয়ে ছিল। পলক পড়ছে না। একটাও কথা নেই মুখে। পরাজিত বিধ্বস্ত একজন মানুষ।

বন্দনাও চেয়ে ছিল। গুড়গুড় গুড়গুড় করে পায়রা ডাকছে সিলিঙে। কেমন যেন করছে বুকের মধ্যে বন্দনার।

ঠিক এই সময়ে মা বেরিয়ে এসে বারান্দায় পা দিল। তারপর থমকে দাঁড়াল।

বুড়ো মানুষটি কাঁপছিল থরথর করে। হাত থেকে স্খলিত ব্যাগটা পড়ে গেল শানে।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এলে তা হলে।

বুড়ো মানুষটি কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। একবার হাঁ করল। তারপর মুখ বুজে ফেলল। চোখের কোলে জল।

রেণু! বলে লোকটা আর পারল না। উবু হয়ে বসে পড়ল হঠাৎ। তারপর দুই হাতে মুখ ঢাকল। কাঁদল বোধহয়।

লোকটা কে তা বুঝতে পারে বন্দনা, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। এই কি তার সেই বাবা, যে কিনা একজন কবির মতো মানুষ। শৌখিন আনমনা, কল্পনায় ডুবে থাকা। যে বাবা তাকে শিখিয়েছিল ছোট ছোট নানা জিনিসের মধ্যে রূপের সন্ধান। বাইরের দুনিয়া নরখাদক বাঘের মতো বাবাকে চিবিয়ে খেয়েছে। না, সবটা নয়। অর্ধেক ফেরত দিয়েছে বুঝি। প্রেতলোক থেকে যেন বাবার এই আগমন।

বন্দনা উঠল না, দৌড়ে গেল না, চিৎকার করল না আনন্দে, উদ্বেল হল না, শুধু চেয়ে রইল। দেখল, মা গিয়ে বাবাকে হাত ধরে তুলছে। বলল, এসো, বোসো। এ তোমারই বাড়িঘর। অত লজ্জা পাচ্ছ কেন ?

একটা ময়লা রুমাল পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে বাবা নাক আর চোখ মুছল। দ্বিতীয়বার বলল, রেণু।

বলো। কী বলবে ?

বন্দনা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘরে চলে এল। এ কোন বাবাকে ফেরত দিল পৃথিবী ? এ কেমন ফেরত পাওয়া ? তার বুকের ভিতরে যে একটা পাথরের মতো স্তব্ধতা! মানুষ এত পাল্টে যায়!

ঘর থেকেই সে শুনতে পেল, মা বলছে, বোসো চেয়ারে। একটু জিরিয়ে নাও। কথা পরে হবে।

বাবা বসল। বলল, একটু জল দেবে ?

মা জল নিতে ঘরে এসে বলল, বাবাকে প্রণাম করতে হয়। শত হলেও গুরুজন।

বন্দনা নড়ল না। চুপ করে বসে রইল। পাথর হয়ে।

জল খেয়ে বাবা আরও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, ওরকম চিঠি লিখলে কেন রেণু ?

কেন, আমি কি খারাপ কিছু লিখেছি ?

এ বাড়ি ছেড়ে তুমি কেন যাবে ?

নইলে উপায় কী ?
আমি বলতে এসেছি, তুমি থাকো। আমি তো কাটিয়েই দিয়েছি আয়ু। বাকিটা কেটে যাবে
তা কেন ? কষ্ট করার তো দরকার নেই। রমাকে নিয়ে আসোনি ?
না। সে আসতে বড় ভয় পায়।
ভয় কীসের ? সে তো এখন সুয়োরানি। আমি দুয়ো।
বাবা একটা খুব বড়, বুক খালি করা শ্বাস ফেলে চুপ করে থাকল।
মা বলল, খাবে তো ?
খাব ! বলে বাবা যেন খুব অবাক হয়ে গেল।
মা বলল, ভাত খেয়ে এসেছ কি ?
নাঃ।
দুপুরে এখানেই তো খাবে। আর কোথায় যাবে ?
বাবা আর একটা খুব বড় শ্বাস ফেলে বলল, এ চেয়ারে বন্দনা বসে ছিল না ?
হ্যাঁ।
আমাকে চিনতে পারেনি। না ? কত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেছি দেখ ! অথচ এখন আমার চুয়ান্ন বছর বয়স ! গত দু বছরে কী হয়ে গেল !
প্রেমের মাশুল দিতে হচ্ছে তো ! বুড়ো বয়সের প্রেম তার হ্যাপা কি কম ?
আমাকে তোমাদের বড্ড ঘেন্না হয়, না ? আমার নিজেরই হয়, তোমাদের হবে না-ই বা কেন ?
ঘেন্না পিত্তির কথা এখন থাক। চান করে ভাত খেয়ে একটু জিরোও। তারপর কথা হবে।
বাবা কথাটা কানেই তুলল না। বলল, স্টেশনে নামলাম, রিক্সা করে এত দূর এলাম, এর মধ্যে একটা লোকও আমাকে চিনতে পারেনি, জানো ? স্টেশনের রেলবাবু না, রিক্সাওলা না, রাস্তার কেউ না। এমন কী মদনের সঙ্গে দেখা হল নীচে, সেও পারল না। মেয়েটা পর্যন্ত পারেনি। শুধু তুমিই দেখলাম, একবারে চিনলে।
আমার না চিনে উপায় আছে !
বিলু কি বাড়িতে নেই ?
স্কুলে গেছে।
তবে বুঝি তার সঙ্গে দেখা হল না।
ওমা ! কেন হবে না ?
আমি চারটের গাড়িতে ফিরে যাব।
তা হলে এলে কেন ?
দীপ্তির মুখে শুনলাম তুমি বাসা ভাড়া করে চলে যাবে বলে তোড়জোড় করছ। তাই ছুটে আসতে হল। তুমি ও কাজ কোরো না। তোমরাই থাকবে এখানে। বড্ড কষ্টে ছিলাম বলে তোমাকে ওরকম একটা অদ্ভুত চিঠি লিখেছিলাম। চিঠিটা পাঠিয়ে মনে হল, কাজটা ঠিক করিনি। সত্যিই তো, ওরকম কি হয় ? তোমার যে তাতে অপমান হয় তা আমার মাথায় খেলেনি।
শুধু এইটুকু বলতে এলে ?
হ্যাঁ। আর শেষবারের মতো তোমাদের একটু দেখে গেলাম। আর আসব না।
তোমার শরীরের যা অবস্থা দেখছি, ধকল সইবে তো ! তেমন জরুরি কাজ না থাকলে আজ বরং থেকেই যাও। নিজের অধিকারেই থাকতে পারবে। এত বছর ঘর করলে আমার সঙ্গে, একটা রাত এ বাড়িতে থাকলে আর কী ক্ষতি হবে ?
থাকাটা কি ভাল দেখাবে রেণু ?
ভাল দেখাবে কি না তা জানি না। তোমার শরীর ভাল দেখছি না বলে বলছি।
মেয়েটা বোধহয় চিনতে চাইল না, না ? যাক রেণু, আমি বরং ফিরে যাই। বিলুটাকে দেখে গেলে হত। ওরা সব ভাল আছে তো !
আছে। যেমন রেখে গেছ তেমনই আছে।

আর একটু জল দাও। খেয়ে উঠে পড়ি। আড়াইটেয় একটা গাড়ি আছে। ধরতে পারলে সন্ধেবেলায় কলকাতায় পৌঁছে যাব।

আবার জল নিতে মা ঘরে এল। বন্দনা তখনও খাটে বসে। একদম পাথরের মতো।

একবার দেখা করবি না? একটু চোখের দেখা দেখতে এসেছে। যা না কাছে। শরীরের যা অবস্থা দেখছি, লক্ষণ ভাল নয়।

বন্দনা তবু নড়ল না।

বাবা জল খেল। তারপর আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। বোধহয় ক্লান্তি। বোধহয় প্রত্যাশা।

মা বলল, এ বাড়ির নাকি এখন অনেক দাম। মদন সেদিন হিসেব করে বলল, এক কোটি টাকার ওপর। শাওলরাম মাড়োয়ারি কুড়ি লাখ টাকা দিতে চাইছে। আর একটু বেশি দাম উঠলে বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ারই ইচ্ছে আমার। তুমি কী বলো?

তোমাকে তো ওকালতনামা দিয়েই রেখেছি। তোমার ইচ্ছে হলে বেচে দিয়ো। বাড়ি দিয়ে কী হবে?

চাও তো তোমাকে কিছু দেব। কষ্টে আছ।

এই প্রথম বাবা একটু হাসল। বলল, না, আর দরকার নেই।

দরকার নেই কেন? খুব নাকি অভাব!

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ, সে একটা দিনই গেছে। খুব কষ্টের দিন। কিন্তু সয়েও যায় রেণু। এখন দেখছি, আমার আর অভাবটা তেমন বোধ হয় না। খিদে সহ্য হয়, রোগভোগ সহ্য হয়, অপমানও বেশ হজম করতে পারি। টাকা পয়সার প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে। না রেণু, বাড়ি বেচে টাকা-পয়সা হাতে রেখো। তোমার লাগবে।

মত দিচ্ছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। মত দিয়েই রেখেছি। আসি গিয়ে?

দুটো সন্দেশ মুখে দিয়ে যাও।

বাবা উঠতে গিয়েও বসে পড়ল, দাও তা হলে।

সন্দেশ নিতে মা ঘরে এসে বন্দনার দিকে চেয়ে বলল, অন্তত সন্দেশটা নিজের হাতে দাও না বাবাকে। খুশি হবে।

ও লোকটা আমার বাবা নয় মা।

ও কী কথা? ছিঃ। ওরকম বলতে নেই।

আমার বাবা তো এরকম ছিল না মা।

মা ফ্রিজ থেকে সন্দেশ বের করে প্লেটে সাজাতে সাজাতে বলল, চিরদিন কি কারও সমান যায়? শুনেছিস তো অভাবে কষ্টে আছে। চেহারা ভেঙে গেছে, অকালবার্ধক্য এসেছে। তা বলে কি বাবা বলে স্বীকার করবি না?

বন্দনা গোঁ ধরে চুপ করে রইল।

বাবা সন্দেশ খেল। ফের জল খেল। বলল, কম খেলেই আজকাল ভাল থাকি। বুঝলে? এই যে দুটো সন্দেশ পেটে গেল এই-ই এক বেলার পক্ষে যথেষ্ট। উঠলাম, কী বলো?

কী আর বলব। বিলুর তো ফিরতে দেরি আছে।

থাক থাক। না দেখাও ভাল। দেখলে মায়া বাড়ে কিনা।

মেয়ে সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে।

থাক থাক। ওকে ওর মতো থাকতে দাও। বড় হচ্ছে, একটা মতামত আছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে বাবার খুব সময় লাগছিল। বন্দনা উঠে বারান্দায় এল। তারপর রেলিঙের ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইল। একটু বাদেই বাবাকে দেখতে পেল সে, জীর্ণ শীর্ণ একজন মানুষ রোগা দুর্বল পায়ে ধীরে ধীরে উঠোনটা পেরোচ্ছে। পেরোতে পেরোতে একবার মুখ ফিরিয়ে ওপরের দিকে তাকাল। এই তাকানোটা ওই মুখ ফেরানোটাই যেন তীব্র মোচড়ে বুক ভেঙে দিল বন্দনার। বাবা শেষবারের মতো চলে যাচ্ছে। আর আসবে না। উঠোনটা পেরোলেই তাদের সঙ্গে সব বন্ধন ছিঁড়ে

যাবে। কেন মুখ ফেরাল বাবা ? কেন ?

বন্দনা হঠাৎ নিজের অজান্তেই অনুচ্চ স্বরে ডাকল, বাবা। একটু দাঁড়াও।

বাবা ভাল শুনতে পায়নি। যেতে যেতেই আর একবার মুখটা ফেরাল, তাকাল। তারপর ভুল শুনেছে মনে করে চলে যাচ্ছিল।

বন্দনা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নীচে। তারপর ছুট-পায়ে গিয়ে দেউড়ির কাছে মানুষটার পথ আটকে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছ তুমি এই রোদে ? না খেয়ে ? বলতে বলতে বহু কালের সমস্ত কান্না, জমে থাকা যত দুঃখ উথাল-পাথাল হয়ে উঠে এল তার বুক থেকে।

॥ ছয় ॥

পরান বলল, পারবেন ?

পারব। পারতেই হবে।

সামনে এক অফুরান মাঠ। এবড়ো খেবড়ো চষা জমি। স্টেশন যে কত দূর। একমাস হয়ে গেছে, তবু অতীশের সর্বাঙ্গ আজও ব্যথিয়ে আছে। পুলিশ তার প্রত্যেকটা জয়েন্ট ভেঙে দিতে চেয়েছিল। কনুই, হাঁটু, মেরুদণ্ডের তলার দিকটা। মারতে মারতে যেন নেশা ধরে গিয়েছিল ওদের। তবু চেঁচায়নি অতীশ। একটুও যন্ত্রণার শব্দ বেরোয়নি মুখ দিয়ে। কেবল দৃশ্যটা মনে পড়ছিল। হাবু মণ্ডলের ঘরের পাশে সে আর বিশু দাঁড়িয়ে। রাত তখন সোয়া একটা হবে। বোমবাজির শেষ খেলটা খেলছিল বাবু আর ল্যাংড়ার দল। বড় বাড়ির দুধারের গলি দিয়ে বাবুর দল ঢুকে আসছিল। ল্যাংড়া লিড দিচ্ছিল বস্তির দু কোনা আটকে। কার জিত, কার হার তখনও বোঝা যাচ্ছিল না। আচমকা একটা চিৎকার শোনা গিয়েছিল, রিট্রিট।

ওই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে গলির দুধার থেকে বাবুর দলের ছেলেরা পিছিয়ে যেতে লাগল। তারপর হাওয়া হয়ে গেল।

বিশু চাপা গলায় বলল, এর মানে কী জানো তো গুরু ? পুলিশ নামছে।

প্রথমে কয়েকটা টিয়ার গ্যাসের শেল এসে পড়ল গলির মধ্যে। তার পিছনে বুটের আওয়াজ। ল্যাংড়ার দলের ঝানু ছেলেরা চটপট বেরিয়ে এসে টিয়ার গ্যাসের শেলগুলো পটাপট বড় বাড়ির দেয়ালের ওধারে ফেলে দিল। তারপর গা-ঢাকা দিল। তারপর আড়াল থেকে মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে এসেই বোমা মেরে পালিয়ে যাচ্ছিল অলিগলির মধ্যে। পুলিশের সঙ্গে এরকম লুকোচুরি খেলার অভ্যাস এদের আছে।

পুলিশ ঢুকছিল দুধার দিয়েই। কিছু এল বড় বাড়ির ভিতর দিয়ে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে গলে। এখনও ফায়ারিং অর্ডার দেওয়া হয়নি। তবু বিশু বলল, চলো গুরু, সরে পড়া যাক।

হাবু মণ্ডলের পাশের গলিতে ঢুকে তারা নিশ্চিন্তেই এগোচ্ছিল। কোনও বিপদ ছিল না।

আচমকাই একজন সাব ইন্সপেক্টর আর কনস্টেবল ঢুকে এল গলিতে। কিছু বোঝাই গেল না। দুম করে একটা শব্দ হতেই বিশু যেন ছিটকে শূন্যে উঠে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ এক অসহনীয় ছটফটানি। তারপর নিথরও। অতীশ আমূল বিস্ময়ে তার জীবনের দ্বিতীয় মৃত্যু-দৃশ্যটা দেখল। কিন্তু এবার আর সেই স্তম্ভন ছিল না, সেই ভয়টাও নয়। একটা পাগলা রাগে ক্ষিপ্তের মতো সে গলির মুখে ছুটে গেল। সাব ইন্সপেক্টরের হাতে খোলা রিভলভার, কনস্টেবলের হাতে রাইফেল। তাকে ফুঁড়ে দিতে পারত।

কেন মারলেন। কেন মারলেন ? কী করেছে ও ? কেন গুলি করলেন ? বলতে বলতে সে কনস্টেবলটার ওপরে গিয়ে পড়েছিল। একটা লাথি মেরে কনস্টেবলটাকে ফেলে দিয়ে রাইফেলটা কেড়ে নিতে যাচ্ছিল সে।

সাব ইন্সপেক্টর কমল রায় গৌরাঙ্গর দাদা। চেনা লোক। শুধু তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করে বলেছিল, কী করছ ? যাও বাড়ি যাও। গো হোম।

কিন্তু ততক্ষণে বাহিনীটা এসে গেছে। কমল রায় চিৎকার করে তাদের আটকানোর একটা চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু তখন আশেপাশে বৃষ্টির মতো বোমা ফেলছে ল্যাংড়ার দল। কমল রায় অন্য দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। আর তখন পুলিশের বুট আর রাইফেলের কুঁদোয় পাট পাট হয়ে গেল অতীশ। তাকে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয় অর্ধচেতন অবস্থায়। শক আপে তার প্রবল জ্বর এসেছিল।

তিন দিন পর হীরেনবাবু তাকে বললেন, ওরে বাবা, পুলিশ কি লোকের নাম-ঠিকানা জেনে তবে গুলি চালাবে? পুলিশকে গুলি চালাতে হয় অন্ধের মতো। টু হুম ইট মে কনসার্ন। বুঝেছ? তোমার বন্ধু মারা গেছে, কিন্তু ইচ্ছে করে তো আর মারেনি বাবা। তুমি একজন স্পোর্টসম্যান, জেলার চ্যাম্পিয়ন। তোমার এগেনস্টে কেস দিচ্ছি না। বাড়ি যাও।

রিক্ত অবসন্ন অতীশ টলতে টলতে বাড়ি ফিরে এল। শরীরের ব্যথা নয়, তার মন-জুড়ে এক বিষের জ্বালা। বিশু নিরীহ ছিল, বিশু ছিল পাড়ার গেজেট, তেমন কোনও দোষও ছিল না ওর। গত একমাস ধরে ক্ষণে ক্ষণে শুধু বিশুর কথা মনে পড়ে।

পরান গাছতলায় বসে বিড়ি টেনে নিচ্ছিল। বলল, কেন যে এত কষ্ট করছেন। দুদিন পর তো কলকাতাতেই চলে যাবেন। সেখানে চাকরি বাকরি করবেন, ভাল থাকবেন, ভদ্রলোক বনে যাবেন। তবে আর এ কষ্টটা করা কেন?

অতীশ দূরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমি সব কিছু পারতে চাই। বুঝলে।

আপনি শক্ত লোক। পুলিশের ওরকম মার খেলে অন্যে তিন মাস হাসপাতালে পড়ে থাকত। চলুন, গাড়ির সময় হয়ে আসছে। রাস্তা এখনও অনেক।

চল্লিশ কেজি নতুন আলুর বস্তাটা গাছের গোড়ায় দাঁড় করানো। অতীশ উঠল। তারপর বস্তাটা জাপটে কাঁধে তুলে ফেলল। তার পর দুহাতে একটা সাপটা টানে মাথায়।

সাবাস! বলে বাহবা দিল পরান।

পরানের কাছেই শেখা। অতীশ বলল, চলো।

ব্যথা বেদনার শরীর, মাথার ওপর গন্ধমাদনের ভার, সামনে অফুরান পথ। এই মেহনতের ভিতর দিয়েই একটা মোচন হয় অতীশের। ক্লান্তিতে ঝিমঝিম করে শরীর, রগে রগে ছড়িয়ে পড়ে অবসন্নতা, তবু ওই নিষ্পেষণের ভিতর দিয়েই নিজের ভিতরে আর একটা নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে সে।

আগে পরান, পিছনে সে। একটু দুলকি চালে দ্রুত পায়ে হাঁটছে তারা। অনেকটা ছোটার মতো। ধীরে ধীরে যত কোমল ও সূক্ষ্ম বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। একটা চেতনা আর জেদ কাজ করে শুধু।

শীতকাল, তবু স্টেশন অবধি আসতেই ঘামে জামা আর প্যান্ট ভিজে সপসপে হয়ে গেল।

পরান বস্তাটা নামিয়ে তার ওপর বসে বিড়ি ধরাতে যাচ্ছিল। অতীশ বলল, পরিশ্রমের পর ওসব খেতে নেই। বুকের বারোটা বাজবে।

আমাদের ওসব সয়ে গেছে।

নিজের বস্তার ওপর উদাসভাবে বসে থাকে অতীশ। আজকাল তার কিছু ভাল লাগে না। কিছু একটা হয়ে উঠতেও ইচ্ছে করে না। থানা থেকে যেদিন ছেড়ে দিল সেদিন অতীশ তার ভাঙা শরীর নিয়েও গিয়েছিল বিশুদের বাড়িতে। বিশুর মা দৌড়ে এসে তাকে দুহাতে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করে বলছিল, ও অতীশ, তুই তো সঙ্গে ছিলি। তুই তো মরলি না, আমার ছেলেটা মরল কেন রে?

বার বার ওই কথা, তুই তো মরলি না, তবে আমার ছেলেটা কেন মরল? কথাটা কানে বড় বাজে আজও। কান থেকে কথাটা কিছুতেই তাড়াতে পারে না অতীশ।

মার-খাওয়া, থ্যাঁতলানো একটা শরীর, সর্বাঙ্গে বীভৎস কালশিটে, কাটা ছেঁড়া নিয়ে চার দিনের দিন ডাক্তার অমল দত্তের কাছে গিয়েছিল সে। অমলদা তাকে দেখে অবিশ্বাসে মাথা নেড়ে বলেছিল, এই শরীর নিয়ে তুই ঘুরে বেড়াচ্ছিস কী করে? তুই তো হসপিট্যাল কেস।

জ্বালা-ধরা দুই চোখে হঠাৎ জল এল তার। বলল, তবু তো বেঁচে আছি।

তুই বেঁচেও আছিস কি? এভাবে ওপেন উন্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ালে সেপটিক হয়ে মরবি যে! এক্স-রেটা করাস, গোড়ালিটা যা ফুলেছে, মনে হচ্ছে ফ্র্যাকচার।

ক্ষতগুলো ব্যান্ডেজ মেরে, টেটভ্যাক দিয়ে অমলদা একটা প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বললেন, সব ব্যাপারে হিরো হতে চাস না, বুঝলি? ওষুধগুলো ঠিকমতো খাস। আর সোজা বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাক।

একটু হাসল অতীশ। তার আবার বাড়ি, আবার বিছানা। ঘরে তার জায়গাই হয় না। ইস্কুলবাড়ির বারান্দায় সে শোয়। কিন্তু ডাক্তারবাবুকে সেসব কথা জানানোর মানেই হয় না।

শরীর ছাড়া অস্তিত্ব নেই। আবার সেই শরীর যখন অকেজো, অশক্ত হয়ে পড়ে তখন হয়ে ওঠে মস্ত ভারী একটা বোঝার মতো। আহত, থ্যাঁতলানো শরীরটা টেনে টেনে তবু দুদিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াল অতীশ। শরীরের ভার আর এক অক্ষম রাগ তাকে এমন তিরিক্ষি করে তুলেছিল যে, বাড়ির লোক অবধি তাব সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায়নি।

পাঁচ পাঁচটা নির্লজ্জ শহিদ বেদি তৈরি হল পাড়ায়। পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে শহরে বন্‌ধ হল একদিন। তাতে যে মানুষের কী উপকার হল তা কে জানে! তবু মানুষ এরকমই সব অর্থহীন কাজ করে।

একটা ডাউন গাড়ি গেল। পরান বিড়িটা ফেলে দিয়ে বলল, আজ আপ গাড়িটা লেট করছে।

অতীশ শুধু বলল, হুঁ।

কী ভাবছেন এত বসে বসে?

কত কথা ভাবি।

ডাউন গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেল। আপ গাড়ির জন্য দু-চারজন লোক বসে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য অস্তে যাচ্ছে চষা মাঠেব ওদিকটায়। বড্ড খুনখারাপি রং হয়েছে আকাশে। ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া লেগে হঠাৎ ঘামে ভেজা শরীরে একটু শীত করে উঠল অতীশের।

মাথার ওপরে জ্যোৎস্না আর চারদিকে বারুদের গন্ধ, বোমা ফাটছে গুলি চলছে, আর ছাদ থেকে ঝুঁকে বন্দনা বলছে, আমি মরলে তোমার কী? তুমি বিচ্ছিরি লোক। বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি লোক! দৃশ্যটা এত ঘটনাবলির ভিতর থেকে যেন আলাদা হয়ে বড্ড মনকে উদাস করে দেয়। একদিন তেমাথার কমল স্টোর্সের কাছে সকালের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল অতীশ, একটা রিক্সায় বন্দনা কলেজে যাচ্ছিল। গায়ে একটা কমলা রঙের শাল জড়ানো, মুখখানা পাণ্ডুর, চোখ দুখানা বিষণ্ণতায় ভরা। যেন মানুষ নয়। যেন খুব ফিনফিনে খুব নরম জিনিস দিয়ে তৈরি একটা পুতুল। কী সুন্দর! তাকে দেখতে পায়নি, ভারী আনমনা ছিল। রিক্সাটি যখন দূবে চলে যাচ্ছে তখন অতীশ বিড়বিড় করে বলেছিল, তাই কি হয় খুকি? তাই কি হয়? তুমি হলে আমাদের মনিব, অন্নদাতা।

একটা বিষণ্ণ ঘণ্টির শব্দ চারদিকটাকে মথিত করতে থাকে হঠাৎ। পরাণ বলল, গাড়ি আসছে।

দিন পাঁচ-ছয় আগে একদিন রাতে বাড়ি ফিরতেই মা বলল, কর্তাবাবু ফিরেছেন, জানিস?

অতীশ অবাক হয়ে বলে, সে কী?

কী রোগা হয়ে গেছেন, চেনা যায় না। সঙ্গে ছোট বউ আর ছেলেও এসেছে। এখন এখানেই থাকবে।

একসঙ্গে?

তাই তো শুনছি। বড় গিন্নির সঙ্গে নাকি রফা হয়েছে। খবর পেয়ে তোর বাবা গিয়েছিল দেখা করতে। কর্তাবাবুর বলে কী হাউ-হাউ কান্না। অনেক দিন বাদে নিজের বাড়িতে ফিরে নিজেকে সামলাতে পারছেন না। ছোট বউটা নাকি বড় গিন্নির ভয়ে একতলার সিঁড়িতে ছেলে কোলে করে বসে ছিল। বড় গিন্নির আপন পিসতুতো বোন হলে কী হয়, ছেড়ে কথা কওয়ার মানুব বড় গিন্নি নয়। ক'দিন পরেই লাগবে।

বড়দি সেলাই করতে করতে বলল, তার ওপর আবার বুড়ো বয়সে ছেলে হয়েছে, ছিঃ। কত লোক আসছে রঙ্গ দেখতে! কী লজ্জা, কী ঘেন্না বাব্বাঃ!

ফাঁকা ট্রেনে বসে পরান আবার বিড়ি ধরিয়ে বলল, আজ যে খুব ভাবিত দেখছি আপনাকে। বলি হলটা কী ?

অতীশ একটু হাসল। কিছু বলল না। আজকাল সে ভাবে। আজকাল সে খুব ভাবে।

স্টেশনে আলুর বস্তাটা নামিয়ে রিক্সায় তুলল অতীশ। পরান বলল, আলুর ব্যবসাই যদি করবেন তো বড় করে করুন। আমাদের মতো ছোট ব্যাপারি হয়ে থাকলে আর কপয়সা হবে। তারকেশ্বর, বাঁকড়ো, বর্ধমানের দিকে চলে যান, ট্রাক ভর্তি মাল নিয়ে আসুন, পকেটে টাকা ঝনঝন করবে।

অতীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বন্দনা সেদিন তাকে লোভী বলেছিল। বলেছিল, টাকার জন্য তুমি সব পারো। অতীশ কি তাই পারে ? অতীশ কি ততটাই লোভী ?

বাজারে পাইকারের কাছে আলুর বস্তা গস্ত করে টাকাগুলো প্যান্টের পকেটে ভরল অতীশ। পকেটে হাত রেখে টাকাগুলো কিছুক্ষণ খামচে ধরে রইল। লোভী ? সে কি লোভী ? তুমি তো জানো না খুকি, এক একটা কথা কত গভীরে বিঁধে থাকে।

খুব কি পাপ হবে ? পাপ পুণ্য বলে কিছু আছে কি না সেই সিদ্ধান্তে আসতে পারে না অতীশ। তবু তিনটে ডাইনির মতো তার পথ আটকে দাঁড়াতে চায় তিনটে জিনিস। বয়সে বড়, বিধবা আর ছেলের মা। এই তিন ডাইনি তার পথ আটকায় বটে, কিন্তু তবু তার ইচ্ছে করে ওসব গায়ে না মাখতে। দীপ্তি একজন ঝলমলে মেয়ে, জিয়ন্ত, কত হাসিখুশি। মস্ত একটা চিঠি দিয়েছে সে। পাছে অতীশের বাড়ির কেউ খুলে পড়ে সেইজন্য ইংরিজিতে লেখা। ম্যানেজমেন্ট কোর্সে অতীশকে ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে আছে। কম্পিউটার ট্রেনিং-ও। পুরনো সংস্কার গায়ে না মাখলেই হয়। কিছু স্মৃতির ধুলো শুধু গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে অতীশকে। পারবে না ?

আজকাল অতীশ খুব ভাবে। ভাবতে ভাবতে পকেটের টাকাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে পথ হাঁটে।

॥ সাত ॥

দুপুরবেলা চুপি চুপি নীচে নেমে এল বন্দনা। একতলার পশ্চিমের ঘরটাই সবচেয়ে অন্ধকার আর ড্যাম্প। এই ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে রমা মাসি। কিছুতেই ওপরের ঘরে যেতে রাজি হয়নি। প্রথমদিন এসে শুধু মাকে একটা প্রণাম করে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। মা ধমক দিয়েছিল, চুপ কর।

ধমক খেয়ে চুপও করেছিল রমা মাসি। তারপর সেই যে এই ঘরে ছেলে নিয়ে ঢুকল, আর বেরোয় না। কাউকে মুখ দেখায় না।

দরজায় টোকা দিল বন্দনা।

রমা মাসির ভীত গলা বলে উঠল, কে ?

আমি মাসি। দরজা খোলো।

দরজা খুলে বিহ্বল মাসি হাসবে না কাঁদবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। দুটো বিপরীত ভাব মানুষের মুখে আর কখনও এরকম খেলা করতে দেখেনি বন্দনা। সে মাসিকে দুহাতে ধরে বলল, কেঁদো না, তোমার ছেলেটাকে চলো তো দেখি। আমি ভীষণ বাচ্চা ভালবাসি।

আয়।

রোগা বাচ্চাটা শুয়ে ঘুমোচ্ছে মশারির মধ্যে।

খুব শীত পড়েছে মাসি, ওকে রোদে নিয়ে তেল মাখাও না ?

ঘরেই মাখাই।

কেন মাসি ? ঘরের বাইরে যেতে ভয় পাও কেন ?

রমা মৃদু গলায় বলল, কত ক্ষতি করে দিলাম তোদের। আমার জন্যই তো এত সব হয়ে গেল। মুখ দেখাতে লজ্জা করে।

ওসব ভুলে যাও।

রমা হঠাৎ তার দুটো হাত ধরে বলল, তোর জন্যই আমরা এখানে ফের আসতে পারলাম। রেণুদিকে তুই-ই রাজি করিয়েছিস। তুই এত ভাল কী বলব তোকে ? যদি এখানে না আসতাম তা হলে আমরা আর বেঁচেই থাকতে পারতাম না। তোর জন্যই—

ওসব বলতে নেই মাসি। আমার মা একটু রাগী ঠিকই, কিন্তু মা ভীষণ ভালও তো।

খুব ভাল রে ! কিন্তু রেণুদির কী সর্বনাশটাই না আমি করলাম।

শোনো মাসি, একটু ওপরে টোপরে যেও, ঘোরাফেরা কোরো, নইলে সম্পর্কটা সহজ হবে না।

সাহস পাই না যে রে।

মা তোমাদের ওপর রেগে নেই কিন্তু।

কী করে বুঝলি ?

মাকে আমি খুব বুঝি। বাইরের রাগ একটু আছে হয়তো, কিন্তু ভিতরে রাগ নেই।

আমার বড্ড ভয় করে রেণুদিকে।

রাত্রিবেলা মায়ের পাশে শুয়ে বন্দনা হঠাৎ বলল, মা, তুমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করো ?

হঠাৎ ওকথা কেন ?

এমনি। বলো না করো কি না ?

করব না কেন ? চিরকাল শুনে আসছি মানুষ মরে আবার জন্মায়।

বন্দনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি রমা মাসির ছেলেটাকে দেখেছ মা ?

মা একটা বিরক্তির শব্দ করে বলল, প্রবৃত্তি হয়নি।

বন্দনা আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক দাদার মতো দেখতে।

মা হঠাৎ নিথর হয়ে গেল। তারপর বলল, কে বলেছে ?

কে বলবে মা ! আমারই মনে হয়েছে।

তুই ওই বয়সের প্রদীপকে তো দেখিসনি !

না তো। কিন্তু একটা আদল আসে।

বাজে কথা। ঘুমো।

বন্দনা ঘুমোল। কিন্তু পরদিন ভারী অন্যমনস্ক রইল মা। তার পরদিন গিয়ে হানা দিল রমার ঘরে।

দু দিন বাদে ছেলেটা মায়ের কোলে কোলে ঘুরতে লাগল।

এই ছলনাটুকু করতে খারাপ লাগল না বন্দনার। এই ফাঁকা ভুতুড়ে বাড়িটায় একটু জনসমাগম হয়েছে। একটু প্রাণের স্পর্শ লেগেছে। এটুকু নষ্ট হোক, সে চায়নি।

বাবা বড্ড বুড়িয়ে গেছে। মুখে কেবল মরার কথা। আমি আর বেশি দিন নয় রে। আমার হয়ে এসেছে।

বাঁচতও না বাবা। সেদিন দুপুরে এসে চলে যাওয়ার সময় বন্দনা গিয়ে যদি না আটকাত তা হলে বাবা বোধহয় পথেই পড়ে মারা যেত সেদিন। বন্দনা জোর করে ধরে নিয়ে এল। স্নান করতে পাঠাল, ভাত খাওয়াল। যেতে দিল না সেদিন। আর রাতে মায়ের কাছে কেঁদে পড়ল সে, ও মা, বাবাকে এখানে আসতে দাও।

মা বলল, আসুক না। আসতে তো বলছিই। আমি থাকব না।

কেন মা ? আমরাও কেন থাকি না এখানে ?

তা কি হয় ? আমার আত্মসম্মান নেই ?

রমা মাসি তো খারাপ মানুষ নয় মা, সে তো কখনও তোমার অবাধ্যতা করেনি। এক ধারে এক কোণে পড়ে থাকবে। এত বড় বাড়ি, তুমি টেরও পাবে না।

শুনে মা খুব রাগ করল। বলল, এত কাণ্ডের পরও একথা বলতে পারলি তুই ? ওদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকব ! কেন, আমার কি ভিক্ষেও জুটবে না ?

বন্দনা মায়ের পা ধরেছিল, ওরকম বোলো না মা। বাবার কী অবস্থা দেখছ না ? এ অবস্থায় ফেলে তুমি কোথায় যাবে ?

আমাকে ফেলে যায়নি তোর বাবা ?

তার শাস্তি তো পেয়েছে মা।

সারা রাত মায়ের সঙ্গে তার টানাপোড়েন চলল। ভোর রাতের দিকে মা ধীরে ধীরে নরম হয়ে এল। কাঁদল। তারপর বলল, তোদের মুখ চেয়ে না হয় সেই ব্যবস্থা মেনে নিলাম। কিন্তু লোকে তো হাসবে।

এখন লোকে হাসে না মা। লোকের তত সময় নেই।

কিন্তু রমা নীচের তলা থেকে ওপরে উঠতে পারবে না কখনও। মনে রাখিস।

কথাটা মা নিজেই মনে রাখেনি। দশ দিনের মাথায় রমা মাসিকে দিব্যি দোতলায় ডেকে আনল মা। বলল, আমি ছেলেটাকে দেখছি, তুই রান্নার দিকটা সামলে নে।

চমকে উঠে রমা মাসি যেন কৃতজ্ঞতায় গলে পড়ে বলল, যাচ্ছি রেণুদি।

শাওলরাম মাড়োয়ারি এই সেদিনও এসে বাবার কাছে খানিকক্ষণ বসে থেকে গেছে। তার একটাই কথা, চৌধুরী সাহেব, বিশ লাখ দর তুলে বসে আছি। কিছু একটা বলুন।

বাবা হয়তো রাজি হয়ে যেত। বিষয়বুদ্ধি বলতে বাবার তো কিচ্ছু নেই। বন্দনা বাবাকে বলে রেখেছে, এ বাড়ি ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না বাবা। এ বাড়ি তুমি কিছুতেই বিক্রি করতে পারবে না।

বাবা তার দিকে চেয়ে হেসে বলেছে, আমারও তাই ইচ্ছে। শেষ কটা দিন এ বাড়িতেই কাটাই।

তুমি একটা কাজ করবে বাবা ? বস্তির দিককার খানিকটা জমি বিক্রি করে দাও। বাকিটা আমাদের থাক।

পরদিনই মদনকাকা আর বাহাদুর মিলে ফিতে টেনে পিছনের দিককার জমিটা মাপজোক করল। মদনকাকা বাবাকে এসে বলল, বিঘে দুই হেসে খেলে বের করা যাবে। দু বিঘের অনেক দাম। পিছনের জমি বলে দাম কিছু কম হবে। তাও ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ ধরে রাখুন। শাওলরাম দিনে দুপুরে ডাকাতির চেষ্টা করছে।

তাদের বাড়ির ভোল পাল্টাচ্ছে আস্তে আস্তে। মরা বাড়িটা জেগে উঠছে। একটু প্রাণের স্পর্শ লাগছে ক্রমে ক্রমে। কিন্তু বন্দনার বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে ট্রেনের হুইশলের মতো দীর্ঘ টানা বাঁশির মতো কী যেন বেজে যায়। একমাস পার হয়ে গেছে। অতীশ কলকাতায় চলে গেল বোধহয়! কবে গেল ? বলেও গেল না ?

মা! ও মা! ছেলে ফিরে পেয়ে সব ভুলে গেলে যে! বাবা ফিরে এল, এবার নারায়ণপুজো দেবে না ?

তাই তো! কত দিন পুজোপাঠ নেই। বাহাদুরকে দিয়ে ভট্চাযমশাইকে খবর পাঠা তো।

বাহাদুরকে ভট্চাযমশাইয়ের কাছে পাঠাল বন্দনা। কিন্তু মনে মনে বলল, হে ঠাকুর, ভট্চাযমশাইয়ের যেন কাল জ্বর হয়। যেন অতীশ আসে। তার যেন কলকাতায় যাওয়া না হয়ে থাকে ...

এক মাসের জায়গায় দেড় মাস পেরিয়ে গেছে, অতীশের থাকার কথা নয়। এই ভেবে বন্দনার বুকটা ধুক ধুক করতে লাগল অনিশ্চয়তায়।

পরদিন সন্ধেবেলা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল বন্দনা। কে আসবে ? কে আসবে ? কে আসবে ? হে ঠাকুর ...

গায়ে নামাবলি জড়ানো পুরুত ঠাকুর যখন তার লাজুক মুখটা নামিয়ে নম্র পায়ে উঠে আসছিল সিঁড়ি বেয়ে তখন যে কেন আনন্দে হার্টফেল হল না বন্দনার কে বলবে ? তার খুব হাততালি দিয়ে হো হো করে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল। ইচ্ছে হল ছাদে গিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়তে। ইচ্ছে হল আজ ঘুমের মধ্যে মরে যেতে।

যতক্ষণ পুজো করল অতীশ, বন্দনার দুটো চোখের পলক পড়ল না। ঠাকুর আজ তার দুটো চোখ ভরে দিচ্ছেন। আর কিছু চায় না বন্দনা। আর কিছু নয়। শুধু মাঝে মাঝে যেন দু চোখ ভরে দেখতে পায়।

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল পিছনের বাগান। কুয়াশায় মাখামাখি। নতমুখে বাগানটা পেরোচ্ছিল অতীশ। আতা গাছটার তলায় কে যেন বসে আছে। অতীশ থমকে দাঁড়াল।

কলকাতায় কবে যাচ্ছ ?

অতীশ একটু হাসল, এখানে বসে থাকতে হয় বুঝি খুকি ? ঠাণ্ডা লাগবে না ?

কথার জবাব দাওনি।

যাচ্ছি না। তিনটে ডাইনি যেতে দিচ্ছে না।

ডাইনি ! সে আবার কী ?

আছে। তুমি বুঝবে না। ঘরে যাও ঠাণ্ডা লাগবে।

আমি মরব।

ওরকম বলতে নেই।

আমি মরলে তোমার কী ?

সে কি বোঝাতে পারি ?

তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক।

জানি খুকি, জানি।

শোনো, আমাদের পিছনের দু বিঘে জমি বিক্রি হবে। বাবার তো একটুও বুদ্ধি নেই। কে আমাদের এত সব কাজ করে দেবে বলো ? তুমি ভার নেবে ? বাবা বলেছে টেন পারসেন্ট কমিশন।

অতীশ একটু হাসল। বলল, আমি বড় লোভী, না খুকি ?

বন্দনা ভ্রূ কুঁচকে বলল, লোভীই তো।

তারা আর কোনও কথা বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মুখোমুখি। তারা বলল না, কিন্তু তাদের হয়ে আজ রাতের জ্যোৎস্না, একটু কুয়াশা আর পুরনো এই বাড়ির প্রাচীন এক হাওয়া কত কথা কয়ে গেল। কত কথা উঠে এল মাটির গভীর থেকে, আকাশ থেকে ঝরে পড়ল। তাদের চারদিকে সেইসব কথা উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। গুনগুন, গুনগুন।

ঋণ
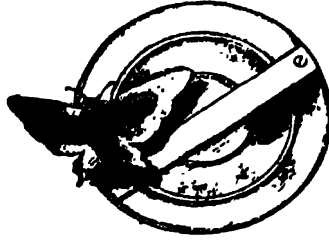
আপনার নাম ?
মিঠু মিত্র।
বাবার নাম ?
স্বৰ্গত পিনাকী মিত্র।
আপনার কোনও পোশাকি নাম আছে ?
না, আমার একটাই নাম।
বয়স ?
তেত্রিশ বছর।
ঠিকানা ?
এই ফ্ল্যাটই আমার ঠিকানা।
এই ফ্ল্যাট ছাড়া আপনার আর কোনও বাড়ি নেই ?
আছে। কৃষ্ণনগরে। আমার বাবা করেছিলেন। কিন্তু সেটা ভাড়াটেদের দখলে। তারা ভাড়াও দেয় না।
বাড়ির ট্যাক্স কে দেয় ?
আমিই দিই।
আপনি কোথায় চাকরি করেন ?
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে।
ব্রাঞ্চ ?
রসা রোড।
কী চাকরি করেন ?
অ্যাকাউন্টস অফিসার।
কতদিন চাকরি করছেন ?
প্রায় দশ বছর।
একই ব্রাঞ্চে ?
না। তিনটে ব্রাঞ্চে ঘুরে ফিরে।
আপনার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস ?
সিঙ্গল।
কখনও বিয়ে হয়েছিল ?
হয়েছিল।
কার সঙ্গে ?
মিতালি ঘোষ। ডিভোর্স হয়ে গেছে।
বিয়েটা ভেঙে গেল কেন ?
মিতালি আমাকে পছন্দ করত না।
কেন করতেন না ?
সেটা তারই জানার কথা।
অপছন্দের কথাটা তিনি কবে প্রকাশ করেন ?
বিয়ের রাতেই।
অপছন্দ হলে তিনি আপনাকে বিয়ে করলেন কেন ?

আমাদের বিয়েটা কিছুটা অ্যাকসিডেন্টাল।

কী রকম?

ওর বাবা বরুণ ঘোষের লাং ক্যান্সার হয়েছে বলে একজন বড় ডাক্তার সন্দেহ প্রকাশ করেন। মিতালি তাঁর একমাত্র সন্তান, তিনি বিপত্নীক ছিলেন। সুতরাং তিনি খুব তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। হাতের কাছে আমাকে পেয়ে আমার সঙ্গেই বিয়ে দেন।

বরুণ ঘোষের সঙ্গে আপনার বিয়ের আগে পরিচয় ছিল?

সামান্য ছিল। আমার ব্রাঞ্চে ওঁর অ্যাকাউন্ট ছিল। প্রায়ই আসতেন। আমি তখন ক্যাশে বসতাম। সেই সূত্রেই পরিচয়।

মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পক্ষে পরিচয়টা যথেষ্ট নয় কিন্তু।

সেটা আমি অস্বীকার করছি না।

বরুণ ঘোষ কি নিজেই আপনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনিও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান?

না। আমার বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না। উনি ওঁর অসুখের কথা বলে আমাকে রাজি করান।

কিন্তু আমরা যতদূর জানি বরুণ ঘোষের ক্যান্সার হয়নি।

না। সেটা পরে ধরা পড়ে। কিন্তু তখন ক্যান্সার হয়েছে বলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

দেখুন, আমরা পুলিশের লোক। সহজ সরলভাবে কোনও কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের কাছে খবর আছে, বিয়ের ব্যাপারে আপনারই আগ্রহ ছিল বেশি। কারণ বরুণ ঘোষের টাকা এবং বিষয়সম্পত্তি। তাঁর মেয়ে মিতালিও ছিল সুন্দরী এবং মেধাবী। আপনার যা স্ট্যাটাস তাতে বরুণ ঘোষের মতো একজন ধনী লোক তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে আপনার সঙ্গে দিতে চাইবেন এবং তার জন্য চাপাচাপি করবেন এটা কি স্বাভাবিক ঘটনা?

না, স্বাভাবিক ঘটনা নয়, আমিও জানি। কিন্তু তখন সিচুয়েশনটাও স্বাভাবিক ছিল না। উনি নাচার হয়েই বিয়েটা দেন।

আমি যদি বলি, আপনি ওঁর মেধাবী ও সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করে ওঁর বিরাট সম্পত্তি গাপ করার জন্য ওঁকে ব্ল্যাকমেল করেছিলেন?

ব্ল্যাকমেল! কীভাবে ব্ল্যাকমেল করব?

সেটা আস্তে আস্তে জানা যাবে। তদন্তের তো মোটে শুরু।

আগেই বলেছি বরুণবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় গভীর ছিল না। ব্যাঙ্কের সূত্রে পরিচয়। তাঁকে ব্ল্যাকমেল করার প্রশ্নই ওঠে না।

এই বিয়েতে যে মিতালির আপত্তি ছিল, তা কি আপনি বিয়ের আগে জানতে পেরেছিলেন?

না।

মিথ্যে কথা। বিয়ের আগে মিতালিই আপনাকে টেলিফোন করে জানান যে, এই বিয়েতে তিনি রাজি নন।

না তো, এ রকম ঘটনা ঘটেনি।

শুধু তাই নয়, মিতালি আপনাকে একটা চিঠিও লিখেছিলেন।

আমি কোনও চিঠি পাইনি।

মিতালি ঘোষের বন্ধুরা কিন্তু সাক্ষী দেবে। তারা জানে।

আমি সত্যি কথাই বলছি।

ইউ আর এ কুল কাস্টমার। এই ফ্ল্যাটটা কার?

আমার।

এটা কি বিয়ের আগেই কিনেছিলেন?

হ্যাঁ।

ফ্ল্যাট কেনার টাকা কে দিয়েছিল?

ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে কিনেছিলাম। ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি ছিল।

মিথ্যে কথা। আমরা জানি, ফ্ল্যাট কেনার জন্য টাকা আপনি আদায় করেছিলেন বরুণ ঘোষের কাছ থেকে।

কিন্তু আমার লোনের রেকর্ড ব্যাঙ্কে আছে।

সে টাকা তুলে আপনি হয়তো ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছেন বা শেয়ারে খাটিয়েছেন। আমরা সবই জানতে পারব।

বরুণ ঘোষের কাছ থেকে আমি টাকা নিইনি।

বিয়ের রাতে মিতালি আপনাকে কী বলেছিলেন ?

বলেছিল আমাকে তার পছন্দ নয়।

আপনি তখন কী করলেন ?

আমি খুবই অসহায় ফিল করলাম। আমি তাকে বলেছিলাম যে, পছন্দ না হয়ে থাকলে আমার দিক থেকে তার কোনও ক্ষতি হবে না।

মিথ্যে কথা। আপনি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার সঙ্গে উপগত হয়েছিলেন।

না। কখনওই নয়। তার সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্কই হয়নি।

আপনারা এই ফ্ল্যাটে কতদিন একসঙ্গে বসবাস করেছেন ?

একসঙ্গে বসবাস করিনি। ফুলশয্যার রাত থেকেই মিতালি আর আমি আলাদা ঘরে শুতাম। মাসখানেক বাদে মিতালি স্থায়ীভাবে চলে যায়।

আপনার হাইট কত ?

পাঁচ ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চি।

ওজন ?

আটাত্তর কেজি।

মিতালি দেবীর গয়নাগুলি আপনি তাঁর কাছ থেকে কেড়ে রেখে দিয়েছিলেন কেন ?

গয়না! তার গয়নার খবরই আমি রাখি না।

আপনারা দুজন যুবক-যুবতী একসঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকতেন, তবু আপনাদের মধ্যে সেক্স রিলেশন হয়নি এটা কি আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন ?

বলি। কারণ ঘটনাটা সত্যি।

আপনার রান্নাবান্না কে করে ?

আমি নিজেই করি।

সব কিছু করেন ?

আমার কোনও কাজের লোক নেই। নিজেই সব করি।

তরকারি বা মাছ কুটতে পারেন ?

পারি।

তরকারি কী দিয়ে কাটেন ? বঁটি ?

না। ছুরি দিয়ে।

কী রকম ছুরি ?

কিচেন নাইফ।

দেখুন তো, এ রকম ছুরি ?

না না, অত বড় নয়।

এর চেয়ে কতটা ছোট হবে ?

আরও দু ইঞ্চি ছোট।

আপনি কি জানেন মিতালি দেবী ঠিক এরকমই একটা ' চেন নাইফে খুন হয়েছেন ?

জানি।

কীভাবে জানলেন ?

কাগজে পড়েছি। আপনি কী মিন করতে চাইছেন ?

আচ্ছা, মিতালি দেবী কি কখনও আপনাকে বলেছিলেন যে, তিনি অন্য কাউকে ভালবাসেন ?

না তো।

ভাল করে ভেবে দেখুন।

এ রকম কথা বললে আমার মনে থাকত।

বিয়ের সময় আপনার বয়স কত ছিল ?

পঁচিশ-ছাব্বিশ।

আর মিতালি দেবীর ?

আঠারো-উনিশ। তখন ও ডাক্তারি পড়ছিল।

আপনার কি কোনও প্রেমিকা আছে ?

না।

মাত্র তেত্রিশ বছর বয়স, নামমাত্র বিয়ে, তবু কেউ জোটেনি ?

না।

না ? অথচ এর আগে পুলিশের জেরার উত্তরে আপনি বলেছেন যে, আপনার দুজন বান্ধবী আছেন!

বান্ধবী আর প্রেমিকা এক নয়।

তফাতটা কী ?

অনেক তফাত।

তাদের মধ্যে একজনের নাম কি শিখা বরুয়া ?

হ্যাঁ।

আর একজনের নাম মন্দিরা সেন ?

হ্যাঁ।

এদের সঙ্গে আপনার কোনও অ্যাফেয়ার নেই ?

না।

বিশ্বাস করতে বলছেন ?

বলছি।

ঠিক আছে। ডিভোর্সের পরই আপনার স্ত্রী বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। ফর হায়ার স্টাডিজ। কোথায় গিয়েছিলেন আপনি জানেন ?

শুনেছি আমেরিকায়।

আপনি বিদেশে তাঁর ঠিকানা জানতেন ?

ন্‌না।

জানতেন না ? তা হলে তাঁকে যে আপনি গাদা গাদা চিঠি লিখতেন সেগুলো তাঁর কাছে কীভাবে পৌঁছোত ?

আমি তাকে চিঠি লিখতাম না।

হাসালেন মশাই। তাঁর সুটকেসে আপনার একাধিক চিঠি পাওয়া গেছে।

আমি তাকে চিঠি লিখিনি।

কখনও নয় ?

না।

আচ্ছা, আপনার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল ?

প্রথম দিকে ভালই ছিল। মিতালি আমাকে ছেড়ে ওঁর কাছে চলে যাওয়ায় উনি খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। মিটমাটের চেষ্টাও করেছিলেন। তখন আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতেন, দুঃখ প্রকাশ করতেন। মিতালি শেষ অবধি ডিভোর্সের মামলা করায় উনি ভেঙে পড়েন। শুনেছি তখন থেকেই ওঁর হার্টের দোষ দেখা দেয়। তখন থেকেই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ কমে যেতে থাকে।

আপনি কি বরুণ ঘোষকে সে সময়ে থ্রেট করেছিলেন ?
না তো ! থ্রেট করব কেন ?
আপনি কি কুংফু ক্যারাটে জানেন ?
খানিকটা শিখেছিলাম ।
কেন শিখেছিলেন ?
এমনি, শখ করে ।
নাকি মস্তান হওয়ার জন্য !
মস্তান !
অবাক হচ্ছেন ? বাসব হালদার নামে একজন লোককে তার দু'জন বন্ধুসহ আপনি একডালিয়ায় মারধর করেছিলেন। তারা আপনার বিরুদ্ধে পুলিশে ডায়েরি করেছিল। পুলিশ আপনাকে গ্রেফতারও করে। ঠিক কি না ?
হ্যাঁ। বাসব হালদার নিজেই একজন গুণ্ডা। একডালিয়ায় আমার একজন বন্ধু ভাড়া বাড়িতে থাকত। তাকে তুলে দেওয়ার জন্য বাড়িওলা বাসবকে লাগায়। বাসব তাকে প্রায়ই হ্যারাস করত, এমনকী তার বোনকে পর্যন্ত রাস্তায় ঘাটে টিজ করা শুরু করে। তখন বাধ্য হয়ে—
বাসব হালদার গুণ্ডা ছিল, এ কথা আপনিই বলছেন। তা হলে বলুন, গুণ্ডাকে পেটাতে পারে আরও একজন গুণ্ডাই, তাই না ?
আমি গুণ্ডামি করিনি, অন্যায়ের প্রতিকার করেছিলাম মাত্র।
রবিন হুড ? অ্যাঁ ! আপনি নিজেকে হিরো বলে প্রমাণ করতে চাইছেন নাকি ? তা হলে বলি, আপনার বিরুদ্ধে আরও একটা পুলিশ কেস ছিল। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে ন্যাটা দাসকে আপনি মেরে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন। বেচারা মারাও যেতে পারত। এফ আই আর-এ আছে আপনি তাকে গুলিও করেছিলেন।
আমি ! আমি কী করে গুলি করব ? আমার কোনও বন্দুক পিস্তল নেই।
ধীরে, মশাই, ধীরে। গুলি আপনি করেছিলেন ঠিকই, তবে শেষ অবধি সেটা প্রমাণ হয়নি। প্রমাণ হয়নি বলেই ধরে নেবেন না যে আপনি নিরপরাধ। অনেক ক্রাইমই প্রমাণ হয় না। ন্যাটা দাসকে আপনি কেন মেরেছিলেন ?
আমার জ্যাঠামশাই তাকে বিশ্বাস করে কিছু ডলার ভাঙাতে দিয়েছিলেন। টাকাটা সে মেরে দেয়।
কীরকম জ্যাঠামশাই ?
গ্রাম সম্পর্কের। ওঁকে ছেলেবেলা থেকেই চিনি। জাহাজে চাকরি করতেন।
ন্যাটা দাসও কি গুণ্ডা ছিল ?
নিশ্চয়ই। পুলিশের রেকর্ডে তার বিরুদ্ধে অনেক কেস।
আপনি কি তাকে খুন করতে চেয়েছিলেন ?
না। শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম।
খুনের একটা টেন্ডেন্সি আপনার কি বরাবর ছিল ?
না।
তা হলে আপনি আসলে একজন হিরো ? দুঃখের বিষয় এরকম একজন হিরোর মূল্য মিতালি দেবীই টের পেলেন না। যাকগে, বরুণ ঘোষের কথায় আসা যাক। আপনি তাঁকে কীভাবে ব্ল্যাকমেল করতেন বলুন তো !
ব্ল্যাকমেলের প্রশ্নই ওঠে না।
ওঠে। তার আগে জিজ্ঞেস করি, ব্ল্যাকমেল কথাটার অর্থ আপনি জানেন তো ! গুপ্ত কথা ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা বা সুবিধা আদায়। আপনি বরুণ ঘোষের অন্তত একটা গুপ্ত খবর জানতেন।
কী ?

ওঁর বেনামা অ্যাকাউন্ট। রুদ্র সেন, পিনাকী শর্মা আর হরিপদ হাজরা— এই তিনটে ফিকটিশাস নামে ওঁর আরও তিনটে অ্যাকাউন্ট ওই ব্রাঞ্চে ছিল। আপনি কি তা জানতেন না ?

জানতাম।

এটা কি গুপ্ত খবর নয় ?

এটা ম্যালপ্র্যাকটিস। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য কেউ কেউ করে। কিন্তু তেমন মারাত্মক অপরাধ নয় বলে গুরুত্ব না দিলেও চলে।

তা হলে কি বলতে চান, আপনি বরুণ ঘোষ সম্পর্কে আরও গুরুতর কোনও গুপ্ত কথা জানতেন ?

না। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় সামান্য।

আপনি কি জানেন আমরা তাঁর কিছু ডায়েরি পেয়েছি, যাতে তিনি লিখে গেছেন যে, তাঁকে কেউ নিয়মিত ব্ল্যাকমেল করত ?

না। আমার এসব জানার কথা নয়।

যদি বলি ব্ল্যাকমেলার হিসেবে তিনি আপনার কথা ডায়েরিতে লিখে গেছেন ?

হতেই পারে না। তিনি তেমন মিথ্যেবাদী ছিলেন না।

ইউ আর এ কুল কাস্টমার। জানেন তো, বড় ক্রিমিনালরা খুব কুল হেডেড হয় ? যাকগে, ডায়েরি তো কোর্টেই প্রোডিউস করা হবে। বরুণবাবুর কাছ থেকে পণ হিসেবে আপনি কত টাকা নিয়েছিলেন ?

এক পয়সাও নয়।

আচ্ছা, এবার বেশ ভেবে বলুন তো, বিয়ের রাতে মিতালি দেবী ঠিক কী ভাষায় বলেছিলেন যে তিনি আপনাকে পছন্দ করেন না। ভেবে বলুন।

খুব সাধারণভাবে বলেছিল।

বিয়ের রাতে না ফুলশয্যার রাতে ?

ফুলশয্যার রাতে।

কী বলেছিলেন ?

বলেছিল, আমি এ বিয়ে মানি না।

বেশ রাগ করে বলেছিলেন কি ?

খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল।

তখন আপনার কীরকম রি-অ্যাকশন হয়েছিল ? আপনি কি ইনসাল্টেড ফিল করেছিলেন ?

হ্যাঁ।

আর তাই আপনার ভিতর জিঘাংসা জেগে উঠেছিল ?

ও কথা কেন বলছেন ?

কারণ তারপরই আপনি তাকে অ্যাটাক করেন এবং রেপ করেন। আপনি কি জানেন যে স্ত্রীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে জোর করে মিলিত হলে সেটা রেপ-এর পর্যায়ে পড়ে। যদিও এদেশে সেটা বে-আইনি নয়।

তখন জানতাম না, কিন্তু এখন জানি। কিন্তু আমি সেই অপরাধটা করিনি।

আপনার ভিতরে অপরাধপ্রবণতা আছে, আপনি কুংফু ক্যারাটে জানেন, আপনার ইগো প্রবল। এসব কন্ডিশনগুলো আপনার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। মিতালি দেবী তাঁর এক বন্ধুকে ঘটনাটা পরদিনই জানিয়েছিলেন।

তা হলে মিতালি বা তার বন্ধু কেউ একজন মিথ্যে কথা বলেছে।

বরুণ ঘোষ কবে মারা গেছেন আপনি জানেন ?

মাসখানেক আগে।

কীভাবে জানলেন ? বরুণ ঘোষের খবর কি কাগজে বেরিয়েছিল ?

লোকের মুখে শুনেছি।

সেই লোক কে, মনে আছে ?
ভাবলে মনে পড়বে হয়তো।
এগজ্যাক্ট ডেটটা জানেন ?
মনে নেই। তবে নভেম্বরের মাঝামাঝি বোধহয়।
কীভাবে মারা যান ?
থ্রম্বসিস বোধহয়। ওরকমই শুনেছিলাম।
আপনার সঙ্গে তাঁর শেষ কবে দেখা হয়েছিল ?
মনে নেই, বোধহয় উনি আমেরিকা যাওয়ার আগে।
আমার নাম শবর দাশগুপ্ত। খুবই বিচ্ছিরি নাম। তবে মা-বাবা নামটা শখ করে রেখেছিলেন, কী আর করা যাবে বলুন।
ঠিকই তো।
এমনকী নামটার অর্থও আমি ভাল করে জানি না। বাংলায় আমার বিদ্যের দৌড় খুবই কম। তবে যতদূর জানি শবর মানে ব্যাধ। তাই কি ?
বোধহয়।
হাঃ হাঃ। একদিক দিয়ে আমার নামটা খুবই সার্থক। ব্যাধ মানে শিকারি তো ? আমিও একজন ভাল শিকারি। আমার শিকার অবশ্য ক্রিমিনালরা। আই ক্যান অলওয়েজ স্মেল এ রট্ন্ র‍্যাট। হাঃ হাঃ।
আপনার কথা কি শেষ হয়েছে ?
আরে না। গলা শুকিয়ে গিয়ে থাকলে আপনি একটু ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিন বরং। আচ্ছা, মিতালি দেবী কবে খুন হন সে তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন।
হ্যাঁ, গত শনিবার।
শনিবার মিতালি ঘোষ একটা পার্টি দিয়েছিলেন। জানেন ?
জানি।
জানবেনই তো। আপনি তো সেই পার্টির একজন ইনভাইটিও ছিলেন।
না।
ছিলেন না ? যাকগে, তবে আপনি সেই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন তো ?
আমি পার্টি জেনে যাইনি।
এমনিই গিয়েছিলেন ?
হ্যাঁ।
কার্টসি ভিজিট ?
না। মিতালির সঙ্গে আমার দেখা করার দরকার ছিল।
সে তো বটেই। তাকে আপনি খুন করতে গিয়েছিলেন।
মিতালিকে খুন করে আমার কী লাভ ?
মোটিভের কথা বলছেন ? মোটিভ সবসময়ে তো আর মেটেরিয়ালিস্টিক হয় না। পুরনো অপমান, আহত অহং, সূক্ষ্ম জেলাসি, পরশ্রীকাতরতা, হেল্পলেস লাভ, হোপলেস রিলেশন—কত কারণ থাকতে পারে। আপনিই বলুন না আপনার মোটিভ কী ছিল।
আমি খুনটা করিনি মিস্টার দাশগুপ্ত।
সে কথা থাক। বলুন, পার্টিটা কোথায় হচ্ছিল।
নীচের তলায়। হলঘরে।
চমৎকার সিচুয়েশন, তাই না। নীচের তলায় পার্টি চলছিল, গোলেমালে আপনি ওপরে উঠে গিয়ে ঘাপটি মেরে মিতালি দেবীর শোয়ার ঘরে লুকিয়ে রইলেন। তারপর পার্টি শেষ করে একটু ড্রাংক এবং হাই অবস্থায় মিতালি দেবী যখন ওপরে উঠে এলেন, তখন—না মশাই, এ রকম গোল্ডেন সিচুয়েশন ভাবা যায় না।

কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমার সঙ্গে নীচের তলায় কয়েকজনের দেখা হয়েছিল। তারা আমার চেনা। পার্টি হচ্ছে দেখে আমি যে ফিরে আসি তা তারা জানে।

হ্যাঁ। আমরা তাদের স্টেটমেন্ট পেয়েছি। কিন্তু কথাটা হল, স্পট অব ক্রাইমে আপনাকে দেখা গিয়েছিল। ইউ ওয়্যার দেয়ার। তাই না?

তা তো বটেই।

মিতালি দেবীর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল?

হয়েছিল।

মানে মার্ডারের সময়ে তো? আহা মশাই, ঝেড়েই কাশুন না।

মিতালিকে আমি খুন করিনি।

করেছেন, করেছেন। যাকগে, সব তথ্যই বেরিয়ে আসবে।

॥ দুই ॥

পাপী! পাপী! ঘোর পাপী! বিড়বিড় করতে করতে চোখ মেলল সে। চোখ মেলে যা দেখল তাতে শিউরে উঠে ফের চোখ বন্ধ করে ফেলল। নরক! নরক!

টেবিলের ওপর গত রাতের ভুক্তাবশেষ মাংসের হাড়, রুটির টুকরো, এঁটো প্লেট, একটা খালি আর একটা অর্ধেক খালি ব্ল্যাক নাইটের বোতল। মেঝের ওপর খানিকটা বমিও কি? নরক! নরক!

বিছানাটা মস্ত বড়। ও পাশে যে শুয়ে আছে তার দিকে তাকাতে ইচ্ছে হল না সমীরণের। জুলেখা শর্মাদের কখনওই সকালের দিকে অবলোকন করা উচিত নয়। সকালটা কখনওই নয় নষ্ট মেয়েছেলেদের জন্য। কাতর একটা অর্থহীন শব্দ করে নিজের ভারী মাথাটা তুলবার চেষ্টা করল সমীরণ। প্রতিদিন সকালে এটাই তার প্রথম ব্যায়াম—নিজেকে তোলা।

এত পাপ ভগবান সইছেন কী করে? এতদিনে তাঁর বজ্র নেমে আসার কথা! তবে কি তিনি আদতে নেই? নাকি পৃথিবীতে পাপীর সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, তাঁর তত বজ্রের স্টক নেই?

বালিশের পাশে কর্ডলেস টেলিফোনটা পড়ে আছে। লো ব্যাটারির ইন্ডিকেটর জ্বলে আছে। দু'দিন বোধহয় চার্জ দেওয়া হয়নি। কত কী বকেয়া পড়ে আছে তার। এই যে জুলেখা, এ হল পরিবর্ত ব্যবস্থা, স্টপ গ্যাপ। তার একজন স্থায়ী মেয়েমানুষ আছে। ক্ষণিকা। না, বউ নয়। ক্ষণিকা দু'বার বিয়ে করেছিল। দু'বার ডিভোর্সের পর তৃতীয়বার আর বিয়ের মতো ভুল করেনি। সমীরণের সঙ্গে তার শর্ত ছিল, আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার। কেউ কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না। এবং সমীরণকে ভাল করে বুঝতে হবে যে, ক্ষণিকা যেমন তার বউ নয়, তেমনি নয় রান্নার লোক বা ঝি। কেউ কারও বন্ধু বা বান্ধবী নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না। হ্যাঁ, আর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কেউ কারও ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে না। তুমুল নারীবাদী ক্ষণিকা গত দু বছর ধরে তার লিভ ইন গার্ল ফ্রেন্ড। এই দুটো বছর এই ফ্ল্যাটের ভিতরে বিস্তর মেজাজের বিস্ফোরণ, ইগোর সঙ্গে ইগোর যুদ্ধ ও শান্তিস্থাপন, ভালবাসা ও ঘৃণা এবং লাভ হেট রিলেশন ও উদাসীনতা—এই সব কিছুই ঘটে গেছে। সে এক ভদ্রমহিলার চেহারা ও স্মার্টনেসের একটু বাড়াবাড়ি প্রশংসা করে ফেলায় ক্ষণিকা—ঘোরতর নারীবাদী ক্ষণিকা—কে বিশ্বাস করবে যে, রাগ করে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে আছে গত পনেরো দিন! মুক্ত নারীকে কি মানায় এই ঈর্ষা? কিন্তু তর্ক করবে কার সঙ্গে সমীরণ? তর্কে বহু দূর। এখন গিয়ে ক্ষণিকার কাছে তার ক্ষমা চাওয়া ও সেধে ফেরত আনার বকেয়া কাজটাও পড়ে আছে। জুলেখা অন্তর্বর্তীকালীন বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু জুলেখার কথা জানতে পারলে কপালে সমীরণের আরও কষ্ট আছে।

সে পাপী—এই সার সত্য সে জানে। পঞ্চ ম কারের কোনওটাই তার বাকি নেই। কিন্তু পাঁচটা ম-এর মধ্যে সে মেয়েমানুষ আর মদের কথা জানে। বাকি তিনটে ম কী কী? সে অন্তত জানে না।

সমীরণ নিজেকে দাঁড় করাল। এক হাতে একটা বালিশ, অন্য হাতে কর্ডলেস টেলিফোন।

জিভটা এত শুকনো যে, মুখে যেন কেউ একটা পাপোশ ঢুকিয়ে দিয়েছে। বালিশটা ফের বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে সে গিয়ে টেলিফোনটা চার্জে বসাল। এ কাজটা জরুরি। কল আসতে পারে।

এই রকম বিচ্ছিরি সকালে বাথরুমটা তার কাছে মরূদ্যানের মতো লাগে। জলের আর এক নাম জীবন না ? বেসিনের কল থেকে হাতের কোষে জল নিয়ে সে কয়েক ঢোঁক খেল। তারপর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সে তাকাল আয়নায়, নিজের দিকে।

পাপী ! পাপী ! এত পাপ কি তোর সইবে রে ? আকণ্ঠ ডুবে আছিস পাপে !

শাওয়ার খুলে দিল সমীরণ। কলকাতার শীত তীব্র নয় ঠিকই, কিন্তু তবু তো শীতকাল ! ঠাণ্ডা জলের শতধারার সূচিভেদ্য আক্রমণে প্রথমটায় শিউরে শিউরে উঠল সে। তারপর ভাল লাগতে লাগল। আঃ ! কী আরাম।

জলে পাপ ধুয়ে যায় না, সে জানে। তবু জল যেন তার গা থেকে বাসি, পচা, দুর্গন্ধযুক্ত একটা আস্তরণকে অপসারিত করছিল। স্নান করতে করতেই সে হাতঘড়িটা দেখল, যেটা প্রায় সহজাত কবচ কুণ্ডলের মতো প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই পরে থাকে সে। আটটা দশ ! অবিশ্বাস্য ! অবিশ্বাস্য ! কী করে এটা হয় তা আজও বুঝতে পারেনি সমীরণ। প্রতিদিন সকালে ঠিক একই সময়ে কেন ঘুম ভাঙে তার ? কেন প্রতিদিন সকালে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পায়, ঘড়িতে আটটা দশ ? অলৌকিক ছাড়া একে আর কী বলা যায় ?

স্নান করতে করতেই সে দাঁত ব্রাশ করল। তারপর শাওয়ার খোলা রেখেই বসল কমোডে। জল পড়ে যেতে লাগল বিনা কারণে। কিন্তু এ সময়ে এই জলের শব্দটা তাকে উদ্বুদ্ধ ও তৎপর করে। বয়ে যাচ্ছে জল, বয়ে যাচ্ছে আয়ু, বয়ে যাচ্ছে মহার্ঘ সময়। জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে যায়... নাই নাই নাই যে সময়...সাড়ে নটায় তার অফিস...

কমোড থেকে উঠে সে ফের শাওয়ারের নীচে দাঁড়াল এবং দাড়ি কামিয়ে নিল। অনেকদিন আগে নন্দিতা বলেছিল, আপনার মুখে এক জোড়া গোঁফ রাখলে ভাল হত। এক একটা মুখ আছে, গোঁফ না থাকলে মানায় না।

তা হবে। কিন্তু গোঁফের অনেক ল্যাঠা। কেয়ারি করতে হয়, ছাঁটতে হয়, দু দিক সমান করতে হয়। তার সময় কোথায় ? আজও তাই গোঁফ রাখা হয়নি তার। কোথায় ভেসে গেছে নন্দিতা। গোঁফ ছাড়াও তার তো দিব্যি চলে গেল এতগুলো বছর !

কত বছর ? সে কি চল্লিশের কাছাকাছি ? না, সে বয়স নিয়ে মোটে ভাববে না, ভাবতে চায় না। বয়স মানেই একটা ভয়। একটা জ্বালা। একটা উদ্বেগ।

যখন সে বাথরুম থেকে বেরোল তখনও বিছানার দিকে তাকানোর ইচ্ছে হল না তার। লণ্ডভণ্ড বিছানার একপ্রান্তে এখনও জুলেখা শুয়ে। থাকগে। ঘুম ভাঙলে আপনি চলে যাবে। এগারোটায় ওর স্কুল।

স্নান করে আসার পর নিজের শোয়ার ঘরের দুর্গন্ধ ও নারকীয় পরিবেশ তাকে যেন আরও তাড়া দিচ্ছিল বেরিয়ে পড়ার জন্য। ঘরের বাইরেও একটা নোংরা, গান্ধা শহর। তবু আলো আর হাওয়ার প্রবহমানতা আছে।

নরক ! নরক ! বলতে বলতে সে পোশাক পরল। চায়ের জল গরম করে টি ব্যাগ ডোবাল। বাইরের ঘরটা এখনও তত সংক্রামিত নয়। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। তবে ফ্লাওয়ার ভাসে বাসি ফুল তার সহ্য হয় না। গত পনেরো দিন ধরে বা তারও বেশি এক গোছা হরেকরকম ফুল পচছে, শুকোচ্ছে, নেতিয়ে পড়ছে। কেউ ফেলার নেই। ফুলগুলোর দিকে অনিচ্ছের চোখে চেয়ে সে চা খেল।

পাপ কখনও গোপন থাকে না। ফুটে বেরোবেই। আর সেই কারণেই সমীরণ কখনও কিছু লুকোছাপা করে না। তার জীবন হল খোলা বই। এই যে শোয়ার ঘরে জুলেখা শুয়ে আছে, একটু বাদেই ঠিকে ঝি নবর মা এসে ওকে দেখবে। গত দশ বারো দিন ধরে দেখছেও। এখন যদি হুট করে ক্ষণিকা চলে আসে, তা হলে সে-ও দেখবে। না দেখলেও ক্ষণিকা জানতে পারবে ঠিকই, তারপর অনেক অশান্তি হবে। সব জানে সমীরণ, তবু কিছুই লুকোয় না।

হাই !

সমীরণ একটু চমকে গিয়েছিল। হাতের কাপ থেকে চলকে একটু চা পড়ল হাঁটুতে। ছ্যাঁক।

হাই! ঘুম ভাঙল?

ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে মস্ত একটা হাই তুলল জুলেখা। ছোটখাটো শ্যামলা, ছিপছিপে মেয়েটি চোখে পড়ার মতো নয়। তবে চলাফেরায় একটা বেড়ালের মতো চকিত তৎপরতা আছে। একটা ফিরিঙ্গি স্কুলে ও ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর। ইউ পির মেয়ে, কলকাতায় জন্ম-কর্ম। আর বিশেষ কিছুই জানা নেই সমীরণের। জানার অনেক ল্যাঠা।

জুলেখা আর একটা হাই তুলে বলল, ইটস বোরিং।

হোয়াট ইজ বোরিং?

এভরিথিং।

সমীরণ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, ঠিক কথা। জীবনটাই ভারী একঘেয়ে। নাথিং হ্যাপেনস। সোমবার ঠিক মঙ্গলবারের মতো, মঙ্গলবার ঠিক বুধবারের মতো, অ্যান্ড সো অন।

চা খাব।

খাও। জল গরম করা আছে।

তোমার ফোন বাজছে। ধরো।

জ্বালালে।

চলে গিয়ে ফোনটা ধরল সমীরণ। কানে লাগিয়ে হ্যালো বলেই চমকে উঠে কান থেকে ফোনটাকে একটু তফাতে ধরল সে। তার বাবা মধু বাগচী যাত্রা দলে ঢুকলে নাম করতে পারতেন। গলার রেঞ্জ সাংঘাতিক। রেগে গেলে আরও মারাত্মক। এখন সেই মারাত্মক মাত্রায় গলাটা তাকে ধমকাচ্ছে, কী ভেবেছ তুমি। সারারাত ফুর্তি করে সকালে হ্যাংওভার নিয়ে পড়ে থাকলেই হবে? তোমাকে কতবার বলেছি, আজ শুক্রবার অফিসের আগে মিস্টার ভার্মার বাড়ি থেকে একটা জরুরি ফাইল নিয়ে আসবে! উনি অপেক্ষা করছেন। আর একটু বাদেই উনি একটা ফ্লাইট ধরতে বেরিয়ে যাবেন!

যাচ্ছি বাবা, এখনই যাচ্ছি।

রিচ হিম উইদিন ফিফটিন মিনিটস। ফিফটিন! হার্ড মি?

ইয়েস। ফিফটিন।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই ডোরবেল বাজল। এ সময়ে বাজবার কথা নয়। এ বাড়িতে খবরের কাগজ বা গয়লা আসে না। নবর মা আসে এগারোটার পর। সে ডোরবেল বাজায় না, তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। সাধাসাধি না করলে ক্ষণিকা নিজে থেকে ফিরে আসার মেয়ে নয়।

একটু চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন সমীরণ গিয়ে দরজাটার দিকে হাত বাড়িয়ে জুলেখাকে বলল, টু বি অন দি সেফ সাইড, তুমি বরং শোয়ার ঘরে যাও।

যাচ্ছি। বলে জুলেখা একটা হাই তুলল। তারপর সে বেশ ধীরে সুস্থে শোয়ার ঘরে চলে গেল।

দরজা খুলে সমীরণ যাকে দেখল সে বেশ ছোটখাটো মানুষ। গোঁফ আছে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। চেহারা রোগা। পরনে কালো ট্রাউজার্স আর একটা কট্‌স্‌উলের সবুজ চেকওলা হাওয়াই শার্ট, বিনা হাস্যে বলল, আসতে পারি?

সমীরণ দরজা না ছেড়ে বলল, কী চাই?

আপনাকেই।

কী দরকার?

লোকটা বুক পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে দেখিয়েই পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, তদন্ত। ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট।

সমীরণ একটু ক্যাবলা হয়ে গিয়ে বলল, তদন্ত মানে সেই ইয়ের কেসটা কি? একবার তো এনকোয়ারি হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, সেই ইয়ের কেসটাই। এনকোয়ারি বার বার হবে। এবারেরটা গুরুতর। পরশু দিনও এসেছিলাম। আপনি বেশ সকালেই অফিসে বেরোন দেখছি।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তবে পরশু অবশ্য আপনার কাজের মেয়েটির সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছে। রিগার্ডিং ইউ। আমি ভিতরে এলে কি আপনার অসুবিধে হবে ? ভিতরে গার্ল ফ্রেন্ড-ট্রেন্ড কেউ আছে নাকি মশাই ?

না না। আসুন।

থাকলেও আমি মাইন্ড করব না। তাকেও হয়তো প্রয়োজন হবে। মার্ডার কেস যে কোথা থেকে কোথায় গড়ায় !

সমীরণ লোকটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বলল, বসুন। কিন্তু আমি একটা জরুরি কাজে বেরোচ্ছিলাম।

আমার কাজটা কি কম জরুরি ? এখন যদি আপনি কাজ দেখান তা হলে আপনাকে আমার অফিসিয়ালি থানায় টেনে নিয়ে যেতে হবে।

আতঙ্কিত সমীরণ বলল, প্লিজ। তা হলে আমি বাবাকে একটা টেলিফোন করে নিই ? উনিই আমার বস।

জানি। কর্ডলেস টেলিফোনটা এই ঘরে নিয়ে এসে কথা বলুন। আর গার্ল ফ্রেন্ডটিও এখানে স্বচ্ছন্দে এসে বসতে পারেন।

সমীরণ টেলিফোনটা নিয়ে এল। খানিকটা চার্জ নিয়েছে। চলবে। সে লাইনটা অন করে ডায়ালের বোতাম টিপতে টিপতে বলল, জুলেখা টয়লেটে গেছে। এসে যাবে।

বেফাঁস বলা। টেলিফোনে তার বাবার গলা হঠাৎ ফেটে পড়ল, জুলেখা টয়লেটে গেছে ? হোয়াট ডু ইউ মিন ? কে জুলেখা ? আর তার টয়লেটে যাওয়ার খবর তুমি এই সাতসকালে আমাকে শোনাচ্ছ কেন ?

আপনাকে নয়।

আমি জানতে চাই তুমি এখনও বেরিয়ে পড়োনি কেন ? তোমাকে বলেছিলাম কি না ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে ভার্মাকে রিচ করতে হবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কী সমস্যা ? জুলেখা কে ? তার টয়লেটে যাওয়াটাই তোমার সমস্যা নাকি ?

না বাবা। আই অ্যাম আন্ডার অ্যারেস্ট।

অ্যারেস্ট ! বলে বাবা এমন চেঁচাল যে, মানুষ অত জোরে সচরাচর চেঁচাতে পারলে টেলিফোন যন্ত্রটারই দরকার হত না।

অ্যারেস্ট ! আমি ঠিক শুনেছি তো !

ঠিকই শুনেছেন। তবু আমি ভেরিফাই করে নিচ্ছি। বলে মাউথপিসটায় হাত চাপা দিয়ে সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, অ্যাম আই আন্ডার অ্যারেস্ট ?

না না। বরং ইউ আর আন্ডার স্ক্রুটিনি।

মাউথপিসটা থেকে হাত সরিয়ে সমীরণ বলল, ইনি বলছেন, ঠিক অ্যারেস্ট নয়, আই অ্যাম আন্ডার স্ক্রুটিনি। ব্যাপারটা কী তা আমি জানি না।

কেন, তোমাকে স্ক্রুটিনিই বা করা হচ্ছে কেন ? তুমি কী করেছ !

মনে হচ্ছে সেই ইয়ের কেসটা—

কোন কেসটা ? কীসের কেস ?

একটা মার্ডার কেস।

মাই গড ! মার্ডার কেস ! মার্ডার কেস ! ঠিক শুনছি ?

ঠিকই শুনেছেন। ইনি বোধহয় আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন। ভার্মার ফাইলটা তাই আমার পক্ষে আনা সম্ভব হচ্ছে না।

হ্যাং ভার্মা। পুলিশ অফিসারকে ফোনটা দে, আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

লোকটাকে কিছু বলতে হল না, নিজেই হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিয়ে তার বাবাকে বলল, ঘাবড়াবেন না, আপনার ছেলেকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি।

বাবার গলা টেলিফোন থেকে দু'হাত দূরে দাঁড়িয়েও শুনতে পেল সমীরণ। বাবা বলল, কার মার্ডার? কীসের মার্ডার?

মিতালি ঘোষ নামে একটি মেয়ের।

তার সঙ্গে আমার ছেলের কী সম্পর্ক?

সম্পর্কটা গোলমেলে। তবে ক্রমশ সব জানা যাবে।

আমার যে প্যালপিটিশন হচ্ছে।

একটা সর্বিট্রেট খেয়ে নিন।

শুনুন অফিসার, আমার এই সেজো ছেলেটা অত্যন্ত ইররেগুলার। বোধহয় লম্পটও এবং একটি মিটমিটে বদমাশ।

আজকাল কে নয়? দি ইয়ং জেনারেশন ইজ টোটালি স্পয়েল্ট। তার জন্য আপনারা অর্থাৎ পেরেন্টসরাই বেশি রেসপনসিবল।

ও.কে., ও.কে.। কিন্তু আমার কথাটা শেষ হয়নি। আমি বলছিলাম কী, হি হ্যাজ হিজ ভাইসেস। কিন্তু হি ইজ কমপ্লিটলি ইনক্যাপেবল টু কমিট মার্ডার, হি ইজ নট ব্রট আপ দ্যাট ওয়ে।

হু নোজ? তবে আমাদের প্রাইম সাসপেক্ট উনি এখনও নন। ওঁর কাজটা আজ আপনি চালিয়ে নিন।

কিন্তু আপনাদের প্রশ্নোত্তরগুলো যে আমার জানা দরকার। আই অ্যাম ওরিড।

উপায় কী বলুন। ইন্টেরোগেশনের রানিং কমেন্টারি তো আপনাকে শোনানো যাবে না।

আমি কি আসব?

না। আপাতত ওকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না। আপনি পরে ওঁর কাছ থেকে শুনে নেবেন। ছাড়ছি।

আচ্ছা, আচ্ছা।

ফোনটা অফ করে লোকটা সমীরণের হাতে সেটা দিয়ে বলল, হ্যাপলেস পেরেন্টস। যান, ওটা চার্জে বসিয়ে আসুন।

পাপ! পাপ! পাপ ছাড়া কি তার জীবনে কিছু নেই? তার জীবন পঞ্চ ম-কারে আকীর্ণ। কিন্তু মার্ডার ম দিয়ে শুরু হলেও বোধহয় পঞ্চ ম-কারের মধ্যে পড়ে না।

ভিতরের ঘরে এসে কর্ডলেসটা চার্জে বসিয়ে সে কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে ধ্যানস্থ হওয়ার চেষ্টা করল। সকালবেলায় তার মাথা এমনিতেই ভাল কাজ করে না। তার ওপর এই সব উল্টোপাল্টা ঘটনায় সে বিভ্রান্ত। এখন দরকার মেডিটেশন। আজকাল স্ট্রেস কাটানোর জন্য অনেকেই মেডিটেশন ধরেছে। ব্যাপারটা কেমন তা অবশ্য সে ভাল করে জানে না। যোগ ব্যায়াম, ধ্যান ইত্যাদির কথা সে খুব শুনতে পায় আজকাল। খানিকক্ষণ চোখ বুজে সে নিজেকে জড়ো করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল মাত্র। তারপর গিয়ে বাথরুমের দরজায় টোকা দিয়ে চাপা জরুরি গলায় ডাকল, জুলেখা! জুলেখা!

ভিতরে শাওয়ার চলছে। জুলেখা শুনতে পেল না।

টেবিল থেকে চাবিটা তুলে এনে সেইটে দিয়ে দরজায় নক করল সে।

শাওয়ার বন্ধ হল, জুলেখা বলল, কে?

আমি। একটু তাড়াতাড়ি করো।

কেন? উইল ইউ গো টু দি পি? আর একটা বাথরুম তো রয়েছে।

নো, আই ওন্ট গো টু দি পি। বাট দেয়ার ইজ অ্যানাদার পি হিয়ার। পুলিশ।

পুলিশ? যাঃ, তুমি ইয়ার্কি করছ।

মাইরি না।

পুলিশ কী চায়?

ইন্টেরোগেট করতে এসেছে।
আমাকে ? আমাকে কেন ?
তোমাকেও। আমার সম্পর্কে হয়তো জানতে চাইবে।
ডোন্ট ওরি। আই শ্যাল পেইন্ট ইউ ইন পিংক।
ইয়ার্কি নয়। সিরিয়াস ব্যাপার। আই মে বি আন্ডার অ্যারেস্ট।
কেন, তুমি কী করেছ ?
পাপ ! বিস্তর পাপ করেছি। কিন্তু পুলিশ যে পাপটার কথা বলছে সেটা আমি করিনি।
ভেবো না। আমি পুলিশের মেয়ে, পুলিশের নাতনি। আই ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন এ পুলিশ কোয়ার্টার। পুলিশের কোলে চড়েই বড় হয়েছি।
চমৎকৃত হয়ে সমীরণ বলল, এসব আগে বলতে হয়। আই অ্যাম ইমপ্রেসড, ইউ আর অ্যান অ্যাসেট।
পুলিশ কেন এসেছে বলো তো ! হ্যাভ ইউ কমিটেড এনি ক্রাইম ?
আমার এক বান্ধবী সম্প্রতি খুন হয়েছে।
বান্ধবী ?
ইট ওয়াজ অল ইন দি নিউজপেপারস। মিতালি ঘোষ।
আমি খবরের কাগজ পড়িই না। ঠিক আছে, তুমি গিয়ে কথা বলো। আমি আসছি।
এই শীতেও কি একটু ঘাম হচ্ছে তার ? কে জানে কেন, ছোটখাটো, আনইমপ্রেসিভ চেহারার পুলিশ অফিসারটির সামনে তার কিছু অস্বস্তি হচ্ছে। সে ঘরে ঢুকতেই অফিসারটি কান থেকে একটা ছোট্ট যন্ত্র খুলে তার গুটিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, ওয়েল ডান।
তার মানে ?
আমি এতক্ষণ আপনাদের ডায়ালগ শুনছিলাম।
কীভাবে শুনছিলেন ? এনি ইলেকট্রোনিক ডিভাইস ? আজকাল যে কত কিম্ভূত যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে, একটুও শান্তি বা সেকলুশন থাকছে না।
এটা একটা ইমপ্রোভাইজড হিয়ারিং এইড। খুব সফিস্টিকেটেড কিছু নয়, তবু ভাল কাজ দেয়। বসুন।
সমীরণ বসল।
মিতালি দেবী কি আপনার বাল্যবান্ধবী ?
আমরা স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম।
তিনি কেমন মেয়ে ছিলেন ?
ব্রাইট। মেরিটোরিয়াস।
সেটা আমরা জানি। আদার সাইডস ?
খুব মিশুকে ছিল। একটু রোমান্টিক।
ডাক্তারি পড়ার সময়ে ওঁর বিয়ে হয়ে যায়, তাই না ?
হ্যাঁ হ্যাঁ।
এত আরলি এজে বিয়ে হয়েছিল কেন, জানেন ?
সমীরণ একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল, ওর মা নেই। বাবা আর ও। বোধহয় ওর বাবা ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন। সেইজন্যই—
ওঁর বাবা বরুণ ঘোষের ক্যানসার হয়েছিল বলে ডাক্তার একটা ভুল ডায়াগনসিস করে। ঘটনাটা আপনি জানেন ?
না। আসলে স্কুলের পর আর আমাদের বিশেষ মেলামেশা ছিল না। টেলিফোনে কথা হত। বিয়ের নেমন্তন্নেও গিয়েছিলাম।
এত আরলি এজে কেন বিয়ে হচ্ছে তা জানতে চাননি ?
হ্যাঁ। কিন্তু ও ভেঙে কিছু বলেনি।

বিয়েতে কি ওঁর আপত্তি ছিল ?
ছিল। বলেছিল বাবা ওকে প্রেশার দিয়ে বিয়ে দিচ্ছে।
প্রেশারের কারণ কি সাসপেক্টেড ক্যানসার ?
আমি ঠিক জানি না। হতে পারে।
আপনি হয়তো আরও কিছু জানেন। বলতে চাইছেন না।
না, ঠিক তা নয়।
মিতালি দেবীর হাজব্যান্ড মিঠু মিত্রকে আপনি চেনেন ?
চিনি।
কীভাবে চেনেন ?
ওদের বিয়ের সময়ে পরিচয় হয়েছিল। পরে বন্ধুত্বের মতোই হয়েছিল।
কিন্তু বিয়ে তো ভেঙে যায়। এক মাস পরই মিতালি দেবী চলে আসেন।
হ্যাঁ। কিন্তু মিঠুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তাতে কেটে যায়নি।
সম্পর্কটা কীরকমভাবে হল ?
ঘটনাটা ইন্টারেস্টিং। বলব ? আপনার কি অত সময় আছে ?
আছে। বলুন।
বউবাজারে আমাদের একটা জুয়েলারির দোকান আছে। তখন আমরা দুই ভাই ওখানে বসতাম। একবার দোকানে একটা ডাকাতি হয়। ডাকাতির পর বাবা ডিসিশন নেন আমাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস দরকার এবং মার্শাল আর্টও রপ্ত করা প্রয়োজন। আমি জীবনে ব্যায়াম ট্যায়াম কখনও করিনি।
সেটা আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়।
যায় ?
যায়। তবে আপনি তো হ্যাপি লাইফ কাটান। হ্যাপিনেসের হ্যাপা হল হেলথ হ্যাজার্ডস।
বাঃ, আপনি বেশ অ্যালিটেরেশন করতে পারেন।
তারপর বলুন।
হ্যাঁ। মিতালির বর যে একজন মার্শাল আর্টিস্ট তা আমার জানা ছিল। মিঠুর কাছে আমরা দুই ভাই ওসব শিখতে যেতাম। সেই থেকেই বেশ ভাব হয়ে যায়।
মিঠু মিত্র কেমন লোক ?
ভাল। খুব ভাল।
তা হলে আপনার বান্ধবী মিতালি তাকে পছন্দ করেননি কেন ?
কে কাকে পছন্দ করবে বলা মুশকিল।
আমি জানতে চাই মিঠু মিত্রকে অপছন্দ করার বিশেষ কোনও কারণ মিতালি দেবীর ছিল কি না।
আমি জানি না।
ঠিক আছে। অন্তত এটা তো জানেন, বিয়ের আগে মিতালি দেবী আর কোনও ছেলেকে পছন্দ করতেন কি না।
আপনি কি পাণ্টুর কথা জানতে চাইছেন। দেখুন, ও কেসটা স্যাড। মিতালি একটা মারাত্মক ভুল করেছিল। ভুল বুঝতে পেরে সে ফিরেও আসে।
একটু ডিটেলসে বলবেন কি ?
ব্যাপারটা হল, মিতালি একটু রোমান্টিক টাইপের। পাণ্টু ছিল ওর পাড়ার মস্তান। এ ব্যাড টাইপ। কিন্তু বেশ রোখা-চোখা, সাহসী। মিতালি ইনভলভড হয়ে গিয়েছিল। ওর বাবা ভয়ঙ্কর রেগে যাবেন বলে মিতালি ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে যায়। বিগ ব্লান্ডার। ছেলেটার রোজগারপাতি ছিল না, যোগ্যতাও নয়। মিতালি ছ'মাস বাদে বাবার কাছে ফিরে আসে। এ রেক অফ এ গার্ল। মেয়ে চলে যাওয়ার পর ওর বাবা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। শরীরও ভেঙে যায়। মিতালি ফিরে এলেও ওর বাবা সেই শকটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু আমি মনে করি, এ রকম ভুল

যে কেউ করতেই পারে। অল ইন দি লাইফস গেম।

ঘটনাটা কি মিঠু মিত্র জানতেন ?

বোধহয়, মিতালির বাবাই হয়তো ওকে বলেছিলেন।

আপনি সিওর নন ?

আমি প্রসঙ্গটা কখনও তুলিনি। মনেও হয়নি।

পান্টু এখন কোথায় ?

জানি না। ওকে আমি এক আধবার দেখেছি।

বিয়েটা যে ভেঙে গেল তা পান্টুর ব্যাপারটার জন্য নয় তো !

আরে না। মিতালি তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। পান্টুকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল মন থেকে।

ওদের কোনও ইস্যু হয়েছিল কি ? মানে পান্টু আর মিতালির ?

না না।

মিঠু মিত্র পান্টুর কথা জেনে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল—এমন কি হতে পারে ?

না, কখনওই নয়। বিয়েটা ভেঙেছিল মিতালিই।

ঠিক জানেন ?

হান্ড্রেড পার্সেন্ট।

এবার বলুন, পার্টির দিন আপনি কোথায় ছিলেন।

পার্টিতেই ছিলাম। আই ওয়াজ অ্যান ইনভাইটি।

পার্টিতে কী হয়েছিল ?

মিতালি অনেককে নেমন্তন্ন করেছিল।

অকেশনটা কী ?

গেট টুগেদার।

কীরকম পার্টি ?

ককটেল ডিনার।

মিঠু মিত্রকে কি নেমন্তন্ন করা হয়েছিল ?

মাই গড ! না।

তবু মিঠু মিত্র সেইদিন মিতালি দেবীর বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাই না ?

হ্যাঁ। আমার সঙ্গে তার দেখা হয়।

কখন এবং ঠিক কোথায় ?

আমি তখন গাড়ি থেকে নামছি। দেখি মিঠু কম্পাউন্ডের ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। মিঠুর প্রেস্টিজবোধ প্রবল।

তিনি কেন এসেছিলেন সে-বিষয়ে কিছু বলেছিলেন আপনাকে ?

না। হি ইজ এ রিজার্ভড ম্যান। আগ বাড়িয়ে বলে না।

আপনাদের মধ্যে কি কিছু কথাবার্তা হয়েছিল ?

সামান্য। মিঠু খুব অন্যমনস্ক ছিল। আমি বললাম, কী খবর ? ও বলল, ভাল।

উনি কি গাড়িতে এসেছিলেন ?

না। মিঠুর একটা বুলেট মোটরবাইক আছে। সেইটেতে চড়ে চলে গেল। খুব স্পিড দিয়েছিল মনে আছে ?

আপনি কি মিতালি দেবীকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন ?

করেছিলাম।

তিনি কী বললেন ?

ওকে খুব ডিস্টার্বড দেখলাম।

কীরকম ? খুলে বলুন।

আনইজি লাগছিল। একটু যেন রেস্টলেস। আমাকে হঠাৎ বলল, আমি জীবনে বারবার ভুল

করি কেন বলো তো।
ব্যস, এইটুকু ?
না। আরও একটু বলেছিল।
কীরকম ?
বলল, আই মাস্ট রিকনসাইল।
কার সঙ্গে।
সেটা স্পষ্ট করে বলেনি। আন্দাজ করছি, মিঠুকেই মিন করছিল।
হাউ ডু ইউ নো ?
আমি তো বলেইছি, ওটা আমার আন্দাজ।
সেদিন কি মিতালি দেবী খুব ড্রিঙ্ক করেছিলেন ?
হ্যাঁ। মিতালি মদ খেত না কখনও। আমেরিকাতেও না। আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখত। তাতে প্রায়ই থাকত ও আমেরিকায় নেশার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন কবতে চায়।
তবু সেদিন উনি ড্রিঙ্ক করেছিলেন ?
হ্যাঁ, উল্টোপাল্টা খাচ্ছিল। কখনও হুইস্কি, কখনও শেরি, কখনও বিযার বা রাম। বোঝা যায় ও ড্রিঙ্ক করতে জানেই না।
তারপর কী হল ?
মশাই, মুশকিলে ফেললেন।
কেন ?
আমি পাপী-তাপী লোক। মদ আমিও খাই। পার্টি কিছুক্ষণ চলার পর আমি কি আর চৈতন্যে ছিলাম ?
আউট হয়ে গিয়েছিলেন ?
ঠিক তা না হলেও আই ওয়াজ এক্সট্রিমলি হাই। ডিনার টেবিলে বসেও আমি নাকি কিছুই খেতে পারিনি।
তারপর ?
ক্ষণিকা আমাকে ফিরিয়ে আনে।
ক্ষণিকা কে ? যিনি বাথরুমে আছেন ?
না। এ জুলেখা।
আপনার ক'জন ?
একজনই। ক্ষণিকা। এ হল স্টপ গ্যাপ।
একে কোথায় পেলেন ?
জুটে যায়।
আপনি ভাগ্যবান লোক। আচ্ছা, মিঠু মিত্র আপনাকে কোথায় কারাটে শেখাতেন ?
সাদার্ন ক্লাবে। লেক-এর কাছে।
আপনি কতদিন শেখেন ?
বেশি নয়। মাস খানেক। কারাটে ইজ এ বোরিং থিং। সিনেমা টিনেমায় দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু শেখা ভীষণ একঘেয়ে। এক জিনিস হাজারবার করতে হয়।
ক্ষণিকা দেবী এখন কোথায় ?
ক্ষণিকা। ওঃ। সে বাপের বাড়িতে।
উনি কি আপনাকে ছেড়ে গেছেন ?
বোধহয় না। টেম্পোরারি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং।
সেটা কীরকম ? জুলেখা দেবীই কি কারণ ?
না না। জুলেখা ইজ নো ম্যাচ ফর হার। ব্যাপারটা খুলেই বলি।
বলুন।

ওয়ানস আই ওয়াজ ইন লাভ উইথ মিতালি

তাই নাকি ?

ইট ওয়াজ ন্যাচারাল। মিতালির ডান গালে একটা আঁচিল আছে। আপনি দেখেননি, তাতে ওকে কী সুন্দর দেখাত ! ইন ফ্যাক্ট সেভেন্টি পারসেন্ট অফ হার মেল ক্লাসমেটস ওয়্যার ইন লাভ উইথ হার।

তারপর বলুন।

অবশ্য কাফ লাভ। ওসব ভুলে যেতে দেরি হয় না। তারপর মিতালি যখন আমেরিকা থেকে ফিরে এল আই ওয়াজ সেকেন্ড টাইম ইন লাভ উইথ হার। আমেরিকায় গিয়ে ও আরও সুন্দর এবং স্মার্ট হয়েছে। অনেক ম্যাচিওরডও। এইসব কথা আমি ক্ষণিকাকে বলেছিলাম।

বটে ?

হ্যাঁ। অ্যান্ড ক্ষণিকা ওয়াজ ক্রস। পার্টি থেকে আমাকে নিয়ে এসে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সে সোজা বাপের বাড়ি চলে যায়।

কেন, পার্টিতে কিছু হয়েছিল ?

আমি নাকি মাতাল অবস্থায় মিতালির প্রতি প্রেম নিবেদন করে ফেলেছিলাম। কিন্তু মাতালের কথা কি ধরতে আছে, বলুন ? শি ইজ সো জেলাস !

বেশি জেলাসি থেকে মানুষ খুনও করতে পারে !

আতঙ্কিত সমীরণ বলল, না না ! কী যে বলেন ! ক্ষণিকা ওরকম মেয়ে নয়।

কীরকম মেয়ে ?

কোয়াইট রেসপনসিবল। সোশ্যাল ওয়ার্কও করে।

আপনি কি বলতে পারেন মিতালি দেবীর আমেরিকায় কোনও বয়ফ্রেন্ড আছে কি না !

নেই।

কীভাবে জানলেন যে নেই ?

থাকলে আমাকে জানাত।

উজ্জ্বল সেন বলে কারও নাম শুনেছেন ?

শুনেছি। উজ্জ্বল ওর বন্ধু ঠিকই, কিন্তু যাকে বয়ফ্রেন্ড বলে তা নয়।

উজ্জ্বল কী করেন ?

আমেরিকায় ওর ব্যবসা আছে।

কীসের ব্যবসা ?

বোধহয় সফটওয়্যার।

বোধহয় বলছেন কেন ?

সেইরকমই শুনেছিলাম যেন।

ওঁদের মধ্যে কোনও অ্যাফেয়ার ছিল না বলছেন !

না না। থাকলে মিতালি আমাকে জানাত।

বরুণ ঘোষের সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল ?

সামান্য।

কীরকম লোক ছিলেন ?

লোনলি। আপনমনে থাকতেন।

আপনার ব্লাডপ্রেশার কত ?

প্রেশার ? তা তো জানি না। কেন বলুন তো ?

মাঝে মাঝে চেক করানো ভাল। আপনার ফোন বাজছে। বোধহয় আপনার বাবা। গিয়ে ফোনটা ধরুন।

বাবাই। ফোন ধরেই কানের কাছ থেকে যন্ত্রটাকে তফাত করতে হল। বাবা চেঁচাচ্ছিল, কী হল ? কী হয়েছে ? বলবি তো।

কিছু হয়নি। আমরা অ্যামিকেবলি কথা বলছি।
অ্যারেস্ট করেনি তো!
না বাবা।
তেমন বুঝলে আমাদের বিরজা উকিলকে খবর দিতে পারি।
এখনই দরকার নেই।
কে খুন হয়েছে বলছিলি?
আমার এক বান্ধবী।
কুলাঙ্গার কোথাকার!
বাবা ফোন রেখে দেওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সমীরণ।
সামনের ঘরে ঢুকতেই দেখল, লোকটা আবার তার হিয়ারিং এইডটা কান থেকে খুলে পকেটে রাখল। তারপর বলল, আপনার বান্ধবী বাথরুমে একটু বেশি সময় নিচ্ছেন!
আজ্ঞে হ্যাঁ, বাথরুম ওর খুবই প্রিয় জায়গা, ডাকব কি?
ডাকুন।
সমীরণ গিয়ে বাথরুমের দরজায় টোকা দিয়ে বলল, হয়েছে জুলেখা?
যাচ্ছি।
আরও মিনিট পাঁচেক পর জুলেখা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে সামনের ঘরে এল। হেসে বলল, হাই। আমি জুলেখা।
অফিসার বলল, আমি শবর দাশগুপ্ত। গোয়েন্দা।
হাউ থ্রিলিং!
আপনি একজন পুলিশ অফিসারের মেয়ে?
হ্যাঁ। আমার বাবার নাম বিজয় শর্মা। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ। রিটায়ার্ড।
সমীরণবাবুর সঙ্গে আপনাব কত দিনের পরিচয়?
জাস্ট বারো দিন।
কীভাবে?
উই ওয়্যার টু লোনলি পিপল। উই মেট সামহোয়ার। অ্যান্ড দ্যাটস দ্যাট।
আপনি চাকরি করেন?
হ্যাঁ, মেরিজ স্কুলে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর।
ম্যারিটাল স্ট্যাটাস?
সিঙ্গল।
একা থাকেন না বাবা-মার সঙ্গে?
একা। বাবা-মা আমার লাইফ স্টাইল পছন্দ করেন না।
সমীরণবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়াটা কি অ্যাকসিডেন্টাল?
হ্যাঁ।
কোথায় দেখা হল?
একটা বার-এ।
বার-এ? আপনি কি ড্রিংক করেন?
অকেশনালি। যখন বোরিং বা লোনলি ফিল করি।
আর ইউ ইন লাভ?
হিঃ হিঃ। ডোন্ট নো।
আপনি কি জানেন যে, ওঁর আর একজন গার্ল ফ্রেন্ড আছেন?
জানব না কেন?
আপনি মিতালি ঘোষের কথা শুনেছেন?
না।

হাউ ডিড ইউ ফল ফর হিম ?
জুলেখা মুচকি হাসল, উইল ইউ বিলিভ ?
হোয়াই নট ?
হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ স্কেয়ারড অফ গোস্টস।
ভূতের ভয় ?
ঠিক তাই।
শবর সমীরণের দিকে চেয়ে বলে, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন ?
সমীরণ ভারী লজ্জিত হয়ে বলে, বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ভয় পাই। বিশেষ করে মিতালি খুন হওয়ার পর থেকে।
সত্যি ?

মিস শর্মা, তারপর বলুন।
আই অ্যাম ন্যাচারালি অ্যাট্রাক্টেড টু লোনলি পিপল। সমীরণকে আমার ভাল লেগেছিল।
এর আগে অন্য কোনও মানুষের সঙ্গে এভাবে বাস করেছেন ?
মাত্র একবার। তবে পল্লবের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ারই কথা ছিল। একটা অ্যাকসিডেন্টে সে মারা যায়। এক বছর আগে। আই লিভ এ লোনলি লাইফ।
আপনার ঠিকানা ?
থ্রি এ বাই ওয়ান লিটন স্ট্রিট। রুম নম্বর টুয়েন্টি থ্রি।
এটা কি বোর্ডিং হাউস ?
হ্যাঁ। কিন্তু এই মার্ডার কেসটার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার সম্পর্ক নেই ? আমি কি যেতে পারি ? আমার স্কুলে আজ ফেট আছে।
পারেন।
বাই দেন।
বাই।
জুলেখা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল শবর। দরজা বন্ধ হওয়ার পর বলল, ইজ শি টেলিং দি ট্রুথ ?
মোর অর লেস।
হোয়াই লেস ?
ওটা কথার কথা। ও ঠিকই বলেছে।
কোন বার-এ আপনাদের দেখা হয়েছিল ?
মদিরা।
আপনি সেখানে রেগুলার যান ?
যাই। বেশ সেকলুডেড জায়গা। গাড়ি পার্ক করার জায়গা আছে।
জুলেখাও কি যায় ?
না। সেদিনই ওকে প্রথম দেখলাম।
কীভাবে পরিচয় হল ?
ও একটু হাই ছিল। এসে আমার টেবিলে বসল। অ্যান্ড উই টকড।
তারপর ?
তারপর তো দেখছেন।
ক্ষণিকা দেবী রাগ করবেন না ?
করবে। এখনও হয়তো জানে না। জুলেখা অবশ্য জানে যে, এটা কোনও পার্মানেন্ট ব্যবস্থা নয়। খুব কনসিডারেট মেয়ে।
শুধু ভূতের ভয়ের জন্য আপনি বান্ধবী জোগাড় করেছেন, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

বিশ্বাস করুন। বাস্তবিকই আমার ভীষণ ভূতের ভয়। পাপী তো, আমার কেবলই মনে হয় মৃতদের আত্মারা আমার কাণ্ড দেখে রেগে যাচ্ছে। বাগে পেলেই এসে গলা টিপে ধরবে।

॥ তিন ॥

(এক) শোনো,

আমি আজ তোমাকে যা বলতে চাই তা তোমার বিশ্বাসই হবে না যদি না একটা গল্প তোমাকে বলি। এখানে মখমলের মতো ঘাস হয়, নিবিড় গাছপালা আর কত ছড়ানো এখানকার নির্জনতা। আমার বাড়ির কাছেই একটা বন। এখানে সবই অভয় অরণ্য। এরা গাছপালা এত ভালবাসে। রোজ সকালে আমি একা একা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে যাই। একটা নদী আছে, কেউ সেখানে কখনও স্নান করে না। একটা মল আছে। মল মানে জানোই তো, বাঁধানো চাতাল আর বসবার জায়গা। এরা যা করে নিখুঁত। মলটাও এত সুন্দর। রোজ গিয়ে নদীর ধারে ওই মল-এ বসে থাকি। কেউ থাকে না। মাঝে মাঝে ঘোড়া চালায় ছেলেমেয়েরা। আর জগাররা দৌড়োয়। এদের খুব স্বাস্থ্যের বাতিক। বহুদিন বাঁচতে চায়, খুব ভোগ করতে চায়। একদিন কী হল জানো, খুব সকালে বেরিয়েছি। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটছি। সেপ্টেম্বর মাস। ফল-এর আর দেরি নেই। গাছের পাতার রং বদলে যাচ্ছে। ক'দিন পর সারা বনভূমি একদম রাঙা হয়ে যাবে। ফল যদি তুমি দেখতে! ইচ্ছে করছে আমার দুখানা চোখ তোমাকে পাঠিয়ে দিই। আমি চারদিক দেখতে দেখতে হাঁটছি। হঠাৎ পায়ে কী একটা ঠেকল। শক্ত। তাকিয়ে যা দেখলাম বুক হিম হয়ে গেল। একটা পিস্তল পড়ে আছে। কোথা থেকে এল? কে ফেলে গেল? সর্বনাশ! ধারেকাছে ষণ্ডাগুণ্ডা রেপিস্ট নেই তো! না বাবা, ফিরে যাওয়াই ভাল। শরীর কেঁপে-টেঁপে আমার কী অবস্থা! ফিরব বলে যে-ই ঘুরে দাঁড়িয়েছি কী দেখলাম জানো? ভাবতেও পারবে না রাস্তার ধারে একটা পুরনো গাছ গত ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল। কেউ সরায়নি। সেই শুকনো গাছের ওপর একটা হাত নেতিয়ে পড়ে আছে। সাদা হাত। আমার কী অবস্থা ভাবতে পারো? বুক ধড়ফড় করে যাই আর কী! তবু কী জানো, খুব ভয়ের মধ্যেও একটু সাহস ছিল। সকালবেলা, দিনের আলো, কাছাকাছি জগার আর রাইডাররা তো আছেই। আমি পা টিপে টিপে একটু এগিয়ে উঁকি দিয়ে বললাম, হু ইজ দ্যাট?

কেউ জবাব দিল না। দেখলাম একটা লোক কাত হয়ে পড়ে আছে। কপালের পাশটায় একটা ফুটো। অনেক রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। তারপর জমে গেছে। ভয় পেলেও আমি তো ডাক্তার। গাছের ওপর নেতিয়ে পড়া হাতটা ধরে বুঝলাম মারা গেছে অনেকক্ষণ। রিগর মরটিস শুরু হয়ে গেছে। বেশি বয়স নয়। সাতাশ-আঠাশ। একমাথা সোনালি চুল। সাদা একটা শার্ট আর ট্রাউজার্স পরা। আর মুখখানা এত কচি, এত সুন্দর কী বলব। কী হল জানো, হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল। কেন মনে পড়ল বলো তো! ছেলেটার মুখখানায় তোমার আদল আসে। আর সেই যে মনে পড়ল, হঠাৎ যেন হু হু করে তুমি সাত সমুদ্দুর ডিঙিয়ে এসে আমার ভিতরে ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ছিলে। ভিতরটা তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এত কান্না পাচ্ছিল কেন বলো তো!

আমি মলের দিকে দৌড়োতে লাগলাম। চিৎকার করলাম। লোকজন জড়ো হল। পুলিশ এসে ডেডবডি তুলে নিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে এলাম কেমন যেন ভূতে-পাওয়ার মতো। বসে বসে ভাবলাম আর ভাবলাম। একটা বহুকালের বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে যেন এক আশ্চর্য বাগানে পা দিয়েছি। চারদিক ফুলে ফুলে রঙে গন্ধে একাকার। কিন্তু কেন?

তুমি বিশ্বাসই করবে না তিন দিন আমার মাথা এলোমেলো রইল। কাজে মন দিতে পারিনি। বারবার কী মনে পড়ছিল বলো তো। ফুলশয্যার রাতে তুমি কোনও কথা বলার আগেই আমাকে একটা অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেয়েছিলে। অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতেই দাওনি। এমনভাবে ধরেছিলে আমায় যে, নড়তেও পারিনি। আমার খুব রাগ হচ্ছিল তোমার ওপর। তোমাকে ভাল তো বাসিই না, বরং ঘেন্না করি। ভীষণ। কী ভয়ঙ্কর রাগ হচ্ছিল আমার। তুমি যখন ছাড়লে তখন আমি কী না বলেছি! যা খুশি। তোমার মুখটা কেমন নিভে গেল। কেমন ঠাণ্ডা আর পাথরের

মতো হয়ে গেলে তুমি।

এবার গল্পটা আর একটু বলে নিই। জঙ্গলের মধ্যে যে-ছেলেটা সুইসাইড করেছিল তার নাম জর্জ। এখানে, হাজার হাজার জর্জ। যা হোক, এই জর্জ কেন সুইসাইড করল বলো তো! বললে তোমার বিশ্বাস হবে না।

আমি জর্জকে চিনতাম না বটে, কিন্তু তার বাড়ি আমার খুব কাছাকাছি। পুলিশের কাছে শুনলাম, জর্জের নতুন বউ তাকে ছেড়ে চলে যাওয়াতেই নাকি সে আত্মহত্যা করে বসেছে। শোনো কথা, এ দেশেও এরকম হয় নাকি? এখানে তো বর-বউ সম্পর্কই অন্যরকম। ছাড়ছে, ধরছে। বিয়েও করছে না সবসময়ে। এত নিরাবেগ জাত, তবুও তো মাঝে মাঝে এরকম হয়! শুনে মনটা আরও আরও খারাপ হল। আর কী জানো, যত মন খারাপ ততই যেন সেই মন-খারাপটা আমি এনজয় করছিলাম। এটা একটা বিশ্বাস করার মতো কথাই নয়। মন-খারাপ কি কেউ এনজয় করে? কিন্তু আমি যে করছিলাম!

সেই মন-খারাপের মধ্যে কী হল বলো তো! আমার ভিতরে যেন বাইরের মতোই পাতা ঝরার সময় হল। কী যে ছাই হল মাথামুণ্ডু বুঝতেও পারি না, বোঝাতেও পারি না। যখন বিয়ে হয়েছিল তখন কী-ই বা বয়স বলো! আর বাবা জোর করে বিয়ে দিয়েছিল বলে সেই বয়সে কী রাগ হয়েছিল আমার! রাগ ছিল পাণ্টুর জন্যও। ওই বদমাশটার জন্য কেন বলো তো চিরকালের একটা দাগ পড়ল জীবনে! সব মিলিয়ে মিশিয়ে বিয়ের সময়ে আমার মধ্যে আমি তো ছিলাম না। বাবার ক্যান্সার হয়েছে বলে শুনছি তখন, মাথাটাই খারাপ হওয়ার জোগাড়। সব রাগ গিয়ে পড়ল বেচারা তোমার ওপর! সেসব আমার পুরনো পাতা। এই পাতা ঝরার দিনে সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এলে ঝোড়ো বাতাসের মতো তুমি। আমার পাতা খসে পড়ল সব। এক সন্ধেবেলা ঘর অন্ধকার করে বসে আছি। বাইরে নির্জন রাস্তা। তার ওপাশে ছবির মতো বাড়ি। তার পিছনে অন্ধকার বনভূমি। চেয়ে আছি। আকাশে মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কী মনে হল বলব? হঠাৎ মনে পড়ল, সেই যে অনেকক্ষণ ধরে তুমি আমাকে চুমু খেয়েছিলে, তখন বুঝতে পারিনি, রাগ হচ্ছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব গভীর কোথাও সেই চুমুর স্মৃতি সুখের মতো শিহরন নিয়ে আজও আছে। খুব রাগ করেছিলাম তোমার ওপর। আলাদা ঘরে থাকতাম। তুমি কি জানো, মাঝে মাঝে দরজাটা চুলের মতো ফাঁক করে লক্ষ করতাম তোমাকে? তুমি আমাকে আক্রমণ করতে চাও কি না, তুমি জোর জবরদস্তি করবে কি না, তা বুঝতে চেষ্টা করতাম। ভয় পেতাম, তুমি হয়তো ধর্ষণ করবে আমায়। আজ মনে হয়, আমি বোধহয় তাই চাইতাম। কেন জোর করলে না বলো তো! আজ খুব বুঝতে পারছি, সে সময়ে আমার মধ্যে দুটো উল্টো জিনিস কাজ করছিল। একই সঙ্গে একটা টান আর একটা প্রত্যাখ্যান। তখনকার বয়সটার কথা ভাবো, আমার জীবনটার কথা ভাবো, বুঝতে পারবে।

কিন্তু এখন এই দূর দেশে বসে এই নতুন নিজেকে আবিষ্কার করে কী হবে বলো তো! সব তো চুকে-বুকে গেছে। সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলেছি। একটা কথা বললে বিশ্বাস করবে? তোমাকে প্রথম দেখেই কিন্তু মনে হয়েছিল, তুমি একটা ভাল লোক। কেন বলো তো! তুমি কি সত্যিই ভাল? কে জানে। কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই, সেই জঙ্গলের মধ্যে ঘটনাটার পর থেকে আমার সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। কতবার ভুল করব বলো তো জীবনে? আমার কিছু ভাল লাগছে না।

(দুই) তোমাকে আমার খুব লম্বা একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে। তাতে অনেক আবোল তাবোল থাকবে। যা খুশি লিখব। পাগলামিতে ভরা। জানো গো, আমার কিন্তু একটু একটু করে পাগলামিই দেখা দিচ্ছে বোধহয়। হঠাৎ হঠাৎ আমার আজকাল এত আনন্দ হয় যেন আমি বর্ষার নদী, দু'কূল ছাপিয়ে কোথা থেকে কোথায় ছড়িয়ে পড়ছি। আবার অকারণেই বুক ভার, চোখে জল, মন মেঘলা। পড়াশুনোর এত চাপ, এত ভীষণ সময়ের অভাব, তবু তার মধ্যেও এসব হয়। জানো না তো, এখানে কাজের চাপে মনের সব আবেগ শুকিয়ে যায়। ছিলাম এক বাঙালি দম্পতির বাড়িতে। তারা বেশ লোক। বুড়োবুড়ি। দুই মেয়ের এদেশেই বিয়ে হয়েছে। বুড়োবুড়ির সময় কাটে আপনমনে, ঘোর নিঃসঙ্গতায়। আমি তাদের মাসিমা মেসোমশাই ডাকতাম। তারা তাতে খুব

খুশি। ও-বাড়িতে বেশ ছিলাম। কিন্তু এখন হোস্টেলে থাকতে হচ্ছে। বড্ড কেজো জায়গা। যে যার নিজের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত।

আমারও ইগো, তোমারও ইগো। তাই তোমাকে চিঠিটা লিখতে গিয়েও লিখতে পারিনি। তিনবার কিন্তু শুরু করেছি। তিনটে এয়ারোগ্রাম নষ্ট। না, ফেলিনি, রেখে দিয়েছি। কী জানি, তুমি বিয়ে করেছ কি না। মাঝে মাঝে তোমার খবর খুব জানতে ইচ্ছে করে। করেছ? সমীরণ প্রায়ই চিঠি লেখে, আমিও লিখি। কিন্তু তার কাছে জানতে চাইতে লজ্জা করে। কী ভাববে? আচ্ছা, টেলিপ্যাথি বলে কিছু নেই? নেই কেন? এই তো আমি টেলিপ্যাথিতে তোমার কাছে কত কথা বলছি! শুনতে পাচ্ছ?

প্রফেসর এজেফিয়েল সেদিন বলছিলেন, যাদের ইগো খুব প্রবল তাদের মধ্যে পাগলামির লক্ষণ থাকে। এই ইগো বড্ড জ্বালাচ্ছে আমাকে, জানো? তাই তোমাকে চিঠি লিখতে পারছি না। এটা আমার পাগলামি নম্বর এক। দু' নম্বর পাগলামি হল, এখন তোমাকেই ভাবি আর তোমার সঙ্গেই কথা বলি মনে মনে। এটাকে কি ভাবমূর্তি বলে? না বোধহয়। অন্য কিছু বলে হয়তো। কিন্তু ভাবমূর্তি কথাটা বেশ, না? তোমাকে ভেঙে ফেললাম, তারপর তোমার একটা মানসমূর্তি গড়ে নিলাম, বেশ মজা।

সেদিন একটা কাণ্ড হল। সুসান আমার খুব বন্ধু। দুজনে গাড়ি নিয়ে একটা ঝরনা দেখতে গেছি। বড্ড সুন্দর জায়গা। সাফোকেটিংলি বিউটিফুল। ফেরার সময় একটা পিছল জায়গায় আছাড় খেলাম। না, তেমন লাগেনি। কিন্তু কে জানে কেন, আমার চোখ ভরে জল এল। ভাবলাম, তুমি থাকলে আমি কি পড়ে যেতাম? কক্ষনও না। সুসান আমাকে ধরে তুলছিল। চোখে জল দেখে অবাক হয়ে বলল, আর ইউ ক্রায়িং? মাই গড, ইউ আর নট দ্যাট হার্ট।

আমি অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বললাম, আমার তো কেউ নেই।

কী কথার কী উত্তর। শুনে সুসান আরও অবাক। বলল, আরে তোমার আবার কে থাকবে? আমারই বা কে আছে? উই ডোন্ট নিড এনিবডি।

সত্যিই তাই। এদের কেউ নেই। মা বাবা ভাই বোন কারও তোয়াক্কা করে না। একা থাকে, স্বয়ংসম্পূর্ণ। দরকার মতো বিছানায় বয়ফ্রেন্ড ডেকে নেয়। তারপর তাকে ভুলেও যায়। জলভাত। আর বিয়ে করতে হলে এত হিসেব নিকেশ করতে বসে যে, ওটা বিয়ে না বিজনেস কন্ট্রাক্ট তা বুঝতে কষ্ট হয়।

আমি এদের কাছে পাঠ নেওয়ার চেষ্টা করছি। পারছি না। কিছুতেই পারছি না। আমার কেবলই মনে পড়ে সেই তোমার অনেকক্ষণ ধরে চুমু খাওয়ার কথা। তখন ঘেন্না করেছিল। আজ আমার সমস্ত শরীর আর মন সেই চুমুটার কথা ভেবে সম্মোহিত হয়ে যায়। অন্য কোনও পুরুষ কাছে এলে কুঁকড়ে যাই, স্পর্শ তো বটেই, কাছাকাছি হওয়াটাও সহ্য করতে পারি না। এ আমার পাগলামি নম্বর তিন।

(তিন) আজ বাবা এল। এয়ারপোর্টে বাবাকে আনতে গিয়েছিলাম। দেখলাম অল্প কিছুদিনেই বাবা বড্ড বুড়িয়ে গেছে। এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছি, টুকটাক কথা হচ্ছে। কী করলাম জানো? হঠাৎ বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, মিঠুবাবুর কী খবর?

বাবা অবাক হয়ে বলল, মিঠুবাবু কে?

আমি ভ্রূ কুঁচকে বললাম, মিঠু মিত্র।

কী হবে খবর দিয়ে?

এমনি।

আমার বুক কাঁপছিল। লজ্জা করছিল।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কদিন আগে দেখা হয়েছিল। ভাল আছে।

আমি আরও কিছু শুনতে চেয়েছিলাম। বাবা বলল না।

কিন্তু দু' দিন পর এক রাতে ডিনারের পর বাবা আমাকে ডেকে বলল, হ্যাঁ রে, তুই সেদিন মিঠুর খবর জানতে চাইলি কেন?

এমনি।
তোর কি মিঠুর কথা মনে হয় ?
আমার চোখে ফের জল এল। বাবার কাছ থেকে পালিয়ে এলাম।
পাশ করে চাকরি পেয়ে হোস্টেল ছেড়ে বাসা করেছি। ভাড়া অবশ্য। শিগগিরই একটা বাড়ি কিনব। একা থাকব। চাকরি করব। আর এভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দেব প্রবাসে—আমার নিয়তি তো এই।
কয়েকদিন পর বাবাকে নিউ ইয়র্ক দেখাতে নিয়ে গেছি। কিন্তু বাবার তেমন বিস্ময় নেই। কী যেন ভাবছে। মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামে রেস্টুরেন্টে চা খেতে খেতে বাবা হঠাৎ বলল, এসব দেশে একটা মেয়ের পক্ষে একা থাকা বিপজ্জনক।
কত মেয়েই তো আছে। এদেশে একা থাকাই বেওয়াজ।
সেটা কেমনতরো কথা ! একা থাকার রেওয়াজ তাদের কাছে, যারা নিরুপায়।
আমিও তো তাই।
তুই কেন নিরুপায় ?
এ কথার কি জবাব হয় ? চুপ করে রইলাম।
(চার) বাবাকে আজ প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম। প্রায় এক বছর আমার কাছে রইল বাবা। কী যে ভাল লাগত। আর কিছু নয়, বাড়ি ফিরে একজন আপন মানুষকে তো দেখতে পেতাম ! এ দেশের একাকিত্ব তুমি ভাবতেও পারবে না। পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে মাখামাখি করা যায় না, আড্ডা নেই, হুটহাট কারও বাড়ি যাওয়া যায় না। চেনাজানা লোকদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে বলে আর কত সময় কাটে ? সময়ও হাতে কম। উদয়াস্ত হাসপাতাল, রুগি, রিসার্চ।
গতকাল বাবা বলছিল, একটু ভেবে বল, দেশে কাউকে তোর কোনও মেসেজ দেওয়ার আছে ?
মাথা নেড়ে বললাম, না বাবা।
মিঠু বোধহয় এখনও তোকে ফেলবে না।
আমি তো তার দয়া চাই না।
তোর যে কেউ নেই।
তুমি তো আছ।
আমি আব কদিন ? আমার ইচ্ছে মিঠুর সঙ্গে বিয়েটা মেনে নে। সে বরং এখানে চলে আসুক।
থাক বাবা। সে নিশ্চয়ই আমাকে ঘেন্না করে।
রাগ তো থাকতেই পারে। কিন্তু সে বুদ্ধিমান, বিবেচক ছেলে।
থাক বাবা।
মুখে যাই বলি, বুকটা কেমন করছিল, এমন কি হয় ? এমন কি হতে পারে ? হলে হয়তো ভালও হবে না। কল্পনা এক, বাস্তব আর এক। মিলবে না হয়তো।
উজ্জ্বল অ্যাপ্রোচ করছে। বারবার। জানি, এটা সম্ভব নয়। তবু উজ্জ্বল যে আসছে তা মেনেও নিই। আর কিছু নয়। এই সাঙ্ঘাতিক একাকিত্ব থেকে তো খানিকটা মুক্তি। একজন কথা বলার লোক।
মোট বারোটা এয়ারোগ্রাম জমা হয়েছে। ওপরে তোমার নাম আর ঠিকানা। ভিতরে তিন বা চার লাইন লেখা। সবচেয়ে বড়টায় লিখতে পেরেছি তেরো লাইন। পছন্দ হচ্ছে না।
বাবা চলে যাওয়ার পর খুব কাঁদলাম। অনেকক্ষণ ধরে। আমার যে কী হবে।

তিনটে জেরক্স কপির দিকে চিন্তিত মুখে চেয়ে ছিল শবর দাশগুপ্ত। মিতালির ডায়েরিতে এই তিনটে পাতাই পাওয়া গেছে। বাদবাকি পৃষ্ঠা সাদা। লেখাগুলোর ওপরে বা নীচে কোনও তারিখ নেই। অনুমান করা যায় প্রথমটা আর শেষটার মধ্যে সময়ের তফাত দুই বা তিন বছরের। এর মধ্যে আরও অনেক পৃষ্ঠা লেখা হয়েছিল নিশ্চয়ই। সেগুলো কোথায় গেল বোঝা যাচ্ছে না।
কেসটা খুব মাখো মাখো হয়ে উঠছে স্যার। এ তো রীতিমতো লাভ অ্যাফেয়ার !

শবর তার বিচ্ছু টাইপের সহকারী নন্দলালের দিকে চেয়ে বলল, হাতের লেখা চেক করেছ ?

হ্যাঁ। ওসব ঠিক আছে। মিতালিরই হাতের লেখা। শেষ টুকরোটায় উজ্জ্বল সেনের রেফারেন্সটা দেখেছেন স্যার ?

দেখেছি। পান্টুর কী খবর ?

বাড়ি নেই। ধানবাদ না কোথায় কোন ধান্দায় গেছে। আজ বা কাল ফিরবে। ফিরলেই তুলে নেব।

ক্ষণিকা দেবীকে চেক করো।

ও.কে.।

আর কোনও ডায়েরি খুঁজে পাওনি ?

না স্যার। এই একটাই। মোট তিনটে এন্ট্রি। কোনও পাতা ছেঁড়া ছিল না।

কিন্তু বোঝা যাচ্ছে মিতালি দেবী সিস্টেমেটিক ছিলেন না। উনি এক একসময়ে এক একটা ডায়েরিতে লিখতেন। বাকি ডায়েরিগুলো হয় উনি আমেরিকা থেকে আনেননি, নয়তো চুরি গেছে।

মিঠু মিত্রকে কি তোলা হবে স্যার ?

এখন নয়। তুমি বাড়িটা আর একবার সার্চ করো। দেখো, যদি সিগনিফিক্যান্ট কিছু পাও।

নন্দলাল চলে গেল। শবর চিন্তিত মুখে চেয়ার টেনে বসল। এইটেই মিতালির শোয়ার ঘর। দক্ষিণ পশ্চিম এবং পুব খোলা। দেয়ালে হালকা ক্রিম রং। আসবাব সবই খুব উঁচু জাতের। বার্মা সেগুনের ডবল খাট, বড় ওয়ার্ডরোব, হাফ সেক্রেটারিয়েট এবং রিভলভিং চেয়ার, কাশ্মীরি কাজ করা ছোট টেবিল, ওয়াল ক্যাবিনেটে নানা দামি জিনিস সাজানো। হাতির দাঁতের মূর্তি, রুপোর ওপর মিনার কাজ করা রেকাবি, পুতুল, দুটো মজবুত স্টিলের আলমারি। সবই খুলে দেখা হয়েছে।

খাটের কাছ বরাবর মেঝেতে পড়ে ছিল মিতালি। মোট দুবার তাকে ছুরি মারা হয়েছিল। পিঠের দিক থেকে, হৃৎপিণ্ড বরাবর। মিতালি পড়ে ছিল কাত হয়ে, বাঁ দিকে। চারদিকে অন্তত বারো-তেরোটা সেন্টের শিশি ভাঙা অবস্থায় ছড়িয়ে ছিল। ঘর সুগন্ধে এত ভরা ছিল যে পুলিশ কুকুর সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে যায়। স্নিকার ডগকে বিভ্রান্ত করার জন্যই যে সেন্টের শিশিগুলো ভাঙা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। একজন কেয়ারটেকার, একজন রান্নার লোক এবং একটি কাজের মেয়ে কোনও নতুন কথা বলতে পারেনি। ককটেল ডিনারে ডিনার সার্ভ করেছিল এক নামী ক্যাটারার। তাদের কাছ থেকেও পাওয়া যায়নি তেমন কোনও সূত্র। মোটামুটি যা জানা গেছে তা হল, রাত এগারোটা নাগাদ মিতালি সামান্য মাতাল অবস্থায় ওপরে উঠে আসে। দোতলায় সে একা থাকত। সে শোয়ার ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর মধ্য রাতে রান্নার লোক হরেন আর মালি ভজুয়া অনেক শিশি বোতল ভাঙার আওয়াজ পায়। মিতালি মাতাল অবস্থায় ওসব করছে ভেবে ওপরে ওঠেনি ভয়ে।

শবর উঠল। খানিকক্ষণ পায়চারি করল। তারপর পিছনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। খুন করে পালিয়ে যাওয়ার পক্ষে এই বারান্দাটি প্রশস্ত। পিছনে একটু বাগান এবং ঝোপঝাড় আছে। বারান্দা থেকে অনায়াসে নীচের ঘরের জানালার ওপরকার রেন শেড-এ নামা যায়। সেখান থেকে লাফিয়ে পড়লেই হল।

না, শবর দাশগুপ্ত খুশি হচ্ছে না। মোটিভ অ্যাঙ্গেলটা পাল্টে যাচ্ছে। কোথাও একটা নট রয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে সে আবার নতুন করে পূর্বাপর ভাবতে লাগল।

নমস্কার মিত্তিরমশাই। আপনাকে আবার জ্বালাতে এলাম।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারার মিঠু দরজাটা ছেড়ে দিয়ে ভদ্র গলায় বলল, আসুন।

আপনি তো বেশ ভেঙে পড়েছেন দেখছি।

ও কিছু নয়। বসুন।

আমাদের আরও কিছু জানার আছে মিত্তিরমশাই। উই ওয়ান্ট ইওর হেল্‌প্‌।

বলুন।

আপনি সে দিন মিতালি দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আপনাদের মধ্যে কথাও হয়েছিল।

আমি সেই কথাগুলো জানতে চাই।
প্রথম স্টেটমেন্টেই বলেছি।
জানি। তবু আর একবার বলুন।
মিঠু মাথা নেড়ে বলল, ওর বেশি আমার কিছুই বলার নেই।
মিতালি দেবীই কি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?
মিঠু ক্লান্ত চোখে চেয়ে বলল, একটা যোগাযোগ হয়েছিল।
কীরকম যোগাযোগ ? আপনার তো টেলিফোন নেই। তা হলে ?
আমার অফিসে টেলিফোন আছে।
ওঃ হ্যাঁ, ও কথাটা মনে ছিল না। তা হলে মিতালি দেবী আপনাকে অফিসেই টেলিফোন করেছিলেন ?
আমি সে কথা বলিনি।
যোগাযোগটা কবে হয়েছিল ?
ঠিক মনে নেই।
মারা যাওয়ার দিন কি ?
না।
না ? তার মানে আপনার মনে আছে। ব্যাপারটা আপনি চেপে যেতে চাইছেন কেন ?
কিন্তু কথা না বলার অধিকার আমার আছে।
কিন্তু তাতে একটা মার্ডার কেস ক্ষতিগ্রস্ত হলে নয়।
আমি যে কথা বলতে চাইছি না তার সঙ্গে ওর খুনের সম্পর্ক নেই।
আপনি কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে মিতালি দেবীর বাড়িতে যান ?
না। হঠাৎ গিয়েছিলাম।
কিন্তু একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনাদের মধ্যে হয়েছিল ?
সেভাবে নয়।
মিতালি দেবী দেশে এসেছেন তাঁর বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে। প্রায় এক মাস আগে। এর মধ্যে তাঁর সঙ্গে আপনার মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল কি ?
হ্যাঁ।
ইউ আর নট এ গুড লায়ার। প্লিজ, সত্যি কথা বলুন। তাতে আমাদের তদন্তের সুবিধে হবে।
কিছু কথা আমি বলতে বাধ্য নই।
আপনি কি জানেন পৃথিবীতে যেখানে যত বিবাহিতা মহিলা খুন হন তাঁদের অধিকাংশের খুনের পিছনেই থাকেন তাঁদের হাজব্যান্ডরা। শতকরা নব্বইটা কেসেই।
জানি।
জানেন কি যে, এই কেসেও আপনি প্রাইম সাসপেক্ট ?
অনুমান করছি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই।
ইউ আর এ কুল কাস্টমার।
মিঠু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কিছু বলল না।
মিঠুবাবু, আপনার পাসপোর্টটা একটু দেখাতে পারেন ?
পাসপোর্ট। আমার পাসপোর্ট নেই।
সে কী। পাসপোর্ট করেননি ?
না। আমার দরকার পড়েনি।
এই জেরক্স কপিগুলোর হাতের লেখা চিনতে পারেন ?
পারি। মিতালির লেখা।
মিতালির লেখা বলে চিনলেন কী করে ?
বলতে পারব না। চিনি।

এ হাতের লেখা কোথায় দেখেছেন ? চিঠি বা ডায়েরিতে ?
মনে নেই।
তিনি কি আপনাকে চিঠি লিখতেন ?
না।
আপনি ডায়েরির এই তিনটে কপি একটু পড়ে দেখুন।
মিঠু কপিগুলো হাতে নিল। পড়তে লাগল। তার মুখের দিকে ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দুটি চোখ নিষ্পলক নিবদ্ধ রইল সারাক্ষণ। মিঠুর মুখে তেমন কোনও ভাবান্তর হল না। পড়া শেষ করে সে একটা শ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে বসে রইল।
মিঠুবাবু, আমি ক্রাইমের লোক, হৃদয়ের ব্যাপারটা ভাল বুঝি না। এ ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই অবাক ঠেকছে। আপনি কি ব্যাখ্যা করতে পারেন ?
না। আপনার কি মনে হয় এগুলো ফলস এবং ফ্রড ? কেউ মিতালির হাতের লেখা নকল করে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে ?
হতে পারে।
আর যদি তা না হয়, যদি সত্যিই মিতালি দেবীরই লেখা হয় তা হলে বুঝতে হবে তিনি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন।
মিঠু জবাব দিল না।
হাবুডুবুই যখন খাচ্ছিলেন তখন তাঁর পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক হল, দেশে ফিরেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা। তাই না ?
নাও হতে পারে।
সেটা কীরকম ?
অনেকে আছে, মনে মনে অনেক কিছু বানিয়ে নেয়, বাস্তবকে এড়িয়ে চলে।
মিতালি কি সাইকিয়াট্রিক কেস ?
আমি জানি না।
আপনি এম সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট্সের নাম কখনও শুনেছেন ?
খুব সূক্ষ্মভাবে একটু শক্ত হয়ে গেল কি না মিঠু, তা ভাল বুঝতে পারল না শবর। একবার চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করে মাথা নিচু করল। বলল, কেন ?
আহা, শুনেছেন কি না বলুন না।
শুনতেও পারি।
শুনেছেন মশাই, শুনেছেন। কলকাতার পুরনো অ্যাটর্নি। আপনার শ্বশুর এঁদের মক্কেল ছিলেন।
ও।
আপনি কি জানেন এঁদের কাছে মিতালি দেবীর একটা ডিড আছে ?
থাকতে পারে।
অত নির্বিকার থাকবেন না। ডিডটা আপনার নামে করা। মিতালি দেবী তাঁর সব সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনাকে দিয়ে গেছেন। আপনি এখন এক বিশাল সম্পত্তির মালিক। তাই না ?
কাস্টোডিয়ান আর মালিক তো এক কথা নয়।
ডিডটা কি আপনি দেখেছেন ? মিতালি দেবীর কলকাতার যাবতীয় সম্পত্তি দেখাশুনো, প্রয়োজনে বিক্রি করা বা যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়েছে।
পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি একটা সাধারণ জিনিস।
খুব সাধারণ কি ? তা ছাড়া মিতালি দেবীর সিঙ্গল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টকে সম্প্রতি জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে। আপনার সঙ্গে। এটাও স্বাভাবিক ?
মিঠু একটা শ্বাস ফেলে বলল, কলকাতায় ওদের বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনো করার কেউ নেই।

ফলে উনি ওঁর ডিভোর্স করা স্বামীকে পরম বিশ্বাসে সব কিছুর ভার দিয়ে ফেললেন ?

মিঠু চুপ।

মোটিভটা উনিই তৈরি করেছিলেন। মিতালি দেবীর সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল আপনাকে এতটা বিশ্বাস করা। সব কিছু যেই হাতের মুঠোয় এল অমনি নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য আপনি তাঁকে নির্মমভাবে সরিয়ে দিলেন !

কাজটা আমি করিনি।

নিজের হাতে করেননি বলছেন ? তা হলে কি ভাড়াটে খুনি অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন ?

মিতালিকে খুন করার কোনও কারণ আমার ছিল না।

এগুলো কি কারণ নয় ?

আমার কাছে নয়।

তা হলে আপনার সুবিধের জন্য আমি ঘটনাগুলো একটু সাজিয়ে দিই ? শ্রীমতী মিতালি ঘোষ একদিন আমেরিকায় একটি ঘটনা থেকে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, তিনি আপনাকে আকণ্ঠ ভালবাসেন। সেই হৃদ্দমুদ্দ ভালবাসায় এই রোমান্টিক ও একটু ইমপ্র্যাকটিক্যাল মহিলা ডায়েরিতে পাতার পর পাতা নিজের হৃদয়াবেগে ভরে ফেলতে লাগলেন। অথচ ইগো এবং লোকলজ্জায় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারলেন না। দেশে ফিরে এসে বরুণ ঘোষ কিছুদিন পর মারা গেলেন। মিতালি দেবী সেই মৃত্যু উপলক্ষে দেশে ফিরলেন। তিনি তখন সম্পূর্ণ একা। এই অবস্থায় তিনি আকুল হয়ে লজ্জা সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে প্রথমেই ছুটে এলেন আপনার কাছে। হয়তো আত্মসমর্পণও করলেন। এই গ্যাপগুলো যদি আপনি ভরাট করতে পারতেন তা হলে আমাদের পক্ষে সুবিধে হত। যাকগে, যা বলছিলাম। উনি তো আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, কিন্তু আপনি তো খাচ্ছিলেন না। আপনার বুকে দীর্ঘকালের একটি অপমান বিষধর সাপের মতো অপেক্ষা করছিল। আপনার জন্মমাস নভেম্বর, আপনি একজন স্কোর্পিও। স্কোর্পিওর জাতকদের প্রতিশোধস্পৃহা হয় সাংঘাতিক। তার ওপর আপনি লোভী, সম্পত্তির লোভেই না আপনি মিতালি ঘোষের অতীতের কলঙ্কের কথা এবং বিয়েতে তাঁর অনিচ্ছা জেনেও তাঁকে বিয়ে করেন। হয়তো বিয়ের পর তাঁর সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু থ্যাংক গড, মিতালি দেবী সময় থাকতেই আপনাকে ডিভোর্স করে আমেরিকায় চলে যান। আপনার কপালটা কিন্তু দারুণ ভাল। মিতালি দেবী সম্মোহিতের মতো ফিরে এসে আপনার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করলেন। এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কী হতে পারে বলুন ! তার ওপর আপনি একজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। নিষ্ঠুর ও আবেগহীন। এ কুল কাস্টমার। আপনি মিতালির তালে তালে একটু নাচলেন। তাঁর সম্পত্তির কাস্টোডিয়ান হলেন, জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের কয়েক লাখ টাকা আপনার নাগালের মধ্যে এসে গেল। এরপর মিতালি দেবীর মতো একজন আবেগসর্বস্ব, ছিটিয়াল মহিলাকে জীইয়ে রাখার কোনও কারণ আপনার ছিল না। তাই না ? নিজেই হোক বা ভাড়াটে লোক দিয়েই হোক আপনি তাকে সরিয়ে দিলেন। বাই দি বাই, খুনের দিন রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন বলুন তো।

॥ চার ॥

একজন লোক সকালবেলায় একরকম, দুপুরে অন্যরকম, বিকেলে একেবারে আরও অন্যরকম। ধরা যাক লোকটার নাম রমেন বা শ্যামলী। সকালের রমেন বা শ্যামলী বেশ নরম সরম, উদারচেতা, হাস্যমুখ। দুপুরের রমেন বা শ্যামলী নানা উদ্বেগ ও চাপে তিরিক্ষি, রগচটা, মারমুখী এবং কঞ্জুষ। বিকেলের রমেন বা শ্যামলী ক্লান্ত, উদ্দেশ্যহীন, হতাশ, পর্যুদস্ত। এই যে একজনেরই নানা প্রকাশ বা স্ফুরণ এটা ধরতে পারাই হচ্ছে চূড়ান্ত বিচক্ষণতা। রমেন বা শ্যামলীর মধ্যেও তফাত আছে। রমেন হয়তো সকালে তিরিক্ষি বিকেলে নরম, শ্যামলী তার উল্টো। একজন মানুষ নানা অবস্থা, নানা পরিস্থিতি, নানা চাপ, নানা উদ্বেগ ও ব্যস্ততায় অন্য অন্য সব মানুষ হয়ে যায়। সকালের রমেনকে

দুপুরে দেখলে রমেন বলে মনেই হবে না। দুপুরের শ্যামলীকে যদি মনে হয় বনলতা সেন, রাতে তাকেই মনে হতে পারে বান্ধবগড় জঙ্গলের ভালুক বলে। জীবন তো এরকমই। রবীন্দ্রনাথ তো বলেই দিয়েছেন, তাঁর জীবনটা হল নানা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গাঁথা একখানা মালা। হোয়াট অ্যান এক্সপ্রেশন! লা জবাব।

এই যে সমীরণের মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে সুগভীর গবেষণালব্ধ জ্ঞান, আজ সেই জ্ঞানটাকেই হাতিয়ার করে এগোতে হবে। শ্রীরাধিকার অভিসারে যাওয়ার মতোই। পথ দুর্গম, ক্ষুরস্য ধারা, ফণী ফোঁস ফোঁস করছে, পিছলে পড়ে আলুর দম হওয়ার চান্স আছে। তবু রাধা যেমন রোজই কুঞ্জে পৌঁছে যেত, সেও পৌঁছে যাবে।

রিস্কটা নেওয়ার দরকার ছিল না। কিন্তু গতকাল জুলেখা বলেছে আজ রাত থেকে থাকতে পারবে না। তার হাজব্যান্ড বাঙ্গালোর থেকে ফিরে আসছে। এই নতুন খবরে যথেষ্ট বিচলিত হয়ে সমীরণ বলল, তুমি তো বিয়েই করোনি।

মৃদু হেসে জুলেখা বলল, ওরকম বলতে হয়।

কোনটা সত্যি বলো তো। আগে যেটা বলেছিলে, না এখন যেটা বলছ।

যে কোনও একটা। বাট আই অ্যাম লিভিং।

এ খবরে মাথায় বজ্রাঘাত হল তার। সে পাপী। আর কে না জানে, পাপীদের জন্যই পৃথিবীতে যত ভয়-ভীতির আয়োজন। নেশা করলে সে নানা অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখতে পায়। একা ফ্ল্যাটে তার পক্ষে থাকা অসম্ভব। ক্ষণিকাকে ফিরিয়ে না এনে আর উপায় নেই।

তবে হিউম্যান নেচার সম্পর্কে তার জ্ঞান গভীর বলেই তার দৃঢ় বিশ্বাস। সকালের দিকে ক্ষণিকার মেজাজ ভাল থাকে। এ সময়টায় সে হাসে, ঠাট্টা ইয়ার্কি বুঝতে পারে, বেশ দয়ালু হয়ে ওঠে তার চোখের দৃষ্টি। ফুল অফ হিউম্যান কাইন্ডনেস। তার হৃদয়ের বালতি তখন উপচে পড়ে দয়া-দুগ্ধে।

তাই আজ সকালে— অর্থাৎ বেলা সাড়ে আটটায়—সে অত্যন্ত মলিন মুখে এসে বসে আছে ক্ষণিকার বাপের বাড়ির বাইরের ঘরে। সে দাড়ি কামায়নি, পরিষ্কার জামা কাপড় পরেনি এবং মুখে হাসি নেই। ডোরবেল বাজানোর পর ঝি এসে দরজা খুলে বসিয়ে রেখে গেছে। ফাঁকা ঘর। সোফাসেট, বুক কেস, কাশ্মীরি কাঠের পার্টিশন দিয়ে বেশ সাজানো ঘর। একটা বছর চারেকের বাচ্চা মেয়ে ঘরের কোণে বসে ডল নিয়ে খেলছে। খানিকক্ষণ তাকে লক্ষ করে হঠাৎ বলল, তুমি কে গো?

আমি! আমি একজন পাপী।

পাপী কী?

এ ম্যান ফুল অফ ভাইসেস। এ সিনফুল ম্যান।

তুমি আমার মায়ের বয়ফ্রেন্ড?

ওঃ, তা হলে এই মেয়েটিই ক্ষণিকার মেয়ে। ক্ষণিকা খুব তার মেয়ের গল্প করে। বাপের বাড়িতে তার নিঃসঙ্গ দিদির জিম্মায় থাকে। তাতে ক্ষণিকা মুক্ত থাকতে পারে। উড়ে উড়ে বেড়াতে পারে।

সে বলল, আমি একজন পাপী খুকি।

ঝি চা নিয়ে এল। ক্ষণিকা এল না। তবে চা আসাটা ভাল লক্ষণ। বরফ গলতে চাইছে। ইগোর চৌকাঠটা ডিঙোতে পারছে না। লজ্জার লতা যেন জড়িয়ে ধরছে অভিসারে গমনোদ্যোগী শ্রীরাধিকার দুখানি পা। একটু গলা খাঁকারি দিল সমীরণ।

বাচ্চা মেয়েটা হাম্পটি ডাম্পটি গানটা গাইছে। আজকাল কত বাচ্চাই গায়। সমীরণ চায়ে চুমুক দিল। এই সময়টায় ক্ষণিকার হৃদয়-বালতি ভরে আছে ফেনশীর্ষ দয়ার দুধে। এ সময়ে সে ভিখিরিকেও ফেরায় না। বাচ্চা মেয়েটার গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমীরণ একটু গুনগুন করল, ফেরাবে কি শূন্য হাতে?

ঘুম-ঘুম চোখে সামান্য একটু আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে শ্লথ পায়ে ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়াল ক্ষণিকা। চোখে নিস্পৃহ দৃষ্টি। ঢিলা একটা ড্রাগনের ছবিওলা কিমোনো পরনে। চুলগুলো

অবিন্যস্ত। চোখে অপার বিস্ময়।

এর সবটাই যে অভিনয় তা জানে সমীরণ। ওই চাহনি, ওই শ্লথ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমা, ওই উপেক্ষার ভাব—ওর আড়ালেই রয়েছে সেই অমোঘ বালতিটা। টলটল করছে ভরভরন্ত দুধে।

উদ্বেল হতে নেই। চায়ের কাপটা ধীরে নামিয়ে রেখে মাথা নত করে অপরাধীর মতো বসে রইল সে। এও অভিনয়। কমল হাসান বা নাসিরুদ্দিন শা-র সঙ্গে সে এখন পাঞ্জা কষতে পারে।

তুমি ?

প্রশ্নটার জবাব দিল না সমীরণ। দিতে নেই। খুব ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু।

বাচ্চা মেয়েটা হঠাৎ বলে উঠল, ও লোকটা পাপী জানো মা ?

ক্ষণিকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জানি। ওরকম বলতে নেই। ছিঃ।

বাঃ রে, ও-ই তো বলল।

বেশিক্ষণ ঘাড় নিচু করে থাকার ফলে সমীরণের ঘাড় টনটন করছিল। তবু থাকতে হচ্ছে। ক্ষণিকা মুখোমুখি সোফায় এসে আলতোভাবে বসল। বলল, বোসো।

গলার স্বরটা নরম। সমীরণ খুব সাবধানে ধীরে ধীরে বসল।

জুলেখা চলে গেল বুঝি ? রাখতে পারলে না ?

সমীরণ একটু জিভ কেটে ফেলল। ভুলে। সামান্য খসখসে গলায় বলল, জানতে ?

ওমা ! জানব না কেন ? তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রায়ই তো গিয়ে সব দেখে আসতাম। নবর মা-র সঙ্গে কথা হত।

সমীরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পাপ কখনও গোপন থাকে না।

তা জানি না। তবে যাকে তাকে ডেকে আনছ, আজকাল কি ভীষণ এডস হচ্ছে তা জানো ?

পাপের বেতন মৃত্যু। জানি। কেন আমাকে একা ফেলে চলে আসো বলো তো ! তুমি কি জান না আমি একা থাকতে পারি না ? বিশেষ করে তোমাকে ছাড়া ? সেই জন্যই জুলেখাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। হয় তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, নইলে বাবা পার্মানেন্টলি বাঙ্গালোর পাঠাতে চাইছে, সেখানেই চলে যাব।

জুলেখাকে তুমি মোটেই তাড়াওনি।

আলবত তাড়িয়েছি। চলো, দেখবে।

দেখার দরকার নেই। জুলেখাকে তাড়িয়েছি আমি।

তুমি ?

হ্যাঁ। কাল আমি টেলিফোনে ওকে বিকেলবেলায় ধরেছিলাম।

ওঃ, তুমি মহীয়সী। তুমি কি জানো তোমার মতো—

থাক।

ক্ষণিকা, ক্ষমা—

আর হয় না সমীরণ। আর কিছুতেই—

আর কক্ষনও—

তোমার কথার কোনও দাম—

প্রমিজ। এই একবারটা—

না, প্লিজ। ফিরে যাও—

দয়া করো—

ওঃ সমীরণ—

তোমাকে ছাড়া—

মা, ও লোকটা কি পাপী ?

ছিঃ তোটন—

আমি পাপী। পঞ্চ ম-কার—

উঃ ওরকম কোরো না তো—

এবারকার মতো—
কী জ্বালা বাবা—
লক্ষ্মী সোনা—
বাঙ্গালোরেই যাও না—
না, না, তোমাকে ছেড়ে স্বর্গেও—
মিথ্যুক—মিথ্যুক—ভূতের ভয়ে—
পায়ে পড়ি—
আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে—

চল্লিশ মিনিট বাদে গাড়িতে পাশাপাশি বসে তারা ফিরে আসছিল। ক্ষণিকার গোল মুখশ্রীতে এখনও সকালের সেই অপারগ ক্ষমাশীলতা। ঘুম-ঘুম চোখ। অলস দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে থেকে বলল, মিঠু মিত্রের লাভারটি কে বলো তো।

মিঠুর লাভার ? যাঃ। কেউ নেই।

আছে।

কী করে বুঝলে ?

জানি। হি হ্যাজ এ লাভার। তোমার বান্ধবী বলেছে।

কে বান্ধবী ?

দ্যাট পুওর রেচেড্ গার্ল। মিতালি।

কী বলেছে ?

বেশ মাতাল হয়ে গিয়েছিল সেদিন। আমার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছিল একটা সময়ে। তখন বলল, ডু ইউ নো হি হ্যাজ এ লাভার ? শি লাভস হিম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালাল সমীরণ। তারপর সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল, মেয়েটার নাম কী ?

সেটা বলেনি। সেজন্যই তো জানতে চাইছি।

সমীরণ মাথা নেড়ে বলল, আমিও জানি না। তবে তোমাকে একটা কথা বলি, মাতালদের কথায় কখনও বিশ্বাস কোরো না।

করি না। কিন্তু মিতালিকে সেদিন লক্ষ করেছ ? শি ওয়াজ এক্সট্রিমলি ডিস্টার্বড। আর সেই জন্যই ওরকম আনাড়ির মতো মদ খাচ্ছিল। ডিস্টাবর্ড থাকার একটা কারণ তো আছে।

ব্যাপারটা লজিক্যাল নয়, কিন্তু শি ওয়াজ ইন লাভ উইথ মিঠু।

লজিক্যাল নয় কেন ?

ডিভোর্সের এত দিন পর এবং এত দূরের দেশে থেকে হঠাৎ প্রেমে পড়ে যাওয়াটা কি স্বাভাবিক ?

খুব স্বাভাবিক। মিতালির বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। তখন ওর ম্যাচিওরিটি ছিল না। পরে যখন ধীরে ধীরে পুরো ব্যাপারটা শান্তভাবে ভেবেছে তখন হঠাৎ বুঝতে পেরেছে, কাজটা ঠিক হয়নি। মিঠু মিত্র তো চমৎকার মানুষ। টল, হ্যান্ডসাম, কারেজিয়াস অ্যান্ড কাম। কোয়াইট লাভেবল।

সমীরণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, এনিওয়ে সেই রিডিসকভারি অফ লাভ থেকেই হয়তো ও ওরকম রেস্টলেস হয়ে পড়েছিল।

মোটেই নয়। শি ওয়াজ ডিস্টার্বড বিকজ শি কেম টু নো দ্যাট দেয়ার ওয়াজ অ্যানাদার উওম্যান।

তুমি সিওর ?

সিওর।

কে হতে পারে ?

লেট আস থিংক।

ইয়েস লেট আস থিংক।

ক্ষণিকা চোখ বুজে ধ্যানস্থ হল। সমীরণ ধ্যানস্থ হতে সাহস করল না, কারণ সে গাড়ি চালাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ক্ষণিকা চোখ খুলে বলল, একটা ব্যাপার মনে পড়েছে।
কী সেটা ?
একটা মেয়ে টেবিলে বিরিয়ানি সার্ভ করছিল। বছর কুড়ি একুশ বয়স। পরনে একটা সবুজ রঙের গাদোয়াল ছিল। মুখখানা ভারী মিষ্টি। একটু ড্রিমি মুখ। চোখ দুখানা খুব নরম। মনে আছে ?
একটু গম্ভীর হয়ে সমীরণ বলে, তোমার মনে থাকা উচিত, ডিনারের সময় আমার বাহ্যজ্ঞান ছিল না।
ডিনারের অনেক আগেই তাকে দেখতে পেয়েছ নিশ্চয়ই। মনে পড়ছে ?
আমি মেয়েদের দিকে তাকাই না।
শুধু তাকাও না, চোখ দিয়ে গিলে খাও।
আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে মেডিটেট করতে দাও। তার আগে বলো এই মেয়েটি সম্পর্কে কী বলেছিল মিতালি ?
কিছু বলেনি। মেয়েটা যখন বিরিয়ানির প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকছিল তখনই মিতালি একটু শিউরে উঠে যেন হিসিং সাউন্ড করে বলল, শি-শি ইজ ইন লাভ উইথ হিম।
ওই মেয়েটাকেই মিন করছিল ?
অফকোর্স। মেয়েটাকে দেখেই যেন রিঅ্যাক্ট করল। আমি জানতে চাই মেয়েটা কে ?
সবুজ শাড়ি আর অবুঝ মুখ তো !
অবুঝ মুখ মোটেই বলিনি।
এনিওয়ে, মনে পড়ছে না। শোনো, ছেলেরা কখনও মেয়েদের পোশাক মনে রাখতে পারে না।
তা হলে কী মনে রাখে ?
বেশি মনে রাখে চোখ। দু নম্বর, মুখশ্রী।
মুখশ্রীর কথা তো বললাম।
ডেসক্রিপশন ইনকমপ্লিট। আমি ভিসুয়ালাইজ করতে পারছি না।
চুলগুলো স্টেপকাট করা।
আর কিছু ?
দুদিকে দুটো মিষ্টি গজদাঁত আছে। হাসলে বেশ দেখায়।
যাঃ, ও তো জয়িতা !
সে কে ?
জয়িতা হল মিতালির খুড়তুতো বোন।
যাঃ বলছ কেন ?
ও সেরকম মেয়েই নয়।
কীরকম মেয়ে ?
ভীষণ ভাল টাইপের। ছেলেদের সঙ্গে মেশে না। খুব লাজুক।
ক্ষণিকা একটু হেসে বলল, লাজুকরা বুঝি প্রেমে পড়ে না ?
তা নয়। কিন্তু মিঠুর সঙ্গে ওর কোনও কানেকশনই নেই যে।
খোঁজ নাও।
নিয়ে লাভ ?
জাস্ট কৌতূহল।
সমীরণ মিটি মিটি হাসছিল। বলল, জয়িতা যদি কারও প্রেমে পড়ে তা হলে সে বেচারি ইহজীবনেও জানতে পারবে না যে একটা মেয়ে তার প্রেমে পড়েছিল।
তা হলে মিতালি জানল কী করে ?
ইউ ক্যান্ট বি সিওর।
আই অ্যাম সিওর।

ও.কে. ও.কে.। মেনে নিচ্ছি। তবু মনে রেখো, মিতালি ও কথা বলার সময় মাতাল হয়ে গিয়েছিল।

জানি। আমি মিতালিকে সামলাচ্ছিলাম। ন্যাপকিন দিয়ে চোখ মুখ মুছিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা জল খাইয়ে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে দিয়ে আসি। সোফায় বসেই হড়হড় করে বমি করে দিল। ভাগ্যিস উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, নইলে ডিনারটাই নষ্ট হত।

সমীরণ ভ্রূ কুঁচকে বলল, সামথিং ইজ টিকিং।

হোয়াটস টিকিং ?

ইউ মে বি রাইট।

আই অ্যাম রাইট।

ক্ষণিকা, শবর দাশগুপ্তর কানে কথাটা গেলে হি উইল মেক দি গার্ল আপ সাইড ডাউন।

কেন ?

লোকটা ভীষণ পাজি। তোমাকেও জ্বালাবে।

মেয়েটাকে জ্বালালে তোমার ক্ষতি কী ? হ্যাভ ইউ গট এ সফট কর্নার ফর হার ?

আরে না। শি ইজ জাস্ট এ কিড।

মোটেই নয়। কুড়ি একুশ যথেষ্ট বয়স। কীরকম বোন বললে ?

আপন খুড়তুতো বোন। ওর বাবা অরুণ ঘোষ আমাদের প্রফেসর ছিলেন। মাই গড !

কী হল ?

একটা কথা মনে পড়ল। জয়িতা হল ওনলি চাইল্ড। দুই ভাইয়ের ওই একটিই সারভাইভিং সন্তান। মিতালির নেক্সট অফ কিন। জয়িতা উইল ইনহেরিট এভরিথিং অফ মিতালি।

* * *

তখন কি তার তেরো বছর বয়স ? নাকি চৌদ্দ ? বোধহয় মাঝামাঝি। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের একটা বিশেষ ব্রাঞ্চে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য তার বড্ড ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছিল হঠাৎ। বিশেষ একটা কাউন্টারে ছোট্ট মুখখানা বাড়িয়ে সে করুণ গলায় বলেছিল, আমি কি একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারি ?

মিঠু কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে চিনতে পারল। বাসরঘরে মেয়েটি অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়েছিল। মিঠুর কানে লেগে আছে একটা কলি, সখি ভালবাসা কারে কয়, সে কি সকলি যাতনাময় ...

একটু হেসে মিঠু বলেছিল, কেন পারবে না ?

মেয়েটি হাস্যহীন মুখে করুণ দৃষ্টিতে মিঠুর দিকে চেয়ে ছিল। ওই বয়সেও সে বুঝত, তার দিদি মিতালি এই লোকটাকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে। নাকচ করেছে। অথচ মিঠুদাকে তার কী ভালই লেগেছিল বিয়ের রাতে। কেমন ভদ্র, কেমন গম্ভীর, কী পারসোনালিটি, আর কী দারুণ ম্যানলি চেহারা ! মুগ্ধ, সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল সে। ওই বয়সে ওই তার প্রথম উথাল-পাতাল বুক। মিঠু যদি জামাইবাবু হয়ে থাকত তবে ঠিক সামলে নিত নিজেকে সে। কিন্তু বিয়ের পরই মিতালিদি এমন করতে লাগল। তারপর ছেড়েই দিল। বড্ড কষ্ট হয়েছিল তার। আবার সেই সঙ্গে অদ্ভুত এক আনন্দও।

অ্যাকাউন্ট খোলার পর একদিন, মাত্র একদিনই একটা ভুল করে ফেলেছিল, যার জন্য আজও নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না সে। একদিন টাকা তুলবার অছিলায় চেক-এর সঙ্গে জেমস ক্লিপে আঁটা একটা চিরকুট দিয়েছিল মিঠুকে। তাতে ইংরিজিতে লেখা ছিল, হাউ ডিপলি আই লাভ ইউ।

মিঠু চেকটা নিল, চিরকুটটা দেখল। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল। ভীষণ গম্ভীর। আর একটাও কথা বলেনি সেদিন।

ভয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে সেদিন চলে এসেছিল জয়িতা। পনেরো দিন বাদে আবার

গিয়েছিল। না, আর কখনও ভুল করেনি সে। শুধু কাউন্টারের এক পাশ থেকে অন্য পাশে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। কিন্তু তার হৃৎপিণ্ড এত জোরে শব্দ করেছিল সেদিন, মিঠু কি শুনতে পায়নি ?

পেয়েছিল নিশ্চয়ই। তবু শুধু ভদ্র গলায় একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন আছ ?

তারপর তিন বছর ধরে যতবার ব্যাঙ্কে গেছে ততবারই ওই ভদ্র গলায় একটি প্রশ্ন, কেমন আছ ? তার বেশি একটি কথাও নয়। কখনও নয়।

জয়িতা মৃদু স্বরে বলত, ভাল। আর তার বুকের ভিতরে উত্তাল হয়ে উঠত হৃৎপিণ্ড।

তিন বছর বাদে অন্য ব্রাঞ্চে প্রমোশন পেয়ে চলে গেল মিঠু। একবার বলেও গেল না। জয়িতা অ্যাকাউন্ট তুলে নিল না। অপেক্ষা করল।

রসা রোডের দিকে তার যাওয়ার কথাই নয়। তবু স্কুলের পর তার মাঝে মাঝে লেক-এর দিকে যাওয়ার খুব দরকার পড়তে লাগল, প্রথম প্রথম বন্ধুদের সঙ্গে। তারপর এক একদিন একা। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক তখন তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ব্যাঙ্কের দরজা থেকে একটু দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকত। দেখা হত না। একদিন সাহস করে ঢুকেছিল। অনেককে দেখল, যাদের দেখার দরকার ছিল না।

তারপর একদিন দেখল। মিঠু বেরিয়ে এল। কোনওদিকে না তাকিয়ে তার বিশাল মোটরবাইকে উঠে ভোঁ করে কোথায় চলে গেল।

যথেষ্ট। ওটুকুও তখন কম নয়। তিন দিন ধরে সেই দেখার রেশ রইল।

একদিন মাকে বলেছিল, আচ্ছা, মিঠুদা তো ইচ্ছে করলেই এখন বিয়ে করতে পারে, না মা ?

পারেই তো ! অত ভাল ছেলে !

তবে করছে না কেন ?

করবে করবে। হয়তো কথা চলছে। কে খবর রাখে বাবা ?

কেউ খবর রাখেও না। সে রাখত। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি মাত্র দু স্টপ দূর। সে হঠাৎ হঠাৎ গিয়ে হাজির হত। এ কথা সে কথা। তারপর মিঠুদার কথা।

জ্যাঠামশাই নিজের মেয়ের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। বলতেন, আমি কিছু ভুল করিনি। মিতালি একদিন বুঝবে।

জ্যাঠামশাই, মিঠুদা কি বিয়ে করবে ?

তা কি জানি মা ? মাঝে মাঝে আসে, খোঁজ খবর নিয়ে যায়। লজ্জায় সঙ্কোচে তাকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারি না। বিয়ে তো করাই উচিত।

বেশি দিনের কথা নয়। মাত্র এক দেড় বছর আগে একদিন জ্যাঠামশাই বললেন, সামনের শনিবার মিঠুকে খেতে বলেছি। ভারী সঙ্কোচ। কিছুতেই রাজি হয় না। আমি বেশ লম্বা ছুটিতে আমেরিকা চলে যাচ্ছি বলে রাজি করিয়েছি। তুইও একটু আসিস তো মা। হরেনই রাঁধবে, কিন্তু সে পুরনো মানুষ, এখনকার রান্না জানে না। তুই একটু ওই চাইনিজ-টাইনিজ কিছু একটা রান্না করিস তো। ছেলেটা নিজে রেঁধে খায়, সেদ্ধপোড়া খেয়েই থাকে হয়তো।

তখন তার উনিশ বছর বয়স। তখন তার কী উদ্বেল হৃদয় ! মারাত্মক শনিবারটা যেন ডবল ডেকারের মতো ধেয়ে আসছিল।

সেদিন তার মা-বাবারও ছিল নিমন্ত্রণ। রেসিপির বই দেখে খুব যত্ন করে সে রেঁধেছিল চিলি চিকেন আর প্রন ককটেল। জ্যাঠামশাইয়ের ছোট খাওয়ার টেবিলে চারজন খেতে বসেছে। জ্যাঠামশাই, মা, বাবা আর মিঠু। মুখ তুলে মিঠুই হঠাৎ বলল, এ কী, তুমি বসবে না ?

সবেগে মাথা নেড়ে সে বলেছিল, না। আমি সার্ভ করব।

তাই কি হয় ? বসে যাও, সবাই একসঙ্গে খাই।

শুনে সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুইও বসে যা। হরেন সার্ভ করবে।

কেমন একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হল, তাকে বসতে হল মিঠুর বাঁ পাশে, কাছ ঘেঁষে। চোখমুখ লজ্জায় ঝাঁ ঝাঁ করছিল তার। মুখ তুলতে পারে না, খাবে কী ? আর তখন মিঠুর গা থেকে একটা মিষ্টি

পুরুষালি উত্তাপ আসছিল। আর মাদক একটা গন্ধও। কথাবার্তা হচ্ছিল, সে একটুও বুঝতে পারছিল না কারও কথা।

মিঠু হঠাৎ বলল, এ সব তুমি রেঁধেছ? বাঃ, খুব ভাল রাঁধতে পারো তো তুমি! আর কী কী পারো বলো তো! গান গাইতে পারো, জানি। আর কিছু?

কিছু না।

মা বলল, ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে বি এ পড়ছে।

সে আমি জানি।

জানে! কী করে জানে মিঠু?

ডিনারের পর অনেক রাত অবধি গল্প হয়েছিল। না, জয়িতা কথাই বলেনি। শুধু কাছাকাছি একটা দূরত্বে বসে অনুভব করেছে মিঠুকে। সে এক অতলান্ত অনুভূতি। কী যে হচ্ছিল তার বুকের ভিতরে!

মিঠু কি তাকাচ্ছিল তার দিকে? সে দেখেনি। কিন্তু সে জানে, চোর চোখে মিঠু বহুবার দেখেছিল তাকে। বহুবার।

মা বাবার সঙ্গে সে যখন বেরিয়ে আসছিল তখন সঙ্গে সঙ্গে মিঠুও। বিদায় নেওয়ার একটু আগে হঠাৎ দু পা পিছিয়ে তার সঙ্গ ধরে বলল, তোমার চিরকুটটার জবাব দেওয়া হয়নি। একদিন দেব।

লজ্জায় মরে যাচ্ছিল সে। নার্ভাস। মিঠুর মোটরবাইকের শব্দ যতক্ষণ শোনা গিয়েছিল ততক্ষণ তার শরীরে ঝঙ্কার।

চিরকুটের জবাব দেবে বলেছিল মিঠু। জবাবটা এল মাসখানেক পর। এবং অভিনব উপায়ে। ডাকে তার কাছে এল সাদার্ন ক্লাবে ভর্তি হওয়ার একটা ফর্ম। সেই ফর্মের এক কোণে ছোট্ট করে লেখা "প্লিজ। মিঠু।" হাসবে না কাঁদবে ভেবেই পেল না জয়িতা। এটা কি রসিকতা? নাকি অন্য কিছু?

অনেক ভেবে সে বুঝতে পারল, মিঠু হয়তো তার সঙ্গ চায়। কিন্তু সঙ্গ পাওয়ার অন্য কোনও উপায় হয়তো ভেবে পায়নি। অল্পবয়সীদের মতো মাঠে ময়দানে বা হোটেল রেস্টুরেন্টে বসে প্রেম করা হয়তো মিঠুর পছন্দ নয়। হয়তো সাদার্ন ক্লাবে ব্যায়াম বা মার্শাল আর্টের ক্লাসে তারা অনেক কাছাকাছি হতে পারবে।

অনেক লজ্জা সঙ্কোচ, অনেক দ্বিধা জয় করতে হয়েছিল জয়িতাকে। একদিন কুণ্ঠিত পায়ে হাজিরও হল সাদার্ন ক্লাবে। তাকে দেখে মিঠুর মুখে ভারী চমৎকার একটা হাসি ফুটে উঠেছিল। সেই হাসিটাই তার প্রথম উপহার।

জয়িতা জীবনে কখনও কোনও খেলাধুলো বা ব্যায়াম করেনি। প্রথম প্রথম তার শরীরে কী ব্যথাই না হয়েছিল। তবু করত। মিঠু বলত, ক'দিন পরেই দেখবে শরীর কেমন হাল্কা আর ফিট লাগবে।

কখনও তাদের মধ্যে স্পষ্ট করে কোনও ভালবাসার কথা হয়নি। সব সময়ে তার দরকারও হয় না। ভালবাসার মধ্যে একটা নীরবতাও কি নেই? সে নিজে প্রগলভ নয়। মিঠুও কম কথার মানুষ। তারা খুব কাছাকাছি হত, যখন কারাটে ক্লাসের পর মিঠু তাকে মোটরবাইকের পিছনে চড়িয়ে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিত। কখনও পাড়ায় ঢুকত না বা বাড়িতেও আসত না। বলত, মেলামেশাটা একটু গোপন থাকাই ভাল, নইলে তোমাকে লোকে বদনাম দিতে চেষ্টা করবে। বাড়ির লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

কিন্তু গোপন করলেও খুব গোপন থাকেনি তাদের সম্পর্ক। মাস কয়েক বাদে একদিন মা তাকে ধরল, হ্যাঁ রে, কী ব্যাপার বল তো!

কী ব্যাপার মা?

তোর কি মিঠুকে পছন্দ?

কী লজ্জা! কী লজ্জা! মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। জবাব এলই না মুখে।

মা বলল, মিতালির সঙ্গে ওর বিয়েটা হয়েছিল, সেইটেই একটা খারাপ ব্যাপার, নইলে মিঠু তো

চমৎকার ছেলে। ভাল করে ভেবে দেখ।

ভেবে দেখবে ? ভেবে দেখার কী আছে! তার তো মিঠুময় জগৎ। মিঠু ছাড়া সে আর কিছু ভাবতেই পারে না।

মা তার নীরবতারও অর্থ ধরতে পারল। বলল, বেশ, তোর বাবাকে বলি। মনে হয়, অমত করবেন না। কিন্তু বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে মেলামেশাটা বন্ধ করতে হবে।

এক অপার্থিব আলোয় যেন ভরে গেল জয়িতার জগৎ। এত আনন্দও যে জীবনে আছে তার জানাই ছিল না।

সেদিন সন্ধেবেলা সে খুব লাজুক গলায় মিঠুকে বলল, মা জানতে পেরেছে।

মিঠু সামান্য অবাক হয়ে বলল, কী করে জানলেন ?

তা তো জানি না। তবে অমত করেনি।

মিঠু একটু চুপ করে থেকে খুব ধীর কণ্ঠে বলল, মিতালি আমার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিয়ে গিয়েছিল। তুমি তা ফিরিয়ে দিয়েছ। আমার জন্য আর কেউ এতটা করেনি, তোমার মতো।

জয়িতা খুব ফিসফিস করে বলেছিল, এখন কী হবে ?

মিঠু একটু হেসে বলল, কী হবে জান না বুঝি ?

মাথা নেড়ে জয়িতা বলল, না তো ?

এই প্রথম তাদের মধ্যে ভালবাসার সংলাপ। এইটুকুই মাত্র কথা, কিন্তু উত্তাপ আর আবেগে যেন মাখামাখি। মিঠুর মোটরবাইক সেদিন যেন মাটিতে নয়, আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

কথাটা বাবার কানেও তুলল মা। তার বাবা মাত্র এক মিনিট চিন্তা করে বলল, হোয়াই নট ? বয়সের তফাতটা একটু বেশি, তা হোক। তাতে ভালই হবে। মিঠুর প্রতি যে অন্যায়টা হয়েছে এতে তারও খানিকটা শোধবোধ হবে।

কোথাও কোনও আপত্তি উঠল না। মসৃণ একটা পরিণতির দিকেই যাচ্ছিল তারা।

কিন্তু আপত্তি উঠল অপ্রত্যাশিত একটা জায়গা থেকে। জ্যাঠামশাই আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর বাবা একদিন গিয়ে তাঁকে বললেন ব্যাপারটা। জ্যাঠামশাই যেন ভীষণ চমকে উঠে বললেন, না না, তা হয় না। তা কিছুতেই হয় না।

জয়িতার বাবা অবাক হয়ে বললেন, কেন হয় না ? কোথাও তো বাধক দেখছি না।

জ্যাঠামশাই বার বার বললেন, বাধা আছে। সে তুই বুঝবি না।

জ্যাঠামশাই আর ব্যাখ্যা করেননি। ব্যাখ্যা করার সময়ও আর পাননি। পরদিনই গভীর রাতে বাথরুমে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যান। সেরিব্র্যাল।

খুব কেঁদেছিল জয়িতা। একটা সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। মিঠু তার ভূতপূর্ব শ্বশুরের শ্মশানবন্ধু হয়েছিল।

দুদিন বাদে এয়ারপোর্টে মা-বাবার সঙ্গে জয়িতা গিয়েছিল মিতালিকে নিয়ে আসতে। কী উদভ্রান্ত, শোকাহত চেহারা মিতালির! এক ঝটকায় যেন বয়স বেড়ে গেছে অনেক। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল মিতালিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। মিতালি বলল, না কাকু, তার দরকার নেই। ও বাড়িতে বাবার কত স্মৃতি আছে বলো তো! বরং জয়িতা কয়েকদিন আমার সঙ্গে থাক। নইলে আমার একা লাগবে।

প্রথম দু-চারটে দিন শোকের ভাবটা কাটিয়ে ওঠার পরই তাদের দুই বোনের মধ্যে কথার ফোয়ারা খুলে গেল। দিনের বেলায় জয়িতার কলেজ, মিতালিরও উকিল অ্যাটর্নির কাছে বা ব্যাঙ্কে যাওয়া। গল্প হত রাতে। দোতলায় শোওয়ার ঘরে মস্ত খাটে পাশাপাশি শুয়ে।

শ্রাদ্ধ বা নিয়মভঙ্গ কোনও অনুষ্ঠানেই মিঠু আসেনি। কিন্তু এক সন্ধেবেলা সাদার্ন ক্লাব থেকে বেরিয়ে মাঠের ওপর খানিকটা একসঙ্গে হেঁটেছিল দুজন। মিঠু একটু চিন্তিত। বলল, জয়িতা, মিতালি আমাকে কিছু বলতে চায়।

কী ?

তা জানি না। কিন্তু তোমাকে একটা অনুরোধ করব।

বলুন না।
তুমি আমাদের কথা, তোমার আমার কথা মিতালিকে জানিয়ে দিয়ো।
কেন ? আমার যে ভীষণ লজ্জা করবে।
তোমার লজ্জা নিয়েই তো হয়েছে আমার বিপদ।
মিতালিদির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে ?
হ্যাঁ, মিতালি আমার ব্রাঞ্চে গিয়েছিল।
ও মা !
শি ইজ এ বিট অফ রিপেন্টেন্ট।
জয়িতার বুক অজানা ভয়ে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সে উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল, তা হলে কী হবে ?
মিঠু একটু হাসল, কী হবে তুমি জান না ?
বলুন না !
মিতালি অনেক দূরে সরে গেছে জয়িতা।
জয়িতার বুকে সে যে, কাঁপুনি উঠল সে বোঝাতে পারবে না।
মিতালি মস্ত পার্টির আয়োজন কবল। ককটেল ডিনার। জয়িতাব ইচ্ছে ছিল পার্টির পর মিতালিকে ফাঁক বুঝে বলবে কথাটা। কিন্তু কী হল, আগের রাতে যখন দু বোনে কথা হচ্ছিল তখন মিতালি বলল, তুই কি প্রেমে পড়েছিস ?
জয়িতা অবাক হয়ে বলল, কেন বলো তো !
তোর মুখচোখ বলছে, তোর গলাব স্বর বলছে, তোর আনমনা ভাব বলছে, তুই প্রেমে পড়েছিস।
জযিতা দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিল।
লজ্জার কী আছে ? বল না।
জানি না।
তার মানে সত্যিই প্রেমে পড়েছিস। কে রে ?
জয়িতা একটা বুদ্ধিব কাজ করল। বলল, আজ নয় মিতালিদি। কাল বলব।
কেন ? কাল কেন ?
জয়িতা বলেনি। সেই রাতটা সে ভাল করে ঘুমোতেও পারেনি।
পরদিন সকাল থেকেই ঘরদোর সাজানো, পরিষ্কার করা এসব নিয়ে ব্যস্ত রইল তারা। দুপুরে খাওয়ার টেবিলে যখন দুজনে মুখোমুখি তখন মিতালি জিজ্ঞেস করল, কাল বলিসনি। আজ বলবি ?
বলব। খেয়ে নাও। তারপর বলব।
খেতে খেতেই মিতালি বলল, ছেলেটা ভাল ?
জানি না।
ভাল করে বলছিস না কেন ?
বলব মিতালিদি ? বললে তুমি রাগ করবে না ?
রাগ করব ? তুই কাউকে ভালবাসলে আমার রাগ করার কী ?
খাওয়া তখন শেষের মুখে। জয়িতা শুধু মিঠুর আদেশ পালন করার জন্যই তার সব লজ্জা সঙ্কোচ আর ভয় মুঠোয় ধরে রেখেই বলল, মিঠুদা।
কে বললি ? বলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল মিতালি।
জয়িতা মাথা নিচু করে টেবিল ছেড়ে পালিয়ে গেল।
সে কী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সেটা বুঝতে একটু সময় লেগেছিল তার। মিতালি বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ বসে রইল খাওয়ার টেবিলে। তারপর একতলার লিভিং রুমের সোফায় অনেকক্ষণ পড়ে ছিল চুপচাপ। তারপর ডেকোরেটরের লোকেরা এল ডাইনিং হল-এ টেবিল চেয়ার সাজাতে। এল ক্যাটারার। তাকে উঠতে হল। আড়াল থেকেই তাকে লক্ষ করছিল জয়িতা। সামনে যায়নি।
মিঠু এল বিকেলের দিকে। হঠাৎ।

দৃশ্যটা এ জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না জয়িতা। দোতলায় সাজছিল মিতালি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে মিঠুর দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ একটা অস্ফুট চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিঠুর বুকে। ভগ্নস্তূপের মতো। শুধু বলছিল—প্রবল কান্না ভেদ করে বলছিল, বিশ্বাস করি না—বিশ্বাস করি না—

মিঠু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। জয়িতা চলে গেল পিছনের বাগানে। এ দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব।

তাকে গিয়ে পিছনের বাগানে ধরল মিতালিই। চোখের জল মুছে ফেলেছে, মুখে একটা হাসি ফুটিয়েছে অনেক কষ্টে। তাকে দু হাতে আঁকড়ে ধরে বলল, বেশ করেছিস। বেশ করেছিস। আমি খুশি হয়েছি। বিশ্বাস কর।

জয়িতা বিশ্বাস করেনি। তবু বলেছিল, আমি তো জানতাম না মিতালিদি—

মিতালি একটু চুপ করে থাকার পর বলল, এ কি জানার মতো কথা ? কিছু নয় রে। আমি তো একটা পাগল, কত ভুল করেছি জীবনে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মুখে বলল, কিন্তু কিছুই ঠিক ছিল না সেদিন মিতালির। জন্মে মদ ছোঁয়নি। সেদিন জলের মতো খেল। কত কী উল্টোপাল্টা বলতে লাগল লোকজনকে। কেঁদে ফেলল, হাসতে লাগল। কিছু ঠিক ছিল না।

পার্টি শেষ হওয়ার একটু বাদেই চলে এসেছিল জয়িতা। বুক ভার, মনে ভয়, অনিশ্চয়তা, এই অদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে কী ভাবে মুক্তি ঘটবে।

॥ পাঁচ ॥

জয়িতা দেবী, মিতালি দেবীর খুনেব কেসে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে।

কিন্তু পুলিশকে আমি তো যা বলার বলেছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা আমি জানি। কিন্তু তদন্ত যত এগোয় ততই নতুন নতুন তথ্য বেরোতে থাকে, নতুন নতুন সত্য উদঘাটিত হতে থাকে—একটু শক্ত বাংলা বলে ফেললাম, মাফ করবেন—আর যত এ সব হতে থাকে ততই মামলার প্যাটার্নটা পাল্টে যেতে থাকে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আবার নতুন করে জেরা করা ছাড়া আমাদের উপায় থাকে না।

বলুন।

মিঠু মিত্র নামে কাউকে কি আপনি চেনেন ?

চিনব না কেন ? উনি আমার জামাইবাবু।

বাঃ, বেশ বেশ। কতদিন চেনেন ?

মিতালিদির বিয়ের সময় থেকে।

চমৎকার। আপনি নিজেই বলেছেন যে, উনি আপনার জামাইবাবু। তার মানে কি যে, উনি এখনও আপনার জামাইবাবু এবং আপনি ওঁর শালি ?

তার মানে ?

মানে বিয়ের ইমিডিয়েট পরেই যে ওঁদের ডিভোর্স হয়ে যায় এটা কি আপনার জানা নেই ?

কেন থাকবে না ?

আফটার ডিভোর্স যখন আইনত স্বামী আর স্ত্রীর সম্পর্ক থাকে না তখন সেই বিয়ের সূত্রে গড়ে ওঠা আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোও কি থাকে ? না, থাকা উচিত ?

ওঃ হ্যাঁ। সেই অর্থে আমাদের সম্পর্ক নেই।

অন্য কোনও অর্থে আছে কি ?

তার মানে ?

মিঠু মিত্র আর আপনার জামাইবাবু নন, আপনিও ওঁর শালি নন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আত্মীয়তা ছাড়াও তো কত রকমের সম্পর্ক হয়। আমি জানতে চাই, মিঠু মিত্রের সঙ্গে আপনার

কোনও যোগাযোগ ছিল কি ?
ছিল।
সেটা কী রকম ?
চেনাজানা ছিল।
আর কিছু ?
আমি সাদার্ন ক্লাবে কারাটে শিখতাম। উনি ওখানকার ইনস্ট্রাক্টর।
বাঃ, চমৎকার। কারাটে শিখতেন ? হঠাৎ কারাটে কেন ?
ইচ্ছে হল।
আপনি কি স্পোর্টিং টাইপ ? খেলাধুলো ভালবাসেন ?
বাসি।
স্কুল-কলেজের স্পোর্টসে নেমেছেন কখনও ?
না।
ফুটবল ক্রিকেট বোঝেন ?
না। একটু একটু।
কখনও দৌড়ঝাঁপ করেছেন ?
না।
তবু হঠাৎ কারাটে শেখার ইচ্ছে হল ?
হ্যাঁ।
বেশ বেশ। আপনার বাড়ি থেকে সাদার্ন ক্লাব বেশ খানিকটা দূর। আপনি কীসে করে যাতায়াত করতেন ?
বাসে।
বাসে যেতেন এবং আসতেন ?
হ্যাঁ।
ভাল করে ভেবে বলুন। বাসে যেতেন এবং আসতেনও ?
কখনও কখনও মিঠুদা মোটরবাইকে পৌঁছে দিতেন।
বাঃ, বেশ বেশ। ওঁদের বিয়ের সময় আপনার বয়স কত ছিল ?
বারো তেরো।
এখন কত ?
কুড়ি চলছে।
গুড। আপনি কি জানেন যে, আপনারা—অর্থাৎ আপনাব বাবা, মা এবং আপনি—বিশেষ করে আপনি মৃতা মিতালি ঘোষের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।
জানি না।
শুধু কলকাতার বা পশ্চিমবঙ্গের নয়, মিতালি দেবীর আমেরিকার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি এবং টাকাপয়সারও আপনারাই ওয়ারিশান। জানেন ?
সে রকম কথা কিছু শুনিনি।
শুনবেন। কারণ আপনারাই মিতালি দেবীর নেক্সট অফ কিন।
হতে পারে।
আপনি না জানলেও অন্য অনেকেই কিন্তু খবর রাখত যে, বরুণ ঘোষ ও তাঁর মেয়ে মিতালি ঘোষের নিকটাত্মীয় আপনারাই। আপনারাই তাঁদের ওয়ারিশান।
জয়িতা চুপ করে রইল।
সাদার্ন ক্লাবে আপনি কবে ভর্তি হয়েছেন ?
দু' বছর হবে।
নিজে থেকেই গিয়ে ভর্তি হলেন ?

হ্যাঁ।
মানে হঠাৎ আপনার কারাটে শেখার ইচ্ছে হল আর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সাদার্ন ক্লাবে ভর্তি হলেন—ব্যাপারটা এভাবেই ঘটেছিল কি ?
হ্যাঁ।
আপনি কি জানতেন মিঠু মিত্র ওখানে কারাটে শেখান ?
জানতাম।
তার মানে কি ওঁর কাছেই কারাটে শেখার আগ্রহ ছিল আপনার ?
ঠিক তা নয়। মিঠুদা থাকলে সুবিধে হবে, তাই—
সুবিধে নানারকমই আছে। বাই দি বাই, মিঠুবাবুকে আপনি কি বরাবরই মিঠুদা বলে ডাকেন, নাকি জামাইবাবু ?
মিঠুদা।
কেন, বাঙালি মেয়েরা তো বড় ভগ্নীপতিকে সাধারণত জামাইবাবু বলেই ডাকে।
অনেকে দাদাও ডাকে।
হ্যাঁ, তা বটে। আপনি দাদাটাই প্রেফার করেন তা হলে ?
হ্যাঁ।
বাঃ বেশ। মিঠু মিত্র মাঝে মাঝে আপনাকে মোটরবাইকে লিফ্‌ট দিতেন ?
হ্যাঁ।
মাঝে মাঝে ? না রোজ ?
রোজ নয়। প্রায়ই।
একটু ভেবে বলুন। কারাটে ক্লাবের অন্য মেম্বাররা যদি বলে রোজ ?
রোজ পৌঁছে দিলেই বা ক্ষতি কী ?
ক্ষতি ? ক্ষতির প্রশ্নই ওঠে না। আমরা সত্যি কথাটা জানতে চাইছি মাত্র।
রোজ।
বাঃ এই তো চাই। কবে থেকে আপনাদের মধ্যে শালি আর ভগ্নীপতির সম্পর্কটা ঘুচে গিয়েছিল বলতে পারেন ?
না। জানি না।
আপনাদের মধ্যে সম্পর্কটা কি কেবল প্রশিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর ?
হ্যাঁ।
একটু ভেবে বলুন। কারণ আমাদের সংগৃহীত তথ্য অন্য কথা বলছে।
কী বলছে ?
আপনাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। আপনারা পরস্পরকে ভালবাসেন। শুধু তাই-ই নয়, আপনাদের বিয়ের কথাবার্তাও চলছে। ঠিক বলছি ?
জয়িতা খানিকক্ষণ চুপ থেকে মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ।
দয়া করে বলবেন কি যে এই প্রেম এবং বিয়ের ব্যাপারে আসল ইনিশিয়েটিভ কার বেশি ? আপনার না মিঠুবাবুর ?
আমার।
আপনার ?
হ্যাঁ। মিতালিদি ওঁকে ডিভোর্স করার পর থেকেই আমি ওঁর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি।
ডিভোর্স না করলে ?
তা জানি না। হয়তো মেনে নিতাম।
বাঃ। কিন্তু একটা খটকা থেকে যাচ্ছে।
কীসের খটকা ?
মিতালি দেবী হঠাৎ মারা গেলে আপনিই যে ওঁর বিপুল সম্পত্তি পাবেন এটা মিঠুবাবুর মতো

বুদ্ধিমান লোকের না জানা থাকার কথা নয়।
তাতে কী হল ?
আপনার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে ওঁরই বেশি আগ্রহ থাকার কথা। তাই না ?
আমি বুঝতে পারছি না।
যাকগে। এখন বলুন, মিতালি দেবী ফিরে আসার পর থেকেই কি আপনি ওঁর সঙ্গে ওঁদের বাড়িতে থাকতেন ?
হ্যাঁ। মিতালিদি লোনলি ফিল করছিলেন, তাই আমাকে থাকতে বলেন।
একটানা ছিলেন ?
হ্যাঁ। তবে রাতটা। দিনের বেলায় আমার কলেজ থাকত, মিতালিদিরও কাজ থাকত।
হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো। কিন্তু খুনের রাতে আপনি ছিলেন না।
না।
কেন জানতে পারি ?
সেদিন মিতালিদি হঠাৎ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যান। মাতলামিকে আমি ভীষণ ভয় পাই।
ঠিকই তো। মাতলামি মোটেই পছন্দ করার জিনিস নয়। আচ্ছা, মিতালি দেবী কি প্রায়ই ড্রিংক করতেন ?
না। কক্ষনও না।
তা হলে সেদিন ড্রিংক করলেন কেন বলতে পারেন ?
না।
না ? আপনি তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকদিন একটানা বাস করেছেন, তবু জানেন না তিনি হঠাৎ সেদিন কেন ড্রিংক করলেন ?
না।
আপনাকে তিনি কিছু বলেননি ?
না।
আপনি কিছু দেখেননি ?
না।
কিছু অনুমানও করেননি ?
না।
সেদিন মিঠুবাবুর সঙ্গে মিতালি দেবীর দেখা হয়েছিল, তা তো জানেন ?
জানি।
তাঁদের মধ্যে কী কথা হয় ?
আমি শুনিনি।
আপনি কি জানেন যে, মিতালি দেবীর মিঠুবাবুর প্রতি মনোভাব বদলে গিয়েছিল ?
না, আমি জানতাম না।
জানতাম না মানে তখন জানতেন না, কিন্তু এখন জানেন ?
এখনও জানি না।
এই জেরক্স কপিগুলো দেখুন তো। এ কি মিতালি দেবীর হাতের লেখা ?
হ্যাঁ।
কষ্ট করে একটু পড়বেন কি ? সবটা পড়ুন।
জয়িতা পড়ল। শবর দাশগুপ্ত ঈগলের চোখে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। পড়ার পর জয়িতার হাত থেকে কাগজগুলো ফেরত নিয়ে শবর তার ব্রিফকেস-এ ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, কিছু বুঝতে পারলেন ?
হ্যাঁ। মিতালিদি মিঠুদার প্রতি সফ্‌ট হয়ে পড়েছিল।
এগজ্যাক্টলি। আপনি কি জানেন যে ওর সেই সফ্‌টনেস এতটাই ছিল যে উনি মিঠু মিত্রকে ওঁর

যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির কাস্টোডিয়ান করে দিয়েছেন ?
জানি। মিঠুদা বলেছে।
জয়িতা দেবী, মিতালি দেবীকে কে খুন করেছে বলে আপনার মনে হয় ?
জানি না।
জানতে বলছি না। লজিক্যাল অনুমান বলে তো একটা ব্যাপার আছে।
আমি জানি না।
তা হলে ঘটনাগুলো একটু সাজিয়ে দিই। আপনার সুবিধে হবে। মিঠু মিত্র একজন বড়লোকের একমাত্র সন্তান মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে—যাকে বিয়ে করার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা তাঁর ছিল না। বরুণ ঘোষের বেনামা অ্যাকাউন্ট এবং সম্ভবত আরও দু-চারটি গুপ্ত খবর তিনি জানতেন। মে বি দেয়ার ওয়াজ এ টাচ অফ ব্ল্যাকমেল ইন দা ম্যারেজ। কিন্তু বিয়ে টিকল না। মিতালি দেবী ডিভোর্স করে আমেরিকায় চলে গেলেন। সুতরাং মিঠু মিত্রের তেমন লাভ হল না। কিন্তু কপালটা ভাল, তিনি আপনার সন্ধান পেয়ে গেলেন এবং একটা চমৎকার প্ল্যান করে রাখলেন। প্ল্যানটা অবশ্য একটু ফার ফেচেড, এটা আমি স্বীকার করছি। হয়তো প্ল্যান ওঁর ছিল না। কিন্তু সুযোগ এসে গেল। বরুণ ঘোষ মারা গেলেন এবং মিতালি দেবী দেশে ফিরলেন। দেখুন কীরকম গোল্ডেন অপরচুনিটি। মিতালিকে সরিয়ে দেওয়া গেলে দুটো কাজই হয়। এক, বহুকালের হারানো অপমানের শোধ নেওয়া এবং আপনাকে প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে দেওয়া। শুধু তাই-ই নয়, আমেরিকাতেও বেশ ভাল সম্পত্তি থাকায় তার ইনহেরিটর হিসেবে আপনার এবং আপনার হাজব্যান্ড হিসেবে ওঁরও ভবিষ্যতে আমেরিকায় যাওয়া এবং গ্রিন কার্ড পাওয়ার সম্ভাবনা খুলে দেওয়া। সুতরাং মিঠু মিত্র এই সুযোগ ছাড়লেন না। কিন্তু মুশকিল দেখা দিল মিঠুর প্রতি হঠাৎ মিতালির প্রেম। মিতালিকে খুন না করে, শুধু আবার বিয়ে করে ফেললেই মিঠু মিত্রের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যেত। কিন্তু আমার অনুমান, তিনি সত্যিই আপনাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাই মিতালিকে সরিয়ে দেওয়ার প্ল্যানেই স্টিক করে থাকতে হল। ওঁর কপাল সত্যিই তুলনাহীন। কারণ মিতালি দেবী মারা গেলেই যে আপনি ওঁর সম্পত্তি বা টাকা পয়সা হাতে পেতেন তা নয়। উত্তরাধিকার আইন কমপ্লিকেটেড এবং সাকসেশন সার্টিফিকেট পাওয়া সময়সাপেক্ষ। সেক্ষেত্রেও মিঠু কেল্লা মেরে দিলেন মিতালি ওঁকে কাস্টোডিয়ান করে দেওয়ায়। সুতরাং লজিক্যাল কনক্লুশনে যাওয়া কি খুব শক্ত বলে মনে হচ্ছে আপনার ? আপনি কাঁদছেন ? গুড। আশা করি মূল্যবান চোখের জলটা আপনি সমাজের একজন জঘন্য অপরাধী, একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনির জন্য অপব্যয় করছেন না ! এই কান্নাটা যদি অসহায় হতভাগিনী মিতালি দেবীর জন্য হয়ে থাকে তবে ইট ইজ মোস্ট ওয়েলকাম।
আমি আর পারছি না। আমাকে আজ ছেড়ে দিন।
জয়িতা দেবী, আর একটা ছোট্ট প্রসঙ্গ আছে। খুব অপ্রিয় প্রসঙ্গ। কিন্তু জরুরি। আপনি বরং টয়লেট থেকে ঘুরে আসুন। চোখেমুখে ভাল করে জলের ঝাপটা দেবেন, ইউ উইল ফিল গুড। যান।
জয়িতা গেল। অনেকটা সময় নিয়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিল। তারপর আয়নায় নিজের মুখখানার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। মাত্র কুড়ি বছরের জীবন তাকে কত কিছু শেখাচ্ছে।
বাইরের ঘরে এসে বসতেই শবর হাসল, এই তো বেশ নরম্যাল লাগছে আপনাকে। গুড। এবার সেই কথাটা।
বলুন।
আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে মিতালি দেবীকে খুনের পিছনে আপনারও একটা মোটিভ আছে ?
আমার ?
আরে না না, ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে সন্দেহ করছি না। কিন্তু কথাটা খুব সঙ্গত কারণেই উঠতে পারে।

আমি কেন খুন করব ?

করেনওনি। কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটর মে রেইজ এ কোশ্চেন। প্রশ্ন তুলতে পারে মিঠু মিত্রের উকিলও। সব দিক ভেবে রাখা ভাল।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনি মিঠুকে ভালবাসেন। ঠিক তো ?

হ্যাঁ।

ভালবাসার জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে, স্বীকার করেন ?

হ্যাঁ।

আপনি যখন মিতালি দেবীর বাড়িতে ছিলেন তখন নিশ্চয়ই আপনারা দুই বোন অনেক বিষয়ে কথা বলতেন।

হ্যাঁ। আমরা রাত দুটো তিনটে পর্যন্তও আড্ডা মারতাম।

গুড। কী বিষয়ে কথা হত আপনাদের ?

মোস্টলি আমেরিকা। ওখানকার লাইফ স্টাইল, লোনলিনেস, ঐশ্বর্য —এই সব নিয়ে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমেরিকা তো থার্ড ওয়ার্ল্ড পিপলের কাছে সবচেয়ে বেশি আলোচ্য বিষয় হবেই। খুব স্বাভাবিক। ধরুন প্রশ্ন উঠল যে, এইসব গল্পের ফাঁকে ফাঁকে মিতালি দেবী আপনাকে তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তনের কথাও জানিয়েছিলেন। তিনি যে আসলে মিঠুকে ভুলতে পারেননি এবং নতুন করে তাঁর প্রেমে পড়েছেন এবং রিকনসিলিয়েশনের চেষ্টা করছেন সেসব কথাও বলেছেন।

না, মিতালিদি বলেননি।

আহা, সে তো বটেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠলে কী করবেন ? বিশেষ করে প্রশ্নটা যদি হয় ভীষণ লজিক্যাল অ্যান্ড ডাউন টু আর্থ ? তাই বলছিলাম, এগুলোও ভেবে রাখা ভাল।

কী ভাবব ?

ধরুন উকিল আপনাকে বলল যে, মিতালি দেবীর হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা জানতে পেরে আপনি আপসেট হয়ে পড়েছিলেন অ্যান্ড ভেরি জেলাস। কারণ, আপনার বয়স মাত্র কুড়ি, আপনি অনভিজ্ঞ। হৃদয় জয়ের লড়াইতে আপনি মিতালি দেবীর সঙ্গে নাও পেরে উঠতে পারেন। জেলাসি ইজ এ ডেনজারাস থিং। তাই না ? তা ছাড়া ইনহেরিটেনসের প্রশ্ন তো আছেই। মিতালি মারা গেলে আপনি প্রচুর লাভবান হবেন। সুতরাং আপনি যদি মিতালি দেবীকে মেরে ফেলতে চান সেটাও অস্বাভাবিক বলে মনে করার কিছু নেই।

কী বলছেন আপনি ?

আহা, উত্তেজিত হবেন না। আমি শুধু আদালতের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আপনাকে অ্যালার্ট করছি। আচ্ছা, মিতালি দেবী তাঁর সেন্টের শিশিগুলো কোথায় রাখতেন আপনি জানেন ?

কেন জানব না ? ও অনেক পারফিউম এনেছিল। কিছু সুটকেসে ছিল, কয়েকটা বের করে ড্রেসিং টেবিলে রেখেছিল।

আপনি কি জানেন যে খুনি পালানোর সময় অনেকগুলো সেন্টের শিশি ভেঙে সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল, যাতে পুলিশ কুকুর গন্ধ না পায় ?

শুনেছি।

দ্যাটস গুড। ও বাড়ি থেকে আপনি ক'টার সময়ে চলে আসেন ?

রাত দশটা।

একাই ফিরেছিলেন ?

হ্যাঁ।

তখনও পার্টি চলছিল ?

হ্যাঁ।

আপনাকে চলে আসতে কে কে দেখেছে ?

জানি না। আমি কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে চলে আসি। পিছনের বাগানের রাস্তা দিয়ে।

সেদিন রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন ?

আমার ঘরে। আর কোথায় থাকব ?

হুঁ। বেশ গণ্ডগোলে ফেলে দিলেন।

কেন ?

আপনার কেসটা ফুলপ্রুফ নয়। এনিওয়ে, ফর দি টাইম বিয়িং আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। ধরুন খুনটা আপনি করেননি।

আমি করিনি। ছিঃ ছিঃ, এসব কী কথা বলুন তো!

ফের উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। আপনার যাতে বিপদ না হয় তা আমি দেখব। কিন্তু আমার কিছু তথ্য চাই।

কী তথ্য ?

মিঠু মিত্র কেমন লোক ?

ভীষণ ভাল।

ভেবে বলুন।

ওকে নিয়ে আমি সব সময়েই ভাবি।

আপনি ওঁর জন্য সব কিছু করতে পারেন ?

পারি।

ইভন এ মার্ডার ?

আমি খুন করিনি।

সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। কথাটার জবাব দিন।

আমি ওকে ভালবাসি, ওর জন্য সব ত্যাগ করতে পারি। এর বেশি জানি না।

কথাটা লজিক্যাল হল না। অথচ আপনি লজিক ভালই জানেন। আপনি ফিলজফির ছাত্রী।

আমার লজিক ওরকম নয়। মিঠুদা খুব ভাল জেনেই আমি ওকে ভালবাসি।

সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছেন। কারও সম্পর্কে আগ বাড়িয়ে ধারণা করাটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো। দুনিয়ায় এমন অনেক খুনি আছে যাদের পরম সাধুপুরুষ বলে মনে হয়। অ্যাপারেন্টলি।

আমি অত জানি না।

না জানাটা কাজের কথা নয়। শুনুন, আপনি যদি খুনটা নাও করে থাকেন তা হলেও আপনি খুনির সাহায্যকারী হিসেবে সন্দেহের পাত্রী হতে পারেন। কারণ আপনার অ্যালিবাই নড়বড়ে। কেউ আপনাকে ও বাড়ি থেকে চলে আসতে দেখেনি। ধরা যাক প্রশ্ন উঠল, আপনি সেদিন ও বাড়ি থেকে আসেননি। আপনি লুকিয়ে ছিলেন। রাত গভীর হলে মিঠু ফিরে আসে এবং আপনি তাকে বাড়িতে ঢুকতে সাহায্য করেন। তারপর মিঠু মিতালি দেবীকে খুন করে। আপনি তাকে সেন্টের শিশি দেন। বারান্দা থেকে আপনারা শিশিগুলো ভিতরে ছুড়ে ভেঙেছিলেন। তাতে আপনাদের গায়ে সুগন্ধ লাগতে পারেনি। আপনারা নিরাপদে পিছনের বাগানে নেমে পালিয়ে যান।

আমার মাথা ঘুরছে। প্লিজ, আর নয়।

আহা, এটা শুধু অনুমান। এটা একটা রিকনস্ট্রাকশন মাত্র। এরকম নাও হতে পারে।

তা হলে ?

আমার ধারণা খুনের সময় মিঠু একাই ছিল। ঠিক কি না ?

॥ ছয় ॥

আমাকে কেন টানা হ্যাঁচড়া করছেন ? যা হয়েছিল হয়েছিল। পাস্ট ইজ পাস্ট। মিতালির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

লেখাপড়া কতদূর ?

মাধ্যমিক।

তা হলে তো তোমাকে শিক্ষিতই বলতে হয়। পাশ করেছিলে ?
জি।
কোন ডিভিশনে ?
বললে বিশ্বাস করবেন ? বলে কী লাভ ?
শুনিই না।
ফার্স্ট ডিভিশনে।
বলো কী !
অঙ্কে আর ইতিহাসে লেটার ছিল।
উরেব্বাস।
জানতাম বিশ্বাস করবেন না। তবে সার্টিফিকেট আর মার্কশিট দুটোই আমার মায়ের কাছে আছে। মা ঠাকুরের আসনে তোশকের তলায় রেখে দিয়েছে।
পড়াশুনো আর এগোয়নি ?
না। পড়ে কী হবে ?
কলেজে ভর্তি হয়েছিলে ?
তাও হয়েছিলাম। তবে কন্টিনিউ করিনি।
কেন ?
পড়াশুনো ফালতু জিনিস। পড়ে উন্নতি করতে গেলে লোকে বুড়ো হয়ে যায়। অত সময় কি হাতে আছে ?
বটে ! তা তুমি কীসে উন্নতি করতে চেয়েছিলে ?
মাল-টাল বেচতাম।
কী মাল ?
সে সব স্যার, পুরনো কাসুন্দি। ও ঘেঁটে লাভ নেই। এই কেসটায় ঝুটমুট আমাকে ধরেছেন।
সেটা দেখা যাবে। মিতালিকে চিনতে ?
চিনব না কেন ? সে আমার বউ ছিল।
বিয়ে হয়েছিল ?
কালীঘাটে।
রেজিস্ট্রি হয়নি ?
না। ও তখন মাইনর ছিল।
তাও তো বটে। কতদিন একসঙ্গে ছিলে ?
পাঁচ ছয় মাস হবে।
তুমি ওকে মারধোর করতে ?
না। মারব কেন ? তখন আশনাই চলছিল।
আশনাই কেটে গেল কেন ?
মিতালিই বিগড়ে গেল। ওয়ান ফাইন মর্নিং ঘুম থেকে উঠে বলল, আমি ফিরে যাচ্ছি।
তুমি কী করলে ?
কী করব ! হাই তুলে পাশ ফিরে শুলাম।
আটকাবার চেষ্টা করলে না ?
কী লাভ ! ভদ্রলোকের মেয়ে, একটু টক-ঝালের খোঁজে এসেছিল। টেঁকার বিয়ে নয়, জানতাম।
তোমার জন্য ওর জীবনটা বরবাদ হয়ে গিয়েছিল, জানো ?
কেন স্যার, আমি কী করলাম ? আশনাই তো আমি একা করিনি। ওরও ভূমিকা ছিল।
কোথায় বাসা করে ছিলে ?
গোবিন্দপুর বস্তিতে।

পরে মিতালি দেবীর খোঁজ খবর করোনি ?
খোঁজার কী আছে স্যার ? পাড়ারই মেয়ে। সব খবরই পেতাম।
বটে ! মিতালি দেবীর যে বিয়ে হয়েছিল, উনি যে আমেরিকায় ছিলেন সব জানতে ?
ঘ্যাম মেয়ে। সব জানতাম।
তোমার হিংসে হত না ?
না স্যার। হিংসে-ফিংসে হয়নি। ওসব মেয়ে কি আমার মতো লোকের জন্য ? শখ হয়েছিল, তাই কেটে এসেছিল। তারপর শখ মিটে গেলে কেটে গেল।
মিতালি যে আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছিল তা জানতে ?
কেন জানব না ? বরুণবাবু মারা গেলেন তাও জানি।
তুমি কী করো ? চাকরি ?
কিছুদিন করেছিলাম। ব্যাঙ্কে ধোয়ামোছার কাজ। ক্যাজুয়াল স্টাফ। পোষাল না। ধূপকাঠি, লজেন্স, গেঞ্জি-আন্ডারওয়্যার এসবও বেচেছি। কিন্তু সৎপথে কিছু হল না। এখন টুকটাক করি আর কী।
অসৎ পথে ?
পুলিশ সব জানে স্যার। নতুন কিছু নয়।
মিতালি দেবীর সঙ্গে এবার তোমার দেখা হয়েছিল ?
হাসালেন স্যার। মিতালি আমাকে পাত্তা দেবে কেন ? পাস্ট ইজ পাস্ট।
মিঠু মিত্রকে চেনো ?
মিতালির হাজব্যান্ড তো ! চিনি স্যার।
কীরকম চেনো ?
খুব ভাল লোক স্যার। ট্যাক্সির জন্য লোনটা তো উনিই বের করে দিয়েছিলেন ?
তোমার ট্যাক্সিও আছে নাকি ?
ছিল স্যার। গত মাসে বেচে দিয়েছি।
মিঠু মিত্র তোমাকে চিনত ? মানে তোমার সঙ্গেই যে মিতালি পালিয়ে গিয়েছিল তা জানত ?
কেন জানবেন না ?
জেনেও তোমাকে হেলপ করেছেন ?
হ্যাঁ, জেনেই করেছেন। মিতালি তো দুজনের কাছ থেকেই ভেগেছে স্যার। আমরা লড়ে কী করব ?
মিঠু মিত্র তা হলে তোমার মতে ভাল লোক ?
জি।
তুমি জি বলছ কেন ?
হিন্দি ছবিতে বলে, তাই এসে যায়।
ধরো যদি তোমাকে বলি, মিঠু মিত্র কোনও কাজ করতে বললে তুমি করবে ?
করব স্যার।
যদি একটা খারাপ কাজ করতে বলে ?
খারাপ নানা রকমের হয়। ভদ্রলোকের চোখে খারাপ, পুলিশের চোখে খারাপ, কেরানির চোখে খারাপ। সব খারাপই তো একরকম নয় স্যার। ওজন করে দেখতে হবে।
তুমি তো ফিলজফার দেখছি।
জি।
পড়াশুনো করলে উন্নতি করতে পারতে।
পাস্ট ইজ পাস্ট। ছেড়ে দিন।
ছাড়লাম। নিশ্চয়ই জান যে, মিতালি দেবী খুন হয়েছে।
জানি। স্যাড কেস।

কীভাবে জানলে ?

সবাই জানে। আমার না জানার কী ?

ঠিক কথা। কীভাবে খুন হয় ?

স্ট্যাবিং।

আচ্ছা, তুমি যখন মিতালিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে তখন বরুণ ঘোষ কি পুলিশে রিপোর্ট করেছিলেন ?

হ্যাঁ স্যার।

পুলিশ তোমাকে অ্যারেস্ট করেছিল ?

করেছিল। মিতালি চলে আসার পর।

তোমার কি জেল হয়েছিল ?

না। জামিন পেয়েছিলাম। পুলিশ কেসটা পারস্যু করেনি।

কেন করেনি ?

বরুণবাবু বোধহয় পাবলিসিটির ভয়ে পিছিয়ে যান।

পুলিশ তোমাকে মারধোর করেছিল ?

জি।

তোমার রাগ হয়নি ?

না স্যার। কার ওপর রাগ করব ? আমাদের লাইফটাই এরকম।

মিঠু মিত্রের সঙ্গে তোমার দোস্তি কীভাবে হয়েছিল ?

ঠিক মনে নেই।

একটু ভেবে বলো। ব্যাপারটা জরুরি।

যতদূর মনে আছে উনি আমাকে খুঁজে বের করেছিলেন।

সেটা কি ওঁদের বিয়ের আগে, না পরে ?

বিয়ের পর।

কতদিন পর ?

মিতালি ওকে ছেড়ে চলে আসার পর।

মিঠু মিত্র তোমাকে খুঁজে বের করেছিলেন কেন ?

ওর একটা রং আইডিয়া ছিল।

কীবকম ?

উনি ভেবেছিলেন আমি মিতালিকে পিছন থেকে ফুসলাচ্ছি, তাই মিতালি ওঁর সঙ্গে থাকতে চায় না।

উনি কি তোমাকে থ্রেট করেছিলেন ?

না স্যার।

তা হলে ?

উনি আমাকে খুব ঠেঙিয়েছিলেন।

বলো কী ? তোমার গায়ে হাত ! তুমি তো মস্তান !

জি। তবে বাবারও বাবা থাকে কিনা। উনি তখন রেগে বয়লার হয়ে গিয়েছিলেন।

তুমি উল্টে মারোনি ?

ক্যারাটে কুংফুর সঙ্গে কি পারা যায় ?

তোমার দলবল ?

দু-চারজন দোস্ত একটু হাত-পা চালিয়েছিল। সুবিধে হয়নি।

তারপর ?

তারপর উনি ভুল বুঝতে পারেন।

তারপরই দোস্তিটা হয়ে গেল ?

অনেকটা সেরকমই। একটু সময় লেগেছিল।

দোস্তিটা কি এখনও আছে ?

একটু আছে। দেখা হলে উইশ করি।

মিঠুর সঙ্গে লাস্ট কবে তোমার দেখা হয়েছে ?

ঠিক মনে নেই।

ভেবে বলো।

ওইরকমই সময়েই হবে।

কোনরকম সময়ে ?

. মিতালির মার্ডারের দিনের কাছাকাছি।

নাকি ওই দিনই ?

তাও হতে পারে।

কখন দেখা হয়েছিল ?

বিকেলের দিকে।

কীভাবে ?

আমি মন্টুর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। উনি মোটরবাইকে করে চলে যাচ্ছিলেন।

তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল কি সেদিন ?

না। উনি দেখতে পাননি আমাকে।

তুমি তো নিশ্চয়ই জানো যে, মার্ডারটা হয়েছিল দোতলায়, মিতালি দেবীর শোয়ার ঘরে। রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে।

জি। সব জানি। খবরের কাগজে পড়েছি।

এ পাড়ায় নাইট গার্ডরা রাতে পাহারা দেয়।

জি। আমিও দিই। বহুত চোর ছ্যাঁচড় চারদিকে।

সেই রাতে তোমারও কি ডিউটি ছিল ?

না স্যার। আমাদের মাসে দু' দিন টার্ম আসে। তবে নাইট গার্ডরা সেদিন রাতে কোনও কিছু সন্দেহজনক দেখেনি।

তুমি সেদিন কোথায় ছিলে ?

ঘরেই ছিলাম।

তোমার কোনও গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে ?

ওরকমই ধরে নিন।

তদন্তে কিন্তু তাকেও দরকার হতে পারে। তার নাম ঠিকানা বলো।

ঠিকানা-ফিকানা জানি না স্যার। নাম বলেছিল রীতা দাস।

কীরকম মেয়ে ? প্রস্টিটিউট না কল গার্ল ?

একটু অন্যরকম।

কীরকম ?

একটু হায়ার ক্লাসের।

তোমরা কোথায় ছিলে ?

পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাড়ির পিছন দিকে আমার ঠেক। সেখানেই ছিলাম।

মেয়েটা কোথায় ?

নেই। পরদিন সকালে উঠে দেখি, হাওয়া।

হাওয়া ? তোমাকে বলে যায়নি ?

না স্যার। রাত্তিরে আমার ঘুমটা একটু গাঢ় হয়। টের পাইনি।

তার সঙ্গে কবে তোমার প্রথম দেখা হয় ?

দু' দিন আগে।

কীরকম ভাবে দেখা হয়েছিল ?
আমি একটু আধটু ড্রিংক করি। একটা দিশি মদের আস্তানায়। সেখানেই।
কে আলাপ করেছিল ? তুমি না ও ?
মেয়েটাই।
বারটা কোথায় ?
বার নয় স্যার, ঠেক। কাছেই, ভবানীপুরে।
তাকে আগে কখনও দেখেছ ?
না।
একটু ছোটখাটো ছিপছিপে চেহারা কি ?
হ্যাঁ। আপনি চেনেন স্যার ?
চিনি বলেই মনে হচ্ছে। এবার খুব ভাল করে ভেবে জবাব দাও। সেদিন— অর্থাৎ মিতালি দেবীর খুনের দিন তুমি কখন ড্রিংক করতে শুরু করেছিলে ?
রাত আটটার পরই সাধারণত আমি খাই।
ঘরে বসে খাচ্ছিলে ?
হ্যাঁ।
মেয়েটাও খাচ্ছিল কি ?
একটু আধটু।
কখন শুতে গিয়েছিলে ?
ঘড়ি দেখিনি। তবে সেদিন মালটা বেশি টেনে ফেলেছিলাম স্যার।
সময়টা বলতে পারবে না ?
বোধহয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রীতা একটা পাঞ্চ তৈরি করেছিল। দারুণ জিনিস।
পাঞ্চ ?
হ্যাঁ। দু' তিনরকম মদ মিশিয়ে।

* * *

যে লোকটা দরজা খুলল সে একজন চিনেম্যান চেহারার লোক। বেশ স্বাস্থ্যবান। শবর তার দিকে দু' সেকেন্ড চেয়ে রইল।
হু ডু ইয়া ওয়ান্ট ?
এটা কি তোমার ঘর ?
অফ কোর্স।
এখানে রীতা দাস বলে কেউ থাকে ?
নো। আই লিভ অ্যালোন।
জুলেখা শর্মা বলে কেউ ?
নো। হু দি হেল আর ইউ ?
পুলিশ ইন্টেলিজেন্স।
মাই গড ! কাম ইন।
ঘরে ঢুকে শবর চারদিকে চেয়ে দেখে নিল। বোর্ডিং হাউসের ঘর যেমন হয় তেমনই। দশ বাই বারো মাপেরই হবে। দেয়ালে খুব চড়া রঙের ওয়ালপেপার লাগানো। একটা সরু খাট, টেবিলের ওপর একটা স্টিরিওতে মাইকেল জ্যাকসনের ক্যাসেট বাজছে, একটা ওয়ার্ডরোব এবং নিত্য ব্যবহার্য কিছু জিনিস। একটা লোহার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে লোকটা বলল, প্লিজ সিট ডাউন।
তোমার বয়স কত ?

থার্টি সিক্স।
ম্যারেড?
নট ইয়েট। নো মানি টু ম্যারি।
কী করো?
এলিট সিনেমার গলিতে আমার ব্যাগ তৈরির কারখানা আছে। এ ভেরি স্মল এন্টারপ্রাইজ।
তুমি ইন্ডিয়ান সিটিজেন?
অফ কোর্স!
এ ঘরে কত দিন আছ?
লাস্ট টেন ইয়ার্স।
রীতা দাস বা জুলেখা শর্মা নামের কোনও মেয়েকে চেনো?
না।
এ ঘরে কোনও মেয়ে আসে?
না না। ওসব এখানে হয় না।
তা হলে কোথায় হয়?
ইফ আই নিড এ গার্ল আই গো টু হার।
থ্যাংক ইউ।

* * *

আপনার নাম?
সুনীতা রায়।
আপনি এই স্কুলের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর?
হ্যাঁ।
কতদিন এখানে কাজ করছেন?
এগারো বছরেরও বেশি।
জুলেখা শর্মা বলে কেউ এখানে কাজ করে না বলছেন?
না। কোনওদিন নয়।
ছোটখাটো ছিপছিপে চেহারা, পুলিশ অফিসারের নাতনি।
না। এরকম কেউ এখানে কাজ করে না।
আপনাদের সব স্টাফ আজ উপস্থিত আছেন কি?
হ্যাঁ। ফুল স্টাফ।
আমি তাঁদের দেখতে পারি কি?
পারেন। তবে অনেকে এখন ক্লাসে আছেন।
আমি অপেক্ষা করব।
ও.কে.।

* * *

নমস্কার জয়িতা দেবী!
নমস্কার।
আমাকে দেখে আপনি বোধহয় খুশি হননি! পুলিশের দুর্ভাগ্য, তাদের দেখে কেউ খুশি হয় না।
না না, আপনি তো আপনার কাজ করছেন। বসুন।
আজ খুব বেশি জেরা করার নেই। শুধু দু' একটা প্রশ্ন।

বলুন।
মিতালি দেবীর ঘর থেকে খুনের রাতে কিছু জিনিস খোয়া যায়।
জানি। শুনেছি।
অনেক সময়ে খুনি তার মোটিভ ঢাকতে চুরিটা সাজিয়ে নেয়। আমাদের অ্যাঙ্গেল অফ এনকোয়ারিতে তাই আমরা চুরিটাকে গুরুত্ব দিইনি। উনি কলকাতা কাস্টমসে যে ডিক্লেয়ারেশন দিয়েছিলেন তাতে দেখছি উনি সঙ্গে মাত্র দুশো ডলার এনেছিলেন। একটা হার আর বালা ছাড়া সোনাদানাও বিশেষ ছিল না। ওঁর সব গয়না আমেরিকায় এবং কলকাতায় ব্যাঙ্কের লকারে আছে। সুতরাং চুরির পরিমাণ বেশি নয়। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন ?
পারি। মিতালিদির হ্যান্ডব্যাগে দশ হাজার ডলার ছিল।
দশ হাজার ? বলেন কী ?
টাকাটা উনি আমাকে দেখিয়েছিলেন।
সেই হ্যান্ডব্যাগটায় আর কী ছিল ?
কয়েকটা গয়না।
অত ডলার উনি এনেছিলেন কেন জানেন ? বিশেষ করে যখন এখানেও ব্যাঙ্কে ওঁর প্রচুর টাকা রয়েছে ?
জানি। মিতালিদি একটু অগোছালো টাইপের। একটু আনমনাও। ভারতবর্ষে আসার সময়ে, প্লেন ধরার আগে বাড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তে ও দেখতে পায়, বিছানায় বালিশের তলায় ডলারের গোছাটা পড়ে আছে। টাকাটা ফেলে এলে চুরি যাওয়ার ভয় ছিল। তাই তাড়াতাড়িতে হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়। হ্যান্ডব্যাগটা কি চুরি গেছে ?
না। তবে ডলার আর গয়না চুরি হয়েছে।
ইস, অনেক টাকা, না ?
হ্যাঁ। চুরির অ্যাঙ্গলটাকে আমরা এখন একটু গুরুত্ব দিচ্ছি। আপনার কি মনে পড়ে, মিতালি দেবী দেশে আসার পর কোনও মেয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি না ?
অনেক মেয়ে এসেছিল। ওর বান্ধবীরা। রোজই তো আসত।
তাদের কথা বলছি না। বান্ধবী নয় এমন কেউ ?
আমি তো সবসময়ে বাড়িতে থাকতাম না।
ছোটখাটো ছিপছিপে চেহারার একটি মেয়ে ? মাজা রং ?
মনে পড়ছে না।
ভাল করে ভাবুন।
জয়িতা ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, না। তবে—
তবে ?
একদিন একটা ফোন এসেছিল।
হ্যাঁ বলুন।
ফোনটা করেছিল একটা মেয়ে। আমিই ফোন ধরেছিলাম। মিতালিদিকে চাইছিল বলে আমি ওকেই ফোনটা দিই। অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। মিতালিদি ফোনটার পর খুব রেগে গিয়েছিল। আমাকে বলল, কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার বল তো! এ তো ব্ল্যাকমেল!
বটে ? আপনি জানতে চাননি কে ফোনটা করেছিল ?
চেয়েছিলাম। মিতালিদি বলল, একটা বাজে মেয়ে। চিনি না। খারাপ খারাপ কথা বলছিল।
ব্যস! আর কিছু নয় ?
না। ব্যাপারটা মিতালিদি তেমন পাত্তা দিল না। তবে খুব রেগে গিয়েছিল, এটা মনে আছে।

॥ সাত ॥

নমস্কার।

মিঠু খুব ধীরে তার বিষণ্ণ মুখখানা তুলল ব্যাঙ্ক এখন ফাঁকা। বেলা তিনটে বেজে গেছে। টেবিলের ওপাশে শবর দাঁড়িয়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিঠু বলল, বসুন।

শবর বসল।

কেমন আছেন ?

মিঠু মৃদু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আছি।

আজ ঠিক জেরা করতে আসিনি।

তা হলে কি অ্যারেস্ট করতে ?

এখনই নয়। আমি আরলি অ্যারেস্টে বিশ্বাসী নই। বরং সন্দেহভাজনকে নড়াচড়া করতে দিলে এবং নজর রাখলে ভাল কাজ হয়।

তাই বুঝি। বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্য।

আমার জন্য নয়, দেশ ও দশের জন্য। আমার একটা ইনফর্মেশন চাই।

কীসের ইনফর্মেশন ?

রিগার্ডিং বরুণ ঘোষ।

অনেক কথাই তো হয়েছে।

মাথা নেড়ে বলল, তা হলেও অনেক কিছু জানা যায়নি।

কী জানতে চান ?

গত দু' তিন বছর ধরে ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে উইথড্রয়ালের পরিমাণ হঠাৎ অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল কি না।

ওঁর অ্যাকাউন্ট চেক না করে তো বলা যাবে না।

চেক করুন।

করছি। আর কিছু ?

হ্যাঁ। উনি কেমন লোক ছিলেন ?

সে কথা তো বলেইছি।

লোনলি, উইডোয়ার, মিডল এজেড ?

হ্যাঁ।

শবর একটু হাসল। তারপর বলল, যতদূর জানি মিতালি দেবীর দু' বছর বয়সের সময় বরুণবাবুর স্ত্রী মারা যান।

হ্যাঁ।

তখন ওঁর দ্বিতীয়বার বিয়ে করার বয়স ছিল।

হ্যাঁ।

উনি মারা গেছেন চুয়ান্ন বছর বয়সে।

তা হবে।

বয়সটা খুব বেশি নয়, কী বলেন ?

আপনি একটা কিছু ইঙ্গিত করতে চাইছেন।

হ্যাঁ। বুঝতে পারছেন কি ?

না। আন্দাজ করছি।

তা হলে স্পষ্ট করেই বলি। ওয়াজ দেয়ার এ উওম্যান সামহোয়ার ?

আমি ঠিক জানি না।

একটু ভাবুন। আপনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। আপনি তাঁর অ্যাকাউন্ট হ্যান্ডেল

করেছেন।
মিঠু ভ্রূ কুঁচকে খানিকটা চুপ করে রইল।
শবর বলল, বলতে আপনার রুচিতে বাধছে কি ?
তা নয়।
তা হলে ?
এটুকু বলতে পারি যে, সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
আচ্ছা, উনি কি সবসময়ে নিজেই টাকা তুলতে আসতেন ?
না। মাঝে মাঝে ওঁর রান্নার লোক হরেন বা ড্রাইভারও আসত।
আর কেউ ?
ন্‌না।
দেখুন, কেসটা সিরিয়াস একটা টার্ন নিচ্ছে। এ সময়ে দ্বিধা করলে আমরা মুশকিলে পড়ব। ভাল করে ভেবে দেখুন।
দেখুন, বেয়ারার চেক তো যে-কাউকেই দেওয়া যায়। উনি অনেককেই হয়তো চেক পেমেন্ট করতেন। সব মনে রাখা কি সম্ভব ?
না। তবু কোনও অস্বাভাবিকতা ঘটে থাকলে সেটা মনে থাকতে পারে।
কিছু মনে পড়ছে না।
আচ্ছা, উনি কি অনেককেই চেক পেমেন্ট করতেন ?
যতদূর মনে আছে, না।
ওঁর আরও তিনটে ফিকটিশাস অ্যাকাউন্ট আছে।
সে তো আপনি জানেন।
এই তিনটে অ্যাকাউন্ট থেকে উনি টাকা তুলতেন কি ?
খুব কম।
মনে করে দেখুন তো, কখনও এ তিনটের কোনও একটা থেকে এমন কেউ টাকা তুলতে এসেছেন কি না, যে একটি মেয়ে, যার বয়স এখন বত্রিশ-তেত্রিশ, ছিপছিপে, ছোটখাটো, আন ইমপ্রেসিভ চেহারা ?
মিঠু একটু হাসল।
হাসলেন যে !
এই বিবরণটা আপনি আর একজনকেও দিয়েছেন।
হ্যাঁ। জয়িতা দেবীকে।
মনে পড়ছে না।
শুনুন মিঠুবাবু, মানুষের ব্রেন একটা অনন্ত স্টোরহাউস। তাতে সব জমা থাকে। ব্রেনটা একটু ট্যাপ করুন। চোখ বুজে মেডিটেট করুন।
মিঠু অসহায়ভাবে বলল, তার চেয়ে কম্পিউটারের শরণাপন্ন হওয়াই বোধহয় ভাল।
গুড আইডিয়া। কম্পিউটার অবশ্য কোনও মুখশ্রী দেখাবে না। তবু ইট মে হেল্প টু রিমেম্বার।
টেবিলের একধারে রাখা মনিটরটা চালু করে কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে দেখল মিঠু। তারপর বলল, পিনাকী শর্মার অ্যাকাউন্ট থেকে রেগুলার উইথড্রয়াল হয়েছে।
অ্যামাউন্টটা ?
প্রতি মাসে তিন হাজার।
সেল্‌ফ চেক ?
হ্যাঁ, উনি আমেরিকায় যাওয়ার আগে একটা বড় উইথড্রয়াল দেখছি।
কত ?
ছত্রিশ হাজার।
কী মনে হয় ?

বুঝতে পারছি না।
টাকাটা উনি কাকে দিতেন ?
আপনি যা সাজেস্ট করছেন তা মেনে নিতে পারলে ভাল হত হয়তো। কিন্তু—
মনে পড়ছে না তো ?
না।
তা হলে আমি একটু সাজিয়ে দিই। বিয়িং এ উইডোয়ার উনি একটা শুকনো জীবন কাটাতেন। মেয়েটাকে মানুষ করতে হবে বলে এবং সৎ মায়ের ভয়ে বিয়েও করেননি। কিন্তু লাইফ হ্যাজ ইটস ডিম্যান্ড। সুতরাং একটু বেশি বয়সে, ধরুন লেট ফর্টিজ-এ উনি একজন কাউকে পিক আপ করেন। তাকে কখনও নিজের বাড়িতে জায়গা দেননি। কিন্তু রেগুলার তাকে ভিজিট করতেন। মাসে মাসে তাকে মাসোহারা দিতে হত। পিনাকী শর্মা নামটাই হয়তো মেয়েটাকে বলেছেন। মেয়েটাও এক জায়গায় নিজেকে জুলেখা শর্মা বলে পরিচয় দিয়েছিল।
এরকম হতেই পারে।
খুব নির্দোষ ব্যাপার বলছেন ?
তা বলিনি। তবে সারকামস্ট্যান্সেস মে কমপেল এ ম্যান—
হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক কথা। চেকগুলো কি সবই সেল্‌ফ চেক ?
দেখতে হবে।
দেখুন। তবে তাড়া নেই। মেয়েটাকে খুঁজে বের করাই এখন প্রথম কাজ।

* * *

হরেনবাবু, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।
যে আজ্ঞে। বলুন।
আপনি কতদিন বরুণবাবুর বাড়িতে কাজ করছেন ?
তা পনেরো-ষোলো বছর হবে।
যখন আপনি কাজে ঢোকেন তখন তো বরুণবাবুর স্ত্রী বেঁচে নেই ?
আজ্ঞে না। তার কয়েকবছর আগেই মারা যান।
একটা কথার জবাব ভেবেচিন্তে দিন। বরুণবাবুর চরিত্র কেমন ছিল ?
আজ্ঞে, ভালই। চমৎকার মানুষ ছিলেন।
কিন্তু আমরা জানি গত কয়েক বছর হল বরুণবাবুর সঙ্গে একটি মেয়ের ঘনিষ্ঠতা হয়। মেয়েটিকে আপনি কখনও দেখেছেন ?
আজ্ঞে না।
আরও স্পষ্ট করে বলি, মেয়েটিকে বরুণবাবু এ বাড়িতে কখনও আনতেন না। হয়তো নিজের আসল পরিচয়ও দেননি। কিন্তু তিনি মেয়েটির কাছে যেতেন। আপনার কি মনে পড়ে গত কয়েক বছর যাবৎ বরুণবাবু মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটাতেন কি না।
তা কাটাতেন।
গত ক' বছর ধরে ?
হিসেব করিনি। সাত-আট বছর ধরে হবে।
এবার খুব হিসেব করে জবাব দেবেন। মেয়েটি ছোটখাটো চেহারার, মাজা রং, ছিপছিপে, কিন্তু রুগ্‌ণ নয়। মেয়েটি কখনও রীতা দাস, কখনও জুলেখা শর্মা নামে পরিচয় দেয়।
নাম জানি না, তবে আপনি যেমন বলছেন তেমন একটা মেয়ে বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিল।
কবে ?
বাবু আমেরিকা যাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে। দিদিমণি চলে যাওয়ার পর এ বাড়িতে

মেয়েছেলে বড় একটা আসে না। তাই এ মেয়েটিকে দেখে একটু ধন্দ লেগেছিল।

কেন এসেছিল ?

তা জানি না। বাবুর খোঁজ করাতে আমি তাকে ঘরে বসিয়ে বাবুকে খবর দিই।

ওঁদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল জানেন ?

না। তবে বাবু যে মেয়েটিকে দেখে রেগে গিয়েছিলেন তা দূর থেকেও চেঁচামেচি শুনে বুঝেছি। বলতে ভুলে গেছি, মেয়েটার সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলেও ছিল।

ছেলে! কত বড় ছেলে ?

চার-পাঁচ বছর হবে।

বরুণবাবু চেঁচিয়ে কী বলেছিলেন মেয়েটাকে ?

একটা দুটো কথা শুনেছি। একবার বললেন, এখানে আসার দরকার ছিল না। আর একবার যেন বললেন, টাকা কি গাছে ধরে ?

আর কিছু শোনেননি ?

না।

মেয়েটাকে আর কখনও দেখেছেন ?

হ্যাঁ।

কবে এবং কোথায় ?

দিদিমণি যেদিন খুন হন তার দুদিন আগে।

কোথায় ?

ফটকের বাইরে।

কী করছিল ?

চেয়ে ছিল। আমি বাজারে বেরোনোর সময়ে মুখোমুখি পড়ে যাই। কী চায় জিজ্ঞেস করায় বলল, কাজ খুঁজছে। আগে একবার দেখেছিলাম, তাই চেনা-চেনা ঠেকছিল।

সঙ্গে ছেলেটা ছিল ?

না।

কীরকম কাজ খুঁজছে বলল ?

সে কথা আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল গভর্নেস বা আয়া। আমি বললাম এখানে হবে না। তখন চলে গেল। চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ বাদে কোথায় দেখেছি, কোথায় দেখেছি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল যে এই মেয়েটাই বাবুর কাছে একবার এসেছিল।

এ বাড়িতে সে ঢোকেনি, ঠিক জানেন ?

না।

মিতালি দেবীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেনি ?

আমার তো চোখে পড়েনি। তবে আমাকে তো বাজার হাট রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। নয়নের মা বলতে পারবে হয়তো।

সে কে ?

কাজের মেয়ে। ডেকে দিচ্ছি।

নয়নের মা রোগা, কালো, মধ্যবয়স্কা। খুব পান খায়। সব শুনে-টুনে বলল, এসেছিল।

কবে ?

ওই সব্বোনেশে ব্যাপার যেদিন হয় তার আগের দিন দুপুরে। দিদিমণি তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল ?

না। মেয়েটা নীচের ঘরে বসেছিল। দিদিমণি নেমে এসে দেখা করলেন। দু-চারটে কথার পরই ওপর থেকে শুনলাম দিদিমণি চিৎকার করে উঠলেন, বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও।

আপনি চেঁচামেচি শুনে নেমে এলেন না ?

না। ঝাড়পোঁছ করছিলাম। ভাবলাম সাহায্য-টাহায্য চাইতে এসেছে। কত লোকই তো আসে।

দিদিমণি কিছু বলেছিলেন আপনাকে ?

না। একটু থমথমে মুখ করে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে গেল।

আর কিছু মনে পড়ছে ?

না।

মেয়েটা ধমক খেয়ে উল্টে কিছু বলেছিল ?

না। আমি দোতলা থেকে দেখলাম গটগট করে বেরিয়ে গেল।

পোশাকটা মনে আছে ?

সাদা চুড়িদার।

* * *

আই অ্যাম ডিস্টার্বিং ইউ। কিন্তু কেসটা সিরিয়াস। কাজেই—

ইটস ও.কে. অফিসার। হাউ ক্যান উই হেল্‌প ইউ ?

আমি একটি ছেলের সন্ধান করছি। এখন তার বয়স হবে ছয়-সাত। নাম জানি না। কিন্তু পদবিটা শর্মা হলেও হতে পারে। বাবার নামও জানি না। তবে দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি যে, বাবার নাম পিনাকী শর্মা। আপনাদের রেকর্ডটা কনসাল্ট করবেন ?

নো প্রবলেম। আপনি বসুন, আমি আসছি।

হেড মিস্ট্রেস উঠে গেলেন। শবর বসে রইল। অন্ধকারে ঢিল ছোড়া। তবু লেগেও যায় অনেক সময়ে। মেরিজ স্কুল নামটা যখন জুলেখার মুখে এসেছে তখন হলেও হতে পারে, ওর ছেলে এই স্কুলে পড়ে।

হেড মিস্ট্রেস পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। মুখে একটু উদ্বেগ।

ইয়েস অফিসার, ক্লাস টু-তে দুজন শর্মা আছে। টুইন ব্রাদার্স। কিন্তু ওদের বাবার নাম সুজিত শর্মা, এ মার্চেন্ট। মিস্টার শর্মা পেরেন্টস মিটিং-এ আসেন, আমরা তাঁকে চিনি।

শবর মাথা নেড়ে বলল, না, এরা নয়।

দেন উই আর সরি।

শবর উঠতে যাচ্ছিল। তারপর মাথায় বজ্রাঘাতের মতো একটা কিছু চমকে গেল তার। কী বোকা সে !

ম্যাডাম।

ইয়েস অফিসার।

আই অ্যাম মেকিং এ মেস অফ থিংস। কিন্তু দয়া করে আমাকে আর একটা ইনফর্মেশন দিন।

বলুন।

ছেলেটার পদবি সম্ভবত ঘোষ। বাবার নাম বরুণ ঘোষ।

নিশ্চয়ই। বসুন, আমি চেক করে আসছি।

পনেরো মিনিট যেন পনেরো ঘণ্টার মতো কাটল। হেড মিস্ট্রেস ফিরে এলেন।

ইয়েস অফিসার। হি ইজ ইন ক্লাস টু। প্রীতীশ ঘোষ। বাবা বরুণ ঘোষ, মা দোয়েল ঘোষ। ঠিকানা টুয়েন্টি এ বাই সিক্স হরিশ চ্যাটার্জি বাই লেন।

শবর চিরকুটটা পকেটে রেখে বলল, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম।

ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম।

* * *

দরজা খুলল সেই মেয়েটাই। তাকে দেখে একটুও চমকাল না। চোখে চোখ রেখে একটু চেয়ে রইল। তারপর দরজাটা ছেড়ে দিয়ে বলল, আসুন।

চিনতে পারছেন ?

পারছি। জানতাম আপনি আসবেন।

গলির মধ্যে একটা পুরনো বাড়ির একতলার ছোট্ট বাসা। ভিতরটা অপরিচ্ছন্ন নয়। বরং বেশ তকতকে ঝকঝকে। একটা ডিভান আছে, দুটো বেতের চেয়ার, কাচের শো-কেস-এর ওপর একটা রঙিন টিভিও। পাশে ভি সি আর। এটা স্পষ্টতই বাইরের ঘর। ভিতরে একখানা শোয়ার ঘরও আছে। শবর বেতের চেয়ারটায় বসল।

জুলেখা পর্দা সরিয়ে ভিতরে গেল। দু মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল।

বসুন। কথা আছে।

জুলেখা ওরফে রীতা ওরফে দোয়েল ডিভানটায় বসল। একটু জড়োসড়ো।

আপনার আসল নামটা কী ?

দোয়েল।

বরুণ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় কবে হয়েছিল ?

প্রায় নয় বছর আগে। উনি নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলেন একটা চেক আপের জন্য। ব্রংকিয়াল কারসিনোমা সাসপেক্টেড। খুব অসুস্থ ছিলেন। আমি তখন ওখানে আয়া ছিলাম।

তখনই ঘনিষ্ঠতা হয় ?

হ্যাঁ। উনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন, আমিও ওঁকে।

অ্যান্ড দ্যাটস দ্যাট ?

তখন আমার বয়স চব্বিশ-টব্বিশ। ওঁর মিড ফর্টিজ। উইডোয়ার। উই ফেল্ট ফর ইচ আদার।

তারপর ?

উনি ভাল হয়ে গেলেন। ক্যানসার হয়নি।

তখন ওঁর মেয়ের বিয়ে কি হয়ে গেছে ?

অসুখের পরই মেয়ের বিয়ে হয়, ডিভোর্স হয়, মেয়ে চলে যায় আমেরিকায়। তখন ভীষণ লোনলি। আমাকে ওঁর খুব দরকার হত।

বন্দোবস্তটা কীরকম ছিল ?

উনি এ বাড়ির এই অংশটা লিজ নিয়েছিলেন আমার নামে। দশ বছরের লিজ। মাসে মাসে দু হাজার টাকা মাসোহারা দিতেন।

এখানেই আপনাদের দেখাসাক্ষাৎ হত ?

হ্যাঁ।

এর আগে আপনি কোথায় থাকতেন ?

আমার মায়ের সঙ্গে, মোমিনপুরে।

আপনার মা এখনও সেখানে আছেন ?

না। মারা গেছেন।

সেই বাড়িটা ?

ওটা ভাড়া বাড়ি। আমার দাদা থাকে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।

আপনি ইংরিজি বলা কোথায় শিখলেন ?

স্কুলে। বাবা যখন বেঁচে ছিলেন আমাদের অবস্থা ভাল ছিল। বাবা চাকরি করতেন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে। তিনি মারা যাওয়ার পর আমরা ভীষণ খারাপ অবস্থায় পড়ি। পড়াশুনো ছাড়তে হয়, চাকরি নিতে হয়। তাও আয়ার চাকরি এবং ক্যাজুয়াল। দাদা বাড়ি থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। তারও অবশ্য অবস্থা খারাপ ছিল।

বরুণবাবুকে আপনি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ?

বহুবার।

বিয়ে হল না কেন ?

উনি লোকনিন্দার ভয় পেতেন। একবার রাজি হতেন, আবার নানা টালবাহানা করে পিছিয়ে যেতেন।

বিয়ে না করেই সন্তান হল ?

হ্যাঁ। উনি অ্যাবোরশন করাতে চেয়েছিলেন। আমি রাজি হইনি। ভেবেছিলাম বাচ্চা হলে হয়তো বিয়েতে রাজি করাতে পারব।

উনি রাজি হননি ?

না। ওই তো বললাম, খুব দোনোমোনো করতেন। আমি ওঁর ছেলের মা, আমি ভীষণ ইনসিকিউরিটি ফিল করতাম।

উনি টাকাপয়সা দিয়ে কমপেনসেট করতে পারতেন তো !

টাকা পয়সার ব্যাপারে উনি খুব উদার ছিলেন না। উনি যা দিতেন তাতে চলত না। ছেলে হওয়ার পর খরচ তো বেড়েছিল। বিয়ের জন্য চাপ দিতাম বলে উনি ক্রমে ক্রমে আমার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন।

আমি আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। উনি কি ছেলেকে ভালবাসতেন ?

বাবা যেমন ছেলেকে ভালবাসে তেমন নয়। তবে বোধহয় মায়া একটু ছিল। আদর-টাদর করতেন।

তারপর কী হল ?

উনি মেয়ের কাছে আমেরিকা গেলেন। এক বছরের জন্য। আমাকে মাত্র কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ছেলের স্কুলের বেতনই মাসে দেড়শো টাকা। আরও খরচ আছে। আমি ফের আয়ার চাকরি শুরু করেছিলাম। কিন্তু বাজার খারাপ। আয় সামান্যই হত।

আপনি কি ওঁকে ব্ল্যাকমেল করতেন ?

ব্ল্যাকমেল ! না। কথাটা তখন মাথায় আসেনি।

উনি একটা ডায়েরিতে ব্ল্যাকমেল করার কথা লিখে গেছেন। অবশ্য তাতে আপনার নাম নেই।

ব্ল্যাকমেল নয়। তবে উনি আমেরিকা যাওয়ার আগে অনেকদিন আমার কাছে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। আমি ভয় পাচ্ছিলাম উনি হয়তো আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। বাধ্য হয়ে আমি ওঁর কাছে যাই। ওঁর বাড়িতে যাওয়া বারণ ছিল আমার। বাধ্য না হলে যেতাম না। আমার একার জন্য তো নয়, ছেলেটাকে তো দেখতে হবে। উনি আমাকে দেখে খুব রেগে যান। আমি টাকা পয়সার কথা বলাতে উনি বলেন, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছ ? এটা কি ব্ল্যাকমেল, আপনিই বলুন তো !

না। তারপর বলুন।

শেষ অবধি উনি কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

তারপর ?

উনি আমেরিকা চলে যাওয়ার পর আর যোগাযোগ ছিল না। উনি আমাকে চিঠি লিখতেন না কখনও। আমার তো লেখা বারণই ছিল। এক বছর বাদে উনি ফিরে আসার পর আমার সঙ্গে দেখা করেন। দেখলাম খুব নরম হয়ে পড়েছেন। আমার প্রতি যেন একটা টানও হয়েছে। সেই দুর্বলতার সুযোগে আমি ফের বিয়ের কথা তুললাম। উনি নিমরাজি ছিলেন। তবে চিন্তা ছিল বিষয়সম্পত্তি নিয়ে। বিয়ে করলে প্রীতীশ ওর সম্পত্তির মস্ত ভাগীদার হয়ে দাঁড়াবে। সেটা উনি যেন খুব একটা পছন্দ করছিলেন না। তবে শেষ অবধি রাজি হয়েছিলেন। এমনকী ওঁর কথা মতো আমি একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সঙ্গেও যোগাযোগ করে নিয়মকানুন জেনে আসি। কিন্তু উনি হঠাৎ করে মারা যাওয়ায় সব ভেস্তে যায়।

মিতালি দেবীর সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করেছিলেন কি এসব কথা জানানোর জন্য ?

হ্যাঁ। আর এক বছর পর এই বাড়ির লিজ শেষ হয়ে যাবে। আমার মাসোহারা বন্ধ। চাকরি থেকে হাতে টাকাপয়সা আসছে না। আমি কী করতে পারি বলুন তো ! আমার ছেলে অবৈধ সন্তান আমি জানি, কিন্তু ধর্মত ওঁরই সন্তান। ও কেন অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হবে ? সেইজন্য আমি প্রথমে

ওঁকে টেলিফোনে সব খুলে বলার চেষ্টা করি। উনি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আমাকে উল্টে গালাগাল করেন।

আপনি কলগার্লের জীবিকা কবে থেকে বেছে নেন ?

মাথা নিচু করে একটু চুপ করে থেকে দোয়েল মাথা তুলে বলল, উনি আমেরিকা যাওয়ার প্রায় সাত-আট মাস পরে। কলগার্ল নয়। আমি নার্সিং হোম থেকেই একজন মধ্যবয়স্ক পেশেন্টের সঙ্গে তার বাড়ি যাই। সেখানেই শুরু। তবে ইচ্ছে হত না। বাধ্য হয়েই—

সমীরণ বা পাণ্টুর কেসগুলো কী ?

পাণ্টুর সঙ্গে এক রাত্রি ছিলাম। ফর অ্যাকসেস টু দ্যাট হাউস।

কী চেয়েছিলেন ?

শেষবার চেষ্টা করেছিলাম মিতালির কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেতে। ও আমাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তখন ঠিক করি, চুরি করব।

চুরির পক্ষে কি পার্টির দিনটাই প্রশস্ত ছিল ?

হ্যাঁ। অনেক লোকের ভিড়ে আমি ঢুকে যেতে পারব বলে বিশ্বাস ছিল।

পাণ্টু যে মিতালির প্রাক্তন প্রেমিক, জানতেন ?

জানতাম। বরুণবাবুর কাছে সব শুনেছি।

সমীরণের সঙ্গে কীভাবে এবং কেন জুটে গিয়েছিলেন ?

ক্ষণিকা—অর্থাৎ ওর গার্ল ফ্রেন্ডকে আমি অনেকদিন চিনি। কিছুদিন ওর বাচ্চার বেবি সিটিংও করেছি। ওই সময়ে আমি ওদের বাড়িতে ওর বাচ্চা রাখছিলাম। ক্ষণিকা সমীরণের ওপর রাগ করে চলে আসায় আমি ঠিক করি সমীরণের সঙ্গে থাকব। তাতে খানিকটা ইনফর্মড থাকা যাবে।

এবার আসল কথায় আসুন দোয়েল দেবী।

দোয়েল এই প্রথম একটু হাসল। হাসলে মুখখানা ভারী সুন্দর দেখায়, লক্ষ করল শবর।

পার্টির রাতে আমি দোতলায় উঠি।

কীভাবে ?

পিছনের বাগান দিয়ে। খুব সোজা।

বলুন।

দোতলার ঘরে ঢুকে চারদিক খুঁজে হ্যান্ডব্যাগটা পেয়ে যাই।

রাত তখন কটা ?

সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে।

খুব রিস্ক ছিল না ?

ছিল।

তারপর ?

দশ হাজার ডলার ছিল। টাকাটা আর দুটো গয়না সরিয়ে ফেলি।

কিন্তু—

জানি আপনি কী শুনতে চান। কিন্তু আপনাকে হতাশ হতে হবে। রাত দশটার পর আর আমি ও বাড়িতে ছিলাম না। খুনটা আমি করিনি মিস্টার দাশগুপ্ত।

শবর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দোয়েলের দিকে।

দোয়েল চোখ সরাল না, সমানে সমানে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি আমার ছেলের স্বার্থে ওই অপরাধটুকু করেছি। চুরি বললে চুরি। আইন আমার পক্ষে নেই। কিন্তু ধর্মত ন্যায্যত আমার এবং আমার ছেলের কিছু পাওনা হয়। দশ হাজার ডলার এমন কিছু বেশিও নয়। বরুণবাবুর স্ত্রী হতে পারলে আমার পাওনা অনেক বেশি হতে পারত। আপনি কি আমাকে অ্যারেস্ট করবেন ?

আপনার অ্যালিবাই আছে ? খুনের সময়ে রাত একটা থেকে—

দুটোর মধ্যে ? ও সময়ে সবাই ঘুমোয়। কে সাক্ষী দেবে বলুন।

আপনি কোথায় ছিলেন ?

দোয়েল একটা শ্বাস ফেলে বলল, আপনাকে আবার হার মানতে হবে। কারণ আমার ফুলপ্রুফ অ্যালিবাই আছে।
কীরকম ?
সেই দিন দশ হাজার ডলার পেয়ে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। ফিরে এসে আমি পাশের ফ্ল্যাটের বউদির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করি ওরা মাঝে মাঝে আমার ফ্ল্যাটে ভি সি আর-এ ছবি দেখতে আসে। সেই রাতে ওদের পুরো পরিবার আর আমি এই ঘরে বসে রাত এগারোটা থেকে ভোর চারটে অবধি দুটো বাংলা আর একটা হিন্দি সিনেমা দেখেছি। আপনি খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। আরও বলি, পাড়ার আরও দুটো মেয়েও সেই রাতে আমার ঘরে বসে ছবি দেখেছে। কোয়াইট এ ক্রাউড।
শবর মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি।
চুরির জন্য আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারেন, কিন্তু খুনের জন্য নয়। খুনিকে আপনার আরও একটু খুঁজতে হবে।
আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করছি না।
তা হলে ?
আমি আপনার সঙ্গে একটা বাণিজ্য করতে চাই। সিম্পল বার্টার।
কী বলুন।
লিভ এ ক্লিন লাইফ। যা করেছেন করেছেন, আর নয়।
দোয়েলের চোখ ভিজে গেল, কে নোংরা জীবন কাটাতে চায় বলুন ! যা করেছি ছেলের স্বার্থে, মা হয়ে। ছেলের জন্য মা সব পারে। পারে না, বলুন ! তবে আর নয়, কথা দিচ্ছি।
এবার আরও একটু কথা আছে। হয়তো আপনিই পারেন ধাঁধাঁটা কাটাতে।

॥ আট ॥

সে পালাতে পারবে না, জানত। তবু দৌড়োচ্ছিল, প্রাণপণে দৌড়োচ্ছিল গলি থেকে গলিতে। আরও গলিতে। এসব অলিগলি তার মুখস্থ, হাতের তেলোর মতো চেনা। কোনদিক দিয়ে বেরোতে হবে, সে জানে। পিছনে এক জোড়া, মাত্র এক জোড়া পা-ই দৌড়ে আসছে। শবর দাশগুপ্ত। লালবাজারের টিকটিকি। ওর কাছে পিস্তল আছে। ইচ্ছে করলেই চার্জ করতে পারে। করছে না। পিস্তল তার কাছেও আছে। ইচ্ছে করলে সেও চার্জ করতে পারে। করছে না। করে লাভ নেই।
তবু সে দৌড়োচ্ছে কেন ? পালাচ্ছে ? না, সে পালাতে চাইলে পারবে। কিন্তু তা নয়। সে দৌড়োচ্ছে নিজের হাত থেকে, নিজেকে ছাড়াতে। না, ঠিক বোঝা যাবে না। কেউ বুঝবে না। এই অবোধ্য জীবন তার কত কী কেড়ে নিয়েছে। তার কত কী চলে গেছে ভেসে সময়ের জলে।
সামনে ডানহাতে একটা কানা গলি। সে ডানদিকেই ফিরল। দৌড়োতে লাগল। তারপর সোজা গিয়ে ঠেকল দেয়ালটায়। থামল। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। দেয়ালে পিঠ রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সুনসান গলি। দূরে গলির মুখ। সেখানে শবর দাশগুপ্ত এসে দাঁড়াল। না, পিস্তলে হাত দেয়নি। দূর থেকে তাকে দেখল। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে আসতে লাগল তার দিকে। দুপুরের রোদ খাড়া হয়ে পড়েছে। শবরকে দেখাচ্ছে ছোটখাটো, পায়ের নীচে বেঁটে ছায়া।
সেও পিস্তলে হাত দিল না। ফালতু। এখন আর এসব করে লাভ কী !
শবর সামনে এসে দাঁড়াল, পালালে কেন ?
পালালে কি ধরতে পারতেন ?
খামোখা এতটা দৌড়োনোর মানে হয় না।
হয়। এত সহজে ধরবেন, একটু গা ঘামাবেন না, তা কি হয় ?
শবর একটু হাসল, সহজে ধরেছি কে বলল ? অনেক চক্কর খেতে হয়েছে।

একটা কাজ করলেন, আপনার মতে ভাল কাজ, পরিশ্রম তো সার্থক।

তুমি তো বেশ কথা বলো।

পিস্তলটা চাইলেন না ?

না। তুমি আমাকে গুলি করবে না, জানি।

কেন করব না ?

তুমি বুদ্ধিমান বলে। আমাকে মারা যায় : কিন্তু সিস্টেমকে কি মারতে পারবে ? অতীতকে মারতে পারবে ? যা ঘটে গেছে তাকে মারতে পারবে ?

না।

তাই চাইনি। আমি হিরো নই, লজিক্যাল।

আপনিও বেশ কথা বলেন।

শবর একটু হাসল। মৃদু স্বরে বলল, মেয়েটাকে মারলে কেন ?

মেয়েটার মরাটা দেখলেন, আমার মরাটা লক্ষ করলেন না ?

শবর ম্লান একটু হাসল, তাও দেখছি।

আমি কবে মরে গেছি জানেন ? আরও দশ বছর আগে।

শবর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আপনি কি বিশ্বাস করেন স্যার, আমি পালাচ্ছিলাম ?

না। পালাতে চাইলে তুমি এই কানাগলিতে ঢুকতে না। কিন্তু তুমি পালালে আমি খুশি হতাম।

সে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে শবরের দিকে চেয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল। দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। কিছুক্ষণ সময় লাগল সামাল দিতে। তারপর মুখের ঢাকা খুলে তার তীব্র চোখ দুখানা শবরের চোখে স্থাপন করে বলল, লোকে জানে, আমি মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়েছিলাম, লোকে জানে আমি ওকে নষ্ট করেছি। পুলিশ আমাকে এমন মারল, যে, একটা কিডনি নষ্ট হয়ে গেল। অপটিক নার্ভ জখম হয়ে আমার বাঁ চোখ হয়ে গেল কমজোরি, ভবিষ্যতে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ও থেকে গেল। আমার সেকসুয়াল আর্জ চলে গেল। তার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতি হল, আমার পড়াশুনার। আমার ক্যারিয়ারের। মায়ের কাছে আমার মার্কশিট আছে স্যার। দেখে নেবেন।

দেখতে হবে না। বোর্ডে গিয়ে তোমার মার্কশিটের রেকর্ড আমি চেক করেছি।

স্তিমিত চোখে চেয়ে বলল, কী হল স্যার ? বস্তিতে থাকি, গরিবের ছেলে, ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছিলাম, আমার সামনে ব্রাইট ফিউচার খুলে গিয়েছিল। কিন্তু কী হল স্যার ? কী হল বলুন ! এই মার্কশিট ধুয়ে কি জল খাব ?

তুমি তখন মস্তানি করতে ?

মস্তানি কি খারাপ স্যার, যদি তার পিছনে মর‍্যালিটি থাকে ? ব্যায়াম করতাম, খেলাধুলোয ভাল ছিলাম, গায়ে জোর ছিল, বুকে সাহস ছিল, তাই পাড়া শাসন করে বেড়াতাম। লোকাল থানায় খোঁজ নেবেন স্যার, আমার তখনকার লাইফে কোনও খারাপ রেকর্ড নেই। কোনও চুরি, ছিনতাই, দু নম্বরি করিনি। কিন্তু বস্তির ছেলে তো, বুক ফুলিয়ে বেড়াতাম বলে ভদ্রলোকরা ভয় পেত। বলত, মস্তান।

মেয়েটার কথা বলো।

মিতালির কথা তো আপনিও জানেন স্যার। বড়লোকের [illegible] খাওয়াই ছিল। আমাকে লাইন দেওয়া শুরু করেছিল কবে থেকে, তখন ফ্রক পরত। চিঠি চালাচালি [illegible] ইশারা ইঙ্গিত করত। তারপর সিনেমায়-টিনেমায় নিয়ে গেছি। গরম মেয়ে স্যার। বলতে লাগল, আমাকে নিয়ে পালাও। তখন আমি সায়েন্স নিয়ে কলেজে পড়ছি। ভাল রেজাল্ট করতে হবে বলে খাটছি, অন্যদিকে আমার মাথা খাচ্ছে মিতালি। ওই বয়স তখন আমার, ফার্স্ট লাভ। সুন্দরী মেয়ে। বাপ বড়লোক। সব জেনেবুঝেও বয়সের দোষে ঝুলে পড়লাম। পড়া গেল, ক্যারিয়ার গেল। লোকে বলে, আমি ওকে নষ্ট করেছি। লোকে দেখল না, ও আমাকে কতটা নষ্ট করেছিল। বড়লোকের তো দোষ হয় না। মিতালি ফিরে গেল, বাপের কাছে, ক্ষমা হয়ে গেল, পড়াশুনো করতে লাগল, বিয়ে

হল, আমেরিকা গেল। এমনকী অত ভাল পাত্র মিঠু মিত্তিরকে ডিভোর্স করার মতো আস্পর্ধাও দেখাল। মিতালির কি কিছু লস হল স্যার ? কিছু না। জীবনটা টালও খেল না, ক্যারিয়ার বিল্ড আপটা দেখুন স্যার। আর অন্য দিকে আমাকেও দেখুন। জীবনটা শুরু করেছিলাম কী দুর্দান্ত ! গরিব ঘরের ছেলে, প্রাইভেট মাস্টার দূরের কথা বইপত্তরই জোগাড় হয় না। পুষ্টিকর খাবার নেই। পড়াশুনোর জায়গা জুটত না। তবু ওরকম রেজাল্ট। কত কী করতে পারতাম স্যার। বাপ-মা কত স্বপ্ন দেখত আমাকে নিয়ে। পুরো ধস নেমে গেল। মিতালির দোষ কেউ দেখল না, দেখলেও চোখ ফিরিয়ে নিল। আর আমাকে ? প্রথম অপমান আর তাচ্ছিল্য করে গেল মিতালি। তারপর পুলিশ তুলে নিল। তারপর আপনি সব জানেন...

জানি।

আজ আমি পালাব কেন স্যার ? পালিয়ে কোথায় যাব ? আমার হারানোর কিছু নেই। জিজ্ঞেস করছিলেন মেয়েটাকে মারলাম কেন ? আপনি বুদ্ধিমান, কেন মারলাম তা কি বোঝেননি ? হাসপাতালে পুরো দু মাস থাকতে হয়েছিল। হাজতে চার মাস। পুলিশ কেস দিলে আরও কত দিন মেয়াদ হত কে জানে ! বরুণ ঘোষ বেশি চাপাচাপি করেনি পাবলিসিটির ভয়ে। তাই ছেড়ে দিয়েছিল। ছাড়া পেয়ে কী হল স্যার ? পাড়ায় সবাই দুয়ো দিত। পড়াশুনোর আর্জ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আগেই। তার ওপর শরীর। বাইরে থেকে ভিতরের ভাঙচুর দেখতে পাবেন না স্যার। বলছিলাম না, মিতালি মরল সেদিন, আমি মারা গেছি অনেক আগে। কিন্তু একটা হিসেব তো মেটাতে হবে। ডিভোর্সের পর একদিন মিঠু মিত্তির আমাকে পিটিয়েছিল, আগেই বলেছি স্যার। বলিনি ?

বলেছ।

কিন্তু মিঠু মিত্তির টের পেয়েছিল সে একটা মরা মানুষকে পেটাচ্ছে। তাই মিঠু মিত্তির আমার সঙ্গে ভাব করে নেয়। শুধু তাই নয়, আমার সব কথা শুনে দয়া করে নিজের রিস্কে ট্যাক্সির লোন বের করে দেয়। নিজের পকেট থেকে টাকাও দিত সময়ে সময়ে। আমরা দোস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। মিঠু মিত্তিরকে কী করেছিল স্যার আপনাদের সুন্দরী বড়লোক মিতালি ? মিঠু মিত্তিরের দোষটা কী ছিল বলবেন ? তার জীবনটাও বরবাদ করে যায়নি কি ওই...যাক স্যার, আজ খারাপ কথা বলব না।

স্থির, অপলক, করুণ দু'খানা চোখে চেয়ে রইল শবর। কিছু বলল না।

হিসেবটা মেটানোর ছিল স্যার। আমার যে জীবনটা মিতালি কেড়ে নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য ছিল মিতালির ? ছিল না স্যার। আমি বহু বছর ধরে তার দেশে ফেরার জন্য ওত পেতে অপেক্ষা করেছি।

তুমি হয়তো জানো না, মিতালিও খুব হ্যাপি ছিল না।

মিতালি হ্যাপি ছিল কি না তা জেনে আমার কী হবে স্যার ? আমার একটা কিডনি নেই। আপনি জানেন না আমার সেক্স আর্জ চলে গেছে। পুরুষের পক্ষে কত যন্ত্রণার ব্যাপার বলুন, বিছানায় মেয়েমানুষ, সে কিছু করতে পারছে না। পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছে পুরুষত্বহীনতায়। এই নষ্ট জীবন নিয়ে বেঁচে আছি কি মিতালিকে হ্যাপি দেখতে স্যার ? আমি তো মহাপুরুষ নই। আপনাকে রীতা দাসের কথা বলেছি। যদি কখনও তাকে পান, জিজ্ঞেস করবেন। সে আপনাকে বলবে কীভাবে সেক্সসুয়াল আর্জ-এর অভাবে আমি মাথা কুটেছি আর কেঁদেছি।

সে বলেছে।

বলেছে ? যাক বাঁচা গেল। আপনি তা হলে আমার জ্বালাটা একটু বুঝবেন। পার্টির দিন যখন ওরা ফুর্তি মারছিল তখন আমি মরুভূমি বুকে নিয়ে দূর থেকে ওদের ঘরে আলোর রোশনাই দেখেছি। মাতালের হল্লা শুনেছি। আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম স্যার। সেই রাতে আমি মাতাল হইনি।

জানি। বলো।

রাত সাড়ে বারোটায় আমি দোতলায় উঠি। পিছন দিক দিয়ে। ঘরে ঢুকি। মিতালি তখন

মাতাল [illegible] জামা কাপড় খোলার চেষ্টা করছে। দু'বার মেরেছিলাম। একটা আমার জন্য। আর একটা মিঠু মিত্তিরের জন্য।

শবর হঠাৎ ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, এবার পিস্তলটা আমাকে দাও পাণ্টু।

পাণ্টু একটু হাসল, সুইসাইড করব বলে ভয় পাচ্ছেন স্যার ? আরে না। এখন সুইসাইড করে লাভ কী বলুন। আপনারও বদনাম হবে। লোকে বলবে শবর দাশগুপ্ত নিজেই পাণ্টুকে মেরে সুইসাইড কেস সাজিয়েছে। মরে আর কী হবে ? মরা লোক কি দোবারা মরে স্যার ? তবে জজ সাহেবকে বলবেন, ওসব যাবজ্জীবনটিবন আমার ভাল লাগে না। ফালতু চৌদ্দ বছর শুয়ে বসে থাকা। তার চেয়ে ঝটপট ট্রায়ালটা মিটিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন যেন। বলবেন স্যার ?

শবর একটু হাসল।

অ্যারেস্ট করবেন না স্যার ?

শবর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পালাতে পারতে। কেন যে পালালে না !

বললাম তো স্যার, কোথায় পালাব ? কার কাছ থেকে পালাব ? আমার ফিলজফিটা আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার ?

পারছি। পাণ্টু অধিকারী, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

* * *

এটাই কি সেই দীর্ঘ চুমু ?

না। এটা অন্য। আর একরকম। অনেক বিষণ্ণ, অনেক গভীর।

জানি। আজ তো তুমি আর সেই তুমি নও। আজ তুমি অনেক বিষণ্ণ, কত গম্ভীর।

আজ আমি অনেক গভীরও। তাই না ?

আমরা কি সুখী হব, বলো না !

কে জানে ! কেউ তা বলতে পারে না।

আমরা কোনওদিন তেমন সুখী হতে পারব না বোধ হয় ! হ্যাঁ গো, একটা কথা বললে তুমি কি রাগ করবে ?

রাগ ! ফুলশয্যার রাতে ? তাও কি হয় ?

শোনো, আমরা কেন সব ওদের দিয়ে দিই না ?

মিঠু নিবিড়ভাবে, জয়িতার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মুখে মিটি মিটি হাসি। মৃদু স্বরে বলল, কাকে দেবে ? কী দেবে ?

দোয়েল তো আসলে জ্যাঠামশাইয়ের বউই, বলো। প্রীতীশ তো ছেলে। হ্যাঁ গো, কেন ওদেরই সব দিয়ে দিই না আমরা ?

জানতাম।

কী জানতে ?

তুমি যে এই কথা বলবে।

তুমি বুঝি অন্তর্যামী ?

হ্যাঁ। ভালবাসলে মনের কথা টের পাওয়া যায়, জানো না ?

আমিও তোমার মনের কথা টের পাই।

কীরকম ?

তুমিও চাও। তাই না ? তুমিও চাও ওরা সব নিয়ে নিক।

চাই। কিন্তু আস্তে আস্তে। একবারে অত সম্পত্তি হাতে পেলে ওরা দিশাহারা হয়ে যাবে। লোকে ওদের এক্সপ্লয়েট করবে। ছেলেটা আদরে নষ্ট হবে। ধীরে, বন্ধু ধীরে।

আমি বোকা নই তো !

না। তুমি খুব ভাল।

তুমিও। আমরা কি সুখী হব ? বলো না !

সুখ চাও ? সুখ মানুষকে অলস করে দেয়, ভোঁতা করে দেয়, সুখ থেকে মেদবৃদ্ধি হয়। আমরা